“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ

২২শ বর্ষ।

(১৩২৬ মাঘ হইতে ১৩২৭ পৌষ পর্য্যন্ত)

উদ্বোধন কার্য্যালয়

১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২্ দুই টাকা।

উদ্বোধন।

২২শ বর্ষের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

---

*ভুলক্রমে প্রবন্ধমধ্যে 'করমেতি' স্থানে 'করেমতি' ছাপা হইয়াছে। ত্রুটী মার্জ্জনা করতঃ পাঠক উহা শুদ্ধ করিয়া লইলে বাধিত হইব। উঃ সঃ।

শিবাষ্টক।

(১)

আদিনাথ বিভু অনাদি ঈশ্বর,
সত্যরূপশিব, শঙ্করসুন্দর,
দেব দুরিতহর, সেবিতসুরনর,
হর হর হর শিব শম্ভো!

(২)

জটামুকুটঘটা ফণিমণিভাস্বর,
রাজিতচিতারজ; রজতকলেবর
শূলডমরুকর, আসনবৃষপর,
হর হর হর শিব শম্ভো!

(৩)

চন্দ্রার্কানল চারুত্রিলোচন,
দিশাবাস ভবপাশবিমোচন,
বিঘ্নবিঘাতন, কৃপানিকেতন,
হর হর হর শিব শম্ভো!

(৪)

কজ্জল উজ্জ্বল কণ্ঠহলাহল
বক্ষে অক্ষজাল, মাল অস্থিদল,
সিত বিধুমণ্ডল, কপালকুণ্ডল,
হর হর হর শিব শম্ভো!

(৫)

ভুজঙ্গভূষণ পিশাচসঙ্গ,
প্রচণ্ড তাণ্ডব নর্ত্তন রঙ্গ,
ব্যোমপ্রসঙ্গ, দহনঅনঙ্গ,
হর হর হর শিব শম্ভো!

(৬)

ঈশান ভীষণ শ্মশানচারণ,
অভয় চরণ শরণাগততারণ,
নাথ নিরঞ্জন, ভবভয়ভঞ্জন,
হর হর হর শিব শম্ভো!

(৭)

বিশ্ববিনাশন ভালহুতাশন,
চন্দ্রচূড়, ত্রিপুরাসুরনাশন,
পিণাকধারণ, অশিবনিবারণ,
হর হর হর শিব শম্ভো!

(৮)

দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু, মহেশ্বর,
আশুতোষ, মহাদেব, দিগম্বর,
মঙ্গলআকর, দেবগঙ্গাধর,
হর হর হর শিব শম্ভো!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

নূতন ও পুরাতন।

(শ্রীদয়াময় মিত্র, এম এ)

ফুল যখন ফুটিয়া উঠে তাহার চারিদিক হইতে ভ্রমর গুঞ্জন শুনিতে পাওয়া যায়, কাণে ভাসিয়া আসে সেই মকরন্দবাহী অলিকুলের ব্যগ্র আবাহন-গীতি, চোখে দেখিতে পাই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের উদার উন্মুক্ত রূপ—ফুলের শোভা, আর পাই নাসিকারন্ধ্রের প্রীতিপ্রদ পরিমল; বর্ণে, গানে, গন্ধে এই যে সুন্দরের সোৎকণ্ঠ প্রীতিসম্ভাষণ ইহাই তখন হইয়া দাঁড়ায় চিত্তের মনোমদ আনন্দের অফুরন্ত উৎসব। কিন্তু যখন এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যটির সমগ্রত্বের ভাবে এইরূপে আমরা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি তখন আমরা ভুলিয়া যাই ইহার আংশিক ক্রমবর্দ্ধন, তখন আমরা দেখি না কি রকমে, কত প্রখর বর্ষা, শীতবাত, কত মৃদু বসন্তের পাগল বায়ুর দোলা, কত প্রেমের হস্তাবলেপন, কত নিঠুর পরিমর্দ্দন ইহার পূর্ণ যৌবন-প্রাপ্তির পিছনের পথ ভরিয়া দাঁড়াইয়া আছে! অথবা ইহার পেলব কোমল স্ফোটনোন্মুখ কোরকের প্রেমভরা আনন্দের পূর্ণ সঞ্চয়নের ধারাটুকু আমাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে তার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দাঁড়াইলেও ইহার অন্তরের ব্যথিত বেদনক্লিষ্ট দিনগুলির দীর্ঘশ্বাসময় ইতিহাস অব্যক্ত গভীর অন্তরালের মধ্যেই চিরদিন থাকিয়া যায়—তাহা আমরা দেখিতে পাই না। সমগ্র জগতের ইতিহাসের যে আংশিক ছবিগুলি আমাদের চক্ষের সমক্ষে প্রতিদিন চলন্ত ছবির চিত্রফলকের ন্যায় দ্রুত অভিনীত হইয়া যাইতেছে তাহারা যে জগতের অংশ ও সমগ্রের সম্বন্ধ একই ভাবে চিরন্তন ভাঙাগড়া করিয়া চলিয়াছে এ রহস্য পরম তাত্ত্বিক আর্য্যঋষিকুলের বিদিত থাকিলেও আমরা যাহারা তাঁহাদের সন্তানসন্ততি বলিয়া বড়াই করি, আমাদের পুস্তকলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে তাহা জ্ঞাত থাকিলেও তাহার সমঞ্জসীভূত স্বরূপলক্ষণ আমাদের স্থূল বাহ্য দৃষ্টির কতকটা বহির্ভূতই থাকিয়া যাইতেছে

দেখিতে পাই। আবার ইহাও যেমন সত্য যে আনন্দের সেই পূর্ণ প্রকৃষ্টতম দৃশ্য আমরা দেখিতে পাই না সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তেমনি সত্য যে আমরা সত্যকে, প্রতিনিয়তই জানিতেছি—অর্থাৎ তাহাকে আমরা জানিয়াও জানি না।

আমরা যাহারা ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব, যাহারা ইন্দ্রিয়ানুগ তাহারা সেই অতি-মহান্ ইন্দ্রিয়াতীতের সংবাদ কি করিয়া আনিয়া দিতে সক্ষম হইব? তবে চিদাভাসে মহাশক্তির সেই পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপের যে অস্ফুট ব্যঞ্জনার অনুভব ও অনুপ্রেরণ আমাদের পক্ষে বহন করা সম্ভব তাহাই কেবল আমরা সময়ে সময়ে অধীর ব্যগ্রভাবে রহিয়া রহিয়া শিশুর অর্দ্ধোচ্চারিত ভাবাবেগবিজড়িত ভাষায় বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি—আমাদের কবি, আমাদের সাহিত্যিক, আমাদের শিল্পী, আমাদের দার্শনিক মুহূর্ত্তেকের সেই ভাব-সমগ্র অদ্বৈত সচ্চিদানন্দের ভাবে ভরপূর হইয়া উঠেন। বাক্য যেথায় পৌঁছিতে পারে না, চক্ষু যেথায় দেখিতে পায় না, কর্ণ যেথায় বধির সেই ভাষাতীত, দর্শনাতীত, শ্রবণাতীতের ভাব-ভাষা-দৃষ্টিময় যে প্রাতিভাসিক দর্শনশক্তি তাহাই যে আমাদের শিল্পী, দার্শনিক, কবির উপজীব্য—সত্য যেখানে আমরা হই বা হইয়া যাই সেখানে কে কাহাকে তাহা প্রকাশ করিবে; আমরা যেখানে সত্যকে প্রকাশ করি আমরা যেখানে সেই অন্তরাত্মন্ "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং" এর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ভাবি তখনই আমরা এ জগতের ঋষি, জ্ঞানী, শিল্পী, দার্শনিক ও কবি হইয়া দাঁড়াই। কিন্তু কে সাহস করিয়া বলিতে পারে যে সত্যদৃষ্টির সত্য ও অনন্তের জ্ঞানের সেই পরিপূর্ণ সংবাদ ইঁহারাই বহন করিয়া থাকেন—এক্ষেত্রে এ প্রশ্নের উত্থাপনও যে ভুল।

তাই বাঙলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকের রচনায় আমরা যে কবিহৃদয়ের তাত্ত্বিক সংবাদটি পাই, তাহা তাঁহার পূর্ণ অখণ্ড সচ্চিদানন্দের সম্বিৎলব্ধ আনন্দের উদ্বেল রসে নিষিক্ত এই ধারণাতেই তৎকর্ত্তৃক এবং তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণের দ্বারা নানারূপে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত, চিত্রিত বিচিত্রিত হইয়া আমাদের সম্মুখে ন্যস্ত। ইহা

যদি প্রকৃতই সত্য হয় তাহা হইলে তদপেক্ষা আনন্দের সংবাদ আর কি হইতে পারে? ইহার প্রকৃষ্টতার সর্ব্বোচ্চ নিদর্শন ইহার ভাবগাম্ভীর্য্যের অচল অটল উদাত্তভাব—সত্য সত্যই তাহা যে কত প্রাণস্পর্শী, কত মনোরম! কিন্তু তাঁহার চিন্তা অনেক স্থলেই তাঁহার বাক্যের সমর্থন করে না ইহাও যে আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতে পাই। তিনি সত্যের যে মনগড়া স্বরূপটি দেখিয়াছেন ও সকলকে দেখাইতে চাহিতেছেন তাহা বৈদিক জ্ঞানী ঋষিকুলেরই কথার ভাবে ভরপুর কিন্তু জীবনের যে সত্য তাঁহাদের কাছে ক্ষুরধার পথের মধ্য দিয়া সফল ও পূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এ ক্ষেত্রে সে সত্যলাভের পথে সে বিঘ্নের কথা নাই—আছে কেবল প্রেমের গানের নিছক মন ভুলানো এবং জীবন-ভুলানো শব্দ-বন্ধন। কিন্তু জীবনের সে সত্যকে শুধু মনোরম বাক্যবিন্যাসের দ্বারা অপরের সমক্ষে উপস্থাপিত করা গেলেও কবির জীবন যে তাহা উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই তাহা তাঁহার অন্যথা উচ্চারিত বাক্যে এবং কাব্যে ও কার্য্যেও আমাদের কাছে পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। তাই মনে হয় লেখা ও বলার মধ্যে বাক্য ও চিন্তার যে ব্যবধান থাকিয়া গিয়াছে কিয়ৎপরিমাণে ত্রিকালদর্শী, অসীম আবিষ্কার ও নূতন নূতন পন্থার উদ্ভাবনকারী সাধারণ মানবমন এখনও সে ব্যবধানের অন্তরাল হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া চলিতে সক্ষম হয় নাই—জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই তাই আমাদের অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য এত শীঘ্র ধরা পড়িয়া যায়। সেই অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যের নির্ব্বাণ কেবল জীবনের সত্যের মধ্যেই সম্যক্‌রূপে ঘটিতে দেখা যায় এবং সেইজন্যই বোধ হয় ভারতবর্ষ তাহার সাধু মহাত্মাদিগকে শিল্পী কবির অপেক্ষাও অনেক উচ্চস্থান দিয়া আসিয়াছে—সিদ্ধ সাধুকুলকে তো অবশ্যই, মোক্ষপথের উদ্যমী যাত্রী পর্য্যন্তকেও তাহার সে উচ্চ সম্মানদানে সে কুণ্ঠা করে নাই।

তাই ক্রমান্বয়ে আমরা শুনিয়া আসিয়াছি ত্যাগ ও ভোগের পরস্পরের দ্বন্দ্বের কথা—কবির, ধার্ম্মিকের, শিল্পীর পরস্পরের সম্পূর্ণ অনৈক্যের কথা। জীবনকে সমগ্রভাবে ধরিয়া লইয়া অদ্বৈত সচ্চিদা-

নন্দের রসে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়ারূপ সার্থকতার কথা আমাদিগের মনে উঠিলেও বাক্যে তাহার পরিচয় দেওয়া সম্যক্‌রূপে সম্ভবপর হয় নাই। ফুলের সেই আনন্দময় পূর্ণ স্ফোটনের সংবাদ উপযুক্তরূপে বহন করিতে পারে এমন লোক জগতে অতি বিরল। অনেক সময় এই উদ্বোধনের মধ্যেই আমরা কবির সেই ধিক্কৃত লাঞ্ছিত "মল্লের বাহ্বাস্ফোট" নির্ঘোষ শুনিতে পাইয়াছি, যে নাকি অনবরতই কেবল "তাল ঠুকিয়া" চলিয়াছে, যে নাকি সংগ্রামের উপরকার শান্তির দিকে তাকাইয়া পথ চলিতে চাহে নাই, যে পরস্পরের মিলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের লাল নিশানই উচ্চে উড়াইয়া দৃপ্ত গর্ব্বিত পদভরে পৃথিবীর উপর দিয়া চলিয়া বেড়াইতে চাহিয়াছে। তাহাও সত্য, তাহারও যে প্রয়োজনীয়তা আছে সে কথা আমরা অস্বীকার করি না এবং কবিও তাহা করেন না তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শুধু স্থির হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানের ভাবে বাক্য ও ভাববিজৃম্ভণের যে অল্পায়াসলভ্য মন্ত্রদ্রষ্টৃত্বের শক্তি তাহা জীবনকে সত্য ও সৎস্বরূপের পথে টানিয়া লইতে পারে না।

শুধুই দার্শনিক অথবা কবি, শিল্পী অথবা বিদ্যাবুদ্ধিসহায় তত্ত্বদর্শীর সহিত প্রকৃত তত্ত্বদর্শীর বিরোধ ও অসঙ্গতি এইখানেই আবার এইখানেই তাহাদের পরস্পর মিলনের উচ্চ সমতল ভূমি। বাক্য ছাড়িয়া ভাবকেই যখন ধরা যায়, জীবনের ছায়ার মায়া কাটাইয়া নিরবচ্ছিন্ন সত্যটুকুর কাছে যেখানে ধরা দেওয়া যায় সেইখানেই ইঁহাদের মিলনের ভাব-শ্রীক্ষেত্র রচিয়া উঠে—যেখানে আর জাতির বিচার করা চলে না। অন্যথা সকল স্থলেই সেই বাক্যের সহিত ভাবের অসামঞ্জস্য, সেই অপূর্ণ, বিযুক্ত, সেই শতরন্ধ্রপূর্ণ সন্ধিসংস্থানের অবস্থা।

আমাদের 'উদ্বোধন' কাহারও সহিত বিবাদ করিতে চাহে নাই, কর্ম্মী, কবি, শিল্পী, জ্ঞানী, দার্শনিক সকলকেই সে সমান আদরে সমান আগ্রহে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, বরণ করিয়া লইয়াছে—জ্ঞানী বলিয়া, শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলকেই তাহার সহানুভূতি জানাইয়া আসিয়াছে, কেবল কোনও কোনও স্থলে বাক্যে ও ভাবে তাহার অসামঞ্জস্য

সকল যায়গাতেই যেমন এক্ষেত্রেও তেমনি অনিবার্য্যরূপে থাকিয়া গিয়াছে; বাক্য যেখানে বিরোধকেই বড় করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে ভাব সেখানে সকলকেই আপনার বলিয়া এক করিয়া রাখিয়াছে। তাহা যদি না হইবে তাহা হইলে উদ্বোধন যে তাহার উপদেষ্টা তাহার শাস্তা মহাপুরুষের ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবে। সেইজন্যই যখন যখন এখানে অপরের সহিত বিরোধের ভাব আসিয়া দেখা গিয়াছে তখনকার সেই অসম্পূর্ণতা, সেই ক্ষণিক চিত্তচাঞ্চল্যকে সে একান্ত করিয়া রাখিতে চাহে নাই। যে উন্মুক্ত, মহৎ, পরিমুক্তসঙ্গ উচ্চ দৃষ্টির আলোকে উদ্বোধনের জন্ম ও নামকরণ হইয়াছে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে নানা বিভিন্ন সংস্কার বিশেষিত, নানা পরস্পর বিরোধীভাবের উত্তেজনায় পূর্ণ আবালবৃদ্ধবনিতাকে সে তাহার সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া শুধু এইটুকুই বলিতে চাহিয়াছে যে, দেখ ভাই কে সেই পরম রহস্যবিৎ যিনি ভারতের ও জগতের বহুদিনের সুদীর্ঘ অমানিশার মধ্য হইতে প্রাচীন ঋষিকুলের যথার্থ বংশধররূপে দাঁড়াইয়া আবার আমাদিগকে তাঁহাদিগেরই ভাবে ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন তাঁহার সেই পরিপূর্ণ সৎ চিৎ আনন্দের বিজ্ঞপ্তির সংবাদ। সংগ্রামকে তিনি অস্বীকার করেন নাই, কারণ সত্যের শান্তরূপের মধ্যেই তিনিই সে সংগ্রামকে খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন; বাক্য ও ভাবের অসম্বদ্ধ প্রলাপোক্তি তাঁহাতে দেখা যায় নাই কারণ বাক্য ও ভাবের অপেক্ষাও সমৃদ্ধিবান্ যে জীবন সেই জীবনের ফুলকে তিনি ফোটাইতে পারিয়াছিলেন—শুধু কল্পনার ক্ষেত্রে নয়, এই জ্বলন্ত জীবন্ত বাস্তবের মধ্যেই যাঁহার আদর্শ বাস্তবকে জয় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাঁহাকে—তাঁহাকেই যাঁহার বাণী আজ কখনও মধুর সপ্রেম অথচ সতেজ ভাষায় আবার কখনও বা যাহা তাঁহারই লীলা-সহচরের প্রচণ্ড জলদনির্ঘোষে ভারতের ও জগতের আকাশকে স্পন্দিত, ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে।

ইঁহাদের জীবন একদিকে যেমন সমুদ্রের মত অতলস্পর্শী গভীর ছিল তেমনই আবার অসীম, অনন্ত নীল আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বথাপ্রতত চিদাত্মাসম্পন্ন ছিল। উদ্বোধনের প্রতীতি, "উদ্বোধনের

সাধনা, উদ্বোধনের দোষগুণত্রুটি এই অলোকসামান্য লোকোত্তর-চরিত্র মহাপুরুষদ্বয়ের জীবনের আলোকে নির্ম্মল নিধূত হইয়া দাঁড়াইয়া। উদ্বোধনের জীবন যাঁহাদিগের জীবনের সহিত একত্র গ্রথিত, ঘন-সন্নিবিষ্ট, অভেদাত্মা তাঁহাদিগের মধ্যেই যে তাহার সকল কামনা ও সকল ভাবনা, সকল অস্ফুট অব্যক্ত ভাব—বাক্য যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে নাই তাহা চিরকালের জন্য সার্থক হইয়া রহিয়াছে, সেখানে যেখানে অংশের সহিত সমগ্রের আর বিরোধ নাই, আছে কেবল সার্থক জীবন, শুধুই ফোটা ফুল আর তার গন্ধ, তার গান, তার দৃশ্য, তার পূর্ণ হইতেও অতি পূর্ণতম সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি।

আর একদিক দিয়া আমরা দেখিতে পাইয়াছি তাহাদের, যাহারা ফুল ফোটার তত্বের মধ্যে তাহার সমগ্রতার ও তাহার পূর্ণত্বের সৎচিৎ-আনন্দের স্বরূপবিশ্রান্তির দিকটি ভুলিয়া গিয়া শুধু তাহার ফুটিয়া উঠিবার বেদনার মধ্যে ঐ যে তাহার আলো ও বাতাসের স্পর্শে আপনাকে উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিয়া ধরিবার উত্তেজনা ও আগ্রহ তাহার মধ্যেই আপনাদিগকেই ভুলাইয়া রাখিতে চাহিয়াছে তাহাদের অপরিণত ও অপুর্ণ দৃষ্টির ধর্ম্ম ও দর্শন। ফুলের ফুটিয়া উঠিবার মধ্যে যে ভোগ-রাগের স্পৃহা পরিণামে তাহাই যে তাহার আত্মোৎসর্জ্জনের অন্যথা আত্মবিকাশের যজ্ঞের পূর্ণাহুতি একথা তাহারা ভুলিয়া গিয়া ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড চীন-প্রাচীরের ন্যায় ব্যবধান তুলিয়া রাখিয়াছে। জীবনের পরম পুরুষার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ভোগ ত্যাগের নিয়মে সংযমিত। আবার ভোগ-পুষ্পের পরিতৃপ্তি সুবাস বিকীরণে আত্মত্যাগের প্রাতিপূর্ণ কর্ম্মের মধ্যেই অনুস্যূত রহিয়াছে। কবি ও শিল্পী যেমন অতীন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ উপলব্ধিকারী ঋষির সহিত সত্য সত্যই বিবাদের কোনও কারণ না থাকিলেও বিবাদের আহ্বান আপনার মধ্যে আপনি রচিয়া উপকথার দৈত্যের সহিত যুদ্ধে বদ্ধপরিকর এক্ষেত্রেও সাধারণ জগতের আংশিক ব্যবহারমাত্র-জীবী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ঋষির সহিত কল্পশরীর আপনার বিরোধকে বাস্তবে জীবন দান করিবার চেষ্টায় উপাদান সংগ্রহে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে।

জ্ঞানবাদী সন্ন্যাসিগণেরই বা সেবাধর্ম্ম কি? অদ্বৈতবাদের দর্শনে সেবাধর্ম্মের স্থান বা কিরূপে সম্ভবে—এ সমস্যাও কালও কোনও উর্ব্বর মস্তিষ্ককে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে।

এ ক্ষেত্রেও আমাদের সেই পূর্ব্বকথিত বাক্য ও ভাবের পরস্পর দ্বন্দ্ব তাহার জের টানিয়া চলিয়া আসিয়াছে। এই যে তাঁহাদের পরস্পরের অনৈক্য, এই যে তাঁহাদের যুক্তির উদ্ভাবিত তথাকথিত বৈপরীত্য ও বৈধর্ম্ম্য স্থিতিশীল, স্বাবলম্বি জীবনের প্রশস্ত প্রাঙ্গনে তাহাদের একত্র সমন্বয় ও ঐক্য বন্ধনের দিকে একবারও চাহিয়া দেখিতে চায় না, আমরা যখনই এইরূপে বুদ্ধিমাত্র অবলম্বন করিয়া জগৎকে বিচার করিতে যাই তখন আমরা আমাদের অস্পষ্ট চিদাভাসের কখনও সমগ্র কখনও অংশ, অবিভাজ্য অক্ষরের এই দুই মনঃকল্পিত বিচারপ্রথার মধ্যে সেই সংশয়াত্মিকা বৃত্তির চপল চঞ্চল লীলায় ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকি। ইতিহাসপ্রোক্ত অনেক বীর ও জগন্মান্য পুরুষের জীবনের গতি এই বুদ্ধিমাত্রেরই নির্দ্দেশে পরিচালিত হইয়া নানা বাদবিসম্বাদ ও মতানৈক্যের উৎপত্তিস্থান হইয়া রহিয়াছে। বাক্য ও বাক্যের পশ্চাতে স্থিত ভাব অনেক সময়ে যে সমন্বয়কে ধরিতে পারে না—জীবনের বস্তুগত সত্য তাহার সমাধান করিয়া বসিয়া থাকে —তখনই এ বিরোধের নিরোধ হয়। প্রাচীন মশরের পৌত্তলিকাবাদী পক্ষীর ন্যায় ইহার জীবনমরণের রহস্য মানুষের জীবনসূত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তন্তুজালের সমগ্রতার মধ্যেই নিহিত। ফরাসী রূপকসাহিত্যের অন্যতম কবি ম্যালার্ম্মে ইহার মর্ম্মস্থলে আঘাত করিয়া যে কথাটি বলিয়া গিয়াছেন বিশেষজ্ঞের তাহা অবিদিত নাই। দার্শনিকমনীষী কান্ত অসংহত বিচারবুদ্ধির সত্যজ্ঞানপ্রাপ্তি সম্বন্ধে এই জন্যই নিরাশ হইয়া যুক্তি বিচারের বাহিরে জীবনের কার্য্যে ও ব্যবহারে সেই জ্ঞানের নিত্যস্থিতির সংবাদ লেখনীমুখে দিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার দর্শন, তাঁহার চিন্তা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের নিকট অন্যরূপে প্রতিভাত হইয়া উন্নতির যে সোপানে গিয়া পৌঁছিল তাহা যে সত্য সত্যই তাঁহারই অভীপ্সিত ছিল এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় না। বহু বর্ষ পরে

কান্তেরই চিন্তার রেখাঙ্কনে আধুনিক যুক্তিবাদীদিগের বিপক্ষে ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর যে নূতন দর্শন গড়িয়া উঠিতে চলিয়াছিল এখনও তাহার শেষ দেখিবার জন্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইয়োরোপের মহাকুরুক্ষেত্রের বিভীষিকা এখনও সমাপ্তির শেষ পর্ব্ব অভিনয় না করা পর্য্যন্ত সে দর্শনের পূর্ণত্ব সুদূরপরাহত থাকিয়া যাইবে মনে হয়।

তাই আমরা বলিতে চাই যে পরস্পর বিভিন্ন ভাবের সমন্বয়ে আত্মোৎকর্ষ-ভূয়িষ্ঠ, উচ্চ জীবনের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ এই জন্যই এ যুগের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কে বলিবে এই ভারত-বর্ষেই সেই জীবনের আলোক প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে কিনা,—এখনও সে আলোকসূর্য্য মধ্যাহ্নগগনের সর্ব্বোচ্চ রেখায় আরোহণ করে নাই কিন্তু কে বলিবে তাহার গতি কোথায়, যাহা বাঙলার এক ক্ষুদ্র পল্লীতে কুটীরগৃহে আরম্ভ করিয়া দূর দূরান্তরে সমুদ্রপার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ভক্ত হৃদয়ে তাহার ভাববিকীরণ করিয়া আসিয়াছে,—তাহার সমাপ্তি কোথায়?

সমন্বয়-জীবনের যে শিক্ষা আজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ আপনার হৃদয়ের অন্তস্তম স্থলে জ্বালাইয়া রাখিয়াছে তাহার শ্রেষ্ঠতম, সম্পূর্ণতম আলোক-বর্ত্তিকা জগতের এই নানাসমস্যাপূর্ণ দিনে আপন প্রভাবে সকলকে প্রভাবান্বিত করিতে পারিবে কি?

কারণ ভারতবর্ষ এখন আর তাহার গৃহকোণে আবদ্ধ নাই, আজ সমগ্র জগতের আসরে বিশ্বের মিলনসভায় রাজরাজের কারুকার্য্য-সমন্বিত ক্ষৌমবস্ত্রপরিহিত অবস্থায় না হইলেও তাহার দীনা, ক্ষীণা জননীর প্রদত্ত অপর্য্যাপ্ত মলিন চীরবাস অবস্থাতেও তাহার উপস্থিত হইবার নিমন্ত্রণ আসিয়াছে—যদি তাহাকে বাঁচিতে হয়, যদি তাহাকে জগতের নিকট হইতে শিখিতে ও শিখাইতে হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষ সেই আহ্বানকে আর উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিবে না।

এই যে নূতন যুগের সমস্যার সমাধানের বাণী ভারতবর্ষের এক প্রান্তে ধ্বনিত হইয়াছে সমগ্র ভারত আজ তাহা শুনিলেও এখনও

সে তাহার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাহার কারণ এই সমস্যাটি ঠিক কোনখানে সর্ব্বাপেক্ষা জটিল কোনখানে সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ, তাহার যথাযথ সন্ধান আমরা পাই নাই অথবা অপর কেহ সে সন্ধানের কথা আমাদিগকে বলিয়া দিলেও সে সম্বন্ধে আমরা যৎপরোনাস্তি উদাসীনতা ও নিরপেক্ষতা দেখাইয়া আসিয়াছি ও আসিতেছি। অনেকেরই মত এই যে রাজনীতিক অধিকারগুলি পাইলেই ভারতবর্ষ আপনার প্রাণকে খুঁজিয়া পাইবে আর এই রাজনীতিক অধিকারগুলি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ইয়োরোপের স্বাধীন রাজ্যগুলির সঙ্গে এক হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিব ইত্যাদি নানাপ্রকার। অনেকেই এই প্রসঙ্গে "ধর্ম্ম" অথবা "হিন্দুধর্ম্মের সনাতন শিক্ষা" কথাগুলি শুনিলেই ক্রোধে আত্মহারা হইয়া উঠেন। ইঁহারা যাহাকে ধর্ম্ম বলেন অথবা আমরা যাহাকে ধর্ম্ম বলি সে কথা বাদ দিয়াও ইঁহাদিগকে কেবলমাত্র এই টুকু বুঝিতে হইবে যে এখন যখন দেখা যাইতেছে যে সম্পূর্ণরূপে না হইলেও অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও আমরা আমাদের রাজনীতিক অধিকারগুলি পাইতে পারিব তখন কেবল সেই আশাতেই বুক বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আমরা দেশের ও দশের কাছে আমাদের অতি নিকট কর্ত্তব্যগুলি ভুলিয়া যাইতেছি কি না। ক্রমেই ভারতবর্ষে এই রাজনীতিক অধিকার লইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের—কারণ অশিক্ষিতের স্থান আমাদের এখনকার রাজনীতিতে নাই—মধ্যে এত অনৈক্য, এত বাদানুবাদ মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে যে তাহার সাহায্যে ভারতবর্ষকে এক অখণ্ড সম্মিলিত আকারে দেখিতে পাইবার আশা আকাশ-কুসুমবৎই থাকিয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে যে এক অখণ্ড সম্মিলিতরূপ দেখিতে পাওয়া সম্ভব জাতির ঐক্যবন্ধনের জন্য, তাহাকে সংহতশক্তি দেখিবার জন্য, যে পথ ও প্রথা স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে বুঝাইয়া গিয়াছেন এখনও তাহা একটি প্রচণ্ড কার্য্যকরী শক্তিরূপে লোকনেত্রের সমক্ষে আত্মপ্রচার করিতে পারে নাই। একদিক হইতে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের

জীবনের মহত্ত্ব আমরা যেমন বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না তেমনই আবার স্বামী বিবেকানন্দের ভারতীয় কার্য্যপ্রণালী কতকঅংশে আমরা বুঝিলেও ও দেখিলেও তাহাকে সমগ্রভাবে বুঝিবার ও দেখিবার যোগ্যতার অভাব আমাদের দেশের ভিতরেই দেখা দিয়াছে।

পাশ্চাত্যের যে নূতন জ্ঞানালোক সমাজতত্ত্ব নামে সুধীমণ্ডলীর অধুনা বিচার্য্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেই সমাজতত্ত্ব জীব ও জড়বিজ্ঞানের সকল ধারাগুলিকে একত্র সন্নদ্ধ করিয়া জগতের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের যে সমন্বয়ের বার্ত্তা আমাদের দ্বারে আনিয়া আজ পৌঁছাইয়া দিয়াছে তাহারই আলোকসম্পাতে অতীত ও বর্ত্তমানের মানবজীবনে ধর্ম্মের অপ্রতিহত ও অবশ্যস্বীকার্য্য উচ্চতম প্রভাবের আলোচনা ইয়োরোপের সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ করিতেছেন দেখিতে পাই; কিন্তু ইয়োরোপের প্রভাববার্দ্ধক্যের পরীক্ষিৎ-সন্তান সমাজ-বিজ্ঞান আজ যাহাকে মাত্র কর্ম্মোপযোগিতার ক্ষেত্রে স্বীকার করিয়া লইয়াছে পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বেও সে কথা স্বীকার করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের পিতৃস্থানীয় ফরাসী মনীষী আগষ্ট কোম্‌ত্ প্রত্যক্ষবিজ্ঞানের তুলনায় ধর্ম্মের স্থান নিম্নে ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি মানবত্বের যে পরিপূর্ণ ছবিখানি স্বীয় মানসচক্ষে দেখিয়াছিলেন সে ছবি আজ ক্রম-পরিস্ফুট আকারে আধুনিক সমাজতত্ত্ববিৎগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং অনতিসুদূর ভবিষ্যতে তাহা আরও করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইয়োরোপের এখনকার পণ্ডিতদিগের এখনও সেই জড়বিজ্ঞানের ধুয়া ধরিয়া সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলিয়াছে। তাঁহাদিগেরই অন্যতম একজন বিশ্ব-বৈজ্ঞানিকের সহিত ঘনিষ্ট পরিচয়ে আমরা ইহাই বুঝিয়াছি যে ধর্ম্মের সহায়ে জীবন গঠনের চেষ্টা এখন কেবল ব্যক্তিগতই থাকিবে তাহা আর সার্ব্বজনীন সভ্যতার মূলে গিয়া কার্য্য করিতে অক্ষম ইহাই তাঁহারা মনে করেন। ইয়োরোপের সভ্যতা ও রাষ্ট্রীয় অধিকারমূলক বিরোধের ইতিহাসের দিক হইতে

দেখিতে গেলে ইহা বড়ই সত্য কথা। ইয়োরোপের ধর্ম্ম ইয়োরোপের জীবন ও চিন্তাকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই বরং পদে পদে তাহাদের বিঘ্ন সাধন করিয়া আসিয়াছে। এখনও সে শক্তি নির্ব্বীর্য্য, অপরের ছিদ্রান্বেষী, সেমিটিক চিন্তার বিশেষত্বপূর্ণ, আত্মসর্ব্বস্ব, অনুদার, সমন্বয়ের শক্তি তাহার নাই। বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বসভ্যতার মূলে মহর্ষি ঈশার জীবনের সত্য কার্য্য করিবে ইহা নিশ্চয় কিন্তু পাদ্রীর ঈশা, চার্চের ঈশা এখন মুমূর্ষু, কণ্ঠাগতপ্রাণ।

এখন সকল জায়গায় মানুষকে মানুষ বলিয়া বুঝিবার জানিবার যে চেষ্টা ও আগ্রহ চলিয়াছে বর্ত্তমান যুগের তাহাই একটি বিশেষ লক্ষণ। মানুষকে এখন আর বর্ণগত, ধর্ম্মগত, সম্প্রদায়গত বলিয়া বিভেদ বা অন্তরায় রাখিবার কাল নাই, তাহাকে মানুষ বলিয়া মানুষের সম্মানই দিতে হইবে—এই যে একটা কথা, ইহা যদিও আজ বস্তুতঃ সত্য হইয়া উঠে নাই সকল সমাজের সকল জাতির সকল দেশের জ্ঞানী, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক মহলে ইহারই আদর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আজ সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া রাষ্ট্রের যে ভাঙাগড়া আরম্ভ হইয়াছে জাতিসঙ্ঘের সেই রাষ্ট্রীয় জীবনে এই সকল সুধীমণ্ডলীর প্রায় কাহারও স্থান নাই; এখনও যতদূর দেখিতে পাওয়া যায় তথায় স্থান আছে কেবল রুষীয় আইজ্বোভস্কি, ফরাসী দেলকাস্ অথবা জার্ম্মাণ বেথ্মানহাডির ন্যায় রাজতন্ত্রকৌশলীগণের কিন্তু এই ধর্ম্মজাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে মানুষের মানুষ পূজার হোতা পোতা অধ্বর্য্যুর মিলন ঘটিয়াছে এই পণ্ডিতদিগেরই ভিতর—যাঁহাদের প্রতিভূস্বরূপে রোমেঁ রোলাঁ সেদিন ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক সভ্যতার সূচনা কোথায় এবং কিসে হইতে পারে তাহার নির্দ্দেশ করিয়া তৎসম্পাদনের জন্য জগতের সুধীমণ্ডলীর নিকট তাঁহার ব্যাকুল আহ্বান ও আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাই বা কোথায়? ক্রমেই জগতের সমস্যাগুলি জটিল হইতে জটিলতর এবং জটিলতম হইতে চলিয়াছে; শান্তিসমস্যা, রাষ্ট্রীয় বিত্ত সমস্যা, আন্তর্জাতিক সম্মেলন সমস্যা, যৌন সমস্যা, শ্রমজীবী

সমস্যা এ সকলই যে আজ মানুষকে নানারূপে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। ইহারই মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃসমস্যা। ভারতবর্ষকে এখন ঘরে বাহিরে কিরূপটি হইতে হইবে—সেই আমাদের একান্ত ঘরের কথা। কারণ ঘরে পরে আজ যেখানে আমাদের সকলকে এক হইয়া দাঁড়াইবার কথা সেইখানেই আমাদিগকে মহাপুরুষগণের ইঙ্গিতে ভারতবর্ষের আত্মাকে খুঁজিয়া পাইতে হইবে।

ভারতবর্ষকে আজ যদি আমরা এক সম্মিলিত ঐক্যবন্ধনে দৃঢ় করিয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে আমাদের মনে হয় সেই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা জগতের একটি অতি পুরাতন সমস্যার গ্রন্থিকেও কোনও কোনও অংশে শিথিল করিয়া তুলিতে পারিব। সেই চেষ্টা কিরূপে সম্ভব? পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষার আলোকে আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দেরা তাহার বিচার করিবেন কি?

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষকে একটি স্বাজাত্য-বন্ধনের সূত্র দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সেই সূত্রান্বেষণের স্পৃহা আমাদিগের মধ্যে জাগ্রত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে ভাল করিয়া আধুনিক জগতের অভাব কি এবং কোথায়, কি কি জীবনমরণের প্রশ্ন এখন তাহার সমক্ষে এবং সে প্রশ্নের উত্তর আমরা কিছু দিতে পারি কি না কারণ তিনিই যে বলিয়াছেন ভারতবর্ষই জগৎকে যুগে যুগে নূতন আলোক দেখাইয়াছে। এখন আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের অতীত গৌরবের আদর্শে নিরূপিত হইতে পারিবে কি? তাঁহার শিক্ষায় আমরা এখন কতকটা শুধু দরিদ্রনারায়ণের পূজাকেই জানিয়াছি, এখন এই বিত্তহীনের আহ্বান যে ভারতের ও জগতের আবালবৃদ্ধবণিতার বিশ্ব নর-নারায়ণের শান্তিহীনের আহ্বানে রূপান্তরিত হইতে চলিল। স্বামীজি তাহার জন্য আমাদিগকে কি করিতে বলিয়া গিয়াছেন? জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা কি ছিল? পুরাতন ছোটখাটো বাদবিসম্বাদগুলি ভুলিয়া তাহাই এখন নূতন বৎসরে নূতন করিয়া আমাদের ভাবিবার বিষয় হউক আর আমরা যেন ভুলিয়া না যাই 'উদ্বোধনের' সেই জীবনোদ্দেশ্য যাহার

দীক্ষা তিনিই দিয়া গিয়াছেন সেই "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রজোগুণ ও সত্ত্বগুণের একত্র সম্মিলন" আর সেই তাঁহারই প্রদত্ত আমাদের জীবন যাত্রা প্রারম্ভের আমন্ত্রণ ঃ—

"'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নিঃস্বার্থভাবে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 'উদ্বোধন' সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে।

"কার্য্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে। কেবল আমরা বলি—হে ওজঃস্বরূপ, আমাদিগকে ওজস্বী কর, হে বীর্য্যস্বরূপ আমাদিগকে বীর্য্যবান্ কর, হে বলস্বরূপ, আমাদিগকে বলবান্ কর।"

গুরুগৃহে শঙ্কর।

(২)

(শ্রীমতী—)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শঙ্কর বিদ্যার্থিগণ সহ মঠে ফিরিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণীর করুণ দৃশ্য তাঁহার চিত্তপট হইতে অপসৃত হইল না। তিনি মনে মনে লক্ষ্মীদেবীর শরণাপন্ন হইলেন। মঠে ফিরিয়া ভিক্ষালব্ধ আমলকী-গুলি গুরুপত্নীর চরণে অর্পণ করিলেন। সংক্ষেপে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং নিত্যকর্ম্মাদি সমাপন করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া কেবল ব্রাহ্মণীর দুঃখ লাঘবের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে আজ এরূপ নির্জ্জনে অন্যমনস্কভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া বিদ্যার্থিগণ বড়ই বিস্ময় অনুভব করিল, কেহ বা অধ্যাপককে এ বিষয়ে নিবেদন করিল। তিনি কিন্তু শঙ্করকে কোন প্রশ্নই করিলেন না।

এইরূপে ক্রমে সন্ধ্যা হইল। নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনাদি ও গুরুসেবা সমাপন করিয়া শয়ন স্থানে গমন করিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক

হইল, কিন্তু শঙ্করের নিদ্রা আসিল না। গভীর নিশীথে নির্জ্জনতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইল। তিনি ক্রমে দেহাত্ম-বোধ বিস্মৃত হইয়া লক্ষ্মীদেবীর উদ্দেশ্যে করজোড়ে দরবিগলিতনেত্রে কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

সরল বালকের আকুল আহ্বানে লক্ষ্মীদেবী আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহার চিত্তপটে উদিত হইলেন। লক্ষ্মীদেবীর দর্শনে শঙ্কর প্রথমে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন; কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া লক্ষ্মীদেবীর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক মস্তক লুণ্ঠিত করিতে লাগিলেন।

হরিপ্রিয়া শঙ্করের নির্ম্মল ভক্তিভাব দর্শনে প্রীতা হইলেন। তিনি শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস! কি জন্য এত কাতর প্রার্থনা করিতেছ? কি অভীষ্ট প্রার্থনা কর, আমার প্রসাদে তোমার তাহাই পূর্ণ হইবে।"

মাতৃমূর্ত্তি লক্ষ্মীদেবীর সেই সস্নেহ সম্ভাষণে শঙ্কর আনন্দে বিহ্বল হইলেন। তিনি তাঁহার এই ভাব কোনরূপে সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "মাতঃ, যদি দাসের প্রতি সদয় হইয়া থাকেন তবে সেই ব্রাহ্মণীর দুঃখ কিরূপে দূর হইবে তাহার উপায় করুন।"

লক্ষ্মীদেবী বলিলেন, "বৎস শঙ্কর! ব্রাহ্মণীর জন্য কিছু প্রার্থনা করিও না। তাহার এমন কোনই পুণ্য নাই যে তাহার ফলে সে দারিদ্র্যদুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে।"

লক্ষ্মীদেবীর বাক্যে শঙ্কর করজোড়ে নতজানু হইয়া কহিলেন, "জননি, যদি ব্রাহ্মণীর পুণ্য কিছুই না থাকে তাহা হইলে ব্রাহ্মণী অদ্য আমাকে যে আমলকী ফল প্রদান করিয়াছেন, তাহারই ফলে আপনি তাঁহার দুঃখ দূর করুন।"

শঙ্করের এই প্রার্থনা শুনিয়া লক্ষ্মীদেবী বলিলেন, "বৎস! তাহাই হইবে, তোমার প্রার্থনায় ব্রাহ্মণীর দারিদ্র্যদুঃখ বিদূরিত হইবে।"

লক্ষ্মীদেবীর কথা শেষ হইতে না হইতে শঙ্কর যেন নিদ্রোত্থিত হইলেন। তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন রাত্রি প্রভাতা। লক্ষ্মীদেবীর

বরদানের কথা স্মরণ করিয়া তিনি আশান্বিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ওদিকে দুঃখিনী ব্রাহ্মণী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেও শঙ্করের কথা বিস্মৃত হন নাই। শঙ্কর যে বলিয়াছিলেন, "মা, গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে অচিরে আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে," একথাটী মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণীর হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কত লোকে কত আশীর্ব্বাদ করে কিন্তু শঙ্করের একথাটী তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে; কখন বা তাঁহার দৈন্যপীড়িত অন্তঃকরণে আবার যেন সুখের আশা দেখাদিতেছে। এইরূপে ব্রাহ্মণী আজ যেন কেমন উন্মনা হইতেছেন, আজ যেন তাঁহার চিত্ত একটু চঞ্চল হইয়া পড়িতেছে।

এই ভাবে সারাদিন গত হইল। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত। সহসা আকাশে মেঘের আবির্ভাব হইল। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ঘনীভূত হইয়া চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণী আকাশের গতি দেখিয়া তাড়াতাড়ি সন্তানগুলিকে খাওয়াইয়া গৃহকর্ম্ম সারিয়া লইলেন এবং পুত্রকন্যাদের লইয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু ঘন ঘন বিদ্যুৎবিকাশ ও মেঘগর্জ্জন বশতঃ তিনি শয়ন করিতে পারিলেন না। ওদিকে মহাদুর্য্যোগ উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে প্রকৃতি অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। প্রবল ঝড় বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শিলাবৃষ্টিও আরম্ভ হইল।

একখানি জীর্ণ ভগ্ন মৃণ্ময় কুটীর মাত্র ব্রাহ্মণীর আশ্রয়, শিলাখণ্ডে তাহাও পূর্ণ হইয়া গেল! তিনি সন্তানগণকে লইয়া কোনওরূপে তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সারাদিন তাঁহার হৃদয়ে যে আশার ক্ষীণ আলোক রেখাটী দেখা দিয়াছিল তাহা এক্ষণে একেবারে নির্ব্বাপিত হইল; অধিকন্তু আজ বুঝি আশ্রয়হীন হইতে হয় এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণী বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ আজিকার কালরাত্রিতে তাঁহার বাছাগুলি কিরূপে রক্ষা পাইবে এই চিন্তা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। তিনি বহুদিন হইতেই দারিদ্র্যদুঃখ ভোগ করিতেছিলেন কিন্তু অদ্য তাঁহার দুঃখ যেন

চরমে উঠিল। তিনি অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে বিপদ্‌হারী মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণীর ব্যাকুলতায় প্রকৃতিদেবীর প্রাণেও বুঝি করুণাসঞ্চার হইল, তাই তিনি স্বীয় সংহাররূপ সংবরণ করিলেন। ক্রমে ঝড়বৃষ্টি প্রশমিত হইয়া আকাশ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হইল। কিন্তু ব্রাহ্মণী তথাপি নির্ভয় হইতে পারিলেন না। তিনি সারারাত্র বিনিদ্র থাকিয়া শেষরাত্রিতে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

লীলাময়ী প্রকৃতির অনন্ত লীলা। প্রভাতারুণস্পর্শে নিশীথের সে নিশাচরী মূর্ত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল। এক্ষণে প্রকৃতিদেবী যেন লাজনম্র নববধূর ন্যায় ধীরে ধীরে নীলাম্বরাবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া স্বীয় কনককান্তি প্রকাশিত করিতেছেন। তরুণ তপন প্রকৃতিঅঙ্গে হাসির কিরণ ছড়াইয়া সুষুপ্ত ধরিত্রীকে জাগরিত করিতেছেন। বর্ষণকাতর বিহঙ্গকুল সারানিশি বৃক্ষকুলায়ে সভয়ে যাপন করিয়া এক্ষণে প্রভাতালোক দর্শনে সানন্দে পক্ষ বিস্তার করতঃ বৃক্ষশাখে বসিয়া প্রভাতরাগিণী গাহিতেছে। বহুদিনের ধূলিমলিন বৃক্ষরাজি আজি বর্ষণস্নাত হইয়া যেন উজ্জ্বল শ্যাম কলেবর ধারণ করিয়াছে। প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তনশীল লীলা মানবভাগ্যাকাশে সর্ব্বত্রই প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাই আজি এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ব্রাহ্মণীরও ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইল।

লোকে বলে, দুঃখ চরমে উঠিলেই দুঃখের শেষ, এবং সুখের চরম হইলেই সুখের শেষ। ব্রাহ্মণীর গত রাত্রিতে দুঃখ একেবারে চরমে উঠিয়াছিল, তাই ভগবান্‌ তাঁহার দুঃখের অবসান করিলেন। তাঁহার অদৃষ্টাকাশে ভাগ্যমেঘ কাটিয়া গিয়া সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হইল।

গভীর নিদ্রাচ্ছন্না ব্রাহ্মণীর নিদ্রা ভাঙ্গিতে আজ একটু বিলম্ব হইল। সহসা ছেলেমেয়েদের কোলাহলে তিনি জাগ্রত হইলেন। "ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলোর" ন্যায় তাঁহার ভগ্ন কুটিরমধ্যে সূর্য্য-

কিরণ প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া তিনি চমকিত হইয়া সত্বর উঠিয়া পড়িলেন এবং যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মুখ দিয়া অজ্ঞাতে এক অব্যক্ত ধ্বনি নির্গত হইল। তিনি দেখিলেন, কুটীর মধ্যে চারিদিকে সুবর্ণের ন্যায় কি ঝক্ ঝক্ করিতেছে। ক্রমে দেখিলেন গৃহমধ্যে অগণিত সুবর্ণ আমলকী পতিত রহিয়াছে, এবং সন্তানগুলি তাহা দেখিয়া আনন্দে পরস্পরে কোলাহল করিতেছে। কি অভাবনীয় দৃশ্য! তিনি যেন চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, বারম্বার দুই হস্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া দেখিলেন, যদি চক্ষের ভ্রম হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা নয়, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, বিহ্বলের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কতক্ষণ পরে সন্দেহে সন্দেহে একটা আমলকী হস্তে তুলিয়া দেখিয়া নিঃসন্দেহ হইলেন। সত্যই ইহা সুবর্ণ আমলকী! ব্রাহ্মণী তখন বুঝিলেন সারারাত্রি যাহাকে শিলাবৃষ্টি ভাবিয়া ভীত হইয়াছিলেন, তাহা এই সুবর্ণ আমলকী বৃষ্টি। কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব হইল? এরূপ অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ত তিনি কখনও দেখেন নাই বা শুনেন নাই। বিস্ময়ের আধিক্যে তিনি শঙ্করের বরদানের কথা প্রথমে বিস্মৃত হইয়া গেলেন, পরে সহসা তাঁহার সে কথা স্মরণ হইল। তখন তিনি দরদরিতধারে করজোড়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণিপাত করিলেন এবং সেই বালক ব্রহ্মচারী যে সামান্য মানব নহেন ইহা বুঝিয়া তদুদ্দেশ্যেও বার বার প্রণিপাত করিলেন।

এক্ষণে এই সুবর্ণ প্রাপ্তির বিষয় রাজার কর্ণগোচর হইলে অনিষ্টের সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি আমলকীগুলি সংগোপনের জন্য ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু তখনই ভাবিলেন, যিনি ইহা দয়া করিয়া আমায় প্রদান করিয়াছেন, তিনিই ইহা রক্ষা করিবেন। আমি কেন ইহার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছি। এই ভাবিয়া তিনি আমলকীগুলি সংগ্রহ করিয়া কয়েকটি ভগ্ন মৃণ্ময় কলস মধ্যে রাখিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণীর সন্তানগণ আমলকীগুলি লইয়া খেলা করিবার জন্য আবদার করিতে লাগিল, তিনি তাহাদিগকে মিষ্টান্নের লোভ দেখাইয়া নিরস্ত করিলেন।

কয়েকদিন এই সুবর্ণ আমলকীর রহস্য কেহই জানিতে পারিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণী শঙ্করের মহিমা প্রকাশিত না করিয়া যেন থাকিতে পারিলেন না। তিনি একদিন একটী সুবর্ণ আমলকী লইয়া এক ধনবতী প্রতিবেশীনীর নিকট গমন করিলেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে কয়েকটী মুদ্রা প্রার্থনা করিলেন।

প্রতিবেশীনী দরিদ্রা ব্রাহ্মণীর নিকট সুবর্ণ আমলকী দর্শনে সাতিশয় বিস্মিতা হইলেন এবং তিনি ইহা কোথা হইতে পাইলেন তাহা জানিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণী আনন্দ প্রকাশের সুযোগ পাইয়া সরলভাবে একে একে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

ঘটনা অসম্ভব হইলেও ব্রাহ্মণীর সরলতায় প্রতিবেশীনীর অবিশ্বাস ছিল না, তাই ইহা সহজেই বিশ্বাস করিলেন এবং এতদিনে ব্রাহ্মণীর দুঃখের দশা দূর হইল বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে ঘটনা অনেকেরই কর্ণগোচর হইল এবং পরিশেষে এ সংবাদ একদিন শঙ্করের গুরুগৃহেও পৌঁছিল। শঙ্কর এই সংবাদে মনে মনে লক্ষ্মীদেবীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। শঙ্করের অধ্যাপক তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অবনতমস্তকে সলজ্জভাবে একে একে সকল কথাই বলিলেন। বিদ্যার্থিগণও অধ্যাপকের নিকট ব্রাহ্মণীর ভিক্ষাদানের কথা বলিতে ভুলিল না। অধ্যাপক শঙ্করের এই অমানুষী শক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং শঙ্কর যে বাস্তবিক সামান্য মানব নহেন তাহা নিশ্চয় বুঝিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে অধ্যাপক শঙ্করকে গৃহগমনের অনুমতি দিলেন এবং শঙ্করের সমাবর্ত্তনের সময় হইয়াছে এসংবাদ বিশিষ্টা-দেবীকে প্রেরণ করিলেন। অধ্যাপকের আদেশ পাইয়া বিশিষ্টাদেবী সাতিশয় আনন্দিতা হইলেন এবং যথাযোগ্য উপঢৌকনাদিসহ পরিচারিকাকে অধ্যাপকগৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

অতঃপর শঙ্কর অধ্যাপককে যথোপযুক্ত গুরুদক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক

তাঁহার চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। অধ্যাপক সাশ্রুনয়নে শঙ্করের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাকে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করতঃ বিদায় দিলেন। পরে শঙ্কর বিদ্যার্থিগণকে যথাযোগ্য প্রীতিসম্ভাষণ জানাইয়া তাহাদিগের নিকট হইতেও বিদায় লইলেন। ছাত্রগণ বিষণ্ণ মনে কিয়ৎপথ শঙ্করের অনুগমন করিয়া পরে মঠে ফিরিয়া গেল।

আমাদের দায়।

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)

আমাদের কর্ম্মহীন, লক্ষ্যহীন, চিন্তাহীন, শান্তিপূর্ণ গতানুগতিক জীবনযাত্রার নিস্তব্ধতাকে চমকিত করিয়া পাশ্চাত্যের কর্ম্মচাঞ্চল্য যেদিন অকস্মাৎ অপ্রতিহতগতিতে আমাদের গৃহে প্রবেশ করিল, সেদিন বহির্জ্জগতের সহিত নবপরিচয়ের উচ্ছৃঙ্খল উত্তেজনায় আমাদের অসুস্থ উন্নতিস্পৃহা বিচারহীন অনুকরণকেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিল। য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতাকে স্বায়ত্ত করিতে গিয়া আমরা ভুলিয়া গেলাম যে অনুকরণ অর্জ্জন নহে। প্রতীচীর বিপুল উন্নতিতৃষ্ণা, অটল আত্মনির্ভরতা, অদম্য কর্ম্মশক্তি, নির্ভীক উদ্যম দর্শনে আমাদের কেমন মতিভ্রম হইয়াছিল। সমগ্র ভারতকে ইউরোপের একটা সুলভ দ্বিতীয় সংস্করণে পরিণত করিবার জন্য আমরা জাতীয় ধর্ম্ম ও সমাজনীতি পরিহার করিতে উদ্যত হইলাম। পাশ্চাত্য-শিক্ষা-সম্মোহিত জনকয়েক ব্যক্তির এই অস্বাভাবিক চেষ্টার বিরুদ্ধে একদল স্বাজাত্যাভিমানী ব্যক্তি চীৎকার তুলিলেন। ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, অনাচার ব্যভিচারে সমাজের এক অংশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রাচীন ও নবীনের

অবিরাম সংঘর্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত "প্রতিভাশালী, উদারহৃদয়, সত্যান্বেষী ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারক, সাহিত্যিক, রাজনীতিজ্ঞগণ বিগত শতাব্দীর মধ্য ও শেষভাগে যুগপৎ উত্থিত হইয়া স্ব স্ব ভাবানুযায়ী জাতীয় জীবন-সমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিগত শতাব্দীর ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

একটী প্রাচীনতম সভ্যতা ও শিক্ষার উত্তরাধিকারী জাতি তাহার অতীত ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া অথবা অগ্রাহ্য করিয়া একান্ত ভিক্ষুকের মত আদর্শের জন্য পাশ্চাত্যের দ্বারে হস্তপ্রসারণ করিয়া দণ্ডায়মান—ভারতের ইতিহাস হইতে এ লজ্জাকর কলঙ্করেখা মুছিয়া ফেলিবার নয়। ফলে শতাব্দীব্যাপী বিপ্লবঝটিকা সমাজের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। "কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতেও অন্তর্নিহিত পৈতৃকশক্তি বিদ্যমান"—সেই কারণেই জাতি বিভ্রান্ত হইলেও—বিনষ্ট হয় নাই; পরাধীন, পতিতজাতির দৌর্ব্বল্যকে লুব্ধ করিয়া তাহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইবার সর্ব্ববিধ চেষ্টা বিফল হইয়াছে।

একদিকে পরানুকরণ-মোহাচ্ছন্ন, পাশ্চাত্যশিক্ষায় বিকৃতবুদ্ধি মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তির ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের অক্ষম চেষ্টা অপরদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশাচার লোকাচারের নাগপাশে বদ্ধ, উদ্যমহীন, আশাহীন বিরাট সমাজ পঙ্গুর মত স্তব্ধ;—আর এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী জাগ্রতপুরুষগণ কিংকর্ত্তব্যনির্ণয়ে অক্ষম হইয়া বিভ্রান্তবৎ দণ্ডায়মান। এই সঙ্কটাপন্ন মুহূর্ত্তে ছত্রভঙ্গ জাতির মধ্যে এক অমিততেজস্বী সন্ন্যাসী আসিয়া দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইলেন।

ভারতের জাতীয়জীবন যখনই বিক্ষুব্ধ হইয়াছে, যখনই সে জাতীয় আদর্শ হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিয়াছে—তখনই এক একজন শক্তিশালী সন্ন্যাসী দেখা দিয়াছেন। শ্রীবুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীচৈতন্য পর্য্যন্ত কত কত মহাপুরুষের সুমহান্ প্রয়াস এই ভারতের জীবনাদর্শকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে—তাহাকে বিপথে পদক্ষেপ করিতে দেয় নাই।

কিন্তু কালচক্রের বিবর্ত্তন যখন আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত অবস্থান্তরের মধ্যে আনিয়া ফেলিল "তখন আর্য্যজাতির প্রকৃত ধর্ম্ম কি এবং সততবিবদমান, আপাতপ্রতীয়মান-বহুধা-বিভক্ত সর্ব্বথা-প্রতিযোগী-আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম্ম-নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়" তাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম হইয়াই আমরা বিপথে পদার্পণ করিতে উন্মুখ হইয়াছিলাম।

কেবলমাত্র অহোরাত্র পশ্চিমের দিকে হাতপাতিয়া থাকিবার জন্যই কি পৃথিবীর পূর্ব্বদিকে আমাদের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল? কত বড় বড় ধর্ম্ম ও সমাজবিপ্লবে এই জাতি বিপর্য্যস্ত হইয়াও অবশেষে সংহত ও আত্মস্থ হইয়াছে। কতবার রাষ্ট্রবিপ্লবে অত্যাচার পীড়িত হইয়াও তাহার দুর্ব্বল মুষ্টি হইতে জাতীয় আদর্শ স্খলিত হইয়া পড়ে নাই; আজ ঘটনাচক্রে ভারতবাসী মূর্চ্ছিত হইলেও জীবিত। কিসের জন্য আজও ধরাপৃষ্ঠ হইতে এই চিরসহিষ্ণু জাতির স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই? এই সমস্যা দ্বারাই স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, অন্তরে ও বাহিরে প্রবলঝড়ে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের ন্যায় আলোড়িত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের ঝড় পূর্ব্ব ও পশ্চিমে উভয় সমুদ্রেই তরঙ্গ তুলিয়াছে। বর্ষের পর বর্ষ ধরিয়া গভীর চিন্তা, প্রথমে পদব্রজে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ ও পরে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া এই পরিব্রাজকসন্ন্যাসী সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণসহায়ে ও তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ আদর্শের অপক্ষপাত বিচার করিয়াছেন। অবশেষে কটিদেশ কৌপীনে আবৃত করিয়া এই চক্ষুষ্মান্ সন্ন্যাসী সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষায় তাঁহার দেশের মাটীর উপরই পূর্ব্বাস্য হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

তথাপি পশ্চাতে সুদীর্ঘ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল "এই পাশ্চাত্যবীর্য্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জ্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়। পাছে প্রবল আবর্ত্তে

পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়, পাছে অসাধ্য, অসম্ভব এবং মূলচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙ্গের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হইয়া যাই।"

অথচ যুগপ্রয়োজনে এই উভয় শক্তির সম্মিলন ও সমন্বয় সাধন করাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রয়োজন সাধন করিতে গিয়া তিনি জাতীয় জীবনের মূল উদ্দেশ্যকে অব্যাহত রাখিয়া বিকৃত ও লুপ্ত পন্থাগুলি পরিহার করতঃ অটুট অধ্যবসায়ের সহিত অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। অভ্রান্ত আত্মবিশ্বাসের উপর দণ্ডায়মান হইয়া তিনি অবিচলিতকণ্ঠে বলিয়াছেন, "হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। লুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে, সদ্যোনির্ম্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান্ করিতেছি, বুদ্ধিমান্ বুঝিয়া লও!"

জাতিগত সার্থক গৌরববুদ্ধিকে জাগ্রত ও সর্ব্বথা উন্নত করিয়া এই অভিনব পন্থায় অগ্রসর হইবার জন্য শ্রীভগবানের আদেশ বিবেকানন্দের কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া শতাব্দীর শেষ ও প্রথমভাগে আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছে। ভীরু কাপুরুষের মত আচার-নিয়মের প্রাচীর তুলিয়া, অর্থহীন প্রথার জীর্ণ কুটীরে আত্মগোপন করিয়া আত্মরক্ষা করিবার লজ্জাকর চেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, আমাদিগকে আজ পৃথিবীর উন্নতিকামী জাতিসমূহের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া পথ প্রদর্শন করিতে হইবে। "এই জন্য ঘরের সম্পত্তি সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্ব্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্ব্ব দ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক্ হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ---যাহা দুর্ব্বল ও দোষযুক্ত তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্য্যবান্, বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর—তাহার নাশ করে কে?"

চল্লিশ বৎসর হইতে এই সমস্যা লইয়া প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয়যুগ আমাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। বিশবৎসর পূর্ব্বে এই সমস্যা সমাধান করা যত দুরূহ বলিয়া অনুমিত হইত, আজ তত কঠিন নহে। কারণ, আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রবুদ্ধজাতি ধীরে ধীরে বিজাতীয় বিকৃতপন্থা পরিহার করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাবের অষ্টাদশবর্ষ অতীত হইতে না হইতেই তাঁহার স্বধর্ম্মাশ্রিত ভাবনিচয় জাতির সাহিত্যে, সমাজে ও ধর্ম্মচিন্তায় প্রবিষ্ট হইয়া ঐগুলিকে নবীনাকার প্রদান করিতেছে; তথাপি পর্য্যাপ্ত হয় নাই। আমরা এখনও দেখিতেছি দিগ্বিদিকে নানারূপ আন্দোলনের নীরস খোসা চর্ব্বণ করিতে গিয়া আমাদের অনেক শক্তির অপব্যয় হইতেছে। এখনও আমরা অন্যায় ও ভুলকে অস্বীকার ও প্রতিবাদ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছি। আমাদের সমাজ কপটাচারী ও স্বেচ্ছাচারিগণের স্বচ্ছন্দ বিহারকাননে পরিণত হইয়া আছে। কেবল মাঝে মাঝে বিরক্ত হইয়া আমরা প্রতিবাদ করিতেছি, প্রবন্ধ লিখিতেছি, পুস্তক বিতরণ করিতেছি,—কিন্তু আদর্শ জীবন দেখাইতে পারিতেছি না।

যে দরিদ্র, পতিত, অত্যাচারপীড়িত কোটী কোটী ভারতবাসীর মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া স্বামিজী "হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করিতে করিতে অর্দ্ধ পৃথিবী অতিক্রম" করিয়াছিলেন, দ্বারে দ্বারে তাহাদের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাদের পক্ষসমর্থন ও দুঃখলাঘবকল্পে আজও আমরা স্থায়ীরূপে কিছু করিয়া উঠিতে পারি নাই! অথচ তাহাদিগকে উন্নত করিয়া সমষ্টিবদ্ধরূপে সামাজিক জীবনগঠন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। জাতীয় জীবনীশক্তির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ যে বিশাল জনসঙ্ঘের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় আছে, তাহাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে না পারিলে যে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব ইহা যদি আমরা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া থাকি, তাহা হইলে কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াও ইতস্ততঃ করিতেছি কেন? এই অবস্থা দেখিয়া কেহ কেহ আশঙ্কা করিতেছেন, স্বামিজীর

উপদেশ ও আদর্শ আমাদের হাতে পড়িয়া বুঝি বা বিফল হইতে বসিয়াছে।

কিন্তু নবযুগের সবল শক্তিসাধনার উদ্ভিন্ন আলোকচ্ছটায় কর্ত্তব্যপথ দেখিয়া লইবার এই সুবর্ণসুযোগকে আমরা কখনই ব্যর্থ হইতে দিব না। ইহাকে শুধু স্বীকার ও সমর্থন করিয়াই যথেষ্ট হইল বলিয়া মনে করিব না—জীবন দিয়া প্রমাণ করিব। বর্ত্তমান যুগের এই সমস্যার বিপুলতা দর্শনে ভীত হইব না; ইহার পরিমাণ করিতে গিয়া শক্তিক্ষয় ও বুদ্ধির সূক্ষ্মতার পরিচয় দিব না—ইহার সমাধানকল্পে যে শক্তির প্রয়োজন তাহার কথাই চিন্তা করিব ও তাহা সংযতভাবে প্রয়োগ করিব। বর্ত্তমান জাতীয় জীবনসমস্যা আমাদিগকেই সমাধান করিতে হইবে—কেননা স্বামী বিবেকানন্দ ইহা দায়স্বরূপ ভারতীয়, বিশেষতঃ, বাঙ্গালী যুবকগণের স্কন্ধেই অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। যদি আমরা সে দায়কে আজ অলসবিলাসে মজিয়া অস্বীকার করি, তাহা হইলে আমাদের অকৃতজ্ঞতার মহাপাপে জাতির দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকিবে না—ইহাও সুনিশ্চিত।

জীব ও ঈশ্বরতত্ত্ব।

(৩)

(মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অযুতসিদ্ধ বস্তুদ্বয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকে তাহার নাম সমবায়। সেই সমবায় সম্বন্ধে সত্তা দ্রব্য, গুণ বা কর্ম্মের উপর থাকে এই প্রকার নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্তও ঠিক নহে। কারণ, অযুতসিদ্ধ এই শব্দটীর যে কোন অর্থই কর না কেন, কোন অর্থই উক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল

হইতে পারে না। আচ্ছা বল দেখি,—অযুতসিদ্ধ এই শব্দটীর কিরূপ অর্থ তোমার অভিমত? যদি বল, যে দুইটী বস্তু একই দেশে থাকে তাহারা পরস্পর অযুতসিদ্ধ, তাহাও ঠিক্ নহে, কারণ, সত্তা ও সত্তার আশ্রয় দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম একই আশ্রয়ে থাকিতে পারে না। সত্তা থাকে গুণের উপর,—সত্তা থাকে কর্ম্মের উপর কিন্তু গুণ থাকে দ্রব্যের উপর,—কর্ম্মও থাকে দ্রব্যের উপর; সুতরাং সত্তা ও গুণ অযুতসিদ্ধ হইতে পারে না,—এইরূপ কর্ম্ম ও সত্তা পরস্পর অযুতসিদ্ধ হইতে পারিল না। আবার দেখ, ন্যায় মতে অবয়বী দ্রব্য থাকে অবয়বের উপর কিন্তু সত্তা থাকে অবয়বী দ্রব্যের এবং তাহা অবয়ব দ্রব্যেরও উপর থাকে; সুতরাং সকল দ্রব্যের সহিত একই আধারে থাকে বলিয়া সত্তা ও দ্রব্য যে অযুতসিদ্ধ হইবে তাহাও সিদ্ধ হইতে পারিল না। সুতরাং যাহাদের আশ্রয় এক হয় তাহারাই পরস্পর অযুতসিদ্ধ হইয়া থাকে, এইরূপ মত যুক্তিসহ হইতে পারিল না। যদি বল, যে দুইটী বস্তু এককালে বিদ্যমান থাকে তাহারা পরস্পর অযুতসিদ্ধ, তাহাও ঠিক নহে, কারণ, তোমাদের মতে সত্তা নিত্য সুতরাং তাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেই থাকে কিন্তু যে সকল জন্য বস্তু অর্থাৎ ঘট, পট প্রভৃতি সত্তার আশ্রয় তাহারা উৎপত্তির পূর্ব্বে থাকে না—আবার ধ্বংসের পরও থাকে না সুতরাং ঐ সকল বস্তুর স্থিতিকাল ও সত্তার স্থিতিকাল কি প্রকারে এক হইবে সুতরাং অপৃথক্‌কালত্বও অযুতসিদ্ধত্ব হইতে পারিল না। এখন যদি বল, যে দুইটী বস্তুর স্বভাব একই তাহারা পরস্পর অযুতসিদ্ধ, তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ, সত্তা ও তাহার আশ্রয় যখন তোমাদের মতে পরস্পর ভিন্ন, তখন তাহাদের স্বভাব কি প্রকারে এক হইতে পারে?—সুতরাং অযুতসিদ্ধ বস্তুটাই কি তাহা ঠিক হইল না বলিয়া অযুতসিদ্ধ বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধের নাম সমবায় সম্বন্ধ এবং সেই সমবায় সম্বন্ধে সত্তা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের উপর থাকে ইহা সিদ্ধ হইতে পারিল না এবং তাহার ফলে ইহাও স্থির হইল না যে, সত্তার আশ্রয় হয় বলিয়া দ্রব্য, গুণ বা কর্ম্ম সৎ হইয়া থাকে।

আরও দেখ, ঘট পট প্রভৃতি বস্তু যেক্ষণে উৎপন্ন হয় ঠিক্ সেইক্ষণেই

তাঁহাতে সত্তার সম্বন্ধ হয় একথাও বলা যায় না, কারণ, সম্বন্ধের স্বভাবই এই যে তাহা দুইটী সিদ্ধ বস্তুর মধ্যেই হয়। সংযোগ একটী সম্বন্ধ। যদি দুইটী কাষ্ঠ সংযুক্ত হইবার পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকে তাহা হইলেই সেই দুইটী কাষ্ঠের মধ্যে সংযোগ উৎপন্ন হইতে পারে। এইরূপ সত্তা ও ঘটের মধ্যে যদি সমবায় সম্বন্ধ হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, সমবায়রূপ সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে ঘট ও সত্তা এই দুইটী বস্তুই বিদ্যমান ছিল। তাহাই যদি হয় তবে ঠিক্ উৎপত্তিক্ষণে ঘটের সহিত সত্তার সম্বন্ধ হইবে কিরূপে? সুতরাং তোমাকে বলিতে হইবে, যে উৎপত্তিক্ষণে ঘটের সহিত সত্তার সমবায়রূপ সম্বন্ধ হইবে তাহার পূর্ব্বক্ষণে ঘট ও সত্তা বিদ্যমান ছিল। তাহাই বা হইবে কিরূপে? কারণ, উৎপত্তিক্ষণের পূর্ব্বে যদি ঘট সিদ্ধ হইল তবে ঘট নিত্য হইল। নিত্যই যদি হইল তবে আবার তাহার উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? আর যদি বল, উৎপত্তির পরক্ষণে ঘটের সহিত সত্তার সমবায়রূপ সম্বন্ধ হইবে, তাহাও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে যেমন উৎপত্তিক্ষণে ঘট সত্তার সহিত সম্বদ্ধ না হইয়াও সৎ হয় সেইরূপ উৎপত্তির পরক্ষণেও সে স্বতঃই সৎ থাকুক্ না কেন? মিছামিছি আবার সেই স্বতঃ সৎ ঘটকে সৎ করিবার জন্য তাহাতে সত্তার সম্বন্ধ কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কি? এইরূপ নানাপ্রকার বিরুদ্ধ যুক্তির সাহায্যে সত্তার সহিত সম্বন্ধ প্রযুক্ত কার্য্যবস্তু সৎ হয় এই প্রকার নৈয়ায়িকগণের মত খণ্ডিত হইয়া থাকে। বিস্তার ভয়ে এই স্থলে আর ঐ সকল যুক্তির উল্লেখ করা গেল না। এক্ষণে দেখা যাক্, বৌদ্ধদার্শনিকগণ এই সত্তার স্বরূপনির্ণয় করিতে যাইয়া কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক এই দুই প্রকার বৌদ্ধদার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে, অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্তা,—তাহা ছাড়া অন্য কোন প্রকার সত্তা সিদ্ধ হইতে পারে না। কোন বস্তু আছে এই বিষয়ে, বল দেখি,--সর্ব্ববাদীসিদ্ধ প্রমাণ কি হইতে পারে? এই বস্তুটী না থাকিলে এই কার্য্যটী হইতে পারিত না, এইরূপ উত্তরই ত আমরা সকলেই দিয়া থাকি। ঘট আছে কেন? ইহার উত্তর দিতে যাইয়া আমরা

সকলেই একবাক্যে বলিয়া থাকি, যদি ঘট না থাকিত তাহা হইলে জলাহরণ প্রভৃতি কার্য্য হইতে পারিত না।

একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। ইহার দ্বারাই বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে, কার্য্যকারিতাই সকল বস্তুর সত্তা। এমন কোন বস্তুই নাই যাহা হইতে কোন কার্য্যই হয় না, পর্য্যবেক্ষণ করিলে সকলেই ইহা স্থির করিতে বাধ্য। এইরূপ কোন না কোন কার্য্য করিবার জন্য সকল বস্তুই উৎপন্ন হয় এবং যে কার্য্য করিবার জন্য যে বস্তু উৎপন্ন হয়, সেই কার্য্য উৎপন্ন হইলেই সেই উৎপাদক বস্তু নাশ প্রাপ্ত হয়। এখন যদি বল, আচ্ছা স্বীকার করিলাম যে, কার্য্যকারিতাই বস্তুর সত্তা কিন্তু সেই কার্য্যকারিতা স্থির বস্তুতে থাকিবে না কেন ?—ইহার উত্তর দিতে যাইয়া বৌদ্ধদার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে, কার্য্যকারিতাই যদি বস্তুর সত্তা হয় তাহা হইলে সেই কার্য্যকারিতারূপ সত্তা কিছুতেই স্থির বস্তুতে থাকিতে পারে না ; মনে কর, বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় বলিয়া অঙ্কুররূপ কার্য্যকে উৎপন্ন করিবার যে শক্তি তাহাই বীজের অস্তিত্ব বা সত্তা। এই অঙ্কুর যেক্ষণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঠিক্ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী-ক্ষণে বীজ থাকে, ইহা স্থিরবাদীও স্বীকার করেন, ক্ষণিকবাদীও স্বীকার করেন। কিন্তু স্থিরবাদিগণ বলেন, তাহার পূর্ব্বেও বীজ ছিল কিন্তু ক্ষণিকবাদিগণ বলেন, তাহা ঠিক নহে ; কারণ অঙ্কুর হইবার ঠিক্ পূর্ব্ব-ক্ষণের ন্যায় তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তীক্ষণ সমূহে যদি বীজ থাকিত, তাহা হইলে যেক্ষণে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীক্ষণেও সেই অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে পারিত। অঙ্কুরকে উৎপন্ন করিবার জন্য বীজের সত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে। সেই বীজ রহিয়াছে অথচ যে কার্য্যের জন্য তাহার সত্তা সেই কার্য্য অর্থাৎ অঙ্কুর সে থাকিলেও হইতেছে না, ইহা কি করিয়া অঙ্গীকার করা যাইতে পারে ? কারণ থাকিলেই কার্য্য হয় ; কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না—ইহা ত সর্ব্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত। তাই বলিতেছিলাম যে, কার্য্যকারিণী শক্তিই যদি বস্তুর সত্তা হয় তাহা হইলে বস্তুমাত্রকে ক্ষণিক বলিয়া অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে অর্থাৎ কারণ যেক্ষণে থাকিবে ঠিক্ তাহার পরক্ষণে কার্য্য হওয়াই চাই—কারণ আছে

অথচ কার্য্য হইতেছে না এইরূপ হইলে কার্য্যকারণভাবরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধই হয় না। এই জন্য অর্থক্রিয়াকারিত্বই বস্তুসত্তা এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে কোন বস্তুকেই স্থিরবান্ অক্ষণিক বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না ইহা সিদ্ধ হইল। যদি বল, ইহাতেও বস্তুর ক্ষণিকতা সিদ্ধ হইল না, কারণ, অঙ্কুরের উৎপত্তির পক্ষে কেবল বীজই ত কারণ নহে—সূর্য্যরশ্মি, জল, ক্ষেত্র ও কাল ইহারাও ত অঙ্কুরের কারণ। এই সকল কারণকে সহকারী কারণ বলা যায়। এই সহকারী-কারণগুলির সহিত যে ক্ষণে বীজ মিলিত হইবে ঠিক তাহার পরক্ষণে অঙ্কুররূপ কার্য্য উৎপন্ন হইবে এইরূপ অঙ্গীকার করিলেই ত উক্ত আপত্তি খণ্ডিত হয়। বীজ অঙ্কুরের কারণ হইলেও যেক্ষণে অন্যান্য সহকারী-কারণগুলির সহিত তাহার সম্বন্ধ হয় নাই সেইক্ষণে তাহা অঙ্কুরের উৎপাদক হয় না, আর যেক্ষণে তাহা ঐ সকল সহকারী-কারণগুলির সহিত মিলিত হইবে তাহার অব্যবহিত পরক্ষণেই অঙ্কুর উৎপন্ন হইবে সুতরাং বীজ স্থায়ী হইলে প্রতিক্ষণেই অঙ্কুরের উৎপত্তি হউক এই প্রকার আপত্তি আর থাকিতেছে না। অতএব বীজকে স্থায়ীবস্তু বলিলে ক্ষতি কি?

স্থিরবাদিগণের এই প্রকার উক্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। কেন তাহা বলা যাইতেছে। আচ্ছা বল দেখি, সহকারীকারণগুলি মিলিত হইয়া বীজের কোনপ্রকার উপকার করে কি না? যদি বল, তাহারা অঙ্কুর জন্মাইবার অনুকূল কোন উপকার করে না, তাহা হইলে তাহাদিগকে সহকারী-কারণ বলিয়া মানিবার আবশ্যকতা কি? কোন প্রকার উপকার যাহা দ্বারা সাধিত হয় না সে যদি সহকারীকারণ হয় তাহা হইলে শুধু উত্তাপ, সলিল, ভূমি ও কাল কেন বীজের সহকারী বলিয়া পরিগণিত হইবে? জগতের আর সকল বস্তুও ত তাহার সহকারী হইতে পারে,—তাহাত তোমরা মান না। তোমরা ঐ চারিটী বস্তুকে যখন সহকারী বল এবং অন্য বস্তুগুলিকে যখন সহকারী বল তখন বাধ্য হইয়া তোমাকে বলিতেই হইবে যে, "ঐ সকল সহকারী-কারণগুলি মিলিয়া বীজে অঙ্কুর জন্মাইবার অনুকূল কোন উপকার বা শক্তি উৎপন্ন করে ইহা স্থির। এখন যদি তোমরা বল, আচ্ছা

তাহাই হউক তাহাতে ক্ষতি কি? অর্থাৎ তোমরা বলিবে যে, স্থায়ী বীজরূপ কারণে আতপ, জল প্রভৃতি সহকারী-কারণগুলি মিলিত হইয়া যেক্ষণে একটী উপকার বা শক্তিকে উৎপাদন করে ঠিক তাহার পরক্ষণেই অঙ্কুররূপ কার্য্যের উৎপত্তি হয়, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। বৌদ্ধদার্শনিকগণ বলেন যে এই সিদ্ধান্তও যুক্তিসহ নহে। যদি বল কেন, তাহার উত্তর এই যে, আচ্ছা বল দেখি, সেই শক্তি বা উপকার (যাহা সহকারী-কারণ, আতপ, সলিল প্রভৃতি হইতে বীজে উৎপাদিত হয়) বীজ হইতে অভিন্ন বা ভিন্ন? যদি বল তাহা বীজ হইতে অভিন্ন অর্থাৎ বীজ ও সেই শক্তি একই বস্তু তাহা হইলে বলিব, তাহা যদি বীজ হইতে অভিন্ন বলিয়া সহকারী-কারণগুলি মিলিত হইবার পূর্ব্বেও ছিল ইহা মানিতেই হয়, তবে সহকারী-কারণগুলি মিলিত হইবার পূর্ব্বে তাহা অঙ্কুরকে উৎপন্ন করিল না কেন? এই আপত্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যদি বলিতে চাহ যে, সেই শক্তি বা উপকার বীজ হইতে ভিন্নই বটে তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিব সেই উপকাররূপ ভিন্ন বস্তুটী কি বীজের ন্যায় কোন ভাব পদার্থ অথবা উহা অভাব পদার্থ। যদি বল উহা অভাব পদার্থ তাহা হইলে বলিব অভাব ত অবস্তুভূত, যাহা স্বয়ং অবস্তুভূত তাহা হইতে অঙ্কুরের উৎপাদন হইবে কি প্রকারে?

যদি বল তাহা বীজের ন্যায় একটী ভাব বস্তু, তাহা হইলে বলিব, তাহা যদি একটী স্বতন্ত্র ভাব বস্তুই হইল তাহা হইলে তাহাকেই অঙ্কুরের কারণ বলিয়া স্বীকার করা উচিত, মিছামিছি বীজকে অঙ্কুরের কারণ বলিয়া লাভ কি? ইহার উপরেও যদি বলিতে চাহ যে, বীজ তাহার আশ্রয় এইমাত্রই কারণ, সাক্ষাৎ না হইলেও কারণের আশ্রয় হয় বলিয়া তাহাকেও কারণ বলিতে ক্ষতি কি? তাহাও ঠিক নহে, কারণ, তাহা হইলে যেক্ষণে অঙ্কুরের উৎপাদিকা সেই শক্তি উৎপন্ন হয় না সেই সময়ে বীজের সত্তাও সিদ্ধ হয় না, কারণ, অঙ্কুর-জনন-শক্তিই বীজের সত্তা ইহা পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। সেই শক্তি যে সময় বীজে নাই সেই সময় বীজ যে আছে এই বিষয়ে ত কোন প্রমাণ দেখা যায় না।

তাহার পর আরও দেখ, সেই উপকার বা শক্তি কার্য্যবস্তু ইহা মানিতেই হইবে, কারণ, তাহা সকল সময়ে থাকে না। যাহা সকল সময়ে থাকে না, কোন সময়ে থাকে তাহাই ত কার্য্যবস্তু। আর যদি তাহা কার্য্যবস্তুই হইল তাহা হইলে তাহা যে সময়ে উৎপন্ন হইবে ঠিক তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে তাহার উৎপাদনের জন্য বীজ, আতপ, সলিল, ভূমি ও কাল প্রভৃতি কারণগুলিতে প্রত্যেকে এক একটি অতিরিক্ত শক্তি স্বীকার করিতে হইবে, সেই শক্তিগুলিও নিত্য হইতে পারে না, কারণ তাহারা যদি নিত্য হইত তাহা হইলে বীজগত অঙ্কুর-জনিকা-শক্তিও নিত্য হইয়া পড়িত বা প্রতিক্ষণেই উৎপন্ন হইত। সুতরাং সেই সকল কারণগত শক্তিগুলি অনিত্য বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। তাহারা যদি এইরূপে অনিত্যই হয় তাহা হইলে সেই শক্তি-গুলির উৎপত্তির জন্য আবার অসংখ্য শক্তি মানিতে হইবে, আবার সেই অসংখ্য শক্তির উৎপত্তির জন্য আবার অসংখ্য শক্তি মানিতে হইবে, এইভাবে অবিশ্রান্ত কল্পনা করিতে যাইয়া স্থিরবস্তুবাদীকে একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িতে হইবে অথচ কোন একটা সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া উঠিবে না, সুতরাং স্থায়ীবস্তু মানিয়া কার্য্যকারণভাব ব্যবস্থা করিবার প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ক্ষণিকবাদিগণের মতকেই নির্দ্দোষ বলিয়া আশ্রয় করিতে হইবে।

বৌদ্ধদার্শনিকগণ এইপ্রকার যুক্তির সাহায্যে স্থায়ীবস্তুতে অর্থ-ক্রিয়াকারিত্বরূপ সত্তা থাকিতে পারে না ইহা সপ্রমাণ করিয়া থাকেন। অবশ্য এই বিষয়ে তাঁহাদের আরও অনেক যুক্তি আছে, প্রবন্ধের কলেবর অতি বিস্তৃত হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় এখানে আর সেই সকল যুক্তির অবতারণা করা গেল না। এক্ষণে দেখা যাক, এইভাবে তাঁহারা জগতের সকল বস্তুকে ক্ষণিক বলিয়া সিদ্ধ করিয়া আত্মস্বরূপ নির্ণয়ার্থ কিরূপ পন্থার অনুসরণ করিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

'সুপ্রভাত।'

(শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়)

(১)

ভারত-আকাশ আবরি আঁধারে
জ্ঞানজ্যোতি ঢাকিল তিমিরে
জাতির গৌরব ভুলিল সকলে
সে এক অতীত দিনে—
বাড়িল তৃষা, জ্বলিল বহ্নি
স্বার্থ-সুখের সনে ॥

(২)

নিবিল তাহার গৌরব-তারা
ভকতি-জ্যোৎস্না মলিন পারা
বিবেক-সূর্য্য হইল অস্ত
হত-গৌরবে ধীরে—
গর্জ্জি ঝঞ্ঝা ছুটিল করকা
পড়িল জাতির শিরে ॥

(৩)

উঠিত যথায় হোমের অনল
তাপস-তাপসী নর-নারী দল
ডুবে গেল তার পুণ্য গরিমা
স্বার্থ-অন্ধকারে—
আদর্শ হারায়ে করে ছুটাছুটি
তাপিত হৃদয়-ভারে ॥

(৪)

শিথিল ভারত নূতন মন্ত্র
নব এক ভাষা নূতন তন্ত্র
'পরম অর্থে' বুঝিল 'স্বার্থে'
ভোগ-তৃপ্তি আশে—
'পরানুকরণে' কত যে ব্যগ্র
দীনতা ঘেরেছে পাশে ॥

(৫)

ভুলিল তাহার উপাস্য দেবতা
ত্যাগী উমানাথ মোক্ষের বারতা
সাধন-ভজন মানব জীবন
পূর্ণ করিতে তারে
রাখিতে জাতির গৌরব দাগ
ত্যাগের শুভ্র শীরে ॥

(৬)

হইল প্রভাত হাসিল এ ধরা
নরদেহে হর আসিলেন ত্বরা
সুপ্ত-ভারত হইল দীপ্ত
পুন নিজ মহিমায়
আর্য্য সূর্য্য বিবেকানন্দ
প্রণমি আমি গো তাঁয় ॥

———

ধানের চাষ।

(ব্রহ্মচারী পশুপতি)

আমাদের লোককে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। উচ্চশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও নিরক্ষর। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় উপাধি থাকিলেই আমরা বুঝি উচ্চশিক্ষিত। যাঁহার কোন উপাধি নাই অথচ বেশ বড় বড় কথা বলেন তিনি অর্দ্ধশিক্ষিত এবং বাদবাকী সবই মুর্খ।

শিক্ষিত ব্যক্তিরা সুসভ্য--তাঁহারা চাকুরী করিয়া খান। মুর্খেরা অসভ্য--তাহারা মজুরী করিয়া খায়। অথচ একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে, মুর্খেরা সভাদের মুখে গ্রাস তুলিয়া দেয় তবে তাঁহারা কষ্ট করিয়া চিবাইয়া লন, এবং পরে দেখেন তাঁহারা মুর্খের অন্ন খাইতেছেন। এমন কথা বলিতেছি না যে, সকলেই মজুরী করিয়া খায় বা মজুরী করিয়া খাওয়াই আদর্শ। তবে আমার বক্তব্য এইমাত্র যে, দিন রাত্রি অশান্তির অন্ন খাওয়া অপেক্ষা সোয়াস্তিতে খাওয়া শ্রেয়স্কর, এবং তাঁহারা যে শিক্ষা করেন তাহা যদি তাঁহাদের গরীব ভাইদের একটু বুঝাইয়া দেন, যদি তাহাদের অশিক্ষিত না রাখিয়া একটু আলোকের আভাস দেন, তাহা হইলে লোকসান ত দুরের কথা, তাঁহাদের অনেক পরিশ্রমের ফল তাঁহাদের মৃত্যুর পরই শেষ হইয়া যাইবে না বরং তাঁহারা জীবনের পরপার হইতে কৃতজ্ঞতার আনন্দধ্বনি শুনিতে পাইবেন।

এই যে বাংলাদেশের সাতকোটী লোকের প্রায় শতকরা ৯৫ জন অশিক্ষিত, একি কম আপশোষের কথা! শুনিলে দুঃখে মাথা কুটিয়া মরিতে ইচ্ছা হয় না? আপনারা শিক্ষিতেরা যদি একটু চেষ্টা করেন, যদি একটু স্বার্থত্যাগ করেন তাহা হইলে ২৫ বছর পরে শতকরা ৯৫ জন অশিক্ষিতের স্থানে, ৯৫ জন শিক্ষিত হইবে।

শিক্ষা বলিতে সাধারণে বোঝে চল্‌তি ইংরাজি শেখা—যাহাতে তাহারা চাকুরী করিয়া খাইতে পারে। কিন্তু আমার ধারণা অন্য রকম। শিক্ষা বলিতে আমি বুঝি, যাহাতে মানুষ বুঝিতে পারে যে সে মানুষ। সে মোটামুটি দেশের ভাষায় কথা বলিতে পারে—দেশের খবর জানে, এবং অন্যদেশে যাহা হইতেছে তাহারও কিছু কিছু খবর রাখে। মোটের উপর সে যে জগতে বাস করিতেছে তাহার সহিত কিছু পরিচিত।

পৃথিবীর সকল দেশের লোকেদের মধ্যে কর্ম্মবিভাগ আছে। তবে আমাদের দেশের মত হয়ত জাতিগত কর্ম্মবিভাগ সকল দেশে নাই। জাতিগত কর্ম্মবিভাগের জন্য অনেকে আপত্তি তুলিতে পারেন, কিন্তু যাহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহার সমূলে ধ্বংস অসম্ভব। জাতিগত কর্ম্ম করা খুব ভাল, তবে আমাদের মনের নীচতা বশতঃ অনেক কাজকে নীচ কাজ বলিয়া থাকি এবং সেই জন্য আমরা মুচি মেথর ছুঁইলেই স্নান করি অথচ একজন সভ্যকর্ম্মী যদি অতি কুৎসিত কর্ম্মও করেন তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে উচ্চাসন দিই।

শিক্ষিত বাঙালীদের চাকুরী করা ছাড়া যে অনেক অন্য কাজ আছে তাহা তাঁহারা ভুলিয়াই গিয়াছেন। কলিকাতার বড় বড় হৌসে চাকুরী করেন অনেকে, অথচ তাঁহাদের কাহারও কথা একটু গোপনে খোঁজ লইলে জানিতে পারিবেন যে তাঁহার ভদ্রাসন বাড়ীটুকুও হয়ত বাঁধা। তাঁহার পিতামহ গ্রামে থাকিতেন, ২৫/, ৩০/, বিঘা আবাদী ধানের জমি তাঁহার ছিল, তিনি পাড়ার হরিশ মোড়লকে 'দাদা' বলিয়া ক্ষেত্রে বীজ বপন হইতে ফসল তুলিয়া আনা পর্য্যন্ত দুবেলা মাঠে যাইতেন, তাহাতে তাঁহার মানের হানি কোন দিন হয় নাই, দেশে পৈতৃক আটচালাখানিতে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব হইত, অতিথি তাঁহার গৃহে নারায়ণ বলিয়া পূজিত হইতেন, ভিক্ষা দিতে তিনি কোন দিন কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই, "সার্ব্বভৌম মশাই" বলিয়া গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে প্রণাম করিত। কিন্তু আজ তাঁহার কৃতী শিক্ষিত পৌত্র তাঁহার সাধের দোল দুর্গোৎসব উঠাইয়া দিয়াছেন,

তাঁহার খামারবাড়ীও নাই গোয়ালবাড়ীও নাই। দুঃখের উপর দুঃখ, বলিতে লজ্জা হয়, লাউডাঁটাও তিনি আজ ধার করিয়া খান। পাওনাদারের পীড়নে তাঁহার আহারে নিদ্রায় শান্তি নাই। এ বিড়ম্বনা কেন? বাড়ীর পিছনে দশ কাঠা জমি পড়িয়া থাকে, তাহাতে যদি লাউ, কুমড়া, কলা, সীম লাগান তাহা হইলে নিজেরা প্রচুর পরিমাণে খাইতে পারিবেন, দু দশ জনকে দুই একটী করিয়া দিলে নিজের হৃদয়ের প্রসার হইবে, অতটা অন্তরকার্পণ্য থাকিবে না। ছুটির সময় যদি নিজেরা একটু পরিশ্রম করিয়া মাঠে যান, এবং আপনাদের শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা নিরক্ষর চাষীদের একটু আধটু শিখাইয়া তাহাদের উৎসাহ দেন তাহা হইলে তাহারা আরও অধিক উদ্যমের সহিত কাজ করিবে। শুধু একটু পরিশ্রম আপনাকে করিতে হইবে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, বিশেষ করিয়া আমাদের বাংলাদেশের সম্পদ্ বলিতে যদি কিছু থাকে তাহা চাষ। বাংলাদেশের চাষারা অনেক রকম শস্যের আবাদ করে বটে কিন্তু ধানই বাংলায় বেশী হয়। জগতের অন্যান্য দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবাদ হইতেছে কিন্তু আমাদের হতভাগ্য দেশ অত্যন্ত গরীব, এবং দেশের কৃতী সন্তানগণের উদ্যমের অত্যন্ত অভাব। আমরা খাই সবাই, কিন্তু তাহা আসে কোথা হইতে, এবং যাহা আসে তাহা কতটুকু, তাহার চেয়ে বেশী আসা দরকার কিনা, এবং কি করিয়া সেই দরকারের পূরণ হয় তাহা আমরা অনেকেই ভাবি না।

কৃষিকার্য্য যে শিক্ষার বিষয় তাহা আমরা অনেকেই জানি না এবং অনেকে স্বীকারও করি না। আমেরিকা এবং ইউরোপে যে উপায়ে আবাদ হয় তাহা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় একরূপ অসম্ভব এবং বলিতে গেলে, অত কলকব্জার আমাদের প্রয়োজনও নাই। আমাদের দেশের জমি ইউরোপ ও আমেরিকার জমি অপেক্ষা অনেক নরম সুতরাং তাহা অনায়াসেই কর্ষিত হইতে পারে। তবে আমাদের দেশের লাঙ্গলের ফাল এখন যে রকমের আছে, তাহা অপেক্ষা কিছু

বড়, চওড়া ও বক্র হওয়ার দরকার। তাহা হইলে অনেকদূর পর্য্যন্ত মাটির নীচে প্রবেশ করে এবং মাটিও একটু বেশী চূর্ণ হয়। শিক্ষিত সমাজের অনেকেই বোধ হয় বার্ণ কোম্পানীর তৈয়ারী লাঙ্গলের ফাল দেখিয়াছেন। তাঁহারা যদি স্ব স্ব গ্রামের কামার দ্বারা ঐ অনুরূপে ফাল তৈয়ারী করাইয়া ব্যবহার করেন তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক ফসল পাইবেন। আমাদের দেশে চাষীরা, অনেকে কেন বেশীর ভাগই, প্রথম চাষ দেওয়ার সময়, জমিতে কোনরূপে গোটাকতক দাগ টানিয়া যায়, অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি ঐ দাগই হয়ত শেষ চাষ হইয়া গেল। এমন করিলে কি আর ভাল ফসল পাওয়া যায়? চাষের প্রথমেই জমিকে বেশ করিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলা উচিত। একেবারে ধূলির মত নয় তবে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাটির স্তূপ রাখিয়াই তাহাতে বীজ বপন করা হয় তাহা না করিয়া মাটিকে চূর্ণ করিয়া লইয়া বীজ বপন করিলে, বীজের অঙ্কুরোদ্গম করার সময় অনেক সুবিধা হইবে, এবং কঠিন মাটির স্তূপ থাকার দরুণ পূর্ব্বে যেরূপ অনেক অঙ্কুর মারা যাইত, তাহা না হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা তিন গুণ অধিক ফসল হইবে। অনেকে বলিবেন, ২০০, ৫০০ বিঘার মাটি চূর্ণ করা অসম্ভব এবং তুমি যাহা বলিতেছ তাহা দু-এক কাঠা জমিতেই সম্ভব। অনেকে হয়ত তাহাও বলিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, ও সব বাজে কথা, আমরা চিরকাল ধরিয়া যাহা করিয়া আসিতেছি তাহা না করিয়া তোমার ও সব বাজে কথা শুনিতে চাহি না। তাঁহাদের কাছে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন একটু কষ্ট করিয়া গভর্ণমেণ্টপরিচালিত কৃষিক্ষেত্রগুলি দেখেন। তাহা হইলে দেখিবেন, তাহারাও তাঁহাদেরই মতন দেশী হাল ও দেশী গরু দ্বারা চাষ করাইয়া তাঁহাদের অপেক্ষা দ্বিগুণ ফসল পাইতেছে, অথচ তাহাদের কোন বারই অজন্মা হয় না। ১০০৲ টাকা খরচ করিয়া ৫০০৲ টাকা পাওয়া যায়, এবং ২০০৲ টাকা খরচ করিয়া ১৫০০৲ টাকা পাওয়া যায়, কোন্‌টা লাভের? তবে প্রথমে খরচ একটু বেশী করিতে হইবে। ১০/০ বিঘা জমি কোন রকমে চাষ

করার চেয়ে, ৫/০ বিঘা জমি ভাল করিয়া চাষ করা উচিত, তৎপর বৎসরে ১০/০ বিঘা জমি বেশ ভাল করিয়া চাষ করিতে পারিবেন।

চাষের প্রধান অঙ্গ সার। কিন্তু আমরা ত' ধানের জমিতে সার দিইই না, আর যদিই বা দিই তাহাকে সার না বলিয়া রাবিশ বলিলেই প্রকৃষ্ট হয়। সার মানে উত্তম জিনিষ, কিন্তু আমরা জমিতে এমন জিনিষ দিই না যাহা তাহার পক্ষে উত্তম, উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় জমির নিজের যদি বা কিছু উর্ব্বরা শক্তি থাকে তাহাও হ্রাস করিয়া দিই। যেমন ছাইএর সার; জমিতে যখন তাহা দেওয়া হয় তখন তাহাতে সার ত' কিছুই থাকে না— থাকে যাহা তাহা কয়লা বা ঝামা। সেই ঝামা বা কয়লা অঙ্কুরগুলিকে ধ্বংস করে। ধানের জমির পক্ষে উত্তম সার গোবর। কিন্তু সাধারণতঃ যেরূপ গোবরের সার জমিতে দেওয়া হয় তাহাতে সার-পদার্থ শতকরা ২৫ ভাগ থাকে, বাকী ৭৫ ভাগ নষ্ট হইয়া যায়।

গোবরের সার প্রস্তুত করিবার মোটামুটি প্রণালী এইরূপ। প্রথমতঃ শুষ্ক স্থানে একটি গর্ত্ত খুঁড়িতে হইবে। যেখানে গর্ত্ত খোঁড়া হইবে সেই যায়গাটি পারিপার্শ্বিক স্থান হইতে উচ্চ হইলে ভাল হয়। গর্ত্ত খোঁড়া হইলে তাহাতে বেশ পুরু করিয়া বিচালী বিছাইতে হয়, তাহার পর টাট্‌কা গোবর সংগ্রহ করিয়া সেই গর্ত্তে দিবেন। গোবর দিবার প্রণালী এই যে প্রথমবার যখন গর্ত্তে গোবর রাখিবেন তখন বেশ সমান করিয়া রাখিবেন, এমন যেন না হয় যে গর্ত্তের কোন অংশে গোবর থাকিল, এবং অন্য অংশ খালি পড়িয়া রহিল। পুনর্ব্বার গোবর দিবার পূর্ব্বে, পূর্ব্বেকার গোবরের উপর কিছু মাটী ছড়াইয়া উল্টাইয়া লইয়া তাহার উপর নূতন সংগৃহীত গোবর দিবেন। এইরূপে যতদিন গর্ত্তটি পূর্ণ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত টাট্‌কা গোবর দিতে থাকিবেন, এবং গর্ত্ত পূর্ণ হইয়া আসিলে তাহার উপর ছাই দিয়া ঢাকিয়া দিবেন। সারের গর্ত্তের উপর এক খানি চাল বাঁধা অবশ্যকর্ত্তব্য। এইবারে হয়ত অনেকেই আমার উপর খড়্গহস্ত হইয়া বলিবেন যে, চাষাদের নিজেদেরই কুঁড়ে

নেই তারা আবার চাল বাঁধতে যাবে সারের গাদার উপর। একখানি চাল বাঁধিতে খরচ কিছুই নাই; বাঁশও পাওয়া যায়, বিচালীও আছে, দড়িও আছে, তবে প্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্য পরিশ্রম—পরিশ্রম করিতে হইবে। পরিশ্রম না করিলে ভাতের গ্রাস মুখে তুলিবেন কি করিয়া? চাল না বাঁধিলে লোকসান যাহা হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—শতকরা ৭৫ ভাগ সারপদার্থ পাওয়া যায় না। অনাবৃত স্থানে সার পড়িয়া থাকিলে, প্রথমতঃ উদ্ভিদের খাদ্য সূর্য্যকিরণে বাষ্পাকারে অনেক উড়িয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ বৃষ্টির জলে অনেক ধুইয়া যায়, তৃতীয়তঃ গর্ত্ত শুষ্ক স্থানে না হইলে সেই গর্ত্তের মাটিও অনেক সারপদার্থ শোষণ করিয়া লয়। গর্ত্তের চতুঃপার্শ্বে নালা কাটিয়া দেওয়া উচিত যাহাতে বৃষ্টির জল কোনরকমে গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ না করে। যাঁহাদের বেশী জমির আবাদ আছে তাঁহারা যদি সারগর্ত্তটী সিমেণ্ট দিয়া বাঁধাইয়া লইতে পারেন তবে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হয়।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য কি?

(মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রবিড়)

ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়া উপনিষদ্‌গুলির প্রকৃত অর্থ কি তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। অতএব উপনিষদের অর্থ বুঝিতে হইলে ব্রহ্মসূত্র যে একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। যেমন কর্ম্মকাণ্ডের শ্রুতিগুলির অর্থ যথার্থরূপে নির্ণয় করিতে হইলে আজকাল মহর্ষি জৈমিনিপ্রণীত পূর্ব্বমীমাংসা ভিন্ন গত্যন্তর নাই, এস্থলেও তদ্রূপ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু উপনিষদের অর্থ কি তাহা নির্ণয় করিবার জন্য

ব্রহ্মসূত্র রচিত হইলেও সেই ব্রহ্মসূত্রের অর্থ কি তাহা নির্ণয় করিবার উপায় কি? বলা বাহুল্য, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য।

আজকাল এই ব্রহ্মসূত্রের উপর প্রায় ১৩টী বা ১৪টী মতের ভাষ্য পাওয়া যাইতেছে এবং তাহারা সকলেই পরস্পর বিভিন্ন মতাবলম্বী—সকলেরই উদ্দেশ্য ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ অর্থ নির্ণয় করা, এবং তাহারা সকলেই যুক্তি এবং তর্ক সহকারে সূত্রের অক্ষরগুলি সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিয়া যাহাতে তাহাদের অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা হয় এবং শ্রুতিরও আনুকূল্য হয় তাহার সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। এই কারণে কোন ভাষ্যকেই যে উপেক্ষা করিতে পারা যায় তাহা বলা যায় না।

ইহার কারণ, সকলের মতেই সূত্রার্থে যুক্তিতর্কের অনুকূলতা এবং সূত্রেরও অনুকূলতা দেখা যায়। বস্তুতঃ, এইজন্য এই সূত্র-গুলিকে কামধেনু বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, যাহার যে মত প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা তাহাই এই সূত্র হইতে প্রদর্শন করিতে পারা যায়।

ফলতঃ, এই কারণে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, ব্রহ্মসূত্রের যাবতীয় ভাষ্যকারগণ যেরূপ বিভিন্ন তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন সেই সকল মতই কি সূত্রকার ভগবান্ ব্যাসদেবের অভিপ্রেত অথবা কোন মতবিশেষই তাঁহার অভিপ্রেত?

এতদুত্তরে যদি বলা যায় সকল মতই তাঁহার অভিপ্রেত, তাহা হইলে মতগুলি পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় কোনটাই তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। আর যদি বলা যায়, কোন একটী মতই তাহার অভিপ্রেত তাহা হইলে দেখা উচিত কি কারণে কোন্ মতটী তাঁহার অভিপ্রেত হইল।

বলিতে কি, এই কার্য্যটী সম্পন্ন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যাহার জন্য প্রাতঃস্মরণীয় পরমপূজ্য আচার্য্যগণ নিজ অমূল্য জীবন ক্ষয় করিয়া গিয়াছেন তাহা যে সহজসাধ্য তাহা কেহই

ভাবিতেও পারিবেন না। বাস্তবিক, পাণিনি ব্যাকরণসূত্রের মহাভাষ্য যেমন মহর্ষি পতঞ্জলি রচনা করিয়া সূত্রের অর্থ সূত্র দ্বারাই নির্ণয় করিয়া সকল প্রকার বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা নিরস্ত করিয়াছেন, এই ব্রহ্মসূত্রের কোন ভাষ্যই সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে নাই। এ কার্য্যটী করিতে পারিলে বোধ হয় সূত্রার্থ নির্ণয়ের জন্য কোন চিন্তাই হইত না। অবশ্য পাণিনির বিশেষত্ব এই যে, পাণিনি-ব্যাকরণে স্বয়ং পাণিনি মুনি সূত্রব্যাখ্যার আনুকূল্যার্থ স্বয়ংই যেমন কতকগুলি সংজ্ঞা ও পরিভাষা-সূত্র রচনা করিয়াছেন, মহর্ষি বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র মধ্যে সেরূপ পন্থ অবলম্বন করেন নাই। নিজ সূত্রের ব্যাখ্যা কিরূপে করিতে হইবে তাহার জন্য যদি তিনি কোন সূত্র রচনা করিতেন বা কোনরূপ প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেন তাহা হইলে হয়ত ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যায় এত মতভেদ হইত না। কিন্তু তাহা হইলেও তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি ত সেই সকল সূত্রের সূত্রকারাভিমত ব্যাখ্যা নির্ণয় করিতে বিরত থাকিতে পারেন না। তিনি যেরূপেই হউক সূত্রের প্রকৃত অর্থনির্ণয়ে যত্ন করিবেনই করিবেন।

তাহার পর ইহাও ভাবিবার বিষয় যে, বাস্তবিক পক্ষে সূত্রকার সূত্রার্থনির্ণয়ের জন্য সূত্রাদি রচনা না করিলেও তিনি যে কোন একটা নিয়মের বশীভূত না হইয়া সূত্ররচনা করিয়াছেন তাহাও বলা যায় না। যিনি পরোপকারের জন্য কত যত্নে এত সংক্ষিপ্ত সূত্র রচনা করিয়াছেন, তিনি যে তাহার অর্থনির্দ্ধারণের জন্য কোন একটী প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। আমরা যদি সেই প্রণালী বুঝিতে না পারি তাহা হইলে তিনি যে কোন প্রণালী অবলম্বন করেন নাই ইহা কি করিয়া বলিতে পারা যায়? যাহা হউক যখন সূত্রকার এরূপ কোন নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন নাই এবং যখন তিনি উচ্ছৃঙ্খলভাবেও সূত্ররচনা করিয়াছেন বোধ হইতেছে না, তখন নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে ইহার কোন নিয়ম আছে। এখন দেখিতে হইবে সে নিয়ম কি।

প্রথমতঃ দেখা যায়, বেদান্ত দর্শনখানি একখানি মীমাংসা-গ্রন্থ—ইহার অপর নাম উত্তরমীমাংসা। মীমাংসাদর্শন বলিতে যে দুইখানি গ্রন্থ বুঝায় ইহা তাহার মধ্যে একখানি। অপর খানির নাম পূর্ব্বমীমাংসা। ইহারা উভয়েই বেদবাক্যের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত; তন্মধ্যে পূর্ব্বমীমাংসা বেদের কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত এবং উত্তরমীমাংসা বেদের অন্তভাগের অর্থাৎ উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ডের ব্যাখ্যায় নিযুক্ত। এখন যদি এই ব্রহ্মসূত্র বা উত্তরমীমাংসার সূত্রার্থ নির্ণয় করিতে হয় তাহা হইলে ইহাদেরই অবলম্বন করিয়া ইহাদের রচনাপদ্ধতি দেখিয়া সে প্রণালী নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই, ব্রহ্মসূত্রের কোন ভাষ্যকার বা সূত্রকার সূত্রার্থ নির্ণয় বিষয়ে কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ না করিলেও পূর্ব্বমীমাংসার ভাষ্যকার শবর স্বামী ইহার জন্য যত্ন করিয়াছেন। তিনি সূত্র-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—

"লোকে যেষু অর্থেষু যানি পদানি প্রসিদ্ধানি কানি সতিসম্ভবে তদর্থান্যেব সূত্রেষু ইত্যবগন্তব্যম্। নাধ্যাহারাদিভি এষাং পরিকল্পনীয়োঽর্থঃ পরিভাষিতব্যো বা। ইতরথা বেদবাক্যানি ব্যাখ্যেয়ানি স্বপদার্থাশ্চ ব্যাখ্যেয়া ইতি প্রযত্নগৌরবং প্রসজ্যেত।"

ইহার অর্থ এই—লোকমধ্যে যে অর্থে যে সকল পদ প্রসিদ্ধ আছে, সূত্রস্থ পদের সেই লোকপ্রসিদ্ধ অর্থই সম্ভব হইলে গ্রহণ করিতে হইবে। অধ্যাহারাদির দ্বারা সূত্রার্থ পরিকল্পনা করা উচিত নহে, কিম্বা পারিভাষিক অর্থ করাও উচিত নহে। অন্যথা বেদব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত সূত্রকারকে বেদব্যাখ্যা এবং স্বপদব্যাখ্যা উভয়ই করিতে হইবে। ফলতঃ, এইরূপে প্রযত্নগৌরবই হইয়া উঠিবে।

এখন ইহার প্রতি যদি দৃষ্টি করা যায় তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, শবর স্বামী সূত্রব্যাখ্যায় ইহা একটী সাধারণ নিয়ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এই নিয়ম ব্রহ্মসূত্রেও প্রযুক্ত হইতে যে কোন বাধা হইতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, উভয়েই বেদব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত।

তাহার পর আর এক কথা। এই উভয় গ্রন্থ যদি মনোযোগ সহকারে পাঠ করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে পূর্ব্বমীমাংসার সহিত ইহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এমন কি, ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, ভগবান্ বেদব্যাস নূতন কিছুই করেন নাই। কেবল পূর্ব্বমীমাংসাতে জৈমিনি মহর্ষি যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন ইহা তাহারই পরিপূর্ত্তি মাত্র, তাহারই অতিদেশ মাত্র। জৈমিনির পূর্ব্ব-মীমাংসার সূত্র দ্বারা যেখানে লোকের কোনরূপ ভ্রান্তি বা সংশয় হইতে পারে প্রায়ই সেই সকল স্থলে ব্যাসদেব সেই জৈমিনি-সূত্রেরই প্রকৃত তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যেমন বেদান্ত দর্শনের "তত্তু সমন্বয়াৎ" এই চতুর্থ সূত্রটীর প্রতি যদি দৃষ্টি করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, পূর্ব্বমীমাংসাতে অর্থবাদাধিকরণের ইহা একটী ব্যাখ্যান মাত্র অর্থাৎ উক্ত অধিকরণে জৈমিনি মুনি যাহা বলিলেন তাহা হইতে যে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে এই চতুর্থ সূত্রটী তাহারই মীমাংসা করিয়া দিতেছে। দেখা যায়, অর্থবাদাধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ সূত্রটী হইতেছে

"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম্।"

অর্থাৎ সমস্ত বেদ ক্রিয়াবোধক, যাহার ক্রিয়া অর্থ নহে তাহা অনর্থক অতএব অপ্রমাণ; এবং সিদ্ধান্ত সূত্রটী হইতেছে—

"বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ"

অর্থাৎ বিধেয় অর্থের স্তুতিরূপ অর্থ প্রতিপাদন দ্বারা বিধিবাক্যের সহিত একবাক্য হইয়া অর্থবাদগুলি প্রমাণ হয়।

এখন ইহাতে লোকের সংশয় সহজেই হইবে যে, জৈমিনির মতে বেদান্তের স্বতন্ত্র প্রামাণ্য নাই, যেহেতু তাহা ক্রিয়াপর নহে। তাহাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে তাহাদিগকে বিধির সহিত একবাক্য করিতে হইবে। আর এইরূপ যদি সিদ্ধান্ত হয় তবে জীবব্রহ্মৈক্য বা মোক্ষ প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ডের কথা ব্যর্থ হইয়া যায়। বস্তুতঃ এইরূপ সংশয় ও সিদ্ধান্ত নিরাকরণ করিবার জন্য এবং সেই অবসরে জৈমিনির প্রকৃত অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাসদেব বলিলেন—"তত্তু

সমন্বয়াৎ” অর্থাৎ নিষ্ফল অর্থবাদাদির জন্য যাহা বলা হইয়াছে তাহা উপনিষদ্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই, কারণ, উপনিষদর্থ স্বয়ং ফলস্বরূপ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্র দ্বারা জৈমিনির অভিপ্রায়ের পরিপূর্ত্তি মাত্র করিয়াছেন। এইরূপ যদি ভাবিয়া দেখা যায় তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, বেদান্তের প্রত্যেক অধিকরণই পূর্ব্বমীমাংসার কোন না কোন অধিকরণের সংশয় প্রভৃতির নিবৃত্তি করিতেছে। আর এই জন্যই পূর্ব্বমীমাংসার অধিকরণ এক সহস্র কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের অধিকরণ কেবল ১৯২টী মাত্র।

তাহার পর জৈমিনির নাম করিয়া, অথবা তাঁহার মতের উল্লেখ করিয়া সূত্রকার বহু স্থলে বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মসূত্রের সহিত পূর্ব্বমীমাংসার যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা বলাই বাহুল্য। আর তাহা যদি হয় তাহা হইলে পূর্ব্বমীমাংসার সূত্রার্থ নির্ণয়ের জন্য যে সকল কৌশল শবরাদিভাষ্যে কথিত হইয়াছে ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যাকালেও যে তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এই যে নিয়মটী কথিত হইল ইহাও অতি সাধারণ নিয়ম। এই নিয়ম দ্বারা ব্রহ্মসূত্রসম্পর্কিত বিবিধ মতের মধ্যে যে কোন একটী মতকে সূত্রকারের অভিপ্রেত বলিয়া স্থির করিতে পারা যাইবে, তাহা বলা যায় না। ইহা অপেক্ষা আরও বিশেষ নিয়ম নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক।

এতদুদ্দেশ্যে যদি চিন্তা করা যায় তাহা হইলে দেখা যায়, প্রথমতঃ 'বহিরঙ্গ পরীক্ষা' নামক একটী বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা উচিত। ইহার অর্থ— নানামতবাদিগণের মধ্যে অধিকাংশ মতবাদী যে ব্যাখ্যা স্বীকার করেন তাহাই সূত্রকারের অভিপ্রেত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ইহার দৃষ্টান্ত যদি দিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, 'ঈক্ষতি' নামক অধিকরণে প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই এই সূত্রে সাংখ্যমতের নিরাস করা হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন। অতএব এই অধিকরণের যাহা সূত্রকারাভিমত অর্থ তাহা সাংখ্যমতের নিরাস। এইরূপ ব্রহ্মসূত্রে বহু উদাহরণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ 'অন্তরঙ্গ' পরীক্ষা'। ইহার অর্থ—পূর্ব্বাপর সূত্রের সহিত একবাক্যতা রক্ষা করিয়া যেরূপ সূত্রান্তরের অর্থ হইবে তাহার নির্দ্ধারণ।

ইহার উদাহরণস্বরূপে বলা যায় যে, যদি প্রথম সূত্রের 'অথ' শব্দের অর্থ 'কর্ম্মাববোধানন্তর্য্য' করা যায় তাহা হইলে দেবতাধিকরণের সহিত বিরোধ হয়। কারণ, দেবতাদিগের কর্ম্মে অধিকার নাই কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে, এইরূপ উক্ত দেবতাধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন যদি অথ শব্দের অর্থ কর্ম্মাববোধের অনন্তর হয় তবে দেবতাদিগের কর্ম্মে অধিকার না থাকায় ব্রহ্মজ্ঞানেও অধিকার থাকে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা অথ শব্দের অর্থ কর্ম্মাব-বোধের অনন্তর করেন তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ে মুক্তি হয়। সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠান মুক্তির জন্য আবশ্যক; আর তাহা হইলে কর্ম্মাববোধও আবশ্যক হইবে। কিন্তু এই মত অঙ্গীকার করিলে দেবতাদিগের ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে অধিকার থাকে না; কারণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা মাত্রেই কর্ম্মাববোধটী কারণ হয়। দেবতাদিগের কর্ম্মে অধিকার না থাকায় তাহাদের কর্ম্মাববোধের কোন উপযোগিতাও থাকিল না। অতএব অথ শব্দের অর্থ কর্ম্মাব-বোধের অনন্তর করিলে দেবতাধিকরণের সহিত বিরোধ ঘটে। সুতরাং এই বিরোধ পরিহার করিয়া যেরূপ অর্থ করা যাইবে তাহাই সূত্রকারের অর্থ বলিতে হইবে।

তাহার পর তৃতীয় কৌশল এই যে, যেরূপ অর্থ করিলে যুক্তির সহিত বিরোধ ঘটে না, ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয় না, সেইরূপ অর্থই সূত্রকারের অভিপ্রেত বলিয়া নির্দ্ধারণ করা উচিত। যেহেতু, বেদান্ত-সূত্রকার যে ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া সূত্ররচনা করিতে পারেন ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না।

চতুর্থ কৌশলটী এই যে, যাহা অপরাপর দর্শনকার সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মসূত্রের মত বলিয়া গ্রহণ করেন তাহাই সূত্রের অর্থ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা উচিত। যেমন সাংখ্য, ন্যায় প্রভৃতি গ্রন্থে যদি

ব্যাসের মত বলিয়া দ্বৈত বা অদ্বৈতের উল্লেখ করা হয় তাহা হইলে দ্বৈত বা অদ্বৈতই ব্যাসের মত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ও তদনুসারে সূত্রার্থ নির্ণয় করা উচিত।

পরিশেষে পঞ্চম উপায়টী এই যে, যে বিষয়ে তাঁহারা প্রকারান্তরে সম্মতি প্রদর্শন করেন, তাহাও ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। যেমন ন্যায়সূত্র মধ্যে দ্বিতীয় সূত্রে ইহার নিদর্শন দেখা যায়।

এই পাঁচটী কৌশল দ্বারা যদি সূত্রার্থ নির্ণয় করিতে পারা যায় তাহা হইলে তাহাই যে সূত্রকারের অভিপ্রেত হইবে তাহাতে বোধ-হয় কোন সংশয় থাকিতে পারে না।

বলা বাহুল্য, কোন ভাষ্য বা কোন টীকা মধ্যে এভাবে সূত্রার্থ নির্ণয় করিবার প্রয়াস করা হয় নাই। সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ানুসারে সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায় পুষ্ট করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক চিরদিন কখনও সমান যায় না, মানবের প্রবৃত্তি কালে বিভিন্ন হইয়া যায়। আর সেইজন্যই বোধ হয় আজকাল মনীষিগণ ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন—সম্প্রদায়নিরপেক্ষ হইয়া ব্রহ্মসূত্রের ব্যাসসম্মত অর্থ নির্দ্ধারণে যত্ন করিতেছেন। এ সম্বন্ধে আমার মনে যাহা উদয় হইয়াছে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই কিছু লিপিবদ্ধ করিলাম।

জীবন্মুক্তির লক্ষণ।

(শ্রীমৎ বিদ্যারণ্য-বিরচিত)

(অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

জীবন্মুক্তি যে আছে এবং হইতে পারে তদ্বিষয়ে শ্রুতিবাক্য ও স্মৃতিবাক্য সমূহই প্রমাণ। সেই সকল বাক্য কঠবল্লী প্রভৃতিতে পঠিত হইয়া থাকে, যথা,—"বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে" (কঠ ৫।১), বিমুক্ত ব্যক্তি পুনঃ বিমুক্ত হইয়া থাকেন—অর্থাৎ সাধক জীবদ্দশায় কাম প্রভৃতি যে সকল দৃষ্ট বন্ধ আছে তাহা হইতে বিশেষরূপে মুক্ত হইয়া দেহনাশ হইলে পর ভাবী বন্ধ হইতে বিশেষরূপে মুক্ত হইয়া থাকেন। আত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে সাধক শমদমাদির অভ্যাস দ্বারা কামাদি হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও যদি কামাদি উৎপন্ন হয় তবে সে অবস্থায় চেষ্টা সহকারে তাহাদের নিরোধ করিতে হয়। কিন্তু এ অবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তি একেবারে না থাকায় কামাদির উৎপত্তি ঘটে না, সেই হেতু সাধক বিশেষভাবে (মুক্ত হয়েন) এইরূপ বলা হইল। আবার প্রলয়কালে দেহনাশ হইলে পর কিছুকাল ভাবী দেহজনিত বন্ধন হইতে (জীব) মুক্ত থাকে বটে, কিন্তু এই অবস্থায় (এই জীবন্মুক্তাবস্থায়) (একেবারে) আত্যন্তিক মোক্ষ লাভ হয় ইহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে 'বিশেষরূপে মুক্ত' বা 'বিমুক্ত' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই (কঠোপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১৫শ মন্ত্র উদ্ধৃতবচনরূপে) পঠিত হইয়া থাকে (তদেষ শ্লোকো ভবতি):—

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ

অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।

ইতি ৪।৪।৭

(তত্ত্বজ্ঞানলাভের পূর্ব্বে) এই জীবের বুদ্ধিতে যে সকল বিষয়-সুখেচ্ছারূপ কাম অবস্থিত থাকে, তাহা যখন (সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টিবশতঃ)

বিনষ্ট হয়, তখন সেই মরণধর্ম্মা জীব (অবিদ্যাকামকর্ম্ম রূপ জন্মমরণ হেতুর অভাব বশতঃ) অমৃত অর্থাৎ পুনঃ-পুনঃ-মরণধর্ম্মমুক্ত হয় এবং সেই শরীরে অবস্থান কালেই ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়।"

অন্য শ্রুতিতেও আছে—"সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোঽকর্ণ ইব সমনা অমনা ইব সপ্রাণোঽপ্রাণ ইব" (১)। "সচক্ষুঃ অচক্ষুর ন্যায়, সকর্ণ অকর্ণের ন্যায়, সমনা অমনার ন্যায়, সপ্রাণ অপ্রাণের ন্যায়" এবং অন্য-স্থলেও এই মর্ম্মের বাক্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। স্মৃতিগ্রন্থ সমূহে (বেদোক্তার্থ প্রকাশক ইতিহাস পুরাণাদিগ্রন্থে) জীবন্মুক্ত ব্যক্তি—জীবন্মুক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ, ভগবদ্ভক্ত, গুণাতীত, ব্রাহ্মণ, অতিবর্ণাশ্রম প্রভৃতি নামে বর্ণিত হইয়াছেন। (বাসিষ্ঠরামায়ণে) বসিষ্ঠ-রাম-সংবাদে—"নৃণাং (২) জ্ঞানৈকনিষ্ঠানাম্" এই স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া "যৎকিঞ্চি-দবশিষ্যতে" এই পর্য্যন্ত শ্লোক সমূহে জীবন্মুক্তের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

বসিষ্ঠ বলিতেছেন—(উৎপত্তি-প্রকরণ নবম অধ্যায়)

নৃণাং জ্ঞানৈকনিষ্ঠানামাত্মজ্ঞানবিচারিণাম্।
সা জীবন্মুক্ততোদেতি বিদেহোন্মুক্ততেব যা (৩)॥

যাঁহারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানের সাধন শ্রবণমননাদিতে নিরত হন এবং আত্মজ্ঞান লাভের জন্য বিচার করেন, তাঁহাদের সেই জীবন্মুক্তের অবস্থা লাভ হয়। শরীর ধারণ হইতে বিযুক্ত হইলে যে অবস্থা হয়, উক্ত জীবন্মুক্তের অবস্থা তাহা হইতে ভিন্ন নহে।

"জ্ঞানৈকনিষ্ঠ"—যাঁহারা লৌকিক ও বৈদিক সকল প্রকার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন।

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি, এ দুই অবস্থায় অনুভবের কোন প্রভেদ

(১) এই শ্রুতি বচনটি ১।১।৪ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে (আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ১ম ভাগ, ৮৫পৃ, ১০পংক্তি)। আনন্দগিরির ব্যাখ্যান অনুসারে ইহার অনুবাদ "অচক্ষু হইয়াও সচক্ষুর ন্যায়, অকর্ণ হইয়াও সকর্ণের ন্যায়, মনঃশূন্য হইয়াও সমনস্কের ন্যায় ইত্যাদি"।

(২) পাঠান্তর—"তেষাং"

(৩) পাঠান্তর—"বিদেহামুক্ততৈব যা"।

নাই, কারণ, উভয় অবস্থাতেই দ্বৈতের অনুভব থাকে না। উভয়ের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ যে, জীবন্মুক্তির অবস্থায় দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থাকে, বিদেহমুক্তির অবস্থায় তাহা থাকে না।

শ্রীরাম বলিলেন—

ব্রহ্মন্বিদেহমুক্তস্য জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্।
ব্রূহি যেন তথৈবাহং যতে শাস্ত্রগয়া দৃশা (১)॥

হে ব্রহ্মন্, আপনি বিদেহমুক্ত ও জীবন্মুক্তের লক্ষণ বলুন, যাহাতে আমি শাস্ত্রানুযায়ী বিচার দ্বারা সেইপ্রকার চেষ্টা করিতে পারি।

বসিষ্ঠ কহিলেন—

যথাস্থিতমিদং যস্য ব্যবহারবতোঽপি চ।
অস্তং গতং স্থিতং ব্যোম স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥

যিনি দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যবহারে রত থাকিলেও যাঁহার নিকট এই দৃশ্যমান্ জগৎ বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কেবলমাত্র আকাশ (চিদাকাশ) অবশিষ্ট আছে, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।

মহাপ্রলয় কালে পরমেশ্বর এই দৃশ্যমান্ জগৎ অর্থাৎ গিরি, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি জগদ্‌দ্রষ্টার দেহেন্দ্রিয়ব্যবহারের সহিত (আপনাতে) উপসংহৃত করিলে, জগতের নিজরূপ বিনষ্ট হওয়াতে, (জগৎ) বিলয় প্রাপ্ত হয়। এ স্থলে কিন্তু সেরূপ হয় না। এস্থলে, দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যবহার থাকে। গিরি নদী প্রভৃতি পরমেশ্বর কর্তৃক আপনাতে উপসংহৃত না হওয়ায় পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থিত থাকে এবং অপর সকল প্রাণী তাহা বিস্পষ্টরূপে দেখিতে পায়। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে, যে বৃত্তির দ্বারা জগতের উপলব্ধি হইবে সেই বৃত্তি সুষুপ্তি কালের মত বিলুপ্ত হওয়ায়, সমস্তই অস্তমিত হয়। কেবল স্বয়ংপ্রকাশ চিদাকাশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। বদ্ধব্যক্তিরও সুষুপ্তিকালে সেই সময়ের জন্য বৃত্তির অভাব হয় বটে, এবং সেই অংশে বদ্ধব্যক্তির জীবন্মুক্তব্যক্তির সহিত সাদৃশ্য আছে সত্য, কিন্তু ভাবী বুদ্ধিবৃত্তির বীজ উপস্থিত থাকাতে বদ্ধ ব্যক্তির সেই অবস্থাকে জীবন্মুক্তি বলা যাইতে পারে না।

---

(১) পাঠান্তর—"শাস্ত্রদৃশাধিয়া"।

নোদেতি নাস্তমায়াতি সুখেদুঃখে মুখপ্রভা।
যথাপ্রাপ্তে স্থিতির্যস্য (১) স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥

সুখের কারণ উপস্থিত হইলে যাঁহার মুখপ্রভা (হর্ষ) উপস্থিত হয় না, অথবা দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে যাঁহার মুখপ্রভার বিলোপ হয় না, যিনি যথাপ্রাপ্তে (অন্নাদিতে) দেহযাত্রানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়।

মুখপ্রভা অর্থাৎ হর্ষ। মাল্য, চন্দন, পূজা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলেও সাধারণ সংসারী জীবের ন্যায় যাঁহার হর্ষের উদয় হয় না।

মুখপ্রভার বিলোপ অর্থাৎ দৈন্য। ধনহানি, ধিক্কার প্রভৃতি দুঃখ প্রাপ্ত হইলেও, যিনি দীন হইয়া যান না। যথাপ্রাপ্তে— বর্ত্তমানকালে কোনও বিশেষপ্রকার প্রযত্ন না করিয়াও প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে সমানীত পূর্ব্বপ্রবাহক্রমে আগত ভিক্ষান্নাদি 'যথাপ্রাপ্ত'শব্দের অর্থ, তদ্দ্বারা যিনি দেহ রক্ষা করিয়া থাকেন। সমাধির দৃঢ়তা বশতঃ তাঁহার মাল্যচন্দনাদির উপলব্ধি হয় না। কোনও সময়ে ব্যুত্থানাবস্থায় মাল্যচন্দনাদির আপাততঃ প্রতীতি হইলেও বিচারের দৃঢ়তাবশতঃ তাঁহার ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য বুদ্ধি উপস্থিত হয় না সুতরাং হর্ষ প্রভৃতির উৎপত্তি না হওয়াই সঙ্গত হয়।

যো জাগর্ত্তি সুষুপ্তিস্থো (২) যস্য জাগ্রন্ন বিদ্যতে।
যস্য নির্ব্বাসনো বোধঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥৭॥

যিনি সুষুপ্তিস্থ হইলেও জাগ্রৎ থাকেন, যাঁহার জাগ্রৎ নাই, এবং যাঁহার জ্ঞান বাসনাশূন্য হইয়াছে তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে। জাগ্রৎ —চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ গোলকে অবস্থান করিতে থাকে, উপরত হয় না এইজন্য তিনি জাগ্রৎ থাকেন। সুষুপ্তিস্থঃ —তাঁহার মন বৃত্তিশূন্য হওয়াতে তিনি সুষুপ্তিস্থ হইয়াছেন। অতএব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি রূপ যে জাগরণ, তাহা না থাকাতে

(১) পাঠান্তর -"যথাপ্রাপ্তস্থিতের্যস্ত"

(২) পাঠান্তর—সুষুপ্তস্থো।

তাঁহার জাগ্রৎ অবস্থা নাই। নির্ব্বাসনো বোধঃ—তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেও (ব্রহ্মবিদের) যে আপনাকে 'ব্রহ্মবিদ্' বলিয়া অভিমান জন্মে, সেই অভিমান প্রভৃতি এবং ভোগ্যবস্তুর (দর্শনাদি) জনিত যে কামাদি তাহা বুদ্ধির দোষ। তাহারই নাম বাসনা। চিত্তের বৃত্তি না থাকাতে সেই সকল দোষের অভাব হেতু তাঁহাকে 'নির্ব্বাসন' বা বাসনাশূন্য বলা যায়।

রাগদ্বেষভয়াদীনামনুরূপং চরন্নপি।
যোঽন্তর্ব্যোমবদত্যচ্ছঃ (১) স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥৮॥

আসক্তি, বিদ্বেষ, ভয় প্রভৃতির অনুরূপ আচরণ করিলেও যিনি অভ্যন্তরে আকাশের ন্যায় অতি নির্ম্মল, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে। আসক্তির অনুরূপ আচরণ—যেমন ভোজনাদিতে প্রবৃত্তি। বিদ্বেষের অনুরূপ আচরণ—যেমন বৌদ্ধ, কাপালিক প্রভৃতির প্রতি বিমুখতা। ভয়ানুরূপ আচরণ—যেমন সর্প, ব্যাঘ্র হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া। "প্রভৃতি" শব্দের দ্বারা মাৎসর্য্য (পরোৎকর্ষাসহিষ্ণুতা) প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। মাৎসর্য্যের অনুরূপ আচরণ—যেমন অন্য যোগীদিগের অপেক্ষা অধিকতর সমাধি প্রভৃতির অনুষ্ঠান। পূর্ব্বেকার অভ্যাস বশতঃ ব্যুত্থানকালে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির এইরূপ আচরণ সংঘটিত হইলেও তাঁহার বিশ্রান্ত চিত্ত কলুষতাশূন্য হওয়ায় তাঁহার অভ্যন্তরে (চিত্তে) স্বচ্ছভাব থাকে। যেমন আকাশ ধূম ধূলি মেঘ প্রভৃতি যুক্ত হইলেও নির্লেপস্বভাব বলিয়া তাহাতে অতিশয় স্বচ্ছতাই থাকে সেইরূপ।

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
কুর্ব্বতোঽকুর্ব্বতো বাপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥৯॥

যে ব্রহ্মবিদের স্বভাব বা আত্মা অহঙ্কারের দ্বারা তাদাত্ম্যাধ্যাস বশতঃ অন্তরে আচ্ছাদিত নহে (এবং) যাঁহার বুদ্ধিলেপ নাই, তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করুন বা নাই করুন, তথাপি তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।

(১) পাঠান্তর—"ব্যোমবদচ্ছঃ"।

এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ বিদ্বৎসন্ন্যাসপ্রস্তাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (২) সংসারে দেখা যায় যখন কোনও বদ্ধ অর্থাৎ অমুক্তপুরুষ কোন শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তখন "আমিই কর্ত্তা" এইভাবে তাঁহার চিদাত্মা অহঙ্কার যুক্ত হয়। "স্বর্গে যাইব" এইরূপ হর্ষ দ্বারা তাঁহার বুদ্ধিলেপ ঘটে। যিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, তিনি 'আমি কর্ম্মত্যাগ করিয়াছি" এই ভাবিয়া অহঙ্কৃত হয়েন এবং "আমার স্বর্গলাভ হইল না" এইরূপ বিষাদ প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার বুদ্ধিলেপ ঘটে। নিষিদ্ধ কর্ম্ম এবং লৌকিক কর্ম্ম সম্বন্ধেও (এই যুক্তি) যথাসম্ভব খাটাইতে হইবে। কিন্তু জীবন্মুক্ত ব্যক্তির আত্মাতে কর্তৃত্বাধ্যাস না হওয়াতে এবং হর্ষপ্রভৃতি না হওয়ায় উক্ত দোষদ্বয় নাই।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়ান্মুক্তঃ (১) স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ১১॥

যিনি কোনও লোককে উদ্বিগ্ন করেন না, কিম্বা কোনও লোকের দ্বারাও উদ্বিগ্ন হয়েন না, যিনি হর্ষ, কোপ ও ভয় রহিত তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।

ইনি কাহাকেও অবমাননা বা তাড়না করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না বলিয়া কেহই তাঁহার দ্বারা উদ্বিগ্ন হয় না। এইহেতু কোনও লোকে ইঁহাকে অবমাননাদি করিতে প্রবৃত্ত হয় না বলিয়া এবং কোনও দুষ্টলোক তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেও ইঁহার চিত্তে সেইরূপ কোন অবমাননাদির বিকল্প উত্থিত হয় না বলিয়া, তিনিও লোকের দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না।

শান্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ।
যঃ সচিত্তোঽপি নিশ্চিত্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ১২।

যাঁহার সংসারকলনা শান্ত হইয়াছে, যিনি কলাবান্ হইলেও নিষ্কল, যিনি চিত্তযুক্ত হইয়াও চিত্তশূন্য তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলা যায়।

(২) সেস্থলে কিন্তু 'বুদ্ধিলেপ' শব্দে 'সংশয়' বুঝান হইয়াছে।

(১) পাঠান্তর—হর্ষামর্ষভয়োন্মুক্তঃ।

শত্রুমিত্র, মান অবমান প্রভৃতি মিথ্যা কল্পনার নাম সংসারকলনা, তাহা যাঁহার নিবৃত্ত হইয়াছে (তিনি শান্তসংসারকলন)। কলা শব্দে চৌষট্টি প্রকার বিদ্যাকে বুঝায়। তাহা থাকিলেও তাঁহার কলাজনিত গর্ব্ব বা কলার ব্যবহার নাই বলিয়া তাঁহাকে নিষ্কল বলা হইয়াছে। চিত্ত শব্দে যে বস্তুটীকে বুঝায় তাহা তাঁহার থাকিলেও তাহাতে বৃত্তির উদয় হয় না বলিয়া তাঁহাকে চিত্তশূন্য বলা হইয়াছে।

'সচিন্ত' 'নিশ্চিন্ত' এইরূপ পাঠ করিলে এইরূপ অর্থ করিতে হইবে—সংস্কার বশতঃ তাঁহার চিন্তা বা আত্মধ্যানবৃত্তি থাকিলেও লৌকিক বৃত্তি না থাকাতে তাঁহাকে নিশ্চিন্ত বলা হইয়াছে। (১)

যঃ সমস্তার্থজাতেষু ব্যবহার্য্যপি শীতলঃ।
পরার্থেষ্বিব পূর্ণাত্মা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥

যিনি সকল প্রকার ব্যবহারে ব্যবহারী অর্থাৎ লিপ্ত হইয়াও তাহাদিগকে অপরের কার্য্য মনে করিয়া হর্ষবিষাদ দ্বারা অসন্তপ্ত ও পূর্ণাত্মা (২) হইয়া থাকেন তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে।

অপরের গৃহে বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে কেহ স্বয়ং গমন করিয়া এবং তাহাদের প্রীতির জন্য তাহাদের কার্য্যে ব্যবহার রত হইয়াও যেমন (তাহাদের) লাভে হর্ষ এবং অলাভে বিষাদ রূপ বুদ্ধির সন্তাপ প্রাপ্ত হন না, সেইরূপ সেই মুক্ত পুরুষ নিজের কার্য্যেও শীতল বা

(১) বাসিষ্ঠ রামায়ণের টীকাকার "সচিন্ত" শব্দে সচেতন, "নিশ্চিন্ত" শব্দে নির্শ্চিন্ত, "সংসারকলনা" শব্দে সংসারে সত্যত্বাবুদ্ধি, "কলাবান্" শব্দে অপরের দৃষ্টিতে দেহাবয়ববিশিষ্ট, এবং "নিষ্কল" শব্দে নিরবয়ব—বুঝিয়াছেন। মুনিবর্য্য বিদ্যারণ্যের ব্যাখ্যা তদপেক্ষা অনেক ভাল এবং জীবন্মুক্তির অনুভবের পরিচায়ক।

(২) রামায়ণের টীকাকার—'পূর্ণাত্মা' কথাটী এইরূপে বুঝাইয়াছেন—তাঁহার নিজের আত্মা তাঁহার নিকট হেয় বা উপাদেয় হইতে পারে না এবং সেই আত্মায় যাহা কিছু অধ্যস্ত হয় তাহা মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হওয়াতে, তাহাতে রাগদ্বেষের সম্ভাবনা নাই। সেইহেতু কোনও পদার্থ জ্ঞানহীনের নিকট রাগদ্বেষের হেতু হইলেও তাঁহার নিকট তাহা রাগদ্বেষের হেতু হইতে পারে না, কেননা, তিনি তাহাদেরও আত্মস্বরূপ অর্থাৎ পূর্ণ এবং তাহারা তাঁহার আত্মায় অধ্যস্ত মাত্র।

হর্ষবিষাদে অনুতপ্ত থাকেন। (হর্ষবিষাদরূপ বুদ্ধি) সন্তাপ না থাকাই তাঁহার শীতলতার একমাত্র কারণ নহে। কিন্তু নিজের পরিপূর্ণ রূপের অনুসন্ধানও তাঁহার (রূপের কারণ)।

ইতি জীবন্মুক্তি লক্ষণ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার—শ্রীদিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও সিরাজগঞ্জ "আয়ুর্ব্বেদ শান্তিকুটীর" হইতে প্রকাশিত। ১৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৷০ আনা। পুস্তকখানি আমরা আনন্দের সহিত পাঠ করিলাম। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অতি সাধু। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া শূদ্র-নামধেয় দেশের কোটী কোটী দরিদ্র জাতির উপর অত্যাচার করিয়া আসিয়াছি—ইহাই আমাদের জাতীয় অধঃপতনের অন্যতম কারণ। বর্ত্তমান গ্রন্থকার স্বামিজীর এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের ও সমাজের কল্যাণসাধনের জন্য আলোচ্য গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। শূদ্রজাতির উপর কিরূপ অত্যাচার করা হইয়াছে—কিরূপে তাহাদিগকে বেদনামাধেয় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানরাশি হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে—কিরূপে তাহাদিগকে অস্পৃশ্য অনাচরণীয় দাসমাত্রে পরিণত করা হইয়াছে, তাহা মহাভারত, মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে বহুতর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। যাহাতে দেশের মধ্যে জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে বেদ বেদান্তের প্রচার হয়, যাহাতে দেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতা সমস্ত কুসংস্কার ও অত্যাচারের বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিয়া আপনাদিগকে জ্যোতির তনয়—শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব আত্মা মনে করিয়া বীর্য্যবান্, জ্ঞানবান্ ও যথার্থ মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে তজ্জন্য গ্রন্থকার তাহাদিগকে ওজস্বিনী ভাষায় উদ্বুদ্ধ করিবার

চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষার্দ্ধে যথার্থ হিন্দুধর্ম্ম কি, উহা কত উদার এবং সহানুভূতিসম্পন্ন তাহাই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আশাকরি গ্রন্থখানি সাধারণের বিশেষ আদরণীয় হইবে।

কর্ম্মক্ষেত্র—শ্রীদীনবন্ধু দাস কর্ত্তৃক প্রণীত ও হিতবাদী পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, ১১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়—চরিত্র গঠন, বিলাসিতা ও তাহার প্রভাব, অনধিকার চর্চ্চা ও অহেতুকী হিংসা, গৃহস্থাশ্রম ও বিধবার ধর্ম্ম, পূজা-পদ্ধতিতে গুরুতর ভ্রম, আমাদের শক্তি ও কাজ, নীতিকথা এবং শান্তিকথা। পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে একস্থানে তিনি বলিতেছেন -

"জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তই আত্মপূজায় কাটান উচিত, নচেৎ এই অকালমৃত্যুর যুগে এইকর্ম্মভূমিতে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার আশা নাই। জীবনের শেষভাগে, যখন স্বভাবতঃ মানবের ধীশক্তি হ্রাস হইয়া যায়, তখন কি আর ধর্ম্মকর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারা যায়? * * * কি ব্যাধি, কি মৃত্যু কেহই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রতীক্ষা করে না; অতএব ভবিষ্যৎকালের অপেক্ষা না করিয়া শ্রেয়স্কর অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।" কি সুন্দর সত্য কথা।

গ্রন্থখানি এইরূপ নীতিগর্ভ উপদেশে পরিপূর্ণ। পড়িয়া মনে হয়, লেখক বেশ ভক্তিমান অথচ উদার। পাঠকবর্গ এই পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

দেবীপূজায় জীববলি—শ্রীঅহীন্দ্র নারায়ণ কবিরত্ন সংকলিত। "গৌরগদাধর সমিতি" হইতে শ্রীদিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অহিংসাই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ইহা সকল শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণই একবাক্যে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। তবে কি শাস্ত্রে জীববলির ব্যবস্থা নাই? আছে বটে কিন্তু সেই বলি কাহার উদ্দেশে দেওয়া হয়, কি ভাবে দেওয়া হয়, কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির

জন্য দেওয়া হয়, সে সমস্ত কথা হয়ত অনেকেই জানেন না। গতানুগতিক ভাবে বংশপরম্পরাক্রমে বলিদান চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বপুরুষ সকাম ভাবে উপাসনা করিতেন—বর্ত্তমান পূজক হয়ত নিষ্কাম এবং বলিদানে বিশেষ অনিচ্ছুক; তথাপি পিতৃপিতামহের বহুদিনের বলিদানপ্রথা অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বজায় রাখিয়া দিয়াছেন। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তাঁহারা যদি উক্ত বিষয়ক শাস্ত্র পাঠ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের এই অন্ধবিশ্বাস সহজেই দূরীভূত হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি ঐ উদ্দেশ্যেই লিখিত। আশাকরি, দেবীভক্তগণ এই পুস্তক পাঠে দেবীপূজায় বলিদানের স্থান কোথায় ও তাহার উদ্দেশ্য কি তাহা কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

গার্হস্থ্য নীতি (প্রথমভাগ)—নওগাঁ প্যারীমোহন বালিকা-বিদ্যালয় কমিটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম। ২০৪ পৃষ্ঠা। মূল্যের উল্লেখ নাই। পুস্তকখানি উক্ত বালিকাবিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক কর্ত্তৃক লিখিত এবং ইহার সমুদয় সত্ব উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য উৎসর্গীকৃত। ছোট মেয়েদের কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া সন্তান-পালন গৃহিণীপনা পর্য্যন্ত বালিকাগণের শিক্ষার উপযোগী সকল বিষয়ই বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

মেয়েদের ইতিহাস—(ভারতবর্ষ)—উক্ত কমিটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত আর একখানি পুস্তিকা। ৪৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵০ আনা। ইহাতে অতি সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় বালিকাদিগকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বুঝান হইয়াছে।

নবস্তুতিমালা—এই পুস্তকখানিও উক্ত কমিটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। উপনিষদ্, গীতা, ভাগবদ্, পুরাণ, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংকলিত অনেকগুলি সংস্কৃত স্তোত্র ও পদ্যে তাহাদের ভাবানুবাদ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৬৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৵০ আনা।

সংবাদ ও মন্তব্য।

অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও শ্রীরামকৃষ্ণমিশন গঙ্গাসাগর মেলায় সেবাকার্য্যের জন্য একদল সেবক প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, এবার অসুখ বিসুখ তেমন বেশী হয় নাই। গতবারে মেলায় কলেরা মহামারীতে শত শত যাত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় এবার ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড ও গভর্ণমেণ্ট বিশেষ সতর্ক হইয়াছিলেন এবং অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা যাত্রিগণের যাতায়াতের ও মেলায় পানীয় জলের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু এবারও কোন কোন বিষয়ে বিশেষ ত্রুটী আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে। এ বিষয়ে যাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় আমরা যথাসময়ে তাহার চেষ্টা করিব।

ঝটিকা প্রপীড়িত স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্য।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্য বিবরণীতে আমরা পাঠকবর্গকে বন্যাপীড়িত স্থানসমূহের অবস্থার কথা জানাইয়া আসিয়াছি। এতদিন দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চাউল না থাকায় এবং সেইহেতু চাউলের দর খুব বেশী থাকায় সেবাকার্য্য চালাইবার বিশেষ দরকার ছিল। বর্ত্তমানে আমন ধান কাটা আরম্ভ হওয়ার জন্য সাধারণের অবস্থার অনেকটা উন্নতি হওয়ায় আমরা আস্তে আস্তে আমাদের সকল কেন্দ্রগুলিই বন্ধ করিলাম। কেবল মাত্র ঢাকা জিলার আরিয়েল বিলের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের শস্য বিশেষ নষ্ট হওয়ায় ঐ অঞ্চলের সাহায্যার্থে শ্যামসিদ্ধি ও রাড়িখাল গ্রামস্থ কেন্দ্র দুইটী আরও একমাস খোলা থাকিবে। ঐ সকল গ্রামে গৃহনির্ম্মাণ কল্পে

আমরা ২০০৲ টাকা প্রেরণ করিয়াছি এবং শীঘ্রই আরও কিছু প্রেরণ করিব। গৃহনির্ম্মাণ কল্পে বরিশাল জিলার অন্তঃপাতী বাগধা কেন্দ্রেও ৫০০৲ টাকা পাঠান হইয়াছে। উহার বিবরণী এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

বস্ত্রাভাব নিবারণ কল্পে আমরা কলমা কেন্দ্রে ৪৩২, আড়িয়ালে ২২১, কামারখাড়ায় ৩৯৩, বজ্রযোগিনী বা বিক্রমপুরে ২৫৭, সোনারঙ্গে ২৬২, লতাবদীতে ১৯৩, সোনারগাঁয় ৩১০, শ্যাম-সিদ্ধিতে ১৫১, রাড়িখালে ১৫১, কুমারপুরে ২০৪, কাগদিতে ১২০, কোটালিপাড়ায় ৫০, ভারুকাঠিতে ১৭০, এবং মোল্লাহাট বা উদয়পুরে ৫২ খানি নূতন বস্ত্র বিতরণ করিয়াছি। ইহা ছাড়া অনেক পুরাতন বস্ত্রও বিতরিত হইয়াছে। কুমারপুর কেন্দ্র হইতে ৯৫, কাগদি হইতে ৩৪, কোটালিপাড়া হইতে ৬০, ভারুকাঠি হইতে ৪৫ এবং উদয়পুর কেন্দ্র হইতে ৩৩ খানি গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ঢাকা এবং বরিশালের অপর কেন্দ্র হইতে গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যের বিবরণ এখনও প্রাপ্ত হই নাই। এতদ্ব্যতীত উদয়পুর কেন্দ্র হইতে ১৫, ভারুকাঠি হইতে ১৪৭, এবং কাগদি কেন্দ্র হইতে ২২৭ জন নূতন রোগীকে ঔষধাদি বিতরণ করা হইয়াছে—অপরাপর কেন্দ্রের রোগীর সংখ্যা এখনও পাওয়া যায় নাই।

ঝটিকা প্রপীড়িত স্থানে ১০ই অক্টোবর হইতে ২২শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৪১১খানি গ্রামে ৮৭৭৫জন দুঃস্থকে ২৭৪৪/২॥ মণ চাউল, ২৮৪৫ খানি বস্ত্র, ২৬৭ খানি গৃহ, এবং ৩৮৯জন রোগীকে ঔষধ দান করা হইয়াছে। এখনও সকল কেন্দ্র হইতে সম্পূর্ণ বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

নিম্নে আমাদের বিভিন্ন কেন্দ্র সমূহ হইতে সাপ্তাহিক চাউল বিতরণের শেষ সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল।

জিলা ঢাকা

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
কলমা	৩৫	১০২৫	৫২/৮

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
কলমা	৩৩	১১৩৬	৫৭৸০
	৩০	৭৫	৩৮।০
কামারখাড়া	৪৩	৯৭৪	৪৮॥৮
	৩৮	১৭১০	৮৫॥০
আরিয়াল	২০	৩৩৩	১৭।১
	২১	৩৩৪	১৮/১
	১০	৯৭	৫।৫
বিক্রমপুর	২৮	৬৮৭	৩৭॥৪
	২৮	৪২১	২১॥০
সোনারঙ্গ	৩৭	৮১১	৪২/২
	১৯	৩৬০	১৯/৪
লতাবদী	১৪	৪৫২	২৩।০
	১৪	৪৪৮	২৩/০
সোনারগাঁ	১১০	৭৪০	৩৮॥২
শ্যামসিদ্ধি	২০	৩৯৪	২০॥০
	২১	৩৮৮	২০।৪
	২০	২৬৪	১৩॥৮
	১৮	৩২৭	১৬৸৬
	২০	৩৯৪	২০॥০
রাড়িখাল	৭	৩৩১	১৬৸০
	৭	৪০৩	২০/৬
	৭	৩৮২	২০/০
	৭	২৬৮	১৪/০

জিলা ফরিদপুর

কুয়ারপুর	২২	৬১১	৩১।৪
	২২	৫৩৪	২৭/৬
	২২	৫১৩	২৫৸০

কেন্দ্রের নাম	গ্রামের সংখ্যা	সাহায্য প্রাপ্তের সংখ্যা	চাউলের পরিমাণ
কুয়ারপুর	২২	৫০৫	২৮।৯
কাগদী	১১	৪৬৩	২৪/১
	১২	৪৬৮	২৪/৬
	১২	৪৯৭	২৫॥৯
	১২	৪৮৯	২৫/০
		জিলা বরিশাল	
ভারুকাঠি	২৭	৪৮৩	২৫/২
	২৭	৩৮৫	১৯।৯
	২৪	২১৯	১২৸৮
বাগধা	১০	২৯৯	১৬/২
		জিলা খুলনা	
উদয়পুর	১৬	২৬৭	২৩৸/।
	১৭	২৬৬	২৪।৪
	১৭	২৬৬	২৬।৪

যাঁহারা আমাদের এই ঝটিকাকার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইঁহাদের মধ্যে বেঙ্গল রিলিফ ফণ্ড ৬০০০৲ টাকা, জুটবেলাস এ্যাসোসিয়েসন—২০০০/০ মণ চাউল, ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব—১০০০৲ টাকা, কলিকাতার কতিপয় ভদ্রমহিলা—৫০০৲ টাকা ও ৩০০ শত নূতন বস্ত্র, মেসপোটেমিয়ার বাঙ্গালী সৈনিক ও কর্ম্মচারীবৃন্দ প্রায় ২০০০৲ টাকা, মেসার্স আর গেভিন এণ্ড কোং ৪৫০ শিশি জ্বারমলীন, রাণাঘাট কেমিকেল ওয়ার্কস ১০০ শিশি সর্ব্বজ্বরামৃত, মেসার্স বল্লভ এণ্ড কোং ১০০ শিশি ম্যালোটনিক, এন সি করাল ৪ ডজন রেজিনাস এবং নিউ এরা কেমিক্যাল ওয়ার্কস ১৮ শিশি লাইমোডাইন দান করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। দেশের এই ভীষণ দুর্দ্দিনে মুক্তহস্ত হইয়া ইঁহারা ভগবানের প্রিয়পাত্র ও দেশবাসীর আশীর্ভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

(স্বাঃ) সারদানন্দ।

প্রাপ্তি-স্বীকার

(৪ঠা নভেম্বর হইতে ২৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত)

মাঃ সেক্রেটারী বিবেকানন্দ সোসাইটী,
কলিকাতা, ১৮২৲
দরিদ্র বান্ধব সমিতি, সম্বলপুর, ১০৲
শ্রীভুবন মোহন বসু, শাঁখারী,
মৌলুবী জামিরুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী,
মাহিপুর, ৫৲
শ্রীপ্রমথ ভূষণ রায়, বক্সার, ২৲
,, উপেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, বাখরগঞ্জ, ৮৲
মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রবৃন্দ,
কলিকাতা, ১৮০৲
শ্রীব্যোমকেশ বসু ও বন্ধুগণ, ,, ১৫।০
,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আলিপুর ২৲
,, যোগেন্দ্র নাথ রায়, টিটাগড়, ২৫৲
,, যোগেন্দ্র নাথ প্রামাণিক, জগতী, ২৲
,, বিজয় গোপাল বক্সী, সরিষাবাড়ী, ২৲
,, তারক নাথ বসু, কৃষ্ণপুর, ১৲
,, শরৎ চন্দ্র মিত্র, কলিকাতা, ৫৲
,, তুফান, ,, ৫৲
,, যামিনী রঞ্জন দাস, শাকপুর, ৸৵০
মর্টন ইনিষ্টিটিয়ুটের তৃতীয় শ্রেণী "বি,"
কলিকাতা, ৮৲
জনৈক দরিদ্র ভদ্রলোক, বৈচামী, ।০
শ্রীরাধাকৃষ্ণ কর, কলিকাতা, ১৪।/০
,, নগেন্দ্রনাথ রায়, রাঁচি, ২৫৲
শ্রীমতী নলিনীবালা দাসী, ইরকুল্লা, ৭৲
শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ, ভাটপাড়া,
,, রামকৃষ্ণ তিরুমালা জায়াদার,
চামরাজেন্দ্রপেট, ২৲

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন, আরারিয়া, ৫৲
,, ভগবান দাস, নারায়ণগঞ্জ, ১৫৲
,, জাহাঙ্গীর, বি, প্যাটেল, বম্বে, ২৫৲
৺প্রসন্ন কুমার মিত্র ও ৺সারদা
চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের স্মৃত্যর্থ
মাঃ ডাক্তার এস, সি, মিত্র, আরা, ২৩৲
বন্ধুগণ, ইরিফালা, ১০৲
জমাদার শ্রীগোলাব সিং, বাগদাদ, ৫৲
শ্রীহীরালাল বসু, পুরাণকোট, ২৲
,, রথীশ চন্দ্র মুখার্জ্জি, কলিকাতা, ১৲
,, কুঞ্জবিহারী দাসগুপ্ত, তাম্বোবীন, ৩৲
জনৈক বন্ধু, আসানশোল, ।০
পূজাফণ্ডের শেষাংশ মাঃ
শ্রীধীরেন্দ্রকুমার বসু, লেডো, ১০০৲
শ্রীযুক্ত এস, সি, মিত্র, কলিকাতা, ১০৲
শ্রীমতী বীণাপানি দাসী, শাঁখারী, ১০৲
শ্রীযোগেশ চন্দ্র ঘোষ, ভবানীপুর, ৫৲
শ্রীমতী শৈব্যা কুমারী ঘোষ, ,, ৫৲
শ্রীযুক্ত এ, গুপ্ত, জামগাঁ, ৪৲
,, জে, এম, বসু, ৩১৯নং, ৪১
বেঙ্গলি ব্যারাক, করাচি, ২৲
,, নবীন চন্দ্র দাস, বোসনগিরী, ১০৲
বঙ্গীয় কায়স্থ সভা মাঃ কুমার
শ্রীমন্মথ নাথ মিত্র, কলিকাতা, ৩২৫৲
(ও ২৫ জোড়া নূতন কাপড়)
শ্রীসতীশ চন্দ্র রায়, বীটঘর, ২৲
,, রমণী মোহন বসু, কলিকাতা, ২৲
,, শুভ্রবীণ দত্ত রায়, পানজীপাস, ১৲

ভাগবত সভা মাঃ শ্রীযুক্ত
আই, পি, বরুয়া, ধুবরী ৩৪॥৵০
শ্রীযুক্ত ভি, ভি, দামলা, ওয়ার্দা, ৭৲
,, নৃত্যলাল মুখার্জ্জি, কলিকাতা, ২৫৲
আলিপুর বারলাইব্রেরীর জনৈক সভ্য, ১০৲
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা, ২১৸৵০
বেঙ্গলী এসোসিয়েসান মাঃ রায় সাহেব
শ্রীযুক্ত এস এন, ঘোষ, পুণা, ১০৲
কোন্নগর সাইক্লোন রিলিফ ফণ্ড, ২৫৲
শ্রীমতী সুরমা দাসী, কলিকাতা, ৬৲
রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়, ডহরকুণ্ড, ২৲
শ্রীরাধারমণ সেন, গোরখপুর, ২৲
,, কামদা প্রসন্ন চৌধুরী, নওগাঁ, ২৲
,, শিবদাস ঠাকুর, জাওলাপুর, ১৩৲
নকুড়চন্দ্র দত্ত, কলিকাতা, ২৲
বীণাপাণি দাতব্য ভাণ্ডার কলিকাতা, ২০৲
জনৈক বন্ধু, ,, ১৲
ভ্রাতৃবৃন্দ, ,, ১৸০
মোহন বাগান হইতে সংগৃহীত ,, ৪৲
ডাঃ জে, এল, বিশ্বাস, এম, ও,
কাওনপ্রা, ২৲
সলপ স্কুলের ছাত্রবৃন্দ, ৭৲
শ্রীযুক্ত এন, সি, ব্যানার্জ্জি, বরানগর ২৲
,, শ্যামাপদ ব্যানার্জ্জি ও সভ্যগণ,
কলিকাতা, ৪৲
শ্রীমতী সরোজিনী দেবী, বালুইভারা ৪৲
শ্রীগণেশ চন্দ্র দত্ত, কলিকাতা, ৫।৵৬
,, উমেশ চন্দ্র দত্ত, পৈটা ১৫৲
,, অতুল কৃষ্ণ দে, কলিকাতা, ৫৲
,, হরিপদ ব্যানার্জ্জি, জারপুর, ৭৲
,, প্রমথ কুমার বসু, কলিকাতা, ২৫৲

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী কলিকাতা ৫৲
ইষ্ট বেঙ্গল ক্লব, ,, ১০০০৲
শ্রীযুক্ত আর, সি, চৌধুরী, ভুতীডাঙ্গা, ১৲
একাউণ্টেণ্ট জেনারেল বেঙ্গল অফিসের
কর্ম্মচারীবৃন্দ, কলিকাতা, ৫০।৵০
বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের ফিনান্স
ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ, ২২৲
বারোয়ারী ফণ্ড, অখিল মিস্ত্রীর লেন, ১০৲
শ্রীঅনীল চন্দ্র গুপ্ত, কলিকাতা, ১০৲
বারপেটার কতিপয় ভদ্রলোক, ৩৸০
শ্রীমতী প্রেমময়ী দাসী, কলিকাতা, ৪৲
এম, এল, পিসি, এইচ, ই স্কুলের
ছাত্রগণ, বাঁটরা, ১৲
শ্রীযুক্ত শিওশঙ্কর প্রসাদ, হামিরপুর, ৩৲
জনৈক বন্ধু, মারিয়ানী, ৬।০
ভ্রাতৃ সমাজ, কলিকাতা, ২।০
শ্রীকানাই লাল রায়, কৌরীয়াজুলী, ২৲
"বুড়ী" ভাগলপুর, ২।০
মাঃ শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায়, দিল্লী, ৫৩৲
শ্রীযুক্ত এস, এন, ব্যানার্জ্জি,
আসানসোল, ১০৲
,, উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বাখরগঞ্জ, ৪৲
,, বিভূতি ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ,, ।০
,, বরদা চরণ দে, ,, ।০
,, ইমান চন্দ্র সাইথিয়া, ,, ।৵০
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী, ইলাসিন, ২৲
শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, বদনগঞ্জ,
,, নগেন্দ্র নাথ সেন, ক্যানিং টাউন, ৪৲
ইয়ংমেন্স ইউনিয়ন, শাখারীটোলা,
কলিকাতা, ৭৮৫৸৵১৫
(ইহার মধ্যে ৮৴০ মণ চাউলের দাম
৬৪॥৴৫) ও ৩৩০ খানি পুরাতন ও
নূতন কাপড়, জামা ইত্যাদি,

মাঃ শ্রীযুক্ত কে, সি, রায়, কেমেণ্ডাইন, বার্ম্মা

স্বর্গীয়া মৃণালিনী দাসী, ডুষ্টি (ত্রিপুরা) ২৲

শ্রীযুক্ত বঙ্কিবিহারী পাল, ৷৹

" ভবানীশঙ্কর মহারাজ, ১৲

" হর কুমার দে, ২৲

" পরশুরাম ৷৹

" জয়চন্দ্র দে, ।৹

" বিপিন চন্দ্র শীল, ।৹

" আর, মজুমদার, ।৹

" শ্রীমন্তরাম সিংহ, ।৹

" অপূর্ণ চরণ, ।৹

মিঃ এ, গ্রেগরী ১৲

শ্রীযুক্ত চৈতন্ত চন্দ্র মিয়া, ১৲

" গুরুদাস দে, ।৹

" ত্রিপুরা চরণ দে, ৷৹

" বি, নাথ, ।

" এ, সি, দে, ৷৹

" নূর আহেমেদ, ৷৹

" ডি, এন, দাস, ৷৹

" রহম আলী টেণ্ডার, ১৲

" গোর মিঞা, ১৲

" নাজির সরকার, ১৲

" আবদুল থালেক, ৷৹

শ্রীযুক্তা বামাসুন্দরী, ৷৹

শ্রীযুক্ত ইসমাইল, ৵৹

" এন, বিশ্বাস, ৷৹

সেখ আবদুল রহমান, ৷৹

আবদুল আজিজ মিস্ত্রী, ।৹

শ্রীযুক্ত গঙ্গারাম, ১৲

" মহম্মদ ইসমাইল, ১৲

" রাজকুমার দে, ১৲

" চন্দ্র কুমার দাস, ৷৹

" দ্বারিকা নাথ চৌধুরী, ৷৹

" নূতন চন্দ্র দে, ১৲

" যোগেশ চন্দ্র দে, ৩৲

" অম্বিকা চরণ দে, ৷৵

" অপর্ণা চরণ দে, ৷৹

" সুরেন্দ্র চন্দ্র দে, ৷৹

" নূতন চন্দ্র মিয়া, ২৲

" মনু মিঞা টেণ্ডার, ১৲

" এম, এন, চাটার্জ্জি, ১৲

" পূর্ণ চন্দ্র বৈদ্য, ৷৹

" বগলা চরণ দে, ৷৹

" আর, রক্ষিত ১৲

" এইচ, ভৌমিক, ৷৹

" জামালদ্দিন সরকার, ২৲

" দুর্গাদাস দাস, ১৲

" সুরেন্দ্র নাথ বসু, ১৲

" বদিয়ার রহমান, ।৹

" নজু মিঞা, ।৹

" বজকিয়াদ্দিন, ।৹

" মুছা মিঞা, ১৲

" আবদুল ছোবান, ।৹

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্তিস্বীকারের তালিকায় ভ্রমবশতঃ "দরিদ্রভাণ্ডার, বোয়ালমারী ১৲" লেখা হইয়াছে, তৎস্থলে "দরিদ্রভাণ্ডার কালুরেজনী ১৲" হইবে।
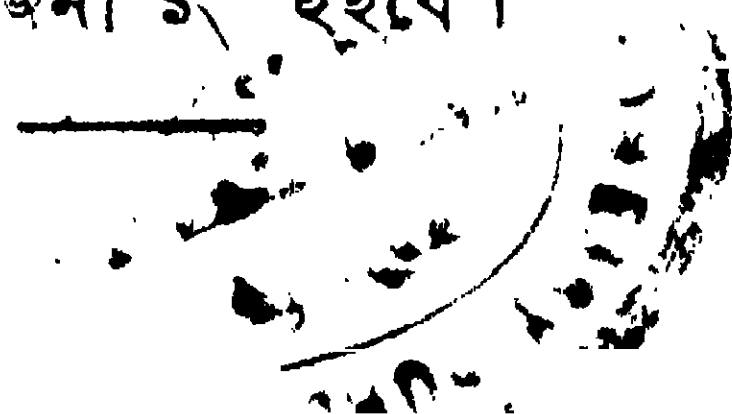
বিশ্বপতি।

(স্তোত্র)

মালকোষ।

(শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ)

(১)

সগুণ, নির্গুণ দেব !
সাকার গো, নিরাকার,
জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মে স্থিতি,
ব্রহ্মাণ্ডেরি একাধার !
জয় জয় নারায়ণ, নারায়ণ, জয় নারায়ণ !

(২)

মোহ, লজ্জা অপসারি
দুর্ব্বলতা চূর্ণ কর !
কোটি কোটি প্রণাম গো,
ভক্তি-পুষ্প পদে ধর !
জয় জয় ইত্যাদি !

(৩)

বিশ্বমাঝে সর্ব্ববস্তু
তোমাতে আশ্রয় করে,
তোমারি পরশ লাভে
অনন্ত শকতি ধরে !
জয় জয় ইত্যাদি !

(৪)

বিশ্বমাঝে আছ বটে
বিশ্বাতীত সদা থাক ;
কল্পনা জ্ঞানের সীমা
স্তব্ধ করি তুমি রাখ !
জয় জয় ইত্যাদি !

(৫)

তুমি প্রভু! ডাকি লহ,
ভৃত্যে বল তব বাণী,
তব কর্ম্মে নিয়োজিত
ভৃত্যেরি পরাণ খানি !
জয় জয় ইত্যাদি !

(৬)

তুমি পিতা! পাল' নিত্য
দীন হীন সন্তানেরে,
আঘাতে বাঁচায়ে লহ
বাহুমাঝে লহ ধ'রে !
জয় জয় ইত্যাদি !

(৭)

তুমি মাতা! কোলে ধর,
স্নেহামৃত কর দান,
অমর হইয়া যাবে
পিপাসিত দুঃস্থ প্রাণ !
জয় জয় ইত্যাদি !

(৮)

তুমি স্বামী! হৃদি-বঁধু
সনে কর আলাপন !
তুমি সখা! হাস্য-তানে

ভরি দাও শুষ্ক মন !
জয় জয় ইত্যাদি !

(৯)

নিয়ত একের মন্ত্রে
তোল গো ওঁকার ধ্বনি !
আলোকিত করি দাও
অন্ধকার হৃদি-খানি !
জয় জয় ইত্যাদি !

(১০)

আলোকে, পুলকে, হাস্যে
আঁধারে, দুঃসহ ক্লেশে
সত্য তুমি, শিবময়,
অদ্বৈত, সুন্দর বেশে !
জয় জয় ইত্যাদি !

(১১)

আনন্দ, আনন্দ তুমি !
হুঙ্কারিয়া তোল সুর,
হৃদি ব্যথা, মর্ম্ম গাথা
লহ টানি মহাশূর !
জয় জয় ইত্যাদি !

(১২)

চিন্ময় করিয়া দাও
সকল হৃদয় নিত্য,
সংসার জ্বালার মাঝে
সমাহিত কর চিত্ত !
জয় জয় ইত্যাদি !

আচার্য্য বিবেকানন্দ ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম।

(জনৈক সন্ন্যাসী)

অবিরাম অপ্রতিহত বেগে কালের খরস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কত উত্থান-পতন, ভাঙ্গা-গড়া ও হাসি-কান্নার মধ্য দিয়া, কত বিপ্লব কত শান্তি, কত গতি, কত স্থিতি সংঘটন করিয়া, কালের বিঘূর্ণিত জটিল প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে। কল্য যেখানে অমরাবতীর অতুল সম্পদ্ বিদ্যমান ছিল, দুরন্ত কাল আজ তথায় শ্মশানের বিভীষিকা প্রকটিত করিয়া তুলিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে যেখানে অসংখ্য হিংস্র-জন্তু-সমাকুল ভীষণ অরণ্যানী বিদ্যমান ছিল, বিচিত্র-শক্তি কালের অপ্রমেয় মহিমায় আজ সেখানে নন্দনের সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বিচিত্র মহাশক্তির অদ্ভুত প্রভাবে কত নূতন নূতন সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছে, কত নূতন জাতি, কত নবীন সম্প্রদায়, অগণন অদ্ভুত প্রতিভাশালী মনীষিগণ উত্থিত হইয়াছেন, আবার তাহারই নির্দ্দয় নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে বিধ্বস্ত, বিপর্য্যস্ত, বিচ্ছিন্ন ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাঁহাদের অমানুষী প্রতিভায় একদিন জগৎ চমৎকৃত হইয়াছিল সেই ব্যাস, বাল্মিকী, হোমার, ভার্জ্জিল আজ কোথায়? যাঁহাদের বীরদর্পে একদিন ধরণী টলমল করিতেছিল সেই ভীষ্ম, অর্জ্জুন, আলেকজান্দার, নেপোলিয়নই বা কোথায়? সবই যায়, যাহা কিছু উৎপত্তিশীল, যাহা কিছু পার্থিব, যাহা কিছু পরিচ্ছিন্ন, শেষ স্মৃতিটুকুর সহিত তৎসমুদয়ই কালের কঠোর পেষণে চূর্ণীকৃত হইয়া যায়—থাকে শুধু শাশ্বত সনাতন অবিনশ্বর সত্য। সত্য যাহা, তাহা কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে, উহা চিরকালই সমভাবে বিরাজিত রহিয়াছে, মানুষ তাহাকে উপলব্ধি করিয়া প্রকটিত করে মাত্র। সেই অবিনশ্বর সত্যের সহিত বিজড়িত থাকে বলিয়া তাহার নাম, তাহার স্মৃতি, তাহার কার্য্যকলাপ দীর্ঘকাল ধরাধামে অবস্থিতি করে।

আজ আমরা যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের অতুলনীয় চরিত্রের যৎ-কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তিনি অষ্টপঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে এমনই একদিনে, কলিকাতার শিমলা নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের পার্থিব দেহ কালবশে আসিয়াছিল, আবার সকল পার্থিব বস্তুর মত কালবশে চলিয়া গিয়াছে। আমাদের শত চেষ্টায়ও তাহা থাকিত না, তাহা থাকিবার নহে। কিন্তু তিনি যে মহাসত্য নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার শিরায় শিরায় প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক রক্তবিন্দুর সহিত মিশ্রিত হইয়া তাঁহাকে সেই সত্যের একটি জীবন্ত বিগ্রহরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল, সেই চিরন্তন অবিনশ্বর সত্য সর্ব্বকালেই সমভাবে বিরাজিত থাকিবে। হয়ত একদিন রক্তমাংসের বিবেকানন্দের স্মৃতিও ধরণীর বক্ষ হইতে মুছিয়া যাইবে, কিন্তু কালের সাধ্য কি সেই সত্যস্বরূপ বিবেকানন্দের কেশাগ্রও স্পর্শ করে! তাঁহার পরমপবিত্র স্মৃতি অটুট রাখিবার জন্য, আজ তাঁহার শুভ জন্মদিনে আমরা সমবেত হইয়াছি। কিন্তু তিনি যে সত্য উপলব্ধি করতঃ নির্ভয় হৃদয়ে জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তৎসাধনে উদাসীন থাকিয়া শুধু মুখের কথায় বা বাহাড়ম্বরের জমকে তাঁহার স্মৃতি জাজ্জ্বল্যমান রাখিতে আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন তাহা সাগরে বালির বাঁধের মত বিফল হইয়া যাইবে, তাহাতে ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত বা জাতিগত কোন বিশেষ কল্যাণই সাধিত হইবে না। সুতরাং আজ এই শুভদিনে তৎপ্রচারিত সত্যসমূহের যথাশক্তি আলোচনা করতঃ তদীয় শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক যাহাতে আমরা নূতন উদ্যম ও নবীন উৎসাহে সকল প্রকার দুর্ব্বলতা দূরে পরিহার করিয়া, তৎসমুদয় জীবনে পরিণত করিয়া তুলিতে পারি সে বিষয়ে সচেষ্ট হইলেই, তাঁহার মহতী স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শিত হইবে।

আচার্য্য বিবেকানন্দ প্রচারিত সত্যসমূহের যথাযথ আলোচনা করিতে হইলে, আমাদের দৃষ্টি তদীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনের উপর স্থির রাখিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন মূলশক্তির কেন্দ্র আর

বিবেকানন্দ যেন তাহারই বিকাশ। বিকাশকে ছাড়িয়া যেমন শক্তিকে বুঝা যায় না সেইরূপ স্বামীজীকে ছাড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝাও অসাধ্য। মোটের উপর, বিবেকানন্দরূপ যন্ত্রকে সহায় করিয়া রামকৃষ্ণরূপ মহাশক্তি যেন জগতের সকল সমস্যার সমাধানের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, স্বামী বিবেকানন্দ তদীয় গুরুদেবের অলোকসামান্য জীবনে যে সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব সুন্দর স্বাভাবিকভাবে মূর্ত্তিমান্ দেখিয়াছিলেন তাহারই আলোকে, জগতের জটিল সমস্যাসমূহের একটা অভূতপূর্ব্ব সমাধানের সন্ধান পাইয়াছিলেন। জগতে শোক, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর বিভীষিকাময় দারুণ চিত্র দেখিয়া ভগবান্ বুদ্ধের জীবদুঃখাসহিষ্ণু উদার হৃদয় যেমন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল তেমনই একটা অব্যক্ত বেদনায়—একটা অভাবনীয় সহানুভূতিতে, তাহার বিশাল হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। অমনি দেখিলেন, তাঁহার গুরুদেবের জীবনরূপ একটি অফুরন্ত পীযুষ-ভাণ্ড অতি গোপনে, অতি নিভৃতে, যেন জগতের সকল দ্বেষ সকল হিংসা দূর করিয়া শান্তি, সাম্য ও মৈত্রীর অমৃতমন্দাকিনী প্রবাহিত করিবার জন্য নীরবে অপেক্ষা করিতেছে। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থে অন্ধ হইয়া, অজ্ঞানতা-প্রসূত ভেদদৃষ্টির বশবর্ত্তী হইয়া জগৎ অশান্তিতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, সবল দুর্ব্বলের রক্ত শোষণ করিয়া লইতেছে, একজাতি অপরজাতির উচ্ছেদসাধনে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, সাদা-আদমি কালকে "D—d Nigger" বলিয়া সম্বোধন করিতেছে, হিন্দু মুসলমানকে, ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে বলিতেছে "তফাৎ যাও," সেই ভেদদৃষ্টির একটা অপূর্ব্ব সমন্বয় তিনি দেখিতে পাইলেন তদীয় গুরুদেবের জীবনে। বস্তুতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যুদার দৃষ্টিতে, হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পণ্ডিত মূর্খ, সাধু পাপীতে কোনও ভেদ ছিল না। তিনি বাস্তবিকই দেখিতে পাইতেন সকলে একই ব্রহ্মময়ীর সন্তান—পাঁচ ছেলের জন্য পাঁচ রকমের বিধান করিয়া তিনি সকলেরই যথার্থ কল্যাণসাধন করিতেছেন। ইহা শুধু স্তোকবাক্য বা আপোষের কথা নহে। বাস্তবিকই তিনি এমন এক অখণ্ড অদ্বয় বস্তুকে উপলব্ধি

করিয়াছিলেন যদ্দ্বারা সমস্ত ভেদদৃষ্টি চিরদিনের জন্য মুছিয়া গিয়া তিনি নিরন্তর সহজ স্বাভাবিকভাবে একটা শান্তির রাজ্যে বিচরণ করিতেন। তিনি সর্ব্বদা 'সাদা চোখে' দেখিতে পাইতেন—"যেমন গ্যাসের আলো একস্থান হতে এসে সহরে নানা স্থানে নানা ভাবে জ্বলছে, তেমনি নানা দেশের নানা জাতের ধার্ম্মিক লোক সেই এক ভগবান্ হতে আস্‌ছে।" ভারতীয় অধ্যাত্মজ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার বেদ উপনিষদ্ প্রভৃতি এবং ভিন্নদেশীয় কোরাণ বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদয় যে সত্যের আভাসমাত্র দিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা এই লোকোত্তর পুরুষের দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনে জাজ্জল্যমান হইয়াছিল। বাস্তবিকই যে সমস্ত সনাতন সত্যরাশি অধুনাতন সভ্যজগতের নিকট কুসংস্কার রূপক অথবা আলঙ্কারিক অতিশয়োক্তি বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছিল, তাহারাই যেন জগতের নিকট নিজেদের সত্যতা প্রমাণের জন্য রামকৃষ্ণরূপে মূর্ত্তিমান্ হইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ভারতীয় উপনিষদ্ বহু পূর্ব্বকাল হইতেই যে সত্য উদাত্তস্বরে ঘোষণা করিয়া আসিতেছিল ঃ—

> অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
> একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥
> বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
> একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

রামকৃষ্ণজীবনে তাহারই চূড়ান্ত সার্থকতা দেখিয়া স্বামীজী চমৎকৃত হইয়া বুঝিলেন "রামকৃষ্ণজীবন উপনিষদ্ মন্ত্রের একটী জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ, এবং এই রামকৃষ্ণরূপ উপনিষদ্ ও উপনিষদ্‌রূপ রামকৃষ্ণই একমাত্র জগতের এই জটিল সমস্যার সমাধানে সমর্থ। জগতে যথার্থ শান্তি, সাম্য ও মৈত্রীর আলোক বিকীরণ করিতে রামকৃষ্ণ-ভানু যথাসময়েই উদিত হইয়াছে।

'শান্তি সাম্য ও মৈত্রী' এই কথা কয়টির একটু সংক্ষেপ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যদিও কথা কয়টি একটু বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য তথাপি, বাহুল্য ভয়ে, আমরা মোটামুটি

সামান্য বিচারমাত্র করিয়াই নিরস্ত হইব। সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বের অভাব যেখানে সেখানেই শান্তি বিরাজিতা। সাদা কথায়, বিবাদ বিসম্বাদ, ঈর্ষা দ্বেষ ও 'আমি বড়, অমুক ছোট' এইরূপ ভাব না থাকাই শান্তি। আর সকল প্রকার আপাতপ্রতীয়মান বিচিত্রতার ভিতর যে একটা একত্বের আবিষ্কার তাহাই সাম্য এবং এই একত্ব আবিষ্কারের ফলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করাই যথার্থ মৈত্রী বলা যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যেখানে সাম্য সেখানেই মৈত্রী এবং যেখানেই সাম্য-মৈত্রী সেখানেই যথার্থ শান্তি। সাম্য ও মৈত্রী যেন জনক জননী আর শান্তি যেন তাহাদেরই স্নেহময়ী দুহিতা। কিন্তু জগতের যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, একটা বিচিত্রতা। বিচিত্রতাই যেন জগতের প্রাণ। ঐ যে কুসুমিত বৃক্ষ স্তবকে স্তবকে পুষ্পভার বহন করিতেছ, তাহার কোন্ ফুলটি অপরটির মত? ঐ যে অসংখ্য বীচিমালা বক্ষে ধারণ করিয়া জলধি গর্জ্জন করিতেছে তাহার একটি তরঙ্গও তো অপরটির অনুরূপ নহে। ঐ যে সহস্রশির সগর্ব্বে উন্নত করিয়া অচল অটল হিমাদ্রি দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহার প্রত্যেক শৃঙ্গই ত অপরটি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এত বিচিত্রতা যেখানে, সেখানে সমত্বের সন্ধান পাওয়া কি সহজ? কিন্তু এই বিচিত্রতার ভিতরেও মানুষ নিজের অবস্থানুরূপ এক একটা একত্বের আবিষ্কার করিয়া লয়, নতুবা সে টিকিতেই পারে না। ভ্রাতা ভ্রাতার সঙ্গে স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হয়, কারণ তাহারা দেখিতে পায়, আকৃতি ও প্রকৃতিগত অশেষ পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের ভিতর একই পিতামাতার শোণিত বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপ এক একটা একত্বকে অবলম্বন করিয়াই পরিবার, সমাজ, জাতি প্রভৃতি গঠিত হইয়া থাকে। জগতের সকল প্রকার বিভিন্ন জাতির ভিতরে একটা শান্তির প্রতিষ্ঠা করিতে হইলেও, সন্ধান করিতে হইবে একটা একত্বের সূত্র, আর তাহাকে অবলম্বন করিয়া স্থাপন করিতে হইবে একটা প্রেমের সম্পর্ক। সুসভ্য শ্বেতাঙ্গ ও কদর্য্য 'নীগারের' ভিতরেও খোঁজ করিতে হইবে

একটা একত্বের ও প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, একটা স্বাভাবিক সৌহার্দ্দ্যের।

আত্মার অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিয়া ভারতীয় বেদান্তশাস্ত্র সেই একত্বের সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। আর সেই একত্ব যথার্থ অনুভব করিলে মানবজীবনে কিরূপ সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয় জগৎকে তাহা দেখাইয়া দিয়া গেলেন দক্ষিণেশ্বরের দীন পূজারী ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণ!

ভাল কথা, আকৃতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন হইলেও সকলেই ত আমরা মানুষ, এই মনুষ্যত্বের উপরই ত একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তবে আর এত কঠিন কথা—আত্মার একত্ব—স্বীকার করিবার প্রয়োজন? প্রয়োজন আর কিছুই নহে, তবে যখন একত্বের সন্ধান আমাদিগকে করিতেই হইবে, তখন সে একত্ব যত অধিক ব্যাপক হইবে শান্তির সৌধও ততই সুদৃঢ়ভাবে গঠিত হইবে। পক্ষান্তরে একটু প্রণিধান করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মানুষে মানুষে যে একত্ব, স্থূল ভৌতিক জগতে অথবা সূক্ষ্মতর মনোজগতে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না কারণ, সূক্ষ্ম মনোজগৎ অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ স্থূল ভৌতিক জগতেরই রূপান্তরমাত্র সুতরাং তাহাতেও অনন্ত বৈচিত্র্য বিদ্যমান। আমরা সাধারণতঃ একত্ব স্থাপন করিতে যাই, গুণগত সামঞ্জস্য দ্বারা, কিন্তু এই গুণগুলিও দেশ, কাল, পাত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ ও সতত পরিবর্ত্তনশীল। কাজেই তদ্দ্বারা নিষ্পন্ন একত্ব কখনই চূড়ান্ত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে বেদান্তের একত্ব যাহাতে প্রতিষ্ঠিত সেই আত্মতত্ত্ব শাশ্বত, সনাতন, অপরিবর্ত্তনশীল ও ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে সমভাবে অনুস্যূত। মানুষ অপর যে সমুদয় একত্ব আবিষ্কার করিয়া জাতি, সমাজ বা পরিবারভুক্ত হয় তাহা আপেক্ষিক একত্বমাত্র, বস্তুতঃ, তাহা এই বিরাট একত্বেরই একটা অস্পষ্ট ছায়া। ভারতীয় ঋষিগণ বহু পূর্ব্বকাল হইতেই এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত ছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।
ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি ॥"
অয়ি মৈত্রেয়ি, পতির প্রীতির নিমিত্ত পতি কখনই ভার্য্যার প্রিয় হয় না পরন্তু আত্মপ্রীতির নিমিত্তই প্রিয় হয়। পত্নীর প্রীতির নিমিত্ত পত্নী কখনই স্বামীর প্রিয়া হয় না কিন্তু স্বামীর আত্মপ্রীতির নিমিত্তই পত্নী প্রিয়া হয়। * * * অধিক কি, অপর কাহারও প্রীতির জন্য অপর কেহ কখনই অপরের প্রিয় হয় না, পরন্তু আত্মপ্রীতির নিমিত্তই সকলে সকলের প্রিয় হয়।

সুতরাং প্রেমের মূল ভিত্তিই হইতেছে, আত্মার এই একত্ব। সর্ব্বভূতে একই আত্মা বিরাজিত আছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই যথার্থ বিশ্বপ্রেম জাগে, এবং কেবলমাত্র এই প্রেমই হিংসা-দ্বেষ, বিবাদ-বিসম্বাদ দূর করিয়া শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম। গীতামুখে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন ঃ—

"সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥"

বেদান্তোক্ত এই সমদৃষ্টিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শান্তিময় পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার একমাত্র উপায়।

এখানে পুনরায় আর এক আশঙ্কা এই দাঁড়াইতেছে যে, জগৎজোড়া শান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যে একটা একত্বের সন্ধান করিতে হইবে, একথা না হয় স্বীকার করিয়া লওয়া হইল, কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্র যে এই একত্ব বা অদ্বৈততত্ত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা ত অবিসম্বাদিত সত্য নহে। এই বেদান্তের উপর পরস্পর বিরোধী নানাপ্রকার মতবাদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। অদ্বৈতবাদী যেমন বলিতেছেন—"উপাধিভেদে নানাপ্রকারে অবভাসিত হইলেও আত্মা যে

স্বরূপতঃ এক ইহা প্রতিপন্ন করাই সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রের উদ্দেশ্য," সেইরূপ দ্বৈতবাদী বলিতেছেন "জীব ও ঈশ্বর কখনই এক হইতে পারে না, সুতরাং আত্মার একত্ব প্রতিপন্ন করা বেদান্তের উদ্দেশ্য নহে"। আবার 'শ্যাম ও কুল' উভয়ই বজায় রাখিয়া মধ্যপন্থী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলিতেছেন "জীব-জগৎও সত্য ঈশ্বরও সত্য—ঈশ্বর পূর্ণ, জীব অংশ, ইহাই বেদান্তপ্রতিপাদিত অর্থ।" এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতবাদিগণ স্বমতানুযায়ী বেদার্থ করিয়া অপরের মতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করিতে দুস্তর বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়াছেন। এমতাবস্থায় কেবলমাত্র অদ্বৈতবাদকেই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া অপর সকল বাদের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিলে আর বিবাদ মিটিল কই? এখন এই সকল বিভিন্ন মতবাদের একটা সামঞ্জস্য বিধান করিতে না পারিলে, এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহা বৃথা বাক্যাড়ম্বর মাত্রেই পর্য্যবসিত হইল। এই গুরুতর সমস্যার সমাধান কি?

সমস্যা গুরুতর হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনেই তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মহা উদার জীবনের ও তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত শিক্ষার প্রভাবে স্বামী বিবেকানন্দ এই সকল বিসম্বাদী মতবাদের যে একটা অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান করিলেন, তাঁহার ভারতে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর স্থানে স্থানে সে বিষয় বিস্তৃতভাবে বিবৃত রহিয়াছে। আমরা স্থূলভাবে তাহারই আলোচনা করিয়া বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি না লইয়া যাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে মূল উপনিষদ্‌গুলি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন—জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া অর্থ না করিলে সমগ্র উপনিষদে এই ত্রিবাদমূলক মন্ত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে, অথচ সাধককে ধীরে ধীরে একটা একত্বের দিকে লইয়া যাইবার উদ্যমও তাহাতে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। বৃহদারণ্যকের জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণ নিজ নিজ মতের সমর্থনকারী মন্ত্রগুলিকে অবলম্বন করিয়া, অশেষ 'বাগ্‌বৈখরী' ও 'শব্দঝরীর' সৃজন করতঃ অপরাপর

বাদমূলক মন্ত্রগুলিকে স্বমতানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে তাঁহাদের মতই শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে কোন মতকেই অস্বীকার করা শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে। তবে কি শ্রুতি পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবকে স্বীকার করিয়া নিজেই নিজের মত খণ্ডন করিয়াছেন? সর্ব্বভূতহিতকারী অভ্রান্ত বেদবাক্যে এইরূপ সন্দেহ উত্থাপন করা কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। স্বামীজী ইহা দেখাইয়াছেন যে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই বাদত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধ নহে, অর্থাৎ একটির সত্যতা অপরটির মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করে না—পরন্তু উহারা সাধক জীবনের ক্রমোন্নতির এক একটা ভূমি বা সোপান। সাধক নিজ রুচি ও অবস্থানুযায়ী এই বাদত্রয়ের অন্যতমকে অবলম্বন করিয়া স্বীয় অভীষ্টানুযায়ী পুরুষার্থ লাভ করিতে সক্ষম হইলেও যে, ভাবের চরম আতিশয্যে সকল সাধকের জীবনেই এই একত্বানুভব সময়ে সময়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, জগতের সকল দেশের শ্রেষ্ঠ সাধকদিগের জীবন্ আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। বৃন্দাবনের ব্রজাঙ্গনাগণ এককালে নন্দনন্দনের সঙ্গে একত্বানুভব করিয়া প্রত্যেকেই মনে করিয়াছিলেন "আমিই শ্রীকৃষ্ণ"। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যে অন্তর্দ্দশায় ভগবানের সঙ্গে একত্বানুভব করিতেন, তাঁহার অর্দ্ধবাহ্য দশায় উচ্চারিত "মুই সেই! মুই সেই!" রূপ হুঙ্কারই সে বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মেরীতনয় ঈশা তাঁহার স্বর্গস্থ পিতার সঙ্গে ঐক্যানুভব করিয়া এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "I and my Father are one". সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদী মুসলমানদিগের মধ্যেও কোন কোন সাধক পরমেশ্বরের সহিত একত্বানুভব করিয়া বলিয়াছেন, "আনল হক্" বা আমিই সেই। অধিক কি, অত্যদ্ভুত বিশ্লেষণ শক্তি প্রভাবে পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানও একটা একত্বের অস্পষ্ট আভাস পাইতেছে। সুতরাং আত্মা বস্তুতঃ এক হইলেও সাধক অবস্থা ও রুচিভেদে তাহাকেই নানারূপে উপলব্ধি করিয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি গল্প বলিতেন:—কোনও গাছে একটা বহুরূপী থাকিত। একজন

লোক ঘটনাক্রমে সেই বৃক্ষতলে যাইয়া সেটাকে দেখিয়া আসিয়া বলিল, "আমি অমুক গাছে একটা লাল গিরগিটি দেখিয়া আসিলাম", আর একজন আসিয়া বলিল, "সেটা লাল হইতে যাইবে কেন? আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি সেটা নীল", আর একজন বলিল, "হলদে"; আবার একজন বলিল, "সবুজ"। এইরূপে পরস্পরে মহাগোল বাধিয়া গেল। সেই গাছের নীচেই একজন লোক সর্ব্বদা বাস করিত, সে তখন ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত, সকল ব্যাপার অবগত হইয়া সে হাসিয়া বলিল, "তোমরা সকলেই ঠিক বলিতেছ, আমি সে গাছতলাতেই থাকি, সেটাকে আমি বেশ জানি, সে একটা বহুরূপী, সে কখনও লাল, কখনও নীল, কখনও হলদে, কখনো সবুজ, আবার আরও কত কি রঙ্গ ধরে। বস্তুতঃ, সেটার কোনও রঙ্গ নেই।" তখন তাহাদের গোল মিটিল। সেইরূপ নিজ রুচি ও অবস্থানুসারে পরমেশ্বরকে সে যেরূপ ভাবে অনুভব করে সে সকলই সত্য। তাই বলিয়া 'তিনি এইরূপই অন্য প্রকার হইতে পারেন না' এই বলিয়া অনন্ত ভগবৎস্বরূপের "ইতি" করিতে গিয়াই জগতে যত প্রকার বাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবান্ রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত এই আলোকে বেদান্ত শাস্ত্রকে বুঝিলেই এই বিবদমান বাদ-সমূহের একটা অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য হয়। সেই জন্যই স্বামীজী তদীয় গুরুদেব কর্ত্তৃক প্রকটিত সেই অপূর্ব্ব সমন্বয়বাদে শ্রীগুরুর কৃপা ও নিজ অমানুষী অত্যদ্ভুত প্রতিভা দ্বারা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগৎকে তাহা অনুভব করিয়া ধন্য হইতে আহ্বান করিলেন। জগৎকে এই গুপ্ত পীযূষপ্রস্রবণের সন্ধান বলিয়া দিবার নিমিত্তই স্বামীজীর পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচার!

জগতে শান্তি, সাম্য ও মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা যে বিবেকানন্দই প্রথম করিয়াছেন তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন মনীষিগণ বিভিন্ন সময়ে তৎপ্রতিষ্ঠায় যত্নপর হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত শান্তি-সাম্য-মৈত্রীর যাহা প্রসূতি তাহাকে ধরিবার বুঝিবার সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাবেই বারম্বার সে উদ্যম পণ্ড

হইয়াছে। দশ জন বৈঠক করিয়া, আইন গড়িয়া সাম্যমৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা যে বাতুলের ব্যর্থপ্রয়াস মাত্র, আজ এই পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের দিনে সে কথা কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। যতদিন না হিংসা, দ্বেষ ও সঙ্কীর্ণতার স্থানে বেদান্তবেদিত আত্মজ্ঞানলব্ধ প্রেম ও সমদৃষ্টি আসিয়া আপন অধিকার বিস্তার করিতেছে ততদিন যথার্থ শান্তি-সাম্য-মৈত্রী শুধু কথার কথা মাত্রই থাকিবে।

এখানে একটি আশঙ্কা এই হইতে পারে যে,—জগতে সকল দেশের সকল লোকই যে একই সময়ে এই আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে ইহা কি আকাশকুসুমের মত কল্পনার কুহকমাত্র নহে? কিন্তু আমরা একথা বলিতে চাহি না যে সাম্য-মৈত্রী স্থাপনের জন্য সকল লোককেই একই সময়ে আত্মতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিতেই হইবে। মহামায়ার রাজত্বে যে তাহা কখনই হইবার নহে তাহা আমরা বেশ বুঝি, কিন্তু আমরা চাহি ভাবের পরিবর্ত্তন। ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণই ভাবরাজ্যের অধীশ্বর। তাঁহারা সমাজ, জাতি বা সমগ্র জগৎকে যে ভাব দিয়া যান, সকলকে অবনতমস্তকে তাহা স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং সর্ব্বত্র তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারী আত্মজ্ঞের সংখ্যা যত অধিক হইবে তত শীঘ্র জগতে এই ভাব ছড়াইয়া পড়িবে। অধিক কি, একজন মাত্র যথার্থ আত্মজ্ঞের ভাবতরঙ্গে যে সমগ্র দেশ প্লাবিত হইতে পারে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। যদি রুসো ও ভল্টেয়ারের ভাবের বন্যায় সমগ্র 'ফ্রান্স', এমন কি, ইয়োরোপের অন্যান্য দেশও ভাসিয়া যাইতে পারে, যদি টলষ্টয়ের চিন্তারূপ ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ সমগ্র জগতে বলশেভিকতার বিপুল বহ্নি প্রজ্জ্বালিত করিতে সমর্থ হয়, তবে যে একজন যথার্থ আত্মদর্শীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুভবের ভাবমন্দাকিনী সমগ্র দেশের শিরায় শিরায়, রক্তে রক্তে প্রবাহিত হইয়া তথায় নন্দনের শান্তি-পারিজাত ফুটাইয়া তুলিতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে কথা এই যে, বেদান্তের এই আত্মজ্ঞানকে শুধু মোক্ষলাভের উপযোগী করিয়া গিরিগহ্বরে নিদি-ধ্যাসনের বস্তু করিয়া না রাখিয়া দৈনন্দিন জীবনের ভিতর তাহাকে

ছড়াইয়া দিতে হইবে, দেখাইতে হইবে যে এই বেদান্তের আলোকে সকল কার্য্যই অধিকতর সুন্দররূপে সম্পাদিত হইতে পারে। রাজ-নৈতিকের রাষ্ট্রসভায়, বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে, শ্রমজীবীর কারখানায় সমভাবে এই বেদান্তের মঙ্গলবর্ত্তিকা প্রজ্বালিত করিয়া দিতে হইবে। এই বিপুল কার্য্য যে সহসা সম্পাদিত হইবে না তাহা স্বামীজীর অবিদিত ছিল না। তিনি যে শান্তিসৌধের ভিত্তিস্থাপন মাত্র করিয়া দিলেন, তাঁহার স্বদেশবাসী ভ্রাতৃদিগকেই তদুপরি ধীরে ধীরে ইষ্টক সন্নিবেশ করতঃ একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হর্ম্ম্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাই তিনি ভারতের নবীন সম্প্রদায়কে আহ্বান করিয়া দুন্দুভিনাদে বলিতেছেন ;—

"Therefore, Children of the Aryans, do not sit idle, Awake, arise and stop not till the goal is reached. The time has come when the Adwaita is to be worked out practically. Let us bring it down from heaven unto the earth ; this is the present dispensation. Aye, the voices of our forefathers of old are telling us to stop—Stop there my chiidren. Let your teachings come down lower and lower until they have permeated the world, till they have entered the very core of society, till they have become the common property of everybody, till they have become part and parcel of our lives, till they have entered into our veins and tingle with every drop of blood there"

পৃথিবীতে যাহা কিছু মহান্, যাহা কিছু বৃহৎ, যাহা কিছু প্রভূত কল্যাণের আস্পদ তৎসমুদয়ই সহসা সম্পাদিত হয় না। ঐ যে সুবিশাল মহীরুহ সুদূর গগনের কোলে অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক অগণিত বিহগকুলের আশ্রয় ও বহু শ্রান্ত পথিকের আরামের স্থল হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাকেও একদিন ক্ষুদ্র বীজাকারে ধরণীর

গর্ভে লুক্কাইত থাকিতে হইয়াছিল, কত ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া, ধীরে ধীরে কংকাল ধরিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে হইয়াছে। এযাবৎ জগতে ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক বহুজনহিতায় যে সকল সত্য প্রচারিত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে গ্রহণ করিতে জগৎকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। প্রাবৃটের ক্ষুদ্র জলদখণ্ড যেমন ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়া বিপুল ঝঞ্ঝাবাত ও অবিশ্রান্ত বর্ষণের সূত্রপাত করে, মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত মহান্ সত্যসমূহও তেমনি ধীরে ধীরে আপন প্রভাব বিস্তার করতঃ জগতের ভাবরাশির একটা আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় গুরুদেবের অত্যুদার জীবনের মধ্য দিয়া ভারতীয় বেদান্তশাস্ত্রের যে অত্যদ্ভুত মহিমা উপলব্ধি করিলেন এবং একমাত্র যাহা সমগ্র ধরণীতে শান্তির অমৃতধারা সিঞ্চন করিতে সমর্থ বলিয়া নিঃসন্দেহে ঘোষণা করিলেন, জগতে যথার্থ শান্তির বিরাট স্তম্ভ যে ধীরে ধীরে তাহারই উপর গঠিত হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দিহান হওয়া কাপুরুষতা মাত্র। যথার্থ পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে সকলকেই বেদান্তের এই উদার অদ্বৈততত্ত্ব অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যটিকে বেদান্তের এই অপূর্ব্ব ভাবের আলোকে ধীরে ধীরে আলোকিত করিয়া তুলিতে হইবে। ইহা ব্যতীত আর অন্য পথ নাই। *

(আগামীবারে সমাপ্য)

---

* কাশী অদ্বৈত আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে পঠিত।

ত্যাগ ও সেবা।

(শ্রী—)

আমাদের জাতীয় কল্যাণ ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, কারণ ধর্ম্মই জাতীয় জীবনের হৃৎপিণ্ড স্বরূপ। অন্যান্য দেশের আদর্শ অন্য কিছু হইতে পারে কিন্তু ভারতের চির উপাস্য আদর্শ ধর্ম্ম। স্মরণাতীতকাল হইতে জাতীয় জীবনস্রোত ধর্ম্মরূপ পার্ব্বতানির্ঝরিণী হইতে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত জাতিশরীরে রসসঞ্চার করিতেছে। কখন কখন সে স্রোত ক্ষীণ হইয়াছে বটে কিন্তু যখনই মহাপুরুষগণ অবতীর্ণ হইয়া অধ্যাত্মনির্ঝরিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়াছেন তখনই আবার সেই ধর্ম্মস্রোত অব্যাহতগতিতে সমাজশরীরে প্রবাহিত হইয়াছে—তখনই আবার দেশ ধনধান্যে, শিল্পবাণিজ্যে, আচার ব্যবহারে ও জ্ঞান গরিমায় উন্নত হইয়াছে—তখনই দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। ইতিহাস ইহার সাক্ষী। বৈদিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক সকল যুগেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখনই আধ্যাত্মিক অভ্যুদয় হইয়াছে তখনই সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ববিষয়ের উন্নতি দেখা দিয়াছে। বর্ষার বারিধারা পাতে যেমন ধরিত্রী নবশোভা ধারণ করে, আধ্যাত্মিক রসসঞ্চারেও তেমনি জাতীয় জীবনে শৌর্য্য, বীর্য্য, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি বিকশিত হইয়া উঠে।

কিন্তু কালপ্রভাবে জাতীয় জীবনসৌধ আধ্যাত্মিক ভিত্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে আবার পাশ্চাত্য বিলাসিতা ও ইহ-সর্ব্বস্ববাদের প্রবল বাত্যাঘাতে উহা প্রায় পতনোন্মুখ হইয়াছিল। দেশের এই আসন্ন বিপদ্ যে ইতিপূর্ব্বে কোন কোন মনীষীর চক্ষে পড়ে নাই তাহা নহে। তাঁহারা বিপদ্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু উহার রোগনির্ণয়ে সমর্থ হন নাই। তাই তাঁহারা ঔষধ প্রয়োগ করিলেও উহা ফলপ্রসূ হয় নাই—তাঁহারা যে সংস্কারপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। রোগ যেরূপ তাহার চিকিৎসকও তদনুরূপ

হওয়া দরকার। যাহাকে ভূতে পাইয়াছে তাহার জন্য রোজার আবশ্যক। শত বৈদ্যই প্রদর্শন কর তাহার কিছুই হইবে না। ভারতের অধ্যাত্মহীনতারূপ রোগনির্ণয় করিতে একজন মহা আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন লোকের আবশ্যক হইয়াছিল। তাই ভারতের সুপ্ত আধ্যাত্মিকতা বিবেকানন্দে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ দেশের জন্যই জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ দেশের জন্য—তাঁহার 'আসাম হইতে সিন্ধু ও হিমালয় হইতে কুমারিকা' পর্য্যন্ত ভারতের গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন দেশের জন্য—তাঁহার আমেরিকা যাত্রা ও তথায় বেদান্তপ্রচার দেশের জন্য—তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন ও মঠ, মিশন, সেবাশ্রম, বিদ্যালয় প্রভৃতি লোকহিতকর অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাও দেশের জন্য। তিনিই যথার্থ বুঝিয়াছিলেন—রোগ কোথায়। তাই তিনি তাঁহার মান্দ্রাজ অভিনন্দনের উত্তরে বলিতেছেন—

"ভারতে আবার নূতন নূতন অবস্থার সংঘর্ষে সমাজ-সংহতির নবগঠন বিশেষ আবশ্যক হইতেছে। বিগত শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ ধরিয়া ভারত সমাজসংস্কার সভা ও সমাজসংস্কারকে পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু হায়! ইহার মধ্যে সকলগুলিই বিফল হইয়াছে। ইঁহারা সমাজসংস্কারের রহস্য জানিতেন না। ইঁহারা প্রকৃত শিখিবার জিনিষ শেখেন নাই। ব্যস্ততাবশতঃ তাঁহারা আমাদের সমাজের যত দোষ সব ধর্ম্মের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। প্রবাদবাক্যে যেমন আছে, মশা মারতে গালে চড়, তেমনি তাঁহারা সমাজের দোষ সংশোধন করিতে গিয়া সমাজকেই একেবারে ধ্বংস করিবার জোগাড় করিয়াছিলেন। * * * তাঁহারা ইহা শিক্ষা করেন নাই যে, ভিতর হইতে বিকাশ আরম্ভ হইয়া বাহিরে তাহার পরিণতি হয়; তাঁহারা শিক্ষা করেন নাই, সমুদয় ক্রমবিকাশ পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ক্রমসঙ্কোচের পুনর্বিকাশ মাত্র। তাঁহারা জানিতেন না, বীজ উহার চতুঃপার্শ্বস্থ ভূত হইতে উপাদান সংগ্রহ করে বটে কিন্তু নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বৃক্ষ হইয়া থাকে। হিন্দু জাতি একেবারে ধ্বংস হইয়া নূতন কোন জাতি যতদিন না তাহার স্থান অধিকার করিতেছে, ততদিন সমাজের এরূপ বিপ্লবকর সংস্কার সম্ভব নহে। যতই চেষ্টা কর না কেন, যতদিন না ভারতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতেছে, ততদিন ভারত কখনও ইউরোপ হইতে পারে না।"

দেশের যথার্থ রোগ কোথায় এবং তাহার প্রতিকারের উপায় কি তদ্বিষয়ে স্বামিজীর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি সময়ে সময়ে এমন কথাও বলিয়াছেন যে,

আগামী তিন হাজার বৎসরের ভবিষ্যৎ ভারতের ছবি তাঁহার মানসনেত্রে ভাসিতেছে! ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। যাঁহারা ঋষি—যাঁহারা সত্যদ্রষ্টা—তাঁহাদের এরূপ যোগজ দৃষ্টিশক্তি থাকে। কারণ, দেশ-কাল-নিমিত্ত তৎমনেরই ভিতরে, যাঁহারা মনের পারে গিয়াছেন তাঁহারা যে ত্রিকালজ্ঞ হইবেন তাহা ত যুক্তিযুক্তই। এইরূপ যথার্থ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াই তিনি দেশের জন্য ত্যাগ ও সেবা (Renunciation and Service) এই যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। বিচক্ষণ চিকিৎসক রোগীকে এরূপ ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা দিয়া থাকেন যাহাতে ঐ রোগ দীর্ঘকাল পরেও আর না হইতে পারে। ভারতের রোগ-নির্ণয় ও ব্যবস্থা সম্বন্ধেও স্বামিজী ঠিক এইরূপই করিয়াছেন। তাঁহার ব্যবস্থার ফল হয়ত হাতে হাতে না পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু উহাই যে আখেরে কার্য্যকরী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বুদ্ধিমান্ চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, তাঁহার দেহত্যাগের এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই জাতীয় জীবন-স্রোতের নিম্নাভিমুখী গতি ত রুদ্ধ হইয়াছেই, অধিকন্তু, উহা উন্নতির দিকে প্রবাহিত হইতেছে। নদীতে যখন জোয়ার আসে তখন ধারের জলই প্রথমে ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকে, ইহার বহুক্ষণ পরে নদীর মধ্যকার জলস্রোত পরিবর্ত্তিত হয়। জোয়ার আরম্ভ হইলেও যাঁহারা মধ্য স্রোতের গতি লক্ষ্য করিয়া বলেন, এখনও জোয়ার আরম্ভ হয় নাই, তাঁহারা ভ্রান্ত—তাঁহারা দূরদৃষ্টিহীন। সেইরূপ জাতীয় জীবনস্রোত আপাতদৃষ্টিতে যথাপূর্ব্ব নিম্নাভিমুখী মনে হইলেও যাঁহারা বুদ্ধিমান্ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তাঁহারা দেশের বিশ বৎসর পূর্ব্বের ও এখনকার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন যে জাতীয় জীবনস্রোতে জোয়ার আরম্ভ হইয়াছে। তবে এ নদী বড়ই বিস্তৃত, জোয়ার মধ্যস্থলে পৌঁছিতে সময় লাগিবে।

স্বামিজীর কোন গুরুভ্রাতা একটী সুন্দর উদাহরণ দিয়া সেদিন এই কথাটী আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "লাউ কুমড়া গাছের বীজ পুঁতিলে এক বৎসরেই তাহা হইতে গাছ, ফুল,

ফল হইয়া মরিয়া যায় কিন্তু বটের বীজ বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফুলফলায়িত হইতে কত বৎসর কাটিয়া যায়। আমাদের দেশও সেইরূপ। ভারতবর্ষ নিজেই একটা মহাদেশ। এখানে যে কত বিভিন্ন জাতি, কত বিভিন্ন ভাষা, কত বিভিন্ন আচার ব্যবহার, কত বিভিন্ন সম্প্রদায়, কত বিভিন্ন ধর্ম্মমত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তোমরা কি মনে কর এত বড় একটা দেশ একদিনে উন্নত হইয়া যাইবে? উহার উন্নতি বটবৃক্ষের বীজের ন্যায়—Slow but sure. ভারতের উন্নতি শুধু ভারতের জন্য নয়—জগতের জন্য উহার প্রয়োজন। যদি জগতে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন থাকে তবে ভারত কখনও মরিতে পারে না। ভারত নিশ্চয় উঠিবে।" স্বামিজীও এই কথাই বলিতেছেন—

"ভারতের কি বিনাশ হইবে? তাহা হইলে জগৎ হইতে সমুদয় আধ্যাত্মিকতা চলিয়া যাইবে; চরিত্রের মহান্ আদর্শ সমুদয় নষ্ট হইবে, সমুদয় ধর্ম্মের প্রতি মধুর সহানুভূতির ভাব বিনষ্ট হইবে, সমুদয় ভাবুকতা নষ্ট হইবে, তাহার স্থলে কাম ও বিলাসিতারূপ দেব দেবীরই রাজত্ব হইবে; অর্থ হইবেন তাহার পুরোহিত—প্রতারণা, পাশববল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে তাহার পূজাপদ্ধতি, আর মানবাত্মা হইবেন তাহার বলি। এরূপ কখনও হইতে পারে না। কার্য্যশক্তি হইতে সহশক্তি অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ; ঘৃণাশক্তি হইতে প্রেমশক্তি অনন্তগুণে অধিক শক্তিমান্।"

এইরূপ অটল বিশ্বাস ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি লইয়া স্বামিজী যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উহা সংক্ষেপে ত্যাগ (Renunciation) ও সেবা (Service)। অন্যান্য নানাবিধ উপায় থাকিতে কেন তিনি ঐ দুইটীর উপর এত অধিক জোর দিয়া গিয়াছেন অতঃপর আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পৃথিবীর যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রই আলোচনা করুন দেখিবেন—ভোগোন্মুখ মানবকে নানাপ্রকার বিধিনিষেধের ভিতর দিয়া ত্যাগের দিকে লইয়া যাওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য। কি জ্ঞানমার্গ, কি ভক্তিমার্গ, কি যোগমার্গ, কি কর্ম্মমার্গ—কি বৈষ্ণব সাধন প্রণালী, কি তান্ত্রিক সাধন প্রণালী—সকল পথের গন্তব্যস্থল ঐ এক ত্যাগ। গার্হস্থ্যাশ্রমেই থাক আর সন্ন্যাসাশ্রমেই থাক, যদি উন্নত হইতে হয়—যদি মুক্তির

দিকে অগ্রসর হইতে হয়—তবে ত্যাগের সাধন করিতেই হইবে। আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই। যাঁহারা বলেন, গৃহস্থাশ্রমে ত্যাগের দরকার নাই, তাঁহারা গৃহস্থই হইয়াছেন কিন্তু গৃহস্থের ধর্ম্ম কি তা জানেন না। বেদ বেদান্তের কথা ছাড়িয়া দিলেও রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি ছত্রে ত্যাগের মহিমায় দেদীপ্যমান। লক্ষ্য এক—তবে কোন পথে আপোষের ভাব মোটেই নাই। যাহা ত্যাগের এতটুকু বাধক—এতটুকু পরিপন্থী তাহাকেই নির্ম্মমভাবে পদদলিত করিয়া কোন পথ ছুটিয়া চলিয়াছে অমৃতের সন্ধানে, আর কোন পথ যোগ ও ভোগের মধ্যে আপোষ করিয়া—কিছু ভোগ কিছু ত্যাগ করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে সেই অমৃতেরই সন্ধানে। লক্ষ্য উভয়েরই এক—উপায়ও উভয়েরই এক। সংসারের আরম্ভ ভোগে নিবৃত্তি ত্যাগে। ত্যাগ ভিন্ন শান্তিলাভের উপায় নাই। তাই বৈদিক ঋষি বলিতেছেন—

"ন ধনেন ন চেজ্যয়া ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।"

সুতরাং স্বামিজী যে ত্যাগকেই জাতীয় জীবনাদর্শরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত কোন নূতন পন্থা নহে। হিন্দুর বেদ, বেদান্ত, দর্শন যাহা উপদেশ করিতেছেন,—যাহা এক সময়ে ভারতকে বিদ্যা, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্যে জগতের গুরুস্থানীয় করিয়াছিল এবং যাহার হীনতায় আজ ভারত দীন, হীন, বুভুক্ষু,—সেই ত্যাগের পথে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই স্বামিজী দেশবাসীকে আহ্বান করিতেছেন।

এই ত্যাগ মানে কি? আত্মত্যাগ—এই আপাতপ্রতীয়মান "অহং"এর ত্যাগ—সর্ব্বপ্রকার স্বার্থপরতার পরিত্যাগ। স্বামিজী একস্থলে বলিতেছেন—

দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান,
'স্বার্থ স্বার্থ' সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকার।

হে প্রেমিক, স্বার্থ-মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জ্জন।
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম, অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন।

অতএব, স্বার্থগন্ধশূন্য হওয়ার নামই ত্যাগ—"প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণ-চিকীর্ষবঃ"—প্রাণ দিয়াও পরের কল্যাণ করা—ইহারই নাম ত্যাগ। পূর্ণ আত্মত্যাগের অবস্থা লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের সাধনায় অগ্রসর হইতে হইবে। স্বার্থই মানুষকে গণ্ডীবদ্ধ করে, তাহার আকাশের ন্যায় উন্মুক্ত, সীমাহীন নির্ম্মল মনকে সঙ্কুচিত করিয়া "আমি আমার"রূপ রুদ্ধ, সঙ্কীর্ণ, পূতিগন্ধময় কারাকক্ষে আবদ্ধ করিয়া ফেলে—তাহার গৌরবোন্নত শীর্ষ হইতে স্বাধীনতার বিজয়কিরীট অপসারিত করিয়া চরণে আসক্তির নিগড় ও ললাটে দাসত্বের তিলক পরাইয়া দেয়! স্বার্থ শব্দের অর্থ নিজের এই ক্ষুদ্র আমিটার প্রয়োজন বোধ বা লাভ লোকসান খতান। এই কার্য্যটী করিব, কারণ, উহাতে আমার এই লাভ হইবে—ঐ কার্য্যটী করিব না, উহাতে আমার এই ক্ষতি হইবে, এইরূপ প্রেরণা দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করার নামই স্বার্থপরতা। নিজে ভাল খাইব, ভাল পরিব, ভাল থাকিব—অপরে মরে মরুক; চুরি করিয়া হউক, ঠকাইয়া হউক, যেরূপে পারি অর্থোপার্জ্জন করিব, নিজ স্ত্রী-পুত্রের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বড় বড় ইমারত করিব, গাড়ী ঘোড়া করিব, এবং উদ্বৃত্ত রাশি রাশি অর্থ কোম্পানির কাগজরূপে সুদে আসলে বাড়িতে থাকিবে—উদ্দেশ্য পুত্রপৌত্রেরা ভোগ করিবে, কিন্তু পার্শ্বে প্রতিবেশী অর্থাভাবে ভাঙ্গা কুঁড়েঘরে অনাহারে অনিদ্রায় দিন যাপন করে' করুক, কাহাকেও একটী পয়সা দিব না; নিজের ছেলেটীর জন্য দুই তিনটী মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া মাসে ৫০।৬০৲ টাকা খরচ করিয়া পড়াইব অথচ প্রতিবেশীর বুদ্ধিমান্ সন্তান অর্থাভাবে মূর্খ হইয়া কোন প্রকারে দিন গুজরান করুক; দেশে ভয়ানক ম্যালেরিয়া; আমার অর্থ আছে আমি সহরে চলিয়া যাইব, কিন্তু দেশের লোক রোগে শোকে অনাহারে মরে মরুক—ইহার নাম উদাসীনতা নয়, ইহার নাম অনাসক্তি নয়, ইহার নাম সংসারধর্ম্মপ্রতিপালন করা নয়—ইহা ঘোর

স্বার্থপরতা। আমাদের ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, কলা সমস্তই ছিল। আজ তাহা লুপ্তপ্রায়! আমরা তাহাদের অভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি—বুঝিতেছি এ প্রতিযোগিতার দিনে Co-operation বা সমবেত-প্রযত্ন ব্যতীত দু এক জনের ব্যক্তিগত চেষ্টায় উহার পুনরুদ্ধার অসম্ভব। তথাপি ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া এরূপ যৌথকারবার গঠনে উদ্যোগী হইতেছি না। আর যদিই বা দশজন লোক মিলিত হইয়া একটা লোকহিতকর অনুষ্ঠান করিতেছে—তবে কতকগুলি লোক তাহাতে যোগদান করিয়া সুবিধা বুঝিয়া তাহার বহুযত্নসঞ্চিত ভাণ্ডার আত্মসাৎ করিতেছে! এই সব ঘৃণিত ব্যবহার, এই দাসসুলভ ঈর্ষা, দ্বেষ, শঠতা যতদিন আমাদের মধ্যে রহিয়াছে ততদিন Renunciation বা ত্যাগের কথা কহা প্রলাপোক্তি মাত্র। দুইটী বিরুদ্ধভাব এক স্থানে থাকিতে পারে না—'যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম'। আমরা মুখে সকলেই ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি—কীর্ত্তনাদি শুনিলে ভাবে গদগদ হই—পূজা দোল দুর্গোৎসব করি কিন্তু জাতির বা দেশের সর্ব্বনাশ করিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হই না। ভাইএ ভাইএ মিল নাই কেন?—স্বার্থ। ব্রাহ্মণে শূদ্রে মিল নাই কেন?—স্বার্থ। জমিদারে প্রজায় মিল নাই কেন?—স্বার্থ। শিক্ষিতে অশিক্ষিতে মিল নাই কেন?—স্বার্থ। শিক্ষিতে শিক্ষিতে মিল নাই কেন?—স্বার্থ। এত স্বার্থ যেখানে সেখানকার দৈন্য কি করিয়া ঘুচিবে? শুধু গলাবাজী করিয়া রাজনৈতিক অধিকার ভিক্ষা করিয়া কি ফলোদয় হইবে? শুধু বাহিরের 'রিফর্ম্মে' কি হইবে?—ভিতরের 'রিফর্ম্ম'ই আসল। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ মহান্ জাতীয়কল্যাণের সম্মুখে বলি দিতে হইবে। নতুবা, আভিজাত্যের বড়াই করিয়া, শিক্ষার বড়াই করিয়া দেশের প্রাণতুল্য কোটী কোটী লোককে ঘৃণার চক্ষে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে শিক্ষাহীন, দীক্ষাহীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, দাসমাত্রে পরিণত করিয়া তাহাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফল কয়েকটীমাত্র তাম্রখণ্ড বা রজতখণ্ডের বিনিময়ে নিজেরাই ভোগ করিতে থাকিলে এবং 'স্বাধীনতা', 'স্বাধীনতা' করিয়া চীৎকার করিলে স্বার্থপরের সে চীৎকারে কেহই কর্ণপাত

করিবে না। চাই যথার্থ স্বার্থত্যাগ। চাই অকপট সহানুভূতিসম্পন্ন হৃদয়। চাই প্রাণপণ সমবেতচেষ্টা। কিন্তু দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ ত্যাগের ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হইলে এ তিনের সমাবেশ অসম্ভব। তাই জাতীয় কল্যাণসাধনে ত্যাগের গৈরিকধ্বজা উড্ডীন করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয়ব্যূহের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া পাঞ্চজন্য-নিনাদে ত্যাগের মন্ত্র ঘোষণা করিতেছেন—

"ভিক্ষুকের কবে বল সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
'দাও, দাও', যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।"

তোমার হৃদয়ে অনন্ত প্রেম রহিয়াছে। সেই প্রেমের দ্বারা জগৎকে আপনার করিয়া লও এবং তোমার যাহা কিছু আছে সর্ব্বস্ব অর্পণ কর—যে যাহা চায় তাহাকে তাহাই দাও। কিছুমাত্র প্রত্যাশা করিও না। তুমি পূর্ণ—তুমি আবার কি প্রার্থনা করিবে? প্রার্থনা করিলেই যে তুমি অপূর্ণ হইয়া যাইবে। ইহাই হইল স্বামিজীর ত্যাগের আদর্শ।

এই ত্যাগের সহিত পবিত্রতার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। পবিত্রতা বা ব্রহ্মচর্য্যই এই ত্যাগের ভিত্তি। ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন ত্যাগ শুধু মুখের কথা মাত্র। অতএব, এই ত্যাগের ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে সমস্ত জাতিকে ব্রহ্মচর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যই তপস্যা। এই তপস্যা দ্বারা জাতীয় শক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে। ধনবল, জনবল, অস্ত্রবল, বিদ্যাবল—লৌকিক অলৌকিক যত কিছু শক্তি—সমুদয়ই এই তপঃসম্ভূত। এই বলেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব। কোন্ শক্তিতে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করিয়াছিলেন?—কোন্ বলে বলীয়ান্ হইয়া ভীষ্মার্জ্জুন বিশ্ববিজয়ী হইয়াছিলেন?—বিশ্বামিত্র কিসের প্রভাবে নূতন জগৎ সৃজন করিয়াছিলেন? আমরাই বা আজ শক্তিহীন কেন? নিজের কল্যাণের জন্য—জাতির কল্যাণের জন্য—জগতের কল্যাণের জন্য—আমাদিগকে আজ এ স্বার্থত্যাগ

করিতেই হইবে। সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে আমাদের আদর্শ—ত্যাগ, ভোগ নহে। মনে রাখিতে হইবে হিন্দুর বিবাহ গৃহমেধী মানবকে ত্যাগের দিকে লইয়া যাইবার জন্য—ভোগের জন্য নহে—ইন্দ্রিয়পরতার জন্য নহে। পবিত্র থাকিবার, সংযত থাকিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে—তবেই আমরা বীর্য্যবান্ হইব, তবেই আমরা ওজস্বী হইব—তবেই আমরা 'অভীঃ' হইব।

বর্ত্তমানকালে ভারতের পক্ষে এই ত্যাগের যত প্রয়োজন হইয়াছে অতীতে সেরূপ হয় নাই। শত শত শতাব্দীর পরাধীনতায় আমরা মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছি—আমাদের শৌর্য্য, বীর্য্য, ওজঃ সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। তাহার উপর আবার পাশ্চাত্য হাবভাব চালচলন ভোগ-বিলাসের অনুকরণে আমাদের দেশের যুবক যুবতীর মধ্যে নীতির আদর্শ (Standard of morality) অতি নীচু হইয়া গিয়াছে। ফলে আমরা মহা ইন্দ্রিয়পরায়ণ জাতিতে পরিণত হইয়াছি। তাহার দৃষ্টান্ত—আমাদের ছেলেমেয়েদের অপরিণত বয়সে সন্তানোৎপাদন। ২০।২২ বৎসরের স্বামী ও ১০।১১ বৎসরের স্ত্রী বৎসর বৎসর পুত্র কন্যার জন্ম দিয়া নিজের মুখোজ্জ্বল—চতুর্দ্দশ পুরুষের মুখোজ্জ্বল—দেশের ও দশের মুখোজ্জ্বল করিতেছে, ভারতভারতীর ইহাপেক্ষা শোচনীয় পরিণাম আর কি হইতে পারে!

দেশের এই ভয়ানক দুর্দ্দিনে শ্রীভগবানের নরশরীর ধারণপূর্ব্বক কামকাঞ্চনত্যাগের জীবন প্রদর্শন যেরূপ সময়োচিত, স্বামী বিবেকানন্দের 'ত্যাগের' আহ্বানও যে সেইরূপ যুগপ্রয়োজনের উপযোগী, তাহা কি আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে?

স্বামিজীর নির্দ্দিষ্ট দ্বিতীয় পন্থা—সেবা। শিব জ্ঞানে জীব সেবা। স্বামিজী দেখিলেন, দেশ যে শুধু স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়াছে তাহা নহে। উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন, উদ্যমহীন, সাহসহীন জড়পিণ্ডে পরিণত হইয়াছে! পরে আমাদের মুখে দুটী অন্ন তুলিয়া দিবে তবে আমরা খাইব! পরে আমাদের একখানি বস্ত্র দিবে তবে আমরা পরিব! পরে আমাদের বিদ্যাশিক্ষা দিবে তবে আমরা বিদ্যাশিক্ষা করিব!

এই আমাদের অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। এ যে মহা তমোগুণের লক্ষণ। অথচ আমরা মনে মনে আপনাদিগকে সত্ত্বগুণী বলিয়া মনে করিতেছি। স্বামিজী দেখিলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্জ্জুনের যে অবস্থা হইয়াছিল সমস্ত জাতটারও আজ তাহাই হইয়াছে। ভিতরে প্রবল ভোগবাসনা কিন্তু বাহিরে বৈরাগ্যের ভাণ করিয়া—সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছা। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া স্বামিজীও দেশকে সম্বোধন করিয়া বজ্রনির্ঘোষে কহিলেন—

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

হে ভারত—হে সুপ্ত সিংহ, এ দীনতা এ ক্লীবতা তোমার সাজে না।—উত্তিষ্ঠত—জাগ্রত! "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—দানহীন ভাবগুলো সব দূর ক'রে দাও—নেই নেই ক'রে যে সমস্ত জাতটা নেই হ'য়ে গেল। বল 'অস্তি' 'অস্তি'—"সোহং সোহং"।

এইরূপে দেশের আত্মবোধ জাগ্রত করিয়া স্বামিজী তাহাকে গভীর কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপ দিতে আহ্বান করিলেন। প্রবল কর্ম্মশীলতার মধ্য দিয়া না যাইলে সত্ত্বগুণে পৌঁছান অসম্ভব। কিন্তু কর্ত্তব্য কি? "কিং কর্ত্তব্যং কিমকর্ত্তব্যং কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ"—সুতরাং বর্ত্তমানে আমাদের কি কাজ করিতে হইবে? কি কাজ করিলে আমাদের এ দৈন্য দূর হইবে—আমাদের মনের কার্পণ্য, দাসসুলভ দুর্ব্বলতা তিরোহিত হইবে—আমাদের অহঙ্কার অভিমান ঘুচিয়া যাইবে—আমরা যথার্থ মানুষ হইব? স্বামিজী উত্তর দিলেন—সেবা। দয়া নহে—নারায়ণ জ্ঞানে জীব সেবা। এতদিন ছিল Work and worship. স্বামিজী প্রচার করিলেন—Work is worship. এতদিন লোক ভগবান্‌কে দেখিত শুধু অন্তরে—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানসহায়ে। তাই যখনই সে কর্ম্ম করিতে যাইত তখনই সে ভগবান্ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িত—তখনই সে বহির্মুখী হইয়া যাইত। কিন্তু ভগবান্ যে বাহিরেও রহিয়াছেন—

"যো রাম দশরথ কি বেটা ওহি রাম ঘট ঘট মে লেটা।
ওহি রাম জগৎ পসেরা ওহি রাম সবসে নেয়ারা।"

এ কথা সে বিস্মৃত হইয়াছিল। তাই সে লোকব্যবহারের সময় ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাইত, নিভৃতে নির্জ্জনে চক্ষু মুদ্রিত না করিলে তাঁহার ইষ্টচিন্তা হইত না। স্বামিজীর কল্যাণে এখন লোকে এই ভাব গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মৃণ্ময় আধারে সেবা বন্দনা দ্বারা যখন চিন্ময়ের দর্শন হয় তখন চিন্ময় আধারে সেবা বন্দনা দ্বারা কেন না সেই চিন্ময়ের দর্শন হইবে? এই যুক্তিযুক্ত কথাটী লোকের অন্তরে দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে।

এই সেবা যখন নররূপী নারায়ণের সেবা তখন এই সেবার উপচার শুধু গঙ্গাজল বিল্বপত্রে নহে—পরন্তু দেহধারী নারায়ণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য যাহা কিছু দরকার সমস্তই। সংক্ষেপে—শারীরিক উন্নতি—মানসিক উন্নতি—আধ্যাত্মিক উন্নতি। হাসপাতাল ডিস্পেন্সারী করিয়া পীড়িত নারায়ণের সেবানুষ্ঠানটী দেশের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। এখন শুধু রামকৃষ্ণমিশন নহে; বৈষ্ণব সমাজ, আর্য্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ, বৌদ্ধ সমাজ, এমন কি, ব্যক্তিগত ভাবেও অনেকে ঐরূপ সেবার অনুষ্ঠান করিতেছেন। সাময়িক সাহায্য, যেমন দুর্ভিক্ষ-নিবারণ, বন্যানিবারণ, ঝটিকানিবারণ প্রভৃতি সেবা কার্য্যেও দেশবাসী কতকটা তৎপর হইয়াছেন। ইহা বড়ই সুখের বিষয়। আজ যদি স্বামিজী স্থূল শরীরে বর্ত্তমান থাকিতেন তাহা হইলে নিদ্রিত ভারতের এই জাগরণ দেখিয়া তিনি যে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আমরা একটী কথা বলিতে চাই। স্বামিজীর শুধু ঐ একটী ভাব ছিল না। তিনি সেবা বলিতে শুধু রোগের সেবা বুঝিতেন না। শুধু ঐ একটি সেবা দ্বারা আমাদের কল্যাণ সাধিত হইবে না। দেশের অন্নসমস্যা ও শিক্ষাসমস্যা—এই দুইটী সমস্যাই দিন দিন নিবিড় হইয়া উঠিতেছে। উহাদিগকে আর উপেক্ষা করা চলে না। এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ভারতভূমিতে কোটী কোটী লোক অনশনে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইবে।—এই ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকীর

বংশধরগণ শিক্ষার অভাবে অজ্ঞানে ডুবিয়া থাকিবে!—হে বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবকবৃন্দ তোমরা আর কতদিন এ দৃশ্য চক্ষে দেখিবে? শুনিতে পাই চিন্তারাশি নষ্ট হয় না।—সহস্র বৎসর পূর্ব্বের চিন্তাও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে উপযুক্ত আধার পাইলেই তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া আবার কার্য্য আরম্ভ করিবে। স্বামিজীর গভীরপ্রেমপূর্ণ হৃদয়োত্থিত ভাবতরঙ্গ কি তোমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়া অনুরূপ তরঙ্গ তুলিতেছে না?—তোমাদের শিরায় শিরায় কি বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিতেছে না? হে স্বামিজীর ঈপ্সিত যুবকসম্প্রদায়, তোমরাই দেশের আশা ভরসাস্থল—তোমাদের স্কন্ধেই তিনি দেশের ভার দায়স্বরূপ অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। কোন সম্প্রদায়বিশেষ ঐ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে পারুক বা না পারুক তোমরা উহাতে অবহেলা করিবে না, ইহাই আমাদের প্রাণের বিশ্বাস।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি স্মরণে।

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)

আজ স্বামী বিবেকানন্দের অষ্টপঞ্চাশত্তম জন্মতিথি। আজ পৌষের হিমমলিন, কুজ্ঝটিকাবৃত প্রভাত আমাদের নিকট যেন নূতন করিয়া এই মহাপুরুষের পুণ্য জন্মবার্ত্তা বহন করিয়া আনিল। যদিও স্বামিজীর তিরোভাবের পর দেখিতে দেখিতে আঠারটী বৎসর কালসাগরে বিলীন হইল, তথাপি তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন, আজও তাহা আমরা পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেন পারি নাই, আজ সে কথা তুলিব না,—কেমন করিয়া পারা যায় এই পবিত্র দিবসে সেই কথাই চিন্তা করিব।

আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, বিবেকানন্দের জড়দেহ আমাদের সম্মুখ হইতে অপসৃত হইলেও জীবনপ্রদ, প্রাণপ্রদ ভাব সমষ্টিরূপে

তিনি নিত্যকাল ধরিয়া আমাদের মধ্যে বিরাজমান থাকিবেন। তাঁহার জীবন্ত ভাবরাশি বাঙ্গালার মরা গাঙ্গে জোয়ার আনিয়াছে। এই অমৃতপ্রবাহের সম্মুখে দাঁড়াইয়াও বাঙ্গালী পিপাসায় শুষ্ক—দৈব-বিড়ম্বনা আর কাহাকে বলে! হায় বাঙ্গালী, কোন্ পাপে আজ তুমি গ্রহণ করিবার শক্তি পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছ?

অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে ভয়ে শিহরিয়া উঠে। জীবনের অতীত ইতিহাস লজ্জায় আরক্তিম হইয়া মুখ লুকায়! আত্মবিস্মৃত জাতির আত্মশক্তিতে অনাস্থাপর বংশধর আমরা—আমরা জাগিয়াও নেত্রে হস্তার্পণ করিয়া 'আলোক', 'আলোক' বলিয়া চীৎকার করিতেছি! দুর্ভাগা দেশের হতভাগ্য সন্তান আমরা—জন্মালস, চক্ষুষ্মান্ অন্ধকে কে পথ দেখাইবে?

আমরা ভুলিলেও ভারতের ভাগ্যবিধাতা আমাদের ভুলেন নাই। তাই তিনি এই দীন, দরিদ্র, দুর্ব্বল জাতির মধ্যে এমন এক মহাপুরুষকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, যাঁহার জীবনের প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক প্রবাহ জাতির নিস্পন্দপ্রায় ধমনীতেও প্রাণশক্তির পুলকবহুল জাগ্রত উত্তেজনা সঞ্চারিত করিয়াছে। চারিদিকে কালের চিহ্ন দেখিয়া আশা হয়, হয় তো বা অদূর ভবিষ্যতে এই অবসন্ন জাতীয় জীবনে সে শক্তি জাগিয়া উঠিতে পারে, যাহা বিবেকানন্দের জীবনাদর্শকে পরিপূর্ণরূপে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারিবে।

এই আশা আছে বলিয়াই, একাগ্রনিষ্ঠার সহিত মাঝে মাঝে বিবেকানন্দের জীবন আলোচনা করিয়া থাকি; এই আশায় নির্ভর করিয়াই আজ যথেষ্ট ত্রুটী ও অপূর্ণতা সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দের পূত জীবনকাহিনী স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধাবিমিশ্র সম্ভ্রমে পুনঃ পুনঃ মস্তক অবনত করিতেছি।

মানসিক বৈচিত্র্য ও ব্যক্তিগত রুচির স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া সকলেই একই ভাবে বিবেকানন্দকে বা তাঁহার উপদেশাবলী গ্রহণ করিবে—এরূপ দুরাশা একমাত্র বাতুল ব্যতীত অপরে সম্ভবে না। অনেক মহাপুরুষ ও প্রতিভাশালী পুরুষকে এইভাবে বুঝিতে ও বুঝাইতে

গিয়া আমরা তাঁহাদের জীবনের আদর্শকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, অথবা উত্তেজনাবশে সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি।

বিবেকানন্দ সমস্ত প্রকার গণ্ডীর শৃঙ্খল সবলে চূর্ণ করিয়া উন্মুক্ত আকাশতলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন,—আজিকার দিনে সে কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। কোন প্রকার ভ্রান্ত গৌরব-বুদ্ধির প্রেরণায় যেন তাঁহার জীবনের সার্ব্বভৌমিক দিককে আবৃত না করিয়া ফেলি— অন্ততঃ এ কথা যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই যে তিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন সকলেরই; তিনি ভারতের, তিনি ভারতবাসীর। একথা বলিবার কারণ এই যে, ভারতের অতীত ইতিহাসের ধারার সহিত সুগভীর ঐক্য রাখিয়া আর কোন মহাপুরুষ এ যুগে জাতীয় জীবনের আদর্শকে সম্যক্‌রূপে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হন নাই।

ভারতকে—ভারতের বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, মন্ত্র, সাধনা, সিদ্ধি, অবতার, গুরুবাদ, মূর্ত্তিপূজা, শিক্ষা, সভ্যতা, আচার, নিয়ম সমস্তই—তিনি পূর্ণ-ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহার কোন অঙ্গকে নিজের ইচ্ছামত কাটিয়া ছাঁটিয়া লন নাই। অথচ তিনি বর্ত্তমান ভেদনীতি, সঙ্কীর্ণ মতবাদ, অর্থহীন প্রথার দৌরাত্ম্য নিরসন করিয়া অতি আশ্চর্য্য উপায়ে সনাতন আদর্শের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন।

'একই সনাতন ধর্ম্ম, দেশকালপাত্র ভেদে বহু বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হইলেও, উহাদিগের মূলদেশে যে গভীর ঐক্য বিদ্যমান এবং তত্তৎ বৈচিত্র্যগুলিকে বিনষ্ট না করিয়াও যে উহাদের সমন্বয় সাধন করা যাইতে পারে—"Eclecticism" এর যুগে তাহা প্রমাণ করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় জীবনব্যাপী সাধনায় উহা প্রমাণ ও প্রকটিত করিয়া অবশেষে স্বামী বিবেকানন্দের উপর প্রচার ভার অর্পণ করেন। বিবেকানন্দ তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া সে দায়িত্বভার দেশের যুবকবৃন্দকে প্রদান করিয়া যান। এই দায়টুকু আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, গ্রহণ করিতে হইবে।

বিবেকানন্দ ভীরু বাঙ্গালীর কুণ্ঠিত হৃদয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই

দায় নির্ভীকচিত্তে স্বীকার করিয়াছিলেন। কোন বিলাসের প্রলোভন, খ্যাতি ও প্রতিপত্তির মোহ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার জীবনের উপর দিয়া কত ঝড় বহিয়া গিয়াছে; তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠাকে উন্মূলিত করিতে পারে নাই। জীবনের লক্ষ্যকে অব্যাহত ও অটল রাখিয়া তিনি দৃঢ় অথচ অকম্পিত পদে, শক্তিসবল বাহুযুগে বাধা বিপত্তি ঠেলিয়া দুর্দ্দমনীয় বিক্রমে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি আমাদের মতই বাঙ্গালী ছিলেন, কিন্তু আমাদের মত কাপুরুষ ছিলেন না। তাঁহার দৃপ্ত পৌরুষগর্ব্ব শত প্রকার দুর্দ্দশার কঠিন আঘাতে পুনঃ পুনঃ আহত হইয়াও ক্ষণেকের তরে পরিম্লান হয় নাই। যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সমস্ত প্রকার প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করিয়া অসঙ্কোচে তাহা প্রচার করিয়াছেন।

কি কঠোর দায়িত্ব ভারই না তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল! সম্মুখে অন্ধকার, পশ্চাতে অন্ধকার,—পথ নাই, আলো নাই—একটা মুমূর্ষু প্রায় জাতির ক্রন্দন থাকিয়া থাকিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে চিতার আলোক জ্বলিয়া উঠিতেছে—আবার নিভিয়া গিয়া অন্ধকার গাঢ়তর করিতেছে! এই অতুলনীয় অন্ধকারে—এই ভীষণের বক্ষে, তিনি একান্ত নির্ভরশীল শিশুর মত মাতৃক্রোড় মনে করিয়া, নিঃশঙ্কচিত্তে ছুটিয়া গেলেন। নিজের মুক্তি-কামনাকে তুচ্ছ করিয়া এই করুণাকাতর সন্ন্যাসী সংসারের রোগ, শোক, দুঃখ, দৈন্য, বিপদ আপদের মধ্যে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন! স্বজাতিপ্রেমমাত্রসম্বল এই কপর্দ্দকহীন সন্ন্যাসী ভারতব্যাপী দুঃখ দৈন্যের প্রতীকারকল্পে অগ্রসর হইলেন। সেদিন তিনি নিঃসঙ্গ একাকী! তাঁহার দক্ষিণে ও বামে আর কেহ ছিল না।

আজ আমরা আমাদের সম্মুখে সেবাধর্ম্মের যে প্রশস্ত রাজপথ দেখিতে পাইতেছি, এই পথটী স্বামিজী তাঁহার জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়া নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন—বাঙ্গালার ভবিষ্যযুগের কর্ম্মিগণ বিজয়ী সৈনিকের মত গর্ব্বিত পদক্ষেপে অগ্রসর হইবেন বলিয়া। এই পথটী বাঙ্গালীর লজ্জা—বাঙ্গালীর গৌরব।

তথাপি আত্মদৌর্ব্বল্যের সমস্ত লজ্জা সরাইয়া রাখিয়া জাতিগত সার্থক গৌরববুদ্ধিকে উদ্যত করিয়া আজ বিবেকানন্দের পুণ্য জন্মদিনে একবার আমরা সেই অলোকসামান্য জীবনের শুভ কর্ম্মগুলি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিব; কেবলমাত্র আমাদের ভক্তিকে চরিতার্থ করিবার জন্য নহে, শক্তিকে কৃতার্থ করিবার জন্য। আজ আমরা নূতন করিয়া "অভীঃ" মন্ত্রে দীক্ষা লইব—নূতন করিয়া ভৈরব উদাত্তস্বরে শুনিব—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

এই আত্মবিস্মৃত জাতির মধ্যে জাগরণের উৎসাহোচ্ছ্বাস বহুদিন আসিয়াছে। বহুদিনের অভ্যস্ত জড়ত্বের ভারে আমাদের উত্থানশক্তি যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আজ এই মহাপুরুষের প্রসারিত বলিষ্ঠ বাহু ধারণ করিয়া আমরা দণ্ডায়মান হইব। বাঙ্গালীর লক্ষ্য মহৎ, তাই দুঃখও মহৎ। এই মহৎ দুঃখকে বরণ করিয়া আজ ক্ষুরধার দুর্গম পথে পদক্ষেপ করিতে আর আমরা দ্বিধা করিব না। বিমুখ ভাগ্যের অসীম ধিক্কার প্রবল অবহেলাভরে উপেক্ষা করিয়া পুরুষকার-সহায়ে আমরা অদৃষ্ট গড়িয়া লইব। শক্তির অল্পতা ও দৌর্ব্বল্যের প্রাচুর্য্যে হতাশ হইয়া জীবনকে ব্যর্থতার আবর্জ্জনাস্তূপে পরিণত করিব না। বিবেকানন্দের জীবনের দৃষ্টান্তে আমাদের ত্যাগকে সার্থক করিয়া তুলিব—পুনঃ পুনঃ বিফলতা সত্ত্বেও উদ্যম প্রকাশে ক্ষুব্ধ বা লজ্জিত হইব না। বিবেকানন্দের জীবনকে আমরা কেবল বক্তৃতা, পুস্তক বা প্রবন্ধে আবদ্ধ করিয়া রাখিব না, জীবন দ্বারা গ্রহণ করিব; এই গ্রহণ করিবার উপরই জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করিতেছে। জাতির কল্যাণের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ইহাই যুগধর্ম্ম। বাঙ্গালার কবিগুরুর কণ্ঠেও এই যুগধর্ম্মের বাণী ঝঙ্কৃত হইয়া আমাদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছে,—

"—এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে!

বড় দুঃখ বড় ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার!—
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট!"

স্বগৃহে শঙ্কর।

(শ্রীমতী—)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শঙ্করের সমাবর্ত্তনের জন্য অতি প্রত্যুষেই গুরুগৃহে পরিচারিকা প্রেরণ করিয়া বিশিষ্টাদেবী কতক্ষণে শঙ্করের চাঁদমুখখানি দেখিবেন এই আশায় পথপানে চাহিয়া আছেন। সুদীর্ঘ দুই বৎসরকাল প্রাণাধিক পুত্রকে না দেখিয়া তিনি কোনও রূপে দিনযাপন করিতেছিলেন, কিন্তু, এক্ষণে আর মুহূর্ত্ত বিলম্বও যেন তাঁহার অসহনীয়। তিনি কখন সুমিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেছেন, কখন গৃহের বাহিরে আসিয়া পথপ্রান্তে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, কখন বা সমাবর্ত্তনের দ্রব্যাদি সাজাইতেছেন, কখন বা পুরোহিত মহাশয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এইরূপে বিশিষ্টাদেবী আজ বড়ই চঞ্চলা হইয়া পড়িয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে শিবগুরুর কথা স্মরণ করিয়া ব্যাকুলা হইতেছেন। বহু প্রতিবেশিনী রমণী বিশিষ্টাদেবীকে সাহায্যের জন্য আজ উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বিশিষ্টাদেবীর এই ভাবান্তর দেখিয়া তাঁহাকে নানা কথায় ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইতে না হইতেই দূরে

পরিচারিকাসহ শঙ্করকে জননী দেখিতে পাইলেন এবং অবিলম্বে মাঙ্গল্য দ্রব্য হস্তে লইয়া গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশিষ্টা-দেবীর সঙ্গিনীগণও তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সকলেই আনন্দে পুলকিত, কাহারও মুখে কোনও কথা নাই, সকলেই যেন শঙ্করকে দেখিবার জন্য উৎসুক।

ক্রমে জননীর এতাদৃশ অবস্থা শঙ্করও দূর হইতে দেখিতেছিলেন। তিনিও ক্রমেই চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। পথিমধ্যস্থ গ্রামের বালকবালিকা শঙ্করকে কতরূপ সম্বোধন করিতেছে, তিনি সংক্ষেপে দুই একটী কথায় উত্তর দিয়া অতি দ্রুতপদসঞ্চারে জননীর দিকে ধাবিত হইলেন এবং নিকটে আসিয়াই ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃচরণে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। বিশিষ্টাদেবী আনন্দে আত্মহারা হইয়া নীরবে পুত্রকে বক্ষে ধরিলেন। মুখ দিয়া আর কোন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। আনন্দাশ্রু তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া শঙ্করের মস্তক অভিষিক্ত করিল—যেন জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী আজ বিশিষ্টার রূপ ধারণ করিয়া স্বীয় আনন্দাশ্রু ধারায় শঙ্করকে বিদ্যারাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর পদে অভিষিক্ত করিলেন। কারণ আজ তাঁহার বিদ্যার্জ্জন শেষ হইয়াছে, আজই ত তাঁহার বিদ্যারাজ্যের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবার কথা। জননীর আশীর্ব্বাদ লইয়া শঙ্কর তাঁহার বর্ষীয়সী সঙ্গিনীগণের পদধূলি লইলেন এবং গৃহপ্রান্তে অবস্থিত নিজ কুলদেবতা শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক দেশীয় প্রথানুসারে মন্দিরজে শরীর বিলুণ্ঠিত করিলেন।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রবাস প্রত্যাগতের গুরু-দেবতা-প্রণামরূপ সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইল। কিন্তু মায়ের প্রাণ কি স্থির থাকিতে পারে? বিশিষ্টাদেবী তাড়াতাড়ি কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া পুত্রকে খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। শঙ্কর জননীর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন—"মা! সমাবর্ত্তন ক্রিয়ার প্রথম কয়েকটী কার্য্য সমাপ্ত না হইতেই কি খাইতে আছে, পুরোহিত মহাশয় আসুন, কার্য্য শেষ হউক, পরে খাইতেছি।" পুত্রবাক্যে বিশিষ্টাদেবীর মোহ

দূর হইল, তিনি সঙ্গিনীগণের দিকে চাহিয়া একটু লজ্জিতা হইয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। বিশিষ্টার এক প্রবীণা প্রতিবেশিনী ইহা দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বিশিষ্টা! দেখ দুধের বাছার আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান রহিয়াছে, কিন্তু তুমি তাহা হারাইয়াছ।" বিশিষ্টা মিষ্টান্নের পাত্র দূরে রাখিয়া দিলেন এবং শঙ্করের জন্য প্রবীণার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া বলিলেন—"আপনারা তাই বলুন, আমার শঙ্কর যেন কর্ত্তব্যপথ হইতে কখন বিচলিত না হয়।"

বৃদ্ধার পরিহাসকে অঙ্গের আভরণ করিয়া লইয়া এইবার বিশিষ্টাদেবী শঙ্করকে বলিলেন—"বৎস! তোমার গুরু তোমায় প্রসন্নচিত্তে গৃহে আসিতে বলিয়াছেন ত? তিনি তোমায় প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন ত? তুমি কোনও দিন তাঁহার ত কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ কর নাই? অবশ্যপাঠ্য শাস্ত্রগুলি ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়াছ ত?"

শঙ্কর জননীর প্রশ্ন শুনিয়া বিনীত ও গম্ভীরভাবে বলিলেন—"হাঁ মা! গুরুদেব আমার উপর বড়ই অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তিনি তাঁহার পুত্র অপেক্ষাও আমায় অধিক ভালবাসিতেন। গুরুমা আমাকে পুত্র বলিয়াই সম্বোধন করিতেন, আমি সেখানে বড়ই সুখে ছিলাম,—একদিনের জন্যও কোন কষ্ট হয় নাই। আমার আসিবার সময় তাঁহারা উভয়েই কাঁদিয়া ফেলিলেন।"

শঙ্করের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই বিশিষ্টাদেবী বলিলেন—"বৎস! পরিচারিকা দ্বারা আমরা যে উপঢৌকন পাঠাইয়াছি, তাহা দেখিয়া তোমার গুরুদেব ও গুরুপত্নী কি বলিলেন? তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি?" শঙ্কর তদুত্তরে বলিলেন—"মা! তাঁহারা আমি বাটী যাইব বলিয়াই বিচলিত, আপনি কি দিয়াছেন তাহা আর ভাল করিয়া দেখিলেনও না। গুরুদেব পিতাঠাকুরের নাম করিয়া বলিলেন—'আহা! তাঁহার পত্নীর আবার দেওয়া কেন?' এই মাত্র।"

মাতা পুত্রে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে শঙ্করের সমাবর্ত্তনের বিষয় জানিতে পারিয়া পল্লীবাসী স্ত্রীপুরুষ আত্মীয়জনেরা

একে একে বিশিষ্টাদেবীর গৃহে আসিতে লাগিলেন। শঙ্করের অদ্ভুত প্রতিভা, অমানুষী শক্তির কথা কালাডি গ্রামের সকলেই শুনিয়াছিলেন, তাই আজ শঙ্করের গৃহাগমনে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই একটা বিস্ময়ের ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে করিতে শিবগুরুর বাটীতে আসিতেছেন। অনেকে আবার সাত বৎসরের ছেলের সমাবর্ত্তন শুনিয়া শঙ্করের বিদ্যার্জ্জন কিছুই হয় নাই ভাবিয়া তামাসা দেখিতে আসিতেছেন। কেহ ভাবিতেছেন, যাহার জন্য সাধারণতঃ অষ্টম বর্ষ হইতে চব্বিশ পঁচিশ বর্ষ পর্য্যন্ত গুরুগৃহে অবস্থান করিতে হয়, সেই বিদ্যা শঙ্করের আজ দুই বৎসর মধ্যে শেষ হইয়া গেল, ইহা কি কখন সম্ভব? দেখা যাউক ব্যাপারটা কি। কেহ ভাবিতেছেন, বিশিষ্টাদেবী নিশ্চয়ই পুত্রের মায়াতে অন্ধ হইয়া পুত্রের ভবিষ্যতের দিকে না চাহিয়া, গুরুগৃহ হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। এইরূপে দুই চারিজন পণ্ডিতও শঙ্করের বাটীতে আসিলেন। জ্ঞাতি ব্রাহ্মণগণ, যাঁহারা শিশুর জন্মের পূর্ব্বে শিবগুরুর বার্দ্ধক্য দেখিয়া তাঁহার বিষয়সম্পত্তি মনে মনে ভাগাভাগি করিতেছিলেন এবং শঙ্করের জন্মে যাঁহারা তাঁহার অকালমৃত্যু মনে মনে কামনা করিতেন, তাঁহারা শঙ্করের প্রতিভার কথা শুনিলেও বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না, তাঁহারা অনেকে পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিলেন, শঙ্করের বিদ্যার্জ্জন কিছুই হয় নাই। আজ তাঁহাদের ইচ্ছা হইতেছে, উপস্থিত পণ্ডিতগণ যদি একবার শঙ্করকে একটু পরীক্ষা করেন ত দেখা যায় ব্যাপারটা কি? এইরূপে নানাভাবে ভাবিত সমাগত ব্রাহ্মণগণকে শঙ্কর ও বিশিষ্টাদেবী পাদ্যার্ঘ্য দিয়া সমাদরপূর্ব্বক বসিবার স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সভা, তাহাতে আবার শঙ্করের সমাবর্ত্তনকালীন সভা, অনেকেই আবার শঙ্করের অদ্ভুত প্রতিভার কথাও শুনিয়াছেন, সুতরাং ব্যক্তিবিশেষে যে শঙ্করকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহিবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? সুতরাং অধিকক্ষণ অতীত হইবার পূর্ব্বেই একজন শিবগুরুর বন্ধু শঙ্করকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং কথায় কথায় তাঁহাকে দু একটী শাস্ত্রীয় প্রশ্ন করিলেন।

শঙ্কর পিতৃসখার পদধূলি লইয়া অতীব বিনীতভাবে তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন এবং প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। বৃদ্ধ শঙ্করের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া ক্রমে নানা জটিল বিষয়ের বিচারের অবতারণা করিলেন। বালক শঙ্কর একে একে কিন্তু সকলেরই সদুত্তর দিতে লাগিলেন বৃদ্ধের দেখাদেখি আরও দুই চারি জন নানা গ্রন্থের নানা স্থান হইতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। শঙ্কর সকলেরই উত্তর দিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ আলোচনার পর সকলেই বিস্মিত হইলেন, সকলেই শঙ্করকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সহিত দেখিতে লাগিলেন।

বিশিষ্টাদেবী নানা কর্ম্মের মধ্যেও দূর হইতে মধ্যে মধ্যে এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন এবং পুত্র সদুত্তর দেয় কিনা ভাবিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া পড়িতেছিলেন। কখন বা ব্যাকুলভাবে গৃহদেবতা কৃষ্ণের, কখন বা যাঁহার বরে শঙ্করের জন্ম সেই চন্দ্রমৌলির চরণে শঙ্করের জয়কামনা করিতেছিলেন। পুত্রস্নেহে বিশিষ্টাদেবী আজ ভুলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার শঙ্কর মানবশঙ্কর নহে। তাঁহার শঙ্কর যে সাক্ষাৎ সেই দেবাদিদেব মহাদেব তাহা আর তাঁহার মনে উদয় হইতেছে না। সেই সপ্তমবর্ষবয়স্ক, দীর্ঘদেহ, সুঠাম, স্থূলকায়, কনককান্তি, নবনীতকোমল বালক—সেই অজিনসূত্রকৌপীনধারী, ভস্মত্রিপুণ্ড্র লাঞ্ছিত, রুদ্রাক্ষ বিভূষিত বালব্রহ্মচারী যখন উন্নত-মস্তকে, অবনতদৃষ্টিতে গুরুজনের সমক্ষে শান্তগম্ভীরভাবে সহাস্যবদনে প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন, তখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শত্রুমিত্রউদাসীন সকলেই মধ্যে মধ্যে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িতেছিলেন। অনেকে মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ক্ষণকাল অতিবাহিত হইবার পর সমাবর্ত্তন কার্য্য সম্পাদনের জন্য বিশিষ্টাদেবী ব্রাহ্মণগণের অনুমতিপ্রার্থী হইলেন। সকলেরই যেন চমক ভাঙ্গিল, তাঁহারা শাস্ত্রবিচার শুনিতে শুনিতে কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিষয় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, সুতরাং সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া শঙ্করকে অশেষ আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিদায় দিলেন, এবং নিজ নিজ কর্ত্তব্য স্মরণ

করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে অনেকে পরস্পরে বলাবলি করিলেন, "এ ছেলে বাঁচিলে হয়", কেহ বলিলেন "যেমন বাপ তেমনি বেটা, আহা শিবগুরু আজ কোথায় ?" শত্রুভাবাপন্ন জ্ঞাতিগণ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নীরবে কে কোথা দিয়া সরিয়া পড়িলেন।

অতঃপর যথাবিধি শঙ্করের সমাবর্ত্তন কার্য্য সম্পন্ন হইল। পুরোহিতগণ দক্ষিণা লইয়া সানন্দিতমনে শঙ্করকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

মাতৃসমীপে থাকিয়াও শঙ্কর পূর্ব্বের ন্যায় ব্রহ্মচারীর নিয়মই পালন করিতে লাগিলেন। অধ্যয়ন, পূজাপাঠ এবং মাতৃসেবাই এখন শঙ্করের একমাত্র অনুষ্ঠেয় হইল। বালকোচিত খেলাধুলা বহুদিন হইতেই তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন, এখনও তাহারা আর ফিরিল না। সাত বৎসরের বালক গুরু বা পিতার শাসন মুক্ত হইলেন, এখনও তাহারা আর দেখা দিল না। নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিয়া তিনি যেটুকু সময় পাইতেন, তাহা পিতৃপিতামহের সংগৃহীত পুরাতন পুঁথিপত্র দেখিতেই ব্যয়িত করিতেন। শিবগুরুর দেহান্তের পর যে সব পুঁথিপত্র বিশিষ্টাদেবীর যত্নে কোনরূপে সংরক্ষিতমাত্র হইতেছিল, তাহারাই আজ বালক শঙ্করের খেলনা হইল। কত প্রাচীন পুঁথি, কত কালের কত মতের কত শাস্ত্রের পুঁথি, শঙ্কর একে একে দেখেন আর বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হন, আহার নিদ্রা ভুলিয়া যান এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশে প্রণিপাত করেন। নিকটবর্ত্তী বা দূরবর্ত্তী গ্রামবাসী যাঁহারা শঙ্করের অলোকসামান্য চরিত শুনিয়া দেখিতে আসিতেন—পণ্ডিত মূর্খ আবালবৃদ্ধবনিতা যাঁহারা শঙ্করকে দেখিতে আসিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে প্রায়ই পুস্তকপরিবৃত ব্যস্তসমস্ত একটী বালক দেখিয়া বিস্মিত হইয়া চলিয়া যাইতেন। যাঁহারা বিশেষ কৌতূহলী হইতেন, তাঁহারাই শঙ্করের সুমধুর বাণী শুনিয়া কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতেন। পণ্ডিতগণ শঙ্করের নিকট বিশেষ সমাদর পাইতেন। জিজ্ঞাসু বা বিচারার্থী শঙ্করের বিনীত ব্যবহার ও শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া নিতান্তই চমৎকৃত হইতেন। এইভাবে শঙ্কর গুরুগৃহ হইতে আসিয়া মাতৃসকাশে স্বগৃহে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

বিশিষ্ঠাদেবী প্রত্যহ প্রত্যুষে গ্রামস্থ পূর্ণা বা আলোয়াই নদীতে স্নান করিতে যাইতেন এবং পথিমধ্যে কৃষ্ণের পূজা করিয়া গৃহে ফিরিতেন। পুত্রের নিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহারও নিষ্ঠা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল কিন্তু ক্রমে বার্দ্ধক্যনিবন্ধন শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিল। সেই অসুস্থতা হেতু গমনে তাঁহার ক্লান্তি বোধ হইলেও তিনি প্রত্যহই নদী-স্নানে ও কুলদেবতার মন্দিরে গমন করিতেন। শরীরের কষ্ট তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, প্রতিবেশিনী বন্ধুবান্ধব নিষেধ করিলেও শুনিতেন না। যিনি তাঁহাকে নিষেধ করিতেন, তাঁহাকেই তিনি বলিতেন, "কেন ভাই, আসিও আমরা দুই জনে এক সঙ্গেই যাইব"। ফলতঃ, বিশিষ্ঠার কথা শুনিয়া কেহই আর বড় জিদ করিত না।

এইরূপে একদিন প্রাতঃকালে একটী প্রতিবেশিনীসহ বিশিষ্ঠাদেবী স্নানার্থ গমন করিলেন। সেদিন কিন্তু স্নানাহ্নিক সমাপ্ত করিয়া গৃহে ফিরিতে তাঁহাদের বড়ই বিলম্ব হইয়া গেল। মধ্যাহ্নের আতপতাপ প্রখরমূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই অবস্থায় দুই বৃদ্ধা গল্প করিতে করিতে বাটী ফিরিতেছেন। কিন্তু সেদিন এক দুর্ঘটনা ঘটিল। রৌদ্রতাপে পথিমধ্যে বিশিষ্ঠাদেবী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। প্রতিবেশিনী তাঁহার চোখে মুখে জল দিয়া সংজ্ঞা সম্পাদনের চেষ্টা করিলেন কিন্তু সংজ্ঞা আর হইল না। অগত্যা তিনি অতিশয় ভীত হইয়া পরিচিত এক ব্যক্তির দ্বারা শঙ্করকে সংবাদ পাঠাইলেন।

শঙ্কর জননীর এই অবস্থার কথা শুনিবামাত্র দ্রুতবেগে তাঁহার উদ্দেশে ধাবিত হইলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তৎসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁহার সংজ্ঞা হইয়াছিল। তথাপি শঙ্কর জননীর অবস্থা দর্শনে বড়ই বিচলিত হইলেন। তিনি ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে সেইস্থলেই জননীর যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন পূর্ব্বক তদীয় হস্তধারণ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিলেন এবং প্রতিবেশিনীর দ্বারা সেদিনের পাকাদি কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। নিষ্ঠাবতী বিধবার প্রাণ বড়ই কষ্টসহিষ্ণু হয়; বিশিষ্ঠাদেবী শীঘ্রই প্রকৃতস্থা

হইলেন এবং প্রতিবেশিনীর সহিত পাকাদি কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

এইবার শঙ্কর অবকাশ বুঝিয়া ধীরে ধীরে জননীর সমীপে আসিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে সেদিনকার ঘটনার কথা তুলিয়া জননীকে নদীস্নানে বিরত হইবার জন্য বহু অনুরোধ ও যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিশিষ্টাদেবী শঙ্করের এই ব্যাকুলভাব দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া সহাস্যবদনে পুত্রকে নানারূপে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন এবং নদীস্নানে কোনমতেই বিরত হইতে সম্মত হইলেন না। বিশিষ্টাদেবী ব্রহ্মনিষ্ঠাবতী বিধবা, তিনি কি জীবনের জন্য অনুষ্ঠানে অবহেলা করিতে পারেন? তপস্যা করিতে করিতে মৃত্যুই যাঁহাদের কামনা, তিনি কি প্রাণের মমতায় কর্ত্তব্যকর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইতে পারেন? সুতরাং শঙ্করের অনুরোধ ভাসিয়া গেল। বুদ্ধিমান শঙ্কর তখন বুঝিলেন জননী নদীস্নান পরিত্যাগ করিবেন না এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া অপরাহ্নের পূর্ব্বে জননীর আহারাদিও সম্পাদিত হইবে না। অগত্যা তিনি স্থির করিলেন যেমন করিয়া হউক নদীকে গৃহসমীপে আনয়ন করিতে হইবে নচেৎ জননীর কষ্টলাঘব অসম্ভব। স্থিরপ্রতিজ্ঞ, দৃঢ়সঙ্কল্প, সরলমতি শঙ্কর তখন জননীকে বলিলেন, "মা! আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না, কিন্তু দেখুন ভগবান্ আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া নদীকেই আমাদের বাটীর নিকট আনিয়া দিবেন। আমি নিশ্চয় বলিতেছি তিনি দয়া করিয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেনই করিবেন।" এই কথা বলিতে বলিতে বালক শঙ্করের চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। বিশিষ্টাদেবী শঙ্করকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ছি, বাবা! তুমি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্, বয়সে বালক হইলেও জ্ঞানে বালক নহ। তোমার এ ব্যাকুলভাব কেন? ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর যেন আমার মত হতভাগিনীর জীবন তাঁহার সেবা করিতে করিতেই শেষ হয়। তুমি বাঁচিয়া থাক, জগতের উপকার কর, তাহা হইলেই আমি ধন্য হইব। কষ্টের ভয়ে কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হওয়া কি মানুষের উচিত?"

জননীর এই কথায় শঙ্করের হৃদয় আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি জননীর পদধূলি লইয়া পুনরায় বলিলেন, "মা! আপনি আমার কথা শুনিলেন না, আচ্ছা দেখি ভগবান্ নদীকেই আমাদের কুটীর নিকট আনিয়া দেন কিনা? আপনার এ কষ্ট যেরূপেই হউক দূর করিতেই হইবে।"

বিশিষ্টা কিন্তু শঙ্করের এই কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া ফেলিলেন। কারণ, তিনি ভাবিলেন বিদ্যা থাকিলে কি হয়, বয়সের ধর্ম্ম যাইবে কোথায়। তিনি শঙ্করকে আর কিছু বলিলেন না, কেবল বলিলেন, "বাবা! ভগবানের দয়া হইলে কি না হয়, তাঁহার দয়ায় সবই সম্ভব।"

জননীর এই উপহাস কিন্তু শঙ্করের মর্ম্মস্পর্শ করিল। তিনি বিমর্ষভাবে নিজ পুস্তকাগারে আসিলেন। কিন্তু অন্যদিনের মত আর অধ্যয়নাদিতে নিরত না হইয়া গভীর চিন্তাকুলিত চিত্তে সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নদীপথে জননীর মূর্চ্ছার কথা শুনিবামাত্র যাইবার কালে গ্রন্থাদি যে ভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল সেই ভাবেই রহিল।

এই ভাবে অধিকক্ষণ অতিবাহিত হইতে না হইতেই পাককার্য্য সমাপ্ত হইল। শঙ্কর, বিশিষ্টা, প্রতিবেশিনী ও পরিচারিকা সকলেরই ভোজনকার্য্য একে একে সম্পন্ন হইয়া গেল। শঙ্কর জননীকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার পদসেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। শঙ্কর সন্ধ্যাস্নানের জন্য নদীতীরে গমন করিলেন। নদীতীরে আসিয়া তিনি একে একে যথাবিধি স্নানাহ্নিক সমাপন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে স্তবপাঠ করিতে করিতে ক্রমে ধ্যানস্থ হইয়া গেলেন। অপরাপর ব্রাহ্মণগণ, যাঁহারা একই উদ্দেশ্যে নদীতীরে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা শঙ্করের অদ্যকার একটু অস্বাভাবিক আচরণ দেখিয়া তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন ভাবিলেন, কিন্তু তাঁহাকে একাগ্রভাবে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া কেহ কিছু আর বলিলেন না, নিজ নিজ কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

ক্রমে রাত্রি হইল, শঙ্করের ধ্যান আর ভঙ্গ হইল না। কিন্তু সন্তানের কাতরতা জননী কতক্ষণ সহ্য করিতে পারেন? ভক্তের

আহ্বান কি কখন ব্যর্থ হয়? শঙ্করাবতার শঙ্কর আজ জননীর কষ্ট নিবারণের জন্য কৃতসঙ্কল্প, সুতরাং জগন্মাতা আর কি উদাসীন থাকিতে পারেন? তাঁহার আসন টলিল। সহসা শঙ্করের হৃদয়াকাশে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশিত হইল এবং ক্রমে যেন তাহা তাঁহার বাহ্যজগৎ পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিল। সত্ত্বরশ্মিসম্পাতে নির্ম্মল গগনে চন্দ্রোদয়ের ন্যায় শঙ্করের হৃদয়গগনে সেই জ্যোতিঃমধ্যে এক সমুজ্জ্বল মধুর মাতৃমূর্ত্তি প্রকটিত হইলেন এবং তৎপরেই শঙ্করের কর্ণে ধ্বনিত হইল; "বৎস! অচিরে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে, শীঘ্র নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইবে।"

বাক্য শেষ হইতে হইতেই কিন্তু সেই মাতৃমূর্ত্তিও অন্তর্হিতা হইলেন।

এই অভাবনীয় দর্শনে শঙ্করের হৃদয়ে কি ভাবের উদয় হইল তাহা বুঝিবার সময় এখনও তাঁহার আসে নাই। বালক শঙ্কর আনন্দ ও বিস্ময়ে বিহ্বলপ্রায় হইয়া নদীতীরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ও শরীর লুণ্ঠিত করিতে লাগিলেন। অবিরল অশ্রুধারায় তাঁহার হৃদয় ও ধরণী অভিসিক্ত হইল।

এদিকে বিশিষ্টাদেবী, সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেল অথচ শঙ্কর গৃহে আসিতেছেন না দেখিয়া উদ্বিগ্না হইলেন। স্নানান্তে সকলেই শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে আসেন ভাবিয়া তিনি পুত্রান্বেষণে পরিচারিকাকে মন্দিরে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তথারও শঙ্করের কোনও সন্ধান পাইলেন না। সহসা তাঁহার মনে অপরাহ্ণের ঘটনার কথা স্মরণ হইল। তিনি তখন ব্যস্তভাবে পরিচারিকাকে নদীতীরে যাইতে বলিলেন।

পরিচারিকা নদীতীরে আগমন করিয়া শঙ্করকে লুণ্ঠিততনু দেখিল। অগত্যা সে একটু দূরে দণ্ডায়মান রহিল, ভাবিল শঙ্কর উত্থিত হইলেই তাঁহাকে ডাকিবে। কিন্তু এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হইতে লাগিল, শঙ্করের উঠিবার কোন লক্ষণই নাই। কিন্তু এ ভাব আর অধিকক্ষণ থাকিল না। জননীর উৎকণ্ঠা, পরিচারিকার উদ্বেগ শঙ্করের অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনোরাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার চিত্তে বিক্ষেপ উৎপাদন করিল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখে কে যেন

দণ্ডায়মান। তখন তিনি একটু ব্যস্তভাবে গাত্রোত্থান করিলেন। কিন্তু অপেক্ষাকারিণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই পরিচারিকা অভিভাবকের স্বরে বলিয়া উঠিল, "শঙ্কর! তুমি এত রাত্রে এখানে কি করিতেছ? তোমার মা যে ভাবিয়া সারা হইলেন।"

শঙ্কর পরিচারিকাকে কোন কথা না বলিয়া কেবল মাত্র বলিলেন, "হাঁ চল বাটী যাই।" পরিচারিকার ইচ্ছা হইয়াছিল শঙ্করকে দুটা মিষ্ট কথা শুনাইবে, কিন্তু তাঁহার ভাব দেখিয়া আর কিছুই বলা হইল না।

বালক শঙ্কর অশ্রুবিগলিতনেত্রে দেবমন্দিরে আসিলেন এবং যথারীতি প্রণামাদি করিয়া মাতৃসকাশে উপস্থিত হইলেন। বিশিষ্টা শঙ্করকে দেখিয়া যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন। একমাত্র বালক পুত্র নদীতে স্নানাহ্নিক করিতে গিয়া ফিরিতেছে না, অসম্ভব বিলম্ব করিতেছে, ইহাতে জননীর মনে কি বোধ হয় তাহা বুদ্ধিমান্ শঙ্কর এতক্ষণে বুঝিলেন। তিনি জিজ্ঞাসিত হইবার পূর্ব্বেই জননীর পদধূলি লইয়া বলিলেন, "মা ভগবতীর কৃপা হইয়াছে, আপনাকে আর কষ্ট করিয়া নদীতীরে যাইতে হইবে না।"

জননী পুত্রকে কিছু তিরস্কার করিবেন ভাবিয়াছিলেন কিন্তু শঙ্করের এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বাবা! কি বলিতেছ, কেন আমার কি শেষদশা উপস্থিত জানিতে পারিয়াছ?

শঙ্কর তখন ভগবানের উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া ভক্তি-গদগদচিত্তে বলিলেন, "মা, নদীই আমাদের বাটীর নিকট আসিবে। আপনাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না।" জননীর বিস্ময়ের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি একবার ভাবিলেন, "বাছা ছেলেমানুষ—সাত বৎসরের বালক, আর কত জ্ঞান হইবে, কি বলিতেছে দেখ!" কিন্তু পরক্ষণেই পুত্রের অসাধারণ চরিত্রের কথা মনে পড়িল। তিনি তখন জিজ্ঞাসুর ভাবে পুত্রকে বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা কি বলিতেছ? নদী আসিবে কি?"

তখন শঙ্কর একে একে সকল কথাই প্রকাশিত করিলেন। ভগবতীর দর্শন, দৈববাণী—সকল কথাই বলিলেন।

ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য কি

(মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্বপ্রবন্ধে সূত্রার্থ তাৎপর্য্য নির্ণয়ের জন্য পাঁচ প্রকার পরীক্ষা কথিত হইয়াছে। পরন্তু তন্মধ্যে 'অন্তরঙ্গ-পরীক্ষা' নামে যে উপায়টী উক্ত হইয়াছে তাহা যদি আমরা প্রথমে আলোচনা করি তবে অন্যান্য পরীক্ষার কোন উপযোগিতা থাকে না। কারণ, সূত্রের পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া যে একটী মত স্থির করা হইবে, তাহাই সূত্রকারের অভিমত বলিয়া গৃহীত হইলে তাহার উপর কোন আপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং অপর সেই সকল উপায়ের কোন আবশ্যকতা থাকে না। এই হেতু আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে কোন্ মতটী যুক্তিসিদ্ধ তাহাই স্থির করিব; পশ্চাৎ সেই মতটী সূত্র হইতে নির্গত হয় কিনা তাহা আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ দেখা যায় বিদ্বৎ-সমাজে সর্ব্বশুদ্ধ সংঘাতবাদ, আরম্ভ-বাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ নামক চারিটী বাদ প্রসিদ্ধ আছে। তাহার মধ্যে সংঘাতবাদটী বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন, আরম্ভবাদটী নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন, পরিণামবাদটী সাংখ্য পাতঞ্জল ও মীমাংসক স্বীকার করেন এবং বিবর্ত্তবাদ শাঙ্কর সম্প্রদায় স্বীকার করেন। শঙ্করাচার্য্য ভিন্ন যাঁহারা বেদান্তের ব্যাখ্যাতা হইয়াছেন তাঁহারা উপরি উক্ত কোন না কোন মতবাদের অন্তর্গত হইয়া থাকেন। অবশ্য সংঘাতবাদটী কেহই বেদান্তের মত বলিয়া স্বীকার করেন না।

ইহাদের মধ্যে সংঘাতবাদে বলা হয়, তন্তু-সমুদায়াত্মকই পট। পট ও তন্তুরমধ্যে কোন ভেদ নাই অর্থাৎ অত্যন্ত অভেদই বিদ্যমান। যাহা তন্তুসমষ্টি তাহাই পট। অন্যকথায় ইঁহাদের মতে কার্য্য ও কারণের মধ্যে কোন ভেদই নাই।

এই পক্ষে ভেদব্যবহারের বিলোপ ঘটে। এ জন্য ন্যায়বৈশেষিক মতাবলম্বিগণ কার্য্যকারণের অত্যন্ত ভেদ স্বীকারপূর্ব্বক নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন।

কিন্তু এই ন্যায় মতেও মৃদ্‌ঘট, সুবর্ণকুণ্ডল ইত্যাদিরূপে কার্য্য-কারণের অভেদপ্রতীতির বাধ হইয়া যায়। যেহেতু কারণ এবং কার্য্য যদি ভিন্নই হয় তবে অভেদ কোনরূপই থাকিতে পারে না। সুতরাং যাহা সুবর্ণ তাহাই কুণ্ডল হইয়া যায়, অথবা, যাহা মৃত্তিকা তাহাই ঘট হইয়া উঠে; এইরূপ লোকমধ্যে আপামরসাধারণ কার্য্য এবং কারণের যে অভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা কোনরূপে উপপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু মৃত্তিকার যে কোন কার্য্যেই হউক না কেন সর্ব্বত্রেই মৃত্তিকার অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে। যেমন মৃৎকপাল অর্থাৎ কপালটী মৃত্তিকাই, মৃৎচূর্ণ শব্দে চূর্ণটী মৃত্তিকাই, মৃদ্‌ঘট বলিতে ঘটটী মৃত্তিকাই, মৃৎপিণ্ড শব্দে পিণ্ডটী মৃত্তিকাই। এইরূপ যে কার্য্যকারণের অভেদ ব্যবহার তাহার উপপত্তি ন্যায়-বৈশেষিক-সম্মত অত্যন্তভেদবাদে কোন মতেই হইতে পারেন। এইরূপ সুবর্ণকুণ্ডলাদি স্থলেও বুঝিতে হইবে।

এইরূপ অনুপপত্তি দেখিয়া পরিণামবাদী বলেন যে, যেহেতু উভয়বিধ ব্যবহার দেখা যায়, অর্থাৎ ভেদব্যবহার এবং অভেদ ব্যবহার এই উভয়ই যখন দৃষ্ট হইতেছে, তখন কার্য্য ও কারণের মধ্যে অত্যন্ত ভেদও নাই অত্যন্ত অভেদও নাই, কিন্তু ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে। যেহেতু প্রতীতি অনুসারে প্রতীতির উপপত্তির জন্য যদি কল্পনা করা আবশ্যক হয় তবে যেরূপে সেই প্রতীতির উপপত্তি হইতে পারে সেইরূপেই কল্পনা করাই উচিত। এখন, প্রতীতি যখন ভেদাভেদ এই উভয়রূপেই হইতেছে, তখন ভেদাভেদই কল্পনা করা উচিত অর্থাৎ কার্য্য ও কারণে একইকালে ভেদও আছে এবং অভেদও আছে। ইহাই হইল পরিণামবাদীর সিদ্ধান্ত।

কিন্তু একথাটীও বিবর্ত্তবাদী স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, প্রতীতির উপপত্তির জন্য যদি উভয়ই স্বীকার করা

যায় তবে অনুপপত্তি তদবস্থায়ই থাকে। কারণ, অনুপপত্তি বিরুদ্ধ স্থলেই ঘটিয়া থাকে এবং ভেদ ও অভেদ ইহারা যে পরস্পর বিরুদ্ধ তাহা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং ইহাদের উভয়ই একস্থলে কিরূপে থাকিতে পারে? অতএব বলিতে হইবে যে, কার্য্য কারণ হইতে বাস্তব ভিন্নও নহে এবং বাস্তব অভিন্নও নহে, কিন্তু অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ কোন রূপেই ইহার নির্ব্বচন করা যায় না। কার্য্যকে কারণ হইতে ভিন্ন বলিলেও দোষ, অভিন্ন বলিলেও দোষ। অগত্যা বলিতে হয়, কার্য্যকারণভাবটী মিথ্যা। এই মিথ্যা শব্দ ও অনির্ব্বচনীয় শব্দ একার্থক। তাৎপর্য্যই এই যে, বস্তু যেরূপে ভাসমান হইতেছে সেই রূপটী বাস্তব নহে কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ তদ্রূপ দেখা যাইতেছে। যেমন শুক্তিকাতে রজত না থাকিলেও রজতবুদ্ধি হইয়া থাকে, তদ্রূপ কার্য্যকারণাত্মক জগৎ বস্তুতঃ অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মচৈতন্যে না থাকিলেও সেইরূপ প্রতীতি হইতে থাকে। ইহাই হইল অনির্ব্বচনীয়বাদ বা বিবর্ত্তবাদ।

এই মতের প্রচার যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন তাহা আগ্রহ কিংবা ভ্রান্তির ফল নহে। কারণ, যাঁহারা বস্তুতত্ত্বের গবেষণা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর তাঁহাদের সকলকেই পরিশেষে এই মতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। যে কোন বাদীই পদার্থবিচারণায় প্রবৃত্ত হইয়া কিছুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াই শেষে কুণ্ঠিত হইয়া যান। এই জন্য বিদ্যারণ্য স্বামী বলিয়াছেন—

"অজ্ঞানং পুরতস্তেষাং ভাতি কক্ষাসু কাসুচিৎ।"

অর্থাৎ কতক কক্ষা পর্য্যন্ত বিচারের পর তাঁহারা আর পথ খুঁজিয়া পান না; পরিশেষে বলিতে বাধ্য হন, ইহার পর আর আমরা জানি না। এই কথাটী বাস্তবিক অতীব যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়।

ইহার কারণের প্রতি যদি দৃষ্টি করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে, যাঁহারা দ্বৈতবাদী তাঁহারা কোনরূপে পদার্থের নির্ব্বচন করিতে পারেন না। দেখুন, সংসারে যাহা কিছু বস্তুমাত্র দেখা যাইতেছে তৎসমস্তই

পরস্পরসাপেক্ষরূপে প্রতিভাত হয়। নিরপেক্ষ পদার্থ কিছুই প্রতিভাত হয় না। যেমন সুখ-দুঃখ, কার্য্য-কারণ, ছায়া-আতপ, জ্ঞান-অজ্ঞান, অস্তি নাস্তি, ভাব-অভাব। এইরূপে যাহা কিছু আছে সবই পরস্পরসাপেক্ষ; অর্থাৎ ভাব পদার্থকে বুঝিতে হইলে অভাব জ্ঞানের প্রয়োজন এবং অভাবকে বুঝিতে হইলে ভাবপদার্থের প্রয়োজন। আর ভাবাভাবাতিরিক্ত কোন পদার্থই নাই। দেখুন না কেন, জগতে সুখ বলিয়া কোন জিনিষ যদি না থাকিত তাহা হইলে দুঃখকে কি কেহ দুঃখ বলিয়া মনে করিত? অথবা দুঃখ যদি না থাকিত, তাহা হইলে সুখকে কি কেহ সুখ বলিয়া মনে করিত? অথবা যেমন আতপতপ্ত হইলে ছায়া দ্বারা তাহার সুখ হয় এবং ছায়া দ্বারা আতপের দুঃখানুভব হয়। এই দুই পদার্থের মধ্যে যদি কোন একটী না থাকে তবে অপরটীরও অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং যাবতীয় পদার্থ পরস্পরসাপেক্ষ।

যেখানে পরস্পরসাপেক্ষতা থাকে সেখানে কোন বস্তুরই স্বরূপনির্ণয় হয় না। ইহারই নাম অন্যোন্যাশ্রয় দোষ। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী গল্প বলা যাইতে পারে—একজন রাস্তা দিয়া একটী ঘোড়া লইয়া যাইতেছিল। তাহাকে জনৈক লোক জিজ্ঞাসা করিল, 'এ ঘোড়াটী কাহার?' তাহাতে সে উত্তর দিল—'আমি যাঁহার ভৃত্য এ ঘোড়া তাঁহারই'। পুনরায় লোকটী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি কাহার ভৃত্য?' তাহাতে সে উত্তর দিল—'যাঁহার আমি ভৃত্য।' এইরূপে সারাদিন ধরিয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করিলেও ঘোড়ার স্বামী যে কে তাহা যেরূপ নিরূপিত হয় না সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও বুঝিতে হইবে। সকল পদার্থ যেহেতু পরস্পরসাপেক্ষ সেই হেতু অন্যোন্যাশ্রয় দোষদুষ্ট, সুতরাং কাহারও অস্তিত্ব নাই, ইহাই বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে। যত বাদী আছেন তাঁহারা সকলেই কার্য্যকারণভাবটীকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ মতের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল পুষ্টিসাধনের মূলীভূত কার্য্যকারণভাবটীরই যদি নির্ব্বচন না হয় তবে কোন বস্তুরই নির্ব্বচন হইতে পারে না। সেই কার্য্যকারণভাবটীও যখন পরস্পরসাপেক্ষ তখন তাহাকে অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত পদার্থ

সিদ্ধ করা হয় তাহারাও অসিদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু কারণ এবং কার্য্য এই দুইটী যে পরস্পরসাপেক্ষ ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু কার্য্যের দৃষ্টিতে কারণের কারণত্ব এবং কারণের দৃষ্টিতে কার্য্যের কার্য্যত্ব; অর্থাৎ কারণের দৃষ্টি না থাকিলে কার্য্য কাহার হইবে? এবং কার্য্যের দৃষ্টি না থাকিলে কারণই বা কাহার হইবে? সুতরাং কারণের অপেক্ষাতে কার্য্যের সত্তা এবং কার্য্যের অপেক্ষাতে কারণের সত্তা। অতএব কার্য্যকারণভাবটী যখন অনির্ব্বচনীয় হইল তখন কার্য্যকারণভাবাত্মক জগৎও অনির্ব্বচনীয়।

যাঁহারা দ্বৈতকে সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের মতেও কার্য্যকারণতত্ত্বের বাস্তব নির্ব্বচন করা অসম্ভব। এই কার্য্যকারণ তত্ত্বের নির্ব্বচন নৈয়ায়িকগণ করিয়াছেন। এই নৈয়ায়িক নির্ব্বাচিত কার্য্যকারণতত্ত্বকে গ্রহণ করিয়াই অন্য সকল বাদী নিজ নিজ কার্য্য সাধন করেন। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যকারণতত্ত্বের নির্ব্বচন কেন হইতে পারে না তাহা দেখা যাউক।

নৈয়ায়িক গ্রন্থে কারণত্বের নির্ব্বচন করিবার প্রসঙ্গে কাহাকে কার্য্য বলা যাইতে পারে এবং কাহাকেই বা কারণ বলা যাইতে পারে তাহা বলা হইয়াছে—যাহার সত্তায় পরক্ষণে কার্য্য জন্মায় এবং যাহা না থাকিলে পরক্ষণে কার্য্য হয় না তাহাই তাহার কারণ। যেমন, দণ্ড থাকিলে পরক্ষণে ঘটের উৎপত্তি হয়, তাহা না থাকিলে ঘটের উৎপত্তি হয় না; অতএব দণ্ডটী ঘটের কারণ। অর্থাৎ দণ্ডের কারণত্ব জিনিষটী এই যে, ঘটের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে থাকা। ইহাই যদি কারণত্বের নির্ব্বচন হইল তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যেখানে দণ্ড থাকিবে সেইখানে 'দণ্ডত্ব' (দণ্ডের ধর্ম্ম) এবং 'দণ্ডরূপ'ও (দণ্ডের রূপ) থাকিবে। সুতরাং তাহারাও কেন ঘটের কারণ না হইবে? যেহেতু, ঐ দুইটীতেও ঘটের অব্যবহিতপূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ব রহিয়াছে।

এই আপত্তির উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন যে, কেবল কার্য্যের পূর্ব্বে থাকিলেই তাহা যে কারণ হইবে তাহা আমরা বলি না। কিন্তু অন্যথা-সিদ্ধ না হইয়া যে অব্যবহিতপূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ব তাহাই কারণত্ব। 'দণ্ডত্ব'

এবং 'দণ্ডরূপে' অব্যবহিতপূর্ব্বক্ষণবৃত্তিত্ব থাকিলেও অন্যথাসিদ্ধিশূন্যত্ব থাকে না। সুতরাং 'দণ্ডত্ব' বা 'দণ্ডরূপ' ঘটের কারণ নহে যেহেতু তাহারা অন্যথাসিদ্ধ।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে যে, অন্যথাসিদ্ধত্ব জিনিষটা কি?—অন্যথাসিদ্ধত্ব কাহাকে বলে অনন্যথাসিদ্ধত্বই বা কাহাকে বলে? ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলিয়া থাকেন যে, যাহা 'অবশ্যকল্প্ত-নিয়তপূর্ব্ববৃত্তি' তাহাই অনন্যথাসিদ্ধ, তদ্ভিন্ন সমুদয়ই অন্যথাসিদ্ধ। যেমন, মৃৎ, দণ্ড, ও চক্রাদি ব্যতীত ঘটের উৎপত্তি অসম্ভব, কিন্তু মৃদ্বাহী গর্দ্দভ না থাকিলে ঘটের উৎপত্তি হয় না এরূপ নহে। সুতরাং মৃৎ দণ্ড চক্রই একান্ত আবশ্যক—গর্দ্দভটী একান্ত আবশ্যক নহে। অতএব আবশ্যক্লিপ্তনিয়তপূর্ব্ববৃত্তি হইল মৃৎ, দণ্ড, চক্র—গর্দ্দভটী নহে। গর্দ্দভের দ্বারা আনীত মৃত্তিকা হইতে ঘট প্রস্তুত হয় বটে কিন্তু মৃত্তিকা আনয়ন অন্যরূপেও হইতে পারে। অতএব গর্দ্দভটী হইল অন্যথাসিদ্ধ।

(ক্রমশঃ)

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

(অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অনন্তর বিদেহমুক্তের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে:—

জীবন্মুক্তপদং ত্যক্ত্বা স্বদেহে কালসাৎকৃতে*
বিশত্যদেহমুক্তত্বং পবনোঽস্পন্দতামিব॥১৪।

কালবশে (প্রারব্ধক্ষয়ে) শরীর বিনষ্ট হইলে পর (জীবন্মুক্ত ব্যক্তি) জীবন্মুক্তপদ পরিত্যাগ করিয়া, পবন যেরূপ নিস্পন্দভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিদেহমুক্ত ভাব প্রাপ্ত হন। যে প্রকার

* পাঠান্তর—'দেহে কালবশীকৃতে'।

বায়ু কোন সময়ে চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ মুক্তাত্মা উপাধিজনিত সংসার পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থান করেন।

"বিদেহমুক্তো নোদেতি নাস্তমেতি ন শাম্যতি।
ন সন্নাসন্ন দূরস্থো ন চাহং নচ নেতরঃ ॥১৫।

বিদেহমুক্তের উদয় নাই, অস্তগমন নাই, তাঁহাকে শান্ত হইতে হয় না, তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন, তিনি দূরস্থ নহেন (এবং নিকটস্থও নহেন), তিনি অহংও নহেন, আর কিছুও নহেন।

'উদয়' ও 'অস্তমন' শব্দে হর্ষ ও বিষাদ বুঝিতে হইবে। শান্ত হইতে হয় না—অর্থাৎ হর্ষবিষাদ পরিত্যাগ করিতে হয় না, কারণ তাঁহার লিঙ্গদেহ এই স্বকারণীভূত পরমাত্মাতেই বিলীন হইয়া যায় অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়। (১)

"সৎ"—শব্দে জগতের কারণ যে অবিদ্যোপাধিক প্রাজ্ঞ (জীব) এবং মায়োপাধিক ঈশ্বর, বিদেহমুক্ত এতদুভয়ের কিছুই নহেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। অসৎশব্দে বুঝিতে হইবে তিনি (কার্য্যরূপ) "ভূত" বা "ভৌতিক" কিছুই নহেন।

"ন দূরস্থঃ", এই কথার দ্বারা বলা হইল তিনি মায়ার অতীত নহেন। "ন চ"—এই দুই শব্দের দ্বারা বলা হইল যে তিনি স্থূলভুকের সমীপস্থ অর্থাৎ শব্দাদি স্থূলবিষয়ের ভোক্তা বৈশ্বানরের নিকটস্থ (প্রবিবিক্তভুক্ তৈজস এবং আনন্দভুক্ প্রাজ্ঞও) নহেন, অর্থাৎ কোনও প্রকার মায়ার সংস্পৃষ্ট নহেন। (২)

"ন অহং চ"—অর্থাৎ তিনি "সমষ্টি"ও (৩) নহেন, "ন ইতরঃ চ"—অর্থাৎ তিনি ব্যষ্টিও (৪) নহেন।

(১) এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপ, ৩।২।১১ এবং মুণ্ডক উপ, ৩।২।৭ দ্রষ্টব্য।

(২) এই প্রসঙ্গে মাণ্ডুক্যোপনিষদের ৩, ৪, ৫ মন্ত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(৩) তিনি আপনাকে স্থূলউপাধিসমষ্টির অভিমানী বিরাট্, সূক্ষ্মউপাধিসমষ্টির অভিমানী হিরণ্যগর্ভ এবং কারণউপাধিসমষ্টির অভিমানী ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না।

(৪) তিনি আপনাকে ব্যষ্টি স্থূল-উপাধির অভিমানী বিশ্ব, ব্যষ্টি সূক্ষ্ম উপাধির

মোটকথা, তাঁহাতে ব্যবহারযোগ্য কোনও প্রকার বিকল্প বা মিথ্যা কল্পনা নাই।

ততঃ স্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম্।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎকিঞ্চিদবশিষ্যতে ॥৪৭।

তদনন্তর স্থিরগম্ভীর, কি এক প্রকার (অনির্ব্বচনীয়) সৎবস্তু অবশিষ্ট থাকে, তাহা না জ্যোতিঃ, না অন্ধকার, তাহার নাম নাই, তাহার রূপ নাই।

জীবন্মুক্তি যে পরিমাণে এইপ্রকার বিদেহমুক্তির সাদৃশ্যলাভ করে, সেই পরিমাণেই তাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়, ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে জীবন্মুক্তিতে যে পরিমাণে নির্ব্বিকল্পতার আতিশয্য হইয়া থাকে, তাহা সেই পরিমাণে উত্তম হইয়া থাকে।

গীতার 'স্থিতপ্রজ্ঞ'

ভগবদ্গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে "স্থিতপ্রজ্ঞঃ" এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে—

অর্জ্জুন উবাচ—

"স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪।

হে কেশব (সমাহিত) স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? (ব্যুত্থিত) স্থিতপ্রজ্ঞ কি প্রকার কথা কহিয়া থাকেন, কি প্রকারে উপবেশন করেন এবং কি প্রকারে গমন করেন।

'প্রজ্ঞা' শব্দের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান। তাহা দুইপ্রকার; স্থিত ও অস্থিত। যেমন, যে নারী উপপতির প্রতি অনুরক্তা তাহার বুদ্ধি সকল প্রকার ব্যবহার কার্য্যে উপপতিকেই ধ্যান করিয়া থাকে, (এবং সেই নারী) যে সকল গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে তাহা (চক্ষুরাদি) প্রমাণ দ্বারা স্বয়ং উপলব্ধি করিলেও যেমন

অভিমানী তৈজস ও ব্যষ্টি কারণ (অজ্ঞান) উপাধির অভিমানী প্রাজ্ঞ বলিয়া মনে করেন না।

তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া যায়, সেইরূপ যিনি পরবৈরাগ্য লাভ করিয়াছেন এবং যোগাভ্যাসে পটুতালাভ করিয়া চিত্তকে অত্যন্ত বশে আনিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাঁহার বুদ্ধি (সেই নারীর) উপপতিচিন্তার ন্যায় নিরন্তর তত্ত্বেরই ধ্যান করিয়া থাকে। তাহাই এই (শ্লোকোক্ত) স্থিতপ্রজ্ঞান। যাঁহার উক্ত (পরবৈরাগ্য, যোগাভ্যাসপটুতা প্রভৃতি) গুণ নাই, তাঁহার যদি কোনও সময়ে কোনও বিশেষ পুণ্যবলে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে সেই নারীর গৃহকর্ম্মবিস্মৃতির ন্যায় তাঁহারও সেইক্ষণেই তত্ত্ববিস্মৃতি ঘটে। তাহাই উক্ত অস্থিত প্রজ্ঞান। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বসিষ্ঠ দেব কহিয়াছেন—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাঽপি গৃহকর্ম্মণি।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্॥
এবং তত্ত্বে পরে শুদ্ধে ধীরো বিশ্রান্তিমাগতঃ।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্বহির্ব্যবহরন্নপি॥*

(উপশম প্রকরণ—৭৪।৮৩।৮৪)

পরপুরুষানুরক্তা নারী গৃহকর্ম্মে অত্যন্ত ব্যাপৃতা হইলেও হৃদয়াভ্যন্তরে সেই (পূর্ব্বাস্বাদিত) পরপুরুষসঙ্গজনিত আনন্দই আস্বাদন করিতে থাকে। সেইরূপ যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, সেই বিশুদ্ধ শ্রেষ্ঠতত্ত্বে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন, তিনি বাহ্যব্যবহারে ব্যাপৃত থাকিলেও সেই (পরম) তত্ত্বই আস্বাদন করিতে থাকেন।

স্থিতপ্রজ্ঞ আবার কালভেদে দুইপ্রকার; সমাহিত ও ব্যুত্থিত এই উভয় প্রকার স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ অর্জ্জুন উক্ত শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে এবং উত্তরার্দ্ধে যথাক্রমে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

* মূলের পাঠঃ—

"ন শক্যতে চালয়িতুং দেবৈরপি সবাসবৈঃ" ।—ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবগণও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারেন না। উদ্ধৃত শ্লোকের শেষার্দ্ধ বোধ হয় বিদ্যারণ্য মুনিবিরচিত।

সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষা কি? অর্থাৎ সকললোকে কীদৃশ লক্ষণবাচক শব্দের দ্বারা সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞকে বর্ণনা করিয়া থাকে? (আর) ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ কি প্রকার বাগ্‌ব্যবহার করিয়া থাকেন? তাঁহার উপবেশন, গমন মূঢ় ব্যক্তিদিগের উপবেশন ও গমন হইতে কি প্রকারে পৃথক্?

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥৫৫

হে পার্থ, যখন (লোকে) মনোগত সকল কামই পরিত্যাগ করে এবং আপনাতে আপনিই সন্তুষ্ট হইয়া অবস্থান করে (তখন) তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে।

কাম ত্রিবিধ—যথা বাহ্য, আন্তর, এবং বাসনামাত্ররূপ। যে মিষ্টান্নাদি উপার্জ্জিত হইয়াছে তাহাই বাহ্য কাম, যে মিষ্টান্নাদির প্রাপ্তির আশা আছে তাহা আন্তর কাম। পথস্থিত তৃণাদির ন্যায় যাহা আপাততঃ (সামান্যভাবে) জ্ঞাত হইয়া সংস্কাররূপে মনে অবস্থান করে তাহা বাসনারূপ কাম। যিনি সমাহিত হন তাঁহার সকল প্রকারেরই চিত্তবৃত্তির বিনাশ হওয়াতে, তিনি উক্ত তিন প্রকার কামই পরিত্যাগ করেন। (তথাপি) তাঁহার (এক প্রকার) সন্তোষ আছে, তাহা তাঁহার মুখের প্রসন্নতারূপ চিহ্ন দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এবং সেই সন্তোষ (পূর্ব্বোক্ত কোনওরূপ) কাম-বিষয়ক নহে কিন্তু আত্মবিষয়ক; কেননা তিনি সকল প্রকার কাম পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার বুদ্ধি পরমানন্দরূপা হইয়া আত্মার অভিমুখী হইয়াছে। এবং সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যেমন মনোবৃত্তি আত্মানন্দকে অঙ্কিত করিয়া দেখায় এস্থলে সেরূপ নহে, এস্থলে স্বপ্রকাশ চিৎস্বরূপেই (সেই) আত্মানন্দ প্রকাশিত হইয়া থাকে। (এই) সন্তোষ, (চিত্তের) বৃত্তিরূপ নহে, ইহা সেই বৃত্তির সংস্কারস্বরূপ। এই প্রকার লক্ষণবাচক শব্দসমূহের দ্বারা সমাধিস্থ ব্যক্তির বর্ণনা হইয়া থাকে।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥৫৬।

যিনি দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে অনুদ্বিগ্নচিত্ত থাকেন, সুখের কারণ উপস্থিত হইলে স্পৃহাশূন্য হইয়া থাকেন, এবং আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধ বিরহিত, তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি কহে।

দুঃখ—আসক্তি প্রভৃতি কারণ হইতে উৎপন্ন, রজোগুণের বিকাররূপ সন্তাপস্বরূপ প্রতিকূল চিত্তবৃত্তিকে দুঃখ বলে।

উদ্বেগ—সেই দুঃখ উপস্থিত হইলে "আমি পাপী, দুরাত্মা আমাকে ধিক্" এইরূপ অনুতাপাত্মক এবং তমোগুণের বিকার বলিয়া—ভ্রান্তিরূপ যে চিত্তবৃত্তি তাহাকে উদ্বেগ বলে। যদিও এই উদ্বেগ দেখিলে ইহাকে বিবেক বলিয়া মনে হয় তথাপি ইহা যদি পূর্ব্বজন্মে হইত, তাহা হইলে সেই পাপ প্রবৃত্তির নিবর্ত্তক হইয়া সার্থক হইতে পারিত, এখন কিন্তু ইহা নিরর্থক, এইহেতু ইহা ভ্রমমাত্র—এইরূপে বুঝিতে হইবে।

সুখ—রাজ্যলাভ, পুত্রলাভ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন সাত্ত্বিক, প্রীতিরূপ, অনুকূল চিত্তবৃত্তিকে সুখ বলে।

স্পৃহা—সেই সুখ উৎপন্ন হইলে, ভবিষ্যতে সেইরূপ সুখ, তদুৎপাদক পুণ্য অনুষ্ঠিত হইয়া না থাকিলেও, আবার হইবে, এইরূপ বৃথা আশা করার নাম স্পৃহা। ইহা একটি তামসিক বৃত্তি।

যেহেতু প্রারব্ধ কর্ম্মই সুখদুঃখকে আনিয়া উপস্থিত করে এবং ব্যুত্থিতচিত্ত ব্যক্তিরই চিত্তে বৃত্তি থাকে, সেইহেতু ব্যুত্থিতচিত্ত ব্যক্তিরই সুখদুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিবেকী ব্যক্তির পক্ষে কিন্তু উদ্বেগ বা স্পৃহার সম্ভাবনা নাই। সেই প্রকার আসক্তি, ভয়, ক্রোধ তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া (সমাধিস্থ ব্যক্তির) কর্ম্ম ইহাদিগকে আনিয়া উপস্থিত করে না সেইহেতু সমাধিস্থ ব্যক্তির ভয়, আসক্তি, ক্রোধ নাই। এই সকল লক্ষণের দ্বারা পরিচিত হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি নিজের অনুভব প্রকাশ করিয়া শিষ্যশিক্ষার নিমিত্ত উদ্বেগশূন্যতা, নিস্পৃহতাদির বোধক বাক্য

সকল বলিয়া থাকেন। (ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞব্যক্তির ভাষণ প্রকার) ইহাই শ্লোকের অভিপ্রায়।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৭॥

যাঁহার কোন বস্তুতে স্নেহ নাই, এবং যিনি লোকপ্রসিদ্ধ শুভ বস্তু সকল পাইয়া তাহাদিগকে অভিনন্দন করেন না বা সেইরূপ অশুভ বস্তু সকল পাইয়া তাহাদিগের প্রতি দ্বেষ করেন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে।

'স্নেহ'—যাহা থাকিলে অপরের হানিবৃদ্ধি আপনাতে আরোপিত করা হয়, সেইরূপ অপর সম্বন্ধীয় একপ্রকার তামসিক বৃত্তিকে স্নেহ বলে।

'শুভ'—সুখের হেতুভূত নিজের স্ত্রী পুত্র আদিই শুভবস্তু।

'অভিনন্দ'—যে বুদ্ধিবৃত্তি সেই শুভবস্তুর গুণকথন প্রভৃতিতে প্রবর্ত্তিত করে, তাহাকে অভিনন্দ কহে। এস্থলে যখন (স্ত্রী পুত্রাদির) গুণকথন প্রভৃতির দ্বারা অপরের রুচি উৎপাদন করা উদ্দেশ্য নহে, সেইহেতু তাহা ব্যর্থ এবং তাহার হেতুভূত 'অভিনন্দ' একটী তামসবৃত্তি।

'অশুভ'—অপরের বিদ্যা প্রভৃতি ইহার নিকট অশুভ বিষয় কেন না তাহা তাঁহার অসূয়া উৎপাদন করিয়া দুঃখের হেতু হয়।

'দ্বেষ'—বুদ্ধির যে বৃত্তি সেই পরকীয় বিদ্যাদির নিন্দা করিতে প্রবর্ত্তিত করে তাহাকে দ্বেষ বলে। তাহাও তামসিক বৃত্তি। যেহেতু সেই নিন্দার দ্বারা কাহাকেও নিবারণ করা উদ্দেশ্য নহে, সেই হেতু তাহা ব্যর্থ, এবং ব্যর্থ বলিয়া তামসিক এই ধর্ম্মসকল বিবেকীপুরুষে কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮॥

কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গসকল চারিদিক্ হইতে আপনাতে টানিয়া লয়, সেইরূপ যখন তিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়সমূহ হইতে সম্পূর্ণরূপে টানিয়া লয়েন, তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে।

ব্যুত্থিত (স্থিতপ্রজ্ঞের) কোন প্রকার তামসবৃত্তি থাকে না, ইহাই পূর্ব্বোক্ত দুই শ্লোকের দ্বারা কথিত হইয়াছে। সমাহিত ব্যক্তির যখন বৃত্তিই নাই তখন তাঁহাতে তামসিক ভাব আসিবার আশঙ্কা কি প্রকারে হইতে পারে? ইহাই (৫৮ সংখ্যক) শ্লোকের অভিপ্রায়।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥৫৯

দেহিগণ উদ্যম পরিত্যাগ করিলেই (সুখদুঃখের হেতু) বিষয় সকল নিবৃত্ত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সেই বিষয়াদির সঙ্গে সঙ্গে ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না। পরব্রহ্মের দর্শনলাভ হইলেই সেই ভোগতৃষ্ণাও নিবৃত্ত হয়।

প্রারব্ধকর্ম্ম সুখের ও দুঃখের হেতুভূত কোন কোন বিষয়কে আপনা হইতেই সম্পাদন করিয়া থাকে। যথা, চন্দ্রোদয়, অন্ধকার প্রভৃতি। কিন্তু গৃহ ক্ষেত্র প্রভৃতি (সুখদুঃখহেতুভূত বিষয় সকলকে প্রারব্ধকর্ম্ম) পুরুষ কৃত উদ্যম দ্বারাই সম্পাদন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে চন্দ্রোদয় প্রভৃতি (সুখদুঃখের হেতুগণকে) ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার রূপ সমাধির দ্বারাই, নিবৃত্ত করা যাইতে পারে, অন্য প্রকারে নহে। গৃহ প্রভৃতিকে সমাধিভিন্ন অন্য উপায়েও নিবৃত্ত করা যাইতে পারে। 'আহার' অর্থে আহরণ বা উদ্যোগ বুঝিতে হইবে। উদ্যম করা বন্ধ করিলেই, গৃহাদি (রূপ সুখদুঃখহেতুগণ) নিবৃত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু তদ্দ্বারা "রস" নিবৃত্ত হয় না। রস শব্দে মানসী তৃষ্ণা বুঝিতে হইবে। সেই তৃষ্ণাও পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের দর্শনলাভ হইলে, তদপেক্ষা স্বল্প আনন্দের হেতুভূত বিষয় সকল হইতে, নিবৃত্ত হইয়া থাকে। শ্রুতিতে আছে—

"কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ"।

(বৃহ, ৪।৪।২২)

আমরা সন্ততি লইয়া কি করিব? কেননা পরমার্থদর্শী আমাদিগের নিকট এই (নিত্যসন্নিহিত) আত্মাই এই (চরম) লোক বা পুরুষার্থ।

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥৬০॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬১॥

হে কুন্তীপুত্র, বিচারশীল পুরুষ যত্নবান্ হইলেও, বিপজ্জনক ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক তাহার মন হরণ করে। সেই ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া স্থিরভাবে মদ্গতচিত্ত হইয়া থাকিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশে আসিয়াছে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উদ্যোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মদর্শনে প্রযত্ন করিতে থাকিলেও, সাময়িক প্রমাদ পরিহারের নিমিত্ত সমাধির অভ্যাসের প্রয়োজন। ইহা দ্বারা "তিনি কি প্রকারে উপবেশন করেন?" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬৩॥

বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে লোকের তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কাম, (ভোগেচ্ছা), কাম হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, ক্রোধ হইতে সম্মোহ জন্মে, সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম এবং স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ বশতঃ লোকে একেবারে বিনষ্ট হয় অর্থাৎ মোক্ষলাভ হইতে বঞ্চিত হয়।

সমাধির অভ্যাস না থাকিলে কি প্রকারে প্রমাদ ঘটে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সঙ্গ শব্দে ধ্যেয় বিষয়ের (মানসিক) সন্নিধি বা তাহাতে আসক্তি বুঝিতে হইবে। সম্মোহ—বিবেকপরাঙ্মুখতা, স্মৃতিবিভ্রম—তত্ত্বানুসন্ধানে বিরতি, বুদ্ধিনাশ—বিপরীত বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইলে সেই দোষে জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা জন্মে, এবং জ্ঞান প্রতিবদ্ধ হইলে মোক্ষ প্রদান করিতে অসমর্থ হয়, তাহাকেই বুদ্ধিনাশ বলে।

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥৬৪॥

যিনি মনকে বশে আনিয়া, রাগদ্বেষ বিনির্ম্মুক্ত ও বশীকৃত ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা বিষয়ের সহিত ব্যবহার করেন তিনি নির্ম্মল হইয়া থাকেন।

বিধেয়াত্মা=বশীকৃতমনাঃ। প্রসাদ=নির্ম্মলতা, বন্ধরাহিত্য। যাঁহার সমাধির অভ্যাস আছে, তিনি সমাধির সংস্কার বশতঃ ব্যুত্থান-কালেও ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্যবহারে রত হইলেও সম্যক্ প্রকারে নির্ম্মলতা রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা "তিনি কি প্রকারে গমন করেন?" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল। পরবর্ত্তী অনেক শ্লোকের দ্বারা স্থিত-প্রজ্ঞের স্বরূপ সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

(এ স্থলে প্রশ্ন উঠিতেছে)—আচ্ছা, প্রজ্ঞার স্থিতির ও উৎপত্তির পূর্ব্বেও ত সাধন স্বরূপে রাগদ্বেষাদি-পরিহারের প্রয়োজন আছে। (উত্তর)—সত্য বটে, কিন্তু তাহা হইলেও প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ "শ্রেয়োমার্গ" নামক গ্রন্থের রচয়িতা এইরূপে দেখাইয়াছেন।—

"বিদ্যাস্থিতয়ে প্রাগ্যে সাধনভূতাঃ প্রযত্ননিষ্পাদ্যাঃ।
লক্ষণভূতাস্তু পুনঃ স্বভাবতস্তে স্থিতাঃ স্থিতপ্রজ্ঞে॥
জীবন্মুক্তিরিতীমাং বদন্ত্যবস্থাং স্থিতাত্মসম্বোধাম্।
বাধিতভেদপ্রতিভামবাধিতাত্মাববোধসামর্থ্যাৎ॥

"(অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মৈক্য বিষয়ক) জ্ঞান যাহাতে (সংস্কাররূপে নিরন্তর) চিত্তে অবস্থান করে তাহার সাধনরূপে প্রথমে যাহা যাহা চেষ্টা দ্বারা সম্পাদন করিতে হয় তাহাই পরে আবার (লব্ধজ্ঞান) স্থিতপ্রজ্ঞব্যক্তিতে তাঁহার লক্ষণস্বরূপে স্বভাবতঃই (বিনা চেষ্টায়) অবস্থান করে। স্থিত-প্রজ্ঞের এই অবস্থাকে জীবন্মুক্তি বলে, কেননা এই অবস্থায় অবাধিত আত্মানুভবের বলে ভেদজ্ঞান আসিতে পারে না।

সমালোচনা।

গান—দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস। শ্রীবিহারীলাল সরকার প্রণীত। ৯৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০ আনা। গ্রন্থকার সাহিত্যজগতে সুপরিচিত। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁহার রচিত প্রায় দুই শত ভগবদ্ বিষয়ক সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। গানগুলি সুললিত ও মাতৃভক্ত সাধকের হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস-পূর্ণ। আশাকরি, ভক্তজনমধ্যে ইহার বিশেষ আদর হইবে।

পরাবিদ্যার সার—শ্রীমৎ স্বামী অচ্যুতানন্দ স্বরস্বতী বিরচিত। ১০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০ আনা। পুস্তকখানির নাম হইতেই বুঝা যাইতেছে, ইহা একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ। ইহাতে মায়া, ঈশ্বর, ব্রহ্ম, অদ্বৈতভাব, ব্রহ্মানুভূতির সহজ উপায়, বন্ধন নিবৃত্তি, জীবন্মুক্তিসুখ প্রভৃতি সম্বন্ধে ১৭টী প্রবন্ধ আছে।

তপোবল—শ্রীঅক্ষয়কুমার দাসগুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—উপনিষদ্ রহস্য কার্য্যালয়, হাওড়া। ৬৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৵০ আনা। ইহা ত্রিপদী ছন্দে লিখিত একখানি কবিতা পুস্তক। ইহাতে যা-তা বিষয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয় নাই, পরন্তু ভগবদ্বিষয়ক অথবা অপর কোন উচ্চ ভাবপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা সরল পদ্যে বিবৃত হইয়াছে। আখ্যায়িকাগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ।

ঝঙ্কার—শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। ইহাও একখানি ক্ষুদ্র গীতিকাব্য—নানাবিষয়ক কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার গুচ্ছ। পুস্তকের ভাব ও ভাষা ভাল।

তত্ত্বকথা—মহাত্মা শাহ-বু-আলী কলন্দরের পারসী 'মস্‌নবী' অবলম্বনে শ্রীমবিনউদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক পদ্যে লিখিত। মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থে অতি সুন্দর সুন্দর কথা আছে কিন্তু উহার অধিকাংশই আরবী বা পারসী ভাষায় লিখিত হওয়ায় ভাষার ব্যবধান আমাদিগকে সেই অমৃতরসাস্বাদ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মের দিক্ দিয়া যে চিরন্তন বিরোধ রহিয়াছে পরস্পরের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতাই যে তাহার অন্যতম কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থগুলি যতই আমাদের পরিচিত হয় ততই মঙ্গল। আশাকরি, গ্রন্থকার ক্রমে ক্রমে অন্যান্য মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থও বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবেন।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আগামী ১৭ই ফাল্গুন, সন ১৩২৬ সাল, ইংরাজী ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯২০ খৃঃ, রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পঞ্চাশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে আনন্দোৎসব হইবে। সাধারণের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

বিগত ৪ঠা মাঘ, ইংরাজী ১৮ই জানুয়ারী, ১৯২০ খৃঃ, রবিবার পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের অষ্টপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব বেলুড় মঠে মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বহু সহস্র লোক ঐ উপলক্ষে তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। উৎসবের প্রধান অঙ্গ দরিদ্র-নারায়ণ-সেবাও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছিল।

পৌষের কৃষ্ণাসপ্তমী তিথি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি। এবার ২৭শে পৌষ ঐ তিথি পড়িয়াছিল। তাই উক্ত দিবসেও মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীর বিশেষ পূজা, পাঠ, ও ভোগরাগ

এবং রাত্রে শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজা ও হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। রাত্রিশেষে শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে দশজন ত্যাগী যুবক যথাবিধি অনুষ্ঠানপূর্ব্বক পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দীক্ষিত হন। ঐ দিবস ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠেও পাঁচজন ত্যাগী যুবক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করেন। ব্রহ্মচর্য্যের জীবন্ত বিগ্রহ সর্ব্বত্যাগী স্বামী বিবেকানন্দের পূত জন্মদিনে ইহাই তাঁহার পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। যে মহান্ উদ্দেশ্য ও আদর্শের জন্য তিনি জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন সেই উদ্দেশ্য ও আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিলেন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবদ্ সমীপে তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করি। বাংলার ঘরে ঘরে তাঁহাদের দৃষ্টান্ত গৃহীত হউক, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন আমহার্ষ্ট দুর্ভিক্ষ ও বন্যা নিবারণ কার্য্য।

বার্ম্মার আমহার্ষ্ট জেলায় দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবনের কথা আমরা ইতিঃপূর্ব্বে পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। স্থানাভাবে প্রতি মাসে উহার বিবরণ প্রকাশ করিতে পারি নাই। দুঃস্থ লোকগণের সাহায্যার্থ আমরা গত সেপ্টেম্বর মাসে চৌংনাকোয়া নামক স্থানে একটী সাহায্য-কেন্দ্র খুলিয়া নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি করিয়াছি :—

(১) অনূ্যন ৮৫০টী দুঃস্থ পরিবারকে নিয়মিতভাবে চাউল, লবণ, ও লঙ্কা দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১০০/০ মণ চাউল ও তদুপযোগী লবণ ও লঙ্কা সাময়িক সাহায্যেও ব্যয়িত হইয়াছে।

(২) যাহাদের শরীর-ধারণোপযোগী বস্ত্রাদি ছিল না তাহাদিগকে পরিধেয় বস্ত্র (লুঙ্গি) দেওয়া হইয়াছে।

(৩) ১০৮৫ জন পীড়িত ব্যক্তিকে ঔষধ এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে দুগ্ধ, সাগু, চিনি প্রভৃতি পথ্যাদিও দান করা হইয়াছে।

(৪) আবশ্যকীয় স্থলে আর্থিক সাহায্যও করা হইয়াছে।

(৫) কৃষকগণকে চাষের জন্য বীজ দেওয়া হইয়াছে।

এই সাহায্য কার্য্যে যাঁহারা এতাবৎ আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। তন্মধ্যে নিম্ন-

লিখিত সদাশয় ব্যক্তিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অঃ, এ, কে, এ, এস জামাল ৩১০ বস্তা চাউল, মেসার্স অমরচাঁদ মাধোজী এণ্ড কোং ৫০ বস্তা চাউল, মেসার্স ধর্‌সি নন্‌জী এণ্ড কোং ২২ বস্তা চাউল, মেসার্স হাসিম কাসিম 'প্যাটেল' ব্রাদার্স ১৮০টী লুঙ্গি, মেসার্স এডামজী হাজী দাউদ এণ্ড কোং ২৫০৲ টাকা, মিঃ চন্‌মাফি ১০০৲ টাকা, রাঃ ভগবান্‌দাস বাগুলা বাহাদুর ৫০৲ টাকা এবং সরকারী কৃষিভাণ্ডার ৫ বস্তা বীজ দান করিয়াছেন।

বার্ম্মা গবর্ণমেণ্টের সদাশয় কর্ত্তৃপক্ষগণকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা আমাদিগকে চৌংনাকোয়া ফরেষ্ট বাঙ্গলোটী ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং আরও নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। ইরাবতী ফ্লোটিল্লা কোং বিনা ব্যয়ে আমাদের কেন্দ্রে চাউলাদি মাল পৌঁছাইয়া দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

(সাঃ) সারদানন্দ।
সেক্রেটারী রামকৃষ্ণমিশন।

আচার্য্য বিবেকানন্দ ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম।

(জনৈক সন্ন্যাসী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই নূতন আলোকে প্রকাশিত উদার বেদান্ত-মতের ভিতর দিয়া, স্বামীজী ভারতের জাতীয় সমস্যার যে সুন্দর সমাধান আবিষ্কার করিলেন তাহাও এস্থলে প্রণিধানযোগ্য। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল নিরন্তর পর্য্যটন করিয়া তিনি ভারতীয় জীবনের যে চিত্র অবলোকন করিলেন, পরে পাশ্চাত্য দেশ সমূহের অবস্থার সহিত তাহার তুলনা করিয়া তিনি যাহা বুঝিলেন, তাহাতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, ভারত দুর্দ্দশার চরম সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার স্বাভাবিক বিশ্লেষণপটু মন এই দুর্দ্দশার মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। তিনি দেখিলেন ভারতের জাতীয় জীবনের যাহা 'মেরুদণ্ড' তাহাই ভগ্ন হইয়াছে। জগতের প্রত্যেক জাতিরই একটা বিশেষত্ব আছে, সেই বিশেষত্বই সেই সেই জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি। কোনও জাতির বিশেষত্ব তাহার রাজনীতিতে, কোনও জাতির বিশেষত্ব বা তাহার সমাজ-নীতিতে। এইরূপ একটা বিশেষ বিশেষ ভাবকে অবলম্বন করিয়াই এক একটা জাতি গঠিত হইয়া থাকে, জাতীয় জীবনের উন্নতি অবনতি সেই সেই বিশেষত্বের ভিতর দিয়াই সাধিত হইয়া থাকে। স্মরণাতীত কাল হইতে একমাত্র ধর্ম্মই যে ভারতীয় জীবনের সেই বিশেষত্ব বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল ভারতের সাহিত্য—তাহার শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ, কাব্য ও নাটকই সে বিষয়ের প্রকৃত সাক্ষ্য

প্রদান করিতেছে। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, এমন কি, দৈনন্দিন ক্ষুদ্র কার্য্যটিও ভারতবাসী ধর্ম্মের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে, সুতরাং একমাত্র ধর্ম্মই যে ভারতের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড তাহা প্রমাণান্তরনিরপেক্ষ সত্য। এই মেরুদণ্ড ভগ্ন হওয়াতেই জাতিশরীরের অন্যান্য অঙ্গ বিকল হইয়া পড়িয়াছে —তাহার শিল্প, বাণিজ্য, বীর্য্যপরাক্রম লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার সামাজিক পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবন শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছে। ধর্ম্মের যথার্থ ভাব সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে অপারগ হইয়াই ভারতবাসী পরস্পরবিবদমান বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে। বীর্য্যহীনতাই জাতীয় জীবনের অধঃপতনের মূল কারণ। শরীরের রক্তের জোর কমিয়া গেলে যেমন নানাপ্রকার রোগ আসিয়া শরীরকে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলে। সেইরূপ জাতীয় শরীরে যখন ওজঃশক্তির অভাব হয় তখনই তাহার রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ হীনভাব ধারণ করে। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, জগতে বিভিন্ন সময়ে যে সকল জাতির অভ্যুত্থান হইয়াছে এই ওজঃশক্তির প্রভাবেই তাহা সাধিত হইয়াছে এবং যখনই যে জাতি এই ওজঃশক্তিকে হারাইয়াছে তখনই তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যায়, তাহার কার্য্যকরী শক্তির মূলে একটা সংস্কারগঠিত ভাব দণ্ডায়মান, সেই ভাবের ভিতর দিয়াই তাহার কর্ম্মকুশলতা বিকশিত হইয়া থাকে। সেইরূপ জাতির পক্ষেও এক একটা সংস্কারগঠিত ভাব আছে, সেই ভাবের ভিতর দিয়াই তাহার ওজঃশক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারত ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই তাহার কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছে, ধর্ম্মই ভারতের ওজঃশক্তির একমাত্র উৎপত্তিস্থল। তীব্র প্রয়োজন অনুভব করিলেই মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ হয়। সেইরূপ জাতীয় শক্তির বিকাশ করিতে হইলেও সকলের সমান ভাবে অনুভবযোগ্য একটা জাতীয় প্রয়োজনকে

অবলম্বন করিতে হয়, সেই সাধারণ প্রয়োজনের ভিতর দিয়াই সংহতির শক্তির স্ফুরণ হয়। জাতীয় শক্তির ইহাই মূল কেন্দ্র। সকল জাতির ইতিহাসেই এ বিষয়ের বহু দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান। ভারতের জাতীয় ইতিহাস বিশদভাবে আলোচনা করিলেও ইহা দেখা যায় যে, যখনই তথায় জাতীয় শক্তির স্ফুরণ হইয়াছে, ধর্ম্মানুরাগপ্রসূত ওজঃশক্তি-প্রভাবেই তাহা সংসাধিত হইয়াছে। সনাতন ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়াই শ্রীরামচন্দ্রের 'ধর্ম্মরাজ্য' স্থাপিত হইয়াছিল। স্বধর্ম্মানুরাগপ্রসূত মহাবীর্য্যের সহায়তায়ই পাণ্ডবগণ বিপুল কৌরববাহিনী অনায়াসে মথিত করিয়া ভারতে পুনরায় ধর্ম্মের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আবার বৌদ্ধযুগে ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া ভারতে যে ওজঃশক্তির স্ফুরণ হইয়াছিল আজ সার্দ্ধদ্বিসহস্রবর্ষাধিক কাল অতীত হইয়া গেলেও, তাহার চিহ্ন দেখিয়া জগৎকে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হইতেছে। ভারতে প্রবল মুসলমান প্রাধান্যের সময় ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়াই দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত, মহারাষ্ট্র ও শিখ শক্তির অভ্যুত্থান হইয়াছিল। আজ ভারতের অভাব হইয়াছে সেই ওজঃশক্তির, তাহার অভাবই জাতীয় জীবনের সকল প্রকার মালিন্যের হেতু। বর্ষার জলপ্লাবনে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের পঙ্কিল দূষিত জল নির্ম্মলতা ও বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগ হইতে উত্থিত মহা ওজঃশক্তির প্রভাবেই ভারতের সকল প্রকার জাতীয় মালিন্য বিদূরিত হওয়া সম্ভব।

এখানে এই একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, এক হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেই এত প্রকার বিভিন্ন মত বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া জাতীয় উদ্দেশ্যের একতানতা সম্পাদন একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার উপর ভারতবাসী বলিতে যে শুধু হিন্দুদিগকেই বুঝায় তাহাও নহে; মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, বৌদ্ধ প্রভৃতি নানা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগকেও জাতির ভিতর গণনা করিতে হইবে। সুতরাং ভারতে এমন কোন্ ধর্ম্ম আছে যাহা এই সমুদয়কে একসূত্রে গ্রথিত করিতে পারে? পক্ষান্তরে দেখা যায়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই সকল

বিভিন্নজাতির সমান স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে, অতএব তাহাকে অবলম্বন করিয়াই তো উদ্দেশ্যের একতানতা সম্পাদনের সুবিধা হয়?

আপাতদৃষ্টিতে উহা সুবিধাজনক মনে হইলেও উহা দ্বারা ভারতের স্থায়ী কল্যাণলাভের আশা অতি অল্প। আমাদিগের মনে রাখা উচিত যে আমাদিগকে 'মানুষ' হইতে হইবে—প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যবলে বলীয়ান্ হইতে হইবে, আর যাহা কিছু সব আপনা হইতেই আসিতে বাধ্য। কে কবে দেখিয়াছে যে যথার্থ বীর্য্যশালী লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে? সাধনা যদি করিতে হয় তবে সেই মূল শক্তিরই সাধনা করা উচিত যাহাতে অন্যান্য সকল শক্তিই অনায়াসে আয়ত্ত হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহার যেটি চিরন্তন সংস্কারগঠিত মূল ভাব, সেইটিকে অবলম্বন করিয়াই তাহার শক্তির স্ফুরণ হইয়া থাকে এবং সেই শক্তিই তাহাকে সকল বিষয়ে পূর্ণতা আনিয়া দেয়। আমরা একটি দৃষ্টান্ত সহায়ে বিষয়টি স্পষ্টতররূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ঘটনাটি যদিও কবিকল্পনাপ্রসূত তথাপি তাহা বাস্তবজীবনের একটি স্বাভাবিক প্রতিচ্ছবি বলিয়া আমরা এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম। যাঁহারা জগদ্বিখ্যাত ফরাসী লেখক Victor Hugo প্রণীত Les Miserables নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন, কেমন করিয়া ক্ষমা ও সহানুভূতির ভিতর দিয়া নির্য্যাতিত, নিপীড়িত ও সকল প্রকার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত, পাষাণসদৃশ-কঠোরহৃদয় Jean Valjean এর ভিতরে মহাশক্তির বিকাশ হইয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যেন নূতন ছাঁচে ঢালিয়া Monsieur de Madeline রূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল। নিদাঘসন্তপ্তা ধরণী যেমন বর্ষার বারিধারাপাতের জন্য উন্মুখী হইয়া থাকে, সকল প্রকার সহানুভূতি, সকল প্রকার সান্ত্বনা হইতে বঞ্চিত Jean Valjean এর শুষ্কহৃদয়ও তেমনি ধরণীতে একটু সহানুভূতির শান্তিধারা অনুসন্ধান করিতেছিল। বিশপের ত্যাগোজ্জ্বল অদ্ভুত জীবনাকাশ হইতে যেমনি উহা বর্ষিত হইল, অমনি তাহার জীবননাটকের দৃশ্যপট যেন সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল—নরকের কীট স্বর্গের দেবতায় পরিণত

হইল! আবার দীনাহীনা লাঞ্ছিতা পদদলিতা ভিখারিনী ফ্যান্‌টিনের ভিতর ওজঃশক্তি উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, তাহার মাতৃত্বকে অবলম্বন করিয়া। সেইরূপ ব্যক্তি বা জাতির অন্তর্নিহিত ওজঃশক্তির উদ্বোধন করিতে হইলে অবলম্বন করিতে হয় সেইটি, যেটি যাহার চিরন্তন সংস্কারগঠিত মূল ভাব। অন্য ভাবের ভিতর দিয়া যে শক্তি আসে তাহা ক্ষণিক সাময়িক উত্তেজনা মাত্র। সুতরাং ধর্ম্মকে ছাড়িয়া অন্য যে কোন ভাবকে অবলম্বন করিয়াই ভারতে শক্তির উদ্বোধনের চেষ্টা হউক না কেন তাহাতে অল্পবিস্তর ফল হইলেও স্থায়ী কল্যাণের আশা অতি অল্প। অতএব ভারতকে উঠিতে হইলে যথার্থ ধর্ম্মভাবকে অবলম্বন করা ব্যতীত আর পথ নাই।

এখন দেখা যাউক, ভারতের বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মমতের একটা সাধারণ মিলনভূমি আছে কি না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই গুরুতর সমস্যার একটা অভূতপূর্ব্ব সমাধান করিয়া ভারতকে তাহার পূর্ব্বগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ভারতের ভাগ্যাকাশে যথা-সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণরূপ জ্ঞানসূর্য্যের উদয় হইয়াছিল। তাঁহার সমগ্র জীবনের প্রত্যেকটি কার্য্যকলাপের ভিতর এমন একটা অপূর্ব্ব সমন্বয়ের ভাব বিদ্যমান ছিল যদ্দ্বারা শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, নিরাকারবাদী, সাকার-বাদী, এমন কি, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানগণও তাঁহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মমতের যথার্থ পূর্ণতা শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে স্পষ্ট বিদ্যমান দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতেন। আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে, ভারতীয় সনাতন বেদশাস্ত্র "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" বলিয়া যে মূল তত্ত্বের সন্ধান বলিয়া দিয়া গিয়াছেন, জগতের বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্ম বিভিন্ন পথে যে একই মূল সত্যের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইতেছে, সেই মূল তত্ত্বের উপর নিজ জীবন প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং দৈনন্দিন প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যটি তাহারই আলোকে সম্পাদিত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব এমন একটা অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, তাঁহার অলোকসামান্য জীবনের নবীন আদর্শে সনাতন বেদমত একটা নূতন আলোকে প্রকটিত হইল। সুতরাং সকল ধর্ম্মমতের সহিত সম্পূর্ণ অবিরোধী এই মহাসমন্বয়বাদ-

কেই জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। তুমি মুসলমান বা খৃষ্টীয়ান যাহা আছ তাহাই থাক, শুধু এইটুকু জানিয়া রাখ যে অপরে যে ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিতেছে তাহা ভুল বা তোমার মতের বিরোধী নহে। বিভিন্ন পথে তোমরা সেই একই অনাম অরূপ পরমেশ্বরকে জানিবে, সেই একই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, তোমাদের সকলের ভিতর সমভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন। এই উদার অথচ অতি গভীর সমন্বয়বাদকে অবলম্বন করিয়া জাতি গঠিত হইলে, ভারতে যে মহাশক্তির স্ফুরণ হইবে কেবলমাত্র সে শক্তিই ভারতের সকল সমস্যা দূর করিয়া তাহাকে তাহার পূর্ণ-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ। শুধু ভারতের কেন, সকল দেশের সকল সমস্যা ঘুচাইয়া দিয়া পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারগ!

স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শের শুধু নির্দ্দেশ মাত্র করিয়াই যে ক্ষান্ত হইলেন তাহা নহে, উহা লাভ করিবার দেশ-কালোপযোগী সহজ পন্থাও তিনি সম্পূর্ণরূপে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থই আমাদিগের দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়, স্বার্থপরের সঙ্কীর্ণদৃষ্টিতে কখনই সমবুদ্ধির উদয় হইতে পারে না, সুতরাং সকলকেই শিখিতে হইবে, স্বার্থত্যাগ। অবলম্বন করিতে হইবে, স্বার্থগন্ধলেশশূন্য 'কর্ম্মযোগ' বা 'সেবাযোগ'। স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত 'সেবাযোগে'র বিস্তারিত আলোচনা করিবার সুযোগ আমাদের আজ হইবে না, আমরা তৎসম্বন্ধে সামান্য আলোচনা মাত্র করিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এক কথায় বলিতে গেলে—ত্যাগই এই ব্রতের মূলমন্ত্র। সর্ব্ব-ভূতে একই আত্মা বা ঈশ্বর অবস্থিত রহিয়াছেন জানিয়া কোনও প্রকার প্রতিদান বা ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া যথাসাধ্য সকলের সেবা করিয়া নিজকে ধন্য জ্ঞান করাই ইহার অনুষ্ঠান—নিঃস্বার্থ অকপট প্রেমই তাহার দক্ষিণা—ফল, অনন্ত শান্তি। ঐ শুনুন, এই মহাযজ্ঞের ঋত্বিক্ সমগ্র জাতির হৃদয়-তন্ত্রী ঝঙ্কৃত করিয়া উদাত্ত স্বরে কি মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন :—

"দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
"দাও দাও" যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হ'য়ে যান।
ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥"

জোয়ার যখন আসে তখন তাহা নাবিকের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে না, পূর্ব্বগগনকে ঊষার রক্তিম আভায় রঞ্জিত করিয়া অরুণ যখন উদিত হন তখন বিহগগণ কাকলি ধ্বনিতে তাহাকে বরণ করিয়া লইল কি না, মানব নয়ন উন্মীলন করিয়া তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল কি না, তাহা দেখিবার জন্য তিনি অপেক্ষা করেন না। সেইরূপ বিধির বিধানে নূতন ভাবের বন্যা যখন আসে তখন কাহারও বারণ বা প্রত্যাখ্যানের ধার তাহাকে বড় একটা ধারিতে হয় না, অথবা সুদূর হিমালয়ের তুষার-ধবল উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে জাহ্নবীর পূত বারিধারা যখন সাগরের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া আসিতে থাকে, তখন কোন বাধাই তাহার গতিরোধ করিতে পারে না, অপিচ যাহারা তাহার অবিরাম প্রবাহে গা ভাসাইয়া দেয় তাহারা অনায়াসে বিপুল সাগরসঙ্গম লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকে। আবার যাহারা স্বকার্য্যসাধনতৎপর তাহারা সেই অপ্রতিরোধ্য গতিকে প্রতিহত করিতে চেষ্টা না করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূলভাবে তাহার গতিকে ব্যবহার করিয়া নানারূপে স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া লয়। বুদ্ধিমান্ সে যে সেই মহাশক্তির সামর্থ্য বুঝে ও তাহার যথাযথ ব্যবহার জানে। সেইরূপ দেখা যায়, জগতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে উদিত মহাপুরুষগণ একটা প্রবল ভাবের হিল্লোল তুলিয়া দিয়া যান, আর তাহার প্রভাবে তৎসমকালবর্ত্তী ও পরবর্ত্তিগণ বিভিন্ন প্রকার শ্রেয়ঃসাধন করিয়া লন। মেরীনন্দন ঈশা ভাবরাজ্যে যে প্রবল ঝটিকা উত্থিত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন তাহাকে অবলম্বন করিয়াই ইয়ুরোপ ও আমেরিকার এই আশ্চর্য্য সভ্যতার বিকাশ হইয়াছে। আর যাহাদের সঙ্কীর্ণ ভাবগ্রহণপরাঙ্মুখ হৃদয় তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান

করিয়াছিল তাহারা আজ কোথায়? জগতে আজ তাহাদের স্থান কই? ভগবান্ বুদ্ধ যে ভাবের উৎস তুলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন তাহার পুণ্যপ্রবাহে অভিসিঞ্চিত হইয়া ভারতউদ্যানে যে সকল স্বর্গের কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার সৌরভে আজও ধরণী ভরপুর রহিয়াছে।

আবার সুবাতাস উঠিয়াছে। হে অমৃতের যাত্রিগণ, এবার পাল তুলিয়া দাও, ভাবমন্দাকিনীর পুণ্যপ্রবাহ আবার ছুটিয়া চলিয়াছে, হে বুদ্ধিমান্ তাহাকে অবলম্বন করিয়াই তোমার স্বকার্য্য সাধন করিয়া লও। ঘোর অমানিশার দুর্ভেদ্য তিমিরজাল বিচ্ছিন্ন করতঃ পূর্ব্ব-গগনকে গৌরবের সমুজ্জ্বল কিরীটে বিভূষিত করিয়া ঐ দেখ অরুণ উদয় হইয়াছে, দেখিতেছ না তোমার জীর্ণ কুটীরের ভগ্ন বাতায়নপথে তাহারই একটি ক্ষুদ্র রশ্মি প্রবেশ করিয়া কেমন ঝিক্‌মিক্ করিতেছে? —চতুর্দ্দিকে কেমন একটা নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে? তবে এস, ওহে অনন্তের যাত্রি, নিশার আবেশ ত্যাগ করিয়া, সকল প্রকার স্বার্থমলিনতা বিসর্জ্জন দিয়া, সকল প্রকার ভয় ও দুর্ব্বলতা পরিহার পূর্ব্বক. হৃদয় হইতে ঈর্ষা, দ্বেষ, সঙ্কীর্ণতা, কপটতা মুছিয়া ফেলিয়া এই পরম পবিত্র নবীন প্রভাতে, নবজাগরণের এই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নবীন দীক্ষাগ্রহণ করতঃ তোমার জীবনকে অমৃতময় কর আর বিশ্বের মাঝে দাঁড়াইয়া তোমার অমৃতদৃষ্টিতে সকলকে অভিষিক্ত কর।

(সমাপ্ত)

বাঙ্গালায় বিংশ শতাব্দী।*

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)

কোন কোন যুগবিশ্লেষণকারী মনস্বী লেখক ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালায় নবযুগের সূচনা হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতেই নাকি আমরা "জাগিয়া উঠিয়া নবান আলোকে" উন্নতিপথে যাত্রা করিয়াছি।

আজ যদি আমরা পশ্চাদ্দৃষ্টিপরায়ণ হইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট কাল আবিষ্কারের চেষ্টা করি—নূতন চিন্তা, নূতন ভাবে ভাবিত হইয়া জীবনের অভিনব বিকাশের উৎপত্তিস্থান আবিষ্কারের চেষ্টা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভ্যুদয়ের পর হইতেই বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যে এক সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। সকল দিক্ বিচার করিয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালায় নবযুগের আরম্ভ ইহা অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তথাপি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এ যুগের আদর্শ প্রচার করিবার কোন বিশেষ চেষ্টা এতদ্দেশে দেখা যায় নাই। এক কথায় স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর হইতেই নবযুগের আদর্শ ব্যাপক ও সার্ব্বজনীনভাবে ঘোষিত হইয়াছে। বাঙ্গালার বিংশ শতাব্দী বা নবযুগকে সেই জন্যই আমরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগ বলিয়া অভিহিত করিতে চাই, এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিতে চাই স্বামী বিবেকানন্দই এ যুগের প্রথম ও প্রধান প্রচারক। আজ পর্য্যন্তও এই শক্তিমান্ সন্ন্যাসীর অমর ভাবসমষ্টি অপ্রতিহত গতিতে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন, স্বামিজীর বিপুল উদ্যম ও চেষ্টাকে আমরা

* বিগত ২৫শে মাঘ "ব্যাটরা অনাথবন্ধু সমিতি" কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

কেবল বাঙ্গালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া দেখাইতেছি। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রের পরিধি ভারতবর্ষের সীমালঙ্ঘন করিয়া সমগ্র জগৎকে বেষ্টন করিয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাঁহাকে কেবলমাত্র বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর দিক্ হইতেই দেখিব।

আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতেই বাঙ্গালায় নবযুগের ভাবরাশি প্রচারিত হইয়াছে। যাঁহারা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ হইতে ব্যাপকভাবে একটা জাতীয় জাগরণ লক্ষ্য করিয়া তখন হইতেই নবযুগের সূত্রপাত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের কথাও অনেকাংশে সত্য, কেননা, অনেকেই উহার মূল উৎসরূপে স্বামিজীর ভাবরাশির প্রতিই ইঙ্গিত করিয়া থাকেন।

এই বাঙ্গালাদেশে স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব্বগ ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকগণের চরিত্র ও কার্য্যপ্রণালী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা কতকগুলি বৈদেশিক ও স্বদেশীভাবের অসংলগ্ন মিশ্রণের প্রতিধ্বনি মাত্র। বৈদেশিক শিক্ষা, সমাজনীতি ও ধর্ম্মের সহিত প্রথম পরিচয়ে যে ধারণা ও আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের মনে উদিত হইয়াছিল, তাঁহারা কেবলমাত্র তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন—ধর্ম্মসংস্কার ও জাতীয় সাধনধারার সহিত ঐক্য রাখিয়া তাঁহারা কোন অভিনব আদর্শ ফুটাইতে পারেন নাই।

শাক্ত ও বৈষ্ণব—দুইটী সাধনার ধারা কত বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গীতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালার মাটীতে প্রবাহিত হইতেছে। কত বিচিত্র রূপান্তরের মধ্য দিয়া, কত কলহ দ্বন্দ্বে প্রতিহত হইয়া, কত কদাচার ও ব্যভিচারে পঙ্কিল হইয়া অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়-প্রয়াগে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের রাজসূয়যজ্ঞে ব্রতী এই মহাপুরুষ শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনাকে আত্মস্থ করিয়া—দুই আদর্শের সমন্বয় করিয়া—এক অতি আশ্চর্য্য কৌশলে বাঙ্গালার সাধনধর্ম্মের বিশেষত্ব রক্ষা করিলেন। ভারত ও ভারতেতর বিশেষ বিশেষ সাধন-ধারাগুলিও বাঙ্গালার সাধনধারার সহিত তাঁহার জীবনে সম্মিলিত হইয়াছে। এই মহা-সমন্বয়ের ক্ষেত্র হইতে যে অদ্বৈত আদর্শ উত্থিত

হইয়াছে, নবযুগের ধর্ম্মসাধনায় সেই আদর্শ প্রয়োগ করিবার কৌশল স্বামিজী আমাদের নিকট বিবৃত করিয়াছেন। এই অভিনব ধর্ম্মাদর্শে জীবন গঠন করিবার জন্য তিনি দুইটী পথের ইঙ্গিত করিয়াছেন—ত্যাগ ও সেবা। বৈষ্ণব সাধনায় প্রেমের বিকাশ ত্যাগে, শাক্ত সাধনায় শক্তির বিকাশ কর্ম্মে। প্রেম ও শক্তির এই অপূর্ব্ব সম্মিলনে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রচারিত জাতীয় আদর্শ সেবাধর্ম্মের অভ্যুদয়—জাতীয় সাধনধারার সহিত ইহার গভীর ঐক্য অথচ অভিনব মৌলিক বিকাশ।

আধার ভেদে এই প্রেম বিভিন্নপ্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্বজাতিপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, ভগবৎপ্রেম—একই প্রেমের বিভিন্ন বিকাশ। সেই জন্যই নবযুগের কর্ম্মীকে সেবার পথে দাঁড়াইবার প্রথম সোপানেই স্বামিজীর একটী প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়—"তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে তো?" যদি থাকে তবে সেই প্রেম, তাহা বর্ত্তমানে যতই সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত হউক না কেন, সাধনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করাইয়া তোমাকে চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জাতীয় জীবনের আসন্ন সমস্যাগুলির মীমাংসা স্বামিজী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা তাহাই একটু আলোচনা করিব। দুর্ভাগা বাঙ্গালীর আজ সমস্যার অন্ত কি? অন্নসমস্যা, বস্ত্রসমস্যা, শিক্ষাসমস্যা, সমাজসমস্যা, ধর্ম্মসমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা—ইত্যাদি সহস্র সমস্যার জালে বাঙ্গালীর জীবন আচ্ছন্ন। সমস্যা এত গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে যে বাঙ্গালী শিশু জন্মমাত্রেই দুগ্ধসমস্যায় পীড়িত হইয়া সাগু, বার্লি বা পাটির পালোর শরণ লইতে বাধ্য হয়! মৃত্যুসমস্যাও ততোধিক সঙ্গীন। বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ পিতামাতা অন্নবস্ত্রাভাবে পুত্রকন্যাগণের শীর্ণ উলঙ্গমূর্ত্তি দেখিয়া ভগ্নহৃদয়ে অশ্রুমোচন করিয়া প্রতিদিন শতবার মৃত্যুকামনা করিতেছে—সহরবাসী 'বাবুর' পরিত্যক্তা ও উপেক্ষিতা মাতা পল্লীগ্রামের জনহীন কুটীরে বসিয়া প্রত্যহ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে—অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা বঙ্গকুমারীগণ হৃদয়হীন নিষ্ঠুর

গঞ্জনায় ক্ষিপ্ত হইয়া স্বদেহে অগ্নি প্রদান করিতেছে; —ঋণের দায়ে, জমিদারের বিলাসযজ্ঞের হবির আয়োজনে, পেষণে পীড়নে বিব্রত হইয়াও বাঙ্গালী মরিতেছে—আবার দুর্ভিক্ষে, ওলাওঠায়, প্লেগে, ইনফ্লুয়েঞ্জায়, বসন্তে অসহায় বাঙ্গালী দল বাঁধিয়া মরিতেছে—ইহা বাঙ্গালীর মর্ম্মান্তিক হৃদয়ভেদী মৃত্যুসমস্যা!

এই জন্মমৃত্যুসমস্যার সঙ্কটময় সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াও আজ বাঙ্গালী জীবনসমস্যা মীমাংসা করিবার আগ্রহে মস্তক উত্তোলন করিতেছে—ইহা আশার কথা। বিমুখ ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসের বিরুদ্ধে প্রবল সচেষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রহরে জাতিগত আত্মসম্বিৎ লইয়া আমরা একবার পশ্চাদ্দৃষ্টিপরায়ণ হইয়া আমাদের অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম। কেননা, খ্রীষ্টান পাদ্রী বা পণ্ডিতগণ এবং স্বদেশী সংস্কারকগণ যে ভাবে অতীতকে চিত্রিত করিয়াছিলেন তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি নাই, আমাদের কেমন একটা সন্দেহ হইয়াছিল, আমরা মুখ ফিরাইয়াছিলাম। আমরা কি জানিতাম, আমাদের অনাদৃত, উপেক্ষিত ইতিহাস এক মহাজাতির গৌরব-কাহিনী বুকে ধরিয়া বাঙ্গালার ধূলিতলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে? আমরা কি বুঝিতাম, এই ইতিহাসকে বিস্মৃতির গহ্বর হইতে তুলিয়া আনিয়া জাতির সম্মুখে স্থাপন করিতে হইবে, কেননা, আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উহার দ্বারাই প্রভূত পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইবে? আমরা জানিতাম না, বুঝিতাম না বলিয়াই দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরিয়া বিজয়ী জাতির গৌরবচ্ছটায় স্বদেহ অনুরঞ্জিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আজ অতীত আমাদিগকে ডাক দিয়াছে; অতীতের গর্ভে ফিরিয়া যাইবার জন্য নহে—তাহাকে জীবন্তভাবে চিত্রিত করিয়া তুলিবার জন্য। নূতন করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে হইবে। তবে ত আমরা বুঝিব যে বাঙ্গালী চিরদিন এত ভীরু, দুর্ব্বল ও পরবশ ছিল না। অমিতবীর্য্য, অলৌকিক প্রতিভা, অদম্য কর্ম্মশক্তি, বাঙ্গালীর সব ছিল!

বাঙ্গালী জাগিবে—জাগিতেছে! তাই না আমরা অতীত ইতিহাসের খনি খুঁড়িয়া আমাদিগের জাতীয় আদর্শ উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। প্রাচীন শিক্ষা, সভ্যতা ও আদর্শ কেবলমাত্র আমাদের জাতীয় জীবনকে পুষ্ট ও বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য নহে, উহাদের দ্বারা বর্ত্তমান জড়বাদসর্ব্বস্ব জগতের চিন্তা-স্রোত পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে হইবে। এই আদর্শ যুগপৎ স্বদেশে ও বিদেশে প্রচারিত করিয়া উপেক্ষিত বাঙ্গালা বিশ্বসমাজে বরণীয় হইবে—এই প্রবল সচেষ্ট যুদ্ধঘোষণার প্রারম্ভ হইতেই নবযুগের সূচনা। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে এই আদর্শ পূর্ণরূপে প্রকট হইয়াছিল বলিয়াই তিনি যুগপ্রবর্ত্তক—নব্যভারতের প্রথম জাগ্রত পুরুষ।

তিনিও তাঁহার জীবন-বিকাশের ইতিহাসের কথা বলিতে গিয়া একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "যে সকল নীতি অবলম্বনে আমার জীবন পরিচালিত হইতেছে তন্মধ্যে একটী এই যে, আমি কখনও আমার পূর্ব্বপুরুষগণকে স্মরণ করিয়া লজ্জিত হই নাই। জগতে যত ঘোর অহঙ্কারী পুরুষ জন্মিয়াছে, আমি তাহাদের অন্যতম; কিন্তু আমি তোমাদিগকে স্পষ্টভাষায় বলিতেছি, আমার নিজের কোন গুণ বা শক্তি লইয়া আমি অহঙ্কার করি না, আমি আমার প্রাচীন পিতৃপুরুষগণের গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। যতই আমি অতীতকালের আলোচনা করিয়াছি, যতই আমি অধিক পশ্চাদ্দৃষ্টিপরায়ণ হইয়াছি, ততই আমার হৃদয়ে এই গৌরববুদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাতেই আমার বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও সাহস আসিয়াছে, আমাকে পৃথিবীর ধূলি হইতে উত্থিত করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মহান্ অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে নিযুক্ত করিয়াছে। সেই প্রাচীন আর্য্যদিগের সন্তানগণ, ঈশ্বরের কৃপায় তোমাদেরও সেই অহঙ্কার হৃদয়ে আবির্ভূত হউক, তোমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের উপর সেই বিশ্বাস তোমাদের শোণিতের সহিত মিশিয়া তোমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া যাউক, উহা দ্বারা সমগ্র জগতের

উদ্ধার সাধিত হউক।” আজ যদি বাঙ্গালায় “দেবানাং প্রিয় পিয়দর্শী” সম্রাট্ অশোক থাকিতেন, তাহা হইলে দিকে দিকে প্রস্তর-স্তম্ভে ও গিরিগাত্রে বিবেকানন্দের এই উক্তি ক্ষোদিত হইত। তথাপি আশা আছে, উদীয়মান বাঙ্গালী যুবকগণের তরুণ প্রাণে এ মর্ম্মস্পর্শী আহ্বান প্রতিধ্বনি তুলিবে।

স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্র পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া বিংশ-শতাব্দী বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছিল। ঐ মহাপুরুষের অপ্রতিহত ভাবপ্রবাহের দুর্নিবার প্রেরণায় নবজাগ্রত জাতি “বিদেশীভাবের স্বদেশী” করিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছে—ঈষদুন্মেষিত পুরুষকারের ক্ষুব্ধ উত্তেজনায় শক্তির অসঙ্গত প্রয়োগ করিতে গিয়া নিষ্ঠুরভাবে প্রতিহত হইয়াছে। এই বিকৃতপন্থা হইতে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আমরা ফিরিয়া আসিয়াছি, তাহা আমাদিগের বর্ত্তমান যুগের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও কর্ত্তব্যের সহিত সম্যক্ পরিচয়ের পথ অধিকতর সুগম করিয়া দিয়াছে। আমরা বুঝিয়াছি, সাময়িক উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া শক্তির অযথা অপব্যয় মূঢ়তার চিহ্ন। উহাতে স্বদেশের হিতসাধন অপেক্ষা অহিতসাধনই হইয়া থাকে। যাহা হউক, এই মারাত্মক ভ্রমের চোরাবালিতে পড়িয়াও বহুচেষ্টায় আমরা উঠিয়া আসিয়াছি। এই সমস্ত ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে আমরা শ্রীভগবানের কৃপায় যে কেবল আত্মপরিচয় পাইয়াছি তাহা নহে, সমস্ত মিথ্যা সংশয় বিদূরিত করিয়া আত্মশক্তিও ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য, অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাকে সর্ব্বদা জাগ্রত ও উদ্যত রাখিয়া এই শক্তিবিকাশের নানা দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেওয়া। আমাদের দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া বাঙ্গালার বিশাল জনসঙ্ঘকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। তাহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও অভাবের সহিত সম্যক্‌রূপে পরিচিত হইতে হইবে। বাঙ্গালার প্রাণের যে বিপুল প্রবাহ হরজটাজালরুদ্ধ মন্দাকিনীর মত এই জনসাধারণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তপঃপ্রভাবে তাহাকে পুনরায় দেশের মাটীর উপর দিয়া বহাইয়া দিতে হইবে। বাঙ্গালার

প্রাণের সে জগৎউপপ্লাবী লীলার দিন নিকটবর্ত্তী—কোন্ মত্ত ঐরাবত আভিজাত্য ও পদমর্য্যাদার ক্ষুদ্র দন্ত লইয়া ইহার গতিরোধ করিতে গিয়া আত্মঘাতী হইবে? সরিয়া দাঁড়াও! সরিয়া দাঁড়াও! রে অলস, দুর্ব্বল, বিলাসী, স্বার্থপর! এ কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার কোন প্রয়োজন নাই। এ মহাপূজার সন্ধিক্ষণে চাই তাহাদের, যাহারা "প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ,"—চাই তাহাদের, যাহারা যুগপ্রবর্ত্তক আচার্য্যের উদাত্ত কণ্ঠস্বরের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে পারিবে, "আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি—আমি মানুষকে বিশ্বাস করি—আজ দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের সেবার জন্য নরকে যাইতে তাহাদিগকেই প্রস্তুত হওয়া আমি খুব বড় কাজ বলিয়া বিশ্বাস করি।" জাতির সর্ব্বদুঃখ বরণ করিয়া লইয়া গণবিগ্রহের পুরোহিতরূপে পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে।

চারিদিকে কালের শুভচিহ্ন! সমাজের বিভিন্ন স্তরের 'পতিত' পর্য্যায়ভুক্ত ও জল-অনাচরণীয় জাতিসমূহ ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিতেছে। ইহার বিরুদ্ধে কতকগুলি কূপমণ্ডুকের ব্যর্থ লম্ফঝম্ফ দেখিয়া হাস্যোদ্রেক হয়। ইহাদের সঙ্কীর্ণ মস্তিষ্ক ভাবিতে পারে না যে, এই জাগরণের পশ্চাতে যুগপ্রবর্ত্তকের গভীর তপঃশক্তির প্রেরণা রহিয়াছে! ইহাদের স্থূলদৃষ্টির সম্মুখে ভাবী সমাজবিপ্লবের ভয়াবহ চিত্র প্রতিফলিত হয় না। ইহারা বুঝিতে পারে না, শাস্ত্রযুক্তিহীন দেশাচার ও লোকাচারের প্রাচীন জীর্ণ কন্থা দিয়া আর এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া রাখা যাইবে না, উহা সমস্ত কুসংস্কার দগ্ধ করিয়া স্বমহিমায় দীপ্ত হইয়া উঠিবে। সাবধান! মাৎসর্য্যের অন্ধত্বে, ব্যর্থ অহঙ্কারের আস্ফালনে এই ক্ষুদ্রজাতিগুলিকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিও না। এই উন্মেষোন্মুখ শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক পথে বিকশিত হইতে দাও! দুঃখ, দৈন্য, ব্যাধি, মড়কের "প্রলয় পয়োধি জলে" অনন্ত আশার নাগপৃষ্ঠে শায়িত বাঙ্গালার নিদ্রিত বিরাট জনসঙ্ঘরূপী "নারায়ণ" তাঁহার নাভিকমলোদ্ভূত ব্রহ্মারূপী বিবেকানন্দের তপঃশক্তিতে যুগান্তরের নিদ্রা ত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন!

এই পুণ্যলগ্নে তুমি এসো কর্ম্মি! তোমার শক্তি-সবল সেবাপরায়ণ বাহুযুগ লইয়া—বলদর্পিত পদতলে অন্যায়, অসত্য, অত্যাচার দলিত করিয়া বাঙ্গালার সোনার শ্মশানে এই স্তব্ধ আলস্যের জড়ত্ব মথিত করিয়া নূতন নূতন কর্ম্মের সৃষ্টি কর। বিবস্ত্রা জননীর লজ্জা নিবারণ কর, ক্ষুধিত জঠরে অন্ন দাও, অত্যাচারীর কবল হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা কর। অজ্ঞানকে জ্ঞান দাও, দুর্ব্বলকে শক্তি দাও, পশুকে মনুষ্যত্ব দাও, মানুষকে দেবতা কর! এসো কর্ম্মি! আমরা তোমাকে বরণ করিবার জন্য স্রক্‌চন্দনহস্তে দাঁড়াইয়া আছি।

এসো তুমি ভক্ত, বাঙ্গালার দেবদেবী, মূর্ত্তিপূজা, অবতার, গুরুবাদ, মন্ত্র ও সাধনা লইয়া! তোমার প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসিয়া যাক্। তোমার ধ্যানে বাঙ্গালার চিরন্তন রূপ নববৈচিত্র্যে ফুটিয়া উঠুক; বাঙ্গালার দেবদেবী তোমার পূজায় প্রসন্ন হইয়া জাগ্রত হউন! এসো ভক্ত, বাঙ্গালার পল্লীর কুটীরে কুটীরে পূজাহীন দেবতার বেদী কোনমতে রক্ষা করিয়া আমরা তোমার অপেক্ষা করিতেছি।

এসো তুমি জ্ঞানি! বাঙ্গালার শ্যামলকাননে তপোবন রচনা করিয়া এসো অগ্নিতুল্য তেজস্বী ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মবিদ্যাকামী শিষ্যগণকে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষা দাও! স্মৃতিশাস্ত্রের নবকলেবর করিয়া নূতন বিধান রচনা কর, সমাজকে ধারণ কর, জাতিকে সংহত ও সংযত কর। এসো তুমি জ্ঞানি, অকামহত, শ্রোত্রিয়, ব্রাহ্মণ! তোমার অপেক্ষায় আমরা উন্মুখ আগ্রহে দণ্ডায়মান। আবার তোমাকে বাঙ্গালার বুকে ফিরিয়া আসিতেই হইবে।

আর এসো তুমি নবযুগের নবীন সন্ন্যাসি! সনাতন ধর্ম্মাদর্শের সংরক্ষক ও প্রচারক! কুলকে পবিত্র করিয়া, জননীকে কৃতার্থ করিয়া, জন্মভূমিকে ধন্য করিয়া, কৌপীনমাত্রসম্বলে তুমি আজ গৌরবগর্ব্বে দণ্ডায়মান হও। তোমার ত্যাগপূত গৈরিকদীপ্তিতে বাঙ্গালা উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক! দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ঝঞ্ঝা, ব্যাধি, মড়ক, অবিচার, অত্যাচারে জর্জ্জরিত জীবন্মৃত বাঙ্গালী তোমার সেবাপ্রসারিত মঙ্গলহস্তের পুণ্যস্পর্শ লাভ করিয়া নবীন আশায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠুক। তুমি নিজের

মুক্তিকামনাকে তুচ্ছ করিয়া বিশ্বাস কর সকলের মুক্তি না হইলে তোমার মুক্তি হইতে পারে না। এক ও বহু উভয়েই একই সত্যের বিভিন্ন আত্মার বিভিন্ন অনুভূতি, ইহা বুঝিয়া বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান কর। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে গিয়া শুনাও, "তোমরা অমিতবীর্য্য অমৃতের অধিকারী।" বাঙ্গালীর শুষ্ক তৃষিত কণ্ঠে তোমার কমণ্ডলু হইতে অদ্বৈতামৃত বর্ষণ কর। এই নবযুগে তুমি অগ্রসর হইয়া শৃঙ্খলিত জাতির অঙ্গ হইতে অর্থহীন বিধিনিষেধের বাঁধন খুলিয়া দাও। তোমাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও তপস্যার প্রভাবে নবজাগ্রত জাতির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠুক সেই "ত্রৈলোক্যকম্পনকারী কোটীজীমূতমন্দ্রী নবীন ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি—'ওয়াহ্ গুরুজিকী ফতে'।"

আর সর্ব্বোপরি তুমি এসো, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ! বাঙ্গালার বুদ্ধ ও শঙ্কর, বাঙ্গালীর গুরু তুমি এসো— ভাস্বরবিগ্রহরূপে আমাদের হৃদয়ের বিনম্র শ্রদ্ধার অজিনাসনে উপবেশন কর। উদয়াচলের অরুণচ্ছটার ন্যায় তোমার পদ্মপলাশ নেত্রদ্বয়ের স্নিগ্ধদৃষ্টি আমাদের প্রত্যেক চেষ্টা ও কার্য্যের উপর পতিত হইয়া তাহাকে উজ্জ্বল ও সার্থক করিয়া তুলুক। তোমার জীবন হইতে তেজ আহরণ করিয়া আমরা তেজস্বী হইব। আমাদের দুর্ব্বহ দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয় ও সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি তোমার মুক্ত স্বাধীন বিপুল মনুষ্যত্বের অভ্রভেদী শুভ্র মহিমায় প্রতিহত হইয়া আহত অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠুক! আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ লজ্জিত হউক—অসার দম্ভ মস্তক অবনত করুক। তোমার জীবন-সাধনা বাঙ্গালীর অখণ্ড জাতীয় জীবনে নববৈচিত্র্যে জাগ্রত হইয়া বিংশ শতাব্দীকে সফল ও গৌরবান্বিত করুক। তোমার অক্লান্ত কর্ম্মের মহাবীর্য্যতরঙ্গ বাঙ্গালীকে আবার নূতন স্রোতে, নূতন পথে ভাসাইয়া লইয়া যাক্।

আগড়পাড়ায় ম্যালেরিয়া, হনুমান্, শৃগাল ও তস্কর।

(জনৈক দর্শক)

কলিকাতা লাটভবনের নয় মাইল উত্তরে আগড়পাড়া নামক একটি গ্রাম আছে। কেহ বলেন ইহার রাশনাম ছিল "অগ্রপল্লী"। তাহাই আগড়পাড়া এই ডাকনামে পরিণত হইয়াছে। অগ্রপল্লী নামের কারণ কি, তাহা অনেকে অনেক রকম অনুমান করেন। ইহা বাঙ্গালার প্রথম বর্ণ 'অ', ইংরেজীর প্রথম 'এ' এবং পারস্য প্রথম 'আলিফ্' অক্ষরাদ্য শব্দ বলিয়া বর্ণানুক্রমে নাম করিতে হইলে এই পল্লীর নাম অগ্রেই আসিয়া পড়ে, এজন্যও নামের সার্থকতা আছে। শুনা যায়, এক সময়ে এই গ্রামখানি ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি ও জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় এ অঞ্চলে অগ্রবর্ত্তী ছিল; টোলের হিসাবে ভাটপাড়ার ন্যায় আগড়পাড়ারও প্রসিদ্ধি ছিল। স্বর্গীয় নীলকান্ত তর্কবাগীশ ও কালীকিশোর ভট্টাচার্য্য প্রমুখ পণ্ডিতগণের সুনাম আজিও শুনা যায়। সুনামখ্যাত বিশ্বপণ্ডিত স্যার্ বিলিয়ম্ জোন্স্ আগড়পাড়ার টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা গিয়াছে। একথাও শুনা যায় যে, বঙ্গের আর্ণল্ড ছাত্রবন্ধু ডিরোজিও সাহেব নাকি কিছুদিন আগড়পাড়ায় খ্রীষ্টীয় মিশনরীদের আশ্রমে বাস করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা যতদূর সন্ধান পাইয়াছি তাহাতে বলিতে হয় এ বিশ্বাস ভুল। যিনি এখানে ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল এফ, জে, ডিরোজারিও, আর তিনি ছিলেন 'রেভারেণ্ড'। ১৮৪২খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগত মিশনরী শ্রীগুরুচরণ বসু মহাশয় যখন আগড়পাড়ায় মিশনের কাজ করিতে আসেন তখন রেঃ ডিরোজারিও ছিলেন মিশনের কর্ত্তা। আর হেনরী লুই ভিভিয়ান্ ডিরোজিওর মৃত্যু হয় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে। মিশনরীদের সঙ্গে তাঁহার যে সম্বন্ধ ছিল না, তাহা ম্যাক্সমূলার প্রণীত

"Auld lang Syne" গ্রন্থোক্ত "Derozio though branded by the clergy as an infidel and a devil of the Thomas Paine School, was worshipped by his pupils as the incarnation of goodness and kindness".— এই মন্তব্যে বুঝা যায়। তবে ইনি যদি স্যর্ বিলিয়ম্ জোন্সের ন্যায় টোলে পড়িবার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়া বাস করিয়া গিয়া থাকেন তাহা আমরা জানি না। সংবাদটা প্রাচীন মহলে খুব গরম ও আগড়পাড়ার সুদিনের পরিচায়ক বলিয়াই আমরা উল্লেখ করিলাম। গেজেটীয়রে আগড়পাড়ার কথা আছে, "The Literary Year Book"এ আগড়পাড়া পাবলিক লাইব্রেরীর উল্লেখ আছে। আর আজকাল কলকারখানা করিবার জন্য দেশী ও বিদেশী কোম্পানী উভয়েই আগড়পাড়ায় জমী ক্রয় করিবার জন্য ঝুঁকিয়াছেন। কালে আগড়পাড়া কল্‌বাজারে পরিণত হইতে পারে। ইহার প্রাচীন গৌরব কিন্তু বড় বড় পোড়ো বাড়ীর রাবিশে আর বনজঙ্গলে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আগড়পাড়ার ভালদিন যে এককালে ছিল তাহা এক্ষণে প্রাচীনদিগের মুখে গ্রামখানি 'উৎসন্ন গিয়াছে' এই আক্ষেপোক্তিতে বেশ বুঝা যায়। একটা কথা শুনা যায় যে, গ্রামের যখন খুব 'বোল্‌বোলা' ছিল, তখন নাকি এক তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী উপেক্ষিত হইয়া এই সূর্য্যভেদী গ্রামকে শাপ দিয়াছিলেন এবং তদবধি এই অভিশপ্ত গ্রামের প্রতি শনির দৃষ্টি পতিত হয়। শনির দৃষ্টি কিভাবে পড়িয়াছে জানি না, কিন্তু হনুমান্, শৃগাল, তস্কর ও ম্যালেরিয়ার দৃষ্টি পল্লীবাসীরা বেশ অনুভব করিতেছেন একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি। আরও একটা কথা তেমনি সাহসের সহিতই বলিতে পারি যে, সহরের বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যদি আগড়পাড়ার ন্যায় 'গ্রামে' আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে গোল্ডস্মিথের "Deserted Village" টীকা টিপ্পনীর সাহায্যে বুঝিবার আবশ্যক হয় না। যাঁহারা কর্ম্মব্যপদেশে সপরিবারে একবার বিদেশে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই আর ফেরেন নাই, যাঁহারা অধিকদিন প্রবাসে থাকেন, তাঁহারা পল্লীভবনের ঠাট বজায়

রাখিলেও সহজে ফিরিতে চাহেন না। যাঁহাদের কলিকাতায় নিজস্ব বাসবাটী অথবা নিকট আত্মীয়ের ভবনে বাসের সুবিধা আছে, তাঁহারা মাঝে মাঝেই সহরে বাস করিতে যান এবং মালী রাখিয়া না গেলে অধিকদিন পরে গ্রামে ফিরিয়া আসিলে সদর ও ভিতর বাড়ীর উঠানের জঙ্গল কাটাইয়া ঘরের দালানে উঠেন! যাঁহাদের কলিকাতায় ওরূপ সুবিধা নাই অথচ সঙ্গতি আছে, তাঁহারা বৎসরে অন্ততঃ বর্ষা ও শরৎ ঋতুটাও বাড়ীঘর ফেলিয়া কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া করিয়া কাটাইতে যান। যাঁহারা বারমাসই গ্রামে থাকেন, তাঁহাদের পাড়াতে রোগশূন্য দিন বিলাতের সূর্য্যোদয়ের মত সুখবাসর! তাঁহাদের অনেকেই নিত্যকর্ম্মের মধ্যে অনাহারে অথবা সাগু বার্লিতে বলসঞ্চয় করিয়া প্রভাতে কলিকাতা যাত্রা করেন এবং কম্পজ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কম্মক্লান্ত দেহভার লইয়া প্রদোষে গৃহে ফিরেন। কলিকাতা বা পশ্চিমের ফেরত কেহ গ্রামে আসিয়া দেখা দিলে পরিচিত গ্রামবাসী তাঁহাকে অন্তরের সহিত সাবধান করিয়া বলেন, "পালান্ পালান্, এক রাত্রিও এখানে বাস করিবেন না!" যদি কোন পল্লীসংস্কারক, কাগজের সম্পাদক, অথবা গ্রামের অবস্থানুসন্ধিৎসু পল্লীর ধাত বুঝিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাকে গ্রামের মধ্যে একবার অন্ততঃ অষ্টপ্রহর বাস করিয়া যাইতে হয়, মোটরে করিয়া বেড়াইতে গেলে অথবা পুষ্পপত্রাদিশোভিত, কার্পেটফরাসমণ্ডিত সভাস্থলে বক্তৃতা দিয়া গেলে তাঁহার গ্রাম সম্বন্ধে কোন ধারণাই হয় না।

গঙ্গার পূর্ব্ব উপকূলে যে সকল ম্যালেরিয়াবিধ্বস্ত গ্রাম আছে তন্মধ্যে আগড়পাড়া অন্যতম। এখানে খ্রীষ্টান মিশনরীদের প্রকাণ্ড দুর্গতুল্য অট্টালিকা, রাণী রাসমণির সুবিস্তীর্ণ সুন্দর উদ্যানসমন্বিত ঠাকুরবাড়ী, 'বিবির স্কুল' আর না থাকিলেও দেশী খ্রীষ্টানদিগের আশ্রয় স্থান হইতে সমাধি স্থান পর্য্যন্ত এবং বালিকাবিদ্যালয় এখনও আছে। বালকদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাবলিক লাইব্রেরী, সখের থিয়েটার, হরিসভা, দু'একটি ঔষধালয় এবং কয়েকখানি দোকান দেখিতে

পাওয়া যায়। দুর্গাপূজার সময় কয়েকখানি বনেদী বাড়ীতে ধূমধামের সহিত প্রতিবৎসর দুর্গাপূজাও হয়। কলিকাতায় বাঙ্গালা ও মাড়য়ারী ধনীদের উদ্যানবাস উপলক্ষে মোটরের যাতায়াত ক্রমেই বাড়িতেছে, কিন্তু পল্লীর প্রতি শনির দৃষ্টি ঘুচিতেছে না। আমাদের চিরসংস্কার ছিল শৃগালেরা রাত্রির চারিপ্রহরে চারিবার ডাকিয়া থাকে। আগড়পাড়ায় কিন্তু তাহারা অষ্টপ্রহরই ডাকে এবং আট বার অপেক্ষা অনেক বেশী বার ডাকে। তাহারা অরণ্যে ও শ্মশানে কতবার ডাকে কে জানে! কাক শৃগালের ভাষা কেহ কেহ বোঝেন এবং সামুদ্রিক জ্যোতিষ প্রভৃতির জ্ঞান ও চরিত্রানুমান বিদ্যাও অনেকের আছে, তাঁহারাই বলিতে পারেন কেন আগড়পাড়ার শৃগালেরা অতবার ডাকে, দিবা দ্বিপ্রহরেও ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে, পথিকের বামেও গমন করে দক্ষিণেও যায়, আর তাহারা গ্রামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই বা কি বলে? এখানে তাহারা মুসলমানের বাড়ী হইতে হাঁস মুর্গী আর হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে, ছাগলটা, হাঁসটা, বিড়ালছানা, কুকুরছানা আর পথ পাইলে পুকুর হইতে মাছটা কাঁকড়াটাও ধরিয়া লইয়া যায়। হাঁ, বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আগড়পাড়া পানিহাটী মিউনিসিপালিটীর অধিকারভুক্ত। তাই ভরসা হয়, গ্রামের প্রতি শনির দৃষ্টি যদিই পড়ুক মিউনিসিপালিটীর শুভদৃষ্টি পড়িলে ইহার নষ্টশ্রী এখনও ফিরিতে পারে।

ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর উদরে স্থান পাইতে পাইতে সন্ধ্যার বাতি জ্বালিবার লোকের অভাবে এখানে অনেকের বাড়ী 'পালানে বাড়ী' হইয়া পড়িয়াছে। সেই সকল বাড়ী ও যাঁহারা ম্যালেরিয়াকে ফাঁকি দিয়া জানমান লইয়া সহরাঞ্চলে বা বিদেশে পলাইয়াছেন তাঁহাদের বড় বড় বাড়ী ও সুন্দর সুন্দর উদ্যান বনজঙ্গলে, হনুমান্ শৃগালাদির বাসায়, ভগ্ন ছাদ, প্রাচীরাদির স্তূপ, ভেকভুজঙ্গের আলয়ে ও তস্করের আশ্রয়ে পরিণত হইয়াছে এবং পুকুরগুলি মজিয়া যাইতেছে! ৪২ বৎসর পূর্ব্বে আগড়পাড়া ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে ম্যালেরিয়া প্রথম মহামারীর আকারে দেখা দিয়াছিল। এখন তাহা বনেদী হইয়া পড়িয়াছে।

প্রথম আক্রমণে গ্রামের লোক পিপীলিকার মত মরিয়াছিল, এখন উহা ক্রমশঃ যেমন অনেকটা গা-সওয়া হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি আক্রমণ করিবার মত লোকের সংখ্যাও কমিয়াছে। কিন্তু আদমসুমারীর গণনায় গ্রামের লোকসংখ্যা যেমন কমিতেছে, আর এক জাতীয় জীবের সংখ্যা তেমনি বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে পল্লীবালক-বালিকার আনন্দ ও লোকের কৌতুকবর্দ্ধক দুই একটা হনুমান্ মধ্যে মধ্যে দেখা দিত, ক্রমে ম্যালেরিয়া যখন তাহাদের অভিযানের পথ পরিষ্কার করিয়া দিল তখন তাহারা একটি দুইটি করিয়া ক্রমে দলে দলে আসিয়া ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত উদ্যান-স্বামীর উপেক্ষা ও অবহেলায় অরক্ষিত ফলবান্ বৃক্ষলতাপরিবৃত উদ্যান ও স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত ভগ্ন অট্টালিকার সর্পশৃগালাদিরক্ষিত দুর্গ অধিকার করিতে লাগিল। এখন বারমেসে ফলের গাছ বড় দেখাই যায় না। হনুমানের উপদ্রবে আর ফুল ফল বাঁচাইবার উপায় নাই। গৃহস্থের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে বা উদ্যানে একটা বেগুন গাছ করিয়া তাহার ফল খাইবার জো নাই। পেঁপে গাছ ত আর গ্রামের মধ্যে দেখাই যায় না। সজিনা গাছও নিম্মূলপ্রায়, তাহার ডালে পাতাটি পর্য্যন্ত গজাইতে পায় না। আমের বউল ধরিলে হনুমান্ তাহা খাইতে আরম্ভ করে, নারিকেলের জল ধরিতে না ধরিতে তাহা খাইয়া ফেলে, বেল কাঁচাতেই কামড়াইয়া কতক খায় কতক ছড়ায়, আম লিচু প্রভৃতি গাছের নূতন পাতা গজাইলেই তাহা উদরস্থ করে। তাহারা পল্লীবধূ ও শিশুদিগকে ভয় করা দূরে থাক, দগ্ধমুখে দন্তবিকাশের দ্বারা রসিকতা করিতে ভালবাসে এবং সময়ে সময়ে তাড়া করিতেও ছাড়ে না। মধ্যে মধ্যে হনুমানের কামড়ে বালক ও স্ত্রীলোককে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে শুনা ও দেখা যায়। ম্যালেরিয়া ঋতুবিশেষে দুর্ব্বলের প্রতি বল প্রকাশ করে, কিন্তু পৌরাণিক ঘরপোড়ার বংশধর নামে প্রসিদ্ধ এই চতুর্ভুজ পশু বারমাসই গ্রামে অত্যাচার করিতেছে। এই দুর্ম্মূল্যের দিনে গ্রামে গরীব দুঃখী যে দুই একটা আনাজ তরকারীর গাছ করিয়া খাইয়া বাঁচিবে তাহার জো নাই, হনুমান্ তাহার মুখের গ্রাস

গ্রাস কাড়িয়া লইবে। এই চতুর্ভুজ পশু বিধাতার বরে দীর্ঘজীবী, অব্যাহতগতি, ও সুস্থসবল হইয়া ম্যালেরিয়ার সহচররূপে মানুষের সমাজ বা আইনের কোন বাধা না পাইয়া চক্রবৃদ্ধিহারে বংশ বিস্তার করিতেছে। হিন্দুর বিশ্বাস, যদিও হিন্দুমাত্রেরই নয়, যে রামচন্দ্র বানর নামক বনের পশুর সাহায্যে লঙ্কাজয় ও সীতাউদ্ধার করিয়াছিলেন। হনুমান্ রাক্ষসনিগ্রহকারী, রামভক্ত ও মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি অবলীলাক্রমে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে ও দেশভাষায় কথা কহিতে পারিতেন এবং মন্ত্রণায় সভ্যতম জগতের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক অপেক্ষা কম বুদ্ধি ধারণ করিতেন না। তাঁহার স্বজাতিবর্গ সকলেই রামসৈন্যদল পুষ্ট করিয়া সাগর পার হইয়াছিল। তাহাদের ভাষা মানুষ ও রাক্ষস উভয়েই বুঝিত। বাল্মীকি রামায়ণে সুন্দর ও লঙ্কাকাণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধি ও কার্য্যসিদ্ধি ইঁহারই আয়ত্ত; বল, উৎসাহ ও শাস্ত্রবোধ ইঁহারই ছিল। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে আছে, হনুমানের বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—"ঋগ্বেদজ্ঞ, যজুর্ব্বেদজ্ঞ ও সামবেদজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত অপর কেহ ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না। ইনি অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু একটিও অপশব্দ প্রয়োগ করেন নাই। বোধ হয় ইনি ব্যাকরণ প্রভৃতি বিবিধ ব্যুৎপাদক গ্রন্থ বহুবার অধ্যয়ন করিয়াছেন। বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠগত মধ্যম স্বর অবলম্বন পূর্ব্বক পদবিন্যাসক্রম অতিক্রম না করিয়া শ্রুতিকটু-পদশূন্য বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।" আরও উক্ত হইয়াছে যে পরাক্রম, উৎসাহ, বুদ্ধি, প্রতাপ, সুশীলতা, মাধুর্য্য, নীতিজ্ঞান, গাম্ভীর্য্য, বীর্য্য এবং ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণে হনুমান্ অপেক্ষা ইহলোকে কেহই অধিক নাই। অপিচ, এই কপিবর সূত্র, বৃত্তি, মহাভাষ্য এবং সংগ্রহের সহিত মহার্থযুক্ত মহৎ গ্রন্থ অর্থতঃ গ্রহণ করিয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার সদৃশ শাস্ত্রবিশারদ আর নাই। ইনি সমস্ত বিদ্যা—কি ছন্দঃ, কি তপোবিধান সকল বিষয়েই সুরগুরুকে স্পর্দ্ধা করেন! কিন্তু এই সকল পল্লীসুখশান্তিহারক ফলতস্করকে সেই হনুমান্ ও তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের বংশধর বলিয়া লোকে রামানুচর মহাপণ্ডিত ও পরম

বৈষ্ণবের অবমাননা করিয়া থাকে। গোল বাধিয়াছে পোড়া মুখ ও লম্বা ল্যাজ লইয়া। কিন্তু সেই হনুমানের ল্যাজ ছিল বলিয়া ইহাদের নহে, এই হনুমানের ল্যাজ আছে বলিয়া সেই হনুমানের ল্যাজ আরোপিত হইয়াছে, এবং লঙ্কাদাহন কালে সেই হনুমানের মুখ পুড়িয়াছিল বলিয়া এই হনুমানের পুরুষানুক্রমে মুখমণ্ডলে ছাপ পড়িতেছে! আবার রাবণবধের পর অযোধ্যার রাজবাড়ীতে প্রীতিভোজের নিমন্ত্রণরক্ষা কালে হনুমান্‌চন্দ্র সাক্ষাৎ মহাদেবের অবতার বলিয়া সীতাদেবীর হস্তে ধরা পড়িয়া যাওয়ায় তদবধি নাকি হনুমান্ বংশের আভিজাত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইতে এক্ষণে লোকের সংস্কারগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই যদি কেহ এখানে মানুষকে গ্রামবাসী করিতে হনুমান্‌গোষ্ঠীকে গ্রামছাড়া করিবার প্রস্তাব করে অথবা মানুষের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এই পশুর প্রাণ নাশের ইঙ্গিত করে তাহা হইলে তাহার ধর্ম্ম ও বংশলোপের আশঙ্কা করা হয় এবং গ্রামের সহিত সম্পর্কবিহীন সংবাদ ও সাময়িক পত্রে তাহার নিন্দা হয়। শ্রীরামচন্দ্র হইতে রাজপুত ও মোগল রাজারা যেরূপ মৃগয়া করিতেন, মৃগয়ার উল্লাস ও উৎসাহ এখনও সেইরূপই আছে। বরং অধুনা য়ুরোপীয় শিক্ষাপ্রিয় রাজপুরুষ ও রাজবন্ধুগণ পুরুষোচিত ক্রীড়া, রসনার তৃপ্তি ও ব্যসনামোদার্থ যেরূপে স্বচ্ছন্দ-বিহারী নিরীহ পশুপক্ষী সংহার করিয়া থাকেন আমরা তাহার অনুমোদন করি না। কিন্তু সর্পব্যাঘ্রাদি হিংস্রজীবের ন্যায় গ্রামবাসীর সুখশান্তিহরণকারী শাখামৃগকুলকে বিনাশ না করিলেও তাহাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের ব্যবস্থা করা রাজা প্রজা উভয়েরই অবশ্য-করণীয় বলিয়া মনে করি। অত্যাচারী মানব আইনের হস্ত হইতে পলাইয়া অব্যাহতি পায় না। কিন্তু এই অত্যাচারী পশু দণ্ডবিধি আইনের বহির্ভূত বলিয়া নাগরিক স্বাধীনতা লাভ করিয়া পল্লীকে শ্রীভ্রষ্ট ও গ্রামবাসীর ভীতিবৃদ্ধি করিতেছে। 'রূপকথায়' শুনা যায় হনুমান্ ভারতবাসীর মুখ চাহিয়া তাহাদের রসনার তৃপ্তির জন্য লঙ্কায় অমৃতফল খাইয়া তাহার আঁটি তথা হইতে ছুড়িয়া সাগর পার করিয়া

দিয়াছিল। তাহা হইতেই ভারতভূমে রসালের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই হনুমানের বংশধর তাহাদের গোষ্ঠীপতির আরাধ্য রামচন্দ্রের স্বজাতি-বর্গের প্রতি আজ বিরূপ হইল কেন? মানুষের হনুমান্ সম্বন্ধীয় সংস্কার অক্ষুণ্ণ থাকিলেও মানুষের সম্বন্ধে রামচন্দ্রের স্বজাতি বলিয়া সংস্কার হনুমান্‌বংশের বোধ হয় আর নাই। তা না থাক্, আগড়-পাড়া এবং তত্তুল্য হনুমান্ প্রপীড়িত ও অষ্টপ্রহর শৃগালের ঘোর রবে আরাবিত পল্লীর প্রতি প্রতিকারক্ষম গ্রামসংস্কারকগণের দৃষ্টি প্রার্থনা করি। হনুমানের অত্যাচারে লোকের গাছপালার প্রতি যত্ন নাই, বন কাটিয়া ফলফুলের বাগান করিবার আগ্রহ নাই, উদ্যান ও পুষ্করিণী আবর্জ্জনাশূন্য করিবার শক্তি ও প্রবৃত্তি নাই। কাজেই আগাছায় ও আরণ্য লতাগুল্মে উদ্যান বনজঙ্গলময় ও পুষ্করিণী লতা পাতা পচিয়া আবর্জ্জনাপূর্ণ হইতেছে তৎপ্রতি কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। চতুর্দ্দিকের খানা ডোবা ম্যালেরিয়া-বীজবাহী মশকবংশ-বৃদ্ধির প্রশস্ত ক্ষেত্র এবং মলমূত্রপূর্ণ পুষ্করিণীর দূষিত দুর্গন্ধময় বাষ্পে বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত হইয়া ম্যালেরিয়া বিস্তারের সহায়তা করিতেছে। গ্রামের সাধারণের ব্যবহৃত পুষ্করিণীগুলি বহুবর্ষ ধরিয়া একাধারে স্নানাগার, পানাগার, বিণ্মূত্রমলিন-বস্ত্রধৌতাগার, জলশৌচাগার, মুখ-প্রক্ষালনাগার ও মূত্রকুণ্ডের স্থান অধিকার করিয়া আছে। জল নারায়ণ সুতরাং তাহাতে দোষ নাই। কিন্তু একটি অর্দ্ধ বিঘা পরিসর বদ্ধ জলাশয়ে পাঁচশত মণ মূত্র ঢালিয়া দিলে সে জল যদি দূষিত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের কাটান পুষ্করিণীতে প্রত্যহ অন্ততঃ দুই একজনের প্রস্রাবও পতিত হওয়ায় তাহার জল সেইরূপই দূষিত অস্পৃশ্য মনে করা উচিত। কিন্তু সাধারণে সে জল ব্যবহার ত করেই, অধিকন্তু রোগীর বস্ত্রাদি ধৌত ও প্রস্রাব করিতেও ক্ষান্ত হয় না। ইহা শতকরা ৭৫ টি অশিক্ষিত জনপূর্ণ দেশের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। যাঁহারা পল্লীস্বাস্থ্যরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, যাঁহারা ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহাদের স্বতঃই রোগের নিদানভূমি গ্রামের বনজঙ্গল

ও পুষ্করিণীর প্রতি দৃষ্টি পতিত হউক। পল্লীসমাজের উচ্চ নিম্ন, ধনী নির্ধন, স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হউক, যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম, সংবাদ ও সাময়িক পত্রের ভাষা এবং বক্তৃতার মর্ম্ম সকলের বোধগম্য হয়।

পল্লীগ্রামের পুষ্করিণীর জল বিশ্লেষণ করিয়া তাহা প্রাণীদির সংস্পর্শে বিশুদ্ধ পানীয় জল হইতে কত পরিমাণ দূষিত ও রোগবীজাণুর সূতিকাগারে পরিণত হইয়াছে, সেই সকল বীজাণুপূর্ণ জল পান ও তাহাতে স্নানাদি করিলে কোন্ রোগ কি ভাবে উৎপন্ন হইতে পারে, কোন্ রোগ আক্রমণ করিলে দেহের মধ্যে কিরূপ বিকার সাধন করে, তাহার পরিণাম ভবিষ্যবংশীয়দিগের পক্ষে কতদূর শোচনীয় তাহা গ্রামের স্থানে স্থানে প্রকাশ্য সভা করিয়া স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিশারদ পণ্ডিতগণের আলোকচিত্রাদি সাহায্যে নরনারীর হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। সমাজ এ পর্যন্ত যেভাবে শিক্ষিত বা গঠিত হইয়াছে তাহাতে ভাগবত পাঠ, কথকতা কীর্ত্তন, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি স্থলে জনসমাগমের জন্য ভাবিতে হয় না। শিক্ষার এরূপ ভাবে বিস্তার করিতে হইবে এবং স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা এরূপ চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে যাহাতে সকলেরই তাহা শুনিবার, বুঝিবার ও বুঝিয়া ভীষণ ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্তি জন্মে।

ম্যালেরিয়া ও চাকরি ভদ্রপরিবারে নির্জীবতা আনিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর সবলকায় সদাপ্রফুল্ল, শ্রমসহিষ্ণু, সাহসী নরনারী ক্রমাগত অল্পাহার, উপবাস ও অপুষ্টিকর আহার এবং অসংযম দ্বারা দেহকে এরূপ দুর্ব্বল ও রোগপ্রবণ করিয়া ফেলিয়াছে যে তাহারা আত্মরক্ষার শক্তি এককালে হারাইয়া বসিয়াছে। তাহাদের কোটরগত নিষ্প্রভ নয়নদ্বয়, উৎসাহহীন চিন্তামলিন মুখমণ্ডল, যৌবনে জরার আক্রমণ এবং অবসন্ন শীর্ণদেহ দেখিলে গ্রাম যে প্রকৃতই অভিশপ্ত তাহা বুঝা যায়। গ্রামের বাঙ্গালী হিন্দুমুসলমানের মধ্যে শ্রমিক বড় দেখা যায় না। হনুমানের মুখ হইতে আম কাঁটাল বাঁচাইবার ক্ষমতাও লোপ পাইতেছে।

ফলে হিন্দুস্থানী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অল্প টাকায় বাগান জমা লইয়া সহরে বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হইতেছে, উড়িয্যার লোক দলে দলে আসিয়া লোকের বাড়ীতে ভৃত্যের, বাগানে মালীর ও হাটবাজারে মুটেমজুরের কাজ করিতেছে। অল্প পুঁজীর হিন্দুস্থানী ও মাড়-য়াড়ী ব্যবসাদার কাপড়, মিঠাই, কেরোসিন তেল প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে এবং কাবুলীরা গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া উচ্চ-সুদে টাকা ধার দিয়া দরিদ্র গ্রামবাসীর অর্থ শোষণ করিতেছে। আর পতিতপাবনী গঙ্গার কূলে কূলে পাট, চট আর তেলকলের কল্যাণে পশ্চিমা কুলী মজুরের সংখ্যা ও প্রভাব এতই বাড়িয়াছে যে স্থানীয় মোল্লারহাটে চাষাদের হাতে নটে শাকটি পর্য্যন্ত ওজন দরে বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কামারহাটীর কলবাড়ীর কুলীরা গ্রামের লোকের বাগানে গিয়া গাছের শুক্না ডাল ভাঙ্গিয়া মোট বাঁধিয়া বা ঝুড়ী ভরিয়া লইয়া যায়, কাহারও বারণ শোনেও না আর গ্রামের নিবারণক্ষম চাকরিজীবী পুরুষগণ রুগ্ন না হইলে সমস্ত দিন বাড়ী থাকেন না। সুতরাং কাহার সাড়াও পাওয়া যায় না। গ্রামের সাড়া পাইতে হইলে দেখিতে হয় ভোর হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে টিটাগড়, ইছাপুর ও কলিকাতা-যাত্রীদিগের ষ্টেশনাভিমুখী ত্রস্তগতি এবং শুনিতে হয় সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে তাঁহাদের প্রত্যাগমনের পদশব্দ। প্রতি সপ্তাহে, দুইটি হাটবারেও দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বেশ সাড়া পাওয়া যায়। রবিবার বিশ্রামবার সুতরাং কিছু বলাই বাহুল্য। অধুনা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম কামার-হাটীর কলের অনেক কুলীমজুর প্রতি শনিবার অপরাহ্ণ কালে তাড়ি বা মদ খাইয়া পরস্পরের মধ্যে যেরূপ কলহ, কুৎসিত আলাপ, ও বীভৎস চীৎকার করিতে করিতে গ্রামের ভিতর দিয়া গমন করে তাহাতে পল্লীসমাজ, মিউনিসিপালিটী অথবা পুলিসের যে কোন প্রকার শাসন বা প্রতিকারের ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে তাহা মনে হয় না। এদিকে রাত্রিতে চোরের উপদ্রব মধ্যে মধ্যে অতিশয় বৃদ্ধি পায়। কয়েকদিন হইল এক রাত্রিতে মুষ্টিমেয় স্থানের মধ্যে তিনচারিটী

বাড়ীতে সিঁধ কাটিয়া চোর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। চুরির সংবাদ ত প্রায়ই পাওয়া যায়। গ্রামে দিবাভাগে লালপাগড়ী ত দেখাই যায় না; রাত্রিতেও কাহার সাড়া পাওয়া যায় না। যে রাত্রিতে কোথাও চুরি বা সিঁধ হয়, সেই রাত্রি বা তাহার পররাত্রি এক আধ বার চৌকীদারী হাঁক শুনা যায় মাত্র। শুনিলেই বা কি? বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য-সাহস-ঐক্য-বিহীন গ্রামবাসীর কোন্ নিভৃত নিবাসের প্রাচীর গাত্রে কোন্ তস্কর কখন সিঁধ কাটিতেছে, তাহা মুষ্টিমেয়ের মধ্যে কোন্ সতর্ক প্রহরী সন্ধান রাখিয়া নিবারণ করিতে ও গৃহস্থকে রক্ষা করিতে পারে?

গ্রামের অভাব এবং অভিযোগ অনেক, আজ প্রধান প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করা গেল। এখন প্রতিকারের ভার যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইলেই অভিশপ্ত গ্রামের গ্রহ কাটিতে পারে।

মানবমনে ধর্ম্মভাব ও তাহার অনিবার্য্য প্রয়োজনীয়তা।

(শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত, বি-এ)

পরিদৃশ্যমান্ জগতের উৎপত্তি, বিকাশ ও লয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস ও কারণনির্দ্দেশ অনন্তাভিসারী সমুদ্রের ন্যায় যেমন অসীম তেমনি অননুমেয়। সৃষ্টিমাত্রই কার্য্যপরম্পরা নির্দ্দেশ করে; কিন্তু জাগতিক সৃষ্টি-প্রহেলিকা এতই জটিল ও দুর্ব্বোধ্য যে, এ প্রপঞ্চের আবরণ উন্মোচন করা সাধারণ মানবের পক্ষে চিরদিনই এক রহস্যময় অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে। নানা তর্ক-যুক্তি দ্বারা এই প্রহেলিকাবাদ ছেদন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আর

নানা দিগ্দেশাহৃত নীতিবাক্যের উদ্ধৃতাংশ দ্বারা বিভিন্ন পুষ্পসংযুক্ত সুরভিমাল্যের ন্যায় দিব্য এক আকর্ষণের বস্তু প্রস্তুত করা যায় সত্য, কিন্তু অপগত দিবসের মাল্যের ন্যায় চিরকালই উহা বিশুষ্ক, সুতরাং প্রাণহীন হইয়া থাকে। অতএব মানবমনের স্বাভাবিকতার উপর নির্ভর করিয়াই স্বাধীনভাবে আলোচ্য বিষয়ের বিচারে অগ্রসর হইব।

এ বিশ্বের প্রথম আবরণ, যাহা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে, তাহা অনন্ত বিচিত্রতাময়। এ বৈচিত্র্যের অভিনবত্ব কখনও অপকর্ষ লাভ করিয়াছে, এরূপ শুনা যায় নাই। এই বিচিত্রতার সম্যক্ বিশ্লেষণ করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশাধিকার অতীব দুঃসাধ্য, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। অপর দিকে, প্রাজ্ঞোক্তি বা সাধুদিগের সাধনা-সম্ভূত উপদেশাবলীর সারাংশ মানবহৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগরণের সহায়ক হইতে পারে কিন্তু এ সমস্ত কখনই ধর্ম্মরাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব সম্পূর্ণ বোধগম্য করাইয়া দিতে পারে না। শাশ্বত সত্য চিরস্বাধীন। পরাধীনতায় স্বাধীনতা মিলে কই? সুতরাং হে অমৃতের পুত্র! এস, একমাত্র উত্তরাধিকার। সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া মহাযোগী লোকগুরু শ্রীবুদ্ধের ন্যায় স্বাধীনভাবে স্বীয় ধর্ম্মরাজ্যে বিজয়াভিমানে অগ্রসর হই। প্রয়োজন হইলে সময়ে সাহায্য লইব। প্রথমেই নিজকে বুঝিবার সুযোগ ছাড়িয়া বহির্মুখীনতার আবেগে রাশীকৃত শাস্ত্রোপদেশ মস্তিষ্কে লইয়া ধর্ম্মোন্মাদনার বৃথা ভণ্ডামিতে কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে?

চিন্তাই সৃষ্টি। জগৎ যতই বৈচিত্র্যময় হউক না কেন, তোমার আমার চিন্তা ও ইচ্ছা-অনুযায়ী দৈনন্দিন ইহার অসংখ্য প্রতিরূপ গঠিত হইতেছে। এইরূপে আবার অগণিত জীব কতই না বিভিন্ন দৃষ্টিতে এই বিচিত্রতা দেখিতেছে, বিভিন্নভাবে এই বিচিত্রতার ভোগ আস্বাদন করিতেছে। বলিতে পার, এ ভোগ-সম্ভার তুমি দেহের ন্যায় নশ্বর ইন্দ্রিয়সমষ্টির সাহায্যে নিজের গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছ মাত্র। উহাদের সাহায্যে তুমি যে কোন কল্পনা বা সত্য বুঝাইয়া দাও না কেন, উহাকে একমাত্র সত্যজ্ঞানে গ্রহণ করিব কিরূপে? উত্তরে এইমাত্র

বলিতে চাই, হে ধীমান্, বৃথা তর্কজাল বাড়াইও না। দেহজ্ঞানের লেশমাত্র থাকিতে উহার নশ্বরত্ব যতই প্রমাণ কর না কেন, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় উহার অস্তিত্বের উপর বহুধা নির্ভর করিয়াই তোমাকে এ বিচারে অগ্রসর হইতে হইবে। কদাচিৎ শুকদেবাদি পৃথিবীতে শুভাগমন করেন, যুগযুগান্তরে কদাচিৎ ব্রহ্মাবগাহী ঋষি লোকালয়-দ্বারে পরাজ্ঞানের বর্ত্তিকাহস্তে উপস্থিত হন সুতরাং তোমার আমার স্বর বাধ্য হইয়া দুই এক গ্রাম নীচে রাখিতে হইল বলিয়া আক্ষেপ করিবার কারণ নাই। মানবসাধারণকে ইন্দ্রিয়রাজ্যের ভিতর দিয়াই অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

স্থিরবুদ্ধি লইয়া অন্তর্বহিঃ যে দিকেই বিচার-চক্ষু ফিরাই না কেন, সর্ব্বত্রই দ্বৈতলীলা ওতপ্রোত ভাবে প্রবাহাকারে ছুটিতেছে দেখিতে পাই। দিবস-রজনী, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুভাশুভ, আলো ও অন্ধকার, সকলই দ্বৈতভাব সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দেয়। এই দ্বৈতভাবই জীবত্বের সর্ব্বসম্পদ্। আবার রহস্য দেখিতেছি, অসংখ্যাকারে প্রবর্ত্তিত এই দ্বৈতভাবকে 'সৎ ও অসৎ' বা 'ভাব ও অভাব' এইমাত্র সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। একই অবস্থা ক্রিয়াশূন্য। একমাত্র 'সৎ' বা 'ভাব'কে লইয়াই সৃষ্টি হয় না। আদি পুরুষ অ্যাডাম আপেল ভক্ষণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সৃষ্টি-লীলা বুঝেন নাই। 'সৎ' বা 'ভাব' পদার্থ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারায় ন্যায় একই সত্তায় স্থিতিশীল। বিকৃতিবিহীন কোন কিছুই সৃষ্টিগ্রাহ্য হইতে পারে না। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, কোন অনামা অদিনে, কেন জানিনা, যখন এই 'সৎ' বা 'ভাব' সমুদ্রে 'অসৎ' বা 'অভাবের' উদ্বেল তরঙ্গ উত্থিত হইল, তখন হইতেই এই দ্বৈতভাবের অপ্রতিহত প্রবাহ সৃষ্টিলীলার প্রহেলিকায় জীবত্বকে পরিখাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সেই দিন একত্বে বিচ্যুতি, তাই এ অভাব; মিলনে বিচ্ছেদ, তাই এ বিরহ! সে এক অপূর্ব্ব রহস্যময় মুহূর্ত্ত, যখন জীবত্ব তাহার 'ভাব' নিকেতন হইতে 'অভাবকে' সঙ্গে লইয়া এ জগৎপ্রাঙ্গণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। 'অভাব' আনিয়াছে সঙ্গে বিস্মৃতি, যাহার

সম্মোহন বীণার অমোঘ ঝঙ্কার 'ভাব'-রাগিণীর বাস্তব সুরকে ক্ষীণতম করিয়া সৌদামিনীঝলকের ন্যায় চকিতে উহাকে শ্রুতির স্পর্শে আনিয়া আবার তখনি কোথায় ঢাকিয়া ফেলিতেছে!

সুতরাং জীবত্ব জন্মাবধি চিনিয়াছে 'অভাব', যথাসাধ্য বুঝিয়াছে তাহার লীলা, শিখিয়াছে অহর্নিশি তাহারই তীব্র লীলা-বিলসন। ইহারই বা অন্ত কোথায়? যেখানেই হউক না কেন, এই 'অভাবের' কোন লীলাই যে মানবকে তাহার চিরাভীপ্সিত শান্তি দিতে পারিতেছে না, ইহা স্বতঃই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। কিন্তু হইলে কি হয়, জীবত্বের এমনই বৃত্তি যে 'অভাবের' শত কষাঘাতে উহার সর্ব্বসম্পদে ক্ষণিক অলীকতা বোধ আসিলেও, অনুক্ষণ উহারই অনুগামী হইতেছে। কিন্তু উপায় কি নাই? 'অভাব'-তাড়না শুধু 'অভাব'কেই শিক্ষারূপে না রাখিয়া অপর কোন শিক্ষাই কি রাখিয়া যাইতেছে না? যদি না রাখিতেছে, তবে 'ভাব'-বোধই বা কোথা হইতে আসিল? সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখা যাইতেছে যে, এই 'অভাব' 'ভাব'কে বোধগম্য করাইয়া দিতেছে না সত্য, কিন্তু 'ভাব'-রাহিত্যই সর্ব্বদুঃখের আকর এবং 'ভাবে'র চিরাশ্রয় লাভই সর্ব্বদুঃখ নিরসনের একমাত্র উপায়, ইহা অলক্ষ্যে মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া যাইতেছে। 'অভাব'-বিমুখতা বা 'অভাব'-রাহিত্যই উপায়, ইহাই 'অভাবে'র, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত যাবতীয় দ্বৈতভাবের একমাত্র শিক্ষা। জীবত্বের নিজ সমস্যাপূরণে এই শিক্ষাই কি তাহার বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট একমাত্র অবলম্বন নহে? হে মানব! সর্ব্বশুভদাতা এই 'অভাব' শিক্ষককে তুমি কখনও নিন্দা করিও না। গুরুরূপী 'অভাব' অনন্ত কল্যাণের নিদান। তুমি স্থিতধী হইয়া এই গুরুর শরণাপন্ন হও। তাহার অমৃতনিস্যন্দিনী শিক্ষামন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া ধন্য হও। তোমাকে ভবার্ণবের উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা দেখিয়া ভীত হইতে হইবে না। দাও দক্ষিণা এই গুরুর পায়, সেই 'অভাব'-বিমুখতা, যাহাকে অবলম্বন করিয়া তুমি তোমার স্বরাজ্যে—'ভাব'-সম্পদে অলঙ্কৃত হইতে পারিবে।

এই 'অভাব'ই মানবকে তাহার স্বরূপ চিনাইয়া দেয়। কোন

অঙ্গ আহত বা পৃষ্ট হইলে যেমন ঐ স্থান নির্দ্দেশের জন্য অন্য কাহারও প্রয়োজন হয় না, শীতার্ত্তকে দিবসে যেমন সূর্য্যকিরণের সন্ধান বলিয়া দিতে হয় না, তেমনই 'অভাব'-তাড়িত জীবকে 'ভাবা'শ্রয়ের শিক্ষা-দানের নিমিত্ত কাহারও অগ্রগামী হইবার প্রয়োজনীয়তা দেখি না। জীবের সত্তা নিয়েও 'অভাবের' শিক্ষাই তাহার পর্য্যাপ্ত শিক্ষা। শাস্ত্রোপদেশ প্রয়োজনীয় হইলে পিপাসার্ত্তের ন্যায় জীব আপনিই তাহার প্রয়োজনানুযায়ী উপদেশ-সলিলের দিকে ধাবিত হইবে। আর যদি তোমার 'চাপরাস্' থাকে তবে অগ্রবর্ত্তী হও; নতুবা তোমার অভিমানমূলক স্বীয় মত প্রচারের নিষ্ফল প্রয়াসে জগৎ মন দিতে পারে না, তোমারও সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

অন্ধ, সে অতি অন্ধ, যে জন্মসহচর 'অভাব' গুরুর শিক্ষায় মন দেয় না, তাহার তাড়নায় অভিনব দীক্ষা গ্রহণ করে না, 'কাঁটা ঘাস' খাইয়াও পুনরায় উষ্ট্রের ন্যায় 'অসৎ' এর শরণাপন্ন হয়। এ অন্ধকেও অপেক্ষা করিতে হইবে। এখানেও স্বাধীনতার পথই একমাত্র পথ দেখিতে পাই। তোমার উপদেশাবলী 'ঊষর ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বীজবৎ' এ অন্ধের হৃদয়-ক্ষেত্রে কোন বৃক্ষই উৎপাদন করিবে না। এ স্থলেও 'কালেনাত্মনি বিন্দতি' এ বাক্যের সফলতা দেখিতেছি।

সত্যানুভূতিই ধর্ম্ম। 'ভাব'-ঘন সত্যানুভূতিই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য। মানব যে শান্তির অনুসন্ধানে যুগযুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে, তাহা এই 'ভাব' সম্পদ্। ইহাই ধর্ম্মরাজ্য বলিয়া অভিহিত। যে কোন প্রকারেই হউক, এ রাজ্যে প্রবেশ না করিলেই নয়। তুমি যতই কেন 'অভাব'কে লইয়া থাকিতে চাও না, এ 'অভাব' কিছুতেই তোমাকে 'ভাব'-রাজ্যের সন্ধান না দিয়া নিরস্ত হইবে না। 'অভাবে'র দুর্ণিবার কষাঘাতে জর্জ্জরিত হয় না, এমন জীব কোথায়? চেতনার উদ্বোধন হইতে কালক্ষেপ হইতে পারে, কিন্তু এ রুদ্ররূপী 'অভাব' গুরুর তীব্র তাড়নায় কখনও উদ্বোধন হইবে না, হে মানব! তুমি পুনঃপুনঃ শিক্ষালাভ করিয়া এ বাক্যে প্রতারিত হইও না। দিন আসিবে, যখন তুমিই তোমাকে

চিনিতে পারিবে। 'অভাব'-রাহিত্যের দিব্যাভাস ক্ষণিকের জন্য হইলেও, একবারেই পাও নাই, এরূপ তুমি বলিতে পার না। সুতরাং তুমি দিব্য চক্ষু লইয়া আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাও। 'অভাবে'র নিকট যে শিক্ষা লাভ করিয়াছ, তাহারই সাহায্যে পলাইবার পথ নিজেই আবিষ্কার কর। তোমার নিজ হস্তেই রজ্জু রহিয়াছে। তুমি বৃথা আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া সাম্প্রদায়িক 'হুজুগে' আর মত্ততা দেখাইও না। 'যত মত তত পথ'। তুমি জীবনে দ্বৈতভাবের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়া যে শিক্ষা লাভ করিয়াছ, তাহারই অনুরূপ পথ স্বাবলম্বী হইয়া নিজেই আবিষ্কার কর। অপর যাহা কিছু সাহায্য প্রয়োজন হইলে অবশ্যই মিলিবে। তুমি নিজকে লইয়া ব্যাকুল হও। শত দৈন্য, দুর্বিপাকে 'ভাব' বা ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা তুমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছ। এই 'ভাব' বা ধর্ম্ম তোমার না হইলে চলে না। উহা তোমার মধ্যেই রহিয়াছে। তুমি সতর্ক হইয়া ধীরে ধীরে ঐ ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ কর। ভাবিও না, কেবল তুমিই এই 'অভাব'কে লইয়া উঠিতেছ। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এই রহস্যময় লীলা জগতে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং ভয় পাইও না। সাহসে বুক বাঁধিয়া 'দ্বারে আঘাত কর, উহা আপনিই খুলিয়া যাইবে।'

দ্বারকাধাম ও কয়েকটি তীর্থ দর্শন

(শ্রীঅতুল কৃষ্ণ দাস)

বাষ্পযান ও অন্যান্য নানাপ্রকার যানাদির নির্ম্মাণ ও ব্যবহারের সহিত তীর্থদর্শন অপেক্ষাকৃত অনেক সহজসাধ্য হইয়াছে। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে পুরীধাম বা কাশীধাম ভ্রমণ করিয়া বাড়ী ফিরিতে যে সময় লাগিত, এখন সেই সময়ে ভারতের চতুঃপ্রান্তস্থ চারিধাম দর্শন করিয়া আসা যায়। সেকালে চারিধাম দর্শন করা সাধারণতঃ একটা কল্পনার কথা ছিল ; কিন্তু এখন অনেকেই প্রতি বৎসর অনায়াসে উহা সম্পন্ন করিতে পারেন। কিন্তু দেবদর্শন সুলভ হওয়ার সহিত তীর্থযাত্রায় যে ধর্ম্মপ্রাণতা বর্ত্তমান ছিল তাহা বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। এখন তীর্থযাত্রা কতকটা সাহেবিয়ানা রকমের ভ্রমণ বা হাওয়াখাওয়ার স্থান অধিকার করিয়াছে। তীর্থগমনের পূর্ব্বে সংযম-পূর্ব্বক উপবাস এবং দেব ও পিতৃগণের পূজা, তীর্থস্থানে যথাশক্তি অন্নদান, কাম, ক্রোধ, আমিষাহারাদি বর্জ্জন এবং শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করণ প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মমূলক সদাচার প্রবর্ত্তিত ছিল এখন আর সেগুলি আচরিত হইতে দেখা যায় না। ফলতঃ, এখন কি করিয়া ভাল খাইব ও ভাল থাকিব সেই চেষ্টায় সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, দেব-দর্শন ও পূজাদি নামমাত্রে পর্য্যবসিত থাকে। বাস্তবিক ইহা বড় পরিতাপের বিষয়। কারণ, ইহাতে তীর্থ সকলের পবিত্রতা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে এবং প্রাচীন সদাচারগুলি পালন না করাতে আমরা তীর্থযাত্রার সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হইতেছি না। তীর্থযাত্রার দ্বারা কোন পবিত্র ভাব সংগ্রহ করা দূরে থাকুক, বরং অনেক সময়ে একটা ঘৃণার ভাব অর্জ্জন করিয়া আসি। আমার মনে হয় বর্ত্তমান শিক্ষা দীক্ষাই ইহার মূল কারণ। যাহা হউক, ক্ষণে প্রকৃত বিষয় আরম্ভ করা যাউক।

বহুকাল হইতেই চারিধাম দর্শন করা অতি সৌভাগ্যজনক বলিয়া সমাজে গণ্য হইয়া আসিতেছে। ইতিপূর্ব্বে আমার বদরিনাথ, পুরী,

রামেশ্বর এই তিনটি ধাম ঈশ্বরেচ্ছায় দর্শন হইয়াছিল। অবশিষ্ট ৺দ্বারকা ধামটি দর্শন হয় নাই, এই জন্য প্রাণটা বড় ব্যাকুল ছিল। সৌভাগ্যের কথা বলিয়াই যে ব্যাকুল ছিলাম তাহা নহে, তবে কার্য্যটি যেন অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল এই ভাবটি বড়ই ব্যাকুল করিয়াছিল। কিন্তু ব্যাকুল হইলে কি হয়, সাধু সন্ন্যাসী ত নই যে মনে করিলেই বাড়ীর বাহির হইতে পারি। কর্ম্মস্থান হইতে অবসর পাইতে ও অন্যান্য সুযোগ খুঁজিতে খুঁজিতে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে গত ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে ভগবান্ একটু সুবিধা করিয়া দিলেন। আমরা উক্ত মাসের ১৬ই তারিখে নাগপুর মেলে রওনা হইলাম। আমি একা ছিলাম না; আমার ভগ্নীপতি, দুইটি ভাগিনেয়, ভগ্নী ও স্ত্রী সঙ্গে ছিলেন। উপরন্তু আমার একটি বন্ধুর ভগিনী ও ভ্রাতুষ্পুত্রীও সঙ্গে ছিলেন। আমাদের দলটি একটু বড় হইলেও আপনা আপনির মধ্যে হওয়ায় নিতান্ত অসুবিধাজনক ছিল না। যাহা হউক, তৃতীয় দিবস প্রত্যুষে আমরা বোম্বাই প্রেসিডেন্সির নাসিক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশন হইতে নাসিক সহর প্রায় ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা নাসিক জেলার প্রধান সহর। সহরে যাইবার জন্য পেট্রোল ট্রাম, ঘোড়ার ট্রাম, একা, গরুর গাড়ি প্রভৃতি অনেক প্রকার যান আছে। পেট্রোল ট্রামের ভাড়া লোকপ্রতি ।৵০ এবং ঘোড়ার ট্রামের ৶০। ট্রামগুলি খুব শীঘ্র যায় বটে কিন্তু সংখ্যায় বড় কম; পুনশ্চ যতক্ষণ পূর্ণসংখ্যক যাত্রী না হয় ততক্ষণ ছাড়ে না। একার ভাড়ার কিছু ঠিক নাই, তবে ১৲ টাকার কম নহে। ইহাতে ৩ জন মাত্র যাওয়া চলে। যাঁহাদের সঙ্গে মাল আছে অথচ শীঘ্র যাইতে চাহেন তাঁহাদের একাই সুবিধা।

শীতকাল। তথাপি অতি প্রত্যুষে পাণ্ডা বা তীর্থগুরুগণ যাত্রী সংগ্রহের জন্য তথায় উপস্থিত দেখিলাম। অনেকে পাণ্ডাগণকে অতি ঘৃণ্যজীব, তীর্থের জঞ্জাল, অর্থ আদায়ের একটি যন্ত্র মনে করেন এবং যতদূর সাধ্য তাঁহাদের সহিত অভদ্রোচিত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, এমন কি, অনেকে পাণ্ডা দেখিলেই রাগান্বিত হন।

আমার মনে হয় এটা ঠিক নয়। অবশ্য পাণ্ডাগণ সাধারণতঃ অর্থপ্রয়াসী, আর বাস্তবিকই যখন যাত্রিগণপ্রদত্ত অর্থই তাহাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন, তখন আদায়ের জন্য একটু জিদ বা প্রার্থনা তাহাদের পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, তাহাদের এই দোষের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহারা যে আমাদের বিশেষ উপকারী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাস্তবিক তাহাদের সাহায্য ব্যতীত তীর্থ-দর্শন সম্পূর্ণ করা অতি দুরূহ। কারণ, কোথায় কি আছে সকলের জানা থাকে না, পরন্তু খোঁজ করিয়া সকলগুলির সন্ধান পাওয়া বড় কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ। যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে কোন তীর্থের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি নিঃশেষে দর্শনাদি করিতে হইলে পাণ্ডার সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও তাহারা আমাদের বিশেষ সাহায্যকারী—কোথায় থাকা উচিত, কোন্ বাসা ভাল, কোথায় খাবার জিনিষ ভাল এবং সস্তা মেলে, কোন্ কুয়ায় জল পানের যোগ্য এবং অস্বাস্থ্যকর নয় ইত্যাদির সন্ধান বলিয়া দেয়। আবার অসুস্থ হইলে ইহারা ডাক্তার ও ঔষধ আনাইয়া দেয় ও অন্যান্য নানা প্রকারে যজমানের যত্ন করিতে ত্রুটি করে না এবং যাহাতে জুয়াচোরের হস্তে না পড়িতে হয় তজ্জন্য সতত সাবধান করিয়া দেয়। বাস্তবিক পক্ষে পাণ্ডাদের জন্য কিছু খরচ হয় বটে, কিন্তু সে তুলনায় তাহাদের নিকট হইতে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

আমরা উপস্থিত পাণ্ডাগণের মধ্যে একজনকে পুরোহিত ঠিক করিয়া লইলাম। তিনি দুইখানি এক্কা করিয়া দিলেন, কিন্তু আমরা সংখ্যায় ৮ জন থাকায়, দুইজন অবশিষ্ট রহিল। ইঁহারা একটু বেলা হইলে ট্রাম করিয়া যাত্রা করিলেন। ট্রামের একটা অসুবিধা এই যে ইহাদের ছাড়িবার কোন নির্দ্ধারিত সময় নাই; আরোহীর সংখ্যা পূর্ণ না হইলে ছাড়ে না। যাহা হউক, প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা পাণ্ডার নির্দ্দিষ্ট বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সহরের নিকটে আসিলেই গাড়ি বা ট্রাম থামাইয়া মিউনিসিপ্যালিটীর লোকে প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতে গোদাবরীতে স্নানের জন্য চারি আনা

করিয়া ট্যাক্স আদায় করে। প্রত্যেক হিন্দু আগন্তুককে এই কর দিতে হয়। যদি সে ব্যক্তি গোদাবরীতে স্নান ভিন্ন অন্য কার্য্যের জন্য আসিয়া থাকে তাহা হইলেও তাহার অব্যাহতি নাই। যাহা দেখিলাম তাহাতে ইহা এক প্রকার জুলুম বলিয়াই বোধ হইল। আমি নদীতে স্নান করিব তাহার জন্য ট্যাক্স কেন দিব বুঝিতে পারিলাম না। আগন্তুক মুসলমানও স্নান করে, কিন্তু তাঁহাকে ত কিছু দিতে হয় না। বিশেষতঃ, তীররক্ষার জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর এমন বিশেষ কোন চেষ্টা বা কার্য্যও দেখিলাম না যাহার জন্য এই কর আবশ্যক হইতে পারে। যাহাহউক, বাসাটি গোদাবরীর তীর হইতে ৫।৭ মিনিটের পথ দূরে অবস্থিত থাকায়, উহা পছন্দ হইল না; কারণ, আমরা ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম যে গোদাবরীর উপরেই কয়েকটি বাসা ও ধর্ম্মশালা আছে। এই হেতু আমরা তৎক্ষণাৎ তাহার সন্ধানে যাইলাম, এবং মনোমত একটি ধর্ম্মশালা পছন্দ করিয়া লইলাম। ইহা পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত কর্পূরথালার মহারাজ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। ধর্ম্মশালাটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঘরগুলি প্রশস্ত এবং জলের খুব আরাম। কারণ, একে নদীর উপরেই অবস্থিত, তাহার উপর বাড়ীর মধ্যে কল আছে, তাহাতে দিনরাত জল থাকে। বাস্তবিক এখানে আসিয়া একটু আরাম বোধ করিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নাসিক জেলার প্রধান সহর। ইহা গোদাবরীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় তীরে অবস্থিত। পূর্ব্বতীরের অংশটির নাম পঞ্চবটী, ইহা সমগ্র নাসিকের এক সপ্তমাংশ মাত্র। পশ্চিমদিকের অংশের সহিত ভিক্টোরিয়া ব্রিজ নামক একটি সেতুদ্বারা ইহা সংযুক্ত। এই সেতু ১৮৯৭ সালে ২॥০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পশ্চিমাংশটাই যথার্থ সহর; সরকারী যাহা কিছু, এবং কারবারাদি সমস্তই এই অংশে। পঞ্চবটী ভাগে মন্দির মঠাদিই বেশী। ভিক্টোরিয়া ব্রিজ হইতে প্রায় ৮০০ হাত দক্ষিণ পর্য্যন্ত গোদাবরীর উভয় তট মন্দির ও সোপানশ্রেণী দ্বারা পূর্ণ। এইহেতু কাশীর গঙ্গাতীর, মথুরার যমুনাপুলিন, বা অবন্তীর শিপ্রাতট

অপেক্ষা নাসিকের গোদাবরীতীর বেশী মনোরম বলিয়া বোধ হয়। নাসিক হইতে ২২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ত্র্যম্বক সহরে ব্রহ্মগিরি পর্ব্বতে গোদাবরীর উৎপত্তি। ঐ স্থান হইতে উঠিয়া গোদাবরী ৯০০ মাইল অতিক্রম করিয়া মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির ভিতর দিয়া বঙ্গোপসাগরে গিয়া পড়িয়াছে। স্বাভাবিক সুষমা ও মনুষ্যের উপকারিতা হিসাবে ইহা ভারতের নদনদীগণের মধ্যে গঙ্গা ও সিন্ধুর নিম্নেই গণ্য। নাসিকের নিকটে জলের গভীরতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত একটি আনিকট করা হইয়াছে। নাসিক হিন্দুগণের একটি পবিত্র তীর্থ। হরিদ্বারের ন্যায় এখানে দ্বাদশ বর্ষান্তে কুম্ভমেলার অধিবেশন হয়। আগামী বৎসর সেই দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইবে বলিয়া এবার নাসিকেই কুম্ভমেলা হইবে। এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। এইজন্য এখানে ইংরাজের Cantonment রহিয়াছে। ইহার লোকসংখ্যা ২৭।২৮ হাজারের অধিক হইবে না। এই স্থানের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত এইরূপ।

ত্রেতাযুগে বর্ত্তমান নাগপুর হইতে নাসিক পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড দণ্ডকারণ্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্ব্বে ইহা দণ্ডক রাজার রাজ্য ছিল, শুক্রাচার্য্যের শাপে ইহা অরণ্যে পরিণত হয়। রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র নির্ব্বাসিত হইলে অযোধ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রথমে চিত্রকূট পর্ব্বতে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু অযোধ্যা ইহার নিকটবর্ত্তী হওয়ায় আত্মীয়বন্ধুগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া বিরক্ত করিতে পারেন, এই হেতু তত্রস্থ অত্রিমুনির পরামর্শানুসারে দণ্ডকারণ্যে আগমন করেন। তথায় ক্রমান্বয়ে শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ ও অগস্ত্য ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। শেষোক্ত ঋষি তাঁহাকে দণ্ডকারণ্যের পশ্চিম প্রান্তস্থ গোদাবরী তীরে অবস্থিত পঞ্চবটীতে আসিয়া বাস করিতে পরামর্শ দেন। এইখানে রামচন্দ্রের পিতৃসখা জটায়ুর সহিত সাক্ষাৎ হয়; এবং গৃধ্ররাজ সীতার রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিশ্রুত হ'ন। তখন রামচন্দ্র এই বনে অরুণা ও গোদাবরীর সঙ্গমের নিকট পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। এইখানে লক্ষ্মণ দশস্কন্ধভগিনী রাক্ষসী শূর্পনখার নাসাকর্ণ

ছেদন করেন। তদবধি এই স্থানের নাম 'নাসিক' হইয়াছে। পঞ্চবটীর অপর পারে জঙ্গল মধ্যে (যেখানে এখন নাসিক সহর হইয়াছে) রাম লক্ষ্মণ রাবণভ্রাতা খরকে সসৈন্যে বিনাশ করেন। এই পঞ্চবটী বনেই রাম কর্ত্তৃক মায়ামৃগরূপধারী মারিচ বধ ও রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ সাধিত হয়। পর্ণশালা হইতে কিছু দূরে এই বনভূমি মধ্যেই জানকীউদ্ধারে বদ্ধপরিকর জটায়ুকে রাবণ বিনাশ করেন। তৎপর রাম সীতাউদ্ধারার্থ এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দেশে গমন করেন।

সকাল বেলা প্রায় ৯টার সময় আমরা কর্পূরথালা মহারাজের ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হই। জিনিষপত্রাদি গুছাইয়া রাখিয়া বাজার হইতে কাষ্ঠ, খাদ্যদ্রব্য ও কিছু মিষ্টান্নাদি ক্রয় করিয়া আনিলাম। বাজারটি খুব নিকটেই ও প্রচুর জিনিষ পত্রাদিতে পূর্ণ। কিছুকাল পূর্ব্বাবধি এখানে শাক শবজী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিত ও খুব সস্তা ছিল। এখন তত সস্তা না থাকিলেও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অনেক স্থান অপেক্ষা সস্তা বটে। তবে দুই বৎসর অনাবৃষ্টি হওয়াতে আজকাল জিনিষপত্রাদি কিছু মহার্ঘ্য হইয়াছে। এক সময়ে এখানকার আঙ্গুর বিখ্যাত ছিল, কিন্তু চাষ ও যত্নের অভাবে তাহারা এখন অদৃশ্য হইয়াছে।

আহারের বন্দোবস্ত করিয়া সকলে পাণ্ডার সহিত গোদাবরীতে স্নান করিতে গেলাম। তীর্থকার্য্য সম্পন্ন করাইয়া পাণ্ডা চলিয়া গেলে স্নান করিলাম। এখানে গোদাবরীর এক একটি অংশকে এক এক কুণ্ড কহে, তন্মধ্যে রামকুণ্ডই প্রধান। কথিত আছে রামচন্দ্র এই স্থানটিতে পিতৃকার্য্য করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য উত্তরকালে সকলে এইখানেই তীর্থকরণীয় যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকেন। আমরাও সকলে এইখানে স্নানাদি করিলাম। নদীর শীতল ও নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া অতিশয় আরাম বোধ হইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যে নদী পূর্ণ থাকায় একস্থানে স্থির হইয়া স্নান করা যায় না, তাহারা পায়ে ও গায়ে ঠোকর মারিতে থাকে। রামকুণ্ডের উত্তর ভাগে

নদীগর্ভে এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত এক স্তর পাথর গাঁথা আছে; বর্ষান্তে নদীর জল কমিয়া আসিলে (প্রায় কার্ত্তিক মাস হইতে) ঐ পাথরগুলি জাগিয়া উঠে। তখন নদী পার হইতে হইলে পুলের উপর দিয়া ঘুরিয়া না গিয়া ঐ পাথরগুলির উপর দিয়া ধীরে ধীরে যাওয়া চলে। আমরা কয়েকজন ঐস্থান দিয়া নদী পার হইয়া গোদাবরী মাতার মন্দির, কপিলেশ্বর-মন্দির, শঙ্করাচার্য্য-মন্দির, লক্ষ্মণ-মন্দির, রাম-মন্দির ও ২।৪টি মঠ দর্শন করিয়া রামকুণ্ডের দক্ষিণস্থ পূর্ব্বোক্ত আনিকটের পাথরের উপর দিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। যে কয়টি মন্দির দেখিলাম তন্মধ্যে রামমন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। ইহা বেশ বড় ও কাল প্রস্তরনির্ম্মিত। গর্ভগৃহটি প্রশস্ত, তন্মধ্যে রাম-সীতার মূর্ত্তি বিরাজিত। পূজার্চ্চনাদির বন্দোবস্ত ভাল। মন্দিরসম্মুখস্থ জগমোহনও বেশ বড়। নাটমন্দির অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে সেবায়েতগণের ও আগত সাধু সন্ন্যাসিগণের থাকিবার জন্য অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে। আমরা দুএকজনে মিলিয়া খানিকটা মান্দ্রাজে চলিত 'রামনাম' (যাহা পূজ্যপাদ শ্রীযুত ব্রহ্মানন্দ স্বামিজী বাঙ্গালা দেশে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন) কীর্ত্তন করিলাম। এ জিনিষটা নূতন বলিয়া স্থানীয় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা মনোযোগ দিয়া শুনিতে লাগিলেন। বাসায় আসিয়া রন্ধন ও আহারাদি করিতে বেলা প্রায় ২টা বাজিয়া গেল। পরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া বৈকাল বেলা একটি পথপ্রদর্শক যোগাড় করিয়া সকলে মিলিয়া পঞ্চবটী ও পর্ণশালাদি দর্শন করিতে চলিলাম।

আনিকটের প্রস্তরের উপর দিয়া গোদাবরী পার হইলাম। দুই একটি মন্দির ও মঠ দেখিতে দেখিতে ১০।১৫ মিনিটের মধ্যেই সহর অতিক্রম করিয়া বনস্থলীতে পড়িলাম। যাঁহারা রামায়ণ পড়িয়াছেন তাঁহারা এই স্থানের তাৎকালিক সৌন্দর্য্যের বিষয় অবগত আছেন। বাস্তবিক মহর্ষি বাল্মিকীর বর্ণনা পাঠ করিলে হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আপ্লুত হয়। কিন্তু এখন সে শোভাসম্পদের আর কিছুই নাই। আর সে শাল-তাল-তমাল-পনস-রসালাদি-

শোভিত বনরাজি দৃষ্টিগোচর হয় না। আর নদীতটে পদ্ম ফোটে না; আর হংসকারণ্ডবাদি বিহঙ্গম খেলা করে না; আর তথায় হরিণ-হরিণী নির্ভীকচিত্তে বিচরণ করিতে আসে না। এখন ইহার অনেকাংশ আবাদী জমিতে পরিণত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে মঠ ও দেবালয় বিরাজ করিতেছে। যাহা হউক, প্রায় দুই মাইল বনভূমি ও ধান্যের মাঠ পার হইয়া অবশেষে অরুণা ও গোদাবরীসঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থানটি পর্ব্বতসমাকীর্ণ। বাম-দিকের পার্ব্বত্যভূমি ভেদ করিয়া অতি ক্ষীণকায়া অরুণা প্রশস্ততরা গোদাবরীতে আসিয়া মিলিতা হইয়াছে। স্থানটি প্রায় সম্পূর্ণ নির্জ্জন ও মনোরম; কদাচিৎ কোথাও পর্ব্বতমধ্যে নিভৃত স্থানে এক আধটি লোক স্থিরভাবে উদাসনয়নে বসিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। এই সঙ্গমস্থলে যে যাত্রিগণ সকালে আসেন তাঁহারা স্নান করিয়া থাকেন। আমাদের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠিল না, কারণ আমরা বৈকালে আসিয়াছিলাম। এইখানে এখনও রাত্রিকালে হরিণের দল আসিয়া থাকে এবং দিনের বেলায় ২।৪টি ময়ূরও নাচিয়া বেড়াইতে দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যা সমাগত হওয়ায় আমরা ইচ্ছা থাকিলেও এখানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। কারণ, শুনিলাম রাত্রে কখন কখন হিংস্র জন্তুও আসিয়া থাকে। সঙ্গমের অদূরে পর্ণশালা। তথায় রামসীতার মূর্ত্তি বিরাজিত। এই পর্ণশালা মধ্যে এখন কয়েকটি সাধু বাস করিয়া থাকেন। আমরা সীতারাম দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। যাইবার সময় পথস্থ কতকগুলি দেবস্থান ও মঠ দেখিয়া গিয়াছিলাম অপর কতকগুলি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম, এখন সেইগুলি দেখিতে দেখিতে চলিলাম। যাহা দেখিলাম তাহাতে বোধ হইল, নাসিকে বিস্তর মঠ আছে, তবে অধিকাংশই রামানুজী বৈষ্ণবগণের। যে মন্দিরগুলি দেখি-লাম সীতাগুহা ব্যতীত তাহাদের কোনটি প্রাচীন নহে। সীতাগুহা মন্দিরটি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার চতুর্দ্দিকে অনেকটা

বৃক্ষাদিশোভিত স্থান আছে। মন্দিরসংলগ্ন একটি দালানে মন্দিরের দুই একটি কর্ম্মচারী খাতাপত্র লইয়া বসিয়া আছে; তাহারা সীতাগুহাদর্শনার্থী যাত্রিগণের নিকট হইতে একটি করিয়া পয়সা আদায় করিয়া থাকে। গুহার অভ্যন্তর মেজে হইতে অনেক নিম্নে; একটি সরু সিঁড়ি দিয়া এক প্রকার হামাগুড়ি দিয়া নামিতে হয়। সেখানে আলোক যাইবার কোন উপায় নাই। দিনরাত একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। গুহাভ্যন্তরে মা জানকী পুষ্পাভরণে ভূষিতা হইয়া বিরাজ করিতেছেন। কথিত আছে, শূর্পনখা রামচন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিলে তিনি যখন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তখন রাক্ষসী কুপিতা হইয়া সীতাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে তিনি ভয়ে এই গর্ত্তমধ্যে লুক্কায়িতা হন, এবং লক্ষ্মণ রামের আদেশে শূর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদন করেন। এই সকল দেখিয়া রাত্রি প্রায় ৮টার সময় ফিরিয়া আসিলাম।

(ক্রমশঃ)

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

(অনুবাদক শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি) ,

গীতার "ভগবদ্ভক্ত"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশাধ্যায়ে ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) ভগবদ্ভক্তের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

যিনি কোন জীবের প্রতি দ্বেষ করেন না, যিনি (সর্ব্বজীবের প্রতি) মিত্রতা ও করুণা করিয়া থাকেন, যিনি মমতাশূন্য ও নিরহঙ্কার, যিনি সুখে দুঃখে তুল্যভাবে অবস্থান করেন, যিনি সহিষ্ণু, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, স্থিরচিত্ত, সংযতস্বভাব ও দৃঢ়নিশ্চয়সম্পন্ন এবং যিনি মন ও বুদ্ধি আমাতে সমর্পণ করিয়াছেন তিনিই আমার প্রিয়।

তিনি সুখে দুঃখে তুল্যভাবে অবস্থান করেন, কারণ ঈশ্বরে চিত্ত অর্পণ করিয়া তিনি যখন সমাহিত থাকেন, তখন তাঁহার অন্য কোন বিষয়ের অনুসন্ধান (চিত্তের দ্বারা গ্রহণ) থাকে না, এবং তিনি ব্যুত্থিত অবস্থায় থাকিলেও তাঁহার বিষয়ানুসন্ধান উদাসীন ভাবে নিষ্পন্ন হওয়ায় তাহাতে হর্ষ বা বিষাদ হয় না। নিম্নে উল্লিখিত ধর্ম্ম-সমূহেও তাঁহার সমভাবে অবস্থানের কারণ এইরূপেই বুঝিতে হইবে।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥১৮

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯

যিনি লোককে উদ্বিগ্ন করেন না, এবং লোকেও যাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিতে পারে না, যিনি উল্লাস, অসহিষ্ণুতা, ভয় এবং উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়। যিনি (সুখপ্রাপ্তি বা দুঃখপরিহারে) স্পৃহাশূন্য, শুচি, দক্ষ, উদাসীন ও মনঃপীড়াশূন্য, এবং যিনি অভীষ্টসাধক সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন ও আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়। যাঁহার হর্ষ নাই, দ্বেষ নাই, শোক নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি শুভ ও অশুভ উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই ভক্তিমান্ আমার প্রিয়। যিনি শত্রু ও মিত্রের প্রতি তুল্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, যিনি মানে অপমানে, শীতে গ্রীষ্মে এবং সুখে দুঃখে সমচিত্ত থাকেন, যিনি আসক্তি শূন্য, যিনি নিন্দায় প্রশংসায় সমভাবাপন্ন ও সন্তুষ্ট বলিয়া মৌনী বা সন্ন্যাসী এবং সেইহেতু গৃহশূন্য ও স্থিরমতি, সেই ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয়।

এস্থলেও পূজনীয় বার্ত্তিককার পূর্ব্বের ন্যায় প্রভেদ দেখাইয়াছেন,

উৎপন্নাত্মপ্রবোধস্য ত্বদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ।
অযত্নতো ভবন্ত্যস্য ন তু সাধনরূপিণঃ ॥ *

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, ৪।৬৯।

---

* সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত উক্ত গ্রন্থের জ্ঞানোত্তম-বিরচিত-'চন্দ্রিকা' নামক টীকায় উক্ত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে—

(আশঙ্কা)—আচ্ছা ভগবদ্গীতোক্ত অমানিত্বাদি গুণসকল যদি সাধকের পক্ষে সাধন স্বরূপ হইল তবে তাহারা অবিদ্যার কার্য্য এবং সেইহেতু তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া সিদ্ধ ব্যক্তিতে থাকিতে পারে না, কেননা, নিয়মই রহিয়াছে—"সাধ্যাভাবে মহাবাহো সাধনৈঃ কিং প্রয়োজনম্"— হে মহাবাহো, যখন সাধিবার কিছুই নাই তখন সাধনের কি প্রয়োজন?

যাঁহার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে (যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন) তাঁহাতে দ্বেষ-শূন্যতা প্রভৃতি গুণ (গীতা ১২ অঃ, ১৩—১৯ শ্লোকে উক্ত) প্রযত্ন না করিলেও অবস্থান করে। কিন্তু (সাধক কর্তৃক) এই সকল গুণ যখন সাধনরূপে অনুশীলিত হইয়া থাকে, তখন এইরূপ নহে (অর্থাৎ তখন ইহারা প্রযত্নসাপেক্ষ)।

গীতার "গুণাতীত"

গীতার চতুর্দ্দশাধ্যায়ে "গুণাতীতের" এইরূপ বর্ণনা আছে ঃ—

অর্জ্জুন উবাচ

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে॥

(গীতা ১৪।২১)

অর্জ্জুন কহিলেন ঃ—

যিনি এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়াছেন, কোন্ কোন্ চিহ্নের দ্বারা তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়? তাঁহার আচরণ কি প্রকার? এবং তিনি কি প্রকারেই বা এই তিন গুণ অতিক্রম করেন?

গুণ তিনটী—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সেই তিন গুণের বিশেষ প্রকারের পরিণাম হেতুই সমস্ত সংসার চলিতেছে। এইহেতু "গুণাতীত" শব্দে অসংসারী অর্থাৎ জীবন্মুক্ত বুঝিতে হইবে। "চিহ্ন," অর্থাৎ যাহা দ্বারা সেই জীবন্মুক্ত পুরুষের গুণাতীতত্ব অপরে বুঝিতে পারে। "আচার" বা "আচরণ" শব্দে তাঁহার চিত্তের গতি

আর যদি সিদ্ধ ব্যক্তিতে সেইগুণগুলি থাকে তবেই বলিতে হইবে যে তত্ত্বজ্ঞানীকেও নিবৃত্তিশাস্ত্র মানিয়া চলিতে হয়।

(উত্তর)—উদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা গ্রন্থকার উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিয়া বলিতেছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানীকে ঐ সকল গুণগুলি রাখিতে হইবে, তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি এইরূপ কোন শাস্ত্রবিধির নিয়োগ থাকিলেও উক্ত গুণগুলি (অমানিত্বাদি) তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ীভূত যে পরমার্থ তাহার স্বভাবের বিরোধী নহে বলিয়া অযত্নসাধ্যভাবে তত্ত্বজ্ঞানীর লক্ষণরূপে (সাধকাবস্থার অভ্যাসবশতঃ) থাকিয়া যায়।

বিধি বুঝিতে হইবে। "কি প্রকারে" অর্থাৎ কোন্ প্রকার সাধনের দ্বারা ?

ভগবানুবাচ—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

(গীতা ১৪।২২—২৬)

ভগবান্ বলিলেন—

হে পাণ্ডব, তিনি প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ আবির্ভূত হইলে তাহার প্রতি বিদ্বেষ করেন না, এবং তিরোহিত হইলে তাহার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। (তিনিই সেই গুণাতীত) যিনি উদাসীনভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া গুণসমূহের দ্বারা বিচালিত হয়েন না এবং "গুণসমূহই প্রবৃত্ত হয়" এই বিচার করিয়া যিনি স্থির ভাবে অবস্থান করেন ও (ইষ্টানিষ্ট স্পর্শে) বিচলিত হয়েন না। তিনি সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন (ও) স্বেচ্ছায় অবস্থান করিয়া থাকেন। * তিনি লোষ্ট্র, প্রস্তর ও সুবর্ণকে সমান মনে করেন, তাঁহার নিকট প্রিয় ও অপ্রিয় দুইই সমান। সেই জ্ঞানী তিরস্কার ও প্রশংসায়

* যখন সমাধিতে থাকিবার ইচ্ছা না থাকে তখন আপনা হইতেই ব্যুত্থিত হন।

সমভাবাপন্ন। সম্মানে ও অপমানে তাঁহার একই ভাব, মিত্রপক্ষে ও শত্রুপক্ষেও সেইরূপ। তিনি দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদ সকল কর্ম্মই পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই প্রকারের পুরুষকেই গুণাতীত বলা যায়। যিনি অব্যভিচারী ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া আমার সেবা করেন তিনিও গুণসমূহ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।" *

প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ শব্দের অর্থ যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ। সেই গুণগুলি জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় (নিজ নিজ ব্যাপারে) প্রবৃত্ত হয়। সুষুপ্তি † ও সমাধি অবস্থায় এবং যে অবস্থাকে শূন্যচিত্ততা বলে সেই অবস্থায়, সেই গুণগুলি (নিজ নিজ ব্যাপার হইতে) নিবৃত্ত থাকে। প্রবৃত্তি দুই প্রকারের, যথা, অনুকূলা এবং প্রতিকূলা। তন্মধ্যে অবিবেকী ব্যক্তি জাগ্রদবস্থায় প্রতিকূল প্রবৃত্তির প্রতি বিদ্বেষ করে এবং অনুকূল প্রবৃত্তির কামনা করে। কিন্তু যিনি গুণাতীত তাঁহার অনুকূল ও প্রতিকূল বলিয়া মিথ্যাজ্ঞান না থাকাতে তাঁহার দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা নাই। যেমন দুই ব্যক্তি কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে কোনও দ্রষ্টা, যিনি কোন পক্ষের মিত্র বা শত্রু নহেন, নিজে কেবল উদাসীনভাবে অবস্থান করেন, জয় পরাজয়ের দ্বারা ইতস্ততঃ বিচালিত হয়েন না, সেইরূপ গুণাতীত বিবেকী ব্যক্তি নিজে উদাসীনভাবে অবস্থান করেন। 'গুণময় ইন্দ্রিয়াদি গুণময় বিষয়াদিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, আমি প্রবৃত্ত হইতেছি না'—এইরূপ বিচার দ্বারা তাঁহার উদাসীন ভাব আইসে। 'আমিই করিতেছি' এইরূপ অধ্যাস, বা মিথ্যাজ্ঞানকে বিচলন কহে, এইরূপ বিচলন তাঁহার নাই। ইহার দ্বারা 'তাঁহার আচরণ কি প্রকার?' এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইল। 'সুখে দুঃখে সমভাব' প্রভৃতি চিহ্নসকল, এবং

* এই কয়েকটি শ্লোকের চতুর্ধরী টীকা বা নীলকণ্ঠকৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। সেই ব্যাখ্যায় এই সকল শ্লোকোক্ত কোন্ চিহ্ন সাতটি জ্ঞানভূমিকার মধ্যে কোন্ জ্ঞানভূমিকার পরিচায়ক তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

† মূর্চ্ছা ও মরণ সুষুপ্তির অন্তর্গত।

অব্যভিচারিণী ভক্তির সহিত জ্ঞান ও ধ্যানের অভ্যাসপূর্ব্বক পরমাত্ম-সেবা, ইহাই গুণসমূহকে অতিক্রম করিবার সাধন।

ব্রাহ্মণ—

ব্যাস প্রভৃতি (ঋষিগণ) ব্রাহ্মণের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

(১) "অনুত্তরীয়বসনমনুপস্তীর্ণশায়িনম্।
বাহূপধায়িনং শান্তং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥*

যাঁহার উত্তরীয় ও বসন নাই, যিনি শয়ন করিতে হইলে কোন প্রকার উপস্তরণের বা শয্যার অপেক্ষা রাখেন না, যিনি নিজের বাহুকে বালিশ করিয়া শয়ন করেন, সেই শান্তপুরুষকে দেবতাগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

এস্থলে ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ ব্রহ্মবিৎ। শ্রুতিতে "অথ ব্রাহ্মণঃ" (বৃহ-উ, ৩।৫।১) এস্থলে "ব্রাহ্মণ" শব্দ ব্রহ্মবিৎ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কেননা, ব্রহ্মবিদেরই বিদ্বৎ সন্ন্যাসে অধিকার আছে।

"যথাজাতরূপধরো"—(জাবালোপনিষৎ, ৬)।
"নাচ্ছাদনং চরতি স পরমহংসঃ" ।+ (পরমহংসোপনিষৎ)

"তিনি জন্মকালে যেমন সর্ব্বপরিগ্রহশূন্য হইয়া আসিয়াছিলেন, এখনও সেইরূপ", "যিনি কোনও আচ্ছাদন ব্যবহার করেন না তিনি পরমহংস" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পরিগ্রহরাহিত্যই পরমহংস দশার মুখ্য (চিহ্ন) বলিয়া উক্ত হওয়ায়, উত্তরীয়শূন্যতা প্রভৃতি গুণ তাঁহার পক্ষে সঙ্গত।

---

* মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্মে (২৪৪ অধ্যায়ে) ব্যাস 'ব্রাহ্মণের' বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলে উদ্ধৃত ব্রাহ্মণবর্ণনাত্মক ছয়টি শ্লোকের মধ্যে ২য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোক উক্ত অধ্যায়ে পাওয়া গেল। ১ম ও ৩য়টি অন্যত্র অনুসন্ধেয়। এই শ্লোক ছয়টি অন্যান্য শ্লোকের সহিত, ব্যাস-বিরচিত বলিয়া বিশ্বেশ্বর সংগৃহীত "যতিধর্ম্মে" (আনন্দাশ্রম সংস্করণ ৩৭ পৃষ্ঠায়) উদ্ধৃত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণেও অনুরূপ শ্লোক আছে। স্কন্দপুরাণও ব্যাস-বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

+ পরমহংসোপনিষদে পাঠ এইরূপ আছে—"ন চাচ্ছাদনং চরতি পরমহংসঃ।"

(২) "যেন কেনচিদাচ্ছন্নো যেন কেনচিদাশিতঃ।
যত্রক্কচনশায়ী স্যাত্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম, ২৪৪ অ, ১২ শ্লোক)

যিনি স্বপ্রযত্নে শরীরকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করেন না) অপর কেহ যদৃচ্ছাক্রমে যাঁহার শরীর বস্ত্রাদির দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া থাকে, যিনি নিজের প্রযত্নে ভোজনে প্রবৃত্ত হয়েন না,) অপর কেহ আসিয়া যাঁহাকে ভোজন করাইয়া দেয়, যিনি যেখানে সেখানে শয়ন করেন, তাঁহাকে দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন।

দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য ভোজন, আচ্ছাদন, এবং শয়নস্থানের প্রয়োজন অপরিহার্য্য হইলেও, ভোজনাদি বিষয়ক গুণদোষ-(বিচার) (পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণের মনে) উদিতই হয় না।* যেহেতু, উদরপূরণ ও শরীরপুষ্টিরূপ প্রয়োজনের সিদ্ধি (যিনি গুণদোষ বিচার করেন এবং যিনি তাহা করেন না এই উভয় পক্ষেই) তুল্যরূপ এবং গুণদোষবিচারে কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না বলিয়া তাহা চিত্তের দোষ ভিন্ন আর কিছু নয়। এইহেতু ভাগবতে পঠিত হইয়া থাকে—

"কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ।
গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তূভয়বর্জ্জিতঃ॥"
(ভাগবত, ১১ স্কন্ধ, ১৯ অধ্যায়, ৪৫ শ্লোক)

গুণ ও দোষের লক্ষণ অধিক বর্ণনা করিয়া কি হইবে? গুণদোষ দেখাই দোষ এবং গুণদোষ না দেখাই গুণ।

(৩) "কন্থাকৌপীনবাসাস্তু দণ্ডধৃগ্‌ধ্যানতৎপরঃ।
একাকী রমতে নিত্যং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

যিনি কন্থা ও কৌপীন দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া দণ্ডধারী ও ধ্যানরত হইয়া নিত্য একাকী আনন্দে বিচরণ করেন, তাঁহাকে দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

* পাঠান্তরের অর্থ— (পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ) ভোজনাদি বিষয়ক গুণদোষের অন্বেষণ করেন না।

ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ প্রভৃতি প্রদান করিয়া জীবগণকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক বলিয়া তিনি সৎপাত্র—ইহা জানাইয়া শ্রদ্ধা উৎপাদন করিবার জন্য (সেই ব্রাহ্মণ) দণ্ডকৌপীন প্রভৃতি চিহ্ন ধারণ করিবেন। যেহেতু শ্রুতিতে আছে,—"কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ স্বশরীরোপভোগার্থায় লোকোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ।" (পরমহংসোপনিষদ্,১)—নিজের শরীরোপভোগের নিমিত্ত এবং লোকের উপকারের নিমিত্ত কৌপীন, দণ্ড এবং আচ্ছাদন বস্ত্র (প্রভৃতি) গ্রহণ করিবেন (পঞ্চম অধ্যায় দেখুন)। সেই ব্রাহ্মণ গৃহস্থের প্রতি অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছাপরবশ হইয়াও গৃহস্থের সহিত তাঁহার গৃহকার্য্যবিষয়ক আলাপ করিবেন না কিন্তু ধ্যানরত থাকিবেন। কেননা শ্রুতিতে আছে—"তমেবৈকং বিজানথাত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ" (মুণ্ডক ২,২,৫)

সেই (আধারভূত) এক (স্বজাতীয়াদি ভেদশূন্য) আত্মাকে অবগত হও। অন্য (অনাত্মবিষয়ক) বাক্য পরিত্যাগ কর। এবং

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্বহুঞ্শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥"

বৃ—৪।৩।২১

ধীমান্ ব্রাহ্মণ উক্তস্বরূপ আত্মাকে (শাস্ত্র ও উপদেশ বাক্য হইতে) জানিয়া (অর্থাৎ পদসমূহের অর্থশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া) (বাক্যে অর্থভূত অশেষ শোকাকাঙ্ক্ষা শান্তিরূপা, স্বরূপাভিব্যক্তিরূপা মোক্ষসম্পাদিকা) প্রজ্ঞা সম্পাদন করিবেন। তিনি প্রভূতশাস্ত্রের বিচার করিবেন না, কেননা, বহুশাস্ত্রাধ্যয়ন বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানিকর (শ্রমজনক) কিন্তু ব্রহ্মোপদেশ "অন্যকথা" নহে বলিয়া বিরোধী নহে। এবং সেই ধ্যান একাকী থাকিতে পারিলেই বিঘ্নশূন্য হয়। এইহেতু অন্য এক স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"একো ভিক্ষুর্যথোক্তঃ স্যাদ্দ্বাবেব মিথুনং স্মৃতম্।
ত্রয়ো গ্রামঃ সমাখ্যাত ঊর্দ্ধন্তু নগরায়তে॥"

নগরং ন হি কর্ত্তব্যং গ্রামো বা মিথুনং তথা।
গ্রামবার্ত্তা হি তেষাং স্যাদ্ভিক্ষাবার্ত্তা পরস্পরম্ ॥
স্নেহপৈশুন্যমাৎসর্য্যং সন্নিকর্ষাৎ প্রবর্ত্ততে।

(দক্ষ-সংহিতা, ৭,৩৫-৩৭)*

ভিক্ষুক একাকী থাকিলেই ভিক্ষুকপদবাচ্য হয়েন, দুইজন হইলেই তাঁহাদিগকে মিথুন বলে; তিনজন হইলেই তাঁহারা গ্রাম নামে প্রসিদ্ধ হয়েন এবং তাহার অধিক হইলেই তাঁহারা নগরের ন্যায় আচরণ করেন। নগর, গ্রাম বা মিথুন কিছুই করা কর্ত্তব্য নহে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকদিগের মধ্যে পরস্পর গ্রামবার্ত্তা (লোকবার্ত্তা, অভব্য কথাবার্ত্তা) কিম্বা ভিক্ষাবার্ত্তা (কোথায় সুস্বাদু ভিক্ষা সুলভ, কোথায় বা দুর্লভ ইত্যাদি) সম্বন্ধে আলাপ চলিবে। একত্রাবস্থান হেতু স্নেহ, খলতা ও ঈর্ষা জন্মে।

(৪) নিরাশিষমনারম্ভং নির্ণমস্কারমস্তুতিম্।
অক্ষীণং ক্ষীণকর্ম্মাণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ †

(মহাভারত, মোক্ষধর্ম্ম, ২৪৪ অ, ২৪ শ্লো)

যিনি কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করেন না, (স্বার্থে বা পরোপকারার্থে) কোনও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন না, যিনি কোনও লোককে নমস্কার করেন না

* দক্ষসংহিতায় (বঙ্গবাসী সংস্করণের) এইরূপ পাঠ আছে :

একো ভিক্ষুর্যথোক্তস্তু দ্বৌ চৈব মিথুনং স্মৃতম্।
ত্রয়ো গ্রামস্তথাখ্যাত ঊর্দ্ধন্তু নগরায়তে ॥৩৫
নগরং ন হি কর্ত্তব্যং গ্রামো বা মিথুনং তথা।
এতত্রয়ং প্রকুর্ব্বাণঃ স্বধর্ম্মাচ্চ্যবতে যতিঃ ॥৩৬
রাজবার্ত্তাদি তেষাস্তু ভিক্ষাবার্ত্তা পরস্পরম্
স্নেহপৈশুন্যমাৎসর্য্যং সন্নিকর্ষাদসংশয়ম্ ॥৩৭

(ঊনবিংশ সংহিতা, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)

† পাঠান্তর—"নির্মুক্তং বন্ধনৈঃ সর্ব্বৈস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ" ॥ নীলকণ্ঠ এই পাঠ গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করেন—যাঁহার স্তুতিনমস্কারজনিত সুখে আসক্তি নাই, সমস্ত বন্ধন বা বাসনা যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, ইত্যাদি।

বা কোনও লোকের স্তুতি করেন না, যিনি কখনই ক্ষীণ (বা দীন-ভাবাপন্ন) হয়েন না, যাঁহার কর্ম্ম ক্ষীণ হইয়াছে তাঁহাকে দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

কেহ প্রণাম করিলে পূজার্হ সংসারী ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রতি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া থাকেন যে ব্যক্তি যাহা চায় তাহার উদ্দেশে সেই বস্তুঘটিত উন্নতির প্রার্থনা করার নাম আশীঃ। ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন রুচি বলিয়া তাহাদের কোন্ বস্তু অভিমত তাহার অন্বেষণে যিনি ব্যগ্রচিত্ত হয়েন, তাঁহার লোকবাসনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। (লোকবাসনা অর্থাৎ লোকের প্রতি আকর্ষণ) সেই লোকবাসনা জ্ঞানের বিরোধী। এক স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—

"লোকবাসনয়াজন্তোঃ শাস্ত্রবাসনয়াপি চ।
দেহবাসনয়া জ্ঞানং যথাবন্নৈব জায়তে॥" *

(বিবেকচূড়ামণি, ২৭২)

লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা এবং দেহবাসনাবশতঃ লোকের যথোপযুক্ত জ্ঞান জন্মে না। (বহুশাস্ত্রাধ্যয়নের দুরাগ্রহ অথবা অনুষ্ঠানব্যসন—শাস্ত্রবাসনা ; দেহকে রক্ষা করিবার ও সুখে রাখিবার আগ্রহ—দেহ-বাসনা) (মহাভারতীয় শ্লোকোক্ত) আরম্ভ, নমস্কার প্রভৃতি সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। (অর্থাৎ তাহারাও জ্ঞানবিরোধী)। নিজের জন্য বা পরোপকারার্থে গৃহ, ক্ষেত্র প্রভৃতি সম্পাদনের প্রযত্নের নাম আরম্ভ। এই আশীর্ব্বচন ও আরম্ভ মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে বর্জ্জনীয়। এই আশীর্ব্বাদ না করিলে যাঁহারা প্রণাম করিবেন তাঁহাদের মনে দুঃখ হইবে, এইরূপ যেন কেহ মনে না করেন। কেন না মুক্ত ব্যক্তিদিগের

* 'বিবেকচূড়ামণি'তে এইটি ২৭২ সংখ্যক শ্লোক। সেইজন্য বিবেকচূড়ামণির উল্লেখ করিলাম। কিন্তু বস্তুতঃ এইটি একটি শ্রুতিবচন। মুক্তিকোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্র। সুত সংহিতার যজ্ঞবৈভব খণ্ডের পূর্ব্বার্দ্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে (আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ৪৬১ পৃষ্ঠায়) এই শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় ; সম্ভবতঃ গ্রন্থকার ঐ স্থান হইতে উক্ত শ্লোক গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া উহাকে স্মৃতিবচন বলিয়াছেন।

হৃদয়ে যাহাতে লোকবাসনা না জন্মিতে পারে এবং প্রণত ব্যক্তিদিগের মনে যাহাতে খেদ উৎপন্ন না হয়, এই জন্য সর্ব্ব প্রকার আশীর্ব্বাদের প্রতিনিধিস্বরূপ "নারায়ণ" শব্দের প্রয়োগ (যতিদিগের পক্ষে) বিহিত হইয়াছে। সকল প্রকার আরম্ভই দোষযুক্ত। স্মৃতিশাস্ত্রে (গীতা, ১৮।৪৮) এইরূপ আছে—

"সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।"

ধূম যেমন অগ্নিকে আবৃত করিয়া রাখে সেইরূপ হিংসাদি দোষ সকল প্রকার আরম্ভকেই বেষ্টন করিয়া থাকে, অর্থাৎ আরম্ভমাত্রেই হিংসাদিদোষ অনিবার্য্য। বোবিদিষা সন্ন্যাসীর পক্ষে নমস্কারও (শাস্ত্রে) কথিত হইয়াছে যথা—

"যো ভবেৎ পূর্ব্বসংন্যাসী তুল্যো বৈ ধর্ম্মতো যদি।
তস্মৈ প্রণামঃ কর্ত্তব্যো নেতরায় কদাচন॥"

যিনি অগ্রে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যদি ধর্ম্ম বিষয়ে সমকক্ষও হয়েন তবে তাঁহাকে প্রণাম করা যায়, তদ্ভিন্ন অপরকে কখনই প্রণাম করা উচিত নয়। এই নিয়মে কোন সন্ন্যাসী অগ্রে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন কিনা এবং তিনি ধর্ম্মবিষয়ে সমকক্ষ কিনা এইরূপ বিচার করিতে হইলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে এই হেতু দেখা যায়, অনেকেই কেবল নমস্কার লইয়া বিবাদ করিতেছে। তাহার কারণ বার্ত্তিককার (সুরেশ্বরাচার্য্য) প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

"প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ।
সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসন্দূষিতাশয়াঃ॥ *
(বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিক, ১ম অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ, ১৫৮৪ শ্লোক)

* আনন্দগিরিকৃত ব্যাখ্যানুসারে অনুবাদ করা হইল। সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত উক্ত বার্ত্তিকের ব্যাখ্যায় আনন্দগিরি লিখিতেছেন :—(শঙ্কা) আচ্ছা মুমুক্ষু ব্যক্তি দেবারাধনায় বিরত হইলে নারকী হইবেন কেন? মোক্ষবাসনাত আর অনর্থপ্রসব করিবে না কেননা, তাহা হইলে মোক্ষোপদেশক শাস্ত্রের সহিত বিরোধ ঘটে (যেহেতু মোক্ষশাস্ত্র বলেন) যে ব্যক্তি অনর্থনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে সে কখনও অনর্থে পতিত হয় না। এই আশঙ্কার

দেখা যায় অনেকে সন্ন্যাসী হইলেও মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ শ্রবণাদিপরাঙ্মুখ হইয়াছেন, (সেইহেতু) তাঁহাদের চিত্ত বহির্মুখ ; এবং সেই কারণেই তাঁহারা পরের উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারেন না এবং সেইহেতু তাঁহারা কলহ করিতে তৎপর। দেবতাদির সম্যক্ আরাধনা না করাতে তাঁহারা তাঁহাদের চিত্তবৃত্তিকে দূষিত করিয়াছেন।

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র।

পরম কল্যাণীয়াসু, বাগবাজার, কলিকাতা

২৮।২।১৭

মা, তোমার পূর্ব্বপত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। কিন্তু উৎসবে ব্যস্ত থাকায় ও আলস্যের জন্য উত্তর দেওয়া হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস শ্রীশ্রীঠাকুর জগতের গুরু। ভগবৎকৃপায় যদি তাঁর ধ্যানে মগ্ন হতে পারি, তবে ঐহিক গুরুর প্রতিও শ্রদ্ধাভক্তি বাড়িয়া যাইবে। এই সৃষ্টির যিনি কর্ত্তা তিনিই যথার্থ গুরু ও গতি। জীবের অন্য উপায় নাই। বল দেখি, পৃথিবীর কটা লোকের 'সর্ব্বস্ব' দানের শক্তি আছে ? আর

উত্তরে বলিতেছেন, বহির্মুখব্যক্তির নিষিদ্ধাচরণ অবশ্যম্ভাবী, সেই হেতু তাহার মুমুক্ষা নিষ্ফল। এই অভিপ্রায়ে উক্ত শ্লোক রচিত হইয়াছে। শ্রবণ মননাদি বিষয়ে মনঃসমাধানের অভাবকেই প্রমাদ বলা হইয়াছে। সেই মনঃসমাধানের অভাব ঘটিলেই বুদ্ধি বাহ্য বিষয়ে প্রধাবিত হয় এবং সেইহেতু পরের উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারে না ; ফলে কলহপ্রিয় ও কতূহলী হইয়া পড়ে। দেবাদির আরাধনার অভাবেই বুদ্ধি দূষিত হয় এবং সেই দূষিত বুদ্ধিই উক্ত প্রমাদের কারণ—এইরূপ বিভাগ করিয়া শ্লোকটি বুঝিতে হইবে। 'অপি' শব্দের অর্থ সন্ন্যাসিগণেরও এই দশা ঘটে, অন্যের কথা আর কি বলিব। ১৫৮৪॥

কটা লোকেরই বা 'সর্ব্বস্ব' গ্রহণের ক্ষমতা আছে? দেহ ও মনের উপর একাধিপত্য ক'জনের হয়? ঠিক যাদের হয় তারা কি মানুষ? যাদের দেহের প্রতি আসক্তি আছে, শরীর বলে বোধ আছে, সুখে দুঃখের বোধ আছে, 'আমি আমার' জ্ঞান আছে, তারা কি অপরের মন প্রাণ কেহ দিলেও নিতে পারে? দেহ-মন-প্রাণ সর্ব্বস্ব দেওয়া নেওয়া যদি এত সহজ ব্যাপার হইত তবে এ জগতে দুঃখকষ্ট, জন্মমৃত্যু কিছুই থাকিত না এ সৃষ্টি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ হইত।

যদি তুমি তোমার মন প্রাণ সর্ব্বস্ব দিয়ে থাক, আর অপরে যদি লইয়া থাকে তবে ত আর তোমার সংসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই নাই— 'তুমি'ও নাই 'তোমার'ও নাই। আর যদি তোমার মন প্রাণ এখনও থাকে তবে দানও হয় নাই, গ্রহণও হয় নাই। তোমার গুরু গোঁসাই যা লিখেছেন সব শাস্ত্রের কথা বটে, তবে শাস্ত্রের কথা কয় জন ধারণা করিতে পারে, বিনা সাধনে? গোঁসাই দেবকে লিখে দিও এ সব আধ্যাত্মিক ব্যাপার, বহুজন্মের সাধনায় তবে উপলব্ধি হয়। আমি এখন সাধ্যসাধনে নিযুক্ত হইব। আপনার উপদেশ মত চলিতে চেষ্টা করিব। অধিক কথা লিখিও না। কেবল করুণা ভিক্ষা করিও।

তোমরা ভাই বোন মিলিয়া ঠাকুরের নামে উৎসব করিয়াছ শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। ঠাকুরের ধ্যান যে করে সেই জগতে জিতিয়া যাইবে।

দেখ মা, আমরা মানখ্যাতি চাই না, চেলাচেলী চাই না, গুরু হতে ইচ্ছা নাই। চাই কেবল ভগবৎকৃপা।

* * *

তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে এবং তোমার ভাই ভগ্নীদের জানাইবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

প্রেমানন্দ।

পরম কল্যাণীয়াসু

রামকৃষ্ণমঠ,
২৭।৩।১৭

মা, তোমার পত্র পেয়ে মনে করেছিলাম তুমি গৌহাটী গিয়াছ, তাই কোন্ ঠিকানায় উত্তর দিব ভাবিতেছিলাম। গতকল্য তোমার পত্র পেয়ে উত্তর দিচ্ছি। শ্রীমতী—বড়ই ভক্তিমতী কিন্তু ভক্তি নিয়ে সংসারে সুখে থাকা চলে না, এ জগৎটা এক রকমের। আর মায়ার খেলা মানুষ বুঝিবেই বা কি? ভক্তের নির্ভর চাই ভগবানে। যা করেন ঠাকুর তা[illegible]—কিছুতে ছাড়ব না।

"যখন যেরূপে মা গো রাখিবে আমারে,
সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে।
রজত মণি কাঞ্চন বিভূতিভূষণ,
তরুতলে বাস কিম্বা রাজসিংহাসন পরে॥"

—র স্বামী অভক্ত তাই তার অশান্তি। টাকা থাকিলেও সুখ নাই—আনন্দ নাই। তুমি ভাল আছ জানিয়া আমার আনন্দ হল। আনন্দ অনৈসর্গিক বস্তু। যারা পায় তারা ভাগ্যবান্। তুমি ঠাকুরের কৃপায় খুব আনন্দে থাক মা।

—মহারাজ মঠে আছেন। তাঁর দেহ মন্দ নয়। আমার ইচ্ছা তুমি তাঁকে চিঠি দিও। হ— সকলের চিঠিরই উত্তর দেন। আর তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও সিদ্ধলোক। আমি তাঁর পদরেণুর যোগ্য নই। আর আছেন —স্বামী। তিনি ঠাকুরের ভক্ত। আমি তাঁদের দাসানুদাস, মূর্খ মানুষ।

তুমি ঠাকুরের ভাবে ডুবে যাও মা, এই আমার অন্তরের ইচ্ছা। সর্ব্বদা পবিত্র ভাব পোষণ কর্ব্বে। পবিত্রতাই শক্তি ও ভগবান্। কেউ না তোমাদের শত্রু থাকে এমন জীবন চাই।

ঠাকুরের পুস্তক নিত্য পাঠ করবে ও ধারণার চেষ্টা করবে।

* * * ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—
প্রেমানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়,
৩।৪।১৭

স্নেহভাজনীয়াসু

মা, তোমার পত্র পাঠে তুমি আনন্দে আছ জানিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। শ্রীশ্রীপ্রভু কৃপা করে এ ক্ষুদ্র অযোগ্য আধার দ্বারা অনেক ছোট ছোট কাজ করান, তাই সব সময় পত্র লিখিতে অবসর হয় না। মা, তুমি তাই বলে মনে করো না, আমি ভক্তদের ভুলে গেছি। আমাদের চিঠি পাও আর নাই পাও—ঠাকুর সদাসর্ব্বদা তোমায় দেখ্ছেন ও দেখ্বেন, ইহা যেন দৃঢ় ধারণা থাকে।

রা— বড়ই ভক্তিমতী মেয়ে। আজ তারও চিঠি পেলাম। অভক্তের মধ্যে থাকিতে ভক্তের কষ্ট হয়, সে জন্য মনের কথা তোমাদের না লিখে আর কাকে জানাবে বল? তুমি —কে যা লিখেছ —ভায়া তা শুনে তোমার বিশ্বাসভক্তির খুব প্রশংসা করলেন। তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন তুমি আরও সাধনে ডুবে যাও আর খুব আনন্দে থাক।

* * *

স্বামী বিবেকানন্দের এক আমেরিকান শিষ্যা, এই ঘোর জাহাজ-ডুবির সময় বিলাত যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি আ আমায় লিখেছেন, "আমি যখন শ্রীস্বামিজীর লোকের আশীর্ব্বাদ নিয়ে চলেছি, তখন আমি একা নই, সমগ্র জাহাজের লোকেরাই নিরাপদে পৌঁছুবে।" বল কেমন বিশ্বাস! মেম সাহেব হলে হবে কি, বিশ্বাস ভক্তিতেই মানুষ দেবতা হয়, ঋষি হয়, জীবন্মুক্ত হয়। এই মেমটী আমাদের মঠের 'গেষ্ট হাউসে' তিন চার মাস যাবৎ ছিলেন। অতি সৎ, অতি উদার। লাট সাহেব প্রভৃতি সকলের সঙ্গে সখ্যতা ছিল। আমাদের মঠের কত কাজ করেছেন। আমরা ভাল আছি। আমাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
প্রেমানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়।
১৪।৪।১৭

স্নেহভাজনীয়াসু,

মা, তোমার পত্রপাঠে আনন্দিত হ'লাম। তুমি যদি মিস্‌কে দেখ্‌তে, বুঝ্‌তে তার কত বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তারা যেন যুগে যুগে ভগবৎ কার্য্যে ব্রতী হ'য়ে শরীর ধারণ করে আসে। তার জন্য আমরা নিশ্চিন্ত আছি। তারা যেন আমাদের ঘরের লোক। পোষাকটা মেমের মত, আর ভিতরটা আমাদের ঠাকুরের।

তোমরা যে ভগ্নী নিবেদিতার কথা চিন্তা কর এর জন্য বার বার ধন্যবাদ দিই। শ্রীস্বামিজীর ইচ্ছা ছিল, সহস্র সহস্র ঐরূপ নিবেদিতা বেরুক এই বাংলা থেকে। দেশ নিবেদিতায় নিঃস্বার্থভাবে ছেয়ে যাক্। আবার এদেশে গার্গী, লীলাবতী, সীতা, সাবিত্রী দলে দলে উঠুক। পবিত্রতায়, সরলতায়, নিষ্ঠায় মানুষ দেবতা হয়। ঠাকুর কৃপা করে তোমাদের দেবভাবে পূর্ণ করুন ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীস্বামিজী বল্‌তেন, মা'র জাত ছেলেদের যেমন শিক্ষা দিতে পারে পুরুষে তেমন পারে না। তুমি নিজে যতটুকু পার দু-চারিটী ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়ে শিক্ষা দিতে সুরু করে দাও। বিধি নিষেধ আপনা হ'তেই হ'য়ে যাবে। ভিতরে ভাব থাক্‌লে অত বিধি-নিষেধ দরকার হয় না। তোমার মধ্যে শক্তি সামর্থ্য সব আছে—বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীকে চিন্তা করে লেগে যাও শিক্ষা দিতে। পাঠশালা খুলে দাও। সাহায্য প্রভুই পাঠাবেন। কলিকালে একমাত্র দানই ধর্ম্ম। বিদ্যা অপেক্ষা ভাল জিনিষ জগতে কি আছে? কর ঐ বিদ্যাদান। বিদ্যা চর্চ্চায় অবিদ্যা দূর হবে।

খুব মন দিয়ে ঠাকুরের কথামৃত নিত্য পাঠ কর্‌বে। উহার একটা কথায় কত ভাগবত, গীতা রয়েছে দেখ্‌বে। স্বামিজীর চিঠি ও বক্তৃতা-গুলি পড়ে দেখ্‌বে উহাতে অনন্ত শক্তি নিহিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবে এক নবযুগ উপস্থিত। এ সুযোগ ছেড়ো না। লোকগুলো

সুন্দর শান্তির পথ দেখুক্। যে এই পথে আস্‌বে সেই আনন্দ পাবে। সমগ্র মেদিনীমণ্ডল নিয়ে আমাদের একটা দল কর্‌তে হবে। এতে বাদ কেউ না যায়—পর সংসারে কেউ না থাকে। যদি কেউ পর থাকে সেটা "আমি আমার"। এই "আমি আমার" হচ্ছে মহা বৈরী। এই পরম শত্রুকে নাশ কর্‌তে হবে, মার্‌তে হবে। তবেই সারা দুনিয়া আপনার হবে, সুখের ও শান্তির হবে, ভগবানের হবে। শিক্ষা দিতে পার্‌বে সেই যে এই "আমি আমার"কে [illegible] পেরেছে। ভগবানের নামে বিশ্বাস এলে তাঁর শক্তিতে এই অখিষ্ঠা মোহ ধ্বংস হবে। ঈশ্বরের শক্তিতে সব হয়। তিনি কৃপা করে আমাদের চোখের বাঁধন খুলে দেন।

শ্রীহরিভায়া তোমার পত্র পেয়েছেন। তাঁর ঢাকা যাবার কথা হচ্চে। ভক্ত টান্‌লে ভগবান্‌কেই আস্‌তে হয়, ভক্ত ত তাঁর দাস। আমরা ভাল আছি। তুমি আমাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

প্রেমানন্দ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

আগামী বৈশাখ মাসে শিলচর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উদ্যোগে উক্ত স্থান হইতে "নবযুগ" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইবে। উহাতে ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইবে। পত্রিকার মূল্য সাধারণের পক্ষে ১॥০ টাকা এবং স্কুল কলেজের ছাত্র ও সাধারণ লাইব্রেরীর জন্য ১।০ টাকা মাত্র। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে পত্রিকাখানির উন্নতি কামনা করি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পঞ্চাশীতিতম জন্মোৎসব।

বিগত ১৭ই ফাল্গুন, রবিবার, সন ১৩২৬ সাল বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পঞ্চাশীতিতম জন্মমহোৎসব বিপুল সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস মঠ এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতেই ষ্টীমার, নৌকা ও রেলযোগে যাত্রীসমাগম হইতে আরম্ভ হয়। গত বৎসর অপেক্ষা এবার লোকসংখ্যা অধিক হইয়াছিল। কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে কনসার্ট পার্টি ও বহু কীর্ত্তনসম্প্রদায় উৎসবে যোগদান করিয়া উহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আন্দুলের সুবিখ্যাত কালীকীর্ত্তন সম্প্রদায়ের তান-লয়-বিশুদ্ধ স্বর্গীয় মাতৃনামগান শ্রবণ করিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তি কিছুক্ষণের জন্য সংসারের শোক তাপ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বেলা দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে প্রায় ১১।১২ হাজার ব্যক্তি বসিয়া প্রসাদ গ্রহণে তৃপ্ত হইয়াছিলেন। প্রসাদবিতরণ কার্য্যে স্বেচ্ছাসেবকগণ যেরূপ উৎসাহ ও কর্ম্মতৎপরতা দেখাইয়াছিলেন তাহা আমাদের যুবক-সম্প্রদায়ের পক্ষে বাস্তবিকই শ্লাঘার কথা বটে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, উৎসবে সমাগত বিশাল জনসঙ্ঘ নিরীক্ষণ করিয়া এবং বৎসর বৎসর লোকসমাগম ক্রমবর্দ্ধমান হইতেছে দেখিয়া আমাদের মনে হইতেছে যে, বাঙ্গালী ধর্ম্মকেই তাহার জাতীয়-উন্নতির নিয়ামক বলিয়া ধরিতে ও বুঝিতে পারিয়াছে। ইহা বাস্তবিকই আশার কথা। ধর্ম্মহীন হওয়ায় আমরা মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি। সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য, উৎসাহ, কর্ম্মকুশলতা, আত্মসম্মানজ্ঞান, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, স্বার্থহীনতা, এই সব লইয়াই মনুষ্যত্ব—ইহাদের সমষ্টির নামই ধর্ম্ম। দিন দিন আমাদের ভিতর এই মনুষ্যত্ব বা ধর্ম্মভাব যতই জাগ্রত হইবে ততই আমরা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইব। স্বামিজী ইহা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই 'বর্ত্তমান ভারতের' আলোচনা প্রসঙ্গে ভগবৎ-চরণে শেষ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন—"হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে,

আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।" আসুন, আমরাও স্বামিজীর সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া প্রার্থনা করি—

"মা আমাদের দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা দূর কর—আমাদের মানুষ কর।"

এতদ্ব্যতীত কাশী, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ, কনখল, ঢাকা, মান্দ্রাজ, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থান সমূহেও শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে।

ঝটিকাপ্রপীড়িত স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাকার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও হিসাব।

ইতিপূর্ব্বে উদ্বোধনের প্রতি সংখ্যায় এবং অন্যান্য সংবাদপত্রে ঝটিকাপ্রপীড়িত স্থানে মিশনের সেবাকার্য্যের বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি উক্ত সেবাকার্য্য শেষ হইয়া যাওয়ায় সাধারণের গোচরার্থ মিশন মোটামুটি কি প্রকার সাহায্য করিয়াছেন তাহার বিবরণ এবং আয়ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রদত্ত হইল।

উক্ত সেবাকার্য্য অক্টোবর, ১৯১৯ খৃঃ হইতে আরব্ধ হইয়া জানুয়ারী, ১৯২০ খৃঃ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই কার্য্যে সর্ব্বসমেত ২৮ জন সেবক নিযুক্ত ছিল। ঐ সময়ের মধ্যে সমস্ত কেন্দ্র হইতে ৩৩৭০৷৷৩ মণ চাউল (উক্ত চাউলের মধ্যে ১৯৯৮/৫ মণ চাউল কলিকাতা জুটবেলার্স এসোসিয়েসান প্রদান করেন) ও ৩১৯৫ খানি নূতন বস্ত্র বিতরিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ৫৬০ খানি গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য করা হয়; ২১৫৭ জন রুগ্ন ব্যক্তিকে ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা সেবা করা হয় এবং দরিদ্র ভদ্রপরিবার, বিধবা ও অসহায় ব্যক্তিগণকে নগদ ১৫৩৮৸৵০ টাকা দিয়া সাহায্য করা হয়।

আয়ব্যয়ের হিসাব।

জমা— মিশন উক্ত সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা এবং অন্যান্য প্রদেশে দুর্ভিক্ষনিবারণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। উহা অক্টোবর

মাসে (১৯১৯খৃঃ) শেষ হয়। সেই সময় দুর্ভিক্ষনিবারণ ফণ্ডে যাহা উদ্বৃত্ত ছিল তাহা এবং অক্টোবর মাসেই ঝটিকাপীড়িতের সাহায্য-কল্পে 'বেঙ্গল সাইক্লোন রিলিফ ফণ্ড কমিটির' নিকট হইতে প্রাপ্ত ৬০০০৲ টাকা ও অন্যান্য স্থান হইতে যাহা পাওয়া গিয়াছিল তৎসমেত ৮৯৮৩৶/৫ টাকা, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রভিডেণ্ট ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত ৮০০৲ টাকা, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় ও উদ্বোধন কার্য্যালয়, কলিকাতা—এই দুই স্থলে এককালীন দান হিসাবে সংগৃহীত ১১৭৩১৷৷৵১০ টাকা; কার্য্য শেষ হইবার পর চাউলের থলে এবং অন্যান্য অনাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত ২৭৯০৲ টাকা। মোট জমা—২৪৩০৫৷৴১৫ টাকা।

খরচ— চাউল—৮১০৫৷৷০ টাকা; কাপড়—৪৬৩২৶ টাকা; চাউলের জন্য থলে—২২৷৷০ টাকা; চাউল এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সাহায্য কেন্দ্রে লইয়া যাইবার জন্য রেল, নৌকা, গাড়ী, মুটে ভাড়া প্রভৃতি ১৯৬৪৷৵১০ টাকা; সেবকগণের যাতায়াত এবং গ্রাম পরিদর্শন প্রভৃতি—৬০১৵১৫ টাকা; সেবকগণের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি—২৫৷৵১৫ টাকা; সেবকগণের খাইবার এবং ঔষধাদির খরচ—২২৭৶১০ টাকা; চাকরের বেতন, আলোর তেল ইত্যাদি—৩০৵০; কালী, কলম, এবং রিপোর্ট ফরম ছাপাইবার কাগজ ইত্যাদি—৬১৵১০ টাকা; ডাক খরচ—৭৪৷৴১৫ টাকা; বিবিধ ফরম ছাপিবার খরচ—৫২৶০ টাকা; বিবিধ—১৭৷৷১০ টাকা; গরীব ভদ্র পরিবার, বিধবা ও অসহায় ব্যক্তিগণকে অর্থ সাহায্য ১৫৪৮৶০ টাকা; রুগ্ন ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্য ঔষধ পথ্যাদি—১৪৪৴১৫ টাকা; গৃহ নির্ম্মাণের জন্য সাহায্য—৩৫৯৭৷৷৵৫ টাকা; অন্যান্য স্থানে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত সেবা-সমিতিগণকে অর্থ সাহায্য—৮০৩৲; মোট—২১১১২৶৫ টাকা। তহবিল উদ্বৃত্ত ৩১৯২৷৷৴১০ টাকা শ্রীরামকৃষ্ণমিশন প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে জমা দেওয়া হইল। সর্ব্বশুদ্ধ মোট খরচ—২৪৩০৫৷৴১৫।

ভারত এবং ভারতেতর দেশের যে সকল সদাশয় ব্যক্তি এই কার্য্যে অর্থ, বস্ত্র এবং ঔষধাদি দিয়া আমাদিগকে সহায়তা করিয়াছেন

তাঁহাদিগের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন কেন্দ্রে স্থানীয় যে সকল লোক ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয় নিজেদের নানাবিধ কার্য্যে থাকা সত্বেও, শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ও অন্যান্য ভাবে আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এবং সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দকে তাঁহাদের সাহায্য ও সহানুভূতির জন্য অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কলিকাতা,
১৪ই ফেব্রুয়ারী।   (স্বাঃ) সারদানন্দ
সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণমিশন।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

শ্রীযুতবিনোদ বিহারী দত্ত, চান্দাইকোনা ৫৲
,, সরোজ কুমার ঘোষ, সুকচর, ১০৲
,, শিবরাম বাসুদেব কালী, বম্বে, ২০৲
,, হরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, মাঝিরহাট, ২৲
,, মনমোহন পাইন, চাবুয়া, ৪১৷৷০
,, হীরণ কুমার সেন, হাইলাকান্দি, ৫৲
,, সুরেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, আসানসোল, ১০৲
,, এন্, ডি, বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর, ৩৲
এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বার-এ্যাসোসিয়েশন, জলপাইগুড়ি, ৫০৲
,, মাথম লাল দে, কলিকাতা, ৫৲
,, ডি, এন্, সেন, গুণাসিটি, ৫৲
,, সতীশ চন্দ্র দাস, কলিকাতা, ৫০৲
,, পি, কোলাণ্ডসামী, তানজোর, ২৫৲
,, বীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, মতলবগঞ্জ, ১৲
,, হেম নাথ ঘোষ, বরজগতী,
এস্, ভাস্করানন্দ, ভুজ, ২৫৲
শ্রীযুতডাঃ ভুবনেশ্বর মিত্র, মেদিনীপুর, ৫৲
,, এ, বি সেন, রেঙ্গুন, ৫০৲
,, অস্তিমতারণ দাস, কলিকাতা, ১৲
,, ভবানী শঙ্কর, বম্বে, ১৲
,, ভোলানাথ ঘোষ, মেদিনীপুর, ২৫৲
সমদুঃখী, বম্বে, ২৫৲
,, বি, মুখোপাধ্যায়, ভবানীপুর, ৫৲
শ্রীমতী প্রমীলা রায়, থাগ্রা, ১৲
,, অপর্ণা কুমারী দেবী, কেচকাপুর ৩৬৲
,, নিরুপমা দেবী, বহরমপুর, ২৲
শ্রীতারা প্রসন্ন পালিত, কলিকাতা, ১০৲
,, এইচ, এন্, বিশ্বাস, নীলফামারী, ৭৫৲
জনৈক ভদ্র মহিলা, কলিকাতা, ১০৲
হিন্দু সেবা সমাজ, আনন্দ, ২৫৲
সেক্রেটারী শান্দল ডিষ্ট্রেস, ফুলগাজী, ৫৲
মাঃ শ্রীযুত মিলনানন্দ রায়, শিলং ২৫০৲
শ্রীযুত অচ্যুত কুমার নন্দী, বালীগঞ্জ, ৭৭৲
,, সি, এস্, কৃষ্ণ স্বামী, তমুমা, ৫৲

ক্ষান্তমণি, কলিকাতা, ৫৲
মাঃ স্বামী অমৃতানন্দ, ভুবনেশ্বর, ৩৩৲
শ্রীযুত এন্, এম্, মুখোপাধ্যায়, মান্দালে, ৫৲
,, এ রাজক, মান্দালয়, ৫৲
,, ললিত মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ২৲
,, জামসেটজী হীরাজী, পুনা, ৫॥०
,, শ্রীনিবাস আয়ার, কুম্ভকোনম্ ১৯৲
,, মন্মথ নাথ দত্ত, ভবানীপুর, ১২
জনৈক ভদ্রমহিলা, পাটনা, ৬॥०
শ্রীমতী মঠি কুমারী শী, কলিকাতা, ১৲
এইচ্, মোহনলাল এণ্ড কোং,
মৌলমিজীন ২৫৲
শ্রীযুক্ত যদুপতি চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ৫০৲
,, এন্, সি, মুখোপাধ্যায়, ,, ১০৲
,, ভুবন মোহন চৌধুরী, মিনাথ, ১৮।०
,, ভূপেন্দ্র নাথ ঘোষ, মহামায়া, ২৲
,, মথুরা নাথ চক্রবর্ত্তী, চুয়াডাঙ্গা, ৩৲
প্রেসিডেণ্ট, কালীপূজা কমিটী,
লোহারডাগা, ৪৫৲
,, দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা, ৫৲
পি, এন্ হাইস্কুল, পুঁটিয়া, ১০৲
শ্রীযুক্ত এন্, সি মজুমদার, রাণীগঞ্জ, ৪৲
ক্লার্কস্ এ্যাসেসর ডিপার্টমেণ্ট
কর্পোরেশন, কলিকাতা ৭৲
শ্রীযুক্ত এ, এম্, লাউডেস্বামী, সান্দাকান, ১০৲
,, বিষ্ণুদাস শর্ম্মা, হায়দ্রাবাদ. ২২৲
মাঃ এস্, কে নিয়োগী,
মেসোপটেমিয়া, ২২৲
মাঃ কেশবানন্দ স্বামী, কোয়ালপাড়া ৬
শ্রীযুক্ত রাঘবজী, খেমজী, বম্বে, ৫০৲
,, ডি, এইচ্ গাডজীল, পূর্ব্বখান্দেশ, ৫৲

শ্রীযুত চৈথরাম, পি গিত্বালী, হায়দ্রাবাদ, ২৫০
শ্রীমতী করুণাময়ী বিদ্যান্ত ও স্নেহময়ী সেন,
আগ্রা, ২০০৲
শ্রীযুত পদ্মলাল চেম দাস, রেঙ্গুন, ২৫৲
,, সত্যেন্দ্র চন্দ্র কর, ঢাকা, ২৲
মাঃ ডাঃ কৃষ্ণ, রোহারী, ৩৫৫৸৵০
সেমিণ্ড পাবলীক, ১০৫
জনৈক বন্ধু, ২৫০০৲
,, মনোমোহন বসু, কদমতলা, ৪০
,, টি, দাস, রামপুর, ৩০
,, এস্, পি, নিয়োগী, পাউরী, ২৫
,, এম্, এল গোস্বামী, পেগু, ৫৮
পান্নালাল সিংহ, ধপ, ৩৬৲
,, এম্, ডি কাণ্ডিয়া ও ভি, খার্মাবিয়া,
কাঙ্গ, ১৩॥৶০
সেবাসমিতি, বালী, ৩০০৲
শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু দাস, মৌলমিজীন, ৩৲
,, এ, কে, ঘোষ, কয়েকটাগা, ৮০৲
জনৈক ভদ্রমহিলা, কলিকাতা, ১৩২৫৲
বেঙ্গল রিলিফফাণ্ড, বাসরা ১৫০০৲
টি, এন্, জুবিলী কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ
ভাগালপুর, ৩১॥৶০
মিঃ বসু, সাইমেণ্ড, ১০৲
শ্রীযুত এ, সি, মুখোপাধ্যায়, রেঙ্গুন, ৫৲
পোষ্টাল ষ্টাফ, গার্ডেন রীচ ১০৲
,, রাধারমন, জালালবা, নদীয়া, ২৲
,, ভীমাই চন্দ্র পাল, বর্দ্ধমান, ৸০
মাঃ ব্রঃ ক্ষেমচৈতন্য, কুয়ারপুর, ৫৲
শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ দে, কলিকাতা, ১
,, নৃতালাল মুখার্জ্জি, কলিকাতা, ৫৲
,, অক্ষয় কুমার মিশ্র, কলিকাতা, ২৲
অজ্ঞাত ১,

বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ।*

(শ্রীউপেন্দ্র নাথ দত্ত, এম, এ)

অনাদিকাল হইতে পরিবর্ত্তন-প্রণালীর মধ্য দিয়া জগৎপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। সমষ্টি হিসাবে এই পরিবর্ত্তনের প্রত্যেক অবস্থাটী অপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য হইলেও ব্যষ্টি হিসাবে দোষগুণ সাপেক্ষ। ভূমার তুলনায় প্রত্যেকটী নগণ্য, অপূর্ণ, এবং ক্ষণস্থায়ী। মহাসমুদ্রে তরঙ্গের মত এক একটা সমাজ, জাতি বা দেশ উঠিতেছে পড়িতেছে—স্থির থাকিয়া একটু বিশ্রাম করিবার অবসর পাইতেছে না। ভাঙ্গাগড়াই জগতের ধর্ম্ম। একটী ছোট অংশ যখন ভাঙ্গিয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় আর চলে না, তখন গতিধর্ম্মই যেন এক একটী বিশেষ শক্তির বিকাশ করিয়া এই ভগ্ন অবস্থাটীকে গড়িয়া তুলে। প্রকৃতির অন্তরাল ভেদ করিয়া এই শক্তিটী দেশকালপাত্র বিবেচনায় নানা দেশে নানা ভাবে নিজকে ছড়াইয়া দেয় এবং শুষ্ক মৃতপ্রায় ভাবসমূহে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করে। ফলে যে তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহার শীর্ষদেশে যে মহা শক্তিটী মানবশরীর অবলম্বন করিয়া, ক্ষুদ্রত্বের ভিতর দিয়া বৃহত্বে লীন হইয়া নিজের এবং জগতের সার্থকতা সম্পাদন করে, সে শক্তিটী যে কোন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউক না কেন, অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই তাহার ঘাতপ্রতিঘাত অনুভব করিতে আরম্ভ করে। ধর্ম্মনীতিতে, রাজনীতিতে, সমাজনীতিতে, শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে সর্ব্বত্রই এই শক্তির খেলা লক্ষিত হয়, কিছুকাল এই শক্তির রাজত্ব চলে, তৎপরে অন্য শক্তি আসিয়া প্রাচীনটীকে গ্রাস করিয়া বসে—যেমন বৌদ্ধ

* বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাসাহিত্য সভায় পঠিত।

ভাব সমূহকে শাঙ্করভাবসমূহ গ্রাস করিয়া ফেলিল, দাঁড়াইল না—নিজের করিয়া লইল। ভারত হইতে চৈতন্য শক্তি বিশ্রাম লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভয়ানক সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই সংঘর্ষে ভারতীয় জাতীয় জীবনের শাম্যভাব নষ্ট হইয়া গেল, প্রাচীনে নবীনে ভয়ানক গোল বাধিয়া গেল; কেহ প্রাচীনকে লইয়া অটল অচল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, কেহ বা নূতন স্রোতে সম্পূর্ণরূপে গা ভাসাইয়া দিল; ফলে, অনাচারে অবিচারে দেশ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ভারতের সমাজ এবং জাতীয় জীবন ইতিপূর্ব্বেই মৃত্যুশয্যাশায়ী ছিল, এক্ষণে এই নূতন উত্তেজনা প্রাপ্ত হইয়া প্রলাপ বকিতে লাগিল।

অন্যদিকে পাশ্চাত্যজগতে কর্ম্মপরায়ণ ইংরাজ এবং আমেরিকান জাতির সামাজিক জীবন খুব সজীব এবং দৃঢ় হইলেও ভোগবিলাসে সমস্ত দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। অধ্যাত্মিকতা বলিয়া একটা বস্তু সেখানে ছিল কিনা সন্দেহ। ধর্ম্মহীন হইয়া সে সব জাতিও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল।

এরূপ দুইটী জাতি যখন পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল তখন প্রাচ্যের ধর্ম্ম এবং পাশ্চাত্যের কর্ম্মবিনিময়রূপ মহান্ কর্ম্ম সাধিবার জন্য এক বিরাট্ শক্তির প্রয়োজন হইল। এই বিরাট্ শক্তির একটী বিকাশ দেখিতে পাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে। নানাদেশে নানাক্ষেত্রে এইরূপ যুগ্মশক্তির সম্মিলন এবং বিকাস দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—পৌরাণিক নর-নারায়ণে, গ্রীসদেশীয় এরিসটটল্-আলেকজান্দারে, ইটালীয় ম্যাটসিনী-গ্যারিবল্ডীতে। এই যুগ্মশক্তির একটীকে অন্যটী হইতে পৃথক্ করা যায় না, একটীতে অন্যটীর পূর্ণতা এবং পরিণতি—দুইটীতে মিলিয়া এক। সুতরাং আমাদের আলোচ্য বিবেকানন্দ বস্তুটী পৃথক্‌ভাবে জানিবার পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ শক্তিটীর সহিত ইহার একটু সম্বন্ধ জানা উচিত। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সাক্ষাৎ মূর্ত্তিস্বরূপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রাচীন ভারতের প্রতিনিধিরূপে আমাদের সম্মুখে অবতীর্ণ—আর পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানপূর্ণ নব্যভারতের রীতিনীতি ও আচারব্যবহারের

সহিত সম্যক্‌রূপে পরিচিত স্বামী বিবেকানন্দ বর্ত্তমান ভারতের প্রতিনিধিরূপে তাঁহার সহিত মিলিত। এই প্রাচীন ও নবীন—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবদ্বয়ের সমন্বয়স্থল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। এই অপূর্ব্বভাবের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ, প্রচারক বিবেকানন্দ। Sri Ram-krishna the man of Insight, Vivekananda the Prophet of that Insight. স্বামী বিবেকানন্দের শতমুখী প্রতিভা গুরুশক্তিকে নানাক্ষেত্রে অসংখ্য নূতন নূতন ভাবে খাটাইয়া জাগতিক গতিধর্ম্মের সহায়তা করিল।

স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা সাধারণতঃ তিনভাবে দেখিতে পাই। প্রথম জিজ্ঞাসু, দ্বিতীয় যোগী, তৃতীয় কর্ম্মী। জিজ্ঞাসু জীবনটা পূর্ব্বাপর পর্য্যবেক্ষণ করিলে মনে হয়, যেন কোন একটী আত্মা জন্মজন্মান্তরে সমস্ত ভোগসুখ মিটাইয়া বর্ত্তমানে এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, কোন ভোগ্য বস্তু দেখিলেই সিহরিয়া উঠে—ঐহিক সুখভোগে এত বিতৃষ্ণা! অথচ কিসে শান্তি, কিসে আনন্দ, কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছে না। প্রাণ যেন কি চায়, কোন্ অব্যক্ত অবিদিত বস্তুর জন্য জীবনের গভীরতম প্রদেশ হইতে আর্ত্তনাদ উঠিতেছে জীবনের এই অভাব দূর করিবে কে? তাই দেখিতে পাই, নরেন্দ্রনাথ (তখনও তিনি বিবেকানন্দ হন নাই) যেখানে সত্যের আভাস পাইতেছেন সেইখানেই ছুটিয়া যাইতেছেন—কত সাধু, কত বিদ্বান্, কত সমাজ হইতে মুখ মলিন করিয়া ঘুরিয়া আসিতেছেন—কখনও দেখিতে পাই, তিনি সতীর্থ ব্রজেন্দ্রনাথের সহিত নীরবে জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনা করিতেছেন, আবার কখনও দেখি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিভৃত কক্ষে উন্মত্তের ন্যায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'মহাশয়, আপনি কি ভগবান্ দেখিয়াছেন?' মোটকথা, বর্ত্তমান জীবনে তিনি ঘোর অবিশ্বাসী ও সন্দেহপূর্ণ। এখন চান সত্য, চান শান্তি, নহিলে জীবন আর চলে না!

দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দর্শন হওয়ার পর নরেন্দ্রনাথ যোগী, বিশ্বাসী, সর্ব্বত্যাগী। তাঁহার জীবন পথ পাইল। সত্য বস্তুকে অন্তরে বুঝিয়া এখন ইহা লাভ করিবার জন্য আবার উন্মাদ।

পিতৃহীন পরিবারের একমাত্র অভিভাবক নরেন্দ্রনাথ প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর জননী ও ভ্রাতাভগিনীগণকে অত্যন্ত অভাবের সংসারে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন- নিজের আদর্শ লাভের জন্য। ইহাকেই বলে আদর্শের জন্য ত্যাগ। মহান্ জীবনের ইহা একটী বিশেষ লক্ষণ।

যোগ অবস্থার বিবরণ কোন ঐতিহাসিক বলিতে পারেন না, কারণ, ইতিহাসের আরম্ভ এবং সমাপ্তি রজোগুণে কিন্তু যোগজীবন বা ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ সত্ত্বগুণে এবং পরিণতি কোন ত্রিগুণাতীত অবস্থায়, কাজেই এখানে সব চুপচাপ। তবে বহির্দৃষ্টিতে আমরা দেখিতে পাই, স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী অবস্থায় নানাস্থানে, নানা তীর্থে—কখন পর্ব্বতগুহায়, কখনও নদীতীরে, আকাশপন্থী হইয়া কঠোর তপস্যায় নিরত এবং জগৎ-সংসার ভুলিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন। তাঁহার তখনকার অবস্থা ভাবিলে ভগবান্ শঙ্করের ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির অনুভূতির কথা মনে পড়ে—

"অজরমমরমস্তাভাববস্তুস্বরূপং
স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহীনম্।
শমিতগুণবিকারং শাশ্বতং শান্তমেকং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ॥

এইত গেল বিবেকানন্দের যোগজীবন। তৃতীয় অবস্থা কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে কর্ম্মের জন্য কিভাবে তিনি প্রস্তুত হইতে ছিলেন তাহা একটু বলিয়া লই।

স্বামী বিবেকানন্দের অন্তস্তল হইতে কি এক অজ্ঞাত কর্ম্মপ্রেরণা আসিয়া তাঁহাকে নানা স্থানে ঘুরাইতে লাগিল। তিনি এই আশ্চর্য্য প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং একদিকে যেমন প্রত্যেক জাতির এবং সমাজের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, প্রথা পদ্ধতি সব শিক্ষা করিতে লাগিলেন অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় দর্শন এবং ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে তিনি ভারতীয় শিক্ষা এবং সভ্যতার মূল স্পর্শ করিতে সমর্থ হইলেন, এবং

সমগ্র হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুস্থানের প্রতিনিধি হইয়া স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় সমস্যাসমূহ পূরণ করিতে সক্ষম হইলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ নিজের ক্ষুদ্র আমিত্বের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বিরাট্ আমিত্বে লীন হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার জীবনের কার্য্য বা Mission পূর্ণ হইল না। তিনি আম খাইয়া মুখ মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না। জগতের দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি বৌদ্ধ যোগীদের মত বলিলেন, "একটী জীব থাকিতেও নিজের মুক্তি চাই না। তুচ্ছং ব্রহ্মপদং। অন্যকে উঠাইতে হইবে, সমগ্র জাতিকে, দেশকে, জগৎকে উঠাইতে হইবে।" একজীবনে না হয়, শতজীবনে সহস্রজীবনে বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি অন্যের জন্য প্রাণপাত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। প্রিয় শিষ্যদিগকে বলিতে লাগিলেন, অন্যের জন্য তোরা খাটিতে খাটিতে মরিয়া যা আমি দেখিয়া খুসী হই। এইরূপভাবে তিনি জন্মভিক্ষার সমগ্র এসিয়া, য়ুরোপ, আমেরিকায় বিচরণ করিতে লাগিলেন, যেমন—

"শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনানহেতুনাঽন্যানপি তারয়ন্তঃ॥"

বিবেকানন্দ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তথাকথিত পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মকে অবমাননা করিয়া চিকাগোতে যে ধর্ম্মমহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে প্রাচ্যসন্ন্যাসী হিন্দুধর্ম্মের জয়ঘোষণা করিলেন। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতা দেখিয়া পাশ্চাত্য জাতি মুগ্ধ হইয়া গেল। স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদিত লোক হইয়া জগতের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার সুযোগ পাইলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়কালে উভয়ে উভয়ের ঐশ্বর্য্য দেখিবার একটী অবসর মিলিল, পদদলিত তুচ্ছ ভারত আবার শির উচ্চ করিয়া দাঁড়াইল।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবকে কেন্দ্র করিয়া য়ুরোপে যে কতকগুলি ভাব Ethics ও Sociologyতে Individulismরূপে, Politicsএ Republicanismরূপে, Psychologyতে Nominalismরূপে প্রকাশ পাইয়া এক মহান্ ব্যক্তিত্বের or Individual Solidarityর

সূচনা করিতেছিল সেই ব্যক্তিত্ববাদ এবং অষ্টাবিংশতি শতাব্দীতে শুষ্ক প্রাকৃতিক ধর্ম্ম or Barren religion of nature or Theophilanthropy বিবেকানন্দের প্রচারিত 'বেদান্ত' ধারণা করিবার জন্য পাশ্চাত্য জাতিকে প্রস্তুত করিয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ যে বেদান্ত প্রচার করিয়াছিলেন তাহা ঠিক শঙ্কর বা রামানুজের বেদান্ত নহে। ইহা তাঁহার নিজস্ব। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় বেদান্ত বা উপনিষদকে নূতনভাবে বুঝিয়া জগৎকে তাহার অভয়বাণী বুঝাইলেন। তাঁহার বেদান্তের প্রাণ ছিল শক্তি—যে শক্তি ধর্ম্ম-জগতে, কর্ম্মজগতে, জ্ঞানজগতে, বিজ্ঞানজগতে সমভাবে খাটান যায়—যে শক্তি দ্বারা ধর্ম্মে না হউক, অন্ততঃ, মানবত্বের দিকে, অগ্রসর হওয়া যায়—Vedanta in practical life বা কর্ম্মজীবনে বেদান্ত। স্বামিজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া ভারতের ধর্ম্ম, জ্ঞান, চিন্তা, সভ্যতা এবং বিশ্বজনীনতা (Universality) পাশ্চাত্য জাতি সমূহে এবং তদ্দেশীয় কর্ম্ম, শক্তি, শিক্ষা, সভ্যতা ও ব্যক্তিত্ব (Individuality) ভারতে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতও তাহার ঋষিসন্তানের আচারব্যবহার এবং কার্য্যকলাপ দেখিয়া আর কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিল না। তখন ভারত নিজের চক্ষু মুছিয়া খোসা ছাড়িয়া বস্তুর দিকে নজর দিল, Form ছাড়িয়া Matter নিতে ততটা কুণ্ঠিত হইল না। ইহার ফলে ভারতের সামাজিক গতি অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। স্বামী বিবেকানন্দ হাতে ধরিয়া ভারতের সমাজসংস্কার না করিলেও তাঁহার জীবন সমাজের গতি ফিরাইয়া দিল—Conservative ভারত ক্রমে ক্রমে Liberal হইতে চলিল। ভারতীয় সামাজিক জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের ইহাই বিশেষত্ব। আর সন্দেহবাদ এবং জড়বাদপূর্ণ নব্য ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন যাহা ভয়ানক সন্দেহবাদ বা Agnosticism এর ভিতর দিয়া সম্পূর্ণ ঋষিত্বে পৌঁছিয়াছে) এক অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বহু অবিশ্বাসী মানব নিজেদের বাস্তবকে কল্পনা এবং কল্পনাকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য

হইয়াছে। ইহা স্বামিজীর জীবনের আর একটী বিশেষত্ব। বিবেকানন্দের জ্ঞান এবং কর্ম্মময় জীবন দেখিয়া ভারত এবং ভারতের জাতি পরস্পর পরস্পরকে সরলহৃদয়ে আলিঙ্গন করিল। Emerson তাই বলিয়াছেন, "Great men are thus a collyrium to clear our eyes from egoism and enable us to see other people and their works." অর্থাৎ মহান্ চরিত্র সকল চক্ষুর অঞ্জনস্বরূপ। উহারা আমাদের দৃষ্টিকে আত্মাভিমানের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া আমাদিগকে অপরের চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপের সম্যক্‌দর্শনে সমর্থ করে।

স্বামী বিবেকানন্দ মুমূর্ষু ভারতের আর কি করিলেন? তিনি দেখিলেন, ধর্ম্মহীন হইয়া ধর্ম্মপ্রাণ ভারত সব হারাইয়াছে। স্বার্থ আসিয়া ধর্ম্মের এবং ত্যাগের স্থান অধিকার করাতে ভারত কর্ম্মহীন এবং শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। অতিরিক্ত মাত্রায় ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে গিয়া এরূপ হয় নাই যদিও এরূপ একটী মিথ্যা মত কোন কোন বিদেশীয় পণ্ডিত প্রকাশ করিয়া থাকেন)। তাই তিনি ত্যাগ এবং কর্ম্ম জাতির সম্মুখে ধরিলেন। তিনি বলিলেন, Renunciation and Service—These are the two great national ideals of India, intensify them in their proper channels, the rest will take care of themselves." অনন্ত ত্যাগ এবং সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ। এই দুইটী ঠিক ঠিক রাস্তায় চালাইতে পারিলে আর সব আপনা হইতেই ঠিক হইয়া যাইবে। তাই তিনি ভারতে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ স্থাপনের জন্য রামকৃষ্ণমিশন নামক সাধুসঙ্ঘ 'আত্মনোমোক্ষার্থম্ জগদ্ধিতায়' প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই অসাধারণ মহাপুরুষ সংসারে পাপ না দেখিয়া শুধু দুঃখ দেখিতেন; তাই তাঁহার বিশাল হৃদয় স্বেচ্ছায় ব্রহ্মানন্দসম্ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক দুঃখপূর্ণ সংসারে থাকিয়া দুঃখের পশরা বরণ করিয়া লইয়াছিল।

ভারতীয় শক্তি এবং একত্বের জন্য তিনি একদিকে যেমন কর্ম্মের

নূতন প্রণালী অবলম্বন করিলেন, অন্যদিকে ধর্ম্মেরও এক অভিনব ভাব প্রকাশ করিলেন। ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়াই এই একত্ব সম্ভবপর ভাবিয়া এবং ইহাই সত্য জানিয়া তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভগবান্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তি-বিশেষের ভাব নষ্ট না করিয়া হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি সকলকেই নিজ নিজ ভাবকে পুষ্ট করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। 'যত মত তত পথ' এই মহাবাণী সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় এবং বিশ্বমানবের বিরোধনাশের উপায় হইল। এস্থলে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। উক্ত মহাপুরুষ ভারতের এবং ধর্ম্ম-জগতের একত্বের জন্য বেদের কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ্‌ভাগকে অবলম্বন করিয়া এক নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। একত্ব হিসাবে সাময়িকভাবে এই কার্য্য সফল হইলেও উহা সনাতন হইতে পারিল না। একটী ধর্ম্মের সম্মুখে বা ধর্ম্মের একটী উচ্চ অবস্থার পদতলে বিশ্বমানব মাথা পাতিয়া দিতে পারে না। কারণ, সমগ্র মানবত্বটী ধর্ম্মের চেয়ে অনেক বড়, ধর্ম্ম তাহার মাথার মুকুট; মানব মুকুট মাথায় পরিয়া রাজা হয়, তাই বলিয়া মুকুটটী রাজা নহে। রাজা রামমোহনের ধর্ম্ম বাহির হইতে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া সকলকে এক করিতে গিয়াছিল, স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম্ম ভিতর হইতে ব্যক্তিত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশকালপাত্রানুসারে ধর্ম্মভাব গড়িতে লাগিল। ইহার টানাটানি কেহ অনুভব করিল না, অথচ অজ্ঞাতভাবে সকলে একটা মহান্ একত্বের দিকে যাত্রা করিল। ধর্ম্মজগতে এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী এক সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের ভিত্তি পত্তন করিল।

এইত গেল ধর্ম্ম এবং কর্ম্মজগতের কথা। স্বামী বিবেকানন্দ চিন্তা বা জ্ঞানজগতে যে সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন, তাহাতে তাঁহার বিচারশীলতা বা Rationalismএর অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়। জগৎরহস্যের মীমাংসার জন্য যে সব দার্শনিক চিন্তাপ্রবাহ প্রাচীন ভারত, চীন, মিশর, গ্রীক প্রভৃতি জাতি হইতে নানা বিরোধ এবং

মিলন লইয়া বর্ত্তমান যুগে আসিয়া ঠেকিয়াছে এবং সে সব বিরোধই দর্শনের প্রাণ এবং গৌরব বলিয়া মনে হয়, সে সব বিরোধ এবং বিবাদ স্বামিজী এক নূতন মৌলিকভাবে মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার অকাট্য যুক্তি এবং গভীর চিন্তাশীলতা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। বাহাদুরি এই যে, তাঁহার ধর্ম্মজীবনের অদ্ভুত Mysticismএর সঙ্গে চিন্তাজীবনের আশ্চর্য্য Rationalismএর সমন্বয়—A paradoxical combination of Intuition and Reason. Dr. Marvin বলিয়াছেন, দার্শনিকেরা জগতের Reconcilers. এই Reconciliation বা সমন্বয়ের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে স্বামী বিবেকানন্দের স্থান আমরা সহজে অনুভব করিতে পারি।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিবেকতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী, অমানুষিক কার্য্যকলাপ, অদ্ভুত চরিত্র—যাহাতে দেব ও মানবভাবের অপূর্ব্ব সম্মিলন, অসাধারণ প্রতিভা—যাহা ইতিহাসে, দর্শনে, কবিত্বে, সঙ্গীতে, শিল্পজ্ঞানে, বাগ্মিতায়, ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সে সব সম্বন্ধে কিছুই বলিবার অবসর নাই, তবে একটা কথা না বলিলে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু বলা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়—উহা তাঁহার জীবনের সৌন্দর্য্য এবং বিশেষত্ব।

স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র জীবন একটা অসীম মানবত্বের পিছনে ছুটাছুটি। কতটুকু আসিলেন, কি ভাবে আসিলেন, ফিরিয়া দেখিবার তাঁহার এতটুকুও অবসর নাই, কেবল দৌড়, কেবল দৌড়!—কর্ম্মযোগী জানিতেন কেবল কাজ, ফলের দিকে আদৌ নজর নাই। পাণ্ডিত্য শেষ হইয়া গেলে যেমন পণ্ডিত আবার শিশু হয়, আবার নূতন উদ্যোগ নূতন উৎসাহ, সেইরূপ বিবেকানন্দের জীবন এরূপ কতকগুলি পরিণতির সমষ্টি, যাহার সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু জানিতেন না, এবং জানিতে গেলেও সহসা একটা অব্যক্ত অজ্ঞতা আসিয়া সব ঢাকিয়া দিত। তাঁহার একখানি পত্রের খানিকটা দেখিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

"যতই যা হক, জো, আমি এখন সেই পূর্ব্বের বালক বই আর

কেউ নই—যে দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব বাণী অবাক্ হ'য়ে শুন্‌ত আর বিভোর হয়ে যেত! ঐ বালকভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি—আর কাজকর্ম্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু করা গেছে তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের নিমিত্ত আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা! আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুন্‌তে পাচ্চি। * * * যাই, প্রভু যাই!

"* * * চারিপার্শ্বে কতগুলি পুতুল আর ছবি সাজান রয়েছে দেখে লোকের মনে যেমন শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না। এ অবস্থায় জগৎটাকে ঠিক ঐরূপ দেখাচ্ছে, আমার প্রাণের শান্তিরও বিরাম নাই। ঐ আবার সেই আহ্বান!—যাই, প্রভু যাই!"

আমার বিশ্বাস, এইরূপ কোন একটা অজ্ঞাত বা unconscious জীবনের বিষয় ভাবিয়া Carlyle Shakespeare এবং Mahometএ তুলনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "But as for Mahomet I think it had been better for him not to be so conscious. All that he was conscious of was a mere error."

বিবেকানন্দজীবনে এই ভুলটী হইবার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। চিরকাল তিনি বিরাট্ প্রকৃতির একটা কোলের ছেলে ছিলেন।

সুতরাং সংক্ষেপে ইহা বলা চলে যে ঐশীপ্রেরণাসম্পন্ন বিবেকানন্দ-জীবন প্রকৃতির একটী মহাশক্তির খেলা—আত্মজ্ঞান ও বিশ্বপ্রেমের একটী অনাবিল উৎস; ইহাতে যাহা মহান্ এবং বিশাল তাহা প্রকৃতির অন্তরতম প্রদেশ বা 'inarticulate deeps' হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে সাধারণভাবে অন্যের সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে কোন বিশেষ বিশেষ দিক্ দিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে ছাড়াইয়া গেলেও সমগ্র মানবত্বের দিক্ দিয়া—যাহাতে মানবীয় বৃত্তিসমূহের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা বুঝায় সেই হিসাবে—স্বামী বিবেকানন্দ বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব।

আলোচনা সভা ও জীবনগঠন

(শ্রীহরিশ্চন্দ্র দাশ)

আলোচনা মানবসমাজের *একটি স্বাভাবিক ও চিরন্তন প্রথা। মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ—শুধু অসম্পূর্ণ নয়, অনিশ্চিত। ভ্রম প্রমাদ ইহার নিত্যসহচর। আবার প্রত্যেকের জ্ঞান ভিন্নরূপ। এই পরিবর্ত্তন-স্বভাব, নির্ভরের অনুপযুক্ত, দুর্ব্বল জ্ঞানের নেতৃত্বাধীনে বিঘ্নসংকুল সংসার পথে অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক। তাই মানুষ জগতের সহিত প্রথম পরিচয় হইতেই পরস্পর একত্র হইয়া, পরামর্শ করিয়া, দশদিক্ বিচার করিয়া, যথাসম্ভব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবন-যাত্রায় আপনাদের পথ খুঁজিয়া লইতে চেষ্টা পাইয়াছে। আজ কাল নির্ণেয় কর্ত্তব্য কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, পরস্পরের মতামত জানিবার জন্য, নানা কথা শুনিয়া ও শুনাইয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, অল্প সময়ে অধিক জ্ঞান লাভের আশায় বা লিখিবার ও বলিবার অভ্যাস করিবার জন্য আমাদের দেশের স্থানে স্থানে সভা সমিতি ও স্কুলকলেজে 'ডিবেটিং ক্লাব,' 'লিটারারী এসোসিয়েসন্' প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাতে সুফলই হইতেছে। এদেশের অনেক সুবক্তা, সুলেখক ও সুকবির জীবনের উপর উহাদের প্রভাব বড় কম হয় নাই। এসকল ইংরাজী শিক্ষার ফল বলিয়াই সাধারণতঃ মনে হয়। ইংরাজী সাহিত্যজ্ঞ মাত্রেই লণ্ডন সহরের অষ্টাদশ, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ 'ক্লাবে'র সংবাদ রাখেন। ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান প্রধান দশ জন ব্যক্তি—লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ডাঃ জনসন্, চিন্তাশীল বাগ্মী এড্মণ্ড্ বার্ক, সুলেখক ও সুকবি অলিভার গোল্ডস্মিথ, সুবিখ্যাত চিত্রকর সার জোসুয়া রেনল্ডস, স্বনামধন্য অভিনেতা গ্যারিক প্রভৃতি ইহার সদস্য ছিলেন। বর্ত্তমান আকারের

* ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের আলোচনা সভার উদ্দেশ্যে লিখিত ও উক্ত সভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে পঠিত

সভা সমিতি পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম আমদানী হইলেও, সকলে সমবেত হইয়া পরস্পরের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার আলোকে জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় সকলের মীমাংসা ও কর্ত্তব্য নিরূপণ যে এদেশের চিরপ্রচলিত রীতি ছিল, তাহা যিনি ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত পরিচিত তিনি বিশেষরূপ অবগত আছেন। যজ্ঞাদি সময়ে বিদ্বৎ-সম্মিলনী, রাজসভায় বিবিধ বিষয়ে পারদর্শী পণ্ডিতমণ্ডলী, তপোবনে মুনিসমাগম, গুরুগৃহে সহাধ্যায়িগণের নিয়মিত সমবেত আলোচনা প্রভৃতি ইহার নিদর্শন। বর্ত্তমানের কুম্ভমেলা এবং বিবাহ ও শ্রাদ্ধ-বাসরের পণ্ডিতসভা ইহার ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে হয়। সভা ও পরিষৎ শব্দের ব্যুৎপত্তি দৃষ্টেও ইহা প্রতিপন্ন হয়। 'সহভান্তি অভীষ্টনিশ্চয়ার্থ-মেকত্র যস্মিন্ গৃহে ইতি সভা'। 'পরিতঃ সীদন্তি অস্যামিতি পরিষৎ'। "বিদ্বৎ সংহত্যাবপি সভাপর্য্যায় পরিষচ্ছব্দমাহ"। সভা ও পরিষৎ সম্বন্ধে ব্যবস্থাশাস্ত্রপ্রণেতা শ্রীমনু মহারাজ বলিয়াছেন*—

"যে স্থানে তিনজন বেদজ্ঞ বিপ্র, রাজপ্রতিনিধি, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ মিলিত হন তাহাকে সভা কহে। * * * বহুর অভাবে দশের কম না হয়, তদভাবে তিনের কম না হয়, এমন বিদ্বান্ সদাচারী মিলিত হইয়া যে ধর্ম্ম নিশ্চয় করিবেন তাহা কেহ বিচলিত করিবেন না। বেদের শাখাত্রয়ের অধ্যেতা, শ্রুতিস্মৃতির অবিরুদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ, মীমাংসাত্মক তর্কবিৎ, বেদাঙ্গনিরুক্তশাস্ত্রজ্ঞাতা, মানবাদিধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ,

* "যস্মিন্ দেশে নিষীদন্তি বিপ্রাবেদবিদস্ত্রয়ঃ।
রাজ্ঞঃ প্রতিকৃতো বিদ্বান্ ব্রাহ্মণস্তাং সভাং বিদুঃ॥
* * *
দশাবরা বা পরিষৎ যং ধর্ম্মং পরিকল্পয়েৎ।
ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ॥
ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পারিষদ্ স্যাদ্দশাবরাঃ॥
ঋগ্বেদবিদ্ যজুর্বিচ্চ সামবেদবিদেব চ।
ত্র্যবরাঃ পরিষদ্ জ্ঞেয়া ধর্ম্মসংশয়নির্ণয়ে॥"

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থাশ্রমী অন্যূন দশজন লইয়া পরিষৎ করিবে। ধর্ম্মবিষয়ক সংশয় ঋগ্বেদবিদ্, যজুর্ব্বেদবিদ্, সামবেদবিদ্ তিনজনের কম না হয় এমন পরিষদ্ নির্ণয় করিবেন।”

এখানে ইহাও লক্ষিত হয় যে সভাগঠনে বিবিধ বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণের নির্ব্বাচনের প্রতি ভারতীয়গণের দৃষ্টি ছিল। ভারতবর্ষের ন্যায় প্রাচীন গ্রীসে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনার জন্য Thiasi, Eranoi, Orgeônes এবং প্রাচীন রোমে Sodalitates ও Collegium নামধেয় সভাসমিতি বিদ্যমান ছিল। তত্তদ্দেশীয় প্রাচীন সাহিত্য এবং অধুনাতন আইন গ্রন্থেও উহার চিহ্ন রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র রাজনীতি, ধর্ম্ম, সমাজ, বাণিজ্য, সাহিত্য প্রভৃতি জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয়, এমন কি, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনার জন্যও সভাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে বিবিধ জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য অনুষ্ঠিত সভাসমিতিসমূহের অন্যতম আমাদের এই ক্ষুদ্র আলোচনা সভা। জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্যা সমূহের সমাধান এবং তদনুসারে কর্ত্তব্য নিরূপণ ও পালনপূর্ব্বক জীবনগঠন ইহার উদ্দেশ্য। ইহার বিশেষত্ব এই যে, এই সকল সমাধান ও কর্ত্তব্য ধর্ম্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় অবধারিত হইবে। উহারা প্রাচীন শাস্ত্রানুমোদিত অথচ বর্ত্তমান সভ্যতার উপযোগী হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বহু স্থানে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ধর্ম্মের সনাতন সত্য ও সিদ্ধান্ত সমূহ আধুনিক চিন্তাজগতের বিরোধী নহে, পরন্তু উহার পরিপোষক ও পরিচালক।

জীবনগঠন এই আলোচনা সভার লক্ষ্য বটে, কিন্তু মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষই ইহার প্রত্যক্ষ ফল। সদ্ভাবের মৃদু স্পন্দন ভিতরে ভিতরে অনেকেই অনুভব করেন, কিন্তু তাহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবর্ত্তিত করে এমন সামর্থ্য উহাদের নাই। পরস্পরের সাহচর্য্যে ভাবের আদান প্রদান হইলে উহারা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া কর্ম্মজীবনে আত্মপ্রকাশের শক্তিলাভ করে। উপদেশ ও বক্তৃতাদি

শুনিয়া সদ্ভাবের অন্ততঃ ক্ষণিক প্রেরণা জীবনে উপলব্ধি করেন নাই এমন লোক বিরল। ইহাকে ক্রমে ক্রমে স্থায়ী করিতে পারিলেই চরিত্র গঠিত হয়। পরস্পর জ্ঞান ও চিন্তার বিনিময় দ্বারা মনের প্রসার হয়—উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমি হইতে বিষয় সকল বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মে। এক দিক্ হইতে বিবেচনা করিয়া যাহাকে অপকৃষ্ট ও অনাবশ্যক মনে হয়, অন্যদিক্ হইতে দেখিলে তাহাই আবার সমাজের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইবে। কথায় বা লিখিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিলে প্রণালীবদ্ধভাবে চিন্তা করিবারও শক্তি হয়। অনেক বিষয়, যাহা অসঙ্গত ও অস্পষ্ট ভাবে মনে উদিত হয়, তাহা লিখিতে বা বলিতে চেষ্টা করিলে সুসংবদ্ধ ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আবার মনের পরিধিবৃদ্ধির সহিত হৃদয়েরও বিস্তার ঘটে, ফলে, গোঁড়ামি সঙ্কীর্ণতা চলিয়া যায়, উদারতা আসে। অহম্মন্যতা—উন্নতিপথের প্রধানতম অন্তরায়—দূরীকৃত হয়, শ্রদ্ধা তাহার স্থান অধিকার করে।

জীবনগঠনের জন্য হৃদয় ও মন উভয়ের উন্নতি সাধন আবশ্যক। শুধু হৃদয়ের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ত্তব্যসাধন অনেক সময় নিরাপদ্ হয় না। ভাবের প্রেরণায় ভাল করিতে গিয়া কত জন মন্দ করিয়াও বসে। "শেষে উল্টা সমঝ্লি রাম" হইয়া পড়ে। আবার কেবল বিচারবুদ্ধি দ্বারাও কার্য্য হয় না। উহা মাত্র শূন্যগর্ভ তর্কাদির সৃষ্টি করিয়া থাকে। সেইজন্য স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশ—

"আমাদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয়ই আবশ্যক। হৃদয় অবশ্য খুব শ্রেষ্ঠ—হৃদয়ের ভিতর দিয়াই জীবনের উচ্চপথে-পরিচালক মহান্ ভাব সমূহের স্ফুরণ হইয়া থাকে;—হৃদয়শূন্য কেবল মস্তিষ্ক অপেক্ষা যদি আমার কিছু মাত্র মস্তিষ্ক না থাকে অথচ একটুকু হৃদয় থাকে তাহা আমি শত শত বার পছন্দ করি। যাহার হৃদয় আছে তাহারই জীবন সম্ভব, তাহারই উন্নতি সম্ভব কিন্তু যাহার কিছু মাত্র হৃদয় নাই কেবল মস্তিষ্ক, সে শুষ্কতায় মরিয়া যায়।

"কিন্তু ইহাও আমরা জানি যে যিনি কেবল নিজের হৃদয় দ্বারা পরিচালিত হন তাঁহাকে অনেক অসুখ ভোগ করিতে হয়, কারণ, তাঁহার প্রায়ই ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা। আমরা চাই হৃদয়ের ও মস্তিষ্কের সম্মিলন। আমার বলার উহা তাৎপর্য্য নহে যে, খানিকটা হৃদয় ও খানিকটা মস্তিষ্ক লইয়া পরস্পর সামঞ্জস্য করি কিন্তু প্রত্যেক

ব্যক্তিরই অনন্ত হৃদয় ও ভাব থাকুক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত পরিমাণ বিচার বুদ্ধিও থাকুক।"

(সর্ব্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা)

হৃদয় ও মনের উন্নতির ফলে উচ্চভাব, শ্রেষ্ঠআদর্শ ও মহৎচিন্তা-সকল আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে উদ্বোধিত ও অনুপ্রাণিত করে। ভাব ও ভাবনা কর্ম্মের প্রাণ, ভাবহীন বিচারশূন্য কর্ম্মজীবন যন্ত্রবৎ নীরস ও জড়প্রায়। কিন্তু অনেক সময় ভাব ও মননাদি নিস্ফল ভাবুকতায় পর্য্যবসিত হয় বলিয়া অনেকে ভাবুকতার দোষ ভাবের ঘাড়ে চাপাইয়া বিচার, আলোচনা ও শাস্ত্রচর্চ্চা প্রভৃতি মানসিক উন্নতির অবলম্বনগুলির উপরও কটাক্ষ করিতে ছাড়েন না। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"আজকাল সমাজে একটা গতি দেখা দিয়াছে। কার্য্যের দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়া এবং মননাদিকে উড়াইয়া দেওয়া। কার্য্য খুব ভাল বটে, কিন্তু তাহাও চিন্তা হইতে প্রসূত। মনের ভিতর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির বিকাশ হয়, তাহাই যখন শরীরের ভিতর দিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই তখন কার্য্য বলে। চিন্তা ব্যতীত কোন কার্য্য হইতে পারে না। মস্তিষ্ককে উচ্চ উচ্চ চিন্তা—উচ্চ উচ্চ আদর্শে পূর্ণ কর, ঐ গুলিকে দিবারাত্র মনের সম্মুখে স্থাপন কর তাহা হইলে উহা হইতেই মহৎ মহৎ কার্য্য হইবে।"

(মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধীয় বক্তৃতা)

অতএব আলোচনা সভার সভ্যগণকে অধ্যয়ন, মনন ও বিচার দ্বারা শ্রেষ্ঠভাব ও চিন্তা সমূহ গ্রহণ ও ধারণা করিতে হইবে। শুধু স্কুল-কলেজের নির্দ্দিষ্ট পুস্তক পাঠ ও অপরের ভাব দ্বারা মস্তিষ্ক বোঝাই করিলে চলিবে না। স্বাধীন চিন্তা দ্বারা সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। আধুনিক পাঠ্যপুস্তকে জীবনপ্রদ, বলকর, সারবান্ স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় ভাবের অভাব। স্বাধীন যুক্তি ও মৌলিক গবেষণাপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি পাঠ দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা অন্ততঃ আত্মশিক্ষার পথ খুলিয়া দেয়। ছাত্রজীবনে ও পরে উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারতাদি শাস্ত্রীয় গ্রন্থ, প্রধান প্রধান জাতিসকলের ইতিহাস, শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণের জীবনী ও উপদেশ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাপূর্ণ বিশিষ্ট পুস্তক সমূহ প্রধানতঃ আলোচ্য। অধীত বিষয়ে প্রশ্নাদি করিয়া নিজের ভাব সংশোধন ও দৃঢ় করা এবং লেখায়

ও কথায় নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করা প্রয়োজন। ইহাতে শ্রোতা ও বক্তা উভয়ের সমকালে উপকার হয়। আর একটি বিষয়ে সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত। পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ যেন কখনও না জন্মে। তর্কবিতর্কের ফলে অনেক সময় পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ, এমন কি, শত্রুতার সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। পরস্পরের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা, শ্রদ্ধা এবং পরস্পরের মহত্ত্ববোধ দ্বারা হৃদয় পূর্ণ রাখিতে হইবে। প্রশংসাচ্ছলে দোষদর্শনরূপ ব্যাধি যেন আমাদের মধ্যে কখনও প্রবেশ না করে।

আলোচনা সভা সপ্তাহে একদিন উপদেশ প্রদান ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া বিদায় দিলেই কি আমরা জীবন গঠনে সমর্থ হইব? না, কর্ত্তব্যসাধনের জন্য দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রবল আত্ম-বিশ্বাস আবশ্যক। জীবনের দায়িত্ববোধ না হইলে সৎপথে প্রবৃত্তি হয় না এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস না থাকিলে কেহ ঐ পথে চলিতে পারে না। সৎসঙ্গ ও সদালোচনার ফলে কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত ও আত্মশক্তির উন্মেষ হয় এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্ষ্য ধারণা করিবার সামর্থ্য জন্মে। লক্ষ্য স্থির না করিয়া শুধু কর্ত্তব্যপালন দ্বারা জীবন গঠন হয় না। কারণ লক্ষ্যভেদে কর্ত্তব্য ভিন্ন ভিন্ন হয়। বণিক্ ও বিদ্যার্থীর কর্ত্তব্য একরূপ নহে। আবার লক্ষ্য এক হইলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, রুচি ও সামর্থ্যভেদে কর্ত্তব্য বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। কি স্বাস্থ্য, কি বিদ্যা, কি ধর্ম্মলাভ—একই বিষয়ের জন্য প্রত্যেকের কর্ত্তব্য ভিন্নরূপ। কিন্তু জীবনগঠনের জন্য যত প্রকার কর্ত্তব্য—যত নিয়ম বিহিত হইতে পারে, উহাদের সকলকে একটি সাধারণ লক্ষ্যদ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়, যথা—Be good and do good. ভাল হও ও ভাল কর। ইহা জীবনের নিম্নতম অবস্থা হইতে সর্ব্বোচ্চ অবস্থা পর্য্যন্ত সমস্ত অবস্থায় প্রযোজ্য। কথা দুইটি হইলেও উহারা একই জীবনগঠনরূপ পথের দুই দিক্—পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। নিজে ভাল না হইলে অন্যের হিত করা যায় না, অন্যের হিত না করিলে নিজে ভাল হওয়া যায় না। নিজের ও অপরের সামান্য দৈহিক উন্নতি

হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উন্নতি পর্য্যন্ত সকলই ইহার অন্তর্ভুক্ত। আর এক কথা। Be good and do goodএর মূল স্বার্থত্যাগ। কেননা, ভাল হওয়ার অর্থ দেহাদিতে অভিমান বর্জ্জন বা 'কাঁচা আমি' ত্যাগ করিয়া 'পাকা আমি' গ্রহণ, আর ভাল করার অর্থ 'কাঁচা আমি' ছাড়িয়া 'পাকা আমির' ভিতর দিয়া সকলকে দেখা বা সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন। এই 'কাঁচা আমির' ত্যাগই স্বার্থত্যাগ কথাটির প্রকৃত অর্থ। কারণ, পরার্থ কর্ম্ম মাত্রই ক্ষুদ্র আমিত্বের বিসর্জ্জনের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই পরার্থ কর্ম্মের ফলে মানুষ অলক্ষিতে সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা আমিত্বের গণ্ডী ছাড়াইয়া ভিতরেবাহিরে আত্মস্বরূপের সন্ধান পায়। এই স্বার্থহীন কর্ম্ম সকলের পক্ষেই কোন না কোন ভাবে অবলম্বন করা সম্ভবপর। অবশ্য যাঁহারা জগতের মিথ্যাত্ব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া আত্মানুসন্ধানের জন্য মানবসমাজের বাহিরে সংসারের বাতুলতা হইতে বহুদূরে ছুটিয়া যান তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁহারা জনসংঘের মধ্যে আত্মোন্নতি সাধনে ব্যাপৃত, দুঃখীর ক্রন্দন, পীড়িতের আর্ত্তনাদ যদি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ না করে তাহা হইলে তাঁহাদের ভাল হওয়া স্বার্থপরতার নামান্তর! তাঁহাদের পক্ষে দুইই সমকালে অনুষ্ঠেয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "সাধুসেবা, পরোপকার, সদনুষ্ঠান ঈশ্বরানুরাগের ঐশ্বর্য্য"।

আবার একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই Be good and do good জীবনগঠনের কেবল সাধন নয় সাধ্যও। কারণ, ভাল হওয়ার শেষ পরিণতি পূর্ণত্বলাভে। ইহাই মনুষ্যের যথার্থ স্বরূপ বলিয়া সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণ—বুদ্ধ, খৃষ্ট, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—ইহার সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়া আপনাদের উপলব্ধ বস্তু জগতে বিলাইয়া দিয়াছেন। জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রতিকার্য্য ও অবস্থার ভিতর দিয়া এই সাধারণ লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার নাম জীবনগঠন। এই অভিপ্রায়ে Be good and do good রূপ সাধ্যসাধনকে অবলম্বন

করিয়া জীবনের বিভিন্ন বিভাগের সমস্যা সকলের সমাধান ও কর্ত্তব্য নিরূপণ করা এই সভার কার্য্য হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "Be and make", "Be god and help others to be gods," "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" ইত্যাদি। লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির থাকিলে সকলেই সাধারণ কর্ত্তব্যসমূহ অবস্থাবিশেষে নিজ নিজ জীবনের উপযোগী করিয়া লইতে পারিবেন, কিন্তু লক্ষ্যৈকনিষ্ঠা আবশ্যক। ঐটি ধারণা হইলে কর্ত্তব্য আপনা হইতেই স্থির হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়মের ব্যতিক্রম হইলেও কিছু আসিয়া যায় না। Ruysbroek নামক বেল্জিয়ম দেশের একজন চতুর্দ্দশ শতাব্দীর খ্রীষ্টিয়ান সাধক ও তাঁহার সহযোগীদ্বয়ের সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, পূর্ণত্বলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন তাঁহাদের জীবনের আর কোন নিয়ম ছিল না—"They had lived in the little house in Brussels with no other rule save their own passion for perfection."

কিন্তু একমাত্র নীতিতত্ত্ব বা ভাবকে অবলম্বন করিয়া জীবনগঠন করা সকল অবস্থায় সম্ভবপর নহে। যতক্ষণ জীবনপ্রবাহ ধীর মধুর গতিতে বহিতে থাকে, কবির ভাষায় glides at its own sweet will, ততদিন উহা সহজসাধ্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যখন অবস্থাবিপর্য্যয়ের ভীষণ বাত্যা উত্থিত হয়, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির তরঙ্গাভিঘাতে যখন চিত্ত আন্দোলিত হইতে থাকে, নিরাশার ঘনান্ধকার যখন দশদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন কয়জন নীতিবিশেষকে অবলম্বন করিয়া লক্ষ্যাভিমুখে জীবনতরী পরিচালনা করিতে বা স্থির রাখিতে সমর্থ হন? অনেকেরই ক্ষুদ্রতরী তখন বিভ্রান্ত বা বিধ্বস্ত হইয়া যায়। কারণ, শুদ্ধ নীতি বা তত্ত্ব প্রাণহীন, নীরস, শুষ্ক। উহাকে সর্ব্বাবস্থায় ধরিয়া থাকা যায় এমন মাধুর্য্য, এমন আকর্ষণীশক্তি উহার নাই। আদর্শ জীবন দ্বারা প্রতিপাদিত হইলে উহা সরস, জীবন্ত, হৃদয়মনোগ্রাহী এবং যথার্থতঃ ধারণাযোগ্য হয়। মহাপুরুষগণ সর্ব্বোচ্চ তত্ত্বসমূহের জীবন্ত

বিগ্রহস্বরূপ। তাঁহাদের জীবনসহায়ে মানুষ তত্ত্ব বা নীতিসকল ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবনে পরিণত করিতে সমর্থ হয়। আদর্শজীবন গ্রহণ না করিয়া শুধু নীতিবিশেষ অবলম্বন করা বিড়ম্বনা মাত্র। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন

আমরা সূক্ষ্ম তত্ত্বসম্বন্ধে, নানামত সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্যই যেন বলিয়া দেয়, ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রে প্রকটিত হইলেই আমরা তত্ত্ববিশেষের ধারণায় সমর্থ হই। আমরা তখনই ভাববিশেষের ধারণায় সমর্থ হই, যখন উহারা আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে প্রতিভাত আদর্শ-পুরুষবিশেষের চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রকটিত হয়। আমরা কেবল দৃষ্টান্ত সহায়েই উপদেশ বুঝিতে পারি। প্রত্যেক মহান্ আচার্য্যের নিজ নিজ জীবনই তাঁহার উপদেশের একমাত্র ভাষ্য। তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবন আলোচনা করিয়া দেখ, তিনি নিজে যাহা করিয়াছেন তাহা তাঁহার উপদেশের সহিত ঠিক মিলিবে। গীতা পাঠ করিয়া দেখ, দেখিবে গীতার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সহিত গীতার উপদেশের কি সুন্দর সমন্বয় রহিয়াছে।

(জগতের মহত্তম আচার্য্যগণ সম্বন্ধীয় বক্তৃতা।)

যিনি আদর্শজীবন সহায়ে কর্ত্তব্যপালনপূর্ব্বক লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হন, তাঁহার সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। প্রথম প্রথম পদস্খলন হইলেও তাঁহার ভয় নাই, কারণ, আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিলে আদর্শই পরে তাঁহাকে ধরিয়া বসে, তখন ছাড়িতে ইচ্ছা হইলেও ছাড়া যায় না; ক্রমে তাঁহার সমস্ত কার্য্য, সমস্ত চিন্তা আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ও অনুরঞ্জিত হইয়া যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "মা যাকে ধরে তার বেতালে পা পড়ে না।" অতএব আমাদের আদর্শজীবন অবলম্বন করা আবশ্যক। স্বামিজী বলিতেন, জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সম্মিলনই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। সর্ব্বোপনিষদ্‌সার, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয়ভূমি শ্রীশ্রীগীতা যে পার্থসারথির আদর্শজীবনের ছায়ামাত্র তাঁহারই পুনঃসংস্কৃতপ্রকাশ অধুনাতন শ্রীরামকৃষ্ণজীবন। একপক্ষে রণক্ষেত্রে অগণন বাহিনীমধ্যে অশ্বসঞ্চালন ও সঙ্গে সঙ্গে চরম দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ, অপর পক্ষে মনোবুদ্ধির বিলয়স্থান নির্ব্বিকল্পসমাধিভূমি হইতে মুহুর্মুহুঃ বলপূর্ব্বক 'আমি আমার' রাজ্যে নামিয়া দর্শন ও শাস্ত্রের মারমর্ম্মোদ্ঘাটনপূর্ব্বক লোককল্যাণসাধন।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন শ্রীরামকৃষ্ণজীবনেরই স্থূলতর অভিব্যক্তি। সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকভাবরাজ্যের শক্তিবিকাশ খুব কম লোকেই ধরিতে ও বুঝিতে পারে। তাই মানবসাধারণের কল্যাণের জন্য জগতের চিন্তারাজ্যে ও কর্ম্মক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাববিস্তার। ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত পাশ্চাত্যদেশসকলের বিলাসাড়ম্বর স্বামিজীর সমাধিপূতমনে দৃশ্যপটের ন্যায় প্রতিভাত হইত। কথাবার্ত্তা, বক্তৃতা বা উপদেশ দানকালে তিনি আত্মসংস্থ থাকিতেন; এমন কি, হাস্যপরিহাস কালেও তিনি মুহূর্ত্তের জন্য আপনভাব হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেন না, একথা তাঁহার শিষ্যগণের লেখনীমুখে বহুবার পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এখন ইঁহাদিগকে অবতারই বলা যাক, কি পরিত্রাণাই বলা যাক, কিম্বা দেবমানব, অতিমানব অথবা মহাপুরুষই বলা যাক, তাহাতে বস্তুসত্তার কোনরূপ ব্যত্যয় হয় না।

কিন্তু আমরা যে ভূপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া সুদূর নক্ষত্রলোকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছি! কোথায় মনোবুদ্ধিবিলয়কর-সমাধিমগ্ন মহাপুরুষ আর কোথায় বাসনাসংক্ষুব্ধচিত্ত দেহৈকবুদ্ধি ক্ষুদ্র জীব! ভয় নাই! স্বামিজী বলিয়াছেন, "Take man where he stands and from there give him a push upwards." জীবনের নিরূপিত কর্ত্তব্যের মধ্যে ত্যাগের ভাব না আসিলেও কোন না কোনরূপে নিঃস্বার্থ কর্ম্ম যে কেহ নিয়মিত ভাবে করিয়া যাইতে পারে। আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপে নিয়মপূর্ব্বক কোন একটি স্বার্থশূন্য কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে সে নিশ্চয় একদিন বলিবে—"সহসা হেরিনু নয়ন মেলিয়া এনেছ তোমারি দুয়ারে!"

নববর্ষ।

(শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার)

আবার নববর্ষ আসিল। বাঙ্গালায় নববর্ষ নূতনের আবির্ভাব নহে—পুরাতনের প্রত্যাবর্ত্তন। সেই একটানা কোনমতে-কায়ক্লেশে-বাঁচিয়া-থাকিবার মামুলী চেষ্টা, আর অভাব অনটনের পীড়নে দুর্ব্বলের ব্যর্থ বিলাপের করুণ কাহিনী! এমনি ভাবে তিল তিল করিয়া সঞ্চিত দুঃখের বোঝা বুকে তুলিয়া দিয়া পুরাতন বর্ষ বিদায় লইল। যাহা যায় তাহা যায়, আর ফিরিয়া আসে না। ফিরিয়া আসে না বলিয়াই আমরা উহা ধরিয়া রাখিতে ব্যগ্রবাহু বিস্তার করি। পাইব না বলিয়াই পাওয়ার আশায় প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই স্বাভাবিক অসহায় ব্যাকুলতাকে লুব্ধ করিয়া স্মৃতি মরুমরীচিকার সম্মোহিনী মায়া বিস্তার করে—আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই। এই স্মৃতির মোহ আমরা কাটাইয়া উঠিতে পারি না বলিয়াই নূতনকে দেখিলেই পুরাতনকে মনে পড়ে। বিচিত্র ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাত, আলোড়ন ও বিক্ষোভের বিশৃঙ্খলতার প্রশান্ত পরিণাম—এই পরিচিত পুরাতনকে পরিহার করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। মানুষ যদি তাহার অতীতকে বিস্মৃতির প্রচ্ছন্ন ক্রোড়ে চিরদিনের মত সঁপিয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে কি হইত জানি না, বোধ হয় মানুষ মানুষ হইত না। স্মৃতি বেদনাময় হইলেও মধুর, জ্বালাময় হইলেও আকাঙ্ক্ষণীয়। নববর্ষের প্রথম প্রভাতে দাঁড়াইয়া পণ্ডশ্রমের অশ্রুজল দু'হাতে মুছিতে মুছিতে ইচ্ছা হয়, একবার পশ্চাদ্দৃষ্টিপরায়ণ হইয়া অতীতের বিশাল ভাণ্ডারে দৃষ্টিপাত করি, আশঙ্কা হয়, বিস্মৃতি বুঝি বা জীবনের শুভমুহূর্ত্তের আনন্দস্মৃতিগুলি অক্লেশে গ্রাস করিয়া ফেলিবে।

কিন্তু কেবলমাত্র অতীত লইয়াই মানুষের জীবন নয়। অতীত ও ভবিষ্যতের তটবন্ধনে দুর্ব্বার জীবনস্রোত বর্ত্তমান ঘটনার তরঙ্গ তুলিয়া

পরম-কৌতূহলে চরম লক্ষ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে। নদীকে যেমন তট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না, জীবনকেও সেইরূপ অতীত ও ভবিষ্যৎ বাদ দিয়া ভাবা যায় না।

অতীতকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিয়া যে কেবলমাত্র বর্ত্তমানের উপরেই নির্ভর করে, তাহার উচ্ছৃঙ্খল জীবনস্রোত কুলনাশিনী পদ্মার মত আবর্ত্তসঙ্কুল, উদ্দামগতিতে সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অগ্রসর হয়। শক্তির অযথা অপব্যয়ের শত ছিদ্রপথে তাহার লক্ষ্যহীন জীবনের সমস্ত সঞ্চয়টুকু ঝরিয়া পড়ে। নিঃস্বের শূন্যগর্ভ আস্ফালন অন্তরের দৈন্যকে আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না। অন্ধ ইচ্ছাশক্তির উৎকট প্রেরণায় যে ধ্বংসের পথে ছুটিয়া চলে, সুখ দুঃখ পর্য্যায়ক্রমে তাহাকে বঞ্চনা ও ব্যঙ্গ করিয়া যায়; বর্ত্তমানের বিরস অভিজ্ঞতা তাহার চিত্তকে ক্রমে ক্রমে বিকৃত করিয়া তোলে। দগ্ধপদ মানব যেমন চরণদাহে কাতর হইয়া ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ায়, স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, তাহার অবস্থাও তদ্রূপ। বর্ত্তমানের তৃপ্তিহীন শুষ্কতা তাহার জীবনরসটুকু নিঃশেষে শুষিয়া লয়। লালসার প্রজ্জ্বলিত শিখায় দগ্ধজীবনের উন্মাদ চাঞ্চল্যের উপর ধীরে ধীরে অবসাদ নামিয়া আসে। অবশেষে জীবনভরা অনুতাপের মধ্যে তাহার শোচনীয় পরিসমাপ্তি!

আবার অতীত যাহাকে স্বপ্নাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহার জীবনের লীলায়িত গতি রুদ্ধ হইয়া যায়। চলমান্ মৃতদেহের মত সে জন-সমাজে চলা ফেরা করে। তাহার পঙ্কিল হৃদয়ে আশার তরঙ্গ খেলে না, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনায় সে নিজেকে সহজ ও স্বাভাবিক বিকাশের পথে ছাড়িয়া দিতে পারে না। তীব্র সুখানুভূতি বা মর্ম্মান্তিক দুঃখও তাহাকে উল্লসিত বা বিচলিত করে না। সে নূতনকে ভয় করে, বিশ্বাস করিতে পারে না। তাহার জীবন ব্যর্থ—কেবল জগতের ভারবৃদ্ধি করে। অস্বাভাবিক অতীত-প্রীতি মানসিক জড়ত্ব আনয়ন করে মাত্র।

এই প্রকার অতিমাত্রায় অতীত-প্রিয়, উদ্যমহীন অদৃষ্টবাদী মনুষ্য-সমষ্টি লইয়া আমাদের বাঙ্গালীসমাজ গঠিত। পুরাতনের মোহ এই

হতভাগ্য জাতিকে এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে সে কিছুতেই প্রাণ খুলিয়া নবীনকে বরণ করিতে পারে না। এই দৈববিশ্বাসী পতিতজাতি মাটীতে পড়িয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিবে, তবুও মাটীভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে না—আশঙ্কা, পাছে চিরাচরিত নিয়মভঙ্গ হইয়া যায়।

* * *

অনন্ত কালস্রোত দুর্ণিবার বেগে বহিয়া চলিয়াছে— ইহার আদি ও অন্ত আমরা বুঝিতে পারি না। শুধু এক একটা তরঙ্গের উত্থানপতন ও বিলয়ের ইতিহাস লইয়া আমরা বর্ষ রচনা করি। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসে। একটী তরঙ্গের পতন আর একটী তরঙ্গের উত্থান-সম্ভাবনা ঘোষণা করে। পুরাতনের বক্ষেই নবীনের আবির্ভাব, তাই অতীতের বক্ষেই বর্ত্তমানের প্রতিষ্ঠা। তাই নববর্ষের আসন্ন আবির্ভাবের মধ্য দিয়া পুরাতনের চিরন্তন সুর নূতন রাগিনীতে বাজিয়া উঠিতেছে। এই সঙ্গীতঝঙ্কার সকলের জীবনকে পুলককম্পনে জাগ্রত করিতে পারে না। যাঁহারা ইহা অনুভব করেন তাঁহারা জানেন, এ সঙ্গীত-ধ্বনি মানবের ক্ষুব্ধ ব্যর্থতাকে লজ্জাহত করিয়া পীড়িত করে না; স্বাভাবিক ও সুগভীর প্রেরণার সুনির্ম্মল উৎসধারায় নবীন-তারুণ্যের সহজবিকাশকে অভিষিক্ত করিয়া দিয়া যায়। তাই না বর্ষশেষে কাল-বৈশাখীর উন্মাদনৃত্যমুখর মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় বাঙ্গালার কবিগুরুর 'জাগ্রত চিত্তে' উলঙ্গ নির্ম্মল কঠিন সন্তোষের' মধ্য দিয়া এই চিরন্তন সুরের দোল উঠিয়াছিল। সে নিবিড়তম অনুভূতিকে ভাষা দিতে গিয়া 'বিজয়গর্জ্জনস্বনে' কবি বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—

> সে পূর্ণ উদাত্ত ধ্বনি বেদগাথা সামমন্ত্রসম
> সরল গম্ভীর;
> সমস্ত অন্তর হতে মূহূর্ত্তে অখণ্ডমূর্ত্তি ধরি
> হউক বাহির!
> নাহি তাহে দুঃখ-সুখ পুরাতন তাপ-পরিতাপ
> কম্প লজ্জা ভয়,

শুধু তাহা সদ্যঃস্নাত ঋজু শুভ্র মুক্তজীবনের
জয়ধ্বনিময়।

বাঙ্গালীর বন্ধনজর্জ্জরিত জীবনের উপর পুরাতন তাপ-পরিতাপ পাষাণস্তূপের মত চাপিয়া বসিয়াছে। সরল উদাত্ত-গম্ভীর জয়ধ্বনির পরিবর্ত্তে মরণাহতের কাতর হাহাকার গুমরিয়া উঠিতেছে। ক্ষুধাতুর বাঙ্গালী আজ শীর্ণ-দুর্ব্বল বাহুযুগে বাধা-বিপত্তি ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাসের উষ্ণস্পর্শে তাহার সমস্ত আনন্দ, আশা, আকাঙ্ক্ষা ভস্মরাশিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এই দুঃস্বপ্নমুগ্ধ আত্মবিস্মৃত জাতির শোচনীয় আত্মহত্যার উন্মাদ প্রয়াস দেখিয়া প্রশ্ন আসে, যাহার অতীতের শুভ্রোজ্জ্বল মহিমার সম্মুখে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের হিরণ্ময়দ্যুতি ম্লান হইয়া যায়, তাহার ভবিষ্যৎ নাই, ইহা কি সম্ভব? না, এ জাতি অমর, ইহার মৃত্যু নাই। এ সাময়িক মোহতন্দ্রা—এ নিদ্রার ঘোর ভাঙ্গিবে কে? কোথায় বাঙ্গালার নব অভ্যুদয়ের নিরলস কর্ম্মি! বিবেকানন্দের লীলাসহচর মহাভৈরবগণ! আজ নববর্ষের অরুণোজ্জ্বল-প্রভাতে যোগাসন হইতে উত্থিত হইয়া দেশের মাটীর উপর দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হও। বজ্র হইতে ধ্বনি কাড়িয়া লইয়া এই জীবন্মৃত জাতির কর্ণে একটা আহ্বান মন্ত্র উচ্চারণ কর। ভারতব্যাপী একটা জাগরণ, ঝটিকার মত অকস্মাৎ জাগিয়া উঠুক। উড়াইয়া লইয়া যাক্ পুরাতনের যত কিছু ভ্রান্তি, দৌর্ব্বল্য ও মিথ্যা। সহজ-প্রবল নবীনের বিশালবক্ষের বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে সকলে আসিয়া দণ্ডায়মান হউক। তবে তো বুঝিব যে বাঙ্গালায় নববর্ষের আবির্ভাব সার্থক হইয়াছে।

নবীনভাবে নবজীবন গড়িবার উপাদান ও আদর্শ লইয়া যুগপ্রবর্ত্তক আচার্য্য আসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে বুঝি নাই, বুঝিবার চেষ্টাও বোধ হয় করি নাই। কেহ কেহ কেবল মাত্র তাঁহার তেজোগর্ভ বচনাবলী, অবসাদগ্রস্ত জীবনে সাময়িক উত্তেজনা আনিবার জন্য সময়ে সময়ে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ বা মহত্ত্বের মিথ্যা অভিনয়ের বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া স্বচ্ছন্দে অক্ষতদেহে দেশের বুকে চলাফেরা

করিতেছে—পুস্তকে পড়িয়া অথবা কাহারও নিকট হইতে শুনিয়া অনেক লম্বা লম্বা কথা আওড়াইতেছে 'কিন্তু কার্য্যে তাহারা অতি নির্দ্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংসপিণ্ড শরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবিতে পারে না!'

এই সমস্ত জঘন্য কাপট্যের পৈশাচিক লীলা নির্ম্মম পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া জাতীয়জীবনকে নিষ্কলুষ করিতে হইবে। কেবলমাত্র কথা—কাটাকাটি করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া, প্রত্যেকটী কথার পশ্চাতে লইয়া আসিতে হইবে কর্ম্মের প্রেরণা।

যুগধর্ম্মের প্রভাবে মানব-কল্যাণ-ব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়া কর্ম্মের মধ্য দিয়া ধর্ম্মজীবন গড়িবার সঙ্কল্প দেশের অনেক তরুণ যুবকের মনে জাগিয়া উঠে বটে, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অনেকেই সেই সঙ্কল্প অবিকৃত রাখিতে পারে না। কল্পনালোকে বসিয়া নিস্তরঙ্গ চিত্তহ্রদে মানব-মহত্বের অকম্পিত প্রতিচ্ছবিখানির পরিপূর্ণ রূপ দেখিয়া তরুণমন মুগ্ধ হয়, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া প্রতিদিনের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সে ছবি অস্পষ্ট ও বিকৃত হইয়া যায়। কল্পনার পেলব-মাধুর্য্যের সহিত বাস্তবের কঠিন-কদর্য্যতার প্রতিনিয়ত বিরোধ ঘটে। ধৈর্য্যহীন কর্ম্মীর দৃষ্টিতে তখন মানবের প্রকৃত স্বরূপ প্রতিভাত হয় না—যাহার জন্য সে একদিন আত্মোৎসর্গ করিয়া গৌরবান্বিত হইবে মনে করিয়াছিল, তাহাকেই অকৃতজ্ঞ অধম বলিয়া অবজ্ঞাভরে ধিক্কার দেয়। স্বার্থান্ধ প্রতিদানপ্রত্যাশার ছলনা সে বুঝিতে পারে না। লক্ষভ্রষ্ট সাধক দুঃখকর অভিজ্ঞতা লইয়া বিরক্তচিত্তে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া যায়।

কেবল মাত্র ভাবপ্রবণ প্রকৃতির উত্তেজনাক্ষুব্ধ প্রেরণায় কর্ম্মে অগ্রসর হইলে কিছুদিন পরেই প্রতিক্রিয়ার ফলে ঐরূপ অবস্থান্তর ঘটে। সাময়িক উত্তেজনার ঝোঁকে স্বদেশ বা স্বজাতির জন্য জীবন দান অনেকেই করিতে পারে; কিন্তু অশুদ্ধ দানে প্রকৃত কল্যাণ হয় না। জীবনদান করিবার পূর্ব্বে সেই জীবনকে সাধনায় শুদ্ধ করিয়া তোলা চাই। আজ নববর্ষে এই কথাটাই আমরা একবার ধীরভাবে

চিন্তা করিয়া দেখিব। স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "ভারতমাতা অন্ততঃ এক সহস্র যুবক বলি চান, কিন্তু মনে রেখো, মানুষ চাই, পশু নয়।" এই জীবনবলির অর্থ আত্মহত্যা নহে, আত্মোৎসর্গ। আমরা যে আজ দেশের জন্য, দশের জন্য নরনারায়ণসেবায় আত্মোনিয়োগ করিতে ছুটিয়াছি, একটু সংযত হইয়া ভাবিয়া দেখি তো আমরা মানুষ না পশু? এ বলি, এ দান তিনি গ্রহণ করিবেন কিনা?

যদি আমরা পশু হই, তবে সর্ব্বাগ্রে মানুষ হইতে হইবে, যদি মানুষ হই, তাহা হইলে অবিলম্বে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। আজ নববর্ষের প্রারম্ভে এই চিন্তাই আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করুক। একদিকে দার্শনিকের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি, অপরদিকে কবির উদ্দাম কল্পনাপ্রবণ মন,—নবযুগের মানুষের মধ্যে এ দু'এর সামঞ্জস্য চাই। তাহা হইলে কর্ম্মে বিরক্তি বা দ্বিধা আসিবে না; বাস্তবের সহিত কল্পনার বিরোধ ঘুচিয়া যাইবে, আমরা মানুষের মত কর্ম্ম করিতে পারিব।

তবে তাহাই হউক। আমরা মানুষ হইব। আমরা ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব, গোলক, বৈকুণ্ঠ কিছু প্রার্থনা করিনা। আমরা চাই এই কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবী, চাই মানুষ হইতে। এই যে নররূপে তাঁহারই বিচিত্র লীলা—সেবাব্রতের আনন্দে এই লীলাবৈচিত্র্যকে উপভোগ করিব। স্বার্থান্ধ কৃতঘ্নতা, অবিচার, লাঞ্ছনা ও অপমানের নির্ম্মম আঘাত ধৈর্য্যকঠিন বক্ষে ধারণ করিব; মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধাকে ক্ষুণ্ণ হইতে দিব না। সমস্ত সংশয়াচ্ছন্ন ধারণা সরাইয়া রাখিয়া মানুষকে বিশ্বাস করিব। বিশ্বাস করিব, নারায়ণ পূজাপ্রার্থী হইয়া নররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কোন্ গিরিগুহায়, অরণ্যে, প্রান্তরে তাঁহাকে খুঁজিতে যাইব—তিনি যে আমার আশে পাশে চারিদিক ব্যাপিয়া! শুষ্ক স্বাতন্ত্র্যের মরুভূমি হইতে সংসারের বিচিত্র জীবনলীলায় সরস আনন্দের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইব। বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজিত এই বিরাট্—এই পূর্ণ আমাদের উপাস্য ঈশ্বর। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, দুঃখীর ভগ্নহৃদয়ে, শোকাহতের বুকভরা অশ্রুরাশির মধ্যে তাঁহারই লীলা বুঝিয়া সকলের দুঃখকষ্ট জ্বালাযন্ত্রণা

আপনার করিয়া লইব। এই সেবাযজ্ঞ উদ্‌যাপিত করিবার জন্য আমরা কোন প্রকার মুক্তি কামনা করিব না। সম্মুখে একটা জাতি ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, শিক্ষার অভাবে কোটী কোটী মানব পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছে—এ দৃশ্য দেখিয়া যে স্বীয় মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়, ত্রিবিধ দুঃখের পারে যাইবার জন্য সকলের মধ্য হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া লয়, হইতে পারে সে একজন বড় রকমের আধ্যাত্মিক ব্যক্তি, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে তাহার আদর্শ সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা!

এসো ভাগ্যবান্ সাধক, আমরা একবার প্রাণ ঢালিয়া দিয়া মানুষকে ভালবাসি। আমরা তো নবযুগাচার্য্যের গভীর মর্ম্মস্থল হইতে উত্থিত বাণী শুনিয়াছি "আমার বিশ্বাস যে, যদি কেহ এই হতশ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদবিদলিত, চিরবুভুক্ষিত, কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে।" জাগিবে—এই ভারত আবার জাগিবে; বিশ্ব-মানবের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিপূত জ্ঞানালোকহস্তে মুক্তিপথ প্রদর্শন করিবে। জনকতক উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারীর রক্তনেত্রের ক্রূর অবজ্ঞাদৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া আমরা এই মহাজাতিকে ভালবাসিব। কপট ও নিষ্ঠুরের দুর্ব্বুদ্ধি উপেক্ষা করিয়া আমরা পরিপূর্ণ প্রাণ ঢালিব। শতবার বিশ্বাসের ভিত্তি বিচলিত হইলেও শতবার বিশ্বাস করিব। হে বীরহৃদয় প্রেমিক, তোমার উদ্বেলিত প্রেমধারায় অবগাহন করিয়া শত শত কলঙ্কমলিন চিত্ত পবিত্র হউক। আজ নববর্ষের পুণ্য প্রভাতে আশামুগ্ধহৃদয়ে তোমাদেরই পথ চাহিয়া আছি।

স্বগৃহে শঙ্কর।

রাজ-সমাগম।

(শ্রীমতী—)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিশিষ্টাদেবী যাহা ভয় করিতেছিলেন তাহাই হইল ; শঙ্করের নদী-আনয়নের কথা ক্রমে কেরলরাজ রাজশেখরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বিশিষ্টাদেবী নিজে ত কখনই পুত্রের নদী আনয়নের কথা মুখে আনিতেন না, অধিকন্তু লোকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। কিন্তু বিধাতার কি চক্র! তিনি উহা যতই চাপা দিবার চেষ্টা করিতেন লোকে ততই সেকথা আলোচনা করিত এবং ঘটনাটী সত্য বলিয়া মনে করিত। সুতরাং এই নদী-আনয়নরূপ অদ্ভুত কথা লোকের মুখে মুখে ক্রমে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রচারিত হইতে লাগিল। ফলে, একদিন উহা সরলাগণসাহায্যে কেরলরাজমহিষীর কর্ণগোচর হইল।

যদিও এই সংবাদ ইতিপূর্ব্বে রাজ-অমাত্য, রাজপণ্ডিত এবং রাজসভাসদ্‌বর্গের অজ্ঞাত ছিল না, তথাপি তাঁহারা সে কথা রাজাকে জ্ঞাত করান নাই। কারণ, রাজা যদি ইহা অবিশ্বাস করেন তবে তাঁহারা রাজার নিকট লঘু হইয়া পড়িবেন। আর এই সকল অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস উৎপাদন করাও সহজ নহে। শঙ্কর অসাধারণ পণ্ডিত হইতে পারেন কিন্তু নদীর গতি পরিবর্ত্তনও যে তাঁহারই প্রার্থনার ফল—উহা যে নদীর স্বভাব বশেই হয় নাই—তাহাই বা কে বলিতে পারে? এজন্য এ কথা রাজার নিকট কেহই প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই।

কিন্তু এই সংবাদে রাজমহিষীর কৌতুহল ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অতঃপর তিনি যেদিন শুনিলেন যে, এই বালকেরই প্রার্থনায়

এক দরিদ্রা ব্রাহ্মণীর গৃহে সুবর্ণ-আমলকী-বৃষ্টি হইয়াছিল, সেদিন তাঁহার কৌতূহলের আর সীমা রহিল না। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা, কিরূপে বালকটীকে একবার দেখিব। তাহাকে কোনরূপে একবার রাজগৃহে আনা যায় না?

যথাসময়ে মহারাজ অন্তঃপুরে আসিলেন। রাণীও সময় বুঝিয়া তাঁহার নিকট এই কথা উত্থাপিত করিলেন এবং এক বার বালকটীকে দেখিবার বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাণীর বাক্যে মহারাজ কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া সহাস্থে বলিলেন, "আচ্ছা আমি এ বিষয়ে সন্ধান লইতেছি।"

পরদিন কেরলরাজ রাজসভায় ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। সভাসদ্‌গণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া যাঁহার যেরূপ জ্ঞান তিনি সেইরূপ বলিলেন—কেহ অবিশ্বাস, কেহ বা উপেক্ষা করিলেন আবার কেহ বা বিস্ময় ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। বিরল কেহ কেহ মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক রাজার মতামত শ্রবণের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন।

সুবুদ্ধি কেরলরাজ তখন মন্ত্রীর উপর অনুসন্ধানের ভার দিলেন। মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে কালাডিগ্রামে প্রেরণ করিলেন। কর্ম্মচারী ছদ্মবেশে শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে শঙ্কর সম্বন্ধে সমুদয় কথা শ্রবণ করিয়া যথাসময়ে রাজ-সকাশে ফিরিয়া আসিল। মহারাজ চরমুখে যাহা শুনিলেন তাহাতে শঙ্করের অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তাঁহার কোন ও সন্দেহ রহিল না। অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণের সম্মানরক্ষার্থ মন্ত্রীকে স্বয়ং যাইয়া ব্রাহ্মণকুমারকে যথোচিত সম্মানে রাজগৃহে আনয়নের ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন। কেরলরাজমহিষী রাজার এই ব্যবস্থা শ্রবণ করিয়া পরম আহ্লাদিতা হইলেন এবং সাগ্রহে শঙ্করের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

একজন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাটীতে যাইবেন বলিয়া মন্ত্রীবর কোনরূপ আড়ম্বর করিলেন না, কেবল কয়েকজন প্রহরী ও

রাজপণ্ডিত সমভিব্যাহারে হস্তীপৃষ্ঠে কালাডিগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মন্ত্রীবর কালাডিগ্রামের নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতে গ্রামে মহা-হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সহসা কেরলরাজ কেন রাজপুরুষ প্রেরণ করিলেন ইহা ভাবিয়া গ্রামবাসী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অনেকে সভয়ে গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া দিল; যাহারা দৈবক্রমে মন্ত্রীবাহিনীর সম্মুখে পতিত হইল, তাহারা সভয়ে উহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল। রমণীগণ চিরদিনই কৌতুহলী, বিপদেও তাঁহাদের সে স্বভাবের অন্যথা হয় না, তাই তাঁহারা আশ পাশ হইতে উঁকিঝুঁকি মারিয়া মন্ত্রীবাহিনীকে দেখিতে লাগিলেন। বালক বালিকারা "ঐ হাতী" "ঐ হাতী" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে একবার ভয়ে গৃহমধ্যে আবার পরক্ষণেই হাতী দেখিবার লোভে বাহিরে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। গ্রামস্থ শান্তিরক্ষক ও রাজপুরুষগণ এবং গ্রামের প্রধান প্রধান বহু ব্যক্তি মন্ত্রীবরের অনুগমন করিল। ফলে, গ্রামে একটা মহা কোলাহল পড়িয়া গেল।

এদিকে মন্ত্রীবাহিনী কোনস্থলে না থামিয়া শিবগুরুর গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল ও অবশেষে তাঁহার গৃহদ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। গ্রামবাসী এইবার যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিস্ময়ের মাত্রাও অতিশয় বর্দ্ধিত হইল। শঙ্করের জ্ঞাতিদিগের মধ্যে কেহ কেহ ইহাতে বড়ই আনন্দ অনুভব করিল। কারণ, তাহারা মনে করিল, বাটীর নিকট নদীআনয়ন করিয়া শঙ্কর নিশ্চয়ই রাজরোষে পতিত হইয়াছে। কেহ বা বলিয়া ফেলিল, "বাছাধন, এইবার মজা টের পাবেন। নদী আনা কি সহজ কথা, কত জায়গা জমি নদীগর্ভে চলিয়া গেল, রাজার কি লোকসান হইল বল দেখি! এইবার সবশুদ্ধ ধরিয়া লইয়া যাইবে।"

ওদিকে বিশিষ্টাদেবীও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি কোলাহল শুনিয়া গৃহদ্বারে আসিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে নিজগৃহদ্বারেই রাজপুরুষসমাগম দেখিয়া ভয়ে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি

ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে থাকিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। পরিশেষে নিরুপায় হইয়া সকাতরে কুলদেবতা কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং পুত্র যথায় পুস্তকাদিপরিবৃত হইয়া এ জগৎ ভুলিয়া উপবিষ্ট তথায় উপস্থিত হইলেন। পুস্তকবদ্ধদৃষ্টি শঙ্কর মস্তক উত্তোলন করিতে না করিতেই জননী ভয়কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, দেখ, রাজপুরুষগণ আমাদের গৃহদ্বারে কি জন্য! শীঘ্র যাইয়া তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা কর।"

শঙ্কর জননীকে অতিশয় ভীতা ও উদ্বিগ্না দেখিয়া দু' একটী কথায় তাঁহাকে স্থির হইতে বলিয়া নিজে শান্তগম্ভীরভাবে বহির্দ্দেশে গমন করিলেন। পুত্রের আশ্বাসে বিশিষ্টা একটু সুস্থির হইলেন এবং তাঁহার অনুগমন করিয়া দ্বারান্তরালে দণ্ডায়মান রহিলেন।

বালক শঙ্কর গৃহের বহির্দ্দেশে আসিয়াই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ন্যায় রাজপুরুষদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

মন্ত্রীপ্রমুখ রাজপুরুষবর্গ এই অভিনব দৃশ্যে যারপরনাই বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইয়া যেরূপ আচরণাদি করিবেন স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন, শঙ্করের এই গাম্ভীর্য্য দর্শনে সে সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। শিখাসূত্রকৌপীনধারী বালক শঙ্করের বিভূতিভূষিতগৌরকান্তি, নবনীতকোমল নাতিস্থূল বর্দ্ধিষ্ণু দৃঢ় দেহ, প্রসন্নগম্ভীর বদন দর্শনে রাজপুরুষদিগের ধনজনগর্ব্বিত মস্তকও যেন অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভক্তিতে অবনত হইয়া পড়িল। শঙ্করের ভাবভঙ্গী দর্শকমাত্রেরই শ্রদ্ধাকর্ষক। মন্ত্রীবর তাঁহাকে যতই দেখিতে লাগিলেন ততই তাঁহার মনে এক অভাবনীয় ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি রাজপণ্ডিতকে অগ্রগামী করিয়া শঙ্করের অনুগমন করিলেন। গ্রামস্থ ভদ্রব্যক্তিগণ বহির্দ্দেশেই দণ্ডায়মান রহিলেন।

শঙ্কর গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক সকলকে যথাযোগ্য আসনাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে উপবেশনে অনুরোধ করিলেন। মন্ত্রীবর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন গৃহসজ্জা অন্য কিছুই নাই, কেবল পুস্তকরাশি স্তরে স্তরে সজ্জিত। মধ্যস্থলে একখানি অজিনাসন

বিস্তৃত ; আসনের চারিদিকে বন্ধনমুক্ত পুস্তকরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, কোথাও লেখনী-মস্যাধার, কোথাও রুদ্রাক্ষ-মালা, কোথাও বিভূতি পাত্র, কোথাও পূজার স্থান ও পাত্রাদি রহিয়াছে।

শঙ্কর নিজাসনে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় আসন গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। মন্ত্রী প্রভৃতি এতক্ষণ বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে শঙ্করের এই অভিনব গৃহসজ্জা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এক্ষণে শঙ্করের আহ্বানে তাঁহাদের সে ভাব অন্তর্হিত হইল। তাঁহারা যেন একটু লজ্জিত ভাবে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন। শঙ্করও তখন আসন গ্রহণ করিলেন।

মন্ত্রীবর ভাবিয়া আসিয়াছিলেন যে, স্বয়ং অথবা রাজপণ্ডিতের দ্বারা শঙ্করকে নানারূপ পরীক্ষা করিবেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার এই প্রবীনোচিত ব্যবহার ও ভাবভঙ্গীতে সে বাসনা অন্তর হইতে মুছিয়া গেল। তিনি কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কেরলরাজপ্রদত্ত উপঢৌকনাদি শঙ্কর-সমীপে রক্ষাপূর্ব্বক সবিনয়ে কহিলেন, "মহাত্মন্! মহারাজ রাজশেখর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি আপনার গৃহে উপস্থিত হইয়াছি। তিনি আপনার গুণাবলী শ্রবণে আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন। এক্ষণে এই সমুদয় উপঢৌকনাদি আপনি গ্রহণ করুন। এই রাজহস্তী আপনার ব্যবহারার্থ প্রেরিত হইয়াছে। আপনি ইহাতে আরোহণ করিয়া আমাদের সহিত আগমন করুন। মহারাজ সন্তুষ্ট হইলে ভবিষ্যতে আপনার চিন্তার বিষয় আর কিছুই থাকিবে না। মহারাজ স্বয়ং সুপণ্ডিত, আপনিও এই বয়সেই পণ্ডিত হইয়াছেন ; সুতরাং আপনি যে তাঁহার শুভদৃষ্টিতে পতিত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?" শঙ্কর মন্ত্রীবাক্য শ্রবণানন্তর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "মন্ত্রীবর! মহারাজকে আমার অসংখ্য আশীর্ব্বাদ প্রদান করিবেন এবং বলিবেন, "আমি ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকুমার, রাজভবনে গমন আমার কর্ত্তব্য নহে। মহারাজের পূর্ব্বপুরুষগণের অনুগ্রহে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ যে সম্পত্তিলাভ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের কোনও অভাব নাই। এই সমুদয় রাজভোগ্য দ্রব্যাদি যে ব্রহ্মচারীর একান্ত

পরিত্যাজ্য ইহা তিনি নিশ্চিতই সুবিদিত আছেন। অতএব এই সমস্ত দ্রব্য তাঁহার রাজকোষে প্রত্যর্পণ করিবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি ইহাতে দুঃখিত হইবেন না, বরং সন্তুষ্টই হইবেন। কারণ তাঁহার একজন প্রজা স্বধর্ম্মপালনে যত্ন করিতেছে এবং তিনিও স্বয়ং স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ। অতএব আপনি আমাকে আমার আশ্রমধর্ম্মলঙ্ঘনে অনুরোধ করিবেন না।"

মন্ত্রিবর বালক শঙ্করের মুখে এরূপ বিনয়পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণে মনে মনে চমৎকৃত হইলেন এবং শঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিতে এতটা আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, এক্ষণে তাঁহার বাক্যের কি উত্তর দিবেন তাহা সহসা ভাবিয়া পাইলেন না।

মন্ত্রীবর শঙ্করের সহিত যতক্ষণ বাক্যালাপে মগ্ন ছিলেন, রাজপণ্ডিত মহাশয় ততক্ষণ শঙ্করের আসনের চতুর্দ্দিকে বন্ধনোন্মুক্ত বিক্ষিপ্ত গ্রন্থগুলি অভিনিবেশ সহকারে দেখিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন কোনটী বেদ, কোনটী বেদান্ত, কোনখানি মীমাংসা, কোনটী ন্যায়, অদূরে পুরাণ; জ্যোতিষ, ব্যাকরণ প্রভৃতি অন্যান্য বহুগ্রন্থও সজ্জিত রহিয়াছে। তিনি গৃহের যে দিকেই দৃষ্টিপাত করেন, কেবলই স্তরে স্তরে সজ্জিত গ্রন্থ দৃষ্টিগোচর হয়। শিবগুরুর গৃহে যে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে ইহা তিনি পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন; এক্ষণে স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। যদিও তিনি শঙ্করকে কিছু পরীক্ষা করিবার মানসেই মন্ত্রীবরের সহযাত্রী হইয়াছিলেন এবং মন্ত্রীবরও তাঁহাকে ঐ উদ্দেশ্যেই সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তথাপি কার্য্যকালে তাঁহাদের উভয়েরই অন্তর হইতে সে বাসনা দূরীভূত হইল। সুতরাং শঙ্করকে আর পরীক্ষা করা হইল না।

ওদিকে দ্বারপার্শ্বস্থিতা বিশিষ্টাদেবী মন্ত্রীমুখে পুত্রের রাজ-গৃহগমনের প্রস্তাব শুনিয়া মনে মনে ব্যাকুল হইলেন। কখন ভাবিলেন, "তাইত কি হইবে, বাছা আমার একাকী কিরূপে রাজগৃহে যাইবে? কখন ভাবিতেছেন, কাহাকেই বা সঙ্গে দিব।" কিন্তু ইতিমধ্যেই যখন শুনিতে পাইলেন যে পুত্র রাজার নিমন্ত্রণ গ্রহণ

করিলেন না, তখন তিনি মনে মনে প্রমাদ গণিলেন; না জানি তাঁহার পুত্রের ভাগ্যে এইবার কি ঘটে! কিন্তু ভাগ্যবানের ব্যবস্থা ভগবান্‌ই করেন। মন্ত্রীবর কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া একটু গম্ভীরভাবে শঙ্করের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। শঙ্করও আসন ত্যাগ করিয়া অতি সমাদরের সহিত তাঁহাদের বিদায় দিলেন।

তাঁহারা গমন করিলে বিশিষ্টাদেবী ব্যস্তভাবে শঙ্করের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি করিলে কি? রাজার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া যে রাজরোষে পতিত হইবে ইহা একবার ভাবিলে না? জানি না আমার আবার ভাগ্যে কি আছে!"

জননীর ভীতিদর্শনে শঙ্কর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মা আপনি ভীতা বা চিন্তিতা হইবেন না। রাজা সুপণ্ডিত, তিনি কখনই রুষ্ট হইবেন না।" বিশিষ্টাদেবী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন।

মন্ত্রীপ্রমুখ রাজপুরুষেরা শঙ্করের গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। গ্রামবাসী অনেকে বিস্মিতভাবে কিয়দ্দূর তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল কিন্তু তাঁহারা কাহারও সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ করিলেন না দেখিয়া সকলে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিল।

রাজমন্ত্রী চলিয়া গেলে শঙ্করের গৃহে জ্ঞাতিকুটুম্ব আত্মীয়স্বজনের ভিড় লাগিয়া গেল। সকলেই বিস্মিতভাবে তাঁহাকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, শঙ্করও সকলকে যথাযথ উত্তর দানে খুসী করিলেন। একে ত রাজমন্ত্রীর আগমন শুনিয়াই তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না, তাহাতে যখন তাঁহারা শুনিলেন যে রাজপ্রদত্ত বহুমূল্য উপঢৌকনাদি শঙ্কর অম্লানবদনে ফিরাইয়া দিয়াছেন, তখন তাঁহারা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে কেহ ভাবিলেন যে রাজাকে ইহাতে অপমান করা হইয়াছে, ইহার ফলে শঙ্কর হয়ত এইবার রাজরোষে পতিত হইবেন। জ্ঞাতিগণমধ্যে কেহ কেহ চুপি চুপি বলিয়া ফেলিলেন, "বেশী কিছুই ভাল নয়, এইবার না বাছাধনকে ধরিয়া লইয়া যায়। রাজার অপমান, একি মুখের কথা!" এইরূপে নানাজনে নানাকথা বলিতে বলিতে যে যার গৃহে চলিয়া গেল।

ও দিকে কালাডিগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া রাজপ্রসাদাভিমুখে গমন করিতে করিতে মন্ত্রীবর ভাবিলেন, তাইত বালকটীকে একবার পরীক্ষা করা হইল না ত, কাজটা কিন্তু ভাল হইল না। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেই বা কি বলিব? কিন্তু আবার ভাবিলেন, আমি না হয় ভুল করিলাম কিন্তু রাজপণ্ডিতকে ত ঐ জন্য লইয়া গেলাম, তিনিই বা কি করিলেন? আমি ত তবু বালকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলাম, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় একেবারে নীরব থাকিয়া উঠিয়া আসিলেন কেন? যাহা হউক, বালকটীকে একটু পরীক্ষা না করা ভাল হইল না। এই ভাবিয়া তিনি রাজপণ্ডিতকে বলিলেন, "পণ্ডিতরাজ, কই আপনি ত বালকটীকে কোনরূপ পরীক্ষা করিলেন না? আপনি নীরব রহিলেন কেন?" উত্তরে পণ্ডিতরাজ নিজ মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "মন্ত্রীবর, আমি আপনারই মুখাপেক্ষা করিতেছিলাম। আপনি একটু ইঙ্গিত করিলেই তাহা হইতে পারিত।"

রাজমন্ত্রীর কূটবুদ্ধি চিরপ্রসিদ্ধ। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই নিজ মনোভাব সাধারণে প্রকাশিত করিতে পারেন না, কারণ, তাহা হইলে লোকে তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া গণ্য করিবে। তাহাতে আবার মন্ত্রীর পক্ষে ইহা যে একেবারে নিষিদ্ধ তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু শঙ্করের অপূর্ব্ব ভাব ও ব্যবহারাদি দর্শনে তিনি এতই বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি তখনই অবাধে বলিয়া ফেলিলেন, "পণ্ডিতরাজ, বলিব কি, বালকটীকে দেখিয়া পরীক্ষার কথা আর আমার হৃদয়ে স্থান পাইল না। বলুন দেখি, বয়সের তুলনায় ছেলেটীর আকৃতি প্রকৃতি সবই কেমন অসাধারণ নহে কি? উহার ভাবভঙ্গী কথাবার্ত্তা সকলই যেন, অপূর্ব্ব কিছুই সাধারণ মানুষের মত নহে। দেখুন না, ঐ বয়সের ছেলে আমাদের দেখিয়া একটু ভীত বা সঙ্কুচিত হইল না; কেমন বিজ্ঞের মত গম্ভীরভাবে যুক্তিপূর্ণ উচিত কথা বলিল; রাজপ্রদত্ত বহুমূল্য দ্রব্যাদি স্বচ্ছন্দে ফিরাইয়া দিল একটুও লোভ হইল না। ছেলেটার এইরূপ অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া আমার আর পাঁচ রকম কথা জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্তি হইল না।" মন্ত্রীবরের বাক্যে রাজপণ্ডিত মহাশয় একটু হাসিয়া

মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "মন্ত্রীবর, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। আমারও ছেলেটাকে দেখিয়া আপনার মত অবস্থা হইয়াছিল। দেখুন, তাহার চারিদিকে যে সব গ্রন্থ উন্মুক্ত ও বিক্ষিপ্ত ছিল তাহা দেখিয়া আর তাহাকে বিদ্যা বিষয়ে পরীক্ষা করিতে আমার ইচ্ছা হইল না। যে সব গ্রন্থ আমরা চক্ষে দেখি নাই কেবল নাম শুনিয়া আসিতেছি, ছেলেটী তাহারই আলোচনায় রত; সুতরাং তাহার বিদ্যা পরীক্ষা করিতে যাওয়া আর ভাল দেখায় না। এইরূপ ক্ষেত্রে পণ্ডিতের সভা করিয়া শাস্ত্রীয় বিচার করা যাইতে পারে। সে ইচ্ছা থাকে ত বলিবেন, তাহাই করা যাইবে।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে তাঁহারা রাজসমীপে ফিরিয়া আসিলেন এবং মহারাজকে সবিশেষ নিবেদন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

৺দ্বারকাধাম ও কয়েকটি তীর্থ দর্শন।

(শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া পদব্রজে পাণ্ডুলেনা নামক কয়েকটি গুহা দেখিতে চলিলাম। সহরতলীর প্রান্তভাগে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে একটি রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। উহা বেশ প্রশস্ত, পরিষ্কার, ও সোজা প্রায় ৪০ মাইল লম্বা। একটি বেড়াইবার রাস্তা বটে। এই রাস্তায় ৬ মাইল যাইলে গুহাগুলি পাওয়া যায়। আমরা দুই জনমাত্র গিয়াছিলাম। দুই পার্শ্বের মাঠের এবং দূরস্থ পর্ব্বতমালার শোভা দেখিতে দেখিতে আন্দাজ ২॥০ ঘণ্টার মধ্যে আমরা রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত একটি পর্ব্বতের সানুদেশে উপস্থিত হইলাম। এই

পর্ব্বতের উপরেই গুহাগুলি খোদিত। ইহার তলদেশে দর্শকগণের বিশ্রামার্থ একটি চালা আছে। এখানে জলখাবারের জন্য কলা এবং সামান্য কিছু মিষ্টান্ন পাওয়া যায় এবং নিকটেই একটি কূপে বেশ সুমিষ্ট পানীয় জল আছে। তলদেশ হইতে ৪।৫ শত ফিট উচ্চে গুহাগুলি অবস্থিত। উঠিবার সিঁড়ি না থাকিলেও পর্ব্বতটি খাড়া না হওয়ায় উঠিতে কষ্ট হয় না। গুহাগুলি প্রায় পাশাপাশি অবস্থিত। যতদূর মনে হয়, উহাদের সংখ্যা ছোট বড় মিলিয়া প্রায় ২৩।২৪টি হইবে, তন্মধ্যে ২টি বেশ বড় হলের ন্যায়। এইগুলি বৌদ্ধগণ দ্বারা নির্ম্মিত। কিন্তু ইহার নির্ম্মাণকাল নির্ণয় করা যায় না। ৪টি গুহার মধ্যে পদ্মপাণি, বজ্রপাণি, তারাদেবী ও বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে দেখিলাম। ৩।৪ স্থানে বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জন্য বড় বড় চৌবাচ্ছা পর্ব্বতগাত্রে কাটা রহিয়াছে; ঐ জল বেশ পরিষ্কার ও শীতল; পান করিবার উপযুক্ত। যেরূপ বন্দোবস্ত দেখিলাম তাহাতে বোধ হয়, কোন সময়ে বৌদ্ধশ্রমণগণ এখানে থাকিয়া সাধন ভজন করিতেন। দেখিয়া শুনিয়া নীচে আসিতে প্রায় দশটা বাজিয়া গেল সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিতে লাগিলাম। কিছুদূর আসিয়া একখানি গরুর গাড়ি পাওয়া গেল। কার্য্যগতিকে তাহাকে সহরে আসিতে হইতেছিল; আমরা দুই আনা পয়সা দিব বলায় আমাদের লইয়া আসিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা দুই জন মাত্র পাণ্ডুলেনা গুহা দেখিতে গিয়াছিলাম। বাসায় আসিয়া আমাদের বাকি ছয়জনের নিকট গুহাগুলির বিবরণ দিলাম। তাঁহারা শুনিয়া ঐগুলি দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং স্থির হইল যে বৈকাল বেলা আহারাদির পর একখানি গরুরগাড়ি করিয়া তাঁহারা গুহা দেখিতে যাইবেন। অতএব আহারাদির পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া পাঁচ সিকায় একখানি গরুরগাড়ি ভাড়া করিয়া তাঁহাদের রওনা করিয়া দিলাম এবং আমরা দুই জনে সহরভ্রমণে বহির্গত হইলাম। পূর্ব্ব দিবসে পণ্ডিত রাজারাম

ত্র্যম্বক শুক্ল নামধেয় এক ব্যক্তির সহিত পরিচয় হয়। তিনি একজন স্থানীয় ব্যক্তি এবং নাসিক শ্রীক্ষেত্রের একটি পাণ্ডা। পাণ্ডাগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় অমায়িক, সরলচিত্ত ও সদাশয় ব্যক্তি আমার কুত্রাপি নয়নগোচর হয় নাই। পাণ্ডাগিরিই তাঁহার পেশা নহে; তিনি একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং ইংরাজিতে বেশ কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন। তিনি আমাদের পাণ্ডা না হইলেও অযাচিতভাবে আমাদের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, যদি কেহ নাসিকে যান এবং এই ব্যক্তির যজমান হন, তবে তাঁহার কোন প্রকার কষ্ট হইবে না। তাঁহার বাড়ী সহর মধ্যে সোমওয়ার পেঠায় নারায়ণ স্বামীর মঠের নিকট। আজ তাঁহার সঙ্গে আমরা সহর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলাম। সহরের পুরাতন ও নূতন ভাগ দেখিলাম। সরকার ওয়াড়া (যাহাতে মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়া নরপতিগণের কাছারি হইত এবং যেখানে এখন ইংরাজ পুলিসআফিস হইয়াছে), মিউনিসিপ্যাল আফিস, স্কুলবাড়ী, সরকারী আফিস, বিশিষ্ট ধনিগণের গৃহাদি, নাসিকের প্রধানা দেবীর মন্দির এবং যেখানে ত্রেতাযুগে খরদূষণাদি রাক্ষসগণের বধ সাধিত হয় সেই সমস্ত স্থান দেখিলাম। রাজারাম মহাশয় আমাদিগকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া জলখাবার দিয়া অতিথিসেবা করিলেন এবং তাঁহার পুত্রকন্যাগণকে আনিয়া আমাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। এখানকার কতকগুলি বাড়ী পাথরের, অবশিষ্টগুলি খোলার। খোলার ঘরগুলি মাট-কোঠার ন্যায় দ্বিতল বা ত্রিতল। ইহাদের চতুর্দ্দিকের দেওয়াল ইটের, কিন্তু মেঝেগুলি, কি একতলের কি দ্বিতলের, সমস্তই মাটীর। মেঝেগুলি গোময় লেপ দ্বারা এমন সুন্দরভাবে পরিষ্কার করা যে দেখিলেই সেখানে বাস করিতে কোন আপত্তি হয় না। এখানকার লোকগুলি বেশ সভ্য-ভব্য ও শ্রমশীল এবং বঙ্গদেশের তুলনায় অধিক শিক্ষিত। আমাদের একটি ঘড়ি হাত হইতে পড়িয়া গিয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং উহা অবিলম্বে মেরামত করা আবশ্যক হয়। কারণ বিদেশে, বিশেষতঃ রেলে যাতায়াতে, ঘড়ি

না থাকিলে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। এইহেতু ঘড়িটি মেরামতের জন্য দুই তিনটি ঘড়িমেরামতকারীর দোকানে যাইতে হইল। দেখিলাম সকল দোকানদারগুলিই বেশ ইংরাজি বলিতে পারে। তাঁহারা এমন ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিল যাহাতে তাহাদের শিক্ষিত বলিয়াই বোধ হইল। পরন্তু দেখা গেল তাহারা খরিদ্দারকে মিথ্যা কথা বলিয়া ঠকায় না। স্ত্রীলোকগণ বঙ্গদেশের স্ত্রীলোক অপেক্ষা অনেক বলশালী ও শ্রমশীল। রাতদিন সংসার লইয়া ব্যস্ত ; যেন সংসারটি মাথায় করিয়া আছে,—এই ঘরে প্রলেপ দেওয়া হইতেছে, এই ময়দা ভাঙ্গা হইতেছে, এই নদীতে গিয়া ১৮।২০ হাত লম্বা কাপড় কাচা হইতেছে ইত্যাদি। যাহা দেখিলাম তাহাতে বোধ হইল এখানকার মেয়েরা পুরুষদের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হইয়া আসিল এবং আমরা বাসায় ফিরিয়া কাপড় ছাড়িয়া সন্ধ্যা করিবার জন্য নদীতীরে যাইলাম। এই সময়ের দৃশ্য বড় মধুর। চতুর্দ্দিকে মন্দিরসকল হইতে শঙ্খঘণ্টাদির পবিত্র ধ্বনি উত্থিত হইতেছে ; স্থানে স্থানে মন্দিরচত্বরে অথবা প্রস্তরনির্ম্মিত বেদীতে বসিয়া ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্র পাঠ করিতেছেন। আর এই পবিত্র ধ্বনির সহিত খরস্রোতা কল্লোলিনী তান মিলাইয়া কি যে অপূর্ব্ব গানের সৃজন করিতেছেন তাহা বর্ণনাতীত। বোধ হইতে লাগিল যেন এক বিমল আনন্দস্রোত সকলকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। এই আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে সন্ধ্যা সমাপন করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

আজ রাত্রে আমরা গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান দর্শন করিতে যাইব এই স্থির ছিল। উহা এখান হইতে প্রায় ১৮।১৯ মাইল দূরে ত্র্যম্বক সহরের নিকট অবস্থিত। গরুর গাড়িতে যাইলে ৭।৮ ঘণ্টা লাগে এবং টঙ্গায় যাইলে ইহার অর্দ্ধেক সময় লাগে। অর্থাৎ টঙ্গায় সকাল বেলায় যাইলে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সেই দিন রাত্রি মধ্যেই ফেরা যায়। যাতায়াত গোযানের ভাড়া ৫।৬ টাকা এবং টঙ্গার ভাড়া তাহার দ্বিগুণ। স্থির হইল আমরা ৫ জন ঐ দিন রাত্রি ১০টার সময় গোযানে যাইব

এবং বাকি ৩ জন সকালে টঙ্গায় যাইবে। কারণ, তাহা হইলে রাত্রি-কালটা বাসা ফাঁকা না থাকায় জিনিষ চুরি যাইবার ভয় থাকিবে না। যাহা হউক, ত্বরায় আহারাদি সারিয়া আমরা ৫ জন গরুর গাড়িতে যাত্রা করিলাম। গরুর গাড়ি একখানি যায় না, অনেকগুলি এক সঙ্গে হইলে তবে ছাড়ে। কারণ রাত্রে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। আমরা প্রায় ১০ খানি গাড়ি এক সঙ্গে যাত্রা করিলাম। রাস্তা বেশ পরিষ্কার বলিয়া গাড়ির ঝাঁকুনি অনেক কম, এই জন্য বেশী কষ্ট হয় না। ভোর ৫ টার সময় আমরা ত্র্যম্বকে উপস্থিত হইলাম। মধ্যপথে গাড়িগুলি একবার আধ ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম করিয়াছিল মাত্র। এখানকার গরুগুলি বেশ বলশালী তাহা না হইলে এত পথ এত শীঘ্র কিছুতেই আসিতে পারিত না। আর গাড়োয়ানেরা গরুকে কি যত্ন করে, কখন তাহাকে মারে না, বলে এ আমার 'দানা পানি' যোগায়, আমি একে মারব! আবার তাহারা গরুর নাম রাখে এবং সেই নামে তাহাকে ডাকে। আমরা এক গুজরাটী ধনীর ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। বাড়ীটি বেশ বড় ও দ্বিতল, ভিতরে প্রকাণ্ড উঠান ও তন্মধ্যে ফুল-বাগান; ঘরগুলি বড় ও পরিষ্কার। প্রতি ঘরের সহিত একটি করিয়া রান্নাঘর আছে। অতি ভাল বন্দোবস্ত। জিনিষপত্র গোছাইয়া রাখিয়া একটু বিশ্রাম করিলাম। পরে পাকের যোগাড় করিয়া দিয়া কুশাবর্ত্ত কুণ্ডে স্নান করিতে গেলাম।

এখানে ত্র্যম্বকেশ্বরের একটি সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক ইতিবৃত্ত দেওয়া গেল। সত্যযুগে মহর্ষি গৌতম পত্নী অহল্যার সহিত ব্রহ্মগিরির উপর তপস্যা করিতেন। ঐ সময়ে অনেক বর্ষ ধরিয়া অনাবৃষ্টি হয় এবং এই হেতু দারুণ জলকষ্ট উপস্থিত হয়। তখন তিনি জলের জন্য বরুণের আরাধনা করেন। তপস্যাতুষ্ট জলদেব আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে একটি কুণ্ড খনন করিতে বলিলেন। কুণ্ড নির্ম্মিত হইলে তাহা অক্ষয় জলে পূর্ণ করিলেন ও তাহার নাম কুশাবর্ত্ত কুণ্ড রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন। জলের সুবিধা দেখিয়া ক্রমে ক্রমে অনেক ঋষি এখানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিছুকাল থাকিতে থাকিতে জল

লইয়া অন্যান্য ঋষিপত্নীগণের সহিত অহল্যার কলহ চলিতে লাগিল। তখন সেই ঋষিগণ গৌতমকে অপমানিত করিবার জন্য বিঘ্নরাজ গণেশের আরাধনা করেন। বিঘ্নরাজ সন্তুষ্ট হইয়া একদিন ঋষিগণের পরামর্শ মত গৌতমের শস্যক্ষেত্রে গোরূপ ধরিয়া শস্য খাইতে লাগিলেন। গৌতম ঐরূপে শস্য নষ্ট হইতে দেখিয়া যেমনি ঐ গরুকে, অতি সামান্যভাবে প্রহার করিয়া তাড়াইতে গেলেন তেমনি উহা মায়াপ্রভাবে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন দুষ্ট ঋষিগণ তাঁহার অত্যন্ত নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন ও তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিলেন। যাহাতে তাঁহাদের আর জলকষ্ট না হয়, সেই মন্ত্রণা করিয়া তাঁহারা গৌতমের এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিলেন যে, তিনি গঙ্গা আনয়নপূর্ব্বক তাহাতে স্নান ও শিবস্থাপনা পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করুন। অগত্যা গৌতম শিবস্থাপনা পূর্ব্বক তাঁহার পূজা ও ধ্যান আরম্ভ করিয়া দিলেন। যথাকালে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া দর্শন দিলেন ও বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ঋষি গঙ্গা প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব ঋষিকে পবিত্র করিবার জন্য গঙ্গাকে আদেশ করিলেন। কিন্তু গঙ্গা বলিলেন, আমি ঋষিকে পবিত্র করিয়া মহাদেবে লীন হইব। তখন গৌতম গঙ্গাকে তথায় চিরবিরাজিত থাকিবার জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন যদি মহাদেব চিরকাল এখানে থাকেন তবে আমি থাকিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলেও এই ক্রুর ঋষিদিগকে পবিত্র করিব না। শিব গঙ্গার কথা শুনিয়া ত্র্যম্বকেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ-রূপে তথায় অবস্থিত হইলেন। তখন জাহ্নবী ব্রহ্মগিরিশিখর হইতে উদ্ভূত হইয়া পর্ব্বতের উপর গৌতমের আশ্রমস্থ যজ্ঞডুম্বুর বৃক্ষের তলায় পতিত হইলেন। দেবগণ তাহা দর্শন করিতে আসিলেন ও প্রতি দ্বাদশ বর্ষান্তে বৃহস্পতি সিংহরাশিগত হইলে তাঁহারা এখানে স্নানাদি করিতে আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। পরে পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণ সাহ্লাদে তথায় স্নান করিতে আসিলেন, কিন্তু গঙ্গা তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর গৌতমের একান্ত অনুরোধে দেবী কুশাবর্ত্ত কুণ্ডে ও ত্র্যম্বকেশ্বর লিঙ্গে অদৃশ্যভাবে আবির্ভূত হইয়া অন্তর্হিত

হইলেন। পুনরায় নাসিক হইতে প্রায় ৯ মাইল দূরে এক স্থানে গঙ্গা-দেবী আবির্ভূত হইয়া প্রবাহিত হইলেন। এই জন্য সেই স্থানটীর নাম গঙ্গাদ্বার হইয়াছে। পুরাণে ভাগীরথী গঙ্গা অপেক্ষা গৌতমী গঙ্গার মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া কথিত। তাহার হেতু এই যে, ভগীরথ নিজবংশের উদ্ধারের জন্য মাত্র গঙ্গা আনয়ন করেন, কিন্তু গৌতম সকলের জন্য তাঁহাকে আনিয়াছিলেন। এ কারণ গোদাবরীর উভয় পার্শ্ববর্ত্তী স্থান তীর্থক্ষেত্র বলিয়া উক্ত, কিন্তু ভাগীরথী গঙ্গার সর্ব্ব-স্থান ঐরূপে গণ্য নহে।

কুশাবর্ত্ত কুণ্ডটি একটি সমচতুষ্কোণ পুষ্করিণী; ইহার চতুর্দ্দিক বাধান ও পাথরের সিঁড়ি দ্বারা বেষ্টিত। জলে গন্ধ না থাকিলেও খুব পরিষ্কার নহে। ইহার নিকটেই আর একটি খুব ছোট কূপাকার কুণ্ড আছে; ইহা কুশাবর্ত্তের সহিত সংযুক্ত। কুশাবর্ত্তের জলে একটু প্রবাহ অনুভূত হয়, এবং তাহা পুরাণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কুশাবর্ত্তে পতিত পূজার পুষ্পাদি প্রবাহবেগে ঐ ছোট কুণ্ডে গিয়া সঞ্চিত হয়, এবং পরে তথা হইতে তুলিয়া ফেলা হয়। কুশাবর্ত্তের সম্মুখে মহাদেব ও মহর্ষি গৌতমের মন্দির, এবং দুই পার্শ্বে দুইটি সুদীর্ঘ দালান ও তন্মধ্যে অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি স্নান সমাপন করিয়া ভারতের বিখ্যাত দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম ত্র্যম্বকেশ্বর দর্শনে চলিলাম। ত্র্যম্বকেশ্বর মন্দির এখান হইতে ৪।৫ মিনিটের পথ। মন্দিরটি বেশ বড়, চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, ইহার তিন দিকে ৩টি ফটক আছে। ফটক পার হইলে একটু বৃক্ষাদিসংযুক্ত জমি, তাহার পর মন্দির প্রাঙ্গন। এই প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে নাটমন্দির ও গর্ভগৃহ এবং এদিক্ ওদিকে ২।৪টি দেবমূর্ত্তি এবং পার্ব্বতী ও গণপতির মন্দির আছে। গর্ভগৃহটি নাটমন্দির হইতে অনেক নিম্নে অবস্থিত। আমরা কিছুদূর হইতে বাবার পূজা করিলাম, কারণ উপস্থিত কেহ কেহ বলিল শূদ্রের লিঙ্গস্পর্শ নিষেধ। কিন্তু পরে শুনিলাম যে কথাটা যথার্থ নহে। সাধারণতঃ গৌরীপট্টের মধ্যস্থলে লিঙ্গ বিরাজমান থাকেন; কিন্তু এখানে লিঙ্গের স্থানে একটি জলপূর্ণ

গর্ত্ত দেখিলাম। শুনিলাম ঐ গর্ত্তমধ্যে তিনটি খুব ছোট লিঙ্গ আছে এবং ঐ জলমধ্যে, প্রবাহ অনুভূত হয়। উহাই নাকি পুরাণোক্ত গঙ্গা-প্রবাহ। রাত্রে উহার উপর সোণা রূপার শিবমূর্ত্তি বসাইয়া শৃঙ্গার হইয়া থাকে। পূজান্তে আমরা ব্রহ্মগিরির উপর গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান দেখিতে যাই।

মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ যাইলে ব্রহ্মগিরি পর্ব্বত। ইহার পাদদেশে একটি খুব বড় পাথরে বাঁধান পুষ্করিণী; এখান হইতে ২।১ মিনিট যাইলেই পাহাড়ে উঠিবার সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে। সিঁড়ি-গুলি অতি পরিষ্কার ও সংখ্যায় ৬১০। আন্দাজ অর্দ্ধ মাইল উপরে উঠিয়াই মহর্ষি গৌতমের আশ্রম পাইলাম। এখানে এক ক্ষুদ্র প্রস্তরমণ্ডপমধ্যে গৌতমমূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গ আছে। নিকটেই একটি যজ্ঞডুম্বুর বৃক্ষ; তাহার তলে আর একটি গৌতমমূর্ত্তি ও সন্নিকটে একটি চৌবাচ্ছা আছে। একটি পাথরের গোমুখ দিয়া গোদাবরীর জল আসিয়া উহা পূর্ণ করিতেছে। আর একটু উপরে উঠিলেই সিঁড়ির শেষ; ইহার উপর একটি তৃণাদশূন্য পাহাড় খাড়া ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। ঐ পাহাড় হইতে গঙ্গা অতি ক্ষীণ ধারায় এই স্থানে আসিয়া ২টি চৌবাচ্ছা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ইহাই গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান। এই কুণ্ড দুইটীর নিকটেই গঙ্গা মাতার মূর্ত্তি বিরাজিত। এই সমস্তগুলিই একটি গুহামধ্যে অবস্থিত। কুণ্ড দুইটির মধ্যে একটি পুরুষদের ও অপরটি স্ত্রীলোকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট। যাত্রিগণ ঐ কুণ্ডে স্নান করিয়া গঙ্গামাতার পূজা দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। এখান হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে খানিকটা যাইবার রাস্তা আছে বটে, কিন্তু তাহার সিঁড়িগুলি বড় উঁচু নীচু. এই রাস্তায় একটি ছোট গুহামধ্যে বহু শিবলিঙ্গ ও আর একটি গুহামধ্যে গণেশ ও দেবীমূর্ত্তি বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলাম। পর্ব্বতে উঠিবার জন্য ডুলি যথেষ্ট পাওয়া যায়, এবং যাতায়াতের ভাড়া দুই টাকার মধ্যে।

সহরের দক্ষিণ ভাগে আমাদের ধর্ম্মশালার খুব নিকটেই আর

একটি পাহাড় আছে ; উহা ব্রহ্মগিরি অপেক্ষা অনেক নীচু। এই পাহাড়ের উপরে চণ্ডিকা দেবীর মন্দির। এই জন্য ইহাকে চণ্ডীর পাহাড় কহে। উপরে উঠিবার সুন্দর সিঁড়ি আছে। মন্দিরটি অবশ্য বেশী বড় নহে, কিন্তু মহামায়ার মূর্ত্তি বড় সুন্দর। পূর্ব্বরাত্রি জাগরণ ও ব্রহ্মগিরি আরোহণ অবতরণে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম বলিয়া আমরা চণ্ডীদেবী দর্শনে যাইতে পারিলাম না। বিশেষতঃ রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের পাণ্ডার মাতা আমাদিগকে খাওয়াইবার জন্য তাঁহাদের বাটীতে লইয়া যাইতে আসিলেন, কিন্তু আমাদের রন্ধনাদি প্রায় হইয়া গিয়াছিল বলিয়া যাইতে পারিলাম না, তাহাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন। এখানকার পাণ্ডারা খুব ভদ্র, যজমানকে বাড়ীতে রাখে, খাওয়ায়। আমাদের পাণ্ডার নামটি গণপত সদাশিব মুলে। কুশাবর্ত্তের আশে পাশেই পাণ্ডাগণের বাড়ী। এই সহরটি ছোট হইলেও ইহাতে অনেক লোকের বাস। ভাগীরথী গঙ্গার উৎপত্তিস্থানের সন্নিকটে যেরূপ গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বারের পৌরাণিক নাম), কুশাবর্ত্ত, চণ্ডীর পাহাড় প্রভৃতি আছে, গৌতমী গঙ্গার উৎপত্তি স্থানের নিকটেও তদ্রূপ গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত্ত, চণ্ডীর পাহাড় প্রভৃতি আছে। বোধ হয় উভয়ের কতকটা সৌসাদৃশ্য রাখিবার জন্যই এইরূপ করা হইয়াছে। আমাদের কিন্তু সময়ের অল্পতা প্রযুক্ত গঙ্গাদ্বার বা উহার নিকটস্থ দুধস্থলী নামক ছোট একটি জলপ্রপাত দেখা হয় নাই।

আমরা যেদিন ত্র্যম্বকেশ্বরে উপস্থিত হই সে দিন সোমবার। শুনিলাম, প্রতি সোমবার বৈকালে দেবাদিদেবের বিশেষ যাত্রা হয়। উঁহার সুবর্ণনির্ম্মিত ভোগমূর্ত্তি নানা আসবাবে সজ্জিত হইয়া পাল্কী করিয়া বহুবিধ বাদ্যসহকারে কুশাবর্ত্তে স্নান করিতে লইয়া যাওয়া হয়। ঐখানে সমারোহের সহিত তাঁহার পূজা ও কীর্ত্তনাদি হয়। কুশাবর্ত্তের চতুর্দ্দিকে লোক পূর্ণ হইয়া যায়। আমরা ঐ সকল দেখিয়া শুনিয়া বৈকাল ৫টার সময় যাত্রা করিলাম। আমাদের যে তিনজন টঙ্গায় যাইলেন, তাঁহারা রাত্রি ৯টার পূর্ব্বেই পৌঁছিবেন বলিয়া

আমাদের জন্য (অর্থাৎ যাঁহারা গো-যানে যাইবেন) আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন স্থির হইল। যাহা হউক অন্যান্য যাত্রীদের গাড়ী প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই আমাদের গাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হইল। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় আমরা অর্দ্ধপথে আসিলাম। এখানে চৌকীদার-গণের আড্ডা। তাহারা সমস্ত রাত্রি এখানে পাহারা দেয় এবং এক আধখানি গাড়ী যাইতে দেখিলে আটকাইয়া রাখে, পাছে তাহারা ডাকাতের হাতে পড়ে এইজন্য। ৫।৭ খানি এক সঙ্গে হইলে ছাড়িয়া দেয়। আমাদের গাড়ী একলা আসিয়াছিল বলিয়া তাহারা আটকাইল। আমরা না থামিয়া অগ্রসর হইব এই রূপ জিদ করায় তাহারা বলিল আপনারা যাইতে পারেন কিন্তু যদি বিপদ্ ঘটে তাহা হইলে আমরা দায়ী থাকিব না। পাঁচ সাত ভাবিয়া অপেক্ষা করাই যুক্তিসিদ্ধ স্থির হইল। কিন্তু প্রাণে বড় ভয় হইতে লাগিল, কি জানি যদি ইহারাই যাহা আছে কাড়িয়া লয়। যাহা হউক, ভয় অধিক ক্ষণ স্থায়ী হয় নাই, কারণ, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ৪৫ খানি গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সকল গাড়ীগুলি ছাড়িয়া দিল। যথাসাধ্য জোর চলিয়া রাত্রি প্রায় দেড়টায় সময় আমরা নাসিকে ধর্ম্ম-শালায় আসিলাম এবং আহারাদি করিয়া শুইয়া পড়িলাম। পর দিবস দ্বিপ্রহরে আমরা নাসিক ত্যাগ করিয়া বোম্বাই যাত্রা করি।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য কি ?

(মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে কার্য্যকারণবাদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে —যে কার্য্যকারণবাদের উপর বেদান্ত ভিন্ন অপর সকল বাদই নির্ভর করে— সেই কার্য্যকারণবাদ যে, কারণের লক্ষণের উপরই নিভর করে তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ না স্বীকার করিলে কখনও কার্য্যকারণবাদ হইতে পারে না। আর সেই কারণের লক্ষণ যদি আলোচনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে, কারণের কোন লক্ষণ হইতে পারে না। লক্ষণনির্ণয়ে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সেই নৈয়ায়িকগণ এই কারণের লক্ষণনির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদি আলোচনা করা যায় তবে দেখা যাইবে, সে লক্ষণটী নির্দ্দোষ নহে। সে লক্ষণের দ্বারা অকারণ হইতে কারণকে পৃথক্ করা যায় না। অন্য কথায় সে লক্ষণটী লক্ষণই নহে। তাঁহাদের সেই কারণের লক্ষণ এই— 'যাহা অন্যথাসিদ্ধিশূন্য অথচ নিয়তপূর্ব্ববৃত্তি' তাহাই কারণ। এবং যাহা 'অবশ্যক্‌৯প্ত-নিয়ত-পূর্ব্ববৃত্তি ভিন্ন' তাহা অন্যথাসিদ্ধ। ইহাতে ঘটের প্রতি দণ্ডই কারণ হয়। দণ্ডত্ব ও দণ্ডরূপ কারণ হয় না, যেহেতু, তাহারা অন্যথাসিদ্ধ হয়। এই কথা পূর্ব্বে এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

কিন্তু এইরূপে অন্যথাসিদ্ধত্বের নির্ব্বচন করিলেও দণ্ডত্ব এবং দণ্ডরূপকে অন্যথাসিদ্ধের মধ্যে গণ্য করিতে পারা যায় না। কারণ, যেস্থলে দণ্ড নিয়তরূপে থাকে সেই স্থলে দণ্ডত্ব ও দণ্ডরূপও থাকিবেই থাকিবে। সুতরাং দণ্ডটী অবশ্যক্‌৯প্ত কিন্তু দণ্ডত্বটী অবশ্যক্‌৯প্ত নহে ইহা বলা যায় না। কারণ, দণ্ড থাকিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডত্ব এবং দণ্ডরূপও নিশ্চয়ই থাকিবে। সুতরাং ইহা বলা যায় না যে, দণ্ডত্ব ও দণ্ডরূপ না থাকিয়া কেবল দণ্ড থাকাতেই যেহেতু ঘটের উৎপত্তি হইয়াছে সেইহেতু দণ্ডটী অবশ্যক্‌৯প্ত এবং দণ্ডত্ব ও দণ্ডরূপটী অবশ্য-

কপ্ত নহে। অতএব উভয়ই অবশ্যকপ্ত হইল অর্থাৎ দণ্ডত্ব দণ্ডরূপটী অন্যথাসিদ্ধ হইল না। আর এই কারণে অন্যথাসিদ্ধত্বের এরূপ নির্ব্বচন করিলেও কারণের ও অকারণের নির্ব্বচন হয় না।

ইহার উপর নৈয়ায়িকগণ অবশ্য বলিতে পারেন যে, আমি অন্যথাসিদ্ধত্বের এরূপ লক্ষণ করিব না যাহাতে এই প্রকার দোষ ঘটিতে পারে। কিন্তু অন্যরূপে ইহার লক্ষণ করিব। অর্থাৎ আমরা বলিব, যাহাকে কারণ বলিলে 'লাঘব' হয় তাহা অবশ্যকপ্ত এবং যাহাকে কারণ বলিলে 'গৌরব' হয় তাহা অন্যথাসিদ্ধ। এই লাঘব গৌরবটী ত্রিবিধ—শরীরকৃত, উপস্থিতিকৃত এবং সম্বন্ধকৃত। এই প্রকার গৌরবটীও তিন প্রকার। যথা—মহত্ত্বকে প্রত্যক্ষের কারণ বলা উচিত অথবা অনেকদ্রব্যবত্ত্বকে প্রত্যক্ষের কারণ বলা উচিত, এইরূপ সংশয় উৎপন্ন হইলে বলা হয় যে, মহত্ত্বই কারণ, অনেকদ্রব্যবত্ত্বটী অন্যথাসিদ্ধ। ইহার কারণ এই যে, পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় না কিন্তু মহৎ অর্থাৎ স্থূলবস্তুর প্রত্যক্ষ হয়। এইহেতু কোন একটী যে কারণের কল্পনা করিতে হইবে, স্থূলপদার্থনিষ্ঠ মহত্ত্বকে সেই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে লাঘব হয়, অর্থাৎ মহত্ত্ব কারণ হইলে কারণতাবচ্ছেদক যে মহত্ত্বত্ব তাহা জাতি হইবে। জাতিটী স্বতন্ত্র পদার্থ। অতএব মহত্ত্বকে কারণ বলিলে শরীরকৃত লাঘব হয় এবং অনেকদ্রব্যবত্ত্ব অর্থাৎ অণুভিন্ন-দ্রব্যবত্ত্ব অর্থাৎ সাবয়বদ্রব্যবত্ত্বকে কারণ বলিলে কারণতার অবচ্ছেদক সাবয়বদ্রব্যবত্ত্বত্বকে বলিতে হয়। তাহা হইলে শরীরকৃত গৌরব হইয়া পড়ে। এইজন্য সাবয়বদ্রব্যত্বটী কারণ নহে। কিন্তু মহত্ত্বকেই কারণ বলা হয়। ইহাই হইল শরীরকৃত লাঘব-গৌরবের উদাহরণ।

অতঃপর উপস্থিতিকৃত লাঘব-গৌরবের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ঘটকে যখন অগ্নিতে দাহ করা হয় তখন ঘটের রূপ, রস, গন্ধাদির পরাবৃত্তি হইয়া নূতন রূপ রস গন্ধাদির উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বরূপাদি কিছুই থাকে না। কিম্বা আম্র অপরিপক্ক অবস্থায় যেরূপ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শবিশিষ্ট থাকে, পরিপক্ক হইলে তাহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ অন্যরূপ হইয়া যায়। সেইস্থলে সেই রূপ, রস, গন্ধাদির উৎপত্তির

প্রতি রূপপ্রাগভাব কারণ অর্থাৎ রূপের প্রতি রূপপ্রাগভাব, গন্ধের প্রতি গন্ধপ্রাগভাব কারণ—(এইরূপ শব্দ স্পর্শাদি সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে) কিম্বা রূপ, রস, গন্ধ সকলের প্রতি গন্ধপ্রাগভাবই কারণ হইবে? এই সমস্যা উপস্থিত হইলে সিদ্ধান্ত এই যে, রূপের প্রতি রূপপ্রাগভাবই কারণ, গন্ধপ্রাগভাব কারণ নহে। যেহেতু রূপের প্রতি কারণ নিরূপণ করিতে যাইলে রূপের জ্ঞান হয়, রূপের জ্ঞান হইলেই রূপপ্রাগভাবের উপস্থিতি শীঘ্র হয়, কিন্তু গন্ধপ্রাগভাবের উপস্থিতি হয় না। অতএব তাহার গন্ধপ্রাগভাবের উপস্থিতি বিলম্বে হয়। এই হেতু রূপপ্রাগভাবকে রূপের প্রতি কারণ বলিলে উপস্থিতিকৃত লাঘবের দৃষ্টান্ত হইল। আর গন্ধপ্রাগভাবকে কারণ বলিলে উপস্থিতিকৃত গৌরবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হইল। এই কারণে গন্ধপ্রাগভাবটী অন্যথাসিদ্ধ, রূপপ্রাগভাবটী কারণ।

প্রকৃত স্থলেও তদ্রূপ দেখা যাইবে যে, দণ্ডত্ব ও দণ্ডরূপকে ঘটের প্রতি কারণ বলিলে সম্বন্ধকৃত গৌরব হয় এবং দণ্ডকে কারণ বলিলে সম্বন্ধকৃত লাঘব হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, দণ্ড যদি ঘটের কারণ হয় তবে কি সম্বন্ধে কারণ হইবে? কার্য্যের অধিকরণে যে কারণ থাকিবে তাহাই কারণ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। যেমন কপাল হইতে ঘট উৎপন্ন হয়। অতএব কপাল হইল ঘটরূপ কার্য্যের অধিকরণ। সেই স্থলে দণ্ড যদি থাকে তাহা হইলে তাহা কারণ হইবে। তাহাতে সেই দণ্ড কিরূপে থাকিবে? কই, তাহাতে ত সে দণ্ড দেখা যায় না। এই হেতু তাহার সম্বন্ধ কি তাহা বলিতে হইবে। (কারণ, সম্বন্ধের দ্বারা সকল জিনিষকে সকল জিনিষের উপর রাখিতে পারা যায়)। সেই সম্বন্ধটী এস্থলে স্বজন্যভ্রমিমত্তা-সম্বন্ধ। এখানে 'স্ব'পদের দ্বারা দণ্ডকে বুঝাইতেছে। সেই দণ্ডের দ্বারা যে ভ্রমণক্রিয়া উৎপন্ন হইয়াছে তাহার আশ্রয় হইল কপাল। অর্থাৎ স্বজন্যভ্রমিমত্তা সম্বন্ধের দ্বারা দণ্ড ঘটের কারণ হইবে, এবং দণ্ডত্ব ও দণ্ডরূপকে যদি কারণ বলা যায় তাহা হইলে স্বাশ্রয়জন্যভ্রমিমত্তা সম্বন্ধে কারণ বলিতে হইবে। অতএব স্বজন্যভ্রমিমত্তা সম্বন্ধ স্থলে স্বাশ্রয়জন্যভ্রমিমত্তা সম্বন্ধ

বলায় সম্বন্ধকৃত গৌরব হয় এবং দণ্ডকে কারণ বলিলে সম্বন্ধকৃত লাঘব হয়। এইজন্য দণ্ডটী ঘটের কারণ এবং দণ্ডত্ব দণ্ডরূপটী অন্যথা-সিদ্ধ। সুতরাং অন্যথাসিদ্ধত্বের ইহাই চরম লক্ষণ হইল যে, যাহাকে কারণ বলিলে গৌরব হয় তাহা অন্যথাসিদ্ধ এবং এতাদৃশ অন্যথাসিদ্ধ ভিন্ন যে নিয়ত পূর্ব্ববৃত্তি লঘুভূত তাহাই কারণ। এইরূপে দেখ, কারণত্বের নির্ব্বচন অনায়াসেই করা যাইতে পারে। সুতরাং দ্বৈতবাদীর মতে কারণকার্য্যত্বের নির্ব্বচন করা যায় না, এইরূপ দোষ যে অদ্বৈতবাদী প্রদর্শন করেন তাহা ঠিক নহে।

এইরূপ যদি দ্বৈতবাদী নিজপক্ষে ব্যবস্থাপন করিতে প্রয়াস করেন, তাহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, এতাদৃশ অন্যথা-সিদ্ধত্ব নির্ব্বচন করিয়াও কারণত্বের নির্ব্বচন করা যায় না। যেহেতু কারণ এবং অন্যথাসিদ্ধ এই দুইটির যথার্থ নির্ব্বচন হয় নাই। যাহাকে কারণ মানিলে গৌরব হয় তাহা অন্যথাসিদ্ধ এবং যাহাকে কারণ স্বীকার করিলে লাঘব হয় তাহাই কারণ, ইহাই যদি নৈয়ায়িকের সিদ্ধান্ত হয় তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষটী অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কারণ গৌরব এবং লাঘব এই দুইটী জিনিষ পরস্পরসাপেক্ষ। অর্থাৎ গুরু না থাকিলে লঘু থাকিতে পারে না, লঘু না থাকিলে গুরু থাকিতে পারে না। অতএব গৌরবের দৃষ্টিতে লাঘব এবং লাঘবের দৃষ্টিতে গৌরবের সত্তা; সুতরাং পুনরায় অন্যোন্যাশ্রয় হয় অর্থাৎ লঘুত্ব-সাপেক্ষ গুরুত্ব ও গুরুত্বসাপেক্ষ লঘুত্ব হইয়া পড়ে। অতএব তদ্ঘটিত কারণত্বটী নির্দ্দুষ্ট বলা যাইতে পারে না।

এই অদ্বৈতবাদিগণপ্রদত্ত দূষণ শ্রবণ করিয়া ইহার সমাধানের জন্য নৈয়ায়িকগণ প্রকারান্তরে যে প্রয়াস করেন তাহা এই—অন্যথাসিদ্ধত্ব জিনিষটী এই যে অবশ্যক্লৃপ্তনিয়তপূর্ব্ববৃত্তিভিন্ন। আবার অবশ্য-ক্লৃপ্তত্বটী কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন, যাহাতে প্রামাণিক ব্যক্তিগণ কারণরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহাই অবশ্যক্লৃপ্ত এবং যাহাতে প্রামাণিকের এইরূপ ব্যবহার হয় না তাহা অন্যথাসিদ্ধ। অর্থাৎ যাহা শিষ্টলোকের কারণত্বব্যবহারের বিষয় তাহা কারণ,

তদ্ভিন্ন যাহা তাহা অন্যথাসিদ্ধ। সুতরাং এই পক্ষে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ আর হইল না।

ইহা শুনিয়া অদ্বৈতবাদিগণ বিস্মিত হইয়া বলেন যে, একটী গল্প শ্রবণ কর। জনৈক ভদ্রলোক কোন একটী নগরে অনেক প্রকার দ্রব্য ক্রয় করিতে আসিয়াছেন এবং দিবাভাগে সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়া ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এমন সময়ে তাঁহার মনে উদয় হইল যে, দিনের বেলায় যদি নদী পার হইতে যাই তাহা হইলে পার-ঘাটের মাশুল দিতে হইবে। সুতরাং দিনে যাওয়া ভাল নয়, রাত্রে কোন প্রকারে অন্য ঘাট দিয়া যাইলে মাশুল দিতে হইবে না। অতএব রাত্রেই যাইব। এইরূপ মনে করিয়া তিনি রাত্রে বাহির হইলেন। পথে সর্ব্বত্রই প্রহরী জাগিয়া রহিয়াছে দেখিয়া তিনি এপথ ওপথ করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রভাত হইলে তিনি দেখিলেন যে সেই পারঘাটেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। নৈয়ায়িকের নির্ব্বচনটীও এই গল্পের ন্যায় হইল। কারণ, তাঁহারা কার্য্যকারণতাকে বাস্তব নির্ব্বচন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বাস্তব নির্ব্বচন করিতে না পারিয়া পরিশেষে ব্যবহারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; অর্থাৎ ব্যবহারমধ্যে যাহা কারণ বলিয়া ব্যবহৃত হয় তাহা কারণ এবং যাহা কার্য্য বলিয়া ব্যবহৃত তাহা কার্য্য। অতএব ব্যবহারে বস্তুর কোন আবশ্যকতা নাই। যেরূপ স্বপ্নে কোন দ্রব্য প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়, কোন নূতন একটী দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু বস্তুতঃ স্বপ্নাবস্থায় এই প্রাচীন দ্রব্য বা নূতন দ্রব্য আছে কি? সকলেই ত তৎকালে উৎপন্ন হইতেছে—যাহা প্রাচীন বলিয়া মনে হয় তাহাও নূতন, যাহা নূতন বলিয়া মনে হয় তাহাও নূতন। তবে একটীকে প্রাচীন বলিয়া মনে করা হয়, অপরটীকে নূতন বলিয়া মনে করা হয় ইহাই পার্থক্য। কল্পনার প্রভেদ মাত্র। একটী অনাদিভাবে কল্পনা করা হইয়াছে—অপরটী সাদিভাবে কল্পনা করা হইয়াছে। একটীকে কারণ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে—অপরটীকে কার্য্য বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, কার্য্য-কারণ বলিয়া কিছুই নাই। তদ্রূপ জাগ্রদ্দশাতেও কার্য্য-কারণ বলিয়া কিছু না থাকিলেও

কার্য্য-কারণ এইরূপ ব্যবহার হইতে বাধা কি ? যদি ব্যবহারের জন্য তুমি তাহাদের পারমার্থিক সত্তা সাধন করিতে প্রবৃত্ত হও তাহা হইলে কাহাদের ব্যবহার ? দুই চারি পাঁচ জনের ব্যবহার কি সমস্ত জগতের ব্যবহার ? যদি দশ পাঁচজনের ব্যবহার হয় তবে আবার দশ পাঁচজনের বিপরীত ব্যবহার হইতেছে। একই সর্পকে দশজনে দশ প্রকার দেখিতেছে। আর সমস্তজগতের যে একরূপ ব্যবহার হয় তাহাকেও যদি সৎ বলিয়া মনে কর তাহা হইলে সমগ্র জগতে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানে এইরূপ ব্যবহার হইয়াছে বা হইবে — ইহাই তুমি কিরূপে বলিতে পার ? সুতরাং ব্যবহার হইতেছে বলিয়া তাহা বস্তুতঃ সৎ ইহা বলা যায় না। এই কার্য্য-কারণ ব্যবহারটা যেহেতু পরস্পরসাপেক্ষ সেইহেতু কোন এক অধিষ্ঠানে ইহা কল্পিত, ইহা বলিতে হইবে। যেমন চন্দ্রত্ব চন্দ্রের জাতিরূপ নহে, যেহেতু, চন্দ্র এক। অতএব চন্দ্রত্বটা সামান্যরূপ নহে। কিন্তু যখন জলে সেই চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পতিত হয় এবং সেইজলে তরঙ্গরূপ উপাধিভেদে অনেক চন্দ্র দেখা যায়, তখন সকল চন্দ্রেতে 'এই চন্দ্র' এইরূপ অনুগত ব্যবহার হওয়ায়, চন্দ্রত্ব সামান্যরূপ হইল, সেই সামান্যের অপেক্ষায় সেই চন্দ্র ব্যক্তি-বিশেষ হইল এবং বিশেষের অপেক্ষায় সেই চন্দ্রত্বটা সামান্যরূপ হইল। এইরূপ সামান্য-বিশেষ ভাব পরস্পরসাপেক্ষ হওয়ায় মুখ্যচন্দ্রের যেমন সামান্য-বিশেষ ভাব কিছুই নাই, কিন্তু উপাধিপ্রযুক্ত কেবল ভ্রান্তিমাত্র হইয়াছে, তদ্রূপ পরস্পরসাপেক্ষ কার্য্যকারণভাব বস্তুভূত না হইলেও চন্দ্রের ন্যায় কোন একটী অধিষ্ঠান আছে যাহাতে কার্য্যত্ব-কারণত্ব এইরূপ ব্যবহারকল্পনা হইয়াছে। সুতরাং কার্য্যকারণভাব যে ব্যবহার দ্বারা বস্তুসৎ ইহা কেহ ব্যবস্থাপন করিতে পারেন না। অতএব দ্বৈতবাদীর মতে কার্য্যকারণভাবের ব্যবস্থা না হইলে তদধীন আর কোন ব্যবস্থাও হইতে পারে না। সুতরাং এই সকল দ্বৈতভেদের সত্যত্ব কি করিয়া সাধন করিতে পারা যায় ? এইজন্য কোন এক প্রাচীন গ্রন্থকার বলিয়া গিয়াছেন—কি করিব, দ্বৈতস্থাপনে আমাদের আগ্রহ নাই ; দ্বৈতকে সত্য বলিয়া মানিতে গেলে তাহার সত্যত্ব প্রতিপন্ন করিতে

আমরা যতই অগ্রসর হই ততই বিফলমনোরথ হইয়া উঠি। যথা—

"বুদ্ধ্যা বিবিচ্যমানানাং স্বভাবো নাবধার্য্যতে।
অতো নিরভিলপ্যাস্তে নিঃস্বভাবাশ্চ দেশিতা॥"

অর্থাৎ বিচার দ্বারা পদার্থের সত্তা নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে যুক্তিদ্বারা কোন পদার্থের সত্তা প্রমাণিত হয় না।

ইহা হইতে দেখা যাইবে, যে একমাত্র অনির্ব্বচনীয় বাদই সত্য বলিয়া স্বীকার্য্য। এই অনির্ব্বচনীয়বাদ ভিন্ন যে কোন বাদ স্বীকার করিবার ইচ্ছা হইবে, বিচার করিয়া দেখিলে তাহাতেই দোষ দৃষ্ট হইবে। সুতরাং দুষ্টমত আশ্রয় না করিয়া অনির্ব্বচনীয় বাদ আশ্রয় করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। আর এই অনির্ব্বচনীয়বাদই যদি সত্যরূপে গৃহীত হইল তাহা হইলে বেদান্ত ব্যাখ্যা করিতে যিনি প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহাকে এই মতাবলম্বনেই উহা ব্যাখ্যা করিতে হইবে। বেদান্ত যদি অভ্রান্ত হয়, বেদান্ত যদি সত্যতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা অনির্ব্বচনীয়বাদই প্রকাশ করিয়াছে এবং সেই বেদান্তসূত্রের রচয়িতা যে মহামুনি বেদব্যাস, তিনিও সেই অনির্ব্বচনীয়বাদ অবলম্বনেই সূত্ররচনা করিয়াছেন বলিতে হইবে। সুতরাং বেদান্তসূত্র ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রকৃতসত্য যে অনির্ব্বচনীয়বাদ তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ব্যাখ্যা করিলে সে ব্যাখ্যা কখনও অভ্রান্ত ব্যাখ্যা হইবে না অথবা ব্রহ্মসূত্রকারের অভিপ্রেত ব্যাখ্যাও হইবে না।

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

(অনুবাদক— শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মুক্তপুরুষের কাহাকেও নমস্কার করিতে নাই, ইহা ভগবৎপাদ (শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক) প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—

"নামাদিভ্যঃ পরে ভূম্নি স্বারাজ্যেঽবস্থিতো যদা।
প্রণমেৎ কং তদাত্মজ্ঞো ন কার্য্যং কর্ম্মণা তদা।"*

(শঙ্করাচার্য্যবিরচিত উপদেশসাহস্রী, ১৭ সম্যঙ্‌মতিপ্রকরণ, ৬৪ শ্লোক)

আত্মজ্ঞপুরুষ যখন নাম বাক্ মন প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থের পরব্যাপক (অর্থাৎ সর্ব্বব্যবহারাতীত অদ্বিতীয় স্বারাজ্যে (অর্থাৎ অমৃতসুখস্বরূপ স্বকীয় মহিমায়) অবস্থিত, (কেননা তিনি আপনাকে ভূমা ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছেন) তখন, (প্রণম্য সকলেই তাঁহার আত্মভূত হইয়া যাওয়াতে) তিনি কাহাকে প্রণাম করিবেন? (তিনি কৃতকৃত্য হইয়া যাওয়াতে) তাঁহার কোন কর্ম্মেই কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। †

---

* রামতীর্থকৃত ব্যাখ্যানুসারে অনুবাদ করা গেল।

রামতীর্থকৃত পদযোজনিকা নাম্নী টীকা—(শঙ্কা) আচ্ছা, তত্ত্বজ্ঞানীরও ত হরিহর, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য এবং তাহা না করিলে ভয়ের আশঙ্কা আছে। সেইহেতু তত্ত্বজ্ঞানীরও কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে বলিতে হইবে;—ইহার উত্তরে বলিতেছেন—নাম, বাক্, মন প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত এই কয়েকটির মধ্যে পরবর্ত্তীটি পূর্ব্ববর্ত্তী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদ্ ইত্যাদিতে শুনা যায়। যিনি ইহাদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সর্ব্বব্যবহারাতীত ভূমা বা অমৃতস্বরূপ, সুখস্বরূপ, অদ্বয়, স্বারাজ্যে বা স্বকীয় মহিমায় অবস্থিত হইয়াছেন (অর্থাৎ আমিই ভূমাব্রহ্ম এইরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন,) সেই তত্ত্বজ্ঞানী আবার কাহাকে প্রণাম করিবেন? কাহাকেও নহে, কেননা, তিনি অন্য কিছুর অপেক্ষায় গৌণ নহেন এবং প্রণম্য অপর সকল বস্তুই তাঁহার আত্মভূত হইয়াছে। অতএব পরিপক্কজ্ঞান-তত্ত্বজ্ঞানী কৃতকৃত্য হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার কিছুই কর্ত্তব্য নাই।

† ভাগবতের পাঠ—

(এস্থলে) যদিও চিত্তের কলুষতা উৎপাদন করে বলিয়া নমস্কার করা নিষিদ্ধ হইল, তথাপি সর্ব্বজীবে সমতাজ্ঞানজনিত চিত্তপ্রসাদের হেতুভূত যে নমস্কার তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—

"ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্॥ ইতি"*

ঈশ্বর জীবের পরিকলন (সৃজন) করিয়া অন্তর্যামিরূপে জীবমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবান্ হইয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কুকুর†, চণ্ডাল, গো, গর্দ্দভ পর্য্যন্ত সকলকেই ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবে।

মনুষ্যের উদ্দেশ্যে স্তুতি করাই নিষিদ্ধ হইল। কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে স্তুতি করার নিষেধ নাই। বৃহস্পতিকৃত স্মৃতিশাস্ত্রে আছে;—

"আদরেণ যথা স্তৌতি ধনবন্তং ধনেচ্ছয়া।
তথা চেদ্বিশ্বকর্ত্তারং কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥"‡

লোকে ধনলোভে ধনবান্ ব্যক্তিকে যেরূপ আদরের সহিত স্তব করিয়া থাকে, বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্‌কে যদি সেইরূপ (আদরের সহিত) স্তব করে তবে কে না বন্ধন হইতে মুক্ত হয়?

অক্ষীণত্ব শব্দে—দীনতারাহিত্য বুঝিতে হইবে; এইজন্য স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"অলব্ধা ন বিষীদেৎ কালে কালেঽশনং ক্বচিৎ।
লব্ধা ন হৃষ্যেদ্ধৃতিমানুভয়ং দৈবতন্ত্রিতম্॥"

* মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥ ৩।২৯।৩৪
বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্॥ ১১।২৯।১৬

শ্রীধরী টীকা—জীবানাং কলয়া পরিকলনেন অন্তর্যামিতয়া প্রবিষ্ট ইতি দৃষ্ট্যেত্যর্থঃ

† অথবা (আ + অশ্ব) অশ্ব পর্য্যন্ত।

‡ বৃহস্পতি সংহিতায় (বঙ্গবাসী সংস্করণ) পাওয়া গেল না।

কোন কোন সময়ে কোনও স্থলে ভোজন না পাইলে, ধৈর্য্য-সম্পন্ন হইয়া থাকিবেন, বিষণ্ণ হইবেন না, এবং পাইলেও হর্যযুক্ত হইবেন না কেননা ভোজন পাওয়া না পাওয়া উভয়ই দৈবাধীন।

ক্ষীণকর্ম্মা শব্দে—যিনি বিধি নিষেধের অধীন নহেন তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। কেননা লোকে স্মরণ করিয়া থাকে—(শুকাষ্টকের ধ্রুবক)

"নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।"

যাঁহারা ত্রিগুণের অতীত পথে বিচরণ করেন তাঁহাদের পক্ষে বিধিই বা কি আর নিষেধই বা কি? এই (বিধি নিষেধের অতীত) ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) বলিয়াছেন—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
"নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥"

(গীতা ২।৪৫)

'তবে কাহার সমাধি-বিষয়ে বুদ্ধি হয়?' অর্জ্জুনের এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন, "হে অর্জ্জুন বেদ সমূহ গুণত্রয়েরই কার্য্য প্রতিপাদন করিতেছে অর্থাৎ উত্তম, মধ্যম ও অধম গতির প্রাপক কর্ম্মকাণ্ডই প্রতিপাদন করিতেছে। তুমি কিন্তু গুণত্রয়কার্য্যের অতীত হও অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম গতিবিষয়েও বৈরাগ্যযুক্ত হও। সেই নিস্ত্রৈগুণ্যভাবে উপনীত হইলে লোকে সুখে দুঃখে, মানে অপমানে, শত্রু মিত্রে সমবুদ্ধি হয়, কেননা, সর্ব্বদা ধৈর্য্য বা সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া সহনশীল হয়। তাহার কারণ এই যে, তিনি জানেন যে অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি ও প্রাপ্তের সংরক্ষণ উভয়ই প্রারব্ধকর্ম্মাধীন, যেহেতু তিনি আত্মবান্ বা জিতচিত্ত।

নারদ বলিয়াছেন ;—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥" (বিষ্ণুপুরাণ)

(১) সর্ব্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে, (২) তাঁহাকে কখনই ভুলিতে নাই। শাস্ত্রে যত বিধি ও নিষেধ আছে তাহা এই দুই নিয়মেরই

কিঙ্কর' (অধীন, অনুসারী) অর্থাৎ এই দুই নিয়মই শাস্ত্রীয় যাবতীয় বিধি নিষেধের লক্ষ্য।

(ভ) "যোঽহেরিব গণাদ্ভীতঃ সম্মানান্নরকাদিব।
কুণপাদিব যঃ স্ত্রীভ্যস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

মোক্ষধর্ম্ম, ২৪৪।১৩*

যিনি জনসংঘকে সর্পের ন্যায়, সম্মানকে নরকের ন্যায়, এবং নারীদিগকে মৃতদেহের ন্যায় ভয় করেন, তাঁহাকে দেবতাগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

"তাঁহাদের সহিত রাষ্ট্রবিষয়ক কথাবার্ত্তা (লোকবার্ত্তা, ভিক্ষাবার্ত্তা ইত্যাদি) হইতে পারে" এইরূপ (পূর্ব্বোদ্ধৃত দক্ষসংহিতার ৩৭ সংখ্যক শ্লোকে)+ কথিত হইয়াছে বলিয়া লোকসঙ্ঘ হইতে সর্পের ন্যায় ভীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সম্মান আসক্তির কারণ হয় বলিয়া পুরুষার্থ-বিরোধী (মুক্তির প্রতিকূল); সেই কারণে নরকের ন্যায় হয়। এই হেতু, স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে,—

"অসম্মানাত্তপোবৃদ্ধিঃ সম্মানাত্তু তপঃক্ষয়ঃ।
অর্চ্চিতঃ পূজিতো বিপ্রো দুগ্ধা গৌরিব সীদতি॥"

কেহ অসম্মান করিলে তপস্যাজনিত ফল অধিকতর হয়। কেহ সম্মান করিলে তপস্যাজনিত ফলের ক্ষয় হইয়া থাকে। গাভীর দুগ্ধ দোহন করিলে যেমন সে অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেইরূপ ব্রাহ্মণ অর্চ্চিত ও পূজিত হইলে, অবসন্ন অর্থাৎ ক্ষীণতপস্ক হইয়া পড়েন।

এই অভিপ্রায়েই, স্মৃতিশাস্ত্রে "অবমান" উপাদেয় বস্তু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে;

---

* মহাভারতের (বঙ্গবাসী সংস্করণ) পাঠ—

অহেরিবগণাদ্ভীতঃ সৌহিত্যান্নরকাদিব।
কুণপাদিব চ স্ত্রীভ্যস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥১৩॥

নীলকণ্ঠকৃত টীকা—অহেঃ সর্পাৎ, গণাৎ জনসমূহাৎ, সৌহিত্যাৎ মিষ্টান্নজনিততৃপ্তেঃ।

+ কিন্তু এই গ্রন্থে "রাজবার্ত্তার" স্থলে গ্রামবার্ত্তা পঠিত হইয়াছে।

"তথাচরেত্ তৈব যোগী সতাং ধর্ম্মমদুষয়ন্।
জনা যথাবমণ্যেরন্ গচ্ছেয়ুর্নৈব সংগতিম্॥"

নারদপরিব্রাজকোপনিষদ্—৫।৩০

যোগী এইরূপ আচরণ করিবেন যাহাতে লোকে তাঁহাকে অবমাননা করে এবং তাঁহার সহিত মিলিতে না আইসে, কিন্তু (তিনি সাবধান থাকিবেন) এইরূপ আচরণের দ্বারা যেন তিনি সাধুজন-পালিত ধর্ম্ম নিয়মের অবমাননা না করেন।)

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে দুই প্রকার দোষ।—এক নিষিদ্ধ বলিয়া, দ্বিতীয় ঘৃণিত বলিয়া। তন্মধ্যে প্রবল প্রারব্ধবশে, কামের বেগে কোন কোন সময়ে নিষিদ্ধতা উল্লঙ্ঘিত হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই মনু-স্মৃতি বলিতেছেন (২।২১৫)—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নৈকশয্যাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥"*

("নৈকশয্যাসনো" স্থলে "ন বিবিক্তাসনো" এইরূপ পাঠ আছে)।

মাতা, ভগ্নী অথবা কন্যার সহিত এক শয্যা বা আসন ব্যবহার করিবে না, কেননা, অতিপ্রবল ইন্দ্রিয় সমূহ বিদ্বান্ পুরুষকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে।

আর স্ত্রীলোকের ঘৃণিতরূপতাও স্মৃতিশাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে—

"স্ত্রীণামবাচ্যদেশস্য ক্লিন্ননাড়ীব্রণস্য চ।
অভেদেঽপি মনোভেদাজ্জনঃ প্রায়েণ বঞ্চ্যতে॥"

(নারদপরিব্রাজকোপনিষদ্—৩।২৯)

স্ত্রীলোকের অনুল্লেখযোগ্য অঙ্গ এবং পূঁজরক্ত স্রাবিশোষস্থত, এই দুইয়ের মধ্যে কোনও প্রভেদ না থাকিলেও, রুচিভেদ বশতঃ অধিকাংশ লোকে প্রতারিত হইয়া থাকে।

---

* মনুসংহিতার পাঠ—

মাত্রাস্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনোভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

কুল্লুকভট্টকৃত টীকা—মাত্রাভগিন্যা দুহিত্রা বা নির্জ্জন গৃহাদৌ নাসীত, যতোঽতি-বল ইন্দ্রিয়গণঃ শাস্ত্রনিয়মিতাত্মানমপি পুরুষং পরবশং করোতি।২১৫।

"চর্ম্মখণ্ডং দ্বিধাভিন্নমপানোদ্গারধূপিতম্।
যে রমন্তি নরাস্তত্র কৃমিতুল্যাঃ কথং ন তে॥"

এক চর্ম্মখণ্ড দুইভাগে বিভক্ত এবং মলদ্বার নিঃসৃত বায়ুর দ্বারা দুর্গন্ধ যুক্ত। যে মানবগণ তাহাতে আসক্ত হয়, তাহারা কি কারণে কৃমিতুল্য নহে?

অতএব নিষিদ্ধতা এবং ঘৃণিতরূপতা এই উভয় দোষ সূচনা করিবার অভিপ্রায়ে এস্থলে মৃতদেহের দৃষ্টান্ত কথিত হইয়াছে।

(চ) যেন পূর্ণমিবাকাশং ভবত্যেকেন সর্ব্বদা।
শূন্যং যস্য জনাকীর্ণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥*

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম ২৬৪।১১)

যিনি একাকী থাকিলে (শূন্য) আকাশ (তাঁহার নিকট) পূর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, এবং জনাকীর্ণ স্থান যাঁহার নিকট শূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাঁহাকে দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

একাকী থাকিলে ভয় আলস্য প্রভৃতি জন্মে বলিয়া সংসারী ব্যক্তিদিগের নিকট একাকী থাকা (বাঞ্ছনীয় নহে, বরং) বর্জ্জনীয়। জনসম্মিলিত হইয়া থাকিলে, সেইরূপ ঘটে না বলিয়া জনসঙ্গম তাহাদের নিকট প্রার্থনীয়। যোগীদিগের সম্বন্ধে ঠিক তাহার বিপরীত, কেননা, তাঁহারা একাকী থাকিতে পাইলে তাঁহাদের ধ্যানপ্রবাহ নির্ব্বিঘ্নে চলিতে থাকে এবং সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ পরমানন্দস্বরূপ আত্মার দ্বারা পূর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। এইহেতু ভয়, আলস্য, শোক, মোহ প্রভৃতি জন্মে না।

"যস্মিন্ সর্ব্বাণিভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥"

ইতি শ্রুতেঃ।

কেননা, বেদে আছে (ঈশাবাস্যোপনিষৎ—৭)—যখন অভেদজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের নিকট ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণী আত্মা-

---

* মহাভারতের পাঠ—"যস্য" স্থলে "যেন"।

নীলকণ্ঠকৃত টীকা—"যেন সম্প্রজ্ঞাতেঽহমেবেদং সর্ব্বমস্মীতি পশ্যতা, যেন রূপাদীনগৃহ্ণতাচ জনপূর্ণমপিস্থানং শূন্যমিব ভবতি; ব্রাহ্মণং ব্রহ্মিষ্ঠম্।১১।

রূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে, অর্থাৎ আমি সর্ব্বভূতের আত্মা এইরূপ জ্ঞানদ্বারা আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন সেই সর্ব্বত্র-একাত্মজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষের কি প্রকার মোহ (আত্মার আবরণ) বা কি প্রকার শোক (আত্মার বিক্ষেপ) হইতে পারে; অর্থাৎ তখন তাঁহার কোনও প্রকার শোক বা মোহ হয় না।।

"জনাকীর্ণম্"—জনাকীর্ণ স্থানে রাজবার্ত্তা প্রভৃতির (আলোচনা) হেতু তাঁহার ধ্যানের বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তাঁহার আত্মানুভব ঘটে না, সেই কারণে সেইরূপ স্থান শূন্যের ন্যায় চিত্তের ক্লেশদায়ক হয় কেননা, না (তিনি জানেন) আত্মাই পূর্ণবস্তু এবং জগৎ মিথ্যা। ইহাই ('চ' চিহ্নিত) শ্লোকের অর্থ।

অতিবর্ণাশ্রমী সূতসংহিতার মুক্তিখণ্ডে, পঞ্চমাধ্যায়ে, পরমেশ্বর (মহাদেব বিষ্ণুর প্রতি) অতিবর্ণাশ্রমীর বর্ণনা করিয়াছেন—

"ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ।
অতিবর্ণাশ্রমী তেঽপি ক্রমাচ্ছ্রেষ্ঠা বিচক্ষণাঃ * ॥" ।৯।

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু ও অতিবর্ণাশ্রমী ইঁহারা নিজ নিজ ধর্ম্মে নিপুণ হইলে, পশ্চাদুক্তটি পূর্ব্বোক্ত অপেক্ষা উত্তম।

"অতিবর্ণাশ্রমী প্রোক্তো গুরুঃ সর্ব্বাধিকারিণাম্।
ন কস্যাপি ভবেচ্ছিষ্যো যথাহং পুরুষোত্তম ॥" ১৪

যিনি অতিবর্ণাশ্রমী তিনি সকল প্রকার অধিকারীর অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার আশ্রমীর গুরু। হে পুরুষোত্তম, অতিবর্ণাশ্রমী কাহারও শিষ্য হয়েন না, যেরূপ আমি (কাহারও শিষ্য নহি)।

"অতিবর্ণাশ্রমী সাক্ষাৎগুরূণাং গুরুরুচ্যতে।
তৎসমো নাধিকশ্চাস্মিল্লোঁকেঽস্ত্যেব ন সংশয়ঃ।" ১৫

অতিবর্ণাশ্রমীকে সাক্ষাৎ গুরুর গুরু বলা হইয়া থাকে। এই সংসারে তাঁহার সমকক্ষ বা তাঁহা হইতে উত্তম কেহই নাই, ইহা নিঃসন্দেহ।

* আনন্দাশ্রমের সূতসংহিতায় ১ম খণ্ডে, ২৮৫ পৃষ্ঠায় "বিচক্ষণ"—(বিষ্ণুর সম্বোধন)—এইরূপ পাঠ আছে।

"যঃ শরীরেন্দ্রিয়াদিভ্যো বিভিন্নং সর্ব্বসাক্ষিণম্।
পারমার্থিকবিজ্ঞানং* সুখাত্মানং স্বয়ংপ্রভম্॥
পরং তত্ত্বং বিজানাতি সোঽতিবর্ণাশ্রমীভবেৎ॥"১৬-১৭½।

যিনি, শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে পৃথক্, সর্ব্বসাক্ষী, (প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের অধিষ্ঠানভূত) পারমার্থিক বিজ্ঞানরূপ সুখস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, পরমতত্ত্বকে অবগত হইয়াছেন, তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন।

"যো বেদান্তমহাবাক্য শ্রবণেনৈব কেশব।
আত্মানমীশ্বরং বেদ সোঽতিবর্ণাশ্রমীভবেৎ॥"১৭-১৮½

হে কেশব! যিনি বেদান্তের মহাবাক্য শ্রবণমাত্রেই আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝিয়াছেন, তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন।

"যোঽবস্থাত্রয়নির্ম্মুক্তমবস্থাসাক্ষিণং † সদা।
মহাদেবং বিজানাতি সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ॥"১৮-১৯

যিনি (শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই) তিন অবস্থাবিনির্মুক্ত, এবং (সকল) অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ মহাদেবকে (স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে) ('আমিই সেই' বলিয়া) অবগত হইয়াছেন, তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন।

"বর্ণাশ্রমাদয়ো দেহে মায়য়া পরিকল্পিতাঃ।
নাত্মনো বোধরূপস্য মম তে সন্তি সর্ব্বদা॥
ইতি যো বেদ বেদান্তৈঃ সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ।"(২০)।

যিনি (উপনিষৎ প্রমাণ) বেদান্তশাস্ত্রের দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে (ব্রাহ্মণাদি) বর্ণ ও (ব্রহ্মচর্য্যাদি) আশ্রম, মায়াদ্বারা এই দেহে

* উল্লিখিত পুস্তকে "পারমার্থিকবিজ্ঞানসুখাত্মানং" ও "পরতত্ত্বং" এইরূপ পাঠ আছে।

† উক্ত পুস্তকে "অবস্থাত্রয়সাক্ষিণং" এইরূপ পাঠ আছে। সূতসংহিতার টীকাকার মাধবাচার্য্য 'অবস্থাত্রয়' শব্দে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—এই তিন "আত্মবেদনক্রম" বুঝিয়াছেন। তদনুসারেই অনুবাদ করা হইল। কিন্তু বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কার আসিলে, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির কথাই মনে হয়।

পরিকল্পিত হইয়াছে—তাহারা কোনও কালে বোধস্বরূপ আমার (ধর্ম্ম) নহে, তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন।

"আদিত্যসন্নিধৌ লোকশ্চেষ্টতে স্বয়মেব তু।
তথা মৎসন্নিধাবেব সমস্তং চেষ্টতে জগৎ॥
ইতি যো বেদ বেদান্তৈঃ সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ॥" ২২-২২

'সূর্য্যের সান্নিধ্যে সংসার যেরূপ আপনিই কর্ম্মরত হয়, সেইরূপ আমার সান্নিধ্যে সমস্ত জগৎ কর্ম্মরত হয়'*—যিনি বেদান্ত বাক্যের সাহায্যে ইহা অবগত হইয়াছেন, তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন।

"সুবর্ণহারকেয়ূরকটকস্বস্তিকাদয়ঃ
কল্পিতা মায়য়া তদ্বজ্জগন্ময্যেব সর্ব্বদা॥
ইতি যো বেদ বেদান্তৈঃ সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ॥"২২-২৩

'যেরূপ হার, কেয়ূর, বলয়, স্বস্তিক (ত্রিকোণাকৃতি অলঙ্কার-বিশেষ) প্রভৃতি অলঙ্কার সুবর্ণে কল্পিত হয়, সেইরূপ জগৎ সর্ব্বদাই মায়াদ্বারা আমাতে কল্পিত হইয়া রহিয়াছে'—যিনি বেদান্ত শাস্ত্র হইতে ইহা অবগত হইয়াছেন তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন।

"শুক্তিকায়াং যথা তারং কল্পিতং মায়য়া তথা।
মহদাদি জগন্মায়াময়ং ময্যেব কল্পিতম্॥
ইতি যো বেদবেদান্তৈঃ সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ॥"২৪-২৫

"যেরূপ শুক্তিকাতে রজত (মুক্তা†) কল্পিত হয়, সেইরূপ মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া (পঞ্চমহাভূত পর্য্যন্ত) মায়াময় জগৎ আমাতেই কল্পিত হইয়াছে"—যিনি বেদান্ত শাস্ত্র হইতে ইহা অবগত হইয়াছেন, তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন।

---

* অর্থাৎ সূর্য্য যেমন সংসারের প্রবর্ত্তক হইয়াও বাস্তবিক প্রবর্ত্তক নহেন, সেইরূপ আমি কর্ত্তা হইয়াও বাস্তবিক কর্ত্তা নহি,—যিনি এইরূপ বুঝিয়াছেন।

† মাধবাচার্য্য 'তার' শব্দে 'রজত' বুঝিয়াছেন, কিন্তু অভিধানে ঐ অর্থ পাওয়া গেল না। 'মুক্তা' অর্থ পাওয়া যায় এবং তাহাতে অসংলগ্ন হয় না।

"চাণ্ডালদেহে পশ্বাদিশরীরে ব্রহ্মবিগ্রহে,
অন্যেষু তারতম্যেন স্থিতেষু পুরুষোত্তম।
ব্যোমবৎ সর্ব্বদা ব্যাপ্তঃ সর্ব্বসম্বন্ধবর্জ্জিতঃ।২৬
একরূপো মহাদেবঃ স্থিতঃ সোঽহং পরামৃতঃ।
ইতি যো বেদ বেদান্তৈঃ সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ॥"২৭॥

"হে পুরুষোত্তম, যে সদেকরূপ স্বপ্রকাশ পরমব্রহ্ম, চণ্ডালের দেহে, পশুপ্রভৃতির শরীরে, ব্রাহ্মণের দেহে এবং উত্তমাধম (শ্রেণী) নিবদ্ধ অন্যান্য জীবের দেহে, আকাশের ন্যায় সর্ব্বসম্বন্ধশূন্য হইয়া সর্ব্বদা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই অমর অবিনশ্বর পরমব্রহ্মই আমি"—যিনি বেদান্তশাস্ত্র হইতে ইহা অবগত হইয়াছেন, তিনিই অতিবর্ণাশ্রম হইতে পারেন।

"বিনষ্টদিগ্‌ভ্রমস্যাপি যথাপূর্ব্বংবিভাতি দিক্*।
তথা বিজ্ঞানবিধ্বস্তং জগন্মে ভাতি তন্নহি।২৮
ইতি যো বেদ বেদান্তৈঃ সোঽতিবর্ণাশ্রমীভবেৎ॥"

(গ্রহনক্ষত্রগত্যাদি দর্শনে) দিগ্‌ভ্রম অপগত হইলেও (সেই ভ্রমের সংস্কারবশতঃ যেমন কোনও) দিক্ পূর্ব্বের ন্যায়ই অনুভূত হয়, সেইরূপ তত্ত্বসাক্ষাৎকার হেতু দৃশ্যমান্ জগতের ভ্রম আমার নিকট নিবৃত্ত হইলেও, (অজ্ঞানের বাধিতানুবৃত্তি বশতঃ) জগৎ আমার নিকট প্রকাশিত হইতেছে 'কিন্তু বস্তুতঃ জগৎ নাই"—যিনি বেদান্তশাস্ত্রের সাহায্যে এইরূপ অনুভব করেন, তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

* আনন্দাশ্রমের উভয় সংস্করণেই "দৃক্‌ভ্রম" ও "যথাপূর্ব্বা" পাঠ আছে। কিন্তু পাঠ দুষ্ট। সূতসংহিতা হইতে শুদ্ধপাঠ উদ্ধৃত করিয়া মাধবাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র

রামকৃষ্ণমঠ, বেলুড়।

২৯।৩।১৭

কল্যাণবরেষু—

শ্রীমান্ বি— তোমার চিঠি পাইলাম। স্বপ্নে যা আসে উহা অনেক সময় সত্যও হয় আবার কখন কখন বা মিথ্যাও হয়। স্বপ্নে কি দেখ্‌লে না দেখ্‌লে তাতে কি আসে? সহজ সত্য—প্রত্যক্ষ বিষয় নিয়ে জীবন প্রস্তুত কর, চরিত্রবান্ হও। যার তার সঙ্গ করা ভাল নয়। যদি লোক চিনিবার শক্তি না থাকে তবে নিজ ভাব অনেক সময় নষ্ট হয়। ছেলেদের নিয়ে ঠাকুরের কথা আলোচনা করা ভাল। সাধু-সন্ন্যাসী স্বপ্নে দেখা ভাল, খুব উত্তম। স্বপ্নের কথা যার তার কাছে বলা কিন্তু ভাল নয়। যা দরকার শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে জানাবে। তিনি কৃপা করে সব জানাবেন এবং বল ও শক্তি দেবেন।

এখানকার সবাই ভাল আছে। শ্রীযুক্ত তু—খুব পণ্ডিত ও সিদ্ধ লোক। তিনি সম্প্রতি এখানে আছেন। তাঁকে তুমি চিঠি লিখো। আমার কথা কিছু বলো না। দেশ ঠাকুরের ভক্তি প্রেমে ভরে যাক্। জগৎ শান্তির আস্বাদে আনন্দে নৃত্য করুক। তুমি আমাদের ভালবাসা জানিবে ও সকলকে দিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—

প্রেমানন্দ

(২)

বেলুড়মঠ

১১।৪।১৭

স্নেহভাজনেষু—

শ্রীমান্ রা— তোমার পত্র পড়িলাম। তোমার ঠিক ধ্যান শীঘ্রই হইবে, কোন ভয় নাই। যে ভগবান্‌কে চিন্তা করে ঈশ্বরই তাহাকে

ধ্যান করিবার শক্তি সামর্থ্য দেন। সৎসঙ্গ, সৎমনবুদ্ধিও তিনি প্রেরণ করেন। তুমি ধ্যান করিতে চিন্তিত হইও না। মনই সৎসঙ্গ, সদ্‌গুরুর কাজ করিয়া, রাস্তা দেখাইয়া দিবে। অবসরমত তোমার পত্র পাইলেই উত্তর দিব। তুমিও সকল কথা নির্ভয়ে খুলিয়া লিখিও, কোনও ভয় ভাবনা নাই। যাহারা ঈশ্বরবিশ্বাসী এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাম ক্রোধ তাহাদের কি করিবে? চিন্তা করিবে আমরা ভগবদ্দাস, বিশ্বনাথের সন্তান—মদনান্তক শূলপাণির ছেলে। তবেই দেখিবে ঐ কামক্রোধগুলো দেশছাড়া হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা—

"রামা রম্ভা তিলোত্তমা যদি মন ছলে,
কৃষ্ণের ইচ্ছায় মন কভু নাহি টলে।"

এই মহামন্ত্র সর্ব্বদা আওড়াইবে, সব শঙ্কা চলিয়া যাইবে।

যে রূপ তোমার ভাল লাগে তাহা হৃদয় মধ্যে বসাইয়া ধ্যান করিয়া যাও। একটু জোর করিয়া মশারির মধ্যে বসিয়া ধ্যান করিও। অভ্যাস হইয়া গেলে ধ্যান না করিয়া থাকিতে পারিবে না, উহাতে মজা পাইবে। তোমার খুব ভক্তি-বিশ্বাস হউক ইহাই প্রভুর নিকট আমার প্রার্থনা। ভগবান্ সর্ব্বদা তোমায় রক্ষা করুন। আমরা ভাল আছি। তুমি আমাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী—

প্রেমানন্দ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিগত মার্চ্চ মাসের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত মাসে সর্ব্বসমেত ১৪৬৫ জন রোগী উপস্থিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ৮৬৫, (পুরুষ ৫১৯, স্ত্রী ৩৪৬)। প্রাত্যহিক নূতন রোগীর গড় সংখ্যা ২৭·৯ এবং নূতন পুরাতন উভয়ের গড় উপস্থিতি ৪৭·২৬; আলোচ্য মাসে দুইটী অস্ত্র চিকিৎসা হইয়াছে।

স্বামী অদ্ভুতানন্দ

আদর্শ ও কর্ম্মজীবন।

(স্বামী শ্রদ্ধানন্দ)

স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যদেশে গমনের পূর্ব্বরাত্রিতে বেলুড় মঠের সাধু ব্রহ্মচারিগণকে সম্বোধন করিয়া কয়েকটী সারগর্ভ উপদেশ দেন—তাহার কিয়দংশ 'ভারতে বিবেকানন্দ' গ্রন্থে 'সন্ন্যাসীর আদর্শ ও তৎসাধনের উপায়'—নামে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ উপদেশের মধ্যে একটী কথার আজ আমরা আলোচনা করিব। মহাপুরুষগণের এক একটী কথার ভিতর এত সারতত্ব নিহিত থাকে যে, উত্তমরূপে প্রণিধান করিলে তাহা লইয়া মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর আলোচনা চলিতে পারে, তাহাতে উহার নূতনত্ব নষ্ট হয় না, বরং আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা ও পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞান হইতে ঐ উপদেশের নূতন নূতন যুক্তি ও দৃষ্টান্ত পাইতে পারি এবং আমাদের ও আমাদের বন্ধুবান্ধবগণের কর্ম্মজীবনে ঐ উপদেশের প্রয়োগের অনেক প্রণালী ও কৌশল আবিষ্কার করিতে পারি। শুনা যায়, স্বামিজী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব-কথিত 'হাতী নারায়ণ ও মাহুত নারায়ণ' আপাতপ্রতীয়মান সামান্য দৃষ্টান্তটী অবলম্বন করিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের সহিত কয়েকদিন ধরিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তৎপ্রসঙ্গে ঐ দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক স্বাধীন ইচ্ছা ও অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের জটিল সমস্যাগুলির উত্তমরূপে সমাধান হইয়াছে বুঝাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, আজ প্রায় বিংশ বর্ষ পরে স্বামিজীর ঐ একটী কথার উপর আর একবার প্রণিধান করিব—নির্জ্জনে বসিয়া নহে, জনবহুল সভায় বসিয়াও নহে—কল্পনার চক্ষে, হে উদ্বোধনের পাঠকপাঠিকাগণ,

নারা আমার এই প্রণিধানের সময় বর্ত্তমান আছেন দেখিয়া। আপনারাও অবহিত হউন এবং যাঁহার সাধনা ও অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ ঐ উপদেশ উচ্চারিত হইয়াছিল, তিনিই আমাদিগকে তাঁহার উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে সহায়তা করুন।

কথাটা এই,—ঠিক ভাষাটী মনে নাই তবে ব্যাপারটা এই, স্বামিজী আমাদিগকে দুইটী জিনিষ হইতে একই সময়ে সাবধান হইবার জন্য বলিতেছেন। বলিতেছেন, কর্ম্মজীবনের খুঁটিনাটি লইয়া ব্যস্ত হইয়া নিজ উচ্চ আদর্শ ভুলিও না—আবার একটা অসম্ভব আদর্শ ধরিয়া বসিয়া কর্ম্মজীবনের উৎসাহ হারাইও না।

আমরা নিদ্রাভঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সারাদিন এবং কতক রাত্রি পর্য্যন্ত নানা কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকি—নানা কর্ম্মের জন্য ছুটাছুটি করি। এই কর্ম্মের হাত হইতে কাহারই বড় অব্যাহতি নাই, তবে দেশ কাল পাত্র অবস্থা প্রভৃতির ভেদানুসারে কার্য্যের কিছু কিছু রকমফের হয় মাত্র। অন্ন বস্ত্র আচ্ছাদন নিজের জন্য ও 'আমার' বলিয়া যাহাদের উপর বুদ্ধি, তাহাদের জন্য—ইহার চেষ্টাই মানুষের প্রাথমিক চেষ্টা। তুমি একটা জঙ্গলে পড়িয়া চলিয়াছ—তোমার প্রথম চেষ্টা হইবে, আজ কিসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিব, আজ কোথায় আশ্রয় লইয়া শীতাতপবর্ষা-হিংস্রজন্তু আদির হস্ত হইতে রক্ষা পাইব—আজ গায়ে কি দিয়া প্রবল শীতের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিব—Fooding, clothing, lodging—এই তিনটীই মানুষের প্রথম আবশ্যকীয়। উহাদেরই উৎকর্ষে—ভাল খাইবার, ভাল পরিবার ও ভাল বাস করিবার স্থানের অন্বেষণেই এই জটিল সমাজযন্ত্রের বিকাশ এই তিনটী মূল প্রয়োজন সিদ্ধ না হইলে সভ্য বা অসভ্য কোন প্রকার জীবনযাত্রাই অসম্ভব। ক্রমশঃ ইহাদের সহিত কতকগুলি সাময়িক প্রয়োজন আসিয়া জুটে—যথা স্বাভাবিক সুস্থতার ব্যত্যয় হইয়া রোগের উৎপত্তি হইলে তাহার প্রতীকার জন্য চেষ্টা হয়, তখন আহার ব্যতীত আবার ঔষধ খুঁজিতে হয়—যা তা আহার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলে চলে না, পথ্য খুঁজিতে হয়। এক স্থান হইতে আর একস্থানে যাইতে হইলে প্রথম পদব্রজে চলে—পরে জলবাধা

পাইলে নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা—আবার দ্রুত যাইবার জন্য বা আরামে যাইবার জন্য নানাবিধ পশুকে বশ করিয়া তদারোহণে অথবা বিভিন্ন পশুবাহিত বা নরবাহিত যানে যাতায়াতের ব্যবস্থা। এইরূপে ক্রমশঃই বাষ্প, তাড়িত প্রভৃতি শক্তি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তৎপরিচালিত ট্রাম, এঞ্জিন, মোটর প্রভৃতির উদ্ভব। আজ আবার বিজ্ঞানের কলাকৌশলের অত্যধিক উৎকর্ষে জলমধ্য দিয়া বা আকাশের অত্যুচ্চপ্রদেশ দিয়াও মানবের গমনাগমন সম্ভব হইয়াছে।

ব্যষ্টির সমষ্টি হইতে সমাজসংহতির উদ্ভব। একজনকে নিজ সমুদয় প্রয়োজন নিজে নিজে নির্ব্বাহ করিতে গেলে জীবনযাত্রা অতি কঠিন হইয়া দাঁড়ায়, এই কারণেই পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরের স্বার্থসাধনের জন্য শ্রমবিভাগের পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত এবং পরিবার, সমাজ, জাতি প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে জটিল সভ্যতা ও সমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে এবং আমরা ইহার এক একটী ব্যষ্টি অঙ্গ-স্বরূপে দাঁড়াইয়াছি। বিভিন্ন মানবের মনে নিজ সুখ ও পরের সুখের জন্য যতপ্রকার বিভিন্ন প্রয়োজনের কল্পনা হইতে পারে, তাহারই কার্য্যে পরিণতির জন্য নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে ও হইতেছে। এইরূপে নানা কর্ম্মের সৃষ্টি ; এবং আমরা প্রত্যেকেই এক একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত থাকিয়া এক একটী কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত হইয়া আছি।

যাক্, এখন কথা এই, আমরা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর অবস্থিত রহিয়াছি উহাই আমাদের কার্য্যকে সম্পূর্ণ নিয়মিত করিবে অথবা আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজের খেয়াল অনুসারে, নিজের ভাবানুসারে উন্নতির দিকে চলিতে থাকিব। বলা বাহুল্য, স্বামিজী যে আদর্শ ও কার্য্যের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনের কথা বলিয়াছেন, তাহা এই সমস্যা সমাধানের জন্যই।

মনে কর, আমি খুব দরিদ্র অবস্থার লোক—আমাকে অতি কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয়—দৈনন্দিন অভাব পূরণেই আমার এত সময় ও শক্তিক্ষয় হয় যে, আমি আমার জ্ঞানবৃদ্ধির

এবং এই জ্ঞানবৃদ্ধি করিয়া আমার ভবিষ্যৎ অবস্থা উন্নত করিবার সময় অল্পই পাই। অথচ আমার আশে পাশে মধ্যবিত্ত ও ধনিগণকে দেখিয়া তাহাদের সুখসমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়া আমার পুরামাত্রায় লক্ষপতি হইবার বাসনা জাগিতেছে। যদি বাসনার তৃপ্তি না হয়, তবে অশান্তির সীমাপরিসীমা থাকে না এক্ষেত্রে আমার কি কর্ত্তব্য ? আমি কি আল্‌নাস্কারের মত দিবা স্বপ্ন দেখিব—বর্ত্তমান কার্য্যে অসন্তুষ্ট ও তাহাতে অমনোযোগী হইয়া তাহার মত কল্পনা করিতে থাকিব যে, এই কাচপাত্রগুলি বিক্রয় করিয়া যে পয়সা হইবে তাহা হইতে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ ব্যবসায় অবলম্বনে খুব বড়লোক হইব—পরে বড়লোক হইলে এইরূপভাবে লোকজনের সঙ্গে ব্যবহার করিব ? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পদাঘাতে কাচপাত্রগুলি ভগ্ন করিয়া তাহার দিবাস্বপ্নের অবসান হইয়াছিল ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার বড়লোক হইবার আশা সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছিল। এক্ষেত্রে সে কল্পনাবিহঙ্গমকে একেবারে অবাধগতির স্বাধীনতা না দিয়া যদি উহাকে একটু সংযত করিত, করিয়া যাহা ভাবিয়াছিল তাহার কতকটারও অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিত, তবে সে আশানুরূপ না হউক, কিয়ৎপরিমাণে তাহার অবস্থার উন্নতিসাধনে নিশ্চিত কৃতকার্য্য হইত। পক্ষান্তরে, যে কেবল উপস্থিত অবস্থায় বা উপস্থিত কার্য্যে এতদূর মগ্ন যে, চিন্তার এতটুকু অবসর লয় না, তাহারও অপরের উন্নতির অবস্থা দেখিয়া বাসনা জাগে বটে, কিন্তু চিন্তাশক্তির বিকাশের অভাবে বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যদ্দৃষ্টির সামান্ত চেষ্টা পর্য্যন্ত সে করে না—তাহার মুখে কেবল practical, practical কথাটাই শুনা যায়, কিন্তু সে নিজে যতটুকু যাহা করিতেছে, তাহার উপরেও যে practical আছে, ইহা সে বুঝিতেই পারে না। উপরন্তু সে নিজে বর্ত্তমান অবস্থায় কেবল অশান্তিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। এখানে কি মধ্যপন্থা অবলম্বনীয় নহে ? অর্থাৎ আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার ভিতরে উপস্থিত অভাব মিটাইবার জন্য সমুদয় সময়টুকু ব্যয় না করিয়া তাহার মধ্যে কিছু

সময় যাহাতে নিজের অপেক্ষাকৃত উন্নতি হইতে পারে এমন কিছু শিক্ষা করিয়া—সুযোগ উপস্থিত হইলে সেই শিক্ষার সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হওয়াই কি বাঞ্ছনীয় নহে? আবার সেই অবস্থা হইতে আর একটী, তারপর আর একটী উচ্চতর সোপান ধরিতে হয়—ইহারই নাম আদর্শ ও কর্ম্মজীবনে সামঞ্জস্য করিয়া চলা।

আপাততঃ মনে হইতে পারে, "অসম্ভব আদর্শের দিকে লক্ষ্য করিও না" এই কথা বলিলে যেন আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা হয়—আদর্শ ও কর্ম্মজীবনের ভিতর একটা আপোষের চেষ্টা করা হয়—কিন্তু এরূপ আপোষ ত কখনই অনুমোদনীয় হইতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে স্বামিজীও পূর্ব্বোক্ত কথা দ্বারা কোনরূপ আপোষ করিতে বলিতেছেন না। আদর্শ খুব উচ্চ রাখ—কিন্তু উহাকে ধরিবার জন্য সোপানাবলম্বনে উঠিতে হইবে—শূন্যে লম্ফপ্রদান করিলে হাঁত পা ভাঙ্গিবারই অধিক সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে, যদি কিছুমাত্র কল্পনা আমার না থাকে, কেবল দিনগত পাপক্ষয় করিয়াই যদি আমি যথেষ্ট করিলাম বলিয়া মনে করি, তবে 'উন্নতি' শব্দটা আমাদের অভিধান হইতে একেবারে উঠাইয়াই দিতে হয়।

ব্যক্তিগত বৈষয়িক উন্নতির বিষয়ে যাহা কথিত হইল, ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্বন্ধেও তদ্রূপ—আর সমষ্টিগত সামাজিক বা রাজনৈতিক জীবনেও এই নীতির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই। মনে কর, আমি শাস্ত্রাদি শ্রবণ বা অধ্যয়নের ফলে বুঝিলাম যে, মুক্তিলাভ আমার জীবনের চরম লক্ষ্য—আর ব্রহ্মের সহিত নিজের অভিন্নতা উপলব্ধি হইলেই তাহা ঘটিতে পারে—এই অভিন্নতা উপলব্ধি নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভ হইলেই হইতে পারে এবং তাহার উপায় আবার সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন;—এখন আমি ঘোরকর্ম্মী সংসারী—কর্ম্মত্যাগ করি কিরূপে? অতএব ভাবিলাম, মুক্তিলাভ আমার পক্ষে অসম্ভব—এবিষয়ে আমার পক্ষে কোন চেষ্টাই সম্ভব নহে; কারণ, আমাকে এই সকল কার্য্য এখন করিতেই হইবে—যদি পরজন্মে কখনও সুযোগ হয়, মুক্তির

চেষ্টা দেখা যাইবে। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে না পারিলে যখন এই জ্ঞানসাধন অসম্ভব—আর আমার দ্বারা কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ সম্ভাবিত নহে, তখন আর আমার মুক্তিলাভের চেষ্টারূপ ধৃষ্টতায় কি ফল? যদি ঈশ্বরেচ্ছায় কখন সন্ন্যাসী হইতে পারি ত ওসব দেখা যাইবে। এখন উহা শিকেয় তোলা থাক। একজন হয় এইরূপ ভাবিল; আর একজন আবার ঐরূপ শাস্ত্রজ্ঞানের ফলে নিজের বলাবল, মনের বৈরাগ্য কতদূর এ সকলের কিছুমাত্র বিচার না করিয়া স্ত্রীপুত্রাদিকে ভাসাইয়া দিয়া গৈরিকবর্ণে বসন রঞ্জিত করিয়া কাশী বা হরিদ্বার যাত্রা করিল এবং নিজ উদরপূরণের এবং শরীররক্ষার চেষ্টায় বিব্রত হইয়া, যে কর্ম্ম করিতেছিল তদপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া বসিল, বা কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়া পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পরিজনবর্গের ঘোরতর অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইল! মহা মহা মনীষিগণ পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে এবিষয়ে পথনির্ণয়ে অক্ষম হইয়া মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ভগবদ্গীতাটা কি? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বার বার বুঝাইতেছেন, মুক্তিই জীবনের চরমাদর্শ—আবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পক্ষে গৃহস্থ ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মযুদ্ধের অনুষ্ঠান অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দিতেছেন। অর্জ্জুন বুঝিতে না পারিয়া বার বার এই প্রশ্ন করিতেছেন,—

'জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জ্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥'

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া কি উপায়ে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ হইয়া ধ্যান ও জ্ঞাননিষ্ঠালাভ হইতে পারে, তাহা বুঝাইতেছেন। দুঃখের বিষয়, আমরা গীতাশাস্ত্রের মর্ম্ম না বুঝিয়া হয় সকলকেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে চাই, অথবা সকলকেই কর্ম্মত্যাগ করাইতে চাই। কবে আমরা অধিকারবাদের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিব!

ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবনে অসম্ভব আদর্শ অনুসরণের চেষ্টায় ক্রমাগত নৈরাশ্য ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। এরূপ সাধক অনেক

দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা দিন রাত 'তাই ত আমার কিছুই হইল না' বলিয়া হা হুতাশ করিতেছে। এরূপ না করিয়া আপাততঃ একটী ক্ষুদ্রতর আদর্শ লইয়া তাহাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইবার চেষ্টা কর। যাহার ইচ্ছা, অধিকাংশ সময় ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত করিব, সে ছয় মাসকাল এবেলা একঘণ্টা ওবেলা একঘণ্টা বসিয়া ধ্যানাভ্যাসের চেষ্টা করুক, পরবর্ত্তী ছয়মাস সে এই অভ্যাস বৃদ্ধি করিয়া দুই ঘণ্টা করিয়া করিতে পারে। আবার একরূপ সাধক আছে, তাহারা অল্প সল্প যাহা সাধন করে, তাহাতেই তৃপ্ত তাহাদের সাধন যন্ত্রবৎ হইয়া গিয়াছে—খানিকটা বসিয়া ও মালা ফিরাইয়া তাহারা মনে করে, আমরা ভগবান্‌কে বাঁধিয়া ফেলিলাম! তাহাদের মনে বিচার নাই, চিন্তা নাই, হৃদয়ে ব্যাকুলতা নাই, প্রাণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই। এইরূপ হইলেও বিশেষ উন্নতি হয় না—যেমন ক্ষেত্রে বহুদিন জল সেচন করিলেও অজ্ঞাতসারে উহা গর্ত্ত দিয়া বাহির হইয়া যায়, তদ্রূপ এই তথাকথিত সাধনভজন বহুদিন করিবার পর দেখা যাইবে, যাহা ছিলাম তাহাই প্রায় আছি—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদিও কমে নাই, আর হৃদয়ে বিবেক-বৈরাগ্য-শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেমেরও বিকাশ বিশেষ কিছুই হয় নাই। তাই বলি, খুব উচ্চ আদর্শ রাখ, কিন্তু তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বর্ত্তমান অবস্থার মধ্য দিয়া চেষ্টা কর—কর্ম্মযোগের দ্বারা কর্ম্মত্যাগরূপ ধ্যানযোগ ও জ্ঞানযোগে আরোহণের চেষ্টা কর। পথ দীর্ঘ বলিয়া ভয় পাইও না, অধ্যবসায়শীল হও—তোমাকে চরমাদর্শে পৌঁছিতে হইবেই হইবে—তাহার জন্য প্রাণপণে পাথের সংগ্রহ কর—প্রস্তুত হও, অধিকারী হও। সন্ন্যাসী না হইলে জ্ঞানলাভ হয় না বলিতেছ, বেশ ত কর্ম্মফলসন্ন্যাস করিতে শেখ দেখি—পরে প্রয়োজন হয় কর্ম্মকেও ত্যাগ করিতে পারিবে। বলিতেছ, নানা প্রলোভনে বেষ্টিত থাকিয়া তাহার প্রভাবকে অতিক্রম করা যায় না—কে বলিল? নিশ্চয়ই যায়—মহাজনগণ তাহার সাক্ষী। হয় না—একথা বলিও না। না হয়, মধ্যে মধ্যে সজনস্থান হইতে নির্জ্জনে গিয়া অভ্যাসের চেষ্টা কর—একটু বলসঞ্চয় করিয়া

সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ কর, আবার বলসঞ্চয় করিয়া এস। সেই ব্রহ্মানুভূতি লাভই ত তোমার আদর্শ—সেই আদর্শ যে কোনরূপেই হউক তোমাকে লাভ করিতেই হইবে। পার ত সরিয়া গিয়া তাহার প্রাণপণ সাধনায় প্রবৃত্ত হও, কিন্তু সাবধান, ভ্রমক্রমেও যেন অনুতাপের দৃষ্টিতে পরিত্যক্ত বস্তুরাজির দিকে তাকাইও না—আর তাহা না পার, যাহা বলিলাম তাহাই করিবার চেষ্টা কর।

সমাজনীতিক্ষেত্রেও যে স্বামিজী পূর্ব্বোক্তনীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা তাঁহার শত শত পত্রাবলি এবং ভারতীয় বক্তৃতাগুলি মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করিলেই প্রতীত হয়। বর্ত্তমান সমাজে শত শত দোষ বিদ্যমান দেখিয়া সংস্কারক অধীর হইয়া সমাজের উপর গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন - ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন দেখিতেছি না, অথচ অব্রাহ্মণে তদুচিত বহুগুণরাজি দেখিতেছি —অতএব জাতিভেদ উঠাইয়া দাও, পরস্পর আদান প্রদান করিয়া বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা কর—বলপূর্ব্বক বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করানতে অনেকে পদস্খলিত হইতেছে, অতএব বিধবাগণকে বিবাহ দাও, স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখাতে ও তাহাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিতা রাখাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের ও মনের দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে, অতএব তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া পুরুষবৎ সর্ব্ববিধ অধিকার দাও, তাহাদিগকে পুরুষলভ্য শিক্ষায় শিক্ষিতা কর। সংসারানভিজ্ঞা বালিকাকে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ না করিয়া সে বিবাহের মর্ম্ম বুঝিলে— স্বেচ্ছায় পতিনির্ব্বাচনের শক্তিলাভ করিলে তাহাকে বিবাহ দাও। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বিজয়পতাকা উড়াইয়া সর্ব্বত্র সামঞ্জস্যের প্রতিষ্ঠা কর। অপরদিগকে রক্ষণশীল সমাজ বলিতেছে, যাহা আমাদের আছে, সব ভাল—'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ'—আমাদের বাপ দাদারা চিরকাল যাহা করিয়া আসিতেছে সেই পথে চলিলেই আমাদের কল্যাণ— নূতন, অনির্দ্দিষ্ট, অপরিচিত পথে না গিয়া, অন্ধকার হইতে হঠাৎ

আলোয় না আসিয়া পরিচিত পথে, চেনা অন্ধকারে চলাই ভাল। স্বামিজী এখানে কি করিতে বলিতেছেন দেখ—

"উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়, অন্য উপায় নাই। ভালমন্দ বিচারের শক্তি সকলের আছে, কিন্তু তিনিই বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া একহস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন। একদিকে গতানুগতিক জড়পিণ্ডবৎ সমাজ, অন্যদিকে অস্থির ধৈর্য্যহীন অগ্নিবর্ষণকারী সংস্কারক; কল্যাণের পথ এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী।" —পত্রাবলি ১ম ভাগ।

এখানেও স্বামিজী মধ্যপন্থারই নির্দ্দেশ করিতেছেন।

আজকাল কোন কোন লেখক স্বামিজীর গ্রন্থের নানা অংশ হইতে উদ্ধৃত করিয়া তিনিও যে তাঁহাদেরই মত একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার প্রবল চেষ্টা করিতেছেন। একরূপ-ভাবে কোন ব্যক্তির বক্তৃতা বা রচনা হইতে নিজ মনোমত স্থানবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে নিজের ইচ্ছামত দাঁড় করান যাইতে পারে—বিশেষতঃ যদি উদ্ধৃতাংশগুলির অধিকাংশই ব্যক্তিবিশেষকে লিখিত পত্রবিশেষের অংশ হয়—যাহা হয়ত লেখকের সাধারণে প্রকাশ করিবার কোন কল্পনাই ছিল না। যদি বলা যায়, তবে কি তিনি প্রকাশ্যে একরূপ ও গোপনে অন্যরূপ মত পোষণ করিতেন? তাহা নহে। তবে সাধারণের নিকট সম্বোধন করিয়া বলিতে গেলে যেরূপ সংযমের সহিত মতামত প্রকাশ করিতে হয়, ব্যক্তিবিশেষকে লিখিত পত্রে সে প্রয়োজনের অভাব। বরং মধ্যপন্থাই যদি তাঁহার যথার্থ অভিপ্রেত হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত অসম্ভব আদর্শের অনুসরণ ও বাস্তবপ্রিয়তা—এই দুইটীর মধ্যে যাহাতে যেটীর অভাব, তাহাকে সেইটীর দিকে জোর দিয়া তবে সাম্যাবস্থায় আনিবার চেষ্টাই স্বাভাবিক। অতিরিক্ত রক্ষণশীল বা গোঁড়াকে উদারভাবের কথা অতিরিক্ত মাত্রায় শুনাইতে হয়, তদ্রূপ অত্যুদারকে সাম্যাবস্থায় আনিতে গেলে তাহাকে রক্ষণ-শীলতার উৎকৃষ্ট দিকটী উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়া দেখাইতে হয়।

রাজনীতিক্ষেত্রেও স্বামিজীর কথিত এই মধ্যপন্থার অনুসরণ প্রযোজ্য। একদল অদূর ভবিষ্যতেই ভারতকে স্বাধীন করিবার—সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক অধিকারের ভাগী করিবার আদর্শে আত্মহারা হইয়াছেন, আর একদল বলিতেছেন, তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা কর, উপযুক্ত হইবার চেষ্টা কর—এখন তোমাদের স্বাধীনতা দিলে তোমরা তাহার মর্য্যাদা রাখিতে পারিবে না। অপরদল উত্তর করেন, আমরা কি ডাঙ্গায় সাঁতার শিখিয়া জলে নামিব? অধিকার পাইলে দেখিবে, আমাদের ভিতরও সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকরী শক্তির প্রকাশ হইয়াছে। আমাদিগকে ভুলভ্রান্তি করিতে দাও—তবে ত আমরা উপযুক্ত হইতে পারিব। এখানেও সত্যটী এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী। উচ্চ আশা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে হইবে—সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যও শিখিতে হইবে, তবেই উন্নতি করিতে পারিবে। আমরা কখনও কিছু করিতে পারিব না, অপরেই চিরকাল আমাদের মুখে খাদ্য তুলিয়া দিবে, ইহাতেও যেমন ক্রমশঃ শক্তিহীনতা আসিয়া চির-বালকত্ব থাকিয়া যায়, পক্ষান্তরে, রাতারাতি একজন অনভিজ্ঞকে রাজ্যশাসনভার দিলেও সেইরূপ রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা অবশ্যম্ভাবী। মনে কর, আমি মনে করিলাম, আমাদের সকলেরই রন্ধন শিখা আবশ্যক—সুতরাং পরিবারের মধ্যে প্রত্যেককেই এক এক দিন রন্ধনের ভার দেওয়া হউক। এইরূপ নিয়ম হইলে অনভিজ্ঞ পাচকের রন্ধনশিক্ষার সুযোগ দেওয়া হইবে বটে, কিন্তু হয়ত মধ্যে মধ্যে উপবাসে দিন যাপন করিতে হইবে। ইহা নিবারণের জন্য কাজ উত্তমরূপে চালাইবার যেমন বন্দোবস্ত রাখা আবশ্যক, তেমনই তৎসঙ্গে সঙ্গে অনভিজ্ঞের শিক্ষারও বন্দোবস্ত থাকা উচিত—কিন্তু একদিনে তাহার হাতে সম্পূর্ণ ভার দেওয়া ভুল। একদিকে যাহাতে সর্ব্বসাধারণের training হয়, শিখিবার opportunity হয় তাহা করিতে হইবে, অন্যদিকে প্রাণপণে efficiency বজায় রাখিতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দের একটী উপদেশকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে গেলে কিরূপ হওয়া সম্ভব তদ্বিষয়ে যে যে কয়েকটী কথা

মনে উদয় হইল, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিলাম। আশা করি, আমাদের দেশের চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দ ও ভবিষ্যতের আশাস্থল যুবকগণ বিশেষ প্রণিধানসহকারে তাঁহার সমুদয় উপদেশ আলোচনা করিবেন, এবং তাহা হইতে নূতন নূতন ভাবরাজি লাভ করিয়া ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে উহাদের প্রয়োগে নিজেদের এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতির কল্যাণের চেষ্টায় নিযুক্ত হইবেন।

ক্রমবিকাশবাদ

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এ)

সমাজের গঠনপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া দেশভেদে ও কালভেদে সমাজ সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তার অভ্যুদয় হইয়াছে। যে ব্যক্তি অতি উন্নত অবস্থা হইতে ভাগ্যবিপর্য্যয়ে দীন দৈন্যদশায় উপস্থিত হয়—আর যে ব্যক্তি অতি দৈন্য দশা হইতে উন্নতি লাভ করিয়া সমাজে বরিষ্ঠ হয়, এতদুভয়ের চিন্তা ও অনুভূতি যে সম্পূর্ণ বিপরীত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কথায় বলে, রাজার ছেলে, হাজার দৈন্যদশায় পড়িয়াও নিজের আভিজাত্য, মর্য্যাদা, সহৃদয়তা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি একেবারে বিস্মৃত হয় না, আর গরীবের ছেলে হাজার বড় হইলেও সহজাত হীনদৃষ্টি, ব্যয়কুণ্ঠতা, হৃদয়হীনতা ও অভিমানের হস্ত হইতে একেবারে অব্যাহতি পায় না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের ক্রমাবনতি (involution) ও ক্রমোন্নতিবাদ (evolution) সম্বন্ধে এই দৃষ্টান্তটী সুষ্ঠু প্রযোজ্য হইতে পারে। অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের মত এই যে, অতিহীন, পাশব ও বর্ব্বরোচিত অবস্থা হইতে যৌন-নির্ব্বাচনে, জীবনসংগ্রামের যোগ্যতায় এবং সুখান্বেষণে শাখামৃগাদি

অবস্থা অতিক্রম করিয়া মানবকুল বর্ত্তমান সভ্যসমাজরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। আর প্রাচ্য পণ্ডিতগণ জলদগম্ভীর স্বরে বলিতেছেন, "তোমরা অমৃতের অধিকারী—কাল ও কর্ম্মবিপর্য্যয়ে তোমরা হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছ—আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া দৈন্যদশায় পতিত হইয়াছ।" সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিরূপ যুগবিভাগ এই ক্রমাবনতি অবস্থার স্মারক ও জ্ঞাপক বলিয়া নির্ণীত হয়।

যে সকল উৎকট দার্শনিক সৃষ্টির একটা আদি কল্পনা করিতে চাহেন, তাঁহারা যে ক্রমসংকোচের বিষয় চিন্তা না করিয়া ক্রমবিকাশের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন ইহা বিচিত্র নহে। বীজাঙ্কুরন্যায়ে প্রাচ্য দর্শন কিন্তু ক্রমসংকোচ এবং ক্রমবিকাশ উভয় দিক্ই দর্শন করিয়াছেন; কিন্তু জীবহিতকল্পে ক্রমসংকোচবাদের পক্ষপাতী হইয়া সমাজের সম্মুখে আদর্শের উচ্চমহিমা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহা আমরা ক্রমেই দেখাইব। আর পাশ্চাত্য জড় দর্শন একমাত্র ক্রমাভিব্যক্তিবাদের পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া আদিসৃষ্টিকল্পনারূপ দোষে ও মহাভ্রমে পতিত হইয়াছে। অলাতচক্রবৎ ঘূর্ণিত এই সৃষ্টিপ্রবাহের আদ্যন্ত নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া পাশ্চাত্য জড়বাদিগণ একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট হইয়াছেন। 'আদিমান্' বলিলেই 'আকস্মিক উৎপত্তি' মানিতে হয়—তা চাই সাংখ্যের 'প্রকৃতি'ই মান অথবা জড়বাদীর 'পরমাণু' বা 'ইলেক্ট্রণ'কেই আদি বলিয়া মান, কিছুতেই আকস্মিক উৎপত্তিরূপ ভ্রমের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। বীজাঙ্কুরন্যায়ে সংকোচ এবং বিকাশরূপ প্রবাহাকারা সৃষ্টি না মানিলে 'আকস্মিক উৎপত্তি'রূপ গ্রাহ-কবল হইতে তোমার মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য উদ্দেশ্য-হীন অন্ধ জড়শক্তির ক্রমবিকাশের কোন অর্থই বুদ্ধিমান্ অনুমান করিতে পারে না। আত্মজ্ঞ প্রাচীন প্রাচ্য ঋষিগণ চৈতন্য হইতেই জগতের অভিব্যক্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং ব্যষ্টি মানবজীবন অথবা সমষ্টি সমাজজীবন উভয়কে আত্মার ক্রমাবনতি অবস্থা বলিয়াই নির্ণয় করিয়াছেন। ইহজগৎসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আবার অতি হীন পশু-পক্ষী-সরীসৃপ অবস্থা হইতে যৌননির্ব্বাচন ও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন-

প্রমাণ অবলম্বনে মানবজীবনের ও সঙ্ঘের ক্রমোন্নতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

এই দ্বন্দ্বমতের কোন্‌টী সত্য—কোন্‌টী প্রমাণের অনুকূল ও গ্রহণীয়, কোন্ মত গ্রহণে মানুষ ক্রমোন্নতির পথে অবাধে অগ্রসর হইতে পারে তাহাই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। প্রত্যক্ষ অনুভূতি ব্যতীত দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা উপপত্তির গ্রহণ হইতে পারে না। আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া অন্তশ্চক্ষুঃ আর্য্যঋষিগণ তাঁহাকে অদ্বয়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই অদ্বয় সচ্চিদানন্দ আত্মাই দেশকালনিমিত্ত বা নামরূপাবলম্বনে আপনাকে যেন দ্বিধা করিয়া (তদাত্মানং স্বয়ং ব্যকুরুত) দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে অবস্থান করিতেছেন। আপনাকে বলিদান করিয়া (দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া) ব্রহ্মা এই সৃষ্টি প্রকটন করিয়াছেন, ইহাও বেদে উক্ত হইয়াছে। জীবের যথার্থ স্বরূপ যদি নির্লেপ আত্মাই হন, তবে ব্যষ্টি বা সমষ্টি মানবজীবন যে অচ্যুত আত্মার স্বরূপ-বিচ্যুতি ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া 'আদম্-ইভের' যে পতন তাহাও জীবের স্বরূপবিচ্যুতির প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আত্মার এই দ্বিধা পরিণতি যদি সঠিক সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তবে বলিতে হইবে যে জীব স্বরূপবিচ্যুত হইয়া হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। আত্মার যেন ক্রমসংকোচাবস্থা (involution) উপস্থিত হইয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রমতে এই আত্মাই যদি জীবের যথার্থ স্বরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তবে ক্রমাবনতি বা ক্রমসংকোচবাদই প্রতিষ্ঠার যোগ্য। স্বরূপবিচ্যুতির শতসহস্র দৃষ্টান্ত দ্বারা ঋষিগণ প্রমেয় আত্মার যাথার্থ্য যেরূপে দৃঢ়স্থাপন করিয়াছেন শাস্ত্রজ্ঞগণ তাহা অবশ্যই জানেন। আমার বক্তব্য এইমাত্র যে, অচ্যুত আত্মা স্বরূপতঃ যদি বিচ্যুতই হইয়া থাকেন তবে ক্রমাবনতিবাদ প্রমাণযোগ্য হইবে। আর জড়ের পরিণমন দ্বারা যদি আত্মার (চৈতন্যের) বিকাশ হইয়া থাকে

তবে ক্রমোন্নতিবাদই সিদ্ধ হইবে। কিন্তু জড় হইতে চৈতন্যের বিকাশ হইয়াছে, একথা কোন জড়বাদী আজ পর্য্যন্ত প্রমাণ করিতে পারেন নাই। জড় ও চৈতন্য যদি পৃথক্ সত্তা বলিয়া কথিত হয়, (যাহা সাংখ্য শাস্ত্রেরও অভিমত) তবে একে অন্যাশ্রিত ও অন্যাভিভূত হইতে পারে মাত্র; স্বরূপসত্তা কেহই ছাড়িতে পারে না—উভয়ের অনাদি পৃথক্ত্বই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বেদান্তমতে আবার "একমেবাদ্বিতীয়ং"এই প্রতিজ্ঞার সার্থকতা প্রমাণ করিতে জড় ও চৈতন্য বলিয়া কোন বিভিন্ন সত্তা স্বীকৃত হয় নাই। ইঁহারা বলেন, চেতন ভিন্ন দ্বিতীয় সত্তা না থাকায়, ভ্রমবশেই দ্বৈতসত্তা কল্পিত হইয়া থাকে। সাংখ্য মতে জড় (প্রকৃতি) ও চৈতন্য (পুরুষ) অনাদি সত্তাদ্বয় (eternal entities) স্বীকৃত হওয়ায়, জড় হইতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইয়াছে, (যাহা পাশ্চাত্য জড়বাদিগণের মত) এরূপ অনুমান করা যায় না। বেদান্ত মতে ব্যবহারকল্পে একই চেতনাত্মা দ্রষ্টা ও দৃশ্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন। জড় দৃশ্য—চেতন দ্রষ্টা।

চৈতন্য ভিন্ন জড় স্বয়ং কার্য্যক্ষম হয় না—ইহা যদি সত্য হয়, তবে জড় হইতে দ্রষ্টা আত্মার অভিব্যক্তি হইতে পারে না। অনাদি চেতন বা আত্মা অনাদি কাল হইতেই বর্ত্তমান আছেন। যদি বল, জড় পরিণাম প্রাপ্ত হইতে হইতে চেতনের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তবে আমরা বলিব, জড়কে পরিণাম প্রাপ্ত করাইতে পারে এমন দ্বিতীয় পদার্থ নাই। আপন স্বভাবে জড়পরমাণু বা electrons স্পন্দিত বা চালিত হয়—এরূপ বলিলে বলিব, এ বিষয়ে সমদৃষ্টান্তের একান্ত অভাব। দ্রষ্টা নাই অথচ দৃশ্য আছে—এমন দৃশ্য থাকা না থাকা সমান। দ্রষ্টা (চেতন) যদি জড়ের অভিব্যক্তিক্রমে জন্য বা উৎপন্ন সত্তা হয়, তবে দ্রষ্টা জন্মিবার পূর্ব্বের অভিব্যক্তি অনুমানের অযোগ্য হইয়া পড়ে। উৎপন্ন পদার্থ ধ্বংসশীল হওয়ায় চেতনের নিত্যত্বও অস্বীকৃত হইয়া পড়ে। জড়োৎপন্ন বলিয়া অন্তে সকলি জড়েতে লয় হইবে, এইরূপ উপপত্তি সিদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে, চেতনবাদ সমর্থনে বলা যাইতে পারে যে, চেতন হইতেই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়া অন্তে

চেতনে লয় প্রাপ্ত হয়। উভয় সিদ্ধান্ত সমবল হইলেও শ্রুতিসিদ্ধান্ত চেতনবাদেরই অনুকূল। জড়বাদের সিদ্ধান্ত স্বাধীনতর্কপ্রতিষ্ঠিত। যাহাহউক, আমরা এপর্য্যন্ত বুঝিলাম যে, প্রাচ্য সিদ্ধান্ত চেতনবাদের উপর, আর পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত জড়বাদের উপর উপস্থাপিত।

এখন দেখা যাক্, এই জড় ও চেতনবাদ হইতে ক্রমোন্নতি এবং ক্রমাবনতিবাদ কিরূপে বিস্তার লাভ করিয়াছে। প্রাচ্য দর্শন মতে অনাদি কাল হইতেই জীব, সমাজ, সঙ্ঘ, আচার, নীতি ও ধর্ম্মশাসন সত্যাদর্শে পূর্ণভাবে বিরাজমান ছিল—প্রাকৃতিক বা যৌন-নির্ব্বাচন প্রভৃতি কল্পিত নিয়মে তাহা ক্রমে গড়িয়া উঠে নাই। জীব ও সমাজ ক্রমে কর্ম্ম ও উপাসনাভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হইতে হইতে হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। অচ্যুত জ্ঞানাবস্থা হইতে বিচ্যুত জীবাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। সত্য ত্রেতাদি যুগবিভাগ এবং তত্তং যুগের মানব ও সমাজজীবনের বর্ণনা তাহাই প্রমাণ করে। পুরাণোক্ত সৃষ্টিপ্রকরণে দেখা যায়, সনকাদি ব্রহ্মার মানসপুত্রচতুষ্টয় জন্মগ্রহণ করিয়াই তপস্যানিরত—ক্রমে ব্রহ্মলীনতা প্রাপ্ত হইতেছেন। পরে প্রবৃত্তিমুখে অবস্থিত মন্বাদি প্রজাপতিগণ দ্বৈতসৃষ্টিকল্পে দ্বৈতমুখে উপস্থিত হইয়াও তপঃসম্পন্ন প্রজাসকল সৃষ্টি করিলেন; তাহা দ্বারা মানব, সমাজ ও ও সঙ্ঘের অতি উচ্চ অবস্থাই সূচনা করে। মরীচি, কশ্যপ প্রভৃতি দ্বারা সৃষ্ট জীবকুল, মৃগ, সর্প, পশু, পক্ষী, মানব, দেবতা প্রভৃতি ক্রমস্তরে সজ্জীভূত পৃথক্ পৃথক্ই দেখিতে চাই। ক্রমোদ্বর্ত্তন হিসাবে তাহাদের পরিণমন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মনুষ্যেতর প্রাণী মাত্রই "ভোগ শরীর" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় মনুষ্য ঐ সকল শরীর অবলম্বনে ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না। প্রলয়া-বস্থায় সৃষ্টির বিভিন্ন বীজ ব্রহ্মে কারণরূপে সঙ্কুচিত হইয়া থাকার কথা শ্রুতিমুখে অবগত হওয়া যায়। ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, শাখামৃগ, মানব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, দেবতাদিরূপ প্রকৃষ্ট বিভাগের বীজ ব্রহ্মেই কারণরূপে অবস্থান করে।

সৃষ্টি বিজৃম্ভিত হইবার কালে জীবজন্তু, স্থাবরজঙ্গম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকশিত হয়। জীবকুল ভিন্ন ভিন্ন শরীর ও ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। ক্রমোদ্বর্ত্তন দ্বারা এক হইতে অন্যে পরিণত হয় না। হিন্দুশাস্ত্রমতে এইজন্য মানব বা সমাজের অভ্যুদয়ে যৌননির্ব্বাচন বা যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন রূপ কাল্পনিক নিয়মপ্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না। সত্য, জ্ঞান, সংযম, তপস্যা, অহিংসা, দান, তিতিক্ষা যে আদিসৃষ্ট মানবের নিত্যসহচর, সে মানবসমাজে জীবনসংগ্রামের উদ্ভট কল্পনা যে একেবারেই স্থান পাইতে পারে না, তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারেন। পূর্ব্বকথিত আর্য্যসিদ্ধান্ত যদি সত্য বলিয়া সমাদৃত হইবার যোগ্য হয়, তবে সৃষ্টির প্রথমে প্রকটিত মনুষ্যসমাজ অত্যুন্নত অবস্থাদ্যোতক হইবে এবং আমরা যে কাল এবং যুগ বিপর্য্যয়ে ভ্রষ্টমতি হইয়া হীনাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর তখন যে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করিবার জন্য সমাজে নীতি, রাজশাসন ও ধর্ম্মশাসনের অভ্যুদয় হয় নাই ইহাও নিশ্চিত। দুর্ব্বল, দুর্নীতিপরায়ণ জনসমাজকে বিভীষিকা প্রদর্শন করাইয়া শাসনে রাখিতে হয়, কিন্তু সবল ও সরলমনা জনগণের জন্য উক্তরূপ কঠোর শাসনের প্রয়োজন নাই। সুতরাং আদিসৃষ্ট জ্ঞানপ্রতিষ্ঠিত মানবসমাজে জীবনসংগ্রামের কল্পনা হয় না—ব্যক্তিগত ও সমাজগত চরম স্বাধীনতা তখন চিরপ্রতিষ্ঠিত।

যে সমাজে সকলেই নিজ নিজ গন্তব্য পথে, ধর্ম্ম পথে, সত্য পথে অবস্থিত যে সমাজে প্রথমাবস্থা হইতেই প্রজ্ঞার অক্ষুণ্ণ রাজত্ব, সে সমাজে আত্মজীবন বা জাতীয় জীবন রক্ষাকল্পে মানবেতর প্রাণীর ন্যায় জীবনসংগ্রামের উদ্যোগ নাই। ইতর জীবের অভ্রান্ত সংস্কারের ন্যায় অত্যুন্নত অভ্রান্ত আদর্শজ্ঞান প্রাচীন মানবকুলকে সর্ব্বদাই উন্নতির পথে পরিচালিত করে। সেই সমাজের স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ—কাহাকে কোথাও ঠেকিয়া শিখিতে হয় না। যৌননির্ব্বাচনে অমানুষ কখন মানুষ হইতে পারে না; বরং উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতায়, জঘন্য যৌন-নির্ব্বাচনে মানুষ ক্রমে অমানুষ ও পশুত্বে পরিণত হয়। পাশবাবস্থায়

নির্ম্মম নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বযুদ্ধ জীবনের অভিব্যক্তিদ্যোতক হইলেও প্রাচীন আর্য্যসমাজে সে দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিকাশ দেখা যায় না। বরং দেবাসুরাদির সংগ্রাম ক্রমনিম্ন স্তরেই দৃষ্ট হয়। এইজন্য বলিতে হয় ক্রমাবনতি-পথেই ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধের সূচনা হইয়াছে।

হারবার্ট স্পেন্সার প্রমুখ জড়বাদী পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাজা বা বলবানের ভয়ে সমাজের দুর্ব্বল লোকগণ তাঁহাকে ভয় করে, পূজা করে, দেবতা বলিয়া সম্মান করে। ইহা হইতে কালে ঈশ্বরারাধনার সূত্রপাত হইয়াছে। এ দেশীয় মতে রাজা হইতেছে সমগ্র প্রজাশক্তির সংহতবিগ্রহ—"অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভিঃ নির্ম্মিতো নৃপঃ।" চণ্ডীতে দৃষ্ট হয়, সমস্ত দেবগণের সংহতশক্তি হইতে দেবী উৎপন্না হইয়াছেন ; রাজাও তেমনি প্রজাশক্তির স্ফুরদ্‌বিগ্রহরূপে উদিত হন। তিনিও আবার ব্রহ্মণ্যশক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রাজশক্তি সর্ব্বদাই প্রজাগণের অভ্যুদয়ে পরিচালিত। "প্রজানামেব ভূত্যর্থং" ইত্যাদি উক্তি তাহার প্রমাণ। প্রাচীন হিন্দুসমাজের আদর্শ দেখিয়া মনে হয় না যে ক্রমবিবর্ত্তন দ্বারা সমাজে রাজাপ্রজারূপী ব্যবস্থার অভ্যুদয় হইয়াছিল। যে প্রাচীন আর্য্যসমাজে চৌর্য্য, দ্যূত, পরপীড়ন, ব্যভিচার প্রভৃতির প্রাবল্য দৃষ্ট হয় না—পক্ষান্তরে, যে সমাজে ধর্ম্ম ও নীতি ভিত্তিস্থানীয় সেখানে কোনরূপ দৌর্ব্বল্য বা ক্লীবতার প্রভাব কল্পনা করা যায় না। প্রজাকুল ভয়ে ভয়ে রাজাকে মান্য দিতে সমাজবদ্ধ হয় নাই। বরং সমুন্নত প্রাচীন মানবসমাজ রাজাকে নীতি, ধর্ম্ম ও মর্য্যাদার ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করিয়া, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সমধিক প্রসারই দিয়াছিলেন। সুতরাং অভিব্যক্তিবাদের সিদ্ধান্ত দর্শনে ইহাই অনুমিত হয় যে, পাশ্চাত্য জগতেই ঐরূপ রাজা ও ঈশ্বর ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকিবে। ভারতবর্ষে কেবল পাশববলে বলীয়ান্ রাজার অভ্যুদয় হয় নাই ; কারণ, এদেশে রাজা ধর্ম্মের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ বলিয়া এখনও পূজিত হন—তাঁহার দর্শন পুণ্যদর্শন বলিয়া কথিত হয়। প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাব অনাদিকাল হইতেই সমাজের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের মতে কিন্তু ভারতবর্ষে

নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মভাবই ব্যক্তি ও সমাজে প্রথম স্ফুরিত হইয়াছিল। যুগবিপর্য্যয়ে তপঃপ্রভাবহীন মানব ক্রমাবনতি পথে ক্রমে প্রবৃত্তির দাস হইয়া অধঃপতিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জড়বাদিগণ ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।

ক্রমোন্নতিমুখে সমাজের গঠন, নীতি ও ধর্ম্মনামক কাল্পনিক শাসনের ক্রমাভ্যুদয় প্রভৃতির বর্ণনায় যে জড়বাদী পাশ্চাত্য দর্শন পরিপূর্ণ ইহা প্রায় সকলেই জানেন। সেই সকল মত বিস্তৃতভাবে এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। মারামারি কাটাকাটি করিয়া মনুষ্যেতর প্রাণী যে জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত রহিয়াছে ইহা আংশিক স্বীকার করিলেও মানবসমাজে তাহার সমর্থন দৃষ্ট হয় না। নিরীশ্বর সাংখ্যকারও তাহা স্বীকার করেন না। ঔপপাদিক জন্ম বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন সংস্কারে, বিভিন্ন দেহেই সংঘটিত হয়, ইহাই সাংখ্যের অভিমত। জাত্যন্তরপরিণাম যৌননির্ব্বাচন দ্বারা অথবা যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন দ্বারা সংসাধিত হয় না। সাধনাপ্রসূত ওজঃশক্তির প্রাবল্যে তাহা সম্পাদিত হয়, ইহাও সাংখ্যশাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা দার্শনিক চিন্তার স্মারক হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য সভ্য জগতের প্রাচীন ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গর্ত্তমধ্যে বাস করিত—বিচিত্র রঙ্‌ বেরঙে দেহ রঞ্জিত করিত, আমমাংশ আহার করিয়া মনুষ্যেতর জীবের ন্যায় জীবন যাপন করিত—শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে পুনঃ পুনঃ রক্ষা করিতে যাইয়া ক্ষাত্রতেজ প্রাপ্ত হইত—নৌশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, জলযাননির্ম্মাণে ও নৌবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিত। ইদানীন্তন সভ্য পাশ্চাত্য সমাজে ঐ সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার স্মারক চিহ্ন অদ্যাপিও বহুধা বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। তবে কাল-ক্রমে সর্ব্ববিষয়েই উন্নতির চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষের আদিম সভ্যসমাজের আহার, বিহার, সংযম, মিতাচারিতা, আত্মতত্ত্বলাভের জন্য তীব্র বৈরাগ্য ও তপস্যা প্রভৃতি আজিও ভারতের অতীত গৌরব কাহিনী স্মৃতিপথে উদিত করে—আজিও

হিন্দুসমাজে ঐরূপ আদর্শ লাভ করিতে ব্যগ্রতা দৃষ্ট হয়; আর ঐ সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থার ক্ষীণালোক এখনও হিন্দুসমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশ, শারীরিক বলকে জীবনের প্রধান অবলম্বন জ্ঞান করিয়া সেই শক্তির বহুধা উন্মেষে যে শত শত উদ্যম দেখাইতেছেন—জলস্থলে কত নিধনাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া যে ঐহিক জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতেছেন—তাহা সকলেই জানেন। আধ্যাত্মিক শক্তিমান্ প্রাচীন ভারতের ঋষিবংশোৎপন্ন মানবকুল এখনো কিরূপ তপোনিষ্ঠ হইয়া জীবনমরণসমস্যা ভেদ করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহাও পাঠকগণ অবশ্য জানেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাশ্চাত্যগণ আপনাদিগকে প্রতাপান্বিত বীর্য্যবান্ দেশজয়ী সৈনিক, সেনাপতি বা দস্যুদলপতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিলে কৃতার্থ হয়। আর ভারতের অধিবাসিগণ আপনাদিগকে তপঃসিদ্ধ মনু, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, চন্দ্র ও সূর্য্যের বংশধর বলিয়া নির্ণয় করিয়া আনন্দ লাভ করেন। ইহাও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিণামফল বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়।

আর একটী কথা এই যে, সকল দেশেই প্রাচীন আচারের কিঞ্চিদাভাস এখনও সমাজে প্রচলিত দৃষ্ট হয়। দেশভেদে ইহা ভিন্নাকারে ব্যাখ্যাত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রথম দর্শনের মিলনচুম্বন তদ্দেশীয় প্রাচীনকালের মাংসলোলুপতার চিহ্ন, অথবা করমর্দ্দনপ্রণালী প্রাচীনকালের হাতাহাতি লড়াইয়ের পরিচায়ক, অথবা বিবাহকালে জুতা ছোড়াছুড়ি সেকালের বলপূর্ব্বক কন্যাহরণের তুমুল সংগ্রামের অবশিষ্ট আচার! পাশ্চাত্য জড়বাদিগণ এই সকল আলোচনা করিয়া বলেন যে প্রাচীনকালের জীবনসংগ্রামের এইগুলি বিশিষ্ট পরিচায়ক। ভারতবর্ষে প্রচলিত ইদানীন্তন অনেক আচারপ্রণালীও তদ্রূপ এতদ্দেশীয় মতবাদের অনুকূলে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ভগবচ্চরণে কায়মনোবুদ্ধি অর্পণ বা সর্ব্বভূতে আত্মার অখণ্ড অবস্থান দর্শন হইতে নমস্কার প্রথার প্রচলন—সর্ব্বদা উত্তরীয় বস্ত্র ধারণের অসুবিধা হইতে ত্রিদণ্ড পৈতাধারণ প্রথার প্রচলন—মৃগমাংস, কুশাসন, ঘৃতাদির প্রাচীন যজ্ঞাদিতে প্রচলন থাকা হইতে ইদানীং উহাদিগকে

পবিত্র বলিয়া গ্রহণ—জগৎকে আপনার করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে নিজকুল বা গোত্রে বিবাহ না করিয়া অতিদূর ভিন্নকুলগোত্রে বিবাহ-করণ প্রভৃতি আচার ব্যবহারের মূলে জীবনসংগ্রামের কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে, এই সকল আচারের মূলেও উন্নত সমাজের ধর্ম্মলিঙ্গ অনুমিত হয়। প্রতীচ্য দেশে আচারগুলি সমাজের অলঙ্কার বলিয়া কথিত হয়। এ দেশে কিন্তু সমাজ ও জীবনের উন্নতিকল্পেই তাহাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। কারণ, তাহাদের অবলম্বনে মানুষ ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্তরে সমারূঢ় হইতে পারে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশের ক্রমসংকোচ ও ক্রমবিকাশবাদ কতদূর সত্য তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া লইবেন। আমরা উভয় দেশের মতগুলি যথান্যায়ে উপন্যস্ত করিয়াছি মাত্র। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই মতদ্বয়ের কোন্‌টী প্রচারের এবং কোন্ মত অনুসরণে জীব ও মানবসমাজ উন্নতির দিকে দ্রুত অগ্রসর হইবার যোগ্য হয়? যাঁহারা amœba (কীটাণু) হইতে যৌননির্ব্বাচনে বা যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনে ক্রমে আপনাদিগকে মহাবল প্রাণী বলিয়া মনে করেন—অথবা যাঁহারা আপনাদিগকে তপঃসিদ্ধ ঋষি ও দেবতার বংশধর বলিয়া জানেন এবং আপনাদের প্রাচীন গৌরবলাভের জন্য ঘোর তপশ্চর্য্যা ও সংযম অভ্যাস করেন—যে আদর্শ জীবকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে সাহায্য করে, সমাজে ও ব্যক্তিতে প্রাণসঞ্চার করে, আপনার স্বরূপে পুনঃস্থাপন করিতে চায় তাহাই উত্তম, অথবা যে আদর্শ সম্মুখে ও পশ্চাতে কেবল জীবনমরণের সংগ্রামবিভীষিকা প্রদর্শন করে—এ জীবনের চরমাভিব্যক্তি কোথায় কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারে না, নীতি এবং ধর্ম্মকে লোকস্থিতির তুচ্ছ কারণ বলিয়া যৌননির্ব্বাচন ও যোগ্য-তমের উদ্বর্ত্তনকে মূল ভিত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করে—তাহাই উত্তম? যে আদর্শে নবীন পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই নরশোণিতে ইউরোপ প্লাবিত করিয়া উহাকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে, সেই আদর্শ যদি ক্রমোন্নতিমূলক হইয়া থাকে তবে সেই ক্রমোন্নতিবাদকে দূর হইতেই নমস্কার! আর যে আদর্শে ভারতবর্ষ শত শত বৎসরের

অত্যাচার ও পরাধীনতা সত্ত্বেও আপনাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া জীব ও সমাজকে উচ্চ আদর্শের দিকে চালিত করিয়া আসিতেছে, সেই আদর্শ যদি ক্রমসংকোচবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহাই আমাদের গ্রহণযোগ্য হইবে।

স্বগৃহে শঙ্কর।

রাজসমাগম।

(শ্রীমতী—)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাজশেখর একজন অসাধারণ গুণগ্রাহী বিচক্ষণ রাজা ছিলেন। তিনি বালক শঙ্করের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মন্ত্রি, বল কি, সেই বালক তোমাদের দেখিয়া একটু ভীত বা সঙ্কুচিত হইল না! নির্ভীক ভাবে তোমাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিল! আবার আমার দত্ত উপঢৌকনাদি বেশ যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিয়া আমাকেই প্রত্যর্পণ করিল! আট বৎসরের বালক একটু ভীত হইল না! বালক বলিয়া হয়ত আদেশ লঙ্ঘনের কি প্রতিফল তাহা না জানিতে পারে, কিন্তু বহুমূল্য দ্রব্যাদি দেখিয়া সে কিছুমাত্র প্রলুব্ধ হইল না! বল কি, এত খুব অদ্ভুত! এ বালক দেখিবার পাত্র বটে। আমি ইহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি। যদি সে একান্তই না আসে, চলুন আমরাই গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসি।"

মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! সেই কথাই ভাল। দেখুন, বালকটীকে যেরূপ দেখিলাম তাহাতে সে যথার্থই একটী দেখিবার বস্তু। মহারাজ, তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার সেই পুরাণবর্ণিত শুকদেবের কথা স্মরণ হইতেছিল।"

অনন্তর মহারাজ রাজপণ্ডিতকে বালকের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজপণ্ডিত কহিলেন, "মহারাজ! বালকটীকে যে সকল গ্রন্থাদি

আলোচনা করিতে দেখিলাম, তাহাতে তাহাকে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন দেখিলাম না। আমি শুনিয়াছি বালকটী শ্রুতিধর দুই বৎসরে গুরুগৃহ হইতে সমগ্র শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া আসিয়াছে। বালক যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।" কেরলরাজ ইহা শুনিয়া সাগ্রহে পুনরায় কহিলেন, "মন্ত্রিবর! চলুন, আমরাই বালকটীকে দেখিয়া আসি। আমি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের গৃহে গমন করিলে আমার কোনরূপ মর্য্যাদাহানি হইতে পারে না। অতএব দিন স্থির করুন, শীঘ্রই আমি যাইব"।

এইরূপ স্থির করিয়া কেরলরাজ অন্তঃপুরে গমন করিলেন। মহারাণী সমুদয় শুনিয়া আনন্দিতা হইলেন বটে কিন্তু তিনি বালকটীকে দেখিতে পাইবেন না ভাবিয়া দুঃখিতা হইলেন এবং বিষণ্ণভাবে মহারাজকে বলিলেন, "মহারাজ! তবে আমার ভাগ্যে তাহার দর্শন আর ঘটিল না! তা আপনই দেখিয়া আসুন।"

মহারাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "রাণি, দুঃখিতা হইও না, আগে আমি দেখি, পরে যদি সম্ভব হয়, তোমারও দেখিবার ব্যবস্থা করিব।"

অনন্তর একদিন মহারাজ রাজশেখরের কালাডিগ্রাম গমনের দিন স্থির হইল। মহারাজের আগমনে কালাডিগ্রামে প্রজাবর্গের মধ্যে যদি কোনও উদ্বেগ জন্মে, এজন্য মহারাজ অপর রাজকর্ম্মচারী কাহাকেও সঙ্গে লইলেন না। কেবল মন্ত্রিবরকে সঙ্গে লইয়া সাধারণ ভদ্রব্যক্তির ন্যায় হস্তিপৃষ্ঠে গমন করিলেন। গমনকালে শঙ্করের জন্য দশ সহস্র সুবর্ণমুদ্রা মন্ত্রীকে সঙ্গে লইতে বলিলেন, এবং নিজে স্বরচিত তিনখানি নাটক লইলেন। যথা সময়ে মহারাজ কালাডিগ্রামে প্রবেশ করিলেন এবং মন্ত্রিসহ একেবারে শঙ্করভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মন্ত্রিবরের কালাডি আগমনের পর হইতেই গ্রামবাসী অনেকেই পুনরায় রাজবাহিনীর আগমন আশঙ্কা করিতেছিলেন। সুতরাং মহারাজ একাকী আসিলেও গ্রামে হস্তী প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সকলে পূর্ব্বের ন্যায় জনতা করিয়া পশ্চাৎ আসিতে লাগিল।

জননীমুখে শঙ্কর এই অভ্যাগতদ্বয়ের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সত্বর গৃহদ্বারে আসিলেন এবং মন্ত্রিবরের সঙ্গী যে মহারাজ ইহা অনুমান করিয়া তাঁহাদিগকে সাদরে গৃহে লইয়া গেলেন। বিশিষ্টাদেবী ইতিমধ্যেই ইঁহাদিগের জন্য আসন বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শঙ্কর মহারাজকে আসন গ্রহণে অনুরোধ করিয়া স্বয়ং নিজ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। মহারাজ ও মন্ত্রিবর শঙ্করকে প্রবীণ পণ্ডিতোচিত সম্মানে অভিবাদন করিয়া অবনতমস্তকে প্রণাম করিলেন। শঙ্করও তদুচিত আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শঙ্করসম্মুখে উপবেশন করিয়া মহারাজ পরম আনন্দ অনুভব করিলেন। মন্ত্রিমুখে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর মহারাজ শঙ্কর যে বালক একথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গেলেন। তিনি যে বিষয়েই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, শঙ্কর সেই বিষয়ের সরল ও বিশদ উত্তর প্রদানে তাঁহাকে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত করিতে লাগিলেন। ফলে, মহারাজ এতই পরিতৃপ্ত হইলেন যে, সঙ্গে আনীত দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা সমুদয়ই শঙ্করের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে উহা গ্রহণের জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করিলেন।

শঙ্করও তদ্দর্শনে একটু হাসিয়া অতি বিনীত ভাবে কহিলেন, "মহারাজ! এসব কেন; আমি ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ, আমার ইহাতে প্রয়োজন কি? আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ আমার পূর্ব্বপুরুষগণকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে আমার ও আমার জননীর কোনই অভাব নাই।" মহারাজ কহিলেন, "মহাত্মন্, আপনি গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিয়াছেন, যথাসময়ে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ধনের অসচ্ছলতা থাকিলে বিদ্যাবুদ্ধি সবই নিষ্প্রভ হইয়া যায়। অত্যন্ত পণ্ডিতেরও মোহ উৎপন্ন হয়। সুতরাং আপনি ইহা প্রত্যাখ্যান করিতেছেন কেন?"

শঙ্কর বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য ও তাহা আপনাতেই শোভা পায়; কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, অভাব না

থাকিলে গ্রহণ করা কেন? ধনের অর্জ্জনে দুঃখ, রক্ষণেও দুঃখ, তাহার পর, মানব প্রারব্ধানুসারে বিত্তাদি লাভ করে। আমার যাহা প্রাপ্য তাহা আমি পাইব, উপস্থিত ত ইহার প্রয়োজন নাই; সুতরাং কিছু গ্রহণ করিয়া উহার রক্ষণচিন্তায় যতটুকু সময়ক্ষেপ করিব ততটুকুই বা শাস্ত্রার্থচিন্তায় বঞ্চিত হই কেন? ভবিষ্যতের অভাব আশঙ্কা করিয়াও গ্রহণ অনাবশ্যক। কারণ, যাহা হইবার তাহা হইবে। আপনার নিকট হইতে যদি আমার প্রাপ্য হয়, তখন আপনিই আমাকে দিবেন এবং আমিও লইবার ইচ্ছা করিব। আপনি এই বিপুল অর্থ আমাকে দিলে উপযুক্ত দরিদ্র পাত্র এই ধনে বঞ্চিত হইবে। সুতরাং আপনি অভাবগ্রস্ত যোগ্যপাত্রে ইহা দান করুন, তাহাতেই আপনার প্রভূত পুণ্য হইবে। আমাকে দিলে আপনার তত পুণ্য হইবার সম্ভাবনা কোথায়?"

শঙ্করবাক্যে মহারাজ একটু লজ্জিত হইলেন এবং বালকের নির্লোভিতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তিনি পুনরায় কহিলেন, "মহাত্মন্! তবে উহা আপনি উপযুক্ত পাত্রে দান করুন, তাহাতেই আমার আনন্দ হইবে।"

শঙ্কর তখনও অবিচলিত। তিনি বলিলেন, "মহারাজ! ধনদান ক্ষত্রিয় বা রাজাদিগের ধর্ম্ম। আমরা ব্রাহ্মণ, বিদ্যাদান জ্ঞানদানই আমাদের ধর্ম্ম। সুতরাং এ কার্য্য আপনি করিলেই সঙ্গত হইবে। কারণ, আপনি রাজা, দানের পাত্রাপাত্র জ্ঞান আমাপেক্ষা আপনারই ভালরূপ থাকিবার কথা।"

শঙ্করের দৃঢ়তা দেখিয়া রাজা অতিশয় বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। কেবল তাহাই নহে। বালক শঙ্করের প্রবীণোচিত বাক্যাবলী শ্রবণে মহারাজ কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তিনি বুঝিলেন, শঙ্কর রাজধর্ম্মেও অজ্ঞ নহেন।

ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তার পরে মহারাজ একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মন্ত্রীকে কহিলেন, "মন্ত্রিবর! আহা, এরূপ সৎপাত্রে আমি কিছু দান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিলাম না, ইহা আমার বড়ই

দুর্ভাগ্য! ইঁহার জনকজননী ধন্য যে তাঁহাদের এরূপ পুত্ররত্ন লাভ হইয়াছে।”

শঙ্কর কেরলরাজকে দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন, “মহারাজ! আপনি দুঃখিত হইবেন না। ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গই সদ্‌ব্রাহ্মণদিগের জীবন। আমাদের অভাব হইলে সর্ব্বাগ্রে আপনাকেই জানাইব। ভগবান্ প্রজাবর্গের ধন রাজার নিকটই গচ্ছিত রাখিয়া থাকেন, রাজাই প্রজার অভাব মোচন করিয়া থাকেন। সুতরাং আপনি আপনার ধনে অভিমান ত্যাগ করুন, তাহা হইলে আপনি সুখী হইবেন।”

ইতিমধ্যে মহারাজের স্বরচিত নাটক তিনখানির কথা সহসা মনে পড়িল। শঙ্কর যোগ্যপাত্র বলিয়া বিবেচিত হইলে উহা তাঁহাকে পাঠ করিতে দিবেন ভাবিয়াই তিনি উহা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এক্ষণে গ্রন্থ কয়খানি হস্তে লইয়া অতি বিনীতভাবে শঙ্করকে কহিলেন, “মহাত্মন্! ক্ষুদ্রকাব্য রচনায় আমার বড়ই আগ্রহ, এবং সামর্থ্য না থাকিলেও আমি বালরামায়ণ, বালভারত প্রভৃতি তিনখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়াছি। আপনার ন্যায় পণ্ডিত ইহা পাঠ করিয়া যদি ইহাকে প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করেন তবেই আমি কাব্যকয়খানি লোকসমাজে প্রচারিত করিব। অতএব আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া কাব্যকয়খানি দৃষ্টিপূত করেন, তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হইব।”

মহারাজের বাক্যে শঙ্কর অতি আগ্রহসহকারে বলিলেন, “মহারাজ আপনার ন্যায় পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক রাজা যখন ইহা রচনা করিয়াছেন তখন ইহা ভালই হইবে; তথাপি আপনার ইচ্ছামত আমি উহা যত্নসহকারে পাঠ করিব।”

মহারাজ বলিলেন, “মহাত্মন্, যদি অনুমতি করেন, তবে আমি নিজেই উহা পাঠ করিয়া আপনাকে শুনাই।”

শঙ্কর বলিলেন, “উত্তম কথা। আপনার রচনা আপনি পাঠ করিলে যত মধুর হইবে অন্যথা সেরূপ সম্ভব নহে।”

শঙ্করবাক্যে মহারাজ সোৎসাহে গ্রন্থগুলি আবরণমুক্ত করিলেন এবং পুনরায় শঙ্করের অনুমতি লইয়া পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে একখানি গ্রন্থ শেষ করিয়া মহারাজ শঙ্করের মতামত জানিতে চাহিলেন। শঙ্করও তাহার সমালোচনা করিয়া গ্রন্থকারের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। মহারাজ তখন আনন্দিত মনে দ্বিতীয় কাব্যখানি পাঠের উপক্রম করিলেন।

এদিকে ক্রমে দিবা অবসানপ্রায় দেখিয়া মন্ত্রিবর কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া মহারাজকে বলিলেন, "মহারাজ, সায়ংসন্ধ্যার কাল সমাগতপ্রায়। অতএব অন্য দিন নির্দ্ধারিত করিলে ভাল হয় না কি?"

মন্ত্রিবাক্যে মহারাজ যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "মন্ত্রি, ঠিক বলিয়াছ, আমি পাঠের আগ্রহে দিবা যে অবসানপ্রায় তাহা লক্ষ্য করি নাই।

এই বলিয়া মহারাজ শঙ্করকে বলিলেন, "যদি অনুমতি করেন দিনান্তরে অপর গ্রন্থদ্বয় শ্রবণ করাইব।" শঙ্কর বলিলেন, "মহারাজের যেরূপ ইচ্ছা, আমি আপনার অবশিষ্ট গ্রন্থদ্বয় শ্রবণে বিশেষ উৎসুক রহিলাম।"

অতঃপর পরস্পরে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক মহারাজ মন্ত্রিসহ শঙ্করকে প্রণাম করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। শঙ্করও মহারাজকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বিদায় প্রদান করিলেন।

মহারাজ পূর্ব্বকথামত পুনরায় একদিন মন্ত্রিসহ শঙ্করভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অবশিষ্ট কাব্য দুইখানি পাঠ করিয়া তাঁহাকে শ্রবণ করাইলেন।

শঙ্কর সমগ্র গ্রন্থ দুইখানি শ্রবণ করিয়া কহিলেন "মহারাজ, আপনার রচিত কাব্য শ্রবণে আমি পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। আপনি নিঃসঙ্কোচে এই গ্রন্থ জনসমাজে প্রচার করুন। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, ইহাতে সমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। এক্ষণে আমি আপনাকে কিছু বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। বরদান ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।"

শঙ্করবাক্যে কেরলরাজ সাতিশয় আনন্দিতচিত্তে বলিলেন, "মহাত্মন্! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমি যেন

ভবৎসদৃশ পুত্র লাভ করিতে পারি। আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন।" শঙ্করও 'তথাস্তু' বলিয়া মহারাজের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

অনন্তর মহারাজ শঙ্করকে নানাবাক্যে বিশেষরূপে সম্মানিত করিয়া বিনীতভাবে প্রণামপূর্ব্বক বিদায় লইলেন।

মহারাজের আগমনাবধি কালাড়িবাসী নরনারীর আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তাঁহারা দেখিলেন, শিবগুরুর ক্ষুদ্রভবনে দেশের রাজা অবাধে যাতায়াত করিতেছেন। রাজার কোনরূপ মানাভিমান নাই। অধিকন্তু রাজা যেন শঙ্করচরণে একেবারে বিক্রীত হইয়া গিয়াছেন। শঙ্করের এই সৌভাগ্য দর্শনে কেহ তুষ্ট, কেহ রুষ্ট, কেহ বা অবাক্, কেহ বা ঈর্ষা করিতেছেন। রমণীরা বিশিষ্টার নিকটে আসিয়া তাঁহার কথা তুলিয়া কত কথা বলিতেছেন, কেহ বা শতমুখে তাঁহার পুত্রভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন। নিরভিমানা বিশিষ্টাদেবী ইহাতে কিছুমাত্র গর্ব্বিতা না হইয়া মনে মনে সভয়ে কেবল পুত্রের কল্যাণ কামনা করিতেছেন এবং বয়স্থাগণের পদধূলি মস্তকে লইয়া শঙ্করের দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিতেছেন। কখনও বা রাজা কর্ত্তৃক পুত্রের সম্মান দর্শনে মৃত পতিকে স্মরণ করিয়া বিরলে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন।

কেরলরাজ রাজগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। রাজার মুখে শঙ্করের সমুদয় কথা শ্রবণ করিয়া রাণীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। শঙ্কর-চরিত্র তিনি যতই শুনেন ততই তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা তাঁহার বলবতী হইতে থাকে, কিন্তু শঙ্কর যখন রাজগৃহে আসিবেন না শুনিলেন তখন আর তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না। রাণীর মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল।

শঙ্করকে দর্শন করিয়া অবধি রাজসভায় মহারাজের আর অন্য প্রসঙ্গ বড় ভাল লাগিত না। তিনি সর্ব্বদাই মন্ত্রিসহ শঙ্করের আলোচনা করিতেন। কখন বলিতেন, মন্ত্রি, এত অল্পবয়সে ত এরূপ বিদ্যাবুদ্ধি দেখা যায় না। এ যেন ক্ষণজন্মা ছেলে। কখন বলিতেন, মন্ত্রি, আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিয়াছ কি? ছেলেটীকে দেখিলে যেন আপনা

হইতেই তাঁহার চরণে মাথা নত হইয়া পড়ে। কিন্তু বড়ই দুঃখ যে তাঁহাকে আমি কিছু দিতে পারিলাম না।"

মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ, ছেলেটী সম্বন্ধে সকলই আশ্চর্য্য বটে। কিন্তু টাকাটী যে লইলেন না ওটিই তাঁহার বালকত্বের প্রমাণ। কারণ কলিযুগে মানব অন্নগতপ্রাণ; একালে অর্থের প্রতি এতদূর ঔদাসীন্য কখনই বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। কচি বালক, সংসারের ত কিছু জানে না!" মহারাজ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, "মন্ত্রি! শঙ্কর আমার গ্রন্থের এরূপ সুন্দর সমালোচনা করিলেন যে আমি যাহা না ভাবিয়াছি, তিনি তাহাও ভাবিয়াছেন। অনেকেই আমার গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন কিন্তু এরূপ নির্ভীক নিরপেক্ষ সমালোচনা এপর্য্যন্ত কাহাকেও আমি করিতে শুনি নাই।"

সভাসদ্‌গণ সকলেই মহারাজের প্রশংসার অনুমোদন করিলেন। এইরূপে ক্রমে শঙ্করের যশোরাশি দিন দিন চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল।

ভক্তিমতী করেমতি।

(শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী)

ভারতবর্ষ ভগবদ্ভক্ত সাধকের লীলাভূমি। এ দেশে যত নিষ্কাম সাধু-সন্ন্যাসী দৃষ্ট হয়, পৃথিবীর আর কোথাও সেরূপ হয় কি না সন্দেহ। এই দেশেই রজতধবল-সমুন্নত-প্রাসাদবাসী রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া গৈরিক বসন পরিধানপূর্ব্বক হিমাচলের নিভৃত কন্দরে আশ্রয় লইয়াছেন। এ দেশেই রাজার পুত্র ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভিক্ষুকবেশ ধারণ করতঃ দ্বারে দ্বারে জীবের উদ্ধারের জন্য উপদেশামৃত বিলাইয়া বেড়াইতেছেন। নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য,

রামানন্দ, দাদু, শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের ত কথাই নাই, ভারতে আরও যে কত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত-নামা ভগবদ্ভক্ত আবির্ভূত হইয়া আবার জলবুদ্বুদের ন্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? আজ পাঠকপাঠিকাগণকে এমনি একজন ভক্তিমতী নারী-রত্নের পরিচয় দিব, যিনি আজন্ম কেবল "কৃষ্ণ", "কৃষ্ণ" করিয়া, অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের পদ পঙ্কজ রেণুস্পৃষ্ট শ্রীবৃন্দাবনধামে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। পার্থিব ভোগসুখ, যৌবনোচিত ইন্দ্রিয়-লালসা কিছুতেই তাঁহাকে সঙ্কল্পিত সাধনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই—তিনি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' করিয়াই কৃষ্ণপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ভাগ্যবতী পুণ্যময়ী রমণী-শিরোমণির নাম করেমতি বাই।

করেমতি দাক্ষিণাত্য প্রদেশের খাজল গ্রামবাসী পরশুরাম পণ্ডিত নামক জনৈক রাজপুত পুরোহিতের কন্যা। পরশুরাম পরম বৈষ্ণব ছিলেন, এবং স্বীয় দুহিতাকেও শৈশবাবধি পরম বৈষ্ণবী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি করেমতিকে যাবতীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পড়াইয়াছিলেন। পিতার শিক্ষার গুণে করেমতি কৈশোরারম্ভের পূর্ব্বেই সাতিশয় বিদুষী হইয়া উঠিলেন। শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অন্তর্নিহিত কৃষ্ণভক্তির উৎস শত ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। পিতা পরশুরাম কন্যার এইরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বড়ই চিন্তাকুল হইলেন। আসন্নপ্রায় যৌবনের সমস্ত অবস্থা করেমতির সর্ব্বাঙ্গে দিন দিন পরিস্ফুট হইতেছে, অথচ তাঁহার সেদিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ নাই। কন্যার ঈদৃশ বৈরাগ্য দর্শনে পিতা পরশুরাম তাঁহাকে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। অচিরাৎ মনোমত পাত্রও জুটিল; কিন্তু করেমতি বলিল সে বিবাহ করিবে না। কন্যার উত্তরে পরশুরাম অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন—তিনি কন্যাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন যে বিবাহ করিলেও শ্রীকৃষ্ণভজনায় তাঁহার কোনই ব্যাঘাত হইবে না। অগত্যা করেমতি পিতার মনস্তুষ্টির জন্য বিবাহ করিলেন।

পিত্রালয়ে যতদিন ছিলেন, ততদিন করেমতির মনঃকষ্টের কোনই কারণ ছিল না। তিনি দিবারাত্র কেবল "কোথা কৃষ্ণ" "হে কৃষ্ণ" বলিয়া চীৎকার করিতেন। শ্রীভগবানের জন্য তাঁহার মর্ম্মভেদী কাতর ক্রন্দনে নিতান্ত পাষাণহৃদয়ও ক্ষণিক ভক্তির উচ্ছ্বাসে দ্রবীভূত হইত। কিন্তু পতিগৃহে আসিয়া করেমতি এক মহা অসুবিধায় পড়িলেন। তাঁহার স্বামী ছিলেন ঘোর বৈষয়িক ও বৈষ্ণবদ্বেষী। করেমতির সাধনভজন, কৃষ্ণব্যাকুলতা তাঁহার স্বামীর চক্ষে গরল বর্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমে স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল এবং পরিশেষে সেই মনোমালিন্য বিচ্ছেদে পরিণত হইল। জগৎপতি কৃষ্ণকে যিনি পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, তিনি কি ভোগসুখরত, ইন্দ্রিয়-পরবশ পতির প্রেমে আবদ্ধ থাকিতে পারেন? করেমতি অগত্যা স্বামিগৃহ হইতে পিত্রালয়ে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনসাধনে রত হইলেন। কিন্তু এখানেও তাঁহার স্বামী আসিয়া তাঁহাকে লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। স্বামিগৃহে যাইয়া তাঁহার পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ করিতে হইবে এবং ঘোর বিষয়ী স্বামী তাঁহাকে দিন দিন বিষয়ানুরাগিণী করিয়া তুলিবেন, এই আশঙ্কায় করেমতি কিরূপে স্বামীর কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় তাহার উপায়ানুসন্ধানে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। অনেক চিন্তার পর তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃত কুঞ্জে আশ্রয় লওয়াই ঠিক স্থির করিলেন এবং একদিন গভীর নিশীথে পলাইবার জন্য শয্যাত্যাগ করিয়া বহির্গমনের দ্বার উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু, হায়! তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল—কারণ সমস্ত দ্বারই বহির্দ্দেশ হইতে অর্গলবদ্ধ। তখন অনন্যোপায় হইয়া করেমতি দালানের ছাদের উপর উঠিয়া "জয় শ্রীকৃষ্ণ" বলিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িলেন—কৃষ্ণের কৃপায় তাঁহার দেহে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগিল না। করেমতি গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখেন চতুর্দ্দিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার, তাহাতে আবার কোন্ পথে

বৃন্দাবন যাইতে হয় তাহাও তিনি জানেন না। এদিকে তাঁহার পিতা কিংবা স্বামী যদি তাঁহার পলায়নবার্ত্তা জানিতে পারেন তবে এখনই তাঁহাকে ধরিয়া পুনরায় অবরুদ্ধ করিবেন। করমেতি এই আশঙ্কায় দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলেন। পদতলে কত কি চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে—কণ্টকে সমগ্র শরীর ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, করেমতির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। কদম্বমূলে "রাধা" "রাধা" গান শুনিয়া যে কৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য ব্রজাঙ্গনাগণ কুলমান ত্যাগ করিয়া, পতির শয্যা ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিত, কৃষ্ণগতপ্রাণা করেমতি আজ সেই ব্রজমোহন বংশীধারীর চরণরেণু লাভাশায় জাতি-কুল-মান জলাঞ্জলি দিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে ছুটিয়াছেন।

রজনী প্রভাত হইল। প্রাচীললাটে বালারুণ স্বর্ণচ্ছটা লইয়া অপূর্ব্ব হাস্যলহরীতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিল। সুমধুর পিককণ্ঠ "কুহু" "কুহু" রবে নিশার অবসানবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। নিস্তব্ধ জগৎ আবার কর্ম্মকোলাহলে জাগিয়া উঠিল। পরশুরাম শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিলেন করেমতি ঘরে নাই। বৃদ্ধের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কন্যার বিরহে তিনি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন—দরবিগলিতধারায় তাঁহার গণ্ড বহিয়া অশ্রু পতিত হইতে লাগিল—পরশুরাম মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইলে পরশুরাম স্থানীয় রাজার নিকট যাইয়া কন্যার নিরুদ্দেশের কথা জানাইলেন। রাজা কালবিলম্ব না করিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠাইলেন।

এদিকে করেমতি এক বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর অতিক্রম করিতে করিতে হঠাৎ পিছন ফিরিয়া দেখেন অনতিদূরে প্রায় শতাধিক রাজ অনুচর তাঁহার অনুগমন করিতেছে। করেমতি প্রমাদ গণিলেন। সে প্রান্তরে কুত্রাপি তরুগুল্ম লতাদির চিহ্নমাত্র ছিল না, যাহার অন্তরালে লুকাইয়া করেমতি নিজেকে ইহাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারেন। অনন্যোপায় ও হতশ্বাস হইয়া করেমতি আরও দ্বিগুণবেগে

পথ চলিতে চলিতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, প্রান্তরের এক প্রান্তে একটি মৃত উষ্ট্রদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। সেই মৃত পশুশরীর অত্যন্ত দুর্গন্ধময়—শৃগালকুক্কুরে তাহার উদরগহ্বরের নাড়ীভুঁড়িসকল প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে, কেবল চর্ম্মাবৃত অস্থিগুলি একটা ছাউনির মত পড়িয়া রহিয়াছে। করেমতি অগত্যা সেই উষ্ট্রদেহে লুক্কায়িত হইলেন। রাজানুচরেরা করেমতির অনুসরণ করিতে করিতে প্রান্তরমধ্যে হঠাৎ তাঁহাকে কোথায় অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেস্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেল। করেমতি এতক্ষণ উষ্ট্রদেহ হইতে তাহাদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন এবং এখন তাহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিয়া তথা হইতে বাহির হইলেন ও মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে দিতে শ্রীকৃষ্ণের চরণোদ্দেশে হৃদয়ের অকপট ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে আত্মবিস্মৃত হইয়া কিছুক্ষণ তাঁহার এই ভাবে কাটিয়া গেল। হঠাৎ চৈতন্য লাভ করিয়া তিনি স্বীয় অবস্থার কথা ভাবিয়া আবার দ্রুতবেগে বৃন্দাবনাভিমুখে ছুটিতে লাগিলেন। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই—করেমতি অহোরাত্র পথ চলিতেছেন। কখন যে রাত্রি প্রভাত হয় আবার কখন যে দিবা অবসান হয়, করেমতির তাহা জানিবার অবসর নাই। মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপ ও নিশার স্নিগ্ধশিশিরসম্পাত তাঁহার নিকট এক। এই সকল উপেক্ষা করিয়া করেমতি সমভাবে একমনে ঊর্দ্ধশ্বাসে পথ চলিতেছেন। এই ভাবে পথে অশেষবিধ ক্লেশ ভোগান্তে করেমতি বহুদিনের পর তাঁহার একান্ত অভিলষিত শ্রীবৃন্দাবন-ধামে পৌঁছিলেন। এতদিনে তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল—এতদিনে সাধ মিটাইয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজার্চ্চনা ও নামজপ করিতে পারিবেন ভাবিয়া করেমতি আত্মহারা হইলেন। অবশেষে তথায় মনোমত একটী স্থান খুঁজিয়া লইয়া সাধনে ডুবিয়া গেলেন। এদিকে কন্যার অদর্শনে ম্রিয়মাণ বৃদ্ধ পিতা পরশুরাম খাজল গ্রাম ত্যাগ করিয়া করেমতির

অনুসন্ধানে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। নানাদেশ জনপদ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমে তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ও তথায় তাঁহার পরম আদরের কন্যারত্নকে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু দেখিলেন করেমতি নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বসিয়া আছেন—তাঁহার দুই চক্ষু বহিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে ও একটা অপূর্ব্ব পবিত্রতার জ্যোতি তাঁহার শরীরের প্রতিঅঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইতেছে! পরশুরাম সেই দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া আপন অবস্থা ভুলিয়া গিয়া সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

সময়ান্তরে পরশুরাম কন্যাকে স্বগৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কত কাকুতি মিনতি করিলেন—কত বুঝাইলেন, কিন্তু করেমতি তাহা শুনিলেন না। তখন পরশুরাম নিরাশহৃদয়ে দেশে ফিরিয়া রাজার নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। রাজা অত্যন্ত ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। তিনি করেমতির কৃষ্ণ সাধনার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য স্বয়ং বৃন্দাবনে গেলেন—দেখিলেন, ধ্যানস্তিমিতনেত্রে বসিয়া এক অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি! সে দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে রাজার শিরও ধীরে ধীরে নত হইয়া আসিল—তিনি ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাজা তাঁহাকে একখানি আশ্রমকুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে চাহিলেন; করেমতি তাহাতে রাজি হইলেন না। কিন্তু ভক্ত রাজা কিছুতেই সে কথা না শুনিয়া তাঁহার জন্য একখানি সুন্দর আশ্রমকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। কতকাল করেমতি এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধাম শ্রীবৈকুণ্ঠে তাঁহার ইষ্টের শ্রীচরণপ্রান্তে গমন করিয়াছেন, কিন্তু আজিও সেই কুটীরের ধ্বংসাবশেষ শ্রীবৃন্দাবনের অসংখ্য যাত্রীর মনে করেমতির পুণ্যস্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে।

৺দ্বারকাধাম ও কয়েকটি তীর্থ দর্শন।

(শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নাসিক হইতে বোম্বাই অধিক দূর নহে। ডাক গাড়ীতে ঘণ্টা চারি এবং যাত্রী গাড়ীতে আরও ২৩ ঘণ্টা অধিক সময় লাগে মাত্র। এখান হইতে ২।৩ ঘণ্টা অগ্রসর হইলেই পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর থুলঘাট পর্ব্বতমালার উপর গাড়ী উঠিতে থাকে। তখন সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইদিকে দুইখানি ইঞ্জিন দিতে হয়। গাড়ী ধীরে ধীরে কয়েকটি পর্ব্বতরন্ধ্রের মধ্য দিয়া থুলঘাট পর্ব্বতমালার শিখরদেশে আরোহণ করে। নিকটস্থ পাহাড়গুলি ইহার নীচে পড়িয়া থাকে। এই দৃশ্যটি বড় সুন্দর। 'দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান্' রেলের দৃশ্যও এইরূপ; তবে উহা ইহা অপেক্ষা অধিক লম্বা ও অধিক উপর হইয়া গিয়াছে। আরোহিগণ অনিমেষনয়নে এই দৃশ্যের মাধুর্য্য উপভোগ করিতে লাগিল, এবং গাড়ী যখন 'টনেলের' মধ্য দিয়া যাইতে লাগিল তখন সকলে একত্রে "হর হর বোম বোম" রব তুলিয়া যেন সুরঙ্গপথ বিদীর্ণ করিবার উপক্রম করিল। ইহার অল্পক্ষণ পরেই গাড়ী নামিতে লাগিল এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যে উহা সমতলক্ষেত্রে নামিয়া দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় ৯৷৷৹ টার সময় আমরা সমুদ্রের একটি খাড়ী পার হইয়া বোম্বাই দ্বীপে উপস্থিত হইলাম।

পূর্ব্ব হইতেই আমাদের ঠিক ছিল যে, আমরা এখানে প্রসিদ্ধ হীরাবাগ নামক ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিব। অতএব দুইখানি গাড়ী করিয়া গিরগাঁওব্যাক রোডস্থ হীরাবাগে আসিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেখানে তিলমাত্রও স্থান নাই। সুতরাং রাস্তার অপরদিকে সি পি ট্যাঙ্ক রোডস্থ মাধোবাগ ধর্ম্মশালায় স্থানের জন্য গেলাম। কিন্তু এখানেও ঠিক ঐরূপ।

এ সহরে ভদ্রলোকের সপরিবারে বাসোপযোগী আর কোন ধর্ম্মশালা নাই, অথচ স্ত্রীলোক লইয়া কোন হোটেলেও যাইতে পারি না। তাহার উপর উক্ত সহরে এমন কোন পরিচিত লোকও নাই যাঁহার বাড়ীতে যাইয়া একটু আশ্রয় লইতে পারি। একবার ভাবিয়া দেখুন, তখন আমরা কি অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছি! কি করি কোথায় যাই, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না, এমন সময় হটাৎ শুনিলাম, মাধোবাগের সম্মুখে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে ইহার অধিকারীর একজন কর্ম্মচারী থাকেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট ছুটিয়া গিয়া আমাদের বিপদের কথা জানাইলাম। তিনি আমাদের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া একটি লোক দ্বারা ধর্ম্মশালার যে অংশ ধনীর জন্য নির্দ্দিষ্ট তাহার সিঁড়ির নিম্নের স্থানটিতে কোনপ্রকারে আমাদের বসিবার একটু স্থান করিয়া দিলেন। স্থানটিতে একটি বৈদ্যুতিক আলোক ছিল; উহা সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি জ্বলিত। ইহা আমাদের বড় সুবিধাজনক হইয়াছিল। যাহা হউক, আমরা অকূলে কূল পাইয়া বাঁচিলাম। এইভাবে রাত্রি অনেক হইয়া যাওয়ায় আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া কিছু জলখাবার কিনিয়া আনিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তিপূর্ব্বক শ্রান্তিনিবারিণী নিদ্রাদেবীর শরণ লইলাম। পরদিবস শুনিলাম, দেওয়ালী মহোৎসবই নাকি এত ভীড়ের কারণ। 'দেওয়ালী'তে এই সহরে ৩৪ দিন খুব জাঁকজমক ও বহুলোকের সমাগম হয় এবং তাহা দেখিবার জন্য নিকটস্থ অনেক দেশের লোক এখানে আসিয়া ৩৪ দিন থাকে। আরও, ঐ দিন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে অনেক যাত্রী বোম্বাইএ অবতরণ করায় এবং তাহাদের কতকাংশ এই ধর্ম্মশালাদ্বয়ে আশ্রয় গ্রহণ করায় এত ভীড় হইয়াছিল।

মুম্বাদেবী এই সহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এইজন্য ইহার নাম মুম্বাই। ষোড়শ শতাব্দীতে ইহা পর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত ছিল। উহারা ইহাকে Bombahia বলিত; সম্ভবতঃ তাহা হইতেই ইহার বর্ত্তমান ইংরাজি নাম Bombay হইয়াছে। ইংরাজরাজ বিবাহের যৌতুকস্বরূপ ইহা পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে পান; তখন ইহার

কোনই সৌন্দর্য্য ছিল না এবং ইহার আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ ছিল। ভারতের সহিত রেল দ্বারা সংযুক্ত হইবার পর ইহার বর্ত্তমান শ্রী সাধিত হইয়াছে। এখন ইহা একটি অতি সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহর। তবে কলিকাতা অপেক্ষা কিয়দংশে সুন্দর হইলেও সর্ব্ববিষয়ে তুলনা করিলে নিকৃষ্ট।

বোম্বাইয়ের আকৃতিটি একটু বিশিষ্ট রকমের; সে জন্য সাধারণ দর্শক এখানে আসিলে প্রথম দু'এক দিন তাহার একটু 'ভ্যাবাচাকা' লাগিয়া যায়। ভারতবর্ষের গাত্রে ইহা যেন একটি ফলের ন্যায় ঝুলিতেছে। ইহার তলদেশ কতকটা হাতের পাঞ্জার ন্যায়; পশ্চিমপ্রান্তের খানিকটা এবং পূর্ব্বপ্রান্তের খানিকটা অংশ অন্তরীপাকারে সাগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বদিকের ভূভাগটুকু সমুদ্রমধ্যে অনেকদূর চলিয়া গিয়াছে। আরব সাগরের যে অংশ এই দুইটি ভূভাগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহাকে Back Bay কহে। ইহাতে বেশী তরঙ্গ-ভঙ্গ নাই। সহরের বিখ্যাত বৃহৎ বৃহৎ হর্ম্ম্যাদি এই Bayর চতুর্দ্দিকে উন্নতমস্তকে সমুদ্রের সহিত আপন সৌন্দর্য্য মিলাইয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বৈকালে অনেকে এখানে বায়ুসেবনার্থ আগমন করেন, এবং সমুদ্রতীরে স্থাপিত কাষ্ঠাসন সমূহে বসিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করেন। দ্বীপের পশ্চিমাংশে দুইটি ছোট ছোট পাহাড় ইহাকে আরব সাগরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে। ইহাদের একটির নাম 'কম্বালা হিল' ও অপরটির নাম 'মালাবার হিল'; প্রথমটি দ্বিতীয়টির উত্তরদেশে অবস্থিত। ইহাদের উচ্চতা ১৮০ ফিটের অধিক নহে। কম্বালা হিলের উত্তরাংশে সমুদ্রের উপর মহালক্ষ্মী দেবীর মন্দির। ইহা বোম্বাইয়ের একটি বিখ্যাত স্থান। মালাবার হিলের উপর স্থানীয় খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের এবং ইংরাজ বড়লোকদের বাস। গুজরাটী, পার্শী, মহারাষ্ট্রী ও ইংরাজ অধিবাসী সকলে পাশাপাশি বাড়ীতে বাস করিতেছে। বেশ ভাবটী, যেন পরস্পর ভাই ভাই। কলিকাতায় এরূপ দৃশ্য বড়

দেখা যায় না। এই পাহাড়ের দক্ষিণ সীমায় লাট বাহাদুরের প্রাসাদ। সহরের পূর্ব্বাংশ ভারত উপদ্বীপ হইতে প্রায় ১৫।১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এই বিস্তৃত স্থানটি সমুদ্র অধিকার করিয়া আছে। সমুদ্রের এই অংশ নীরব নীথর—একেবারে কল্লোলশূন্য। ইহাতে অনেকগুলি দ্বীপ আছে—'এলিফাণ্টা' দ্বীপই উহাদের মধ্যে বিখ্যাত। ইহার জল অতি ঘোলা ও ময়লাযুক্ত, সাগরজলের ন্যায় নীল নহে। সহরের এই অংশ বন্দর, যাহার জন্য ইহা বিখ্যাত। এরূপ উৎকৃষ্ট বন্দর নাকি জগতে বিরল। বন্দর ও বড় বড় ডক্ (Dock) ৪।৫ মাইল জুড়িয়া রহিয়াছে। তথায় বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করিতেছে; অসংখ্য যাত্রী, কুলী, গাড়ী, কর্ম্মচারী, খালাসী ছুটাছুটি করিতেছে। বাস্তবিক সে দৃশ্য দেখিলে আমরা যেন দিশাহারা হইয়া পড়ি। ভারতসন্তান যে অলসতার নিবিড় আঁধারে জড়প্রায় হইয়া রহিয়াছে তাহা এস্থান দেখিলে প্রতীয়মান হয় না। বাস্তবিক মনে হয় যেন এ স্থান মহাবিক্ষোভকর রজোগুণের ক্রীড়ানিকেতন, প্রতীচ্যের অন্তর্গত। কলিকাতার ন্যায় বোম্বাইয়ে বর্ষার প্রবল ঝড় বা বারিপাত নাই, শীতের তেমন প্রখরতা নাই এবং গ্রীষ্মের দারুণ উত্তাপও তত নাই। সমুদ্রের উদ্দাম শীতল বায়ু দিবা-নিশি বহিতেছে। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বোধ হয় ইহা কলিকাতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

এখানে আহার্য্য সামগ্রী তেমন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না, আর যাহা পাওয়া যায় তাহাও অতিশয় দুর্ম্মূল্য। এদিককার অধিকাংশ লোকই নিরামিষাশী বলিয়া কোন কোন পল্লিহাটে—বিশেষ গুজরাটি পল্লীগুলিতে—মৎস্যাদি একেবারেই পাওয়া যায় না। এই সব পল্লীতে কোন আমিষভোজী থাকিলে তাহাকেও অগত্যা নিরামিষাশী হইয়া থাকিতে হয়। আমিষভোজীকে ইহারা বাটী ভাড়া দেয় না। বাটীভাড়া দিবার তাহাদের প্রথম সর্ত্ত এই যে, এ বাড়ীতে কেহ আমিষ ভোজন করিতে পারিবে না। এই সর্ত্তের কেহ অন্যথাচরণ করিলে তাহাকে এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

ইহারা মৎস্যাহার এত ঘৃণা করে যে, মৎস্যাহারীকে কোন কাজকর্ম্ম দিতে চায় না।

যাহা হউক, আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ৺দ্বারিকা ধামের জাহাজ কবে ছাড়িবে তাহার সন্ধানে চলিলাম। অনুসন্ধানে জানা গেল যে Killick Nixon কোম্পানির জাহাজ, রবিবার ছাড়িবে ও মঙ্গলবার দ্বারকায় পৌঁছিবে এবং British India কোম্পানির জাহাজ সোমবার ছাড়িয়া পরদিবসই তথায় পৌঁছিবে। শেষোক্ত জাহাজখানি বড় ও 'মেল' জাহাজ। ইহাকে 'করাচি মেল' কহে। ইহা সপ্তাহে দুইবার ছাড়ে, সোমবার ও শুক্রবার ; শুক্রবারের জাহাজ দ্বারকায় থামে না। এই জাহাজের ভাড়া কিছু বেশী। অধিকাংশ যাত্রী এই জাহাজেই যায়। আমরাও সোমবারের জাহাজেই বোম্বাই ত্যাগ করিয়া ৺দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিব স্থির করিলাম। অতএব আমাদিগকে আরও ৪।৫ দিন এখানে অবস্থান করিতে হইবে ভাবিয়া অপর একটি সুবিধাজনক স্থানের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু ইহাতে অকৃতকার্য্য হওয়ায় অগত্যা 'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ' হইয়া ঐ স্থানেই থাকিতে হইল।

অতঃপর বোম্বাই সহরে অবস্থান সার্থক করিবার মানসে তত্রত্য দ্রষ্টব্য স্থানসকল একে একে দেখিতে ব্রতী হইলাম। বাস্তবিক দেখিবার মত জিনিষ এখানে অনেক আছে। তন্মধ্যে বন্দর ও ডক্, মহালক্ষ্মীর মন্দির, মুম্বাদেবীর মন্দির, বালুকেশ্বর ও ভোলেশ্বর শিবের মন্দির, এপোলো বন্দর, তাজমহল হোটেল, পার্শীগণের Tower of silence, রাজাবাই টাওয়ার, এলিফ্যাণ্টা গুহা ও আফিস অঞ্চল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে বোম্বাইয়ের সামাজিক চালচলন সম্বন্ধে দুএক কথা বলিতে চাই। এখানে স্ত্রী-অবরোধ প্রথা নাই ; মেয়ে পুরুষ সকলেই ট্রামে সম্মান ও আত্ম-মর্য্যাদা পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া গমনাগমন করিতেছে। সুতরাং আমরাও অবাধে নিঃসঙ্কোচে মেয়েছেলে লইয়া ট্রামে নানা স্থানে যাতায়াত করিতেছিলাম। আর এখানকার ট্রাম কোম্পানির ন্যায়

এমন উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত ভারতবর্ষের অন্য কোথায়ও নাই। গাড়ীগুলি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; স্ত্রীপুরুষের বসিবার স্থান ভিন্ন ভিন্ন; দাঁড়াইবার জন্যও পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহাতে একমুখ দিয়া উঠিতে হয় ও অপর মুখ দিয়া নামিতে হয়। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হইলেই প্রবেশের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কণ্ডাক্টরগণও বেশ ভদ্র; বিদেশী লোক দেখিলে তাহাদিগকে যথোচিত সাহায্য করে ও পথঘাটগুলি যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেয়। ইহারা কলিকাতা ট্রামের কণ্ডাক্টরগণ অপেক্ষা শিক্ষিতও বটে। বাস্তবিক আমরা ইহাদের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলাম। যাহা হউক, ঐ দিন আমরা এপোলো বন্দর, তাজমহল হোটেল ও আফিস অঞ্চলে বেড়াইয়া আসিলাম। এপোলো বন্দরটি Back Bay'র পূর্ব্বাংশে অবস্থিত, উহা প্রস্তরনির্ম্মিত। সমুদ্রে সুন্দর সুন্দর অলিন্দ স্থাপিত আছে, বায়ুসেবনার্থী অনেকে তাহাতে বসিয়া আনন্দে গল্পগুজব করিতেছে। বেড়াইবার অতি মনোরম স্থান। সমুদ্রে নামিবার বেশ সিঁড়ি আছে। এই Back Bay নিতান্ত অগভীর, এই জন্য এখানে ষ্টীমার আসিতে পারে না; কেবলমাত্র ছোট ছোট Steam launch গুলি যাতায়াত করে। উপকূলের অদূরে তাজমহল হোটেল উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান। শুনা যায়, এত বড় হোটেল ও এমন সুন্দর বন্দোবস্ত এসিয়া খণ্ডের আর কোন স্থানে নাই। এখান হইতে দক্ষিণ দিকে ১০।১৫ মিনিটের পথ যাইলে প্রসিদ্ধ রাজাবাই tower। স্বনামখ্যাত দানবীর রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ মহোদয়ের মাতাঠাকুরাণী রাজাবাইএর স্মরণার্থে নির্ম্মিত। ইহা উচ্চতায় ২৬০ ফিট। ইহার উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সানন্দে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

পরদিন প্রাতে আমরা এলিফ্যাণ্টা গুহা দেখিতে যাইব বলিয়া সহরের পূর্ব্ব ভাগে যে বন্দর ও ডক্ আছে তথায় গেলাম। কিন্তু ডক্‌গুলির সংখ্যা এত বেশী যে, কোন্ ডক্ হইতে এলিফ্যাণ্টার জাহাজ ছাড়িবে তাহার সন্ধান করিতে করিতেই জাহাজ ছাড়িয়া গেল।

সুতরাং সেদিন আর এলিফ্যাণ্টা যাওয়া হইল না। তবে পরদিবস যাইবার সুবিধার্থে জাহাজের সময় ও ডক্-নম্বর প্রভৃতি জ্ঞাতব্য খবর লইয়া সেদিন বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পূর্ব্বে যে দেওয়ালী উৎসবের কথা বলিয়া আসিয়াছি তাহা আজ হইতে আরম্ভ। এই উৎসব সাধারণতঃ তিন দিন থাকে। এই সময় শুধু বোম্বাই সহরে নয়, সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে মহা ধূম। সাধারণ দেবালয়ে বা গৃহস্থের ঠাকুর বাড়ীতে যে সকল বিগ্রহ আছেন তাঁহাদিগকে সুন্দররূপে সাজান হয় এবং যত প্রকার উত্তম ভোজ্য জোগাড় করা যাইতে পারে তাহা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে সাজাইয়া ভোগ দেওয়া হয়। তিন দিনকাল উক্ত ভোজ্যাদি ঐরূপ সাজান থাকে—তৎপরে ঐগুলি বিতরিত হয়। এই কয়দিন সকলে নিজ নিজ বাটী দীপমালা দ্বারা আলোকিত রাখে—সমগ্র সহরটি এক মহা আনন্দে উৎফুল্ল। আমাদের দেশের দুর্গোৎসব অপেক্ষা বোম্বাইয়ের দেওয়ালীর জাঁকজমক অধিক। আমাদের এখানে দেব-দেবী দর্শন করিতে হইলে লোকে ফল, ফুল, মিষ্টান্ন বা অর্থ দিয়া দর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু বোম্বাইয়ে কেবলমাত্র অর্থ দেওয়াই বিধি। বিগ্রহমূর্ত্তি প্রায়ই স্বুবর্ণ অথবা রজতনির্ম্মিত, মণিমাণিক্যাদিখচিত অলঙ্কারে সুশোভিত, এবং মর্ম্মর প্রস্তরের বেদীর উপর রৌপ্যাসনে স্থাপিত। অপরাহ্নে আমরা উক্ত মহোৎসব দেখিতে বাহির হইলাম। গুজরাটি ও মহারাষ্ট্রীয় পল্লীগুলির মধ্যেই উৎসবের ঘটা বেশী। আমরা এই সব স্থানের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম। রাস্তায় ভয়ানক জনতা—আমাদের এখানকার মহরম উৎসবের মত। অতি কষ্টে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমরা ভোলেশ্বর রোড পার হইয়া কলবাদেবী রোডে আসিয়া পড়িলাম। এই রাস্তার উপর যত ধনী ভাটিয়াগণের জহরতের দোকান; এখানকার বাটীগুলি নানাবর্ণের বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত। অতঃপর আমরা সহরের অধিষ্ঠাত্রী মুম্বাদেবী দর্শন করিতে গেলাম।

মুম্বাদেবীর মন্দির প্রস্তরনির্ম্মিত, বেশ বড় ও উচ্চ। ইহার মেজে

মর্ম্মর প্রস্তরে গঠিত। মন্দিরে দুইটি প্রকোষ্ঠ, একটির মধ্যে রৌপ্য সিংহাসনে পীতবরণা অষ্টভূজা মূর্ত্তি ও অপরটিতে অঙ্গবিহীনা রক্তবর্ণা প্রস্তরমূর্ত্তি। মন্দিরের সম্মুখে প্রাঙ্গণ মধ্যে একটি বৃহৎ জলাশয়; উহার চতুর্দ্দিক প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর সোপানাবলিবেষ্টিত। উহার তীরে ২।৪টি অন্যান্য দেবদেবীর মন্দিরও আছে। মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমরা ভোলেশ্বর মহাদেব দর্শন করিতে চলিলাম। এই মন্দিরও বোম্বাইয়ে খুব বিখ্যাত। শিব দর্শন করিতে করিতে রাত্রি অধিক হইয়া যাওয়ায় আমরা সেদিনকার মত বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পর দিন সকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিয়া এলিফ্যাণ্টা গুহা দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা আবার সেই বিশাল ডকে পথ হারাইয়া সময় মত ষ্টিমার ঘাটে যাইতে পারিলাম না। সুতরাং সে দিনও ষ্টিমার না পাওয়ায় বিষণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে হইল।

অপরাহ্ণে আমরা সহরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তস্থ মালাবার পাহাড়ের উপর বেড়াইতে গেলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই পাহাড়টি উচ্চতায় প্রায় ২০০ ফিট এবং বনজঙ্গলসমাকীর্ণও নহে। স্থানীয় অধিকাংশ বর্দ্ধিষ্ণু লোক এবং বোম্বাইয়ের লাট সাহেব এই পাহাড়ে বাস করেন। রাস্তাগুলি ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠিয়াছে; সে জন্য শকটাদিরও চড়াই উৎরাই করিতে বিশেষ কোন কষ্ট হয় না। এই স্থলটির দৃশ্য বড়ই প্রীতিকর। ইহার একদিকে আরব সাগর ও অপর দিকে Back Bay। উহার উপর খিলান করিয়া ছাদ গাঁথিয়া বেড়াইবার স্থান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই জন্য স্থানীয় লোকে ইহাকে Hanging garden বলিয়া থাকে। বিবিধ হর্ম্ম্যাবলির শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে আরব সাগরের উপকূলে বালুকেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বালুকেশ্বরের মন্দির ঠিক সমুদ্রের ধারেই অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে, রামচন্দ্র লঙ্কা যাইবার সময় বালুকা-দ্বারা এই শিবলিঙ্গ গঠন করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। এবং পূজার

জলের জন্য মন্দিরের সম্মুখে বাণাঘাতে এক পুষ্করিণী সৃজন করেন; ইহা এখনও বর্ত্তমান এবং 'বানগঙ্গা' নামে অভিহিত। শুনা যায়, রামচন্দ্রনির্ম্মিত বালুকা-লিঙ্গ এখন নাই; পর্ত্তুগীজগণ উহা সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়ায় ৺কাশী হইতে এক লিঙ্গ আনাইয়া ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এ মন্দিরে বেশী জনতা হয় না। রাত্রি হইয়া পড়ায় আর অধিক অগ্রসর না হইয়া আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

(ক্রমশঃ)

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

(অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"যথা স্বপ্নপ্রপঞ্চোঽয়ং ময়ি মায়াবিজৃম্ভিতঃ।২৯
তথা জাগ্রৎপ্রপঞ্চোঽপি পরমায়াবিজৃম্ভিতঃ।
ইতি যো বেদ বেদান্তৈঃ সোঽতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ॥"

"এই স্বপ্নপ্রপঞ্চ যেমন মায়া দ্বারা আমাতে প্রকটিত হয়, সেইরূপ এই জাগ্রৎপ্রপঞ্চও তদপেক্ষা অধিক বলবতী মায়া দ্বারা আমাতে প্রকটিত হইতেছে(১)",—যিনি বেদান্ত শাস্ত্রের সাহায্যে এইরূপ বুঝিয়াছেন, তিনিই অতিবর্ণাশ্রমী হইতে পারেন।

(১) পূর্ব্বে মিথ্যা বা (অসম্ভব) বলিয়া জানা থাকিলেও যেমন স্বপ্নপ্রপঞ্চ নিদ্রাকালে অনুভূত হয় বলিয়া (পূর্ব্বকালের সহিত সম্বন্ধহেতু) স্মৃতির বিষয় হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ-ব্যক্তি বর্ত্তমান জাগ্রৎপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া জানিলেও, (কালের সহিত সম্বন্ধহেতু) পূর্ব্বসংস্কারবশে তাহাকে সত্য বলিয়া ব্যবহার করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? (মাধবাচার্য্যকৃত টীকা হইতে সংগৃহীত)।

"যস্ত বর্ণাশ্রমাচারো গলিতঃ স্বাত্মদর্শনাৎ।
স বর্ণানাশ্রমান্ সর্ব্বানতীত্য স্বাত্মনি স্থিতঃ॥"

নিজের স্বরূপভূত আত্মার দর্শনলাভহেতু যাঁহার বর্ণাশ্রমোচিত আচার বিগলিত হইয়াছে, তিনি সকল বর্ণ ও সকল আশ্রম অতিক্রম করিয়া আপনাতে অবস্থিত হইয়াছেন। (১)

"যোঽতীত্য স্বাশ্রমান্ বর্ণানাত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্।
সোঽতিবর্ণাশ্রমী প্রোক্তঃ সর্ব্ববেদান্তবেদিভিঃ॥"৩২

যে পুরুষ স্বকীয় বর্ণ ও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া আপনাতেই অবস্থিত হইয়াছেন, সর্ব্ববেদান্তবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই অতিবর্ণাশ্রমী বলিয়াছেন।

"ন দেহো নেন্দ্রিয়ং প্রাণো ন মনো বুদ্ধ্যহংকৃতী।
ন চিত্তং নৈব মায়া চ ন চ ব্যোমাদিকং জগৎ॥৩৩
ন কর্ত্তা নৈব ভোক্তা চ ন চ ভোজয়িতা তথা।
কেবলং চিৎসদানন্দো ব্রহ্মৈবাত্মা যথার্থতঃ॥"৩৪

(অতিবর্ণাশ্রমের অনুভব বর্ণনা করিতেছেন ঃ—)

আত্মা দেহ নহে, ইন্দ্রিয় নহে, প্রাণ নহে, মন নহে, বুদ্ধি নহে, অহঙ্কার নহে, চিত্ত নহে, এবং মায়া অথবা আকাশ প্রভৃতি সৃষ্টি নহে, আত্মা কিছুই করেন না, কিছুই ভোগ করেন না বা কাহাকেও ভোগ করান না। আত্মা স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহেন।

(১) বর্ণাশ্রমোচিত আচার অতিক্রম করাই যদি এই প্রকারে উৎকর্ষের কারণ হয় তবে ত পাষণ্ডদিগেরই জয়। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—তত্ত্বসাক্ষাৎকার হেতু যাঁহাদের দেহাদিতে আত্মত্বাভিমান বিগলিত হইয়াছে, তাঁহারা দেহধর্ম্মের সহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়াই অতিবর্ণাশ্রমী। কিন্তু যে নাস্তিক, এই চরমাবস্থা লাভ না করিয়াও প্রমাদ আলস্য প্রভৃতি বশতঃ আচার পরিত্যাগ করে, সেইব্যক্তি (সন্ধ্যাদির) অকরণ জনিত প্রত্যবায় সঞ্চয় করিয়া অধঃপতিত হয়।

"জলস্থ চলনাদেব চঞ্চলত্বং যথা রবেঃ।
তথাহঙ্কারসম্বন্ধাদেব সংসার আত্মনঃ॥"৩৫

যেমন জল বিচলিত হইলে (সেই জলে প্রতিবিম্বিত) রবি চঞ্চল বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ অহঙ্কারের সংসার (অর্থাৎ জন্মমরণ, লোকান্তরগমন) ঘটিলেই আত্মার সংসার অর্থাৎ জন্মমরণ বা লোকান্তরগমন ঘটিল মনে হয়।

"তস্মাদন্যগতা বর্ণা আশ্রমা অপি কেশব।
আত্মন্যারোপিতা এব ভ্রান্ত্যা তে নাত্মবেদিনঃ॥

সেইহেতু, হে কেশব! ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম অন্যগত অর্থাৎ অহঙ্কারাশ্রিত হইলেও, ভ্রান্তিবশতঃই আত্মাতে আরোপিত হইয়াছে। যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন, তাঁহার নিকট বর্ণ বা আশ্রম কিছুই নাই।

"ন বিধির্ন নিষেধশ্চ ন বর্জ্জ্যাবর্জ্জ্যকল্পনা।
আত্মবিজ্ঞানিনামস্তি তথা নান্যজ্জনার্দ্দন॥"

হে জনার্দ্দন! যিনি আত্মাকে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার নিকট কোন বিধিও নাই, কোন নিষেধও নাই, তিনি কোন বস্তু পরিত্যাগ করিবার বা পরিত্যাগ না করিবার কল্পনা করেন না, তাঁহার পক্ষে অন্য কিছুই নাই অর্থাৎ লৌকিক ব্যাপার সমূহও নাই।

"আত্মবিজ্ঞানিনো নিষ্ঠামীশ্বরীমম্বুজেক্ষণ।
মায়য়া মোহিতা মর্ত্ত্যা নৈব জানন্তি সর্ব্বদা॥"৩৮

হে পদ্মপলাশলোচন, যিনি আত্মতত্ত্বানুভব করিয়াছেন তাঁহার অলৌকিক নিষ্ঠা, সংসারী ব্যক্তিগণ মায়া দ্বারা মুগ্ধ থাকিয়া সকল সময়ে বুঝে না

"ন মাংসচক্ষুষা নিষ্ঠা ব্রহ্মবিজ্ঞানিনামিয়ম্।
দ্রষ্টুং শক্যা স্বতঃসিদ্ধা বিদুষঃ সৈব কেশব॥"৩৯

যাঁহারা ব্রহ্মানুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের এই নিষ্ঠা চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা দেখিয়া বুঝা যায় না। কিন্তু হে কেশব, সেই নিষ্ঠা তত্ত্বজ্ঞের কেবল নিজেরই অনুভবগম্য।

"যত্র সুপ্তা জনা নিত্যং তত্র প্রবুদ্ধস্তত্র সংযমী।
প্রবুদ্ধা যত্র তে বিদ্বান্ সুষুপ্তস্তত্র কেশব ॥৪০ (১)

হে কেশব! জনসাধারণে যে বিষয়ে একেবারে প্রসুপ্তের ন্যায় জ্ঞানহীন, সংযমশীল (ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ) তাহাতে সর্ব্বদাই জাগরিত, এবং সাধারণ লোকে যে বিষয়ে (দৃশ্যপ্রপঞ্চে) জাগরিত, জ্ঞানীব্যক্তি সেই বিষয়ে একেবারে প্রসুপ্তের ন্যায় জ্ঞানহীন।

(গীতার ২য় অধ্যায়ের ৬৯ সংখ্যক শ্লোকের অর্থও এই)।

"এবমাত্মানমদ্বন্দ্বং নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনম্।
নিত্যং বুদ্ধং নিরাভাসং সংবিন্মাত্রং পরামৃতম্ ॥৪১
যো বিজানাতি বেদান্তৈঃ স্বানুভূত্যা চ নিশ্চিতম্।
সোঽতিবর্ণাশ্রমী নাম্না স এব গুরুরুত্তমঃ ॥" ইতি ।৪২

যিনি বেদান্ত শাস্ত্রের সাহায্যে এবং নিজের অনুভূতি দ্বারা নিশ্চিত রূপে এই অদ্বিতীয় বিক্ষেপরহিত এবং আবরণরহিত নিত্যবুদ্ধ, মায়ামোহবিনির্ম্মুক্ত, চিৎস্বরূপ, পরম অমৃত আত্মাকে অবগত হয়েন, তাঁহাকেই অতিবর্ণাশ্রমী বলা হয়। তিনিই উত্তম গুরু।

অতএব "বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে" (কঠ ৫।১)

"একবার মুক্ত (জীবন্মুক্ত) হইয়া (পুনর্ব্বার) মুক্ত (বিদেহমুক্ত) হয়েন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য, এবং জীবন্মুক্ত-স্থিতপ্রজ্ঞ-ভগবদ্ভক্ত-গুণাতীত-ব্রাহ্মণ-অতিবর্ণাশ্রমী অবস্থার প্রতিপাদক স্মৃতিবাক্য সমূহ সপ্রমাণ করিতেছে যে, জীবন্মুক্তি বলিয়া এক অবস্থা আছে—ইহাই নির্ণীত হইল।

ইতি শ্রীবিদ্যারণ্যপ্রণীত "জীবন্মুক্তি-বিবেক" নামক গ্রন্থে
জীবন্মুক্তিপ্রমাণ নামক প্রথম প্রকরণ ॥১॥

অথ বাসনাক্ষয় প্রকরণম্।

অনন্তর আমরা জীবন্মুক্তির সাধন নিরূপণ করিতেছি। তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ, ও বাসনাক্ষয় এই তিনটিই জীবন্মুক্তির সাধন। এই হেতু বাসিষ্ঠ রামায়ণে উপশম প্রকরণের শেষভাগে "জীবন্মুক্ত-শরীরাণাম্"

(উপশম প্র, ৮৯।৯) বলিয়া যে প্রস্তাব আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে বসিষ্ঠদেব বলিতেছেন—

বাসনাক্ষয়বিজ্ঞানমনোনাশো মহামতে।
সমকালং চিরাভ্যস্তা ভবন্তি ফলদা ইমে (১)॥
(উপশম প্র ৯২।১৭)

হে বুদ্ধিমান্, যদি কেহ বাসনাক্ষয়, তত্ত্বজ্ঞান ও মনোনাশ—এই তিনটি দীর্ঘকাল ধরিয়া একসঙ্গেই অভ্যাস করে তবেই এই তিনটি ফলপ্রদ হয়।

এই শ্লোকে কার্য্যকারণের অন্বয়-সম্বন্ধ (অর্থাৎ বিধিমুখে কারণের সদ্ভাবে কার্য্যের অব্যভিচারী সদ্ভাব) দেখাইয়া উক্ত কার্য্যকারণের ব্যতিরেক-সম্বন্ধ (অর্থাৎ নিষেধমুখে, কারণের অসদ্ভাবে কার্য্যের অব্যভিচারী অসদ্ভাব) দেখাইতেছেন—

ত্রয় এতে (২) সমং যাবন্ন স্বভ্যস্তা মুহুর্মুহুঃ।
তাবন্ন পদসম্প্রাপ্তির্ভবত্যপি সমাশতৈঃ॥ ইতি
(উপশম প্র, ৯২।১৬)

যতদিন না এই তিনটি পুনঃপুনঃ যুগপৎ অভ্যাস দ্বারা, সম্যক্‌রূপে অভ্যস্ত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত শত শত বৎসর অতীত হইলেও (সেই পরম) পদ প্রাপ্তি ঘটে না।

যুগপৎ বা এক সঙ্গে এই তিনটির অভ্যাস না হইলে কি প্রকার প্রতিবন্ধক ঘটে তাহাই দেখাইতেছেন—

একৈকশো নিষেব্যন্তে যস্তেতে চিরমপ্যলম্।
তন্ন সিদ্ধং প্রযচ্ছন্তি মন্ত্রাঃ সঙ্কলিতা (৩) ইব॥
(উপশম প্র ৯২।১৮)

---

(১) মূলের পাঠ—'ইমে'র স্থলে 'মুনে'।

(২) মূলের পাঠ— ত্রয় এতে'র স্থলে "সর্ব্বথা তে"।

(৩) মূলের পাঠ—"সঙ্কলিতা ইব"র স্থলে "সঙ্কীলিতা ইব"। রামায়ণ-টীকাকার তাহার অর্থ লিখিতেছেন—মূর্চ্ছা, মরণ প্রভৃতি মন্ত্রশাস্ত্রোক্ত

যেমন কোনও মন্ত্রকে সময়ে সময়ে খণ্ডে খণ্ডে প্রয়োগ করিলে, তাহা অভীষ্টফলপ্রদ হয় না, সেইরূপ উক্ত তিনটি সাধনের মধ্যে যদি এক একটি করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলেও তাহা সিদ্ধিপ্রদ হয় না।

যেমন, সন্ধ্যাবন্দনে "আপো হি ষ্ঠা", (ময়ো ভুবঃ) 'জল সমূহ তোমরা (সুখসম্পাদয়িত্রী) হও' ইত্যাদি (১) তিনটি ঋক্ মন্ত্র মার্জ্জনের সহিত বিনিযোগ করিবার ব্যবস্থা আছে। যদি সেই তিনটি ঋক্-মন্ত্রের মধ্যে কেহ প্রতিদিন এক একটি করিয়া পাঠ করে, তাহা হইলে যেমন তাহার শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান (সন্ধ্যা) সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ; অথবা যে সকল মন্ত্রকে ছয় ছয় অংশে বিভক্ত করিয়া (দেহের ছয়টী অঙ্গের এক একটি অঙ্গে এক একটি মন্ত্রাংশ বিন্যাস পূর্ব্বক) প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাদের এক একটি মন্ত্র (মন্ত্রাংশ) দ্বারা যেরূপ সিদ্ধিলাভ হয় না সেইরূপ (২); অথবা লৌকিক ব্যবহারে যেরূপ

দোষদ্বারা প্রতিবদ্ধ। কিন্তু বিদ্যারণ্যমুনিকৃত পাঠই অতি সমীচীন ও সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

(১) তৈত্তিরীয় আরণ্যক, প্র ১০, অ ১।

(২) আশ্বলায়নীয় গৃহ্যসূত্রের পরিশিষ্টে প্রদত্ত গায়ত্রী জপবিধি দেখিলেই গ্রন্থকর্ত্তার অর্থ পরিস্ফুট হইবে। তথায় (আসিয়াটিক্ সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের ২৬৮ পৃষ্ঠায় "গৃহ্যপরিশিষ্টে") আছে—চারি চারি অক্ষর লইয়া গায়ত্রী মন্ত্রকে ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক ভাগ আপনার এক এক অঙ্গে বিন্যাস করিয়া আপনাকে মন্ত্ররূপ বলিয়া ভাবনা করিতে হইবে। যথা—

(১) "তৎ সবিতু" হৃদয়ায় নমঃ ইতি হৃদয়ে

(২) "বরেণিয়ং" শিরসে স্বাহা ইতি শিরসি

(৩) "ভর্গোদেব" শিখায়ৈ বষট্ ইতি শিখায়াম্

(৪) "স্য ধীমহি" কবচায় হুং ইতি উরসি

(৫) "ধিয়োযো নঃ" নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ইতি নেত্রললাটদেশেষু বিন্যস্যাথ

(৬) "প্রচোদয়াৎ" অস্ত্রায় ফট্ ইতি করতলয়োরস্ত্রম্ প্রাচ্যাদিষু দশসু দিক্ষু বিন্যসেৎ—এবং অঙ্গন্যাসঃ। এইরূপে প্রথমোক্ত বৈদিকদৃষ্টান্ত-

শাক; সূপ, অন্ন প্রভৃতির এক একটির দ্বারা ভোজন সিদ্ধ হয় না সেইরূপ।

দীর্ঘকাল ধরিয়া অভ্যাস করিবার প্রয়োজন দেখাইতেছেন—

এভিরেতৈশ্চিরাভ্যস্তৈর্হৃদয়গ্রন্থয়ো (১) দৃঢ়াঃ।
নিঃশঙ্কমেব (২) ত্রুট্যন্তি বিসচ্ছেদাদ্‌গুণা ইব॥

(উপশম প্র ৯২।২২)

দীর্ঘকাল ধরিয়া এই তিনটি সাধন অভ্যাস করিলে দৃঢ় হৃদয়গ্রন্থি-সমূহ, মৃণালখণ্ড হইতে তন্তুর ন্যায় নিঃসন্দেহ ছিন্ন হইয়া থাকে।

ব্যতিরেকমুখে উক্ত কারণের অসদ্ভাবে উক্ত কার্য্যের অসদ্ভাব দেখাইতেছেন—

জন্মান্তরশতাভ্যস্তা রাম সংসারসংস্থিতিঃ।
সা চিরাভ্যাসযোগেন বিনা ন ক্ষীয়তে ক্বচিৎ॥

(উপশম প্র ৯২।২৩)

হে রাম, এই জগদ্‌ভ্রমের স্থায়িত্ব শত শত জন্ম ধরিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহা দীর্ঘকালব্যাপী অভ্যাসযোগ ব্যতিরেকে কোনও স্থলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

এক একটির পৃথক্ পৃথক্ অভ্যাস করিলে, কেবল যে ফললাভ ঘটে না তাহা নহে, কিন্তু সেই একটি (সাধন)ও যথাযথরূপে নিজের স্বরূপতা লাভ করে না, ইহাই নিম্নলিখিত শ্লোকে বলিতেছেন।—

দ্বারা উত্তমাধিকারীকে বুঝাইয়া, এই তান্ত্রিক দৃষ্টান্ত দ্বারা মধ্যমাধিকারীকে বুঝাইলেন ও পরিশেষে ভোজন দৃষ্টান্তদ্বারা অধমাধিকারীকে বুঝাইলেন।

(১) রামায়ণের টীকাকার বলেন—হৃদয়গ্রন্থি শব্দে অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণ-ধর্ম্ম সমূহের তাদাত্ম্যাধ্যাস ও সংসর্গাধ্যাস, অর্থাৎ প্রথম প্রকারের অধ্যাস অধিষ্ঠানজ্ঞান দ্বারা বোধযোগ্য, দ্বিতীয় প্রকারের অধ্যাস অধিষ্ঠানজ্ঞান দ্বারা বোধযোগ্য নহে।

(২) মূলের পাঠ "নিঃশঙ্কমেব"র স্থলে "নিঃশেষমেব"।

তত্ত্বজ্ঞানং মনোনাশো বাসনাক্ষয় এব চ।
মিথঃ কারণতাং গত্বা দুঃসাধ্যানি স্থিতানি হি (১)॥ ইতি

তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ, ও বাসনাক্ষয় ইহারা পরস্পর পরস্পরের কারণ হওয়াতে ঐ সাধন তিনটি দুঃসাধ্য হইয়া রহিয়াছে।

(উপশম প্র, ৯২।১৪)

এই তিনটির মধ্যে দুইটি দুইটি করিয়া এক করিলে তিনটি যুগ্মক হয়। তন্মধ্যে মনোনাশ-বাসনাক্ষয় নামক যুগ্মকের একটি যে অপরটির কারণ তাহাই ব্যতিরেকমুখে (অর্থাৎ একটি না থাকিলে অপরটি থাকে না এইরূপ দেখাইয়া) নির্দ্দেশ করিতেছেন।

যাবদ্বিলীনং ন মনো ন তাবদ্বাসনাক্ষয়ঃ।
ন ক্ষীণা বাসনা যাবচ্চিত্তং তাবন্ন শাম্যতি॥

(উপশম প্র, ৯২।১১)

যে পর্য্যন্ত না মন বিনষ্ট হইতেছে, সে পর্য্যন্ত বাসনা ক্ষয় হইতেছে না, এবং যে পর্য্যন্ত না বাসনা ক্ষয় হইতেছে, সে পর্য্যন্ত চিত্তের বিনাশ হইতেছে না।

প্রদীপশিখা আপাতদৃষ্টিতে একটি মাত্র বলিয়া বোধ হইলেও বস্তুতঃ উহা একটি নহে, উহা অসংখ্য শিখার শ্রেণী। অত্যন্ত দ্রুত-বেগে একটির পর একটি করিয়া উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে বলিয়া উহারা একটি বলিয়া দেখায়।

অন্তঃকরণ বলিতে যে বস্তুটিকে বুঝা যায় তাহা (সেই) দীপ-শিখার শ্রেণীর ন্যায় একটি অসংখ্য বৃত্তির শ্রেণীরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। (বৃত্তির নামান্তর মননক্রিয়া) অন্তঃকরণ মননাত্মক বৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে বলিয়া তাহাকে মন বলা হইয়া থাকে। মন বৃত্তিরূপ পরিণাম পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্ধের আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইলে তাহাকে মনের নাশ বলে। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে ইহা এইরূপে সূত্রনিবদ্ধ করিয়াছেন।—

(১) মূলের পাঠ—'স্থিতানি হি'র স্থলে 'স্থিতান্যত

"ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ
নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ"। ইতি। (১)
(পাতঞ্জলসূত্র- বিভূতিপাদ, ৯)

(যখন) ব্যুত্থানসংস্কার সকল অভিভূত হয়, নিরোধসংস্কার সকল আবির্ভূত হয়, এবং নিরোধবিশিষ্ট-ক্ষণ-চিত্তের সহিত অন্বিত অর্থাৎ সম্বন্ধপ্রাপ্ত হয়, তখন সেই অবস্থার নাম মনোনাশ বুঝিতে হইবে। ক্রোধ প্রভৃতির মধ্যে কোনও বৃত্তি, যাহা অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া হঠাৎ উৎপন্ন হয়, তাহার হেতু চিত্তস্থিত সংস্কার—তাহার নামান্তর বাসনা। কেন না, পুষ্পাদির সংসর্গ যেরূপ বস্ত্রাদিতে বাস বা সুগন্ধ রাখিয়া যায় সেইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যাস চিত্তে তত্তৎ সংস্কার রাখিয়া যায়। সেই বাসনার ক্ষয় অর্থে এই বুঝিতে হইবে, যে বিচারজনিত শম দম প্রভৃতি শুদ্ধ সংস্কার দৃঢ় হইলে পর বাহ্য কারণ উপস্থিত থাকিলেও ক্রোধাদির উৎপত্তি না হওয়া। তাহা হইলে যদি মনের নাশ না হয় তবে বৃত্তি সমূহ

(১) সত্ত্বাদি ত্রিগুণের ব্যাপার সর্ব্বদাই অস্থির অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। পরিণাম শব্দের অর্থ, পূর্ব্বধর্ম্মের লয়ে অন্য ধর্ম্মের উৎপত্তি, যেমন মৃৎপিণ্ডে পিণ্ডত্ব ধর্ম্মের লয়ে ঘটত্ব ধর্ম্মের উৎপত্তি। চিত্ত যখন ত্রিগুণাত্মক তখন কোন অবস্থাতেই চিত্ত পরিণামশূন্য থাকিবে না; নিরোধক্ষণেও চিত্তের পরিণামধারা চলিতে থাকে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নিরোধক্ষণের সেই পরিণামধারা কিপ্রকার এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত পাতঞ্জলসূত্রের অবতারণা। নিরোধক্ষণে বৃত্তির দ্বারা পরিণামধারা চলে না বলিয়া পরিণাম লক্ষিত হয় না। তখন কেবল সংস্কার দ্বারাই পরিণামধারা চলিতে থাকে, কারণ, দেখা যায় অভ্যাস দ্বারা নিরোধসংস্কার বর্দ্ধিত হয় এবং অনভ্যাসে তাহার বিচ্ছেদ ঘটে। সূত্রস্থিত ব্যুত্থান শব্দের অর্থ সম্প্রজ্ঞাত, ও নিরোধ শব্দের অর্থ পরবৈরাগ্য। [যোগমণিপ্রভা নাম্নী পাতঞ্জলসূত্রের লঘুবৃত্তিতে ৩।৯ সূত্রের বৃত্তি দ্রষ্টব্য।] এস্থলে উক্ত সূত্রের দ্বারা মুনিবর বুঝাইতেছেন যে, কাম ক্রোধাদির সংস্কারের ক্ষয় করিতে হইলে চিত্তের বৃত্তিরোধ অভ্যাস করা আবশ্যক।

উৎপন্ন হইতে থাকে এবং কোন সময়ে বহু কারণ বশতঃ ক্রোধাদিরও উৎপত্তি হইয়া যায় সুতরাং বাসনাক্ষয় সম্ভবে না; এবং বাসনার ক্ষয় না হইলে পর সেইরূপ বৃত্তি সমূহ উৎপন্ন হইতে থাকে সুতরাং মনোনাশ সম্ভবে না।

তত্ত্বজ্ঞান ও মনোনাশ এই দুইটি পরস্পর পরস্পরের কারণ, তাহাই ব্যতিরেকমুখে দেখাইতেছেন ঃ

"যাবন্ন তত্ত্ববিজ্ঞানং তাবচ্চিত্তশমঃ কুতঃ।
যাবন্ন চিত্তোপশমো ন তাবত্তত্ত্ববেদনম্॥"

(উপশম প্র, ৯২।২)

যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞান জন্মে সে পর্য্যন্ত মনোনাশ কি প্রকারে হইতে পারে? এবং যে পর্য্যন্ত না চিত্তনাশ হয় সে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান হয় না।

এই (অনুভূয়মান জগৎপ্রপঞ্চ) আত্মাই (অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক কিছু নহে) এবং রূপরসাদিরূপ যে জগৎ প্রতীত হইতেছে তাহা মায়াময় এবং বস্তুতঃ তাহা নাই, এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধির নাম তত্ত্বজ্ঞান। সেই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন না হইলে, রূপ, রস প্রভৃতি বিষয় সমূহ উপস্থিত হইলেই তত্তৎ বিষয়ক চিত্তবৃত্তি সমূহ (উৎপন্ন হইতে থাকে, এবং তাহাদিগকে) নিবারণ করিতে পারা যায় না। যেরূপ ইন্ধনাদি অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকিলে, অগ্নিশিখা কিছুতেই নিবারিত হয় না সেইরূপ।

(অপর পক্ষে) চিত্তনাশ না হইলে, চিত্তবৃত্তি সমূহ রূপরসাদি বিষয় গ্রহণ করিতে থাকে, তাহা হইলে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃ-উ ৪।৪।১৯) —(এই ব্রহ্মে (পরমার্থতঃ) কিছু মাত্র ভেদ নাই, এই শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় (ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই) এই প্রকার তত্ত্ব-বিষয়ক নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে না, কেননা প্রত্যক্ষে বিরোধ ঘটে বলিয়া উক্তবাক্যে সংশয় জন্মে অর্থাৎ যদি বলা যায়, (এই) কুশমুষ্টি যজমান বা যজ্ঞকর্ত্তা তাহা হইলে যেমন সেই কুশমুষ্টিকে যজমান বা যজ্ঞকর্ত্তা বলিয়া নিশ্চয় বুদ্ধি জন্মে না সেইরূপ। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ষ্টুডেণ্টস্ হোম

কলিকাতা।

আমরা উক্ত আশ্রমের ১৯২০ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। আশ্রমটীর বয়স ৬ বৎসর হইলেও অনেকেই হয়ত ইহার কথা জানেন না। এতদিন সহরের কোলাহলের মধ্যে নীরবে ইহার ক্ষুদ্র জীবনস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল—তাই সাধারণের চক্ষে পড়ে নাই। কিন্তু নীরব ও ক্ষুদ্র বস্তু মাত্রেই উপেক্ষণীয় নহে। নীরবতা ও পবিত্রতার মধ্যেই শক্তি বিদ্যমান। তাই ইহা কিছুদিন হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল এবং ইহার উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব ও কার্য্যপ্রণালীর সুশৃঙ্খলতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া মিশনের কর্তৃপক্ষগণ বিগত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই আশ্রমটীকে মিশনের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন।

আজকাল অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মুখেই শুনা যাইতেছে যে, আমাদের ছেলেরা স্কুল কলেজে যে শিক্ষা পাইতেছে তাহা বড়ই অসম্পূর্ণ—উহাতে তাহাদের মস্তকে কতকগুলি পুস্তকের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয় মাত্র; কিন্তু তাহাদের চরিত্রগঠনের দিকে আদৌ নজর দেওয়া হয় না। কথাটী যে ঠিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শিক্ষাটা আমাদের দেশে এতই খেলো হইয়া পড়িয়াছে। ফলে, ছেলেরা যখন পাঠ শেষ করিয়া সংসারে প্রবেশ করে তখন 'মানুষ' হইয়া প্রবেশ করে না—সত্যহীন, ব্রহ্মচর্য্যহীন, সংযমহীন, উদ্যমহীন—এক কথায় সম্পূর্ণরূপে নৈতিক মেরুদণ্ডহীন হইয়া তাহারা জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা দিবার জন্য অগ্রসর হয়! ইহা অতিরঞ্জিত কথা নহে। ইহার প্রত্যক্ষফল সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। পূর্ব্বে গুরুগৃহবাসকালে গুরুদেব যেমন ছাত্রদিগকে নানা বিদ্যা শিক্ষা দিতেন তেমনি তাহাদের

চরিত্রগঠনের উপরও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। পিতাপুত্র সম্বন্ধে তিনি ছাত্রদের আদর্শজীবনগঠনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। এখন শিক্ষক শিক্ষিতের মধ্যে সে সম্বন্ধ নাই। স্কুল, কলেজে নির্দ্দিষ্ট ২।৩ ঘণ্টা সময় ব্যতীত শিক্ষকের সহিত ছাত্রদের দেখা শুনাই হয় না, হোষ্টেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সহিত তাহা অপেক্ষাও কম সম্বন্ধ—হাজিরা বহিতে হাজিরা ঠিক থাকিলে এবং মাসের নির্দ্দিষ্ট তারিখে টাকা জমা দিলেই হইল,—সুতরাং তাঁহারা ছাত্রের চরিত্রগঠন করিবেন কি করিয়া?

এইরূপে বর্ত্তমান শিক্ষায় চরিত্রগঠনের স্থান নাই দেখিয়া সেই গুরুতর অভাবটী পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে আলোচ্য আশ্রমটীর প্রতিষ্ঠা। ছেলেরা স্কুল কলেজে যেমন বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে করুক, কিন্তু অবশিষ্ট সময়টা তাহারা যেন এমন একজন লোকের কাছে থাকে, যিনি সর্ব্বদা তাহাদের সহিত সমভাবে মিশিবেন ও যাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য দর্শনে তাহাদের অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণরাজি আপনা হইতেই বিকশিত হইয়া উঠিবে। তিনি কোনরূপ জোর জবরদস্তি বা কঠোর আইনকানুন করিবেন না, কিন্তু তাহাদের যথার্থ ভালবাসিয়া এরূপ আপনার করিয়া লইবেন যে, সাধ্য কি ছেলেরা আশ্রমের ভাব বা নীতিবিরুদ্ধ কোন কার্য্য করে। এইভাবে তিনি তাহাদিগকে practical, moral, intellectual ও spiritual—সব রকম শিক্ষা দিবেন, যাহাতে ছেলেরা কার্য্যক্ষম, শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, সেবাপরায়ণ ও ভগবদনুরাগী—এক কথায় যাহাতে তাহারা ঠিক ঠিক মানুষ হইয়া উঠিতে পারে।

আশ্রমে কোন চাকর না থাকায় রন্ধন ব্যতীত অপর সমস্ত কাজ, যথা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, হাটবাজার করা এবং হিসাবপত্র রাখা ইত্যাদি কাজ ছেলেদের নিজেদেরই করিতে হয়। ইহাতে তাহারা বেশ স্বাবলম্বী ও শ্রমপটু হইয়া উঠে। ইহা ব্যতীত শরীররক্ষার জন্য সকলেই কোন না কোন প্রকার ব্যায়াম করিয়া থাকে। আশ্রমে একটী লাইব্রেরী আছে। ক্ষুদ্র হইলেও উহাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান,

জীবন-চরিত, ভ্রমণকাহিনী, দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল বই আছে। আশ্রমের ছেলেরা অবসরকালে ঐসকল পুস্তক পাঠ করিয়া যাহাতে প্রত্যেক বিষয়েই একটা মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয়। প্রতি শনিবারে একটী করিয়া ক্লাস করা হয় —তাহাতে ছেলেরা তাহাদের পঠিত বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠ করে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জন্য সকলেই প্রাতরুত্থান করিয়া ভগবদ্বিষয়ক ধ্যান ধারণাদি করিয়া থাকে এবং সর্ব্বদা সত্যনিষ্ঠ ও পবিত্র থাকিবার চেষ্টা করে। মোটকথা, প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় এই উভয়ের সামঞ্জস্যই এই আশ্রমের লক্ষ্য।

আশ্রমের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বর্ত্তমান ভারতের অন্যতম অভাবপূরণ— "জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার"। লোকাভাবে এই উদ্দেশ্যটী আপাততঃ কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। তবে এই আশ্রম হইতে যাঁহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইবেন তাঁহাদের দ্বারা অদূর ভবিষ্যতে এই কার্য্য চালান যাইতে পারিবে।

বর্ত্তমানে আশ্রমটীর কার্য্যভার যাঁহার হস্তে ন্যস্ত তিনি বেশ শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র এবং তাঁহার ভিতর এইরূপ একটী নূতন জিনিষকে ঠিক ঠিক ভাবে গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা ভালরূপে আছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের পরিচিত ২।৪ জন বালকের উক্ত আশ্রমে থাকিবার পূর্ব্বের ও পরবর্ত্তী সময়ের অবস্থা তুলনা করিয়া আমাদের এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে আশ্রমে ৫ জন ছাত্র ছিল; তন্মধ্যে ৪ জনের নিজ খরচ বহন করিবার ক্ষমতা না থাকায়, তাহাদের খরচ আশ্রম হইতেই বহন করা হইত। বাকী ১ জন মাত্র ছাত্র খরচ দিয়া থাকিত। বৎসরের শেষে ছাত্রসংখ্যা ৮ জন হয়—তন্মধ্যে ৫ জন বিনা বেতনে ও ৩ জন খরচ দিয়া থাকিত।

আশ্রমটী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত ও বর্ত্তমানে ১১৯।১।২ করপোরেশন ষ্ট্রীটে একটী ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্থাপিত। আশ্রমের অধিকাংশ ছেলেই বিনা বেতনে থাকে,

সুতরাং এ মহার্ঘের দিনে উঁহাদের ব্যয়ভার বহন করা এক দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে তিনটী উপায় অবলম্বনে কোন প্রকারে উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। যথা—(১) আশ্রমের অধ্যক্ষ বাহিরের কয়েকটী ছাত্রকে পড়াইয়া যাহা পান তাহা আশ্রমের জন্য খরচ করেন; (২) জনকয়েক ছাত্র খরচ দিয়া আশ্রমে থাকে; (৩) সাধারণে এককালীন দান বা মাসিক চাঁদা হিসাবে কিছু কিছু দিয়া থাকেন। আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ আয়—২২০৫৮৴১০ টাকা এবং সর্ব্বশুদ্ধ ব্যয়—২২০২৶৴৫ টাকা। উদ্বৃত্ত তহবিল মোট ৩৷৴১৫ টাকা মাত্র।

উক্ত আয়ব্যয়ের হিসাব হইতেই দেখা যাইতেছে যে, আশ্রমটীর আর্থিক অবস্থা নিতান্ত খারাপ। আশ্রমটীকে সুচারুরূপে চালাইতে হইলে একটী স্থায়ী ফণ্ড হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এই ভাবের আশ্রম কলিকাতায় এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব স্মরণ করিয়া আশ্রমটী যাহাতে স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে দেশহিতৈষী সহৃদয় জনসাধারণের সহানুভূতি ও আগ্রহাতিশয্য দেখিলে আমাদের উৎসাহ আরও বর্দ্ধিত হইবে। ইহার সাহায্যকল্পে যিনি যাহা দান করিতে চান তাহা নিম্নলিখিত তিনটী ঠিকানার যে কোন একটীতে পাঠাইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।—
(১) প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণমিশন, মঠ, পোঃ, বেলুড় হাওড়া। (২) সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণমিশন, ১ নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। (৩) ব্রহ্মচারী অনাদিচৈতন্য, ১১৯।১ নং করপোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সংবাদ ও মন্তব্য।

ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণমিশন দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিগত এপ্রিল মাসের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী নিম্নে প্রকাশিত হইল। সর্ব্বসমেত ১[illegible]২৭০ জন রোগী উপস্থিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ১০৬৯ (পুরুষ ৫৮৪, স্ত্রী ৪৮৫)। প্রতিদিন গড়ে ৩৫.৩৬ জন নূতন রোগী ও ৬৪.২৩ জন পুরাতন রোগী উপস্থিত ছিল। এতদ্ব্যতীত এই মাসে দুইটী অস্ত্রচিকিৎসাও হইয়াছিল।

মহাসমাধি।

বিগত ১১ই বৈশাখ, সন ১৩২৭ সাল, ইংরাজী ২৪শে এপ্রিল ১৯২০ খৃষ্টাব্দ, দিবা দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস দেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ ভক্তমণ্ডলীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ৺কাশীধামে মহাসমাধিযোগে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করতঃ শ্রীগুরুপদপ্রান্তে চলিয়া গিয়াছেন।

স্বামী অদ্ভুতানন্দের অলৌকিক জীবনকাহিনী ভাবরাজ্যের সূক্ষ্ম অনুভূতির বিষয়—বাক্যে প্রকাশ করিবার নহে। তথাপি তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ দুইচারি কথা লেখা আমাদের কর্ত্তব্য। ছাপড়া জিলায় কোন দরিদ্র পিতামাতার গৃহে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্ব নাম 'লাটু'। বাল্যে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় ইনি চাকুরীর সন্ধানে কলিকাতা আগমন করেন, এবং শিমলার শ্রীযুত রামচন্দ্র দত্তের গৃহে সাধারণ হিন্দুস্থানী বেয়ারারা যে সকল কাজ করিয়া থাকে সেই সকল কাজ করিতে নিযুক্ত হন। রামবাবু তখন

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতেন সুতরাং মধ্যে মধ্যে শ্রীযুত লাটুকে দিয়া তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ফলমিষ্টাদি পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপে তিনি ঠাকুরের দর্শনলাভে কৃতার্থ হন। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর কিন্তু তাঁহার অনৈক ভক্তের ভৃত্যবেশে উপস্থিত হইলেও শ্রীযুত লাটুকে নিজ অন্তরঙ্গ বলিয়া চিনিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে আবার আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত লাটুও, কি জানি কেন, এই অপরিচিতের প্রতি অন্তরে অন্তরে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি ঠাকুরের নিকট আসিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন এবং রামবাবু ফলমূল পাঠাইলে তিনি সানন্দে সেগুলি ঠাকুরের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া স্বেচ্ছায় তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইতেন—হয়ত দু-একদিন তাঁহার নিকট রহিয়াই গেলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তখন 'নহবতে' থাকিতেন। স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা হইলেও বাড়ীর চাকরবাকরের নিকট স্ত্রীলোকেরা লজ্জাসঙ্কোচ করে না। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও তাই বালক লাটুকে দেখিয়া সঙ্কুচিতা হইতেন না; বরং তাঁহাদ্বারা জল আনা, ময়দা পেসা, বাজার করা প্রভৃতি ছোটখাট কাজগুলি করাইয়া লইতেন। শ্রীযুত লাটুও সানন্দে উহা সম্পন্ন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন

এইরূপে দিন যায়। অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন রামবাবুর নিকট শ্রীযুত লাটুকে তাঁহার কাছে রাখিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে রামবাবু এবং লাটু উভয়েই সানন্দে স্বীকৃত হওয়ায় শ্রীযুত লাটু সেইদিন হইতে ঠাকুরের নিকট থাকিয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের মধ্যে এইরূপে ইনিই সর্ব্বপ্রথম গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুসেবায় মনপ্রাণ অর্পণ করিলেন।

শ্রীযুত লাটু বড় কীর্ত্তন ভালবাসিতেন। তাঁহার রামবাবুর বাটীতে অবস্থান কালে আমরা ইহার পরিচয় পাই। শুনা যায়, রাস্তা দিয়া কীর্ত্তনসম্প্রদায় যাইলে তিনি কাজকর্ম্ম ভুলিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া যাইয়া তাহাতে যোগদান করিতেন এবং বহুক্ষণ তাহাতে মাতিয়া থাকিতেন। তাঁহার এইরূপ কার্য্য-অবহেলার জন্য তাঁহাকে মধ্যে

মধ্যে তিরস্কারও সহ্য করিতে হইত। দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই সংকীর্ত্তন হইত এবং শ্রীযুত লাটু ও অন্যান্য ছেলেরা তাহাতে যোগ দিয়া মহা উল্লাসে নৃত্যাদি করিতেন। ছেলেদের অনুরাগ দেখিয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "মা এদের একটু ভাবটাব হোক।" আধার শুদ্ধ থাকিলে অল্প অভ্যাসে ফল দেখা যায়। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রার্থনার কিছুদিন পরেই শ্রীযুত লাটুর ও অপর কাহারও কাহারও ভাব হইতে লাগিল।

এইরূপে ঠাকুরের পূত সঙ্গে ও তাঁহার আন্তরিক সেবায় শ্রীযুত লাটু দিন দিন আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ঠাকুর তাঁহাকে ধ্যান ধারণাদি উচ্চ উচ্চ বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শ্রীযুত লাটু তখন সমস্ত দিন খাটিয়া খুটিয়া সন্ধ্যার সময় ঘুমাইয়া পড়িতেন। একদিন ইহা ঠাকুরের চক্ষে পড়ায় তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "সে কিরে, সন্ধ্যায় ঘুম কিরে? সন্ধ্যায় ঘুমুবি ত ধ্যান-ধারণা কর্‌বি কখন?" বাস্, ইহাই যথেষ্ট। সেই দিন হইতে তিনি যে রাত্রে নিদ্রাত্যাগ করিলেন জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সেই অভ্যাস রক্ষা করিয়াছিলেন। কি ঠাকুরের সঙ্গে, কি তাঁহার দেহত্যাগের পরে তিনি আজীবন প্রায় সারারাত্রি জাগিয়া ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত করিতেন এবং দিবাভাগে নিদ্রা যাইতেন। গীতার সেই ভগবদুক্তি—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"—

তাঁহার জীবনে আক্ষরিক অর্থেও বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। উত্তর-কালে তাঁহাতে যে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হইয়াছিল তাহা এইরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপী কঠোর সাধনার ফল।

এইরূপে সারারাত্র ধ্যান-ধারণায় রত থাকিলেও তিনি নিয়মিত ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিয়া যাইতেন। যখন ঠাকুর অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরে ও কাশীপুর উদ্যানে ছিলেন তখনও তিনি বরাবর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং এই সময়ে যখন ঠাকুর তাঁহার ত্যাগী যুবক শিষ্যমণ্ডলীকে সন্ন্যাস ও গেরুয়াবস্ত্র দান করেন, তখন

ইনিও তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর যখন তাঁহার যুবক ত্যাগী শিষ্যগণ কিছুদিনের জন্য গৃহে ফিরিয়া গিয়া পাঠাদি সমাপ্ত করিয়া আসিবেন, কি এখনই সংসার ত্যাগ করতঃ সাধন ভজনে রত থাকিয়া শ্রীগুরুপ্রদর্শিত পথে চলিবেন এই সংশয়দোলায় দোদুল্যমান, তখন সর্ব্বপ্রথম শ্রীযুত লাটু, তারক ও বুড়ো-গোপাল এই তিনজনের বাড়ী ঘরের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ইতিপূর্ব্বেই বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ও তাঁহাদের মাথা গুঁজিবার স্থান না থাকায়, তাঁহাদের থাকিবার জন্য বরাহনগরে একটী বাড়ী ভাড়া করা হয়। ইহাই হইল বরাহনগর মঠের সূত্রপাত। অতঃপর ক্রমেই শ্রীযুত নরেন্দ্র প্রমুখ ঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগী শিষ্য-মণ্ডলী একে একে এখানে আসিয়া সমবেত হন এবং সকলে মিলিয়া ভগবান্ লাভের তীব্র ব্যাকুলতায় আহার নিদ্রা ভুলিয়া দিবারাত্র ধ্যান, জপ, কীর্ত্তনাদিতে ডুবিয়া থাকেন। এইখানেই স্বামিজী সকলকে লইয়া যথাবিধি বিরজা হোম করেন এবং সকলকে সন্ন্যাস নাম প্রদান করেন। এই সময়েই শ্রীযুত লাটুর অদ্ভুতচরিত্র—তাঁহার অদ্ভুত ভাব, ধ্যানধারণায় অদ্ভুত অনুরাগ ও অন্যান্য অদ্ভুত আচরণ স্মরণ করিয়া স্বামিজী তাঁহাকে 'অদ্ভুতানন্দ' নামে অভিহিত করেন।

অতঃপর তিনি আলমবাজার মঠ, বেলুড় মঠ, কলিকাতায় 'বলরাম মন্দির' ও অন্যান্য স্থানে অনেকদিন অতিবাহিত করেন এবং স্বামিজীর প্রথমবার বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর কিছুদিন তাঁহার সহিত আলমোড়া, রাজপুতানা, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। স্বামিজী বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য মঠ, মিশন প্রভৃতি নানাবিধ লোকহিতকর কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করেন এবং তাঁহার অন্যান্য গুরুভ্রাতৃগণকে উক্ত কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য আহ্বান করেন। এই আহ্বানে অনেকেই তাঁহার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কিন্তু পূজ্যপাদ লাটু মহারাজ ইহাতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। তিনি যেভাবে আজীবন গড়িয়া উঠিয়াছিলেন সেই ধ্যান ধারণা-কীর্ত্তনাদি উচ্চাঙ্গের কর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত প্রচার, সেবা

প্রভৃতি রজঃপ্রধান বাহ্য কর্ম্মের কিছুতেই সামঞ্জস্য করিতে পারিলেন না। তিনি বরাবর ধ্যান ধারণাদি লইয়াই রহিলেন।

তিনি আদৌ লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু মনোযোগ সহকারে বেদ, বেদান্ত, পুরাণাদি শ্রবণ করিতেন এবং সহজেই তাহাদের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতেন। তিনি যে সহজেই শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারিতেন তাহার প্রধান কারণ এই যে, শাস্ত্রের যাহা গূঢ়ার্থ তাহা তিনি অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিতেন। কাজেই শাস্ত্রোক্ত কোন কথাই তাঁহার নিকট নূতন ঠেকিত না। একবার জনৈক সাধু তাঁহাকে কঠোপনিষদ্ শুনাইতেছিলেন। যেমন তিনি পাঠ করিলেন—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ॥"

তখন তিনি, "প্রবৃহেৎ মুঞ্জাৎ ইব ইষীকাং ধৈর্য্যেণ" অর্থাৎ ধানের শিষটা যেমন অতি সন্তর্পণে ধৈর্য্যসহকারে খড় হইতে পৃথক্ করা যায় সেইরূপ ধৈর্য্যসহকারে অন্তরাত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ করিবে," এই কথাটী শুনিয়া বড়ই খুসী হইয়া বলিয়াছিলেন, "এই ঠিক বলেছে।" তাঁহার এইরূপ অবস্থা লাভ হইয়াছিল বলিয়াই তিনি সহজে এই দুর্ব্বোধ্য কথাটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

মোটকথা, তিনি অপরের নিকট শুনিয়া শুনিয়া সমস্ত বিষয়েই এমন একটা সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণও তাঁহাকে যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি তাহার এমন একটী সুন্দর উত্তর দিতেন যাহাতে সকলেই চমৎকৃত হইয়া যাইত। তাঁহার মীমাংসা হয়ত অপরের সহিত না মিলিতে পারে কিন্তু তিনি যে দিক্ হইতে প্রশ্নটীর উত্তর দিতেন সেই দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে উহা যে বাস্তবিকই খুব বুদ্ধিমানের মত উত্তর, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিত না। উদ্বোধনের পাঠকবর্গও ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে 'উদ্বোধনে' ধারাবাহিকরূপে 'সৎকথা' শীর্ষক যে সকল অমূল্য উপদেশ বাহির হইয়া গিয়াছে, সেগুলি ইঁহারই প্রদত্ত উপদেশ ও

কথাবার্ত্তা হইতে সঙ্কলিত। শ্রদ্ধাস্পদ গিরীশ বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অতুল বাবু বলিতেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের miracle যদি দেখিতে চাও তবে লাটু মহারাজকে দেখ। এর চেয়ে বড় miracle আমি আর কিছু দেখিনে।" পূজ্যপাদ স্বামিজীও বলিতেন, "লাটু যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য হইতে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যে আধ্যাত্মিক জগতে যতটা উন্নতিলাভ করিয়াছে, আর আমরা যে অবস্থা হইতে যতটা উন্নতি করিয়াছি, এতদুভয়ের তুলনা করিয়া দেখিলে সে আমাদের অপেক্ষা অনেক বড়। আমরা সকলেই উচ্চবংশজাত এবং লেখাপড়া শিখিয়া মার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলাম। লাটু কিন্তু সম্পূর্ণ নিরক্ষর। আমরা, ধ্যান ধারণা ভাল না লাগিলে পড়াশুনা করিয়া মনের সে ভাব দূর করিতে পারিতাম, লাটুর কিন্তু অন্য অবলম্বন ছিল না। তাহাকে একটীমাত্র ভাব অবলম্বনেই আজীবন চলিতে হইয়াছে। কেবলমাত্র ধ্যান ধারণা সহায়ে লাটু যে মস্তিষ্ক ঠিক রাখিয়া অতি নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চতম আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, তাহাতে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির ও শ্রীশ্রীঠাকুরের তাহার প্রতি অশেষ কৃপার পরিচয় পাই।"

লাটু মহারাজের একটা বিশেষত্ব ছিল সকলের সহিত প্রাণ খুলিয়া মেলামেশার ভাব। তাঁহার কিছুমাত্র অভিমান ছিল না। বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিত ও তাঁহার নিকট হইতে ছোলাভাজা, হালুয়া প্রভৃতি প্রসাদ পাইবার জন্য ভিড় করিত। তিনি খুব সরল, তেজস্বী ও স্পষ্টবক্তা ছিলেন।

শেষ জীবন তিনি বিশ্বনাথের চরণ প্রান্তে অতিবাহিত করিবার জন্য ৺কাশী গমন করেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সারারাত্রি ধ্যানধারণা করিতেন অথচ আহার বিহারে কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতেন না— সর্ব্বদাই যেন একটা ভাবে থাকিতেন। ভগবৎ প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ তাঁহার নিকট বড় একটা শুনা যাইত না। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথা বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন। ভক্তবৃন্দ

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার কথামৃত পান করিত। অবশেষে তিনি সকলকে প্রসাদ দিয়া বিদায় দিতেন।

এইরূপে কঠোর তপশ্চরণ, নাম মাত্র আহার ও অনিদ্রায় তাঁহার বৃদ্ধ শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া অবশেষে কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। গত ২৩ বৎসর হইতে তিনি অজীর্ণ ও উদরাময় রোগে ভুগিতেছিলেন। কিন্তু তিনি শরীরের দিকে আদৌ নজর দিতেন না। 'শরীর ধারণ বিড়ম্বন' এই কথাটী প্রায়ই তাঁহার মুখে শুনা যাইত। ইদানীং অধিকাংশ সময় ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন—ইচ্ছা হইত ত কাহারও সহিত কথা কহিতেন নতুবা চুপচাপ থাকিতেন। দেহত্যাগের প্রায় ১ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পায়ে একটা ফোস্কা হইয়া ঘা হয়। তিনি উহার বিশেষ কোন যত্ন লইতেন না। উহা ক্রমে বিষাক্ত হইয়া 'গ্যাংগ্রিণে' পরিণত হয়। উপর্য্যুপরি চারিদিন প্রত্যহ ২।৩ টা করিয়া তাঁহার শরীরে অস্ত্র করা হইয়াছিল; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাঁহার একটুকু বিকার নাই—যেন অপর কাহারও শরীরের উপর অস্ত্রচালনা করা হইতেছে! এরূপ দেহজ্ঞানরাহিত্য মানুষে সম্ভবে না। তাঁহার মন জীবজগৎ, এমন কি, নিজের অতি প্রিয় দেহ ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে—বহু ঊর্দ্ধে সেই পরমানন্দময় সত্য-শিব-সুন্দরের ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকিত—"যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"। তাঁহার শেষ-সময়ের সংবাদ নিম্নোদ্ধৃত পূজনীয় তুরীয়ানন্দ স্বামীজির ২৫।৪।২০ তারিখের পত্রে পাঠকবর্গ আরও সুন্দররূপে অবগত হইবেন—

"প্রিয়বর—

* * * লাটু মহারাজের অন্তিম সংবাদ আপনি তারযোগে অবগত হইয়া থাকিবেন। এমন অদ্ভুত মহাপ্রয়ান প্রায় দেখা যায় না। ইদানীং সর্ব্বদাই অন্তর্মুখ থাকিতেন লিখিয়াছি। অসুখের সময় হইতে একেবারে ধ্যানস্থ ছিলেন। ভ্রূমধ্যবদ্ধ দৃষ্টি। সকল বাহ্য বিষয় হইতে একেবারে সম্পূর্ণ উপরত। সদা সচেতন অথচ কিছুরই খবর রাখিতেন না। একদিন ড্রেসিং হইতেছে, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি অসুখ? ডাক্তাররা কি বলিতেছে? আমি বলিলাম,

অসুখ তেমন কিছু নহে, খালি দুর্ব্বলতা। না খেয়ে শরীর পাত করিয়াছ, এখন আর লড়িবার ক্ষমতা নাই; একটু খেয়ে জোর করিলেই সব সারিয়া যাইবে। তাহাতে বলিলেন, শরীর গেলেই ত ভাল। আমি বলিলাম, তোমার ওকথা বলিতে নাই, ঠাকুর যেমন করিবেন সেইরূপ হইবে। তাহাতে বলিলেন, তাত জানি তবে আমাদের কষ্ট। ইহার পর আর তেমন কথাবার্ত্তা হয় নাই। মধ্যে মধ্যে প্রায় প—কে ডাকিতেন। প—র হাতে খাইতেন। কখন কিছু না খাইলে প— বলিত, তবে আমিও কিছু খাইব না। অমনি লাটু মহারাজ খাইয়া লইতেন। কিন্তু দেহত্যাগের পূর্ব্বরাত্রে কিছুই খাইলেন না। প— বলিল খাইলেন না, তবে আমিও আর খাইব না। লাটু মহারাজ এবার বলিলেন, "মত খা"—একেবারে মায়ানির্ম্মুক্ত উক্তি।

পরদিন সকালে আমি যাইয়া দেখি খুব জ্বর। নাড়ী দেখিলাম—নাড়ী নাই। ডাক্তার আসিয়া হার্ট পরীক্ষা করিলেন—শব্দ পাইলেন না। টেম্পারেচর ১০২.৬। বেশ সজ্ঞান—তবে কোনও বাহ্য চেষ্টা নাই। প্রাতে একবার দাস্ত হইয়াছিল। বেশ ভাল স্বাভাবিক মল নির্গত হইয়াছিল। তবে অন্য দিন উঠিয়া বসিতেন, সেদিন আর উঠিতে পারেন নাই। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও দু'চার ফোঁটা বেদানার রস ও দু'চার ফোঁটা জল ছাড়া আর কিছুই খাওয়াইতে পারা যায় নাই। দুধ দিলে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ৺বিশ্বনাথের চরণামৃত অতি সন্তোষের সহিত খাইয়াছিলেন। মাথায় বরফ ও অডিকলন দেওয়া হইতে লাগিল। বেলা দশটার পর আমি বিদায় লইয়া পুনরায় চারটার সময় উপস্থিত হইব বলিয়া আসিলাম। সেই সময় ডাক্তার শ্রীপৎসহায়েরও আসিবার কথা স্থির ছিল। বাটী আসিয়া স্নানাহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতেছি, সংবাদ পাইলাম, লাটু মহারাজ বারটা দশ মিনিটের সময় ইহলোক ছাড়িয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। তখনই আপনাকে ও শ—কে তার করিতে বলিয়া আমি তাঁহাকে শেষ দর্শন করিবার জন্য ৬৯ নং হাড়ার বাগ বাটীতে উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখিলাম ডানদিক্ চাপিয়া পাশ

বালিসে হাত রাখিয়া যেন নিদ্রা যাইতেছেন। গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম জ্বরের সময় যেমন গরম ছিল সেইরূপ গরমই রহিয়াছে। কাহার সাধ্য বোঝে যে চিরনিদ্রায় মগ্ন হইয়াছেন—কেবল অধিক প্রশান্ত ভাব মাত্র। মঠের সকলেই উপস্থিত খুব নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। প্রায় তিন ঘণ্টা কাল প্রগাঢ় ভগবদ্ভজন হইয়াছিল। বেলা সাড়ে চারটার পর তাঁহাকে বসাইয়া যথারীতি পূজাদি করিয়া আরাত্রিকান্তে নীচে নামাইয়া আনা হইল।

যখন তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া পূজাদি করা হয় তখনকার মুখের ভাব যে কি সুন্দর দেখাইয়াছিল তাহা লিখিয়া জানান যায় না। এমন শান্ত সকরুণ মহা আনন্দময় দৃষ্টি আমি পূর্ব্বে কখনও লাটু মহারাজের আর দর্শন করি নাই। ইতিপূর্ব্বে অর্দ্ধনিমিলিত নেত্র থাকিত, এখন একেবারে বিস্ফারিত ও উন্মুক্ত হইয়াছিল। তাহাতে যে কি ভালবাসা, কি প্রসন্নতা, কি সাম্য ও মৈত্রীভাব দেখিলাম তাহা বর্ণনার অতীত। যে দেখিল সেই মুগ্ধ হইয়া গেল। বিষাদের চিহ্নমাত্র নাই। আনন্দের ছটা বাহির হইতেছে, সকলকেই যেন প্রীতিভরে অভিনন্দন করিতেছেন। এ সময়ের দৃশ্য অতীব অদ্ভুত ও চমৎকার প্রাণস্পর্শী। অদ্ভুতানন্দ নাম পূর্ণ করিতেই যেন প্রভু এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইলেন। তাঁহার শরীর, শয্যা যখন নূতন বসন ও মাল্যচন্দনে বিভূষিত করিয়া সকলের সম্মুখে নীত হইল তখন সাধারণে সে শোভা দেখিয়া বিস্ময়ে পূর্ণ ও ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এমন যমন্ত্রী যাত্রা অপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণই বটে। প্রভুর অনন্ত মহিমার সুস্পষ্ট বিকাশ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই। কিছুক্ষণ ধরিয়া প্রতিবেশী ও সকলে হিন্দুমুসলমাননির্ব্বিশেষে তাঁহাকে দর্শন প্রণামাদি মনের সাধে করিয়া লইলে প্রভুর সন্ন্যাসী ভক্তগণ তাঁহাকে বহন করিয়া কেদারঘাটে লইয়া যান ও তথা হইতে নৌকাযোগে ৺গঙ্গাবক্ষে স্থাপন করিয়া মণিকার্ণিকায় লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে পূর্ব্বকৃত্যপূজাদি পরিসমাপ্ত করিয়া যথাবিধানে জলসমাধি প্রদান করিয়া শুভ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্ণ সমাধান হয়। যাহারা এই পরম কালে লাটু মহারাজের এই পরমানন্দ মূর্ত্তি দেখিয়াছে তাহাদের সকলের মনেই এক মহা আধ্যাত্মিক সত্যের ভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। ধন্য গুরুমহারাজ, ধন্য—তাঁহার লাটু মহারাজ! * * *"
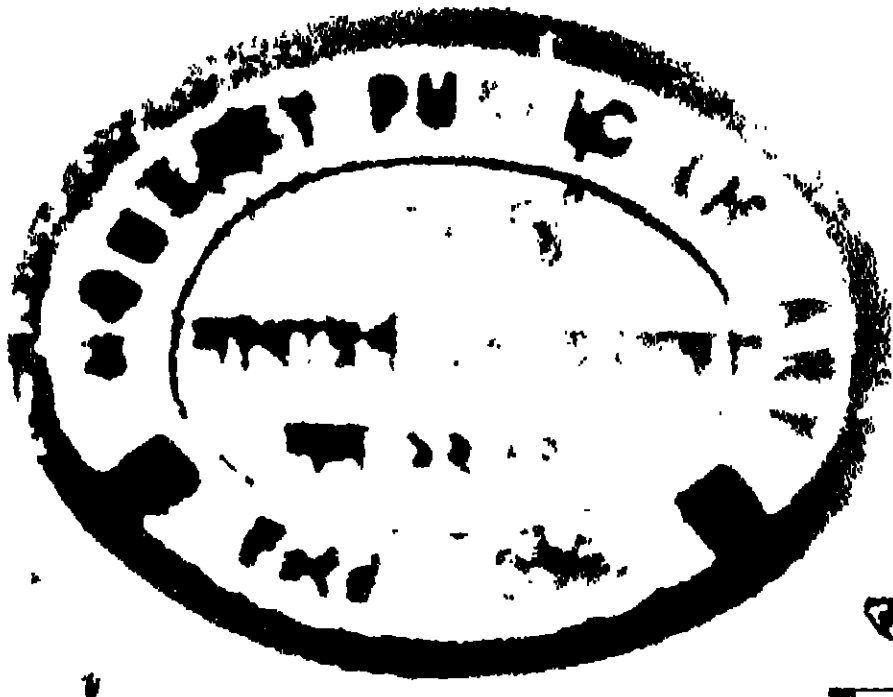
ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য কি ?

(মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৪)

এইবার অন্তরঙ্গ-পরীক্ষা সাহায্যে ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য কি তাহা নির্ণয় করা যাউক। সেই অন্তরঙ্গ-পরীক্ষা বলিতে প্রথমতঃ সূত্রের দ্বারা সূত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় বুঝিতে হইবে। সুতরাং যে সূত্রের অর্থে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইবে সেই সূত্রের অর্থ অন্য স্পষ্টার্থক সূত্রের দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে। অন্য কথায়, যে সূত্রের যেরূপ অর্থ করা হইবে, তাহা যেন অন্য সূত্রের অর্থের বিরুদ্ধ না হয়, এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি কোন সূত্রের অর্থ কোন সূত্রের অর্থের বিরুদ্ধ হইয়া উঠে, তাহা হইলে সেই সূত্রের অর্থ তাহা নহে—ইহাই বুঝিতে হইবে। সূত্রার্থনির্ণয়ে পরস্পর বিরোধ সর্ব্বথা পরিহার্য্য। এইটী এক প্রকার অন্তরঙ্গ-পরীক্ষা। দ্বিতীয়তঃ অদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত কিম্বা দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি যে সকল মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে কোন একটী মতবাদ যদি কোন সূত্রের দ্বারা স্পষ্টতঃ বোধিত হয় এবং সেই মতবাদ ব্যতীত যদি সেই সূত্রের অর্থ উপপন্ন না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সেই মতবাদটীই সূত্রকারেরও উদ্দেশ্য। অন্যান্য সূত্রে সেই মতবাদ অনুসারেই ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। তদ্রূপ একটী বা একাধিক সূত্র দ্বারা

এই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের যে এক একটী প্রকরণ বা বিচার বা অধিকরণ রচিত হইয়াছে, সেই বিচার বা অধিকরণ যদি কোন নির্দ্দিষ্ট মতবাদ ভিন্ন নিরর্থক বা নিষ্প্রয়োজন হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই নির্দ্দিষ্ট মতবাদটী অগত্যা সূত্রকারেরই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে, এবং সেই তাৎপর্য্য অনুসারে অন্যান্য প্রকরণেরও ব্যাখ্যা করিতে হইবে, নচেৎ সূত্র রচনারই দোষ ঘটিবে। ইহাকে অন্তরঙ্গ-পরীক্ষার তৃতীয় প্রকার বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এই ত্রিবিধ অন্তরঙ্গ-পরীক্ষার মধ্যে এক্ষণে দ্বিতীয় প্রকার পরীক্ষা অবলম্বনে যদি ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে—

দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৯ম সূত্র "অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ" বিচার করিলে অদ্বৈতবাদই যে সূত্রকারের মুখ্য তাৎপর্য্য বিষয় ছিল, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ভাষ্যকার শঙ্কর এই সূত্রের যেরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা এই—পূর্ব্বের দুইটী অধিকরণে আকাশ এবং বায়ুর উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। ইহা শ্রবণ করিলে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির সহজেই আশঙ্কা হইবে যে, যাহার উৎপত্তি কোন প্রকারে সম্ভাবিত নাই, এইরূপ আকাশ এবং বায়ুর উৎপত্তিই যদি হয় তাহা হইলে সদ্বস্তু ব্রহ্মেরও উৎপত্তি কেন হইবে না? এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—সদ্বস্তু ব্রহ্মের উৎপত্তি কোন কালেই হইতে পারে না। কারণ, তাহা অনুপপন্ন ইত্যাদি। রামানুজাচার্য্য যদ্যপি এই সূত্রকে পৃথক্ অধিকরণ বলিয়া নির্ণয় করেন নাই, পরন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী আকাশাধিকরণেরই অন্তর্গতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইলেও সূত্রার্থ মধ্যে বেশী ভেদ দেখা যায় না। তিনিও প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে, সদ্বস্তু যে ব্রহ্ম তাহারই উৎপত্তি হয় না; তদ্ব্যতিরিক্ত যাহা তাহার অনুৎপত্তি কখনও সম্ভবপর নহে। কারণ, তাহা অনুপপন্ন ইত্যাদি।

এখন দেখা যায়, এই উভয় পক্ষেই ব্রহ্মের উৎপত্তি হইতে পারে না, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। আর ব্রহ্ম ব্যতিরিক্তের উৎপত্তি হয়,

তাহাও স্বীকার করা হইয়াছে। এই প্রকারে মধ্ব, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি অপরাপর আচার্য্যগণও অর্থ করিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সূত্রে, 'সৎ' শব্দের দ্বারা যে ব্রহ্মেরই গ্রহণ করিতে হইবে তাহার কারণ কি ? প্রায় সকল আচার্য্যই এই 'সৎ' শব্দে ব্রহ্মেরই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহাদের মতে ব্রহ্ম যেরূপ সত্য প্রপঞ্চও তদ্রূপ সত্য, তাঁহাদের মতে এই 'সৎ' শব্দের দ্বারা যে ব্রহ্মেরই গ্রহণ করিতে হইবে, ইহার ত কোন কারণ দেখা যায় না। যাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সকলই মিথ্যা, তাঁহারা 'সৎ' শব্দের দ্বারা যদি ব্রহ্মকে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মতে যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, ব্রহ্ম ব্যতীত কোন সদ্বস্তুই নাই। এইজন্য তাঁহাদের মতে 'সৎ' শব্দের দ্বারা অবশিষ্ট ব্রহ্ম শব্দেরই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্ম ভিন্ন অপর বস্তুকেও সৎ বলিবেন, তাঁহাদের মতে সেই অপর বস্তু যে গৃহীত হইবে না, পরন্তু ব্রহ্মই গৃহীত হইবে ইহার কি কোন হেতু আছে ? বস্তুতঃ এইরূপ কোন হেতুই দেখিতে পাওয়া যায় না। আর যেহেতু এরূপ কোন নিয়ম দেখা যায় না, সেইহেতু বলিতে হইবে যে এস্থলে 'সৎ' শব্দ দ্বারা সূত্রকার-শ্রেষ্ঠ প্রসিদ্ধ সদ্বস্তুকেই গ্রহণ করিয়াছেন। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "ওঁ তৎ সৎ ইতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" ইত্যাদি স্মৃতিতে যে সৎ বস্তুর গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই সদ্বস্তুই সূত্রকার নিজ সূত্রমধ্যে 'সৎ' শব্দ দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা অদ্বৈত-বাদ এবং জগন্মিথ্যাত্ববাদই যে সূত্রকারের অভিপ্রেত তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অতএব বলিতে হইবে—জগন্মিথ্যাত্ব যদি সূত্রকারের অভিপ্রেত না হয়, তবে এই সূত্রের অর্থ কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং সূত্র হইতেই দেখা গেল, সূত্রকারের অভিপ্রেত যে অদ্বৈতবাদ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রুতি স্মৃতি কোন প্রমাণ উদ্ধৃত না করিলেও, বা স্বতন্ত্র কোন বিচার না করিলেও, অদ্বৈতবাদই যে সূত্রের অভিপ্রেত তাহা সূত্রের অর্থ হইতেই বুঝা গেল।

পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় অন্তরঙ্গ-পরীক্ষার সাহায্যে অগত্যা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।

এই বার তৃতীয় প্রকার অন্তরঙ্গ-পরীক্ষা সাহায্যে দেখা যাউক কোন্ সিদ্ধান্ত সূত্রকারের তাৎপর্য্য। এই অধিকরণের পূর্ব্বাধিকরণে আকাশ এবং বায়ুর উৎপত্তি সূত্রকার অতি যত্নসহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন—যদি আকাশ ও বায়ুর উৎপত্তি না স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে "একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান" এই যে শ্রৌত প্রতিজ্ঞা তাহার হানি হইয়া উঠে। আর একথা সকল আচার্য্যই স্বীকার করিয়াছেন। আকাশাদির উৎপত্তি না হইলে ব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। যেহেতু কারণ-জ্ঞান দ্বারা কার্য্যের বিজ্ঞান হইয়া থাকে, এই কারণে আকাশাদি পদার্থের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে—ইত্যাদি রূপ পূর্ব্বাধিকরণের অর্থ প্রায় সকল আচার্য্যই স্বীকার করিয়াছেন।

এখন দেখিতে হইবে যাঁহাদের মতে দ্বৈতের সত্যত্ব অঙ্গীকৃত হয়, তাঁহাদের মতে এই আকাশাদি পদার্থের উৎপত্তিবিচারের আবশ্যকতা কি? দেখ—যাঁহার মত অদ্বৈতবাদ, তাঁহার মতে আকাশাদির উৎপত্তি স্বীকার করা সার্থক হইবে, কারণ, আকাশাদির উৎপত্তি না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা শ্রুতির বাধক হইবে। এই এক বিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞানের উপপত্তি তিন প্রকারে সাধন করা যায়—১ম, বাস্তব অভেদ দ্বারা; ২য়, কার্য্যকারণভাবনিবন্ধন কার্য্যের মিথ্যাত্বপ্রতিপাদন দ্বারা; ৩য়, কার্য্যকারণ ভাব না থাকিলেও কেবল মিথ্যাত্ব নিবন্ধন অভেদ দ্বারা অর্থাৎ কাল্পনিক অভেদ দ্বারা। ইহাদের মধ্যে বাস্তব অভেদ দ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞানে জীববিষয়ক বিজ্ঞান হইবে এবং মহদাদির বিজ্ঞান কার্য্যকারণভাবনিবন্ধন কার্য্যমিথ্যাত্ব-প্রতিপাদন দ্বারা সিদ্ধ হইবে। আর, অজ্ঞানের উৎপত্তি না হইলেও যেহেতু তাহা মিথ্যা অর্থাৎ তাহার সত্তা নাই, সেইহেতু তাহার ব্রহ্মের সহিত কাল্পনিক অভেদ আছে বলিয়া তাহারও জ্ঞান সিদ্ধ

হইবে। সুতরাং উক্ত ত্রিবিধ অভেদ দ্বারা সর্ব্ববিষয়ক বিজ্ঞানই সিদ্ধ হইল।

কিন্তু রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির মতে এই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই নাই, ইহা স্বীকৃত হয় না। সুতরাং তাঁহাদের মতে জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম তিনই বর্ত্তমান। অধিক কি, তাঁহাদের মতে নিত্য-বিভূতি, নিত্য-সিদ্ধ প্রভৃতি বহু 'নিত্য' বস্তু স্বীকার করা হয়। আর এই সকল নিত্য বস্তু ব্রহ্মের কার্য্যও নহে, ব্রহ্মের সহিত বস্তুতঃ অভিন্নও নহে, অথবা ব্রহ্মের সহিত ইহাদের কল্পিত অভেদও নাই। সুতরাং এরূপস্থলে এক ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা এই সকল নিত্য বস্তুর বিজ্ঞান কিরূপে হইতে পারে? শ্রুতি কিম্বা সূত্রকার অভেদ দ্বারা একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের উপপাদন করিয়াছেন। যে সূত্রের দ্বারা ইহা সিদ্ধ করিয়াছেন, সে সূত্রটী এই—"প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাৎ" (২।৩।৫), অর্থাৎ আকাশাদির উৎপত্তি মানিলে, তাহা মিথ্যা বলিয়া ব্রহ্মের সহিত তাহাদের কাল্পনিক অভেদ থাকে, আর তজ্জন্য একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান এই প্রতিজ্ঞার হানি হয় না। এই জন্য আকাশাদির উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। সেই অভেদটী পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ অভেদ ভিন্ন সম্ভবপর হইতে পারে না। আর তাহা যদি হয়, তবে জিজ্ঞাস্য, এই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা দ্বারা যাহারা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধরূপে অভিন্ন নহে তাহাদেরও জ্ঞান হয় কি হয় না?

যদি বল হয়, তাহা হইলে আকাশাদির জ্ঞানও তদ্রূপ হইয়া যাইবে। তাহাদের জ্ঞানের জন্য তাহাদের উৎপত্তি স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? জীবাদি অন্য নিত্য পদার্থের জ্ঞান যেরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে হইয়া থাকে, ইহাদেরও সেইরূপ হইবার কথা। সুতরাং আকাশাদির ব্রহ্মজন্যত্ব স্বীকার করিবার কোন আবশ্যকতা থাকে না। আর তাহা যদি হইল, তবে সূত্রকারের আকাশাদি অধিকরণ রচনা কি ব্যর্থ হইয়া গেল না? অধিক কি, যাবৎ উৎপত্তিবোধক অধিকরণই নিরর্থক হইয়া যাইবে।

আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিয়া বল যে, ব্রহ্মবিজ্ঞান দ্বারা ঐ সকল নিত্য পদার্থের জ্ঞান হয় না বা তাহা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে, তাহা হইলেও আকাশাদির উৎপত্তি প্রতিপাদন করা ব্যর্থ হয়। কারণ, যেরূপ সেই নিত্যপদার্থের জ্ঞান না হইলেও একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ প্রতিজ্ঞার হানি হয় না, তদ্রূপ আকাশাদিরও জ্ঞান যদি ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা না হয়, তবে তাহাতেও ঐ প্রতিজ্ঞার কোন হানি হয় না ইহা বলিতে হইবে। সুতরাং উভয় পক্ষেই দেখা গেল, এস্থলে আকাশাদির উৎপত্তি কথন সূত্রকারের নিষ্প্রয়োজন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি এস্থলে সেই আকাশাদির উৎপত্তিই বর্ণন করিতেছেন। আর অন্যবাদিগণও তাঁহার এই অর্থই স্বীকার করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা রক্ষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব বলিতে হইবে যে, সূত্রকারের মতে অদ্বৈতবাদই অভিপ্রেত। অদ্বৈতবাদ অভিপ্রেত না হইলে এই দুই প্রকরণ রচিত হইত না।

তাহার পর আরও দেখা যায়—এ স্থলে রামানুজাচার্য্যের ব্যাখ্যা তাঁহার নিজ মতেরই বিরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। কারণ, তিনি উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের উৎপত্তি অনুপপন্ন এবং ব্রহ্মব্যতিরিক্ত কোন পদার্থেরই অনুৎপত্তি সম্ভবপর নহে অর্থাৎ উৎপত্তি হয়, এবং এখানে এই সূত্রের এরূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিলে তাঁহার নিজ মতের সহিতই বিরোধ ঘটে। কারণ, তাঁহার মতে বহু নিত্য পদার্থই আছে, অথচ তাহারা ব্রহ্মব্যতিরিক্ত পদার্থ। অতএব এভাবে এ সূত্রের ব্যাখ্যা না করিয়া যদি এই মাত্র বলা যায় যে, ব্রহ্মের উৎপত্তি হইতে পারে না, কারণ, অনুপপত্তি হয় ইত্যাদি—তাহা হইলে আর কোন দোষ হয় না। বস্তুতঃ তাহাই আচার্য্য শঙ্কর নিজ ভাষ্যমধ্যে প্রকটিত করিয়াছেন। অতএব, তৃতীয় প্রকার অন্তরঙ্গ-পরীক্ষার দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, অদ্বৈতবাদই সূত্রকারের অভিপ্রেত, অন্য কোন বাদ তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

এইরূপ, দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদে প্রাণাত্ত্বধিকরণে প্রাণাদির যে উৎপত্তি বিচার করা হইয়াছে, সেই বিচারও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিরর্থক হইয়া থাকে। এইরূপ, যদি ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের অন্য প্রকরণ বা অন্য সূত্রের প্রতি দৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে অদ্বৈতবাদ ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। বাহুল্য ভয়ে তাহা আর এস্থলে বিশেষ করিয়া প্রদর্শিত হইল না।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার অন্তরঙ্গ-পরীক্ষার দ্বারা যদি অদ্বৈতবাদই ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য হইল, তবে প্রত্যেক সূত্রের এই মতবাদকেই অবলম্বন করিয়া যে ব্যাখ্যা করা উচিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর নিজ মতবিশেষ স্থাপন করিবার জন্য যদি কেহ সূত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে প্রদর্শিত রূপ গুরুতর যে দোষ তাঁহাদের মতে উপস্থিত হইবে, তাহা অনিবার্য্য।

এইবার প্রথম প্রকার অন্তরঙ্গ-পরীক্ষা অবলম্বনে সূত্রার্থ বিচার্য্য। এতদুদ্দেশ্যে আমরা প্রথম অধিকরণ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অধিকরণগুলি এবং সেই সেই অধিকরণজ্ঞাপক সূত্রগুলির অর্থ একে একে বিচার করিব।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্ম সগুণ না নির্গুণ ?

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল)

উপনিষদে ব্রহ্মকে কোথাও সগুণ কোথাও নির্গুণ বলিয়া বলা হইয়াছে। নির্গুণ, যথা—

"অস্থূলমনণু অহ্রস্বমদীর্ঘম্।"

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।"

"নেতি নেতি"।

আবার সগুণ, যথা—

"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ।"

"নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং।"

"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিঃ।"

আবার কোথাও একই শ্লোকে তাঁহাকে সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।"

এই শ্লোকে প্রথমে তাঁহাকে সগুণভাবে বর্ণনা করিয়া অবশেষে তাঁহাকে নির্গুণ বলা হইয়াছে। এক্ষেত্রে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ সগুণ না নির্গুণ তাহা কিরূপে নির্ণয় করা যায় ?

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, ব্রহ্মের স্বরূপ নির্গুণ। তাঁহার মতে, শ্রুতি যেখানে ব্রহ্মকে সগুণ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপকে লক্ষ্য করা হয় নাই—মায়ারূপ উপাধির সাহায্যে তিনি যে ভাবে প্রকাশ পান সেই ভাবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য

ইহা ধরিয়া লইয়াছেন যে ব্রহ্মের স্বরূপ সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপই হইতে পারে না। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ যদি সগুণ হন তাহা হইলে নির্গুণ হইতে পারেন না, আর যদি স্বরূপতঃ নির্গুণ হন, তাহা হইলে সগুণ হইতে পারেন না। এই যুক্তির ফলে তিনি নির্ণয় করিয়াছেন—নির্গুণই ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ।

কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের এই মূল সিদ্ধান্তটি কি নির্ভুল? ব্রহ্ম কি স্বরূপতঃ সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপই হইতে পারেন না? ব্রহ্মের স্বরূপ অচিন্তনীয়, জগতের অন্য কোন পদার্থের ন্যায় নহে। তাঁহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। তিনি কি বস্তু তাহা ত আমরা জানি না, এপর্য্যন্ত তাঁহার ত সাক্ষাৎ পাইলাম না। সুতরাং শ্রুতি তাঁহাকে যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেইরূপই বুঝিতে হইবে। শ্রুতি যখন কোথাও তাঁহাকে সগুণ, কোথাও নির্গুণ বলিয়াছেন তখন বুঝিতে হইবে ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ। কতকগুলি শ্রুতিবাক্য গ্রহণ করিব আর কতকগুলি গ্রহণ করিব না—ইহা হইতে পারে না। বিশেষতঃ একই শ্লোকে যখন তাঁহাকে সগুণ নির্গুণ উভয় ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, তখন এরূপ কল্পনা করা কষ্টসাধ্য যে একই শ্লোকে প্রথমে তাঁহার স্বরূপ লক্ষ্য করা হয় নাই, শ্লোকের শেষ অর্দ্ধে অকস্মাৎ তাঁহার স্বরূপ অবতীর্ণ করা হইয়াছে।

আপত্তি হইতে পারে যে, উন্মাদের মত কথা বলিলে চলিবে না; কথার একটা সঙ্গত অর্থ হওয়া চাই। তুমি বলিতেছ ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই—তাহা কি করিয়া হইবে? নির্গুণ মানে, যাহার কোন গুণ নাই; তুমি যখন বলিতেছ তিনি সগুণ অর্থাৎ তাঁহার গুণ আছে, তাহার দ্বারাই বলা হইল যে তিনি নির্গুণ নহেন—আবার কি করিয়া বলিবে তিনি নির্গুণ? এ আপত্তির উত্তর এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের পরিচিত কোন পদার্থ সম্বন্ধে বলা যায় না বটে যে উহা নির্গুণ ও সগুণ উভয় রকমের। কারণ, জগতের পদার্থগুলিকে আয়ত্ত করা যায়। আয়ত্তীভূত পদার্থটির যদি কোন গুণের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইলেই বলা যাইতে পারে যে পদার্থটি

নির্গুণ হইতে পারে না, কারণ আমাদের আয়ত্তের বাহিরে পদার্থটি নাই। কিন্তু ব্রহ্ম পদার্থটিকে আয়ত্ত করা যায় না। এজন্য ক্ষেত্রবিশেষে ব্রহ্মের কোন গুণের যদি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমরা সিদ্ধান্ত করিব যে ব্রহ্ম সগুণ বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত করিতে পারিব না যে ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন। কারণ, সম্পূর্ণভাবে ত ব্রহ্মের পরিচয় পাওয়া যায় নাই; যেটুকু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহার বাহিরেও অসীম ব্রহ্ম অবস্থিত রহিয়াছেন—সেখানে তিনি নির্গুণ ভাবে অবস্থান করিতে পারেন। এইভাবে ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপই হইতে পারেন। আর উন্মাদের কথা যা বলিতেছ, তা ভগবান্‌কে পাইলে কতকটা উন্মাদের মত হইতে হয় ইহা স্বীকার করিতেছি। শ্রীচৈতন্যের ও ব্রজগোপীদের প্রেমোন্মত্ততার কথা কে না জানেন?

পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে, ব্রহ্ম নিরংশ পদার্থ, সুতরাং তাঁহার কিয়দংশ সগুণ এবং অবশিষ্টাংশ নির্গুণ এরূপ কল্পনা করা যায় না। তিনি যে নিরংশ তাহার প্রমাণ শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।"

নিষ্কল অর্থাৎ নিরংশ ইহা স্বীকার করিতেছি। কিন্তু ব্রহ্ম নিরংশ হইলেও তিনি বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করেন—কেমন করিয়া করেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"অবিভক্তমপি ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং।"

অন্যত্র—

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।"

যে শ্রুতি বলিয়াছেন, "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং", সেই শ্রুতিই অন্যত্র বলিয়াছেন, "পাদস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"। একটু বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ব্রহ্মে অংশ আরোপ সকলকেই করিতে হয়।

আমি যদি একটি মন্দির দেখাইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,

ব্রহ্ম ঐ মন্দিরমধ্যে অবস্থান করেন কি না. আপনাকে বলিতে হইবে তিনি করেন, কারণ ব্রহ্ম নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত। ব্রহ্ম যখন নিরংশ পদার্থ তখন এরূপ কল্পনা করা যায় না যে, তাঁহার কিয়দংশ মন্দিরমধ্যে আছে, অবশিষ্টাংশ মন্দিরের বাহিরে আছে, সুতরাং বলিতে হইবে যে সমগ্র ব্রহ্মই মন্দিরমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। সমগ্র ব্রহ্মই যদি মন্দিরমধ্যে অবস্থান করেন তাহা হইলে মন্দিরের বাহিরে কি ব্রহ্ম নাই? অতএব তিনি স্বরূপতঃ নিরংশ হইলেও তাঁহার অংশ কল্পনা করিতে হয়—বলিতে হয় মন্দিরমধ্যে তিনি অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সমস্তটি মন্দিরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নাই, মন্দিরের বাহিরেও তিনি অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মের অংশ কল্পনা করিবার আপত্তি এই যে, অংশ কল্পনা করিলে ন্যূনাধিক্যও আসিয়া পড়ে। কিন্তু ব্রহ্মের অংশ এইভাবে কল্পনা করিতে হইবে যাহাতে এই ন্যূনাধিক্য না আসে। বলিতে হইবে ব্রহ্ম যেরূপ অসীম, তাঁহার অংশও সেইরূপ অসীম, এবং অসীম ব্রহ্ম হইতে অসীম অংশ গ্রহণ করিলেও অসীম ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। শ্রুতি একথা স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

যাঁহারা গণিতের তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে এ কল্পনা অলীক নহে। Infinity minus Infinity can be equal to Infinity

আমাদের বোধ হয়, পরিচিত পদার্থ সমূহ যে নিয়মের অধীন ব্রহ্মকে সেই নিয়মের অধীন করিতে গেলে ব্রহ্মের মহিমা খর্ব্ব করা হয়। তাঁহার স্বরূপ সগুণ না নিগুর্ণ ইহা প্রশ্ন করিলে উত্তর দিতে হইবে—তিনি সগুণ ও নিগুর্ণ উভয়ই। কেহ যদি আপত্তি করেন, সগুণ ও নিগুর্ণ উভয়ই কাহারও স্বরূপ হইতে পারে না, কারণ, কোন পরিচিত বস্তুর সগুণ ও নিগুর্ণ উভয়রূপ দেখা যায় নাই, উত্তরে বলিব, অল্প বস্তুরই সহিত তোমার পরিচয় হইয়াছে; ব্রহ্মের সহিত

ত পরিচয় হয় নাই, হইলে দেখিতে তিনি সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপই হইয়াছেন।

ব্রহ্মের স্বরূপ নির্গুণ, মায়ার সাহায্যে তিনি সগুণভাবে প্রকাশ পান, এই উক্তির তাৎপর্য্য একটু প্রণিধান করিয়া দেখা উচিত। এই মায়া কি বস্তু? মায়া ব্রহ্মের শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান্ ভিন্নবস্তু নহে। সুতরাং ব্রহ্মই সগুণ ভাবে অবস্থান করেন এবং ব্রহ্ম তাঁহার শক্তির সাহায্যে সগুণভাবে অবস্থান করেন এই দুই বাক্যের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। ব্রহ্ম সগুণভাবে অবস্থান করেন বলিলেও বুঝিতে হইবে ব্রহ্ম তাঁহার শক্তির সাহায্যে সগুণভাবে অবস্থান করেন, কারণ, সকলেই নিজশক্তির সাহায্যে সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন করে। অতএব ব্রহ্ম মায়ার সাহায্যে সগুণভাবে অবস্থান করেন বলিলে ইহা প্রতিপন্ন হইল না যে সগুণভাব তাঁহার স্বরূপ—নিজরূপ—নহে।

যে সকল মহাপুরুষ ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছিলেন তাঁহাদের বাক্য আলোচনা করিলেও ঐ কথা বুঝিতে পারা যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়াছেন,—

"কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ কর্‌ছেন না—এই কথা যখন ভাবি তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কাজ করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নামরূপ ভেদ।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম ভাগ, ৩৭ পৃঃ)

"যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জান্‌তে পারে তাঁর স্বরূপ কি। সে ব্যক্তিই জানে যে তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানাভাবে দেখা দেন। তিনিই সগুণ আবার তিনিই নির্গুণ। যে গাছতলায় থাকে সেই জানে বহুরূপীর নানা রঙ—আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।" (ঐ, ১ম ভাগ, ৫৭ পৃঃ)

"নিরাকারে বিশ্বাস—তা ত ভালই। তবে এ বুদ্ধি করো না যে

এইটিই কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে—নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য।" (ঐ ১ম ভাগ, ১৪ পৃঃ)

তারাপীঠের সিদ্ধপুরুষ বামাক্ষেপা বলিয়াছেন, "তাঁরা ব্রহ্মও বটে আবার দয়াময়ী মাও বটে। জ্ঞানীর কাছে তিনি নিরাকার ভক্তের কাছে তিনি সাকার। * * * তিনি সগুণও বটে, নিগুণও বটে। সাকার নিরাকার দুই-ই।"

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, নাম ও রূপ মিথ্যা। জগতের পদার্থ সমূহের নাম ও রূপ সম্বন্ধে সে কথা যেন মানা গেল। কিন্তু ঈশ্বরের নাম ও রূপ মিথ্যা ইহা কেমন করিয়া স্বীকার করিব। আমরা জানি শঙ্করাচার্য্য মিথ্যা শব্দের অর্থ এরূপ মনে করেন না যে, ইহারা আমাদের মনের কল্পনা বা ভ্রম মাত্র ইহাদের বাহ্য অস্তিত্ব নাই। তাঁহার মতে যাহা বিনাশশীল ও পরিমিত তাহাই মিথ্যা,—"যদ্বিষয়া বুদ্ধিঃ ব্যভিচরতি তদসৎ" (গীতা ভাষ্য)। [শারীরকে "নাভাব উপলব্ধেঃ" এই সূত্রের ভাষ্য দেখুন] কিন্তু সে অর্থেও ঈশ্বরের নাম ও রূপ মিথ্যা বলিতে পারি না। প্রশ্ন হইতে পারে যে ঈশ্বরের নাম ও রূপ যদি মিথ্যা না হইবে, যদি সর্ব্বত্র সকল সময় তাঁহার লীলা অভিনয় হইতেছে, তাহা হইলে তুমি দেখিতে পাইতেছ না কেন? দেখিতে পাইতেছি না—আমার দৃষ্টি ক্ষুদ্র বলিয়া। দিনমানে আমি নক্ষত্র দেখিতে পাই না, বায়ুতে কত ক্ষুদ্র কীট ভাসিয়া যাইতেছে আমি দেখিতে পাই না। সে জন্য কি বলিতে হইবে দিনমানে নক্ষত্র থাকে না, বা বায়ু ক্ষুদ্র কীটপূর্ণ নহে? সেইরূপ আমি দেখিতে পাই না বলিয়া কি বলিব যে ঈশ্বরের লীলা এখানে এখন হইতেছে না? বস্তুতঃ অহরহঃ সর্ব্বত্র তাঁহার লীলা হইতেছে। আমি অন্ধ তাই দেখিতে পাইতেছি না। যদি ঈশ্বর দিন দেন সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তাঁহার লীলা দেখিয়া ধন্য হইব। ভক্ত বলিয়াছেন,—

অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ।—

"অদ্যাবধি সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

শ্রীচৈতন্যদেব সেই লীলা দেখিতে পাইতেন। তাই তিনি সমুদ্র দেখিয়া যমুনাভ্রমে (ভ্রমে ? ঝাঁপ দিতেন, কদম্ব বৃক্ষ দেখিয়া তাঁহার রোমাঞ্চ হইত। বলিতে হইবে কি যে, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা দেখিয়াছিলেন তাহা ভুল, আমরা যে ফেন ও তরঙ্গ মালার আস্ফালন, শুষ্কপত্র ও নীরস বৃক্ষত্বচ দেখি তাহাই যথার্থ দৃষ্টি ?

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ঈশ্বরের লীলা অনিত্য নহে। জগতে যাহা কিছু হইতেছে সবই ত ঈশ্বরের লীলা। তাহা হইলে কি জগতের সকল ব্যাপারই নিত্য ?

জগতের ব্যাপার দুই ভাবে দেখা যায় (two points of view ঈশ্বরই এই সব হইয়া লীলা করিতেছেন—এরূপ দেখিলে তাহারা নিত্য। তাহারা যে চিরকাল থাকে না বা সর্ব্বত্র বিরাজিত থাকে না, তাহা সত্ত্বেও তাহাদের আত্যন্তিক বিলোপ ঘটে না। কারণ, যাহা অতীত হয় তাহা আমাদেরই চক্ষুর অগোচর হয়, ঈশ্বরের চক্ষুর অগোচর নহে। ঈশ্বর অতীত ও ভবিষ্যৎ সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছেন,

—"বেদাহং সমতীতানি চ বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।"
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন॥"

তাঁহার চক্ষে অতীত এবং ভবিষ্যৎ দুই-ই বর্ত্তমান হইয়া রহিয়াছে*। কিন্তু আমরা জগতের বস্তু যেভাবে দেখি সেভাবে তাহারা অনিত্য। ঈশ্বরই যে এই সব হইয়াছেন আমরা তাহা দেখিতে পাই না, আমরা দেখি, যেন সকল বস্তুই স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতেছে। আমাদের দৃষ্টিতে এ সকল অনিত্য। অবতাররূপে ভগবান্ যে সকল লীলা করিয়াছেন, মহাপুরুষগণ তাঁহার মধ্যে ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করিয়া

* Vide Carlyle's Vision of Immortality—"The curtains of Yesterday drop down, the curtains of Tomorrow roll up. But Yesterday and Tomorrow both are, even as we are, *here*, mysteriously and with god"—Sartor Resartus.

আমাদের নিকট প্রচার করিয়াছেন, এ জন্য সে সকল লীলা আমাদের নিকটও নিত্য।

"তদনন্যত্বমারম্ভনশব্দাদিভ্যঃ" -(ব্রহ্মসূত্র, ২, ১, ১৪)। জগৎ ব্রহ্ম হইতে অনন্য। অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মেই অবস্থিত—ব্রহ্মের বাহিরে নাই। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "অনন্যত্ব" অর্থাৎ "ব্যতিরেকেণ অভাবঃ"—ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত জগৎ নাই। শঙ্করাচার্য্য ইহার অর্থ করিয়াছেন, ব্রহ্ম আছেন, জগৎ নাই। ইহা যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য আমরা জগৎকে যেভাবে কল্পনা করি—আমরা যে মনে করি জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন এক স্বতন্ত্র পদার্থ, সে ভাবে জগৎ নাই। কিন্তু ব্রহ্মের মধ্যে ত জগৎ আছে—ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন। 'ব্রহ্মের বাহিরে জগৎ নাই' আর 'জগৎ নাই' দুই কি এক কথা ?

'আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ'—এখানে নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্য লক্ষ্য করা হইয়াছে :—"যথা সোম্য, একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ংবিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।"

'বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্,'—এ জন্য শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন বিকার (জগৎ) সত্য নহে, মৃত্তিকা (ব্রহ্ম)ই সত্য। শ্রুতিবাক্যের অর্থ বোধহয় এইরূপ যে, যেমন মৃত্তিকার বিকার ঘট প্রভৃতি নামেই স্বতন্ত্র বস্তু—বাস্তবিক পক্ষে উহারা মৃত্তিকাই, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্বন্ধও সেইরূপ। মৃত্তিকা ও তাহার বিকারের দৃষ্টান্তে জগতের মিথ্যাত্ব উত্তমরূপে প্রতিপন্ন হয় না বলিয়া, শঙ্করাচার্য্য উক্ত সূত্রের ভাষ্যে তাঁহার অভিমত আরও দুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"যথা ঘটকরকাদ্যাকাশানাং মহাকাশানন্যত্বং, যথা চ মৃগতৃষ্ণিকোদকাদীনাম্ ঊষরাদিভ্যঃ অনন্যত্বং—"
কিন্তু মৃগতৃষ্ণিকার দৃষ্টান্ত শ্রুতির অভিপ্রেত কিনা সন্দেহ।

শ্রুত্যাদাহৃত দৃষ্টান্তে জগৎ ব্রহ্মের বিকার বলিয়া প্রতীতি হয়। তাহা পরিহার করিবার জন্য শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, ব্রহ্ম বিকারশীল, পরিণামী হইতে পারেন না, কারণ শ্রুতি অন্যত্র ব্রহ্মকে কূটস্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—"স বা এষ মহানজ আত্মা অজরঃ

অমরঃ অমৃতঃ অভয়ঃ ব্রহ্ম।" "স এষ নেতি নেতি আত্মা।" "অস্থূলমনণু।"

তাই শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "নহি একস্য ব্রহ্মণঃ, পরিণামধর্ম্মত্বং তদ্রহিতত্বং চ শক্যং প্রতিপত্তুং।"* অবশ্য জগতে যেরূপ পরিণাম ধর্ম্মত্ব দেখা যায়, ব্রহ্মের সেরূপ পরিণামধর্ম্মত্ব আরোপ করা যায় না। কিন্তু ইহা কল্পনা করা অসম্ভব নহে যে ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইলেও ব্রহ্ম পূর্ব্বের ন্যায় নির্ব্বিকার অসীমভাবে অবস্থান করেন কারণ আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ব্রহ্মের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে, তিনি এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব ব্রহ্মকর্ত্তৃক জগৎ-সৃষ্টির যে দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত উপযোগী বলিয়া বোধ হয়।

"মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।"

মণি স্বর্ণ রাশি প্রসব করে, কিন্তু মণি যেমন তেমনি থাকে। সেই-রূপ ব্রহ্ম জগৎ প্রসব করেন, তাহাতে ব্রহ্মের স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, তাঁহার কোন অংশ বিকৃত হয় না।

তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায় ততক্ষণ 'নেতি' 'নেতি' করে ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা জানে যে তিনিই সব হয়েছেন—ঈশ্বর, মায়া, জীবজগৎ। তখন বোধ হয়—জীবজগৎশুদ্ধ তিনি। যদি একটা বেলের খোলা, শাঁস আর বীচি আলাদা করা যায়, আর একজন যদি বলে বেলটা কত ওজনে ছিল, তুমি কি খোলা আর বীচি ফেলে দিয়ে শাঁসটা শুধু ওজন করবে? * * খোলাটা যেন জগৎ, জীবগুলি যেন বীচি। বিচারের সময় জীব আর জগৎ অনাত্মা বলেছিলে, অবস্তু বলেছিলে। বিচার করবার সময় শাঁসকেই সার খোলা আর বীচিকে অসার বলে বোধ হয়। বিচার হয়ে গেলে সমস্ত জড়িয়ে এক বলে বোধ হয়।

* এখানে শঙ্করাচার্য্যের দ্বারাই অন্যত্র উদ্ধৃত বাক্য দিয়া শঙ্করাচার্য্যকে উত্তর করা যায়—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতেভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

এখানেও 'প্রকৃতেঃ পরং যৎ' সেইবস্তুরই কথা হইতেছে।

তখন বোধ হয়, যে সত্তাতে শাঁস, সেই সত্তা দিয়েই বেলের খোলা আর বীচি হয়েছে।" * (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ১ম ভাগ, ১১৬ পৃঃ)

* আচার্য্য শঙ্করাদির মতবাদ খণ্ডন করিতে অগ্রসর হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষাসম্পন্নেরা স্বাধীন যুক্তিতর্ককেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া থাকেন। তদুপরি যদি তাঁহারা নিতান্ত প্রচলিত কয়েকটি উপনিষদ্বচনের পূর্ব্বাপরসম্বন্ধবিরহিত ভাবে উল্লেখ ও আলোচনা করিতে পারেন তাহা হইলে ত কথাই নাই—ভাবেন আচার্য্যাদির বহ্বায়াস ও গবেষণাপূর্ণ যুক্তিসৌধ ডাইনামাইট প্রয়োগে চূর্ণবিচূর্ণ করা যাইতে পারে।

ভারতের ঋষি ও আচার্য্যগণ কিন্তু একবাক্যে বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়জজ্ঞান কখনই অতীন্দ্রিয় তত্ত্বপ্রকাশে সমর্থ হইবে না। তপস্যা, সংযম ও ত্যাগবৈরাগ্যাদি সহায়ে মনকে যদি বিষয়সমূহ হইতে পূর্ণপ্রত্যাহৃত ও একাগ্র করিতে পার, বিষয়সঙ্গকলুষিত ভোগাসক্ত বুদ্ধিকে যদি ঈশ্বরচিন্তায় পরিমার্জ্জিত, শুদ্ধ, স্বচ্ছ করিতে পার, তবেই উহাতে অতীন্দ্রিয় বিষয় সকলের স্বভাবতঃ প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব সমাবিষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষপূর্ব্বক অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে অথবা ঋষিত্ব পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। শঙ্করপ্রমুখ আচার্য্য সকলে ঐজন্যই আপ্তবাক্য বেদের মর্য্যাদা সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তদুপদিষ্ট বাক্য সকলকে অভ্রান্ত অপৌরুষেয় জানিয়া সত্যাসত্য নির্ণয়ে উহাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

শ্রুতিপ্রমাণ ঐরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইলে স্বার্থদোষদুষ্ট তার্কিকগণ নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য সয়তানের শাস্ত্রবচন বিন্যাসের ন্যায় পাছে উহার বচন সকলের যথেচ্ছা অর্থ কল্পনা করে, ঐজন্যই দূরদর্শী আচার্য্যগণ পূর্ব্বাপরসম্বন্ধভাবে শ্রুতি সকলের ব্যাখ্যাও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐরূপে আপাতবিরুদ্ধ নানা উপনিষদ্বচন সকলের মধ্যে একলক্ষ্যতা আচার্য্য শঙ্করই প্রথম দেখাইয়া ভারতের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে যাঁহারাই সাধনবলে আপ্তপদবীতে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই আচার্য্যের মতবাদকে চরম সত্যরূপে উপলব্ধি ও প্রচার করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বর্ত্তমানযুগে ঐ তত্ত্ব উপলব্ধিপূর্ব্বক আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছেন—"অদ্বৈতজ্ঞান সব শেষের কথা" (সেখানে) সব শিয়ালের একই রা, (অর্থাৎ জীবজগৎ কিছুই হয় নাই, হইবেও না, যাহা আছে তাহাই আছে)", "ব্রহ্মজ্ঞান কখনও (কাহারও মুখ হইতে নির্গত হইয়া এঁটো হয় নাই, (উহা চিরকাল অবাঙ্মনসগোচর হইয়া রহিয়াছে)।"

প্রবন্ধকার পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকলে লক্ষ্য না রাখিয়া আচার্য্য শঙ্করের মতখণ্ডনে অগ্রসর হইয়া হঠকারিতার পরিচয় প্রদান করিলেও যে আমরা তাঁহার প্রবন্ধ মুদ্রিত করিলাম, তাহার কারণ পাশ্চাত্যশিক্ষার সাধারণ ভ্রমসকল তাঁহাতে থাকিলেও, তিনি রাগদ্বেষ বিরহিত হইয়া যথার্থ সত্যের অন্বেষণে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবোক্ত অজ্ঞাত-গভীর-অরণ্য-প্রবিষ্ট দরিদ্র কুঠারির চন্দনকাষ্ঠ, তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণখনির ক্রমাবিষ্কারের কথা স্মরণ করাইয়া আমরা তাঁহাকে বলি—হে সত্য সাধক, নির্ভয় হৃদয়ে অগ্রসর হইয়া যাও। (উঃ সং)

কর্ম্মের ধারা।

(শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়)

জগৎ সুষুপ্তির কোলে নিশ্চল। অনন্ত আঁধার বিরাট্ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে বিরাজিত। নাই কোন সাড়াশব্দ;—যেন এক বিরাট্ গতিহীন কঠিন জড়কায়াকে কেহ এক সুগভীর গহ্বরের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া মুখে পাথর চাপা দিয়া চলিয়া গিয়াছে!

এমন সময় সেই সীমাহীন সুগভীর আঁধারের ভিতর দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া এক আলোক-রেখা ফুটিয়া উঠিল; আর অমনি জগতে রব উঠিল, "আসিয়াছি, জাগিয়াছি"। সেই সঙ্গে সঙ্গে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ অনন্তকালের জন্য জগতে এক স্পন্দনের সৃষ্টি করিল। সমীরণ বলিল, "আসিয়াছি"। স্রোতস্বতী সলজ্জ হাস্য করিয়া নাচিয়া উঠিল,—বলিল, "জাগিয়াছি"। সেই চতুর্দ্দিকে স্পন্দনের মাঝে, ঊষার নবীন আলোকের মাঝে মানব জন্ম নিল।

মানব চক্ষু মেলিয়া পুলকিত নেত্রে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিল। তাহার অন্তরে বাহিরে সেই স্পন্দন:—ভাবিল, কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম!

প্রতিদিনই সে দেখে, সূর্য্য উদিত হইয়া কোথায় চলিয়া যায়, স্থির নয়! বায়ু সতত বহিয়া যায়, স্থির নয়! কুসুম ফুটিয়া ঝরিয়া যায়, স্থির নয়! বৃক্ষ বায়ু সঞ্চালনে নাচিয়া উঠে, স্থির নয়! কি এক কর্ম্ম-চঞ্চল সূত্রে সকলই সতত পরিভ্রাম্যমাণ—সকলি চঞ্চল—জীবনের মন্ত্রে-কর্ম্মের প্রেরণায় চঞ্চল! জীবনের স্পন্দনের মাঝে, কর্ম্মের প্রেরণার মাঝে মানব কি শুধু নিশ্চল নির্ব্বিকার ভাবে বসিয়াই থাকিবে? একে একে, ধীরে ধীরে জীবনের প্রত্যেক মন্ত্রট, এই নব স্পন্দনের প্রত্যেক স্পন্দনটি তাহাকে জানিয়া লইতে হইবে;—

সেই স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া সে এমন কিছু করিবে যাহা এই বিশ্ব-চঞ্চলতারই রূপান্তর মাত্র।

এমনি ভাবে চিন্তা করিতে গিয়া মানব কর্ম্মের ভাবে প্রণোদিত হইল। জগতের সমস্ত অণুপরমাণু কর্ম্মের প্রেরণায় চঞ্চল—জীবনের মন্ত্রে সজীব। বিশ্বকর্ম্মের ভাবনার সঙ্গে অজ্ঞাতসারে কর্ম্ম-মন্দাকিনী-ধারায় ভাসমান মানব-হৃদয়ে স্বীয় হৃদয়-চাঞ্চল্যের ভাবনাও উদিত হইতেছিল এবং এই হইতেই তাহার স্বীয় কর্ম্মের সূচনা। জগতের কর্ম্মস্রোতে ঝম্প প্রদানোন্মুখ মানবসম্প্রদায় ভাবিল,—'জগতের স্পন্দনের মাঝে দাঁড়াইয়া তাহার কর্ম্মচঞ্চল অণুপরমাণুর সহিত আমরাও কর্ম্মসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িব—আমরাও চঞ্চলতার মন্ত্রে দীক্ষিত হইব।'

জগতের সমস্ত মানবের প্রাণ কর্ম্ম-স্পন্দনে আলোড়িত, সকলই কর্ম্মস্রোতে ভাসমান—সকলি কর্ম্মের জন্য আত্মহারা। কিন্তু মানবের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাহার মনের চিন্তাস্রোত দুই বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়া দূর হইতে সুদূরে ছুটিয়া চলিল। কাহারো মনে উদিত হইল, 'সে কর্ম্মের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত—কর্ম্ম করিবে। কিন্তু সে কর্ম্ম করিবে কাহার?' এই কথার মীমাংসা করিতে গিয়া মানব ভাবনার সাগরে আপনহারা হইল। ভাবিল—'তপন, পবন, বনউপবন যাহার কার্য্যে আত্মহারা আমিও তাঁহারই কার্য্য সম্পন্ন করিব;—ইহাই আমার কর্ম্ম। কিন্তু কে সে? যদি তাহাকেই না জানিলাম তবে তাহার কাজ করিব কিরূপে?'

মানব ভাসিয়া চলিল চিন্তাস্রোতে—কাহার কার্য্য করিবে তাহা জানিবার নিমিত্ত। সকলেরই চিন্তনীয় এক,—'কে সে, জগতের সকলি যাহার কার্য্যে নিয়োজিত?' কিন্তু যুগযুগান্তরব্যাপী চিন্তাতেও তাহা তাহারা জানিতে বা বুঝিতে সমর্থ হইল না। তাহারা মুগ্ধচিত্তে পবনকে জিজ্ঞাসা করে 'কে সে'। পবন মৃদুমন্দগতিতে দূর হইতে দূরে চলিয়া যায়। অরুণকে প্রশ্ন করে 'কে সে'; সে শুধু তাহার

উজ্জ্বল মুখখানিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া হাসিয়াই নিরস্ত হয়। এমন করিয়া দিন যায়,—তাহাদের চিন্তাস্রোত সতত বহিয়াই চলিয়াছে—উদ্দেশ্যে আর উপনীত হয় না। তাহারা চিন্তা করে সত্য, কিন্তু এই চিন্তাই তাহাদের কর্ম্মের আরম্ভ। তাহারা 'কাহার কর্ম্ম করিবে—চিন্তাদ্বারা তাহাই জানিয়া নিজেদের কর্ম্মের প্রবৃত্তি বাড়াইয়া তুলিবে,—নিজেদের কর্ম্মের পথ পরিষ্কার করিবে। সেই কর্ম্মের প্রবৃত্তি বাড়াইয়া তুলিতে,—কর্ম্মের পথ পরিষ্কার করিতে চিন্তাই যে তাহাদের একমাত্র সহায়। সুতরাং এই চিন্তাই তাহাদের কর্ম্মের প্রথম স্তর —এই চিন্তা হইতেই তাহারা কর্ম্মের উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিবে।

দিন আসে, দিন চলিয়া যায়—দূরে, দূরে, অতিদূরে,—শেষে আপনাকে অতীতের অসীম সাগরে হারাইয়া ফেলে। এমনি একদিন শত সূর্য্যের প্রভাকেও ম্লান করিয়া এক বিরাট্ পুরুষের আবির্ভাব হইল। তাঁহার পদপ্রান্তে শত কোটী জগৎ সতত ভ্রাম্যমাণ—তাঁহারি ইঙ্গিতে কোটী কোটী জগৎ পরিচালিত। তাঁহার সুরভিনিশ্বাসে সারা জগৎ রোমাঞ্চিত। তাঁহাকে দেখিয়া মানবের হৃদয়-সাগরে কি যেন এক সুগভীর ভাবের উত্থান-পতন হইতে লাগিল—তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। পলকবিহীন নেত্রে পুলকিত কলেবরে সেই 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' রূপ শুধুই দেখে—সাধ আর মেটে না! ক্রমশঃ সে যখন তাহার নিশ্চল হৃদয়ে অল্প অল্প আঘাত অনুভব করিতে লাগিল, তখন গদগদকণ্ঠে বলিল,—'হে বিরাট্ পুরুষ, অনাদি-অনন্তকালের প্রভু, হে কোটী কোটী জগতের ঈশ্বর, হে অসীম, অনাদি-অনন্তরূপধারি, তোমারি কার্য্যে এ প্রাণ নিয়োজিত করিলাম।' এই বলিয়া তাহারা সেই অনন্ত জ্যোতির আধার, বিশ্বস্রষ্টা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে প্রণত হইল;—তাঁহার ইঙ্গিতে সব বুঝিয়া নিল। তাঁহার সেই অনন্ত জ্যোতির কণামাত্র মানবের মনে বিক্ষিপ্ত হইল; সেই জ্যোতিতে সে দেখিতে পাইল, ক্ষুদ্র কীট হইতে চন্দ্র-সূর্য্য পর্য্যন্ত সকলি সেই জগৎপিতার কর্ম্ম-প্রেরণায় প্রণোদিত।

কিন্তু জগৎপিতা যে নির্ব্বিকার পুরুষ! কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষী ত

তিনি নন। কর্ম্মের ফলাফলের অতীত তিনি। তাঁহার কর্ম্ম করিলে তিনি ত তাহার ফল উপভোগ করিবেন না। তবে কে সেই কর্ম্মের ফল উপভোগ করিবে?—কাহার সুখ সুবিধার জন্য মানব কর্ম্ম করিবে? চিন্তার কথাই বটে।

জগৎপিতার কার্য্যে নিরত ঐ যে বিহগ তাহার সুমধুর স্বরলহরীতে দিগন্ত মধুময় করিয়া তোলে, সে কি স্বীয় তৃপ্তিসাধনের নিমিত্তই কণ্ঠবীণায় ঝঙ্কার দেয়? তাহার সুমধুর স্বরে জগৎই যে আমোদিত। পরের শ্রবণতৃপ্তির নিমিত্তই সে সুমধুর সঙ্গীতে সারা জগৎ মাতাইয়া তোলে। ঐ যে কুসুম জগৎপিতার কার্য্যে ব্রতী হইয়া সৌরভ পরিপূর্ণ অবস্থায় স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেই সৌরভ-সৌন্দর্য্য কি তাহার স্বীয় তৃপ্তির জন্য? সে তাহার সৌরভ সৌন্দর্য্যরূপ অর্ঘ্য লইয়া পরের জন্য দণ্ডায়মান। সমীরণ সেই জগৎপতির কার্য্যের জন্যই বহিয়া চলিয়াছে—সঙ্গে শত কুসুমের সুরভিনিশ্বাস—পরের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিবার নিমিত্ত। জগতের সমস্তই জগৎপতির কাজ করিতে গিয়া পরের সুখসুবিধার জন্য সতত ব্যস্ত। সুতরাং মানবকেও যে পরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্তই কাজ করিতে হইবে। জগৎপিতাপ্রদত্ত সেই জ্যোতিঃকণায় মানব দেখিতে পাইল যেন তাহার বক্ষপঞ্জরে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে,—

"—ব্রহ্ম হ'তে কীটপরমাণু
সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়।"

সুতরাং পরের জন্য পরের সুখসুবিধার নিমিত্ত কাজ করিলে যে ভগবানেরই কাজ করা হয়! তাই মানব বুঝিল, 'সে জগৎপিতার কাজ করিবে, পরের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত।'

জগতের অন্য মানবসম্প্রদায়ের মনে অন্য চিন্তা উদিত হইল। চিন্তাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে মানব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিল, বিহগ সুরসপ্তকে গাহিয়া উঠে তাহা শুনিয়া সে (মানব) কতই না আমোদিত হয়! কুসুম সৌরভস্নাত হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে সেই সৌরভ আঘ্রাণে সে কতই না বিভোর হয়!

সুধাকরের সুধাক্ষরণে সে কতই না পুলকিত হয়! জগতের যে কোন বস্তুতে দৃষ্টিপাত্ করা যায় তাহাই যেন স্বীয় সমস্ত ঐশ্বর্য্য সহিত অর্ঘ্য লইয়া মানবপূজার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহা হইতে মানব বুঝিল জগৎ সমস্ত সৌরভসম্ভার লইয়া মানবের জন্য—মানবের তৃপ্তির নিমিত্ত বিদ্যমান। এইখানে মানব নিজেকে সর্ব্বোচ্চ বেদীতে উপবেশন করাইয়া জগতের অন্যান্য প্রাণীর কথা—এই সমস্ত বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের যে অন্য কোন মহত্তর প্রয়োজন আছে তাহার কথা ভাবিয়াও দেখিল না। হায় স্বীয় স্বার্থান্বেষী মানব!

জগৎ সমস্ত সৌন্দর্য্য লইয়া মানবের জন্য দণ্ডায়মান সুতরাং মানবের কাজ হইল এই বিশ্বসৌন্দর্য্যেরই তথাকথিত সদ্ব্যবহারে নিজের সুখ উৎপাদন করা। নিজেরই এবং নিজেরই সুখস্ব বৰ্দ্ধনের জন্য কাজ করা। ইহাই তাহার কর্ম্ম। হায় ইহসর্ব্বস্ব মানব! একবার ভাবিয়াও দেখিলে না ভগবানের কি মহান্ ইঙ্গিত—কি মহান্ কর্ম্মভার তোমাদের উপর ন্যস্ত! কি মহত্তর কর্ম্মের আহ্বান তোমাদিগকে ডাকিতেছে!

বিশ্বসৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া, জগতের জীবনস্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া একই চিন্তাস্রোতে ভাসমান মানব শেষে দুইটি চিন্তাধারায় ধাবমান হইয়া দুই গন্তব্যে উপনীত হইল। কিন্তু কর্ম্ম চায় উভয়ই। কেহই নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিতে চায় না, অথবা পারেও না। জীবনস্পন্দনের কি সুগভীর চাঞ্চল্যই না তাহাদের ভিতর বিরাজ করিতেছে! উভয়ই কর্ম্মে নিজেকে নিয়োজিত করিল—কিন্তু বিভিন্ন-ভাবে। কর্ম্মের চঞ্চলতার মাঝে—জীবনের স্পন্দনের মাঝে দাঁড়াইয়া প্রথমোক্ত মানবের মনে স্বতঃই উদিত হইল,—'হে বিরাট্ পুরুষ, জগতের সকলই যে তোমার! তাহারই মাঝে আমি প্রেরিত হইয়াছি তোমারই কার্য্য করিতে,—তোমার করুণা সকলের প্রাণে ঢালিয়া দিতে; জগতের সকলই আমার সহায়তা করিবে। তোমারই কাজে এ প্রাণ নিয়োজিত করিলাম; এই আমার কর্ম্ম।' শেষোক্ত ইহসর্ব্বস্ব মানব বলিল,—'হে চন্দ্রিকাপুলকিত, মলয়ানিলসেবিত,

কুসুমসম্ভারশোভিত জগৎ, তুমি আমারি চিত্তবিনোদনে নিযুক্ত। অতএব তোমাদ্বারা আমার চিত্ততৃপ্তি সম্পাদন করা, তোমাকে আরও সজ্জিত করিয়া আমারি ব্যবহারের নিমিত্ত গড়িয়া তোলা—তোমার উন্নতিকল্পে কার্য্য করাই আমার কর্ম্ম।' প্রথম সম্প্রদায় বহুর জন্য আত্মহারা; তাহারা প্রেমিক—নিজেকে পরের জন্য বলি দিতে সতত প্রস্তুত। দ্বিতীয় সম্প্রদায় কাজ করে নিজের জন্য; নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যতটুকু দরকার তাহারা ততটুকু করিতে প্রস্তুত। প্রথম সম্প্রদায় নিজেকে কোন্ এক অসীম অনন্ত, আলোকসাগরে হারাইয়া ফেলে; আর দ্বিতীয় সম্প্রদায় নিজের ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর ঘুরিয়া মরে। প্রথম সম্প্রদায় বিশ্বের কাজে আত্মহারা। তাহারা নিজেদের সমস্ত সুখদুঃখ, আশা ভরসা পরের জন্য জলাঞ্জলি দিয়া পরের কাজে এ প্রাণ ঢালিয়া দেয়; কর্ম্মের ফলাফলের দিকে ফিরিয়াও তাকায় না। বিশ্বের কাজে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া ফলাফলে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া তাহারা জলদগম্ভীরস্বরে বলে,—

'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'

আর দ্বিতীয় সম্প্রদায় কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সুফলের পূর্ব্বাভাস না পাইলে অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহারা কার্য্যান্তে ফললাভের জন্য সতত ব্যস্ত। তাই আশাভঙ্গজনিত শোকে তাহারা সততই মর্ম্মাহত।

এইরূপে অধ্যাত্ম-জগৎ ও জড়জগৎ গড়িয়া উঠিল। প্রথমোক্ত মানবগণ অধ্যাত্মসম্প্রদায় গড়িয়া তুলিল; কত সুপ্ত হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিল, কত নবীন জগতের খবর আনিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহারা হইল অধ্যাত্মবাদী। শেষোক্ত মানবগণ জড়সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া কত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আবার নূতন গড়িয়া এ জগৎকে সজ্জিত করিল, কত বাহ্য সম্পদে এ জগৎকে সম্পদ্‌শালী করিল,—শুধু তাহাদেরই চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত। তাহারা হইল জড়বাদী। অধ্যাত্মবাদী শিক্ষা দিল,—'তুমি এই যে সৌন্দর্য্যময় জগতে দণ্ডায়মান, এখানে তুমি ছিলে না। এক অনন্ত, জ্যোতির্ম্ময় কিরণজালে সমুদ্ভাসিত, ফেনিল-জলধির জল উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে নাচিয়া

যায়;—তরঙ্গের পর তরঙ্গ তার পর তরঙ্গ ছুটিয়াছে সতত কল-কল্লোলে ;—তাহারি এক বিন্দু তুমি—চ্যুত হইয়া আসিয়াছ এখানে—সেই জগৎপিতারই কার্য্যসাধনের নিমিত্ত।" জড়বাদী শিক্ষা দিল,—"কে জানে কোথায় ছিলে এবং কোথায় যাইবে, অথবা মরণের সঙ্গে সঙ্গে তোমার চিরাবসান হইবে? কেন তবে অতীত এবং ভবিষ্যতের তমসাবৃত গহ্বরে সত্যের বৃথা অন্বেষণ করিতেছ? বর্ত্তমান যাহা—এখন তোমার জীবিতাবস্থায় যাহা করিতে হয় কর; এখনি যত পার সুখ ভোগ করিয়া লও। তোমারি জন্য তোমার জীবন—তোমার কর্ম্ম। জগতেই তোমার আদি ও অন্ত।"

এইরূপে জড়বাদী ও আধ্যাত্মবাদী মিলিয়া এই জগতের মানব সমষ্টি। দুইয়ে দুই বিভিন্ন ভাবে জগৎকে, বাড়াইয়া তুলিতেছে। দুইএর বিভিন্ন কর্ম্মসামঞ্জস্যে বিশ্বকর্ম্মের প্রসার। উভয়ের উদ্দেশ্যের পার্থক্য অনেক। জড়বাদী চায় নিজেকে পরের ভিতর বাড়াইয়া তুলিতে; আর অধ্যাত্মবাদী চায় নিজেকে পরের ভিতর ডুবাইয়া দিতে। এখন যদি আমরা কর্ম্মের মাপকাঠি দিয়া উভয়ের পরিমাণ করি তবে দেখিব উভয়েরই এ জগতে তুল্যাংশে প্রয়োজন। জড়বাদী এবং অধ্যাত্মবাদী দুই বিভিন্ন পথে সমান্তরাল ভাবে অগ্রসর হইতেছে। কে অগ্রে কে পশ্চাতে, কে ঊর্দ্ধে কে নিম্নে, অথবা কে পথভ্রষ্ট কে সুপথের যাত্রী, এই কথা জানিবার আমাদের তত প্রয়োজন নাই, যত না প্রয়োজন কর্ম্মের দৃষ্টির ভিতর দিয়া উভয়কে লক্ষ্য করা। যদি জড়বাদী প্রধান হয় তবে অধ্যাত্মবাদী একেবারে ভ্রান্ত হইবে না। কারণ, তাহার কর্ম্ম 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়'; সেই বহুর মধ্যে সেও এক-জন—ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতেই সমষ্টি। আর যদি অধ্যাত্মবাদী শ্রেষ্ঠ হয় তবেও জড়বাদিগণ একেবারে অনাদৃত হইবার কোন কারণ নাই, তাহারা এ জগৎকে সজ্জিত করিয়া ধনসম্পদে গরীয়ান্ করিয়া তুলিতে তুলিতে অজ্ঞাতসারে সেই বিশ্বগুরুরই কার্য্য করে, এই জগতের প্রাণিগণেরই মঙ্গল করে। ব্রহ্ম হইতে কীটপরমাণু সকলেতেই যখন সেই বিশ্বপিতা বর্ত্তমান তখন জগৎবাসীর মঙ্গল করিলে তাঁহারি যে সেবা করা হয়।

অধ্যাত্মবাদীর ভাষায় যদি বলি তবে এই বলিতে হয় যে, এ জগতে যাহা সংঘটিত হয় সকলি সেই বিশ্বস্রষ্টার অভিপ্রায়ে; সুতরাং কার্য্যকারণ ব্যতিরেকে এ জগতে কিছুই অনুষ্ঠিত বা সংঘটিত হয় না। ইহা হইতে ভগবানের এই ইঙ্গিত স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে জগৎস্থিতির জন্য জড় ও অধ্যাত্মবাদীর তুল্যাংশে প্রয়োজন আছে; মূল কথা কর্ম্ম। এই উভয়ের মিল না হইলে একাকী এক সম্প্রদায় যে পূর্ণাবয়ব হয় না! এই উভয়ের মিলন হইবে যে দিন সে দিন মানব নবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার উদ্দেশ্যে উপনীত হইবে। তখন সমস্ত বাঁধনের অতীত মানবের হৃদয়বীণা বেশ ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিবে,—'শান্তিঃ। শান্তিঃ!! প্রশান্তিঃ!!!' আর তখনই মানব একেবারে গিয়া গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইবে আর পথভ্রষ্ট হইবে না।

অধ্যাত্মবাদী প্রাচ্য জগৎ! আর কেন? এইবার তোমাদের সকল ঐশ্বর্য্যসহিত জড়বাদী পাশ্চাত্য জগৎকে আলিঙ্গন কর। জড়বাদিগণ! তোমরা অনেক অগ্রসর হইয়াছ, এইবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখ তোমরা গন্তব্যে উপনীত হইতে পারিবে না; তোমাদের অর্দ্ধাংশ যে প্রাচ্য জগৎ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। তবে আর কেন বৃথা তর্কজাল বিন্যাস করিয়া ক্রমশঃ পথভ্রষ্ট হইতে থাকিবে? প্রাচ্য জগতের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত বেগে একবার অগ্রসর হও দেখিবে আর পথচ্যুত হইতে হইবে না। প্রাচ্য জগৎ! চেয়ে দেখ পাশ্চাত্য জগত আজ তোমার দ্বারে দণ্ডায়মান। তাহার উপর তোমার বিশ্বজনীন প্রেমের ধারা ঢালিয়া দাও; তাহার কর্ম্মপদ্ধতির সঙ্গে তোমার কর্ম্মপদ্ধতির আদানপ্রদান করিয়া এক মহান্ শক্তির সৃষ্টি করিয়া তোল। পাশ্চাত্য জগৎ আজ তোমার কথা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কত লালায়িত! দাও তাহাকে তোমার যতটুকু ঐশ্বর্য্য আছে—কণিকা মাত্র সঞ্চিত রাখিও না, সমস্ত দান করিয়া রিক্তহস্তে মুক্ত-হৃদয়ে উন্মুক্ত আকাশতলে দণ্ডায়মান হও। পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের প্রাণের বিনিময়ের দিন আসিয়াছে। ঐ শোন

বাঙ্গালী কবি সমস্ত তর্কপ্রসূত বিভিন্নতার মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন,—

"পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে,—
যাবে না ফিরে।"

প্রাচ্য পাশ্চাত্য জগৎ মিলিয়া মিশিয়া হাতে হাতে ধরিয়া একই মন্ত্রে দীক্ষিত, একই সূত্রে আবদ্ধ ও একইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হইবে—কি সুন্দর, কি মহান্, কি মধুর, কি স্বর্গীয় দৃশ্য।

পরের চাকর।

(শ্রীআনন্দ চন্দ্র শীল)

"ঘোর অমাবস্যা নিশা—শ্রাবণের ধারা
শিরে ধরি কে ছুটিছ পাগলের পারা ?
হাজারও থাকে যদি নিজ প্রয়োজন,
তবু এ দুর্য্যোগে জ্ঞানী না ছাড়ে ভবন,
পশুও শুইয়া আছে সুখের আবাসে
কি দায়ে পড়িয়া তুমি ধাও রুদ্ধশ্বাসে ?"
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি পান্থ করিল উত্তর—
"পশুর অধম আমি পরের চাকর।"

উদ্যমের ব্রত।

প্রশংসা বলিল—"এস উদ্যম অভঙ্গ!
এতক্ষণ হ'তেছিল তোমারি প্রসঙ্গ।
সকলেই মুক্তকণ্ঠে গায় তব যশ,
শুনি প্রাণে উথলিয়া উঠে স্নেহরস।"
বলিল উদ্যম ধীরে নত করি শির—
"যশঃ—গায়কের গুণ নহে যশস্বীর।
নিন্দাযশে লক্ষ্যহীন আমি অনুক্ষণ,
কর্ম্মপদে করিয়াছি জীবন অর্পণ।"

গরজের আদর।

ভাঙ্গা কুলা বলে—"দেখ কি মোর আদর,
আমার খুঁজিতে গৃহী ব্যস্ত গুরুতর।"
অভিজ্ঞতা বলে—"সেটা বুঝিয়াছি বেশ,
ছাই যত আছে আজ করিবে নিঃশেষ।"

শ্রীআনন্দ চন্দ্র শীল

স্বগৃহে শঙ্কর।

(ঋষিসমাগম)

(শ্রীমতী—)

কেরলরাজ স্বয়ং শঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন একথা অচিরে সমগ্র দেশে প্রচারিত হইয়া পড়িল। জনসাধারণের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহার ফলে শঙ্করকে দেখিবার জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয়ে মহা কৌতুহলের সঞ্চার হইল। এখন পথে, ঘাটে, মাঠে সর্ব্বত্রই শঙ্করের আলোচনা। সকলেরই মুখে কালাডি গ্রামের একটী আট বৎসরের বালকের কথা! কাহারও গৃহে বন্ধুবান্ধব অথবা আত্মীয় স্বজনের সমাগম হইলে পরস্পরের মধ্যে এই কথাই হইতে লাগিল। কেহ হয়ত বলিলেন, "ওহে শুনিয়াছ, কালাডি গ্রামে একটী আট বছরের ছেলে সর্ব্ববিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়াছে, তাহাকে বেদবেদান্ত যাহা জিজ্ঞাসা করিবে সে তাহারই সদুত্তর দিবে।" অপরে বলিলেন "উহাত পুরাতন কথা,—এক্ষণে নূতন যাহা হইয়াছে তাহাই শুনুন, ঐ বালক নদীর গতি ফিরাইয়াছে।" আর একজন হয়ত বলিলেন—"মশায়, ঐ ছেলের প্রার্থনায় এক দরিদ্র, ব্রাহ্মণীর গৃহে প্রচুর সুবর্ণ আমলকী বৃষ্টি হইয়াছিল।" আবার একজন হয়ত বলিলেন, "এক্ষণে রাজা রাজশেখর সেই ছেলেটীকে নিজে এসে দেখে গেছেন।" অন্য একজন কহিলেন, "শুধু তাহাই নয় হে, রাজা বালককে দশহাজার সুবর্ণ মুদ্রা দিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন, বালক তাহা গ্রহণ করে নাই—ফিরাইয়া দিয়াছে।" কেহ বলিলেন, "চলুন মহাশয় একদিন কালাডি গিয়া বালকটীকে দেখিয়া আসা যাউক।" এইরূপে পরস্পরের মধ্যে আলোচনার ফলে শঙ্করের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র অনেকেই—কেহ বা রোগ আরোগ্য কামনায়,

কেহ বা পুত্র কামনায়, কেহ বা ধনলাভাশে, কেহ বা ইষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত—শঙ্করের উদ্দেশে ছুটিল। কুসুমের সুগন্ধ যেরূপ চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া ভ্রমরকুলকে আকৃষ্ট করে, তদ্রূপ শঙ্করের যশঃসৌরভ দলে দলে নরনারীগণকে আকৃষ্ট করিতে লাগল।

আতিথেয়তায় বিশিষ্টাদেবীর চিরদিনই আনন্দ, সুতরাং তাঁহার আজ অতিথিসৎকারের বিরাম নাই। কিন্তু তাঁহার এ আনন্দ আর অধিক দিন থাকিল না। কারণ, এই অতিথিগণ বড়ই উৎপাত আরম্ভ করিল। তাহারা নানাজনে নানারূপ বাসনা লইয়া আসায় স্ব স্ব বাসনা সিদ্ধির জন্য বিশিষ্টাদেবীকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিতে লাগিল। বিশিষ্টাদেবী কিন্তু পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কায় কাহারও নিকট তাহার অলৌকিক শক্তির কথা প্রকাশ করিতে চাহিতেন না, বরং তাহাদিগকে বিপরীতই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহারা তাহা বুঝা ত দূরের কথা, তাঁহাকে আরও উত্যক্ত করিত। পরিশেষে অনেকেই বিফলমনোরথ হইয়া অগত্যা শঙ্করের আশীর্ব্বাদেই বাসনা সিদ্ধি হইবে ভাবিয়া, কেহ বা নিজ অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করিয়া ক্ষুণ্ণমনে গৃহে ফিরিয়া যাইত। এইরূপ ঘটনা নিত্য ঘটিলেও শঙ্কর নির্ব্বিকার ভাবে শাস্ত্রচর্চ্চায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার চক্র দুর্ব্বিজ্ঞেয়। একদিন দ্বিপ্রহরে তাঁহার গৃহে অগস্ত্য, ত্রিতল, পিপ্পল গোত্র সম্ভূত কয়েকজন ঋষিকল্প ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশিষ্টাদেবী এই দেবতুল্য অতিথিগণের শুভাগমন দেখিয়া পুলকিত চিত্তে পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগের যথাবিধি সৎকার করিলেন।

পথশ্রান্তি বিদূরিত হইলে তিনি ঋষিদিগের চরণে ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক করজোড়ে কহিতে লাগিলেন—"ভগবন্! আজি আমার পরম সৌভাগ্য যে গৃহে বসিয়া আপনাদিগের চরণ দর্শনে সমর্থ হইলাম। আপনাদিগের দর্শন অতি দুর্লভ, ভগবানের কৃপায় আমার তাহাও সিদ্ধ হইল, আমি ধন্য হইলাম। আপনারা কৃপা করিয়া আজ আমাদিগের সেবা গ্রহণ করুন।"

বিশিষ্টাদেবীর সুবিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ অতীব তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক কহিলেন, "জননি! আমরা আজি আপনার পুত্র শঙ্করকে দেখিবার জন্য আসিয়াছি। তিনি কোথায়? তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমরা বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ এখনই স্থানান্তরে গমন করিব।" ব্রাহ্মণগণের বাক্যে বিশিষ্টাদেবী শঙ্করকে আহ্বান করিলেন। অধ্যয়ননিরত বালক মাতার আহ্বানে অবিলম্বে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই সকল তেজঃপুঞ্জ-কলেবর প্রাচীন ঋষিকল্প মহাত্মাগণকে দেখিয়া নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন। জননীর ইঙ্গিতের পূর্ব্বেই তিনি তাঁহাদিগের চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করতঃ করজোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন।

ব্রাহ্মণগণ শঙ্করের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিকটে বসাইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ অনিমেষনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইতিপূর্ব্বে অনেকেই তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন কিন্তু আজ এই ব্রাহ্মণগণের দর্শন যেন একটু অন্যরূপ,—ইহা বুঝিতে বুদ্ধিমতী বিশিষ্টাদেবীর বিলম্ব হইল না। অতঃপর ব্রাহ্মণগণ শঙ্করের সহিত শাস্ত্রকথায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ কথোপকথনে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইল। বিশিষ্টাদেবী অবকাশ বুঝিয়া গললগ্নীকৃতবাসে ঋষিগণকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "ভগবন্, এই বালকের প্রতি আপনাদের যেরূপ করুণা দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় ইহার পূর্ব্বজন্মের কোন বিশেষ সুকৃতি ছিল। নচেৎ আপনারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আগমন করিবেন কেন? আপনারা ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ; তাই নিবেদন করিতেছি যদি কৃপা করিয়া এই বালকের ভবিষ্যৎ কিছু বর্ণনা করেন তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই।"

বিশিষ্টাদেবীর আগ্রহে অগস্ত্য নামক ব্রাহ্মণ কহিলেন, "জননি! তবে আপনি ইহার জন্মপত্রিকাখানি আনয়ন করুন।" তিনি উহা আনিয়া দিলে তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিয়া একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল বিচার করিয়া বলিলেন, "জননি! তবে শুনুন। পূর্ব্বে আপনি ও আপনার পতি পুত্রার্থ শিবের আরাধনা

করিয়াছিলেন। শিব সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রবর প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া আপনার পতিকে বলেন, 'শিবগুরো! তুমি শতায়ু মূর্খ বহু পুত্র প্রার্থনা কর, অথবা অল্পায়ু সর্ব্বজ্ঞ একমাত্র পুত্র প্রার্থনা কর? ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী প্রার্থনা কর, আমার বরে তোমার তাহাই লাভ হইবে।' ইহাতে আপনার পতি বলিয়াছিলেন, 'ভগবন্! যদি দীর্ঘায়ু সর্ব্বজ্ঞ পুত্র আমার ভাগ্যে নাও থাকে, তথাপি আমার মূর্খ শত পুত্রে প্রয়োজন নাই—আমাকে সর্ব্বজ্ঞ অল্পায়ু পুত্রই প্রদান করুন।' তাহাতে মহাদেব—'তথাস্তু, আমিই তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব' এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। জননি! আপনার এই পুত্র সেই শঙ্কর। আপনি স্মরণ করুন ইহা সত্য কি না।"

ব্রাহ্মণবাক্যে বিশিষ্টাদেবীর চমক ভাঙ্গিল। তিনি পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া এতদিন বিষয়টী একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "মহাত্মন্! একথা সম্পূর্ণ সত্য। এখন আমার পূর্ব্বকথা সমস্ত মনে পড়িতেছে। এক্ষণে আপনারা দয়া করিয়া বলুন আমার শঙ্করের আয়ু কতদিন—আমি ও বাছাকে রাখিয়া যাইতে পারিব?"

ব্রাহ্মণগণ বিশিষ্টার এই ব্যাকুলতায় যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন এবং পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। বিশিষ্টা ব্রাহ্মণগণের এই ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া আরও ব্যাকুলভাবে পুত্রের পরমায়ুর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন সকলের অনুরোধে অগস্ত্য ঋষি কহিলেন, "মা! আপনার পুত্রের অষ্টমবর্ষে জীবন-সংশয় আছে। ঐকালে যদি জীবন রক্ষা হয় তবে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত আয়ু দেখা যায়; কিন্তু দেবতা বা গুরুকৃপা হইলে আরও ষোড়শবর্ষ কাল জীবিত থাকিতে পারেন। এইরূপে তাঁহার মাত্র দ্বাত্রিংশৎ বৎসর আয়ু দেখিতে পাইতেছি।"

এইকথা বলিয়া অগস্ত্য ভাবিলেন—জননীর সাক্ষাতে এরূপ অপ্রিয় আলোচনা বড়ই গর্হিত হইয়াছে, এবং পাছে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করেন এই ভাবিয়া তিনি আসন ত্যাগ করিলেন এবং বলিলেন, "মা!

এক্ষণে আমাদের বিদায় দিন। আমাদিগকে শীঘ্র স্থানান্তরে যাইতে হইবে।"

ব্রাহ্মণগণ বিদায় লইলে বিশিষ্টাদেবী পুত্রের জন্য বড়ই উদ্বিগ্না হইয়া উঠিলেন। তিনি কখন বা শিরে করাঘাত করিয়া মর্ম্মভেদী বাক্যে শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কখন বা বিমর্ষভাবে অবস্থান করিয়া মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। শঙ্কর জননীর এই কাতরতা দর্শন করিয়া তাঁহাকে নানাবাক্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, "মা আপনি নিষ্ঠাবতী ও বুদ্ধিমতী হইয়া কেন এরূপ শোক করিতেছেন। ভাবিয়া দেখুন এ সংসারে কেহ কাহারও আপনার নহে। আপনি আজ আমার জন্য কাতরা হইতেছেন, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে আপনি কত সন্তানের জননী ছিলেন, এক্ষণে তাহাদের জন্য কি শোক করিতেছেন? আমরা সকলেই এ সংসারে পান্থশালায় পথিকের ন্যায় সমবেত হইয়াছি মাত্র। আর এই ক্ষণভঙ্গুর রক্তমাংসের দেহের জন্য শোক করিতেছেন কেন? আপনি ত জানেন আত্মা অজ, অবিনাশী, অব্যয়, নিত্য, সনাতন—তাঁহার বিনাশ কোথায়? অতএব কাহার জন্য কাতরা হইতেছেন? আপনি এক্ষণে শোক পরিহারপূর্ব্বক ভগবৎপাদপদ্মে চিত্ত সমর্পণ করিয়া শান্ত হউন।"

এইরূপ নানা জ্ঞানপূর্ণ বাক্যে শঙ্কর জননীকে যত সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাঁহার শোকাবেগ ততই উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। বিশিষ্টার মনে হইতেছে—আহা! এমন সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র যদি দীর্ঘায়ু হইবে না তবে ভগবান্ আমাকে কেন পুত্র দিলেন। কখন ভাবেন, না জানি পূর্ব্বজন্মের কি পাপের ফলে এইরূপ অল্পায়ু পুত্র লাভ করিলাম। কখন ভাবিয়া আকুল হইতেছেন—তাইত আমি বাছাকে রাখিয়া যাইতে পারিব কিনা একথার কোন উত্তর ত ব্রাহ্মণগণ দিলেন না! তবে কি আমার সাক্ষাতেই আমার শঙ্করের অমঙ্গল হইবে? বিশিষ্টাদেবী তখন ব্যাকুলভাবে শঙ্করকে বলিলেন, "বাবা! এত শাস্ত্র শিখিয়াছ, জ্যোতিষ শাস্ত্র

তুমি কি শিখ নাই? তুমি কি বলিতে পার না আমি তোমার পূর্ব্বে যাইতে পারিব কিনা?"

জননীর ব্যাকুলতায় শঙ্কর তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "মা! আপনার কোন ভয় নাই, আমি বলিতেছি আপনি আমার পূর্ব্বেই যাইবেন, আমার কথায় বিশ্বাস করুন।" কিন্তু পুত্রবৎসল বিশিষ্টাদেবীর সে কথা যেন বিশ্বাস হইল না। তিনি বার বার ঐ কথাই চিন্তা করিয়া শোক করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। কাল সকল দুঃখই হরণ করে, তাহার তুল্য শান্তিদাতা আর কে আছে! শঙ্করের শত উপদেশ বাক্যে যাহা হয় নাই, এক্ষণে কালমাহাত্ম্যে তাহাই হইল, বিশিষ্টাদেবী একটু শান্ত হইলেন।

জননীকে কথঞ্চিৎ শান্ত দেখিয়া শঙ্করও সুস্থির হইলেন। কিন্তু ক্রমে তাঁহারও চিত্তে চিন্তা-মেঘের উদয় হইতে লাগিল। ঋষিমুখে স্বীয় অল্পায়ুর কথা শুনিয়া অবধি শঙ্কর স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য চিন্তায় নিরত হইলেন। এই সমুদয় বিষয় যতই চিন্তা করেন ততই তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। বালকোচিত হাস্যপ্রফুল্লতা সকলই যেন অন্তর্হিত হইল। সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম্মে আর যেন তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট হয় না, শাস্ত্রচর্চ্চায়ও আর সেরূপ আগ্রহ নাই; ফলতঃ সকল বিষয়েই বিমর্ষতা এবং ঔদাসীন্য যেন তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

যে চিন্তার উদয়ে অতি পাষণ্ডও ক্ষণিক আবেগভরে কুকর্ম্ম হইতে বিরত হয়, সে চিন্তা যে আজ নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র, পবিত্রহৃদয়, অসাধারণসদ্‌গুণসম্পন্ন, বিদ্বান্ এবং জ্ঞানী শঙ্করকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তির পথে চালিত করিবে, অথবা সে চিন্তা যে আজ তাঁহাকে অজ্ঞানমুগ্ধ জনসাধারণের কল্যাণ চিন্তায় ব্যাকুল করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? শঙ্কর আজ কি করিবেন? অপার সংসারসমুদ্র যেন আজ তাঁহার সম্মুখে উত্তাল তরঙ্গভঙ্গিতে অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, সর্ব্বসংহারক

কাল যেন বিকটদশন বিস্তার করিয়া জগৎকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। আর কালভয়ে ভীত জীবকুল যেন, উদ্ধারের আশায় সতৃষ্ণনয়নে শঙ্করের প্রতি চাহিয়া আছে। ভগবান্ বুদ্ধ যেমন রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু দেখিয়া জগতের দুঃখে বিচলিত হইয়া উহাকে জরামৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধারের চিন্তায় গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, শঙ্করাবতার শঙ্করও আজ নিজ অল্পায়ুর কথা শ্রবণ করিয়া জগতের কল্যাণচিন্তায় কাতর হইয়া পড়িলেন। নিজের মৃত্যুচিন্তা বা মৃত্যুভয় তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। শঙ্কর অধ্যয়নে বসেন কিন্তু পাঠে মনঃসংযোগ হয় না, সম্মুখে উন্মুক্ত পুস্তক পড়িয়া আছে বাতাসে উহার পাতা উড়িয়া যাইতেছে, তাঁহার সেদিকে দৃষ্টি নাই। নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানেও মন্ত্রবিস্মৃতি হইতেছে—কোন বিষয়েও যেন লক্ষ্য নাই। আবার কুলদেবতার চরণে প্রণিপাত করিতে গিয়া অসম্ভব বিলম্ব ঘটিয়া যায়—কখন বা জননী মন্দিরে গিয়া পুত্রকে ডাকিয়া লইয়া আসেন। এইরূপে সকল বাহ্যবিষয়ে শঙ্করের উদ্যমহীনতা ও শৈথিল্য পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

কিন্তু ঈশ্বরপ্রসাদে শঙ্করের এই বিচলিতভাব অধিক দিন স্থায়ী হইল না। তিনি শীঘ্রই নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন—'জগদ্ধিতায়' রূপ আদর্শে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া তৎসাধনের উপায়স্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন। এদিকে বিশিষ্টা-দেবী পুত্রের উক্তপ্রকার বহির্ব্বিমুখ ভাব দর্শনে অতিশয় চিন্তিতা ও ভীতা হইয়া পড়িলেন। তিনি পুত্রকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য নিজের চিন্তা গোপন রাখিয়া তাঁহার সম্মুখে প্রফুল্ল থাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শঙ্করের যেন দিন দিন ভাবান্তর হইতে লাগিল। শঙ্কর ক্রমেই গম্ভীর হইয়া পড়িতে লাগিলেন। জননী শঙ্করের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া ভাবিলেন—নিশ্চয়ই বাছা আমার নিজ অল্পায়ুর কথা শুনিয়া মৃত্যুচিন্তায় এরূপ উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছে। যদিও সে আমায় নানারূপ উপদেশ বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া থাকে, তথাপি বালক বই ত নয়! মৃত্যুচিন্তা বৃদ্ধকেও কাতর

করিয়া তুলে, এ ত আমার দুধের ছেলে সুতরাং ইহার পক্ষে ঐরূপ হওয়া আশ্চর্য্য কি! এই ভাবিয়া তিনি একদিন শঙ্করকে নিকটে বসাইয়া সস্নেহে তাঁহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "বাছা শঙ্কর! তুমি এত ভাব কি? তুমি যে বাছা শিবের প্রসাদে জন্মিয়াছ, তোমার জীবনের কোন ভয় নাই। ব্রাহ্মণগণ নিশ্চয়ই গণনায় ভুল করিয়াছেন; তুমি শিবের সন্তান, তুমি অল্পায়ু হইবে কেন? আমি বলিতেছি তোমার কোনও অমঙ্গল হইবে না, অধিকন্তু আমি সদ্‌ব্রাহ্মণ দ্বারা শান্তিস্বস্ত্যয়ন করাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহাতে তোমার সমস্ত বিপদাপদ কাটিয়া যাইবে। তুমি দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে পূর্ব্বের ন্যায় লেখাপড়ায় মন দাও।"

জননীকে বিপরীত চিন্তায় চিন্তিত দেখিয়া শঙ্কর একটু হাসিয়া কহিলেন, "মা! আপনি ভুল করিতেছেন, আমি মৃত্যুচিন্তায় চিন্তিত নহি। অন্যরূপ চিন্তায় আমার চিত্তবিকৃতি ঘটিয়াছে"। তখন যেন বিশিষ্টাদেবীর চমক ভাঙ্গিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—সত্যই ত, আমি স্নেহে অন্ধ হইয়া কাহাকে কি বলিতেছি, শঙ্কর আমার মহাজ্ঞানী, সে কি কখন মৃত্যুভয়ে ভীত অথবা সামান্য চিন্তায় কাতর হইতে পারে? তাহার এরূপ ভাবান্তরের নিশ্চয়ই বিশেষ কোন কারণ ঘটিয়াছে।

এই ভাবিয়া তিনি শঙ্করকে বলিলেন, "বাছা! তবে তুমি কিসের চিন্তায় এরূপ গম্ভীর হইয়া থাক, তাহা আমাকে বল। আমি তোমার এই প্রকার ভাবদর্শনে মনে মনে সাতিশয় কষ্ট পাইতেছি।"

তখন শঙ্কর করজোড়ে কহিলেন "মা! তবে স্বীকার করুন, আমার যাহা নিবেদন করিবার আছে তাহা আপনি শুনিবেন।"

উত্তরে বিশিষ্টা বলিলেন, "বাবা! তোমার কোন্ কথা আমি শুনি নাই? তোমার যাহা বলিবার স্বচ্ছন্দে বল।"

শঙ্কর কহিলেন, "মা! আমার অল্পায়ুর কথা আপনিও সেদিন শুনিলেন। অতএব আমি এই অল্পায়ু জীবন লইয়া কি করিব?

আমি কি বৃথাই সংসারভোগে জীবন ক্ষয় করিব, না মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদনে যত্নপর হইব? মা! আমার আর কিছু ভাল লাগিতেছে না। কয়েক দিন হইতে এই চিন্তায় আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।"

বিশিষ্টাদেবী পুত্রের কথা শুনিয়া স্তম্ভিতা হইলেন। তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "বাবা! তুমি যে অল্পায়ুই হইবে এমন কিছু নিশ্চয়তা নাই। আর যদিও তোমার কোনরূপ গ্রহবৈগুণ্য থাকে তবে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা আমি তাহা নিবারণ করাইব।"

শঙ্কর বলিলেন, "মা! শান্তিস্বস্ত্যয়ন দ্বারা কি প্রারব্ধ ক্ষয় হয়? জ্যোতির্বিদ্যা দ্বারা প্রারব্ধের কথা জানা যায়। উহা দ্বারা মাত্র জানা যায়—যে এই এই ঘটনা ঘটিবে। অতএব আপনি যে শান্তিকর্ম্ম দ্বারা তাহার অন্যথা করিবেন তাহা অসম্ভব। আর যদি কখন কাহারও শান্তিকর্ম্মাদি দ্বারা বিপদুদ্ধার বা মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে, তবে তাহাও সেই প্রারব্ধ এবং সেই জ্যোতিষ শাস্ত্রই নির্দ্দেশ করিয়া দেয় জানিবেন। সুতরাং শান্তি স্বস্ত্যয়ন দ্বারা যে আমার আয়ুবৃদ্ধি হইবে, ইহা ভাবিবেন না। আপনি এতদিন আমার জন্মপত্রিকা দেখান নাই, তাই আমিও ইহা জানিতে পারি নাই। এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের আগমনে তাহা জানিয়াছি। তদবধি আমি কি করিব বুঝিতে পারিতেছি না। আমি ভাবিতেছি অল্পায়ু হইয়া জগতে আসিলাম, অথচ এখনও জীবনের সার্থকতা সম্পাদনার্থে কিছুই করিতে পারিলাম না। যাহা করিলে আর না জগতে আসিতে হয়, আর না দুঃখের মুখ দেখিতে হয় এমন কিছুই করিতে পারিলাম না। দেখুন মা, এ জগতে মানব কোনমতেই অবিমিশ্র সুখ লাভ করিতে পারে না, অথচ এমন কিছুও সে করে না যে ভবিষ্যতে তাহার আর দুঃখ হইবে না। যাগ-যজ্ঞ-ধর্ম্ম কর্ম্ম যাহা কিছু সকলেরই ফল স্বর্গাদি বা ইহলোকে ঐশ্বর্য্যাদি লাভ। কিন্তু তাহাতেই বা কি হইবে? পুণ্যক্ষয় হইলে স্বর্গ হইতে পতন এবং ইহলোকেও ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হয়। সুতরাং, মা! এমন কিছু

করা আবশ্যক যাহাতে আর না জন্ম হয়, আর না সুখদুঃখের মুখ দেখিতে হয়। বর্ত্তমানে ইহাই আমার একমাত্র ভাবনা। দীর্ঘায়ু হইয়া দীর্ঘকাল সদ্‌গুরুর উপদেশে সাধন ভজন করিতে পারিলে যদি ভগবৎকৃপায় তত্ত্বজ্ঞানের স্ফুরণ হয়, তবেই এ মায়ার জগৎ হইতে উদ্ধারের সম্ভাবনা ; নচেৎ শুধু শাস্ত্রপাঠ বা যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইবার নহে। কিন্তু মা! আমি অল্পায়ু, কি করিয়া আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে ?"

বিশিষ্টা শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন এবং কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "কেন বাবা! শান্তি-স্বস্ত্যয়ন দ্বারা কি মানুষ অকালমৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না ? তাই যদি না হইবে তবে শাস্ত্রে এ সকলের ব্যবস্থা কেন, আর লোকেই বা ইহাদের অনুষ্ঠান করে কেন ? তবে বাবা ! তুমি অনেক শাস্ত্র পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছ ও অনেক জান, আমরা কিন্তু এইরূপই শুনিয়া আসিতেছি। মানুষের নিয়তি যখন তাহারই কৃত কর্ম্মের ফল তখন সে তাহার অন্যথা করিতে পারিবে না কেন ?"

শঙ্কর বলিলেন, "মা ! মানুষ কখন নিয়তির অন্যথা করিতে পারে না। কারণ, যে কর্ম্মের ফলভোগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তাহারই নাম প্রারব্ধ কর্ম্ম বা নিয়তি। প্রারব্ধ কর্ম্ম আমাদের স্বকৃত কর্ম্ম হইলেও হাতের ঢিল একবার ছুড়িয়া ফেলিলে যেমন আর তাহা ফিরাইয়া আনা যায় না— ইহাও তদ্রূপ।

বিশিষ্টাদেবী ত শঙ্করেরই জননী, তিনিও এত সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহেন। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বাবা ! মনে কর এক জনের সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইয়াছে। তুমি বলিবে—সেই পীড়া তাহার প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল, কিন্তু এই সময় যদি তাহার জন্য উত্তম-চিকিৎসার বন্দোবস্ত এবং শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি করা হয়, এবং তাহার পরে সে যদি আরোগ্য লাভ করে, তাহা হইলে কি তুমি তাহা চিকিৎসা ও শান্তি কর্ম্মেরই ফল বলিবে না ? বাস্তবিক দেখা যায় এরূপ করিয়া অনেকেই বাঁচিয়া উঠে। তবে নিয়তির কেন অন্যথা করা যাইবে না ?"

শঙ্কর জননীর ঐরূপ যুক্তি শ্রবণ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মা! তখন চিকিৎসা ও শান্তিকর্ম্ম করাও তাহার নিয়তি। কেন না, সকলেই ত চিকিৎসা ও শান্তিকর্ম্ম করাইতে পারে না। প্রারব্ধ-কর্ম্মবশেই রোগ হইয়াছিল এবং প্রারব্ধ কর্ম্মবশেই তাহার চিকিৎসা ও শান্তিকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে; ফলে লৌকিক দৃষ্টিতে মাত্র সে চিকিৎসা ও শান্তিকর্ম্ম করিয়া আরোগ্য হইল।"

বিশিষ্টা বলিলেন, "না বাবা, আমি তোমার একথা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে কি তুমি বলিতে চাও—আমরা যাহা করিতেছি সবই আমাদের পূর্ব্বকর্ম্মবশে করিতেছি—আমাদের কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কোনও ক্ষমতা নাই? আমরা আমাদের কর্ম্মের কর্ত্তাই নহি? তাহা যদি হইবে, তবে কর্ম্মফলের ভোগই বা আমাদের হইবে কেন? আমরা যদি কর্ম্মের কর্ত্তা না হই তবে আমরা কেন তাহার ফলভোগ করিব? আমরা সকলেই বুঝি যে ইচ্ছা করিলে আমি একটা কিছু করিতে পারি আবার নাও করিতে পারি। সুতরাং বাবা! তোমার এ কথা কিরূপে সত্য হইবে যে, বর্ত্তমান জীবনে যাহা কিছু ঘটিতেছে সকলই প্রারব্ধ এবং ঐ প্রারব্ধের উপর আমাদের কোন হাত নাই? অনেক শাস্ত্র পড়িয়া তুমি হয়ত সব গোল করিয়া বসিয়াছ।"

শঙ্কর বিনীত ভাবে বলিলেন, "মা! আপনার কথাই সত্য হইত যদি আমাদের ইচ্ছারও কোন কারণ না থাকিত। দেখুন মা! শীতকালেই আমাদের গরমে থাকিবার ইচ্ছা হয়, গ্রীষ্মকালেই শীতল জলপানে প্রবৃত্তি হয়। সকল সময়ে ত আমাদের সব রকম ইচ্ছা হয় না কাজেই ইচ্ছারও একটা নিয়ম আছে—একটা কারণ আছে। এ জন্যই আমরা স্বাধীন নহি। আমাদের সকলই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট। আমরা আমাদের পূর্ব্বকর্ম্ম জানি না বলিয়া এবং আমাদিগকে কর্ম্মের কর্ত্তা মনে করি বলিয়া আমরা ভাবি যে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্দ্দিষ্ট নহে—আমরা ইচ্ছা করিলে উহাকে যে কোন ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের নিকট সবই জ্ঞাত রহিয়াছে। আমরা

যদি যথার্থই স্বাধীন হইতাম, স্বাধীন ইচ্ছা করিয়া নূতন কিছু করিতে পারিতাম, তবে ভগবানের নিকট তাহা অজ্ঞাত থাকিত—আর তাহা হইলেই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের হানি ঘটে। আরও দেখুন, জ্যোতিষশাস্ত্র আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ কর্ম্মের কথা বলিয়া দেয় সুতরাং সব যদি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট না থাকিবে তবে জ্যোতিষশাস্ত্র তাহা কিরূপে বলিয়া থাকে? আর ঐ প্রকার নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে নল, রাম, যুধিষ্ঠিরাদিরই বা এত দুঃখভোগ হইবে কেন?"

বিশিষ্টা পুত্রের এই সকল যুক্তিযুক্ত বাক্য শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে একটু বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, "বাবা! তবে কি তোমার এই নিয়তি লঙ্ঘনের কোনও উপায় নাই? তোমার ফাঁড়া কাটাইবার জন্য আমার মনে যখন শান্তিস্বস্ত্যয়নের প্রবৃত্তি হইতেছে তখন কি তাহার ফলে তোমার কল্যাণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই? আমার বিশ্বাস ঐরূপ করিলে তোমার কোন অশুভ হইবে না।"

শঙ্কর বলিলেন, "মা! আমি বুঝিতে পারিতেছি আমার এই নিয়তি অতি প্রবল, উহা খণ্ডিত হইবার নহে। তবে শুনিয়াছি ভগবৎসাক্ষাৎকার অথবা যোগসিদ্ধির দ্বারা অনেক সময় অতি প্রবল প্রারব্ধও খণ্ডিত হয়; কিন্তু সেই ভগবৎসাক্ষাৎকার বা যোগানুষ্ঠানের অনুকূল প্রারব্ধও থাকা চাই। আমার জন্মপত্রিকায় সে সুযোগের সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে তাহাই ভাবিতেছি। আর যদি দীর্ঘায়ু হইতাম তাহা হইলে দীর্ঘকাল যোগাভ্যাসের সময় পাইতাম। কিন্তু মা! আমার যদি আট বৎসরে মৃত্যু না হইয়া ষোল বৎসরেই মৃত্যু হয়, তাহা হইলেই বা আমার কি লাভ হইল? এখনইত আমার বয়স আট বৎসর হইয়াছে, আর আট বৎসরে আমি কি করিব? আর যদি দৈবকৃপাবলে বত্রিশ বৎসর বাঁচি, তাহাতেই বা কি হইবে? মানুষের আয়ুঃকাল একশত বৎসর—তন্মধ্যে পঁচিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য, পঁচিশ বৎসর গার্হস্থ্য, পঁচিশ বৎসর বানপ্রস্থ এবং পঁচিশ বৎসর সন্ন্যাস ধর্ম্ম পালন করে। তাহাতে ভাগ্যবলে যে ব্যক্তি সদ্‌গুরু লাভ করে, তাহার

সিদ্ধিলাভ ঘটে, নচেৎ নহে। আমি বত্রিশ বৎসর বাঁচিলেও আর চব্বিশ বৎসরের বেশী ঈশ্বরারাধনার সময় পাইতে পারি না; আর যদি সংসারধর্ম্মে প্রবেশ করি তাহা হইলে তাহারও আশা নাই সুতরাং আমি কোনও উপায় ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।"

এইরূপ বলিতে বলিতে শঙ্করের চক্ষু যেন ছলছল করিয়া আসিল। ইহা দেখিয়া বিশিষ্টাদেবী শঙ্করের জন্য মনে মনে চিন্তিতা হইলেন। তিনি শঙ্করকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন, "বাবা, সেই ব্রাহ্মণগণ নিশ্চয়ই গণনায় ভুল করিয়াছেন; তুমি শিবের প্রসাদে জন্মিয়াছ, তুমি কিরূপে অল্পায়ু হইতে পার? আমি তোমার মা, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তোমার অভীষ্টসিদ্ধ হইবে, তুমি ভাবিও না।"—এই বলিয়া বিশিষ্টা গৃহকর্ম্ম উপলক্ষ করিয়া উঠিয়া গেলেন, শঙ্করও নিজ পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র।

রামকৃষ্ণ মঠ,
বেলুড়,
১৪।৪।১৭

স্নেহভাজনেষু—

ধী—, তোমার চিঠি অনেক দিন পরে পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি ঠাকুরকে মনে মনে চিন্তা ও তাঁর উপর নির্ভর করে কাজ করে যাও। ফলাফলে যেন কিছুমাত্র লক্ষ্য না থাকে—ইহাই হলো প্রভুর শিক্ষা। ইহাতে তোমার চিত্ত শুদ্ধ হবে। আর প্রভু যারে কৃপা করে শেখাবেন সেই কেবল দেখে দেখে শিখবে। কেবল লেক্‌চারে কি ধর্ম্মকর্ম্ম প্রচার চলে? দেখাও কেবল আদর্শ। চিরকাল

জগতে দলাদলি আছে ও থাকিবে। শ্রীশ্রীঠাকুর দয়া না করলে কার সাধ্য তাহা দূর করে। খুব উচ্চ আদর্শ ধরা সাধারণের কর্ম্ম নয়। বহু জন্মের তপস্যায় ও দেবতাদের অনুগ্রহ হলে তবে মানুষ মহত্ব, উদারতা ও সরলতা লাভ করে।

আমাদের টাঙ্গাইলের নিকট ঘাড়িণ্ডা নামক স্থানে ১৫ই বৈশাখ যাইবার কথা হচ্চে। যদি প্রভু দেহ সুস্থ রাখেন হয়ত যাইতে হইবে। এখন সবই ঠাকুরের ইচ্ছায় হচ্চে মনে করি। ওদেশে গেলে হয়ত অনেক স্থানে ঠাকুর ঘুরাবেন। এ সামান্য যন্ত্রটার কোন শক্তি নাই, এটা জড়—চৈতন্যময়, আনন্দময় যেমন চালাচ্চেন তেমনি যেন চলে, ইহাই প্রভুপদে প্রার্থনা।

তোমাদের খুব ভক্তি হউক, বিশ্বাস হউক, জ্ঞান হউক। আনন্দ সাগরে ডুবে যাও। অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে এও এক রকমের খেলা চলুক। ভালবেসে এ জগৎকে আপনার করে ফেল। কেউ আর পর না থাকে, বৈরী না থাকে। অভিধান থেকে শত্রু, বৈরী বিজাতীয় ভাবগুলো উঠিয়ে দাও। ভালবেসে সারা দুনিয়া একজাত হয়ে যা'ক্। ভক্তি, প্রীতিই সার বস্তু জানিবে—আর সব অসার অনিত্য। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—
প্রেমানন্দ।
বেলুড়।
১৬।৪।১৭

স্নেহভাজনেষু,—

তোমার পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরই তোমাদের সর্ব্বদা দেখিতেছেন, খুব দৃঢ়রূপে এই বিশ্বাস হৃদয়ে রাখিয়া চলিয়া যাও, দেখিবে এই ঘোর ভবসাগর গোষ্পদতুল্য হইয়া যাইবে। প্রভুই তোমায় অমন সুন্দর বাড়ীতে থাকিবার স্থান করিয়া দিয়াছেন জানিও। বড় বড় ঘরে থাকিলে আর সৎসঙ্গ হইলে হৃদয় মনও প্রশস্ত হয়—উদার হয়।

দু'তিন দিন হলো প্র— এখানে এসেছেন। তার মুখে ঢাকার

ভক্তদের কথা শুনলাম। শুদ্ধ, পবিত্র, নির্ম্মল দেহেই ভগবৎশক্তির প্রকাশ। আর ঈশ্বরচিন্তায় শরীরের ময়লা কেটে যায়। তোমরা মা'র ছেলে, ত্রিকালমুক্ত—এই মনে রাখিয়া চলিতে থাক। জ্ঞান, ভক্তি প্রীতি এ সব আমাদেরই ঘরের বস্তু জানিবে। মান, সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য এ সব বাহ্য বস্তু। ও সকলে কোন কালে যেন আমাদের আসক্তি না হয়।

এ সময় যখন ঠাকুর এসেছিলেন জান্‌বে তাঁর ভাব নিতে জগৎ বাধ্য। না হলে শান্তি কোথায়? যদি দুর্ব্বলতা আসে সেই মহাশক্তিমান্ প্রভুকে ডাক্‌বে—তিনি মহাবল দিবেন; আনন্দ পাবে, ধন্য হবে।

—ভায়া—জী প্রভৃতি ভাল আছেন। আমাদের টাঙ্গাইল যাবার কথা হইতেছে। আমাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—

প্রেমানন্দ।

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

বাসনাক্ষয় প্রকরণ।

(অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাসনাক্ষয় ও তত্ত্বজ্ঞান এই দুই পরস্পর পরস্পরের কারণ তাহাই ব্যতিরেকমুখে দেখাইতেছেন :—

যাবন্ন বাসনানাশস্তাবত্তত্ত্বাগমঃ কুতঃ।
যাবন্ন তত্ত্বসংপ্রাপ্তির্নতাবদ্বাসনাক্ষয়ঃ॥

(উপশম প্র, ৯২।১৩)

যে পর্য্যন্ত না বাসনাক্ষয় হয়, সে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান কি প্রকারে হইতে পারে? যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বাববোধ জন্মে, সেই পর্য্যন্ত বাসনাক্ষয় কি প্রকারে হইতে পারে?

ক্রোধাদির সংস্কার বিনষ্ট না হইয়া, থাকিয়া যাইলে, শম (চিত্তনিগ্রহ), দম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) প্রভৃতির সাধন সম্ভবপর হয় না এবং সেইহেতু তত্ত্বজ্ঞানও জন্মে না। আর ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু (পরমার্থতঃ) নাই, এই তত্ত্ব অজ্ঞাত থাকিয়া গেলে ক্রোধাদি কারণকে সত্য বলিয়া যে ভ্রমজ্ঞান হয় তাহা বিনষ্ট হয় না, এবং সেইহেতু বাসনা বা সংস্কার দূরীভূত হয় না। পূর্ব্বোক্ত তিনটি যুগলের প্রত্যেকটির এক একটি যে অপরটির কারণ তাহা আমরা অন্বয়মুখে (অর্থাৎ একটি থাকিলে অপরটি থাকিবেই এইরূপ নিয়ম দেখাইয়া) উদাহরণ সহ বুঝাইতেছি।

মন বিনষ্ট হইলে যে যে বাহ্যকারণ বশতঃ সংস্কার সমূহ উদ্বুদ্ধ হয় সেই সেই বাহ্যকারণের আর অনুভব হয় না এবং সেইহেতু সংস্কারও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সংস্কার বিনষ্ট হইলে ক্রোধাদি বৃত্তিরও উদয় হয় না, কেন না, (ক্রোধাদি বৃত্তির) কারণ যে সংস্কার তাহাই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং ক্রোধাদি বৃত্তির উদয় না হওয়াতে মনও বিনষ্ট হয়। ইহাই পূর্ব্বোক্ত মনোনাশ-বাসনাক্ষয় নামক যুগল।

শ্রুতিতে (কঠ, ৩।১২) আছে—"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা,—[সূক্ষ্মপদার্থ-গ্রহণ-সমর্থা বুদ্ধির দ্বারাই এই আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়।] এই শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যেহেতু (বুদ্ধির) যে বৃত্তিটি "সেই আত্মাই আমি"—ইহা উপলব্ধি করিবার জন্য আত্মাভিমুখ হয়, সেই বৃত্তিটিই আত্মসাক্ষাৎকার লাভের উপায়, সেইহেতু অপর সমস্ত বৃত্তির বিনাশই তত্ত্বজ্ঞান লাভের হেতু এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে, মিথ্যাভূত জগৎ সম্বন্ধে আর বৃত্তির উদয় হয় না; যেমন মনুষ্যের শৃঙ্গ প্রভৃতি বস্তু একান্ত মিথ্যা বলিয়া সেই সকল অবস্তু সম্বন্ধে বৃত্তির উদয় হয় না সেইরূপ। আর আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া গেলে তদ্বিষয়ে বৃত্তির আর প্রয়োজনীয়তা থাকে না;

সেইহেতু মন ইন্ধনহীন অগ্নির ন্যায় (আপনিই) বিনষ্ট হয়। ইহাই পূর্ব্বোক্ত মনোনাশ-তত্ত্বজ্ঞান নামক যুগল। তত্ত্বজ্ঞান যে ক্রোধাদির সংস্কারবিনাশের কারণ তাহা বার্ত্তিককার (সুরেশ্বরাচার্য্য) নিম্নলিখিত শ্লোকে দেখাইতেছেন—

রিপৌ বন্ধৌ স্বদেহে চ সমৈকাত্ম্যং প্রপশ্যতঃ।
বিবেকিনঃ কুতঃ কোপঃ স্বদেহাবয়বেম্বিব॥ ইতি।

(নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ২।১৮)

নিজদেহের অবয়বের প্রতি যেমন কোন ব্যক্তির কোপ করা সম্ভবে না (নিদ্রাবস্থায় অজ্ঞাতসারে নিজ নখরাঘাতে স্বশরীরকে ক্ষত করিলেও যেরূপ নিদ্রাভঙ্গে ক্ষতকারী হস্তকে প্রহার করিতে প্রবৃত্তি হয় না) সেইরূপ যে বিচারশীল ব্যক্তি শত্রু, মিত্র এবং নিজদেহে একমাত্র আত্মভাব তুল্যরূপে উপলব্ধি করিতেছেন তাঁহার কোপ করা কি প্রকারে সম্ভবে? (১)

ক্রোধাদির সংস্কার বিলোপের নামান্তর শম, দম ইত্যাদি, এবং শমাদি যে জ্ঞানের কারণ তাহা সর্ব্বজনবিদিত। বসিষ্ঠও বলিয়াছেন—

গুণাঃ শমাদয়ো জ্ঞানাচ্ছমাদিভ্যস্তথাজ্ঞতা
পরস্পরং বিবর্দ্ধেতে দ্বে পদ্মসরসী ইব॥ (২)

(মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণ, ২০।৬)

(১) তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বাসনাক্ষয় সম্পাদন পক্ষেই শ্লোকটি বেশ সংলগ্ন হয়, কিন্তু সুরেশ্বরাচার্য্য উক্ত শ্লোকের এইরূপ অবতরণিকা করিয়াছেন:—বুদ্ধিপ্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া দেহপর্য্যন্ত বস্তুতে যে 'আমি' 'আমার' এইরূপ বাধকপ্রত্যয়শূন্য (নিশ্চয়) বুদ্ধি, তাহাই 'অহংব্রহ্মাস্মি'—আমিই ব্রহ্ম—এই মহাবাক্যের অর্থোপলব্ধি না হওয়ার কারণ। সেই বুদ্ধি বিদূরিত হইলে সাধককে আর কোনও কারণে বিভক্ত (লক্ষ্যভ্রষ্ট) হইতে হয় না, তিনি সমগ্রভাবে প্রত্যগাত্মায় অবস্থান করিতে পারেন। এইহেতু বলিতেছেন "রিপৌ", "বন্ধৌ" ইত্যাদি—অর্থাৎ বাসনাক্ষয় দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন পক্ষে প্রয়োগ করিয়াছেন।

(২) মূলের পাঠ—"পরস্পরং বিবর্দ্ধন্তে তে অব্জসরসী ইব।" রামায়ণ-টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন পদ্ম থাকিলে শৈত্য, সৌগন্ধ, শোভা প্রভৃতি গুণ দ্বারা সরোবরের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয়, ইহা বুঝানই অভিপ্রেত।

শমদমাদি গুণ জ্ঞান হইতে এবং জ্ঞান শমাদি গুণ হইতে পরস্পর উৎকর্ষ লাভ করে; যেমন পদ্ম ও সরোবর, ইহারা উভয়েই পরস্পরের উৎকর্ষ সম্পাদন করে সেইরূপ। এই দুইটিই পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞান ও বাসনাক্ষয় নামক যুগল।

তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত তিনটি, যে যে উপায়ে সম্পাদন করিতে হইবে তাহা বলিতেছেন—

তস্মাদ্রাঘব যত্নেন পৌরুষেণ বিবেকিনা

ভোগেচ্ছাং দূরতস্ত্যক্ত্বা ত্রয়মেতৎসমাশ্রয়েৎ। ইতি

(উপশম প্র, ৯২।১৫)

সেইহেতু, হে রাম, লোকে ভোগবাসনা দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া, বিচারযুক্ত ও পৌরুষপ্রযত্নসহকারে এই তিনটির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। পৌরুষপ্রযত্ন,—"যে কোন উপায়ে আমি অবশ্যই সম্পাদন করিব" এই প্রকার উৎসাহরূপ নির্ব্বন্ধ (জিদ্)। বিবেক শব্দের অর্থ বিভাগ পূর্ব্বক নিশ্চয়, [অর্থাৎ (গুণদোষাদি বিচারপূর্ব্বক) হেয় হইতে উপাদেয় বস্তু পৃথক্ করিয়া নিশ্চয় করা।]

তত্ত্বজ্ঞান সাধনের উপায়—শ্রবণাদি, (শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন)। মনোনাশের উপায়—যোগ। বাসনাক্ষয়ের উপায়—প্রতিকূল বাসনার বা সংস্কারের উৎপাদন। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "দূরতঃ" 'দূর হইতে' কেন বলা হইল? (তদুত্তরে বলিতেছেন) ভোগেচ্ছা অতি অল্প মাত্রায়ও স্বীকার করিলে অর্থাৎ প্রশ্রয় দিয়া রাখিলে,

"হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে" (মনুসংহিতা, ২।৯৪)

ঘৃতসংযোগে "অগ্নির ন্যায় অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়"—এই নিয়মানুসারে, তাহার অত্যধিক বৃদ্ধি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

(এ স্থলে এক আশঙ্কা উঠিতেছে)—আচ্ছা, পূর্ব্বে বিবিদিষা-সন্ন্যাসের ফল তত্ত্বজ্ঞান, এবং বিদ্বৎসন্ন্যাসের ফল জীবন্মুক্তি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাহা হইলে এই বুঝা যাইতেছে যে, অগ্রে তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিয়া পরে বিদ্বৎসন্ন্যাস

অবলম্বনপূর্ব্বক, জীবিত থাকিতে থাকিতে আপনার বন্ধনস্বরূপ বাসনা ও মনোবৃত্তি এতদুভয়ের বিনাশ সম্পাদন করিতে হইবে। এই স্থলে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি তিনটিরই একসঙ্গে অভ্যাস করিতে হইবে—এইরূপ নিয়ম করা হইতেছে। এই হেতু পূর্ব্বের সহিত পরবর্ত্তী কথার বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, ইহা দোষ নহে, মুখ্য ও গৌণ ভাব ধরিলে উহাদের মধ্যে একটা ব্যবস্থা সঙ্গত হইতে পারে। বিবিদিষা-সন্ন্যাসীর পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানই মুখ্য (কর্ত্তব্য) এবং মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় গৌণ (কর্ত্তব্য); কিন্তু বিদ্বৎসন্ন্যাসীর পক্ষে ইহার বিপরীত। এই হেতু উভয় স্থলেই উক্ত তিনটির সমকালে অভ্যাস বিষয়ে কোনও বিরোধ নাই। এস্থলে যদি কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন যে তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হইলেই যখন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তখন আবার পরবর্ত্তীকালে অভ্যাসের জন্য যত্ন করিবার প্রয়োজন কি? (তদুত্তরে বলি) সেইরূপ আশঙ্কা করা চলে না, কেন না, আমরা পরে জীবন্মুক্তির প্রয়োজন নিরূপণ করিয়া (এবং সেইহেতু জীবন্মুক্তির জন্য পরবর্ত্তী কালে উক্তরূপ প্রযত্নের প্রয়োজন দেখাইয়া) সেই আশঙ্কার পরিহার করিব।

যদি কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন যে, বিদ্বৎসন্ন্যাসীর (অর্থাৎ যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহার) পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানের সাধন শ্রবণাদির অনুষ্ঠান নিষ্ফল এবং তত্ত্বজ্ঞান বস্তুটি স্বভাবতঃ এই প্রকার যে, (কর্ম্মকাণ্ডবিহিত কর্ম্ম যেমন) কর্ত্তার ইচ্ছানুসারে করা, (না করা) বা অন্য প্রকারে করা চলে, (১) ইহা সেইরূপ নহে, সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠান করা চলে না, অতএব পরবর্ত্তীকালে (বিদ্বৎসন্ন্যাসাবস্থায়) গৌণভাবেও এই তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস কিরূপ হইবে?

(১) অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান একবার জন্মিয়া গেলে তাহার লাভের জন্য অন্য কিছু করিবার আবশ্যকতা নাই, এবং সেই তত্ত্বজ্ঞানের পরিহার নাই বা অন্য প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি যে, যে কোন উপায়ে তত্ত্বের পুনঃ পুনঃ অনুস্মরণই (গৌণভাবে তত্ত্বজ্ঞানের উত্তরকালীন অভ্যাস); এবং সেই প্রকার অভ্যাস (বাসিষ্ঠ রামায়ণে) লীলার উপাখ্যানে প্রদর্শিত হইয়াছে:—

তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বঞ্চ জ্ঞানাভ্যাসং (১) বিদুর্বুধাঃ॥
(উৎপত্তি প্র, ২২।২৪,)

সেই (তত্ত্ববিষয়ে) চিন্তা করা, সেই তত্ত্ববিষয়ে কথোপকথন করা, পরস্পরকে সেই তত্ত্ব বুঝান এবং সেই তত্ত্ববিষয়ে ঐকান্তিক নিষ্ঠাকেই পণ্ডিতগণ জ্ঞানাভ্যাস বলিয়া থাকেন।

সর্গাদাবেব নোৎপন্নং দৃশ্যং নাস্ত্যেব তৎসদা।
ইদং জগদহঞ্চেতি বোধাভ্যাসং বিদুঃ পরম্ (২)॥
(উৎপত্তি ২২।২৮)

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ শাস্ত্রবর্ণিত সৃষ্টির আদিতে উৎপন্নই হয় নাই, এবং তাহা কোনকালেই নাই, এবং আমিও উৎপন্ন হই নাই, এবং কোনও কালে নাই—এইরূপ অবধারণ করাকেই পণ্ডিতগণ উত্তম বোধাভ্যাস বলিয়া জানেন। (৩)

---

(১) মূলের পাঠ 'তদভ্যাসং'—রামায়ণের টীকাকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—তত্ত্বচিন্তনের প্রয়োজন—অসন্দিগ্ধভাবে নিজের বুদ্ধিতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা; তত্ত্ব-কথনের প্রয়োজন—অন্য কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্ববুদ্ধির সহিত নিজের তত্ত্ববুদ্ধির মিলন করা: পরস্পরকে তত্ত্ব বুঝাইবার প্রয়োজন—পরস্পরের নিকট হইতে অজ্ঞাতাংশ বুঝিয়া লওয়া—এই তিন উপায় দ্বারা অসম্ভাবনা নিবৃত্তি হয় এবং তদেকপরতা বা তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা বিপরীতভাবনা নিবৃত্তি হয়।

(২) মূলের পাঠ "বোধাভ্যাস উদাহৃতঃ।"

(৩) ত্রৈকালিক দৃশ্যের পুনঃপুনঃ বাধদর্শনকেও জ্ঞানাভ্যাস বলে, ইহাই শ্লোকের ভাবার্থ। (রামায়ণ টীকা)

মনোনাশ এবং বাসনাক্ষয় এতদুভয়ের অভ্যাসও সেই স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—

অত্যন্তাভাবসম্পত্তৌ জ্ঞাতুর্জ্ঞেয়স্য বস্তুনঃ।
যুক্ত্যা শাস্ত্রৈর্যতন্তে যে তে তত্রাভ্যাসিনঃ (১) স্থিতাঃ॥
(উৎপত্তি প্র, ২২।২৭)

যাঁহারা যোগাভ্যাসদ্বারা ও (অধ্যাত্ম) শাস্ত্রের সাহায্যে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তু একেবারেই নাই, এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে যত্ন করেন, তাঁহারা তদ্বিষয়ে (মনোনাশে) অভ্যাসী বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকেন।

শ্লোকোক্ত 'অভাবসম্পত্তি'র অর্থ এই যে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তুর মিথ্যাত্ব নিশ্চয়, এবং অত্যন্তাভাবসম্পত্তি শব্দের অর্থ এই যে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তুর নিজ নিজ রূপে আদৌ প্রতীতি বা উপলব্ধি না হওয়া। যুক্তি শব্দের অর্থ যোগ; ইহারই নাম মনোনাশের অভ্যাস।

দৃশ্যাসম্ভববোধেন রাগদ্বেষাদিতানবে।
রতির্বোদিতা যাসৌ ব্রহ্মাভ্যাসঃ স উচ্যতে॥ (২)
(উৎপত্তি প্র, ২২।২৯)

দৃশ্য বলিয়া বস্তু থাকাই অসম্ভব, এইরূপ উপলব্ধি হইলে রাগ ও দ্বেষ ক্ষীণ হইয়া যায়, এবং তখন যে এক অভিনব রতি বা আনন্দ উদিত হয়, তাহাকেই সেই ব্রহ্মাভ্যাস বলে। ইহারই নাম বাসনাক্ষয়াভ্যাস। এ স্থলে এই আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত এই তিনটি অভ্যাস যখন তুল্যরূপে প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীত হইতেছে,

(১) মূলের পাঠ ব্রহ্মাভ্যাসিনঃ। টীকাকার 'যুক্তি' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—প্রমাণ ও প্রমেয়ের স্বরূপাবধানের অনুকূল যে সকল যুক্তি তদ্দ্বারা। 'শ্রবণাদি নিষ্ঠাও ব্রহ্মাভ্যাসের লক্ষণ।

(২) মূলের পাঠ "রতির্বলোদিতাযাসৌ ব্রহ্মাভ্যাস উদাহৃতঃ।" টীকাকার এই 'বল'শব্দের অর্থ করিয়াছেন—মনন হইতে যে আত্মজ্ঞানসংস্কারের দৃঢ়তা জন্মে তাহা। রতিশব্দের অর্থ আত্মরতি।

তখন এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি মুখ্য এবং কোন্‌টি গৌণ তাহার বিচার কি প্রকারে করা যাইতে পারে? তদুত্তরে বলি—এ প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে না। কেন না, প্রয়োজন বুঝিয়া মুখ্যগৌণের বিচার করা যাইতে পারে। যে পুরুষ মোক্ষ চাহেন তাঁহার জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তিরূপ দুইটি প্রয়োজন আছে। এই কারণেই কঠ শ্রুতিতে আছে—

"বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।" (কঠ উ—৫।১)

"প্রথমে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিই পশ্চাৎ বিদেহমুক্ত হয়েন।" তন্মধ্যে দেহধারী পুরুষের দৈবীসম্পদর্জ্জনের দ্বারাই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, এবং আসুরসম্পদ্ হেতুই তাহার বন্ধন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার ষোড়শাধ্যায়ে এই কথাই বলিয়াছেন—

"দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।" (গীতা—১৬।৫)

—পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, দৈবীসম্পদ্ মোক্ষের কারণ এবং আসুরী সম্পদ্ বন্ধের কারণ।

সেই স্থলেই সেই দুই প্রকার সম্পদ্ বর্ণিত হইয়াছে, যথা,—

"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥" (গীতা—১৬।১-৩)

হে অর্জ্জুন, যিনি দেবতাদিগের সম্পদ্ লাভ করিবার যোগ্য হইয়া অর্থাৎ অনন্ত সুখের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার এই সাত্ত্বিক গুণগুলি থাকে (১)।—(১) অভয়—আমার উচ্ছেদ হইবে, এইরূপ আশঙ্কার অভাব, (২) সত্ত্বসংশুদ্ধি—চিত্তের নির্ম্মলতা, (৩) জ্ঞান-যোগব্যবস্থিতি—শ্রবণ মননাদিজনিত জ্ঞান এবং জ্ঞাত বিষয়ে চিত্ত-প্রণিধানরূপ যোগ, এতদুভয়ের নিষ্ঠা। এই তিনটিই মুখ্য দৈবীসম্পৎ।

(১) নীলকণ্ঠকৃত টীকানুসারে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

(৪) দান—যথাশক্তি অন্নাদির বিভাগ, (৫) দম—বাহেন্দ্রিয় নিগ্রহ, (৬) যজ্ঞ—বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, (৭) স্বাধ্যায়—বেদাধ্যয়ন ; তপ—শারীর, মানস ও বাঙ্ময় তপ (গীতার ১৭শ অধ্যায়োক্ত), (৮) আর্জ্জব—সর্ব্ব সময়ে সরলতা ; (৯) অহিংসা—প্রাণিপীড়াবর্জ্জন ; সত্য—অপ্রিয় ও অসত্য পরিহারপূর্ব্বক যথাভূতার্থভাষণ। অক্রোধ—পরকৃত আক্রোশ বা অভিঘাত হইতে যে ক্রোধ জন্মে সেই সেই ক্রোধের উপশম করা। ত্যাগ—সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস ; দান শব্দ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া ত্যাগ শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। শান্তি—অন্তঃকরণের উপরতি ; অপৈশুন—পরদোষ প্রকটন না করা। দয়া—দুঃখিত জীবের প্রতি কৃপা। অলোলুপ্ত্ব—বিষয়ের নিকটবর্ত্তী হইলেও ইন্দ্রিয় সমূহের বিকার উৎপন্ন হইতে না দেওয়া। মার্দ্দব—মৃদুতা। হ্রী—লজ্জা। অচাপল—প্রয়োজন না থাকিলে বাক্‌পাণি-পাদাদির সঞ্চালন না করা। তেজঃ—প্রগল্‌ভতা (এক প্রকার নির্ভীকতা) যাহা উগ্রতা নহে। ক্ষমা—কেহ ক্রুদ্ধ বচন বলিলে বা তাড়না করিলে অন্তঃকরণে বিকার উৎপন্ন হইতে না দেওয়া। (উৎপন্ন ক্রোধের প্রশমনের নাম অক্রোধ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এইরূপ প্রভেদ)। ধৃতি—দেহ ও ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইয়া পড়িলে সেই অবসাদের প্রতীকারক একপ্রকার অন্তঃকরণ-বৃত্তি—যদ্দ্বারা উত্তম্ভিত হইয়া দেহেন্দ্রিয়াদি অবসন্ন হইয়া পড়ে না। শৌচ—দুই প্রকার, মৃত্তিকা জল প্রভৃতির দ্বারা বাহ্য শৌচ, এবং মন ও বুদ্ধির নির্ম্মলতা (অর্থাৎ কপটতা, আসক্তি প্রভৃতি কলুষতার অভাব) আভ্যন্তর শৌচ। অদ্রোহ—অপরের বিনাশ বা ক্ষতি করিতে অনিচ্ছা। নাতিমানিতা—অত্যন্তমানরাহিত্য।

দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ (গীতা—১৬।৪)

যিনি অসুরদিগের সম্পদ্ লাভ করিবার অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাতে রজস্তমোময় এই গুণগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

দম্ভ—ধর্ম্মধ্বজীর ভাব, (অর্থাৎ বাহ্যতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠানের ভাব প্রকটন) ; দর্প—ধনকৌলীন্যাদি নিমিত্ত গর্ব্ব ; অভিমান—আপনাকে লোকের

পূজ্য বলিয়া মনে করা ; পারুষ্য—নিষ্ঠুর ভাষণ ; এবং অজ্ঞান—অবিবেক জনিত মিথ্যা জ্ঞান।

তাহার পর আরও, ষোড়শাধ্যায়ের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত আসুর সম্পৎ সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। সেই স্থলে, (ইহাই সূচিত হইয়াছে যে) অশাস্ত্রীয় স্বভাবসুলভ আসুরসম্পদের মন্দসংস্কারকে, শাস্ত্রীয় ও পুরুষ-প্রযত্ন-সাধ্য দৈবীসম্পদের উত্তম সংস্কার উৎপাদন করিয়া, দূরীভূত করিতে পারিলে জীবন্মুক্তি লাভ হয়।

৺দ্বারকাধাম ও কয়েকটি তীর্থদর্শন

(শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পরদিন প্রাতে পুনরায় এলিফ্যাণ্টাগুহা দেখিবার মানসে ডকে উপস্থিত হইলাম এবং সময়মত টিকিট ক্রয় করিয়া ষ্টীমারে উঠিলাম। 'এলিফ্যাণ্টা' বোম্বাই হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টীমারে করিয়া যাইতে প্রায় একঘণ্টা সময় লাগে। নৌকাতেও যাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে সময় ও ভাড়া দুইই বেশী লাগে। আমাদের ষ্টীমার যথাসময়ে ছাড়িল এবং পথে আর একটি দ্বীপে থামিয়া এলিফ্যাণ্টা দ্বীপে আসিয়া পৌছিল। আমরা প্রায় ১২।১৬ জন দর্শক ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিলাম। এলিফ্যাণ্টা দ্বীপটি নিতান্ত ছোট নহে—লম্বায় ৩।৪ মাইল হইবে। ইহার দেশীয় নাম ধারাপুরী বা গুহানগর। দুইটি অনুন্নত পর্ব্বত কতকটা সমান্তরাল ভাবে দ্বীপটিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আমরা ষ্টীমার হইতে অবতরণ করিয়া উহাদের একটিতে আরোহণ করিতে লাগিলাম। প্রায় ১৫ মিনিট চড়াইএর পর গুহাগুলির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

গুহার নিকটে একটি চালাঘরে সরকারী আফিস আছে। তথায় একজন কর্ম্মচারী প্রত্যেক দর্শকের নিকট হইতে কোম্পানির আইনমত গুহা দেখিবার দর্শনীস্বরূপ চারি আনা আদায় করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকটে একখানি আরাম কেদারায় জনৈক শ্বেতাঙ্গ বসিয়া ছিলেন; তিনি উক্ত দ্বীপের অধ্যক্ষ। তিনি বেশ ভদ্র—আমাদের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা বলিলেন। শুনিলাম এই স্থানটিতে নাকি ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, এবং উহা ভয়ানক সর্পাদি হিংস্রকবহুল। আমরা তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়া গুহা দেখিতে গেলাম।

গুহাটি প্রধানত চারিটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। একটির মধ্যে এক বৃহদাকার ত্রিমূর্ত্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—স্থাপিত আছে। উক্ত মূর্ত্তিটি ১৭ ফুট ১০ ইঞ্চি লম্বা। আর একটিতে ১৬ ফুট ৯ ইঞ্চি উচ্চ অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেব মূর্ত্তি ও অপর একটিতে হরপার্ব্বতী মূর্ত্তি। ফলতঃ অধিকাংশ মূর্ত্তিই শ্রীমহাদেবের মহিমাদ্যোতক। এই সব দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয় যে এই গুহা শৈব হিন্দুগণের দ্বারা ক্ষোদিত। তবে ইহা কোন্ সময়ে যে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা ঠিক করিবার কোন উপায় নাই। গুহার তত্ত্বাবধায়ক সাহেবটি বলিয়াছিলেন যে উহা পাণ্ডবগণ দ্বারা নির্ম্মিত। মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত; এবং শুনা যায় আরও অনেকগুলি এখান হইতে অপসারিত হইয়াছে। গুহামুখে দুইটি হস্তী মূর্ত্তি ছিল; বোধ হয় এই জন্যই এই দ্বীপটির বর্ত্তমান নামকরণ হইয়াছে। পর্ত্তুগিজগণ ঐ মূর্ত্তি দুইটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। এই গুহাতে পূর্ব্বে আরও অনেক প্রকোষ্ঠ ছিল; এখন সম্ভবতঃ সেগুলি মাটি চাপা পড়িয়া রহিয়াছে। কারণ দেখিলাম দুইটি প্রকোষ্ঠ মাটি খুঁড়িয়া বাহির করা হইতেছে। এখানে অনেক ভগ্ন স্তূপ বর্ত্তমান; সে সব দেখিয়া অনুমান হয়, এক সময়ে এখানে অনেক লোকের বাস ছিল। দ্বীপ মধ্যে কয়েকটি গহ্বরে বৃষ্টির জল রক্ষিত রহিয়াছে; উহা বেশ সুস্বাদু ও শীতল। অত্রত্য অধিবাসী ও দর্শকগণ এই জল পান করিয়া থাকেন। দ্বীপটির ধারে ধারে সমুদ্র মধ্যে এক প্রকার ঝিনুক জন্মায়; সে গুলি

দেখিতে বড় সুন্দর। এই সব দেখিয়া বাসায় ফিরিতে প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছিল।

ঐ দিবস বৈকালে বোম্বাই সহরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তস্থ কম্বালা পর্ব্বতের শিখরদেশে অবস্থিত মহালক্ষ্মীর মন্দির দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। এই পথে কয়েকটি বস্ত্র ও সূতার কল আছে। বোম্বাইবাসিগণের ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতি কিরূপ অনুরাগ তাহা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। এমন বাণিজ্যপ্রধান স্থান ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। সমগ্র ভারতবর্ষে ২৬৫টি সূতার ও কাপড়ের কল আছে, তন্মধ্যে শুধু বোম্বাই সহরেই ৭১টি। এইজন্যই এখানকার লোকের দিন দিন এত শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের বড়লোকেরা কেবল কোম্পানির কাগজ করা বা ব্যাঙ্কে টাকা জমাইয়া রাখাই বুঝেন—একটু পরিশ্রম করিলে যে অর্থ চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহা তাঁহারা কখন ভাবিয়াও দেখেন না। কতদিনে আমাদের এই শ্রমবিমুখতা দূর হইবে কে জানে!

সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়, এমন সময় আমরা মহালক্ষ্মীর মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরে যাইতে রাস্তায় আর্ত্ত-দরিদ্র-অনাথগণের ভিড় দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। এত কাঙ্গালী ভারতের অন্য কোন দেব দেবীর স্থানে দেখি নাই। অনূন্য সহস্র ব্যক্তি রাস্তার দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধভাবে বসিয়া রহিয়াছে। মন্দিরের অবস্থানটি অতি চমৎকার—একবারে সমুদ্রের উপরে। জোয়ারের সময় সমুদ্রের তরঙ্গমালা মন্দিরসংলগ্ন প্রাচীরগাত্রে আঘাত করিয়া এক সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি করে। কিয়ৎক্ষণ এই প্রাচীরের উপর উপবেশন করিলে প্রাণে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। একদিকে দিগন্তবিস্তৃত বিশাল বারিধির উত্তুঙ্গ উর্ম্মিমালা চক্ষের সম্মুখে প্রলয়ের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতেছে, অপরদিকে বরাভয়করা দেবী মহালক্ষ্মীর শান্ত মূর্ত্তি হৃদয়ে আশা ও আনন্দের ধারা প্রবাহিত করিতেছে; এই কোমল ও কঠোর ভাবদ্বয়ের অপূর্ব্ব সমাবেশে হৃদয় মন স্তম্ভিত ও বিমুগ্ধ হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতে থাকে। বহির্জ্জগতের

কোন হুঁসই থাকে না। বাস্তবিক একবার এখানে বসিলে আর উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা করে না। দেবায়তনটি একটি নাতিবৃহৎ মণ্ডপের ন্যায়। দেখিতে বেশ সুন্দর, তাহার উপর আবার বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত থাকায় উহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেবী-মূর্ত্তি বহু রত্নালঙ্কারে সুশোভিত। এখানে ভক্তের অভাব নাই, কারণ মা লক্ষ্মীর কৃপাভিক্ষা করেন না এরূপ লোক অতি বিরল! ইহার নিকটে অবস্থিত ডাকোজির মন্দির। এই সব দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আজ আমাদের বোম্বাই দেখা সাঙ্গ হইল, কারণ পরদিবসই ঐ স্থান ছাড়িয়া ৺দ্বারকাধামে যাত্রা করিতে হইবে। বোম্বাইয়ের নিকটে আরও কয়েকটি দর্শনীয় স্থান থাকিলেও সময়াভাবে আমরা তাহা দেখিয়া উঠিতে পারি নাই।

বোম্বাই হইতে ১৪ মাইল দূর স্যালসিট্ দ্বীপে কেনেরীগুহা, বিহার হ্রদ ও তুলসী হ্রদ অবস্থিত। তথায় যাইতে হইলে বি, বি, সি, আই রেলের বরিভ্লি ষ্টেশন হইয়া যাওয়াই সুবিধা। কেনেরী গুহা এলিফ্যাণ্টা অপেক্ষা বড়। গুহাগুলি সংখ্যায় শতাধিক। ইহাদের মধ্যে ২টি বেশ বড়—একটি ৮৮ ফিট লম্বা, ৩৮ ফিট চওড়া ও ৪০ ফিট উচ্চ, অপরটি ৯৬ ফিট লম্বা, ৪২ ফিট চওড়া ও ৯ ফিট মাত্র উচ্চ। পূর্ব্বকালে বৌদ্ধভিক্ষুগণ এখানে তপস্যা করিতেন। ইহাদ্বারা অনুমান হয় যে এইগুলি বৌদ্ধরাজগণ দ্বারা ক্ষোদিত। হ্রদ দুইটির একটি পাহাড়ী নদীর মুখে বাঁধ দিয়া কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা হইয়াছে। বিহার হ্রদটির আয়তন প্রায় সাড়ে চারি হাজার বিঘা; তুলসী হ্রদ উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। বোম্বাই সহরের কলের জল এই হ্রদদ্বয় হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। বোম্বাই হইতে অন্যদিকে কিছু দূরে আর একটি বিখ্যাত গুহা আছে। ভারতের যাবতীয় গুহার মধ্যে শ্রেষ্ঠতা হিসাবে ইহা তৃতীয় স্থান অধিকার করে। পুনা যাইবার পথে কারলা ষ্টেশনের তিন মাইল পূর্ব্বে ইহা অবস্থিত। রেলে যাইতে প্রায় ৫ ঘণ্টা লাগে। এই গুহাগুলি বৌদ্ধ ভাস্কর্য্যের খুব উন্নতির সময় নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। গুহাগুলি ২।৩টি স্তরে নির্ম্মিত। নিম্নের

গুহাগুলি বৌদ্ধযতিগণের ধ্যানস্থান এবং সকলের উপরকার গুহাটি সভামণ্ডপ; শেষোক্ত গুহাটি আয়তনে অতি বৃহৎ, এবং উহার গম্বুজাকৃতি ছাদ, নানা কারুকার্য্যবিশিষ্ট স্তম্ভশ্রেণীর উপর স্থাপিত। বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জন্য কয়েকটি সুগভীর চৌবাচ্চা পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত আছে। কারলা ষ্টেশনের অপরদিকে (অর্থাৎ পশ্চিমদিকে) সহ্যাদ্রি পর্ব্বত মধ্যে সুন্দর খোদাইকার্য্যবিশিষ্ট ভোজগুহা। ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশে ছত্রপতি শিবাজির 'লৌহগড়' ও 'বিজাপুর' নামক দুইটি প্রসিদ্ধ দুর্গ বিদ্যমান। এইগুলি এত দুরারোহ যে আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাতে উঠিতে পারি নাই। এমন কি, আমাদের পথপ্রদর্শক স্থানীয় অধিবাসী হইলেও উঠিবার মত কোন সুগম্য পথ দেখাইয়া দিতে পারিল না। পাহাড়ের চারিদিকই ভয়ানক খাড়াই এবং ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ইহার সানুদেশে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর রবিবর্ম্মার চিত্রালয়।

পরদিন সকাল ১০॥ টার সময় ৺দ্বারকার জাহাজ ছাড়িবে। পাছে অসুবিধা ঘটে এই ভয়ে পূর্ব্ব দিনেই আমরা টিকিট কিনিয়া রাখিয়াছিলাম। অতএব জাহাজে ভাল স্থান অধিকার করিবার মানসে অতি প্রত্যুষেই আহারাদি সম্পন্ন করিয়া আলেকজান্দ্রা ডকে (যেখান হইতে জাহাজ ছাড়িবে) উপস্থিত হইলাম। তথায় যাইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে মনে হইল, আজ আর কিছুতেই যাওয়া হইবে না! ৫৭ শত যাত্রী—ভীড় করিয়া জাহাজে উঠিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। সে জনতা ঠেলিয়া যায় কাহার সাধ্য! কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অবশেষে সাহসে ভর করিয়া কোন প্রকারে ঠেলাঠেলি করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলাম। তবে আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ অনেকটা ভাল থাকায় অনেক যাত্রী ও প্রহরী অবাধে আমাদের পথ ছাড়িয়া দিল। অতঃপর একটি কুলির সাহায্যে জাহাজে উঠিয়া কতকটা সুবিধামত একটি স্থান অধিকার করিলাম।

জাহাজ ছাড়িলে সমুদ্রের দৃশ্য দেখিবার জন্য আমি উপরের তলায়

উঠিয়া একপার্শ্বে একটি ছোট লৌহস্তম্ভের উপর উপবেশন করিলাম। জাহাজ ধীরে ধীরে বোম্বাই প্রদক্ষিণ করিয়া 'ব্যাক বে' পার হইয়া আরব সাগরে আসিয়া পড়িল। এইবার জাহাজের গতি বৃদ্ধি হইল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে অত্যুচ্চ সৌধাবলীসমন্বিত সুদৃশ্য বোম্বাই নগরী দিগন্তের দূর চক্রবালে মিলাইয়া গেল। এখন কোন দিকেই আর বিন্দুমাত্র স্থল দৃষ্টিগোচর হইতেছে না—যেদিকে তাকাই কেবল অনন্ত সুনীল বারিরাশি। উপরে মধ্যাহ্নতপনসমুজ্জ্বল অনন্ত সুনীল আকাশ, নিম্নে বাত্যাহত বিশাল বারিধির উদ্দাম তাণ্ডব নৃত্য! এরূপ বিচিত্র দৃশ্যপট ইতিপূর্ব্বে কখনও নয়নগোচর হয় নাই। প্রাণ বিমুগ্ধ হইয়া নীলাম্বর ও নীলাম্বুধির এই হৃদয়োন্মাদনকারী অপূর্ব্ব লীলা অবলোকন করিতে লাগিল। বারিকণাসংযুক্ত শীতল বায়ুস্পর্শে মনে অপূর্ব ভাবের উদয় হইতে লাগিল। বাস্তবিক বোধ হইতে লাগিল যেন সান্তের রাজ্য ছাড়িয়া এক নূতন অনন্তের রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

আমাদের জাহাজখানি যেন স্বীয় গৌরবে আত্মহারা হইয়া আপন ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া সদর্পে অবিশ্রান্ত গতিতে তাহার গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিয়াছে! মরুভূমে একটি বালুকাকণার যত গুরুত্ব সমুদ্র মধ্যে জাহাজখানির গুরুত্বও তদ্রূপ! দিগন্তবিকম্পী অট্টহাস্যময় উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া সিন্ধু প্রতিমুহূর্ত্তে উহাকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত, আর ঐ সকল ভীতিব্যঞ্জক আড়ম্বর একান্ত উপেক্ষা করিয়া ক্ষুদ্র জাহাজখানি আত্মপ্রত্যয়দৃপ্ত গর্ব্বস্ফীতবক্ষে আপন লক্ষ্যে ধাবমান!

আমি বসিয়া বসিয়া চারিদিকে নানা অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। কত আকারের ও কত বর্ণের মৎস্য যে জাহাজের কাছে আসিয়া নির্ভয়ে খেলা করিতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। উহাদের মধ্যে দুচারিটি চতুরস্র মৎস্যও দেখা গেল। মাঝে মাঝে এক একটি উড্ডীয়মান মৎস্য একস্থান হইতে অন্য স্থানে উড়িয়া গিয়া দর্শকগণের মনে বিস্ময় ও কৌতূহল উৎপাদন করিতেছিল। আরব সাগর কি মৎস্যবহুল! এক-স্থানে দেখিলাম ১০।১২ সের ওজনের সহস্র সহস্র মৎস্য একসঙ্গে খেলা করিতেছে। তাহারা জল হইতে এত উচ্চে উঠিতেছিল যে আমরা

প্রায় ১ মাইল দূর হইতেও তাহাদের খেলা দেখিতে পাইতেছিলাম। মধ্যে মধ্যে আবার অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণের শুশুকও দেখা যাইতেছিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল এবং সেই বিশাল জলরাশি ক্রমশঃ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া এক গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনও গম্ভীর হইয়া উঠিল, এবং যাঁহার মঙ্গলহস্তের ঈষৎ অঙ্গুলিহেলনে এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইল, অজ্ঞাতসারে তাঁহার চিন্তায় ডুবিয়া গেল। পরে রাত্রি অধিক হইলে আহারাদি সমাপ্ত করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে রাত্রি প্রভাত হইয়া ঊষার রক্তিম আভায় দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মনে হইল কে যেন আমাদের সম্মুখ হইতে তমসার যবনিকা সরাইয়া লইল এবং সহসা অরুণদেব রক্তোজ্জ্বল দেহখানি লইয়া জলধিগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইলেন। তরঙ্গায়িত সাগর-বক্ষে সেই রক্তচ্ছটা প্রতিফলিত হইয়া গলিত সুবর্ণের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য!

এই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমাদের ক্ষুদ্র জাহাজখানি হেলিয়া দুলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। শুনিলাম বেলা ৮টার সময় আমরা পোর বন্দর বা সুদামাপুরীতে উপস্থিত হইব। আমরা তীর দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া জাহাজের কিনারায় সতৃষ্ণনয়নে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্ষীণ ধূসরবর্ণের রেখার ন্যায় বেলাভূমি দৃষ্টিগোচর হইল। আমাদের জাহাজ যতই উহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই সমুদয় বস্তু স্পষ্টতররূপে দেখা যাইতে লাগিল। সমুদ্র হইতে সুদামাপুরীর দৃশ্য বড়ই সুন্দর। ইহাই পোরবন্দর রাজ্যের রাজধানী ও বন্দর। এই নগরের যাবতীয় ঘর বাড়ী প্রস্তরনির্ম্মিত। সমুদ্রতীরে একটি ৯০ ফিট উচ্চ আলোকস্তম্ভ আছে; ইহার আলোক ১৫ মাইল দূর হইতে দৃষ্ট হয়। এখানকার সুদামাজীর মন্দিরই তীর্থযাত্রিগণের প্রধান দ্রষ্টব্য। আমরা এখানে অবতরণ না করায় আমাদের ভাগ্যে সুদামাজীর দর্শন ঘটিল না। জাহাজ প্রায় একঘণ্টা

কাল এখানে ধরিয়া রহিল ; পরে এখান হইতে ছাড়িয়া প্রায় ২॥ ঘণ্টার মধ্যে ৺দ্বারকাধামের নিকটবর্ত্তী হইল। বহুদূর হইতেই ৺দ্বারকাধীশের মন্দিরের উচ্চ চূড়া দৃষ্ট হইতেছিল। এখানে সমুদ্র নিতান্ত অগভীর বলিয়া জাহাজ তীরের নিকট ভিড়িতে পারিল না—প্রায় ২ মাইল দূরে দাঁড়াইল। যাত্রী লইবার জন্য তীর হইতে পালভরে ১০।১২ খানি নৌকা আসিয়া জাহাজের গাত্রে এক এক করিয়া সংলগ্ন হইতে লাগিল।

আমরা যথাসময়ে সকল জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া একখানি নৌকাতে নামিয়া বসিলাম, নৌকাখানি তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে তীরের দিকে চলিতে লাগিল। প্রায় ১ ঘণ্টার মধ্যে তীরের নিকটস্থ হইলাম ; কিন্তু উহা অতিশয় চটাল বলিয়া নৌকাও তীর হইতে প্রায় ২০।২৫ হাত দূরে দাঁড়াইল। এখান হইতে হাঁটিয়া পার হওয়া বড় কষ্টকর, কারণ প্রায়ই ঢেউয়ের জলে সমস্ত কাপড় চোপড় ভিজিয়া যায়। সেই জন্য পার করিবার বেশ সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। দুই দুই জন কুলী একখানি চৌকি কাঁধে লইয়া এক এক জনকে পার করে এবং তজ্জন্য চারি আনা করিয়া পয়সা আদায় করে। আমরাও এই উপায়ে তীরে নামিলাম। জাহাজ পঁহুছিবামাত্র যাত্রী লইয়া যাইবার জন্য কয়েকখানি গরুর গাড়ী তীরে প্রস্তুত থাকে। আমরা দুইখানি গাড়ী করিয়া ধর্ম্মশালার উদ্দেশে চলিলাম। এখানে প্রায় ২০টি ধর্ম্মশালা আছে ; তন্মধ্যে ভদ্রকালী ধর্ম্মশালা, বেওয়াগর্জ্জি বাবার ধর্ম্মশালা, পাণ্ডাওয়ালী হাবেলী, মাওজী প্রেমজী ধর্ম্মশালা, ধর্ম্মবাড়ী ও বিকানীরের মহারাজার ধর্ম্মশালা এই কয়টিই ভাল। ইহাদের সকলগুলিই প্রায় সমুদ্রতীর হইতে অর্দ্ধ মাইলের ভিতর। আমরা মাওজী প্রেমজীর ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। ধর্ম্মশালার রক্ষক আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ঘরটি দিলেন। ঘরটির দক্ষিণদিকে একটি বারাণ্ডা ছিল, ঐ বারাণ্ডায় দাঁড়াইলে সম্মুখে আরব সাগরের বিশাল দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঘরটি পাইয়া আমরা বড় খুসী হইলাম।

শাস্ত্রে ৺দ্বারকা বা দ্বারাবতী ভারতে মোক্ষদায়িকা সপ্ত নগরীর অন্যতম বলিয়া কীর্ত্তিত। যথা—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকা ॥"

ভাগবতে লিখিত আছে—দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ মাতুল কংসকে বিনাশ করিয়া মথুরার রাজা হইলে, কংসের শ্বশুর মগধরাজ মহাপরাক্রান্ত জরাসন্ধ যাদবকুল নাশ করিবার জন্য মহতী সৈন্যদল লইয়া উপর্য্যুপরি সপ্তদশবার মথুরা আক্রমণ করেন, কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। ইহার কিছুকাল পরে কালযবন অপরিমেয় ম্লেচ্ছ সৈন্য সমভিব্যাহারে মথুরা আক্রমণ করিল। অধিকন্তু জরাসন্ধ পুনর্ব্বার মথুরা আক্রমণ করিতে আসিতেছে জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন—আমি কাল-যবনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিলে জরাসন্ধ অল্প সময়ের মধ্যে এখানে উপস্থিত হইয়া আমাদের আত্মীয়স্বজনকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। এই মনে করিয়া তিনি এখান হইতে রাজ্যপাট উঠাইয়া লইয়া অন্যত্র রাজ্য-স্থাপন করা স্থির করিলেন। তখন নিজ বাহন গরুড়ের পরামর্শে এইস্থানে আগমন করিয়া সমুদ্রের নিকট হইতে দ্বাদশ যোজন পরিমিত স্থান লইয়া বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে অপূর্ব্ব পুরী নির্ম্মাণ করাইলেন এবং দৈবী উপায়ে যাদবগণকে কালযবনের অদৃশ্যভাবে এইখানে আনয়ন করেন। তৎ-পরে ভগবান্ মথুরায় যাইয়া কৌশলক্রমে কালযবনকে বিনাশ করিলেন; কিন্তু জরাসন্ধ তখনও বরপ্রভাবে অবধ্য জানিয়া তাহার নিকট হইতে অলক্ষ্যে পলায়ন করিয়া এখানে আসিলেন। তবে ৺দ্বারকার স্থান-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে কিছু কিছু মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলেন এই স্থানই যথার্থ দ্বারকা; কেহ বলেন বেট-দ্বারকাই মূল দ্বারকা; কেহ বলেন বেটের দক্ষিণে সমুদ্র পারে বামড়া সহরই মূল দ্বারকা; কেহ বলেন পোরবন্দর ও মিয়াকি বন্দরের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে ইহা অবস্থিত ছিল, আবার কেহ বলেন প্রভাস হইতে ১০ ক্রোশ পূর্ব্বে ও রৈবতক হইতে ২০ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে ইহার স্থান। ইহার মধ্যে কোন্‌টি যে ঠিক তাহা নির্দ্ধারণ করা অতি দুষ্কর। তবে যখন শিবাবতার শ্রীশঙ্কর এই স্থানকে চতুর্ধামের অন্যতম স্থির করিয়া এখানে সারদামঠ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তখন ইহাই মূল দ্বারকা সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া উচিত।

কারণ দেখা যায় মহাপুরুষগণ দিব্যদৃষ্টিপ্রভাবে স্থানমাহাত্ম্য জানিতে পারেন। যাহা হউক ভাগবতে এই পুরীর যেরূপ বর্ণনা আছে এখন তাহার কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এখানে আসিবামাত্রই আমাদের পাণ্ডা স্থির হইয়া গিয়াছিল। পাণ্ডা সম্বন্ধে এখানকার ব্যবস্থা এক রকম মন্দ নহে, কারণ এখানে জাতি হিসাবে পাণ্ডা। যাত্রীর জাতি কি জানিতে পারিলেই পাণ্ডা স্থির হইল। এই কারণ, অন্যান্য তীর্থস্থানের ন্যায় এখানে যাত্রী উপস্থিত হইলেই ২৫।৩০ জন পাণ্ডা মিলিয়া তাঁহাকে ছিঁড়িয়া খাইবার উপক্রম করে না। এই পাণ্ডাগণ কোন প্রকার অভদ্রাচরণ করে না, তাহারা বেশ শান্তশিষ্ট। সন্ধ্যা সমাগমে আমরা পাণ্ডার সহিত দেবদর্শনে গমন করিলাম। মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বার আমাদের বাসার খুব নিকট। বাহিরে দক্ষিণ দিকে নৃসিংহজী ও সাক্ষ্যগোপালের মন্দির এবং বামদিকে প্রসিদ্ধ সারদা মঠ। আমার ধারণা ছিল সারদা মঠে কত সাধু সন্ন্যাসী দেখিতে পাইব, কত জ্ঞানালোচনা হইতেছে শুনিব, কিন্তু কিছুই দেখিলাম না। পূর্ব্বে শুনা ছিল যে, সারদামঠের প্রভূত ঐশ্বর্য্য। মঠবাটী প্রস্তরনির্ম্মিত বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ও ভগ্নাবস্থায় পতিত। বঙ্গদেশীয় জনৈক সন্ন্যাসী মাসখানেক হইল এখানে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শীঘ্রই চলিয়া যাইবেন এবং ইঁহা পুনরায় জনশূন্য হইবে। মঠের মোহান্তজী এখানে থাকেন না; তিনি মন্দিরমধ্যে একটি বাটীতে থাকেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরপ্রাঙ্গণ খুব প্রশস্ত এবং ইহার চতুর্দ্দিকে দেবকী, বলরাম, প্রদ্যুম্ন, রাধাকৃষ্ণ, কেশবভগবান্, পুরুষোত্তম, গুরু দত্তাত্রেয়, অম্বিকাদেবী, বিশ্বনাথ মহাদেব প্রভৃতি দেবদেবীর মন্দির বিদ্যমান। প্রাঙ্গণ হইতে কয়েকটি ধাপ উচ্চে উঠিয়া মূল মন্দিরের নাটমন্দিরে উপনীত হইলাম। ইহার মেজে মর্ম্মরপ্রস্তরে মণ্ডিত। মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ১৭০ ফিট। ১৪০ ফিট পর্য্যন্ত উঠিবার সিঁড়ি আছে ও প্রতি তলে বসিবার স্থান আছে। এইরূপ ভারতের কোন মন্দিরে নাই। উপর হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি চমৎকার। সকল যাত্রীই মন্দিরের উপর উঠিতে

পায়। মন্দিরের উচ্চতা হেতু বহুদূর হইতে ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কথিত আছে ইহাই নাকি বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ মন্দির। মন্দিরগাত্রের কারুকার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয় বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু ইহার নাম ত্রিলোকসুন্দর বা জগৎখুট। চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে আসিলাম। ঠাকুরের সম্মুখে নাট-মন্দিরে বসিয়া অনেকগুলি হিন্দুস্থানী স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া ভজন গাহিতে-ছিলেন। ঠাকুরের রাজবেশ—নানা পরিচ্ছদ ও বহুমূল্য অলঙ্কারে মূর্ত্তি ভূষিত। ঠাকুরকে এখানে 'রণছোড়্জী' বলিয়া ডাকে। তাহার কারণ এই যে তিনি মথুরা হইতে জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া এখানে পলাইয়া আসেন। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; পূর্ব্বেকার মূর্ত্তি মুসলমানগণের অত্যাচারের ভয়ে নিকটবর্ত্তী বেটদ্বীপে লুকাইয়া রাখা হয়, এবং তদবধি সেই মূর্ত্তি সেখানেই আছে। দুই মূর্ত্তিই ঠিক একই প্রকারের। মূর্ত্তির বামে রাধা বা রুক্মিনী কেহই নাই; তবে এক এক পার্শ্বে ২টি করিয়া খুব ছোট ছোট ৪টি মূর্ত্তি আছে। তাঁহারা ব্রহ্মার মানসপুত্র:—সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, ও সনাতন। মন্দির প্রাঙ্গণে আর একটি মহল আছে, তাহাকে রাণীমহল বলে। তথায় রাধারাণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, লক্ষ্মী, গোপাল, কৃষ্ণ, রামা, কংস, মহাদেব ও মারুতি, প্রভৃতি দেবদেবীর মন্দির আছে। এতদ্ভিন্ন ইহার মধ্যে আচার্য্যপ্রবর শঙ্করের গদি আছে। এই সকলের একাংশে সারদা মঠের মোহান্ত বাস করেন। এই সকল দেখিতে দেখিতে রাত্রি অধিক হইয়া যাওয়ায় আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

সংবাদ ও মন্তব্য।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন দাতব্য চিকিৎসালয়, বেলুড়।

বেলুড় মঠস্থ শ্রীরামকৃষ্ণমিশন দাতব্য চিকিৎসালয়ের ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের কার্য্যবিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। চিকিৎসালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। পীড়িত ব্যক্তিগণকে চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ পথ্যাদি বিতরণ করা ব্যতীত সেবকগণ প্রয়োজনানুসারে অনেক সময়ে নিকটস্থ রোগী-দিগের গৃহে যাইয়া সেবাশুশ্রূষাদিও করিয়া থাকেন। ম্যালেরিয়ার সময়ে প্রত্যহ প্রায় ৮০।৯০ জন রোগী চিকিৎসার্থ এখানে সমবেত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে মোট ১৫,৫৯৫ জন রোগীকে ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা সেবা করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ৪,৫১৪ ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা ১১,০৮১।

উক্ত চিকিৎসালয়ের কার্য্যের প্রসার, প্রয়োজনীয়তা ও সন্তোষ-জনক ফল লক্ষ্য করিয়া বালি মিউনিসিপ্যালিটীর সদাশয় কর্তৃপক্ষগণ উক্ত আশ্রমে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে বার্ষিক ১২০৲ টাকা সাহায্য করিয়া আসিতেছেন এবং মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং প্রতি বৎসর উক্ত চিকিৎসালয়ে ব্যবহৃত অধিকাংশ ঔষধ পথ্যাদি বিনামূল্যে দান করিয়া থাকেন। তজ্জন্য মিশনকর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। এতদ্ব্যতীত, বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউ-টিক্যাল ওয়ার্কস্, মেসার্স ডি, গুপ্ত এণ্ড কোং, ডাঃ কে, সি, বসু এবং কলিকাতা, বালি ও বেলুড়ের যে সকল সহৃদয় চিকিৎসক উক্ত কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন মিশনের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদিগকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসালয়ের মোট আয় ৪৫১৮৶১০ টাকা এবং মোট ব্যয় ১১৯৮/০ টাকা। তহবিল মজুদ ৩৩২৶১০ টাকা।

প্রাপ্তিস্বীকার।

মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং, কলিকাতা,		অনুমান ২০০০৲ মূল্যের ঔষধাদি।
বেঙ্গল কেমিক্যাল,	ঐ	... ,, ১২৫৲ ,, ,,
ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল,	ঐ	... ,, ৪০৲ ,, ,,
ডাঃ প্রমথনাথ বসু, এম, বি,	ঐ	... ,, ৩৬৲ ,, ,,
ডাঃ কে, সি, বসু,	ঐ	... ,, ২০৲ ,, ,,
ডি, গুপ্ত এণ্ড কোং		... 'ডিগুপ্ত' ১২ বোতল।
আর, গেভিন এণ্ড কোং	ঐ	... জারমলীন ৫০ শিশি।
ডাঃ জে, এন, মজুমদার,	কলিকাতা	এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।
ডাঃ জে, এন, কাঞ্জিলাল, এম-বি,	ঐ	কিছু হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক ঔষধ।
কলিকাতা করপোরেশন		ইনক্লুএঞ্জা ট্যাবলেট।
কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন ও নিশিকান্তসেন কবিরত্ন	ঐ	বিষম জ্বরারিষ্ট ১২ বোতল
,, কালীভূষণ সেন কবিরত্ন	ঐ	৪ শিশি কবিরাজী ঔষধ।
,, ধন্বন্তরি ভৈষজ্যালয়,	ঐ	৪ বাক্স কবিরাজী ঔষধ।
ডাঃ জে, এফ, ডি, মেলো, রেঙ্গুন		কলেরা কিউর ১ শিশি ও অন্যান্য ঔষধ।
মিঃ মিন, বৌদ্ধমঠ, সারনাথ		কতকগুলি ঔষধ ও যন্ত্রাদি।
শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী সেনগুপ্ত, ব্রাহ্মণবেড়িয়া		ঔষধ ২ বাক্স।
,, আর, এল, চন্দ্র, কলিকাতা		ঔষধ ৩ বোতল।
,, সতীশচন্দ্র চন্দ্র,	ঐ	ঔষধ ১ বোতল।
,, পঞ্চানন ঘোষ, শালকিয়া		মহারাজ তৈল ১ শিশি।
,, শৈলেন্দ্রনাথ সুর, বেলুড়		কতকগুলি ষ্টেসনারি দ্রব্য।
,, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	ঐ	লিখিবার কালী।

মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম পুস্তক বিভাগ।

হিমালয়স্থ মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়ায় সহর হইতে উক্ত স্থানের দূরত্ব নিবন্ধন তথা হইতে কার্য্য পরিচালনের নানারূপ অসুবিধা বশতঃ উক্ত আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষগণ সম্প্রতি কলিকাতায় উহার একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। অতঃপর গ্রাহকবর্গ সহজেই এখান হইতে উক্ত আশ্রমের এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভারত ও ভারত-বহির্ভূত অপরাপর বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থাবলী লইতে পারিবেন।

ঠিকানা—অদ্বৈতাশ্রম পুস্তক বিভাগ, ২৮নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

মহাপ্রস্থান।

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত বাগবাজার নিবাসী ৺বলরাম বসু মহাশয়ের একমাত্র সুযোগ্য পুত্র পরম বৈষ্ণব রামকৃষ্ণ বসু জমিদার মহাশয় বিগত ১৪ই মে, ১৯২০ খৃঃ শুভ বৈশাখী সংক্রান্তি, একাদশী তিথি, শুক্রবার, বেলা ৩টা ৪৫ মিঃ সময় 'পেরিটোনাইটিস্', রোগে তাঁহার বাগবাজারস্থ ভবনে শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ করিতে করিতে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি যেরূপ বিনয়ী, অমায়িক, মিষ্টভাষী, নিরহঙ্কার ও দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ ছিলেন, সংসারে কদাচিৎ সেরূপ দৃষ্ট হয়। যিনি একবার ইঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই চিরকাল তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তাঁহার মুখ হইতে কেহ কখন কটু কথা শুনিয়াছে কি না সন্দেহ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহস্থ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বলরাম বাবুর স্থান যেখানে রামবাবুর স্থানও তাহার পার্শ্বেই। পিতাপুত্রের অদ্ভুত জীবন গৃহস্থমাত্রের অনুকরণীয়। রামবাবু তাঁহার দ্বাদশবর্ষবয়স্ক একমাত্র গুণবান পুত্রের মৃত্যুতে যেরূপ ভক্তোচিত ধৈর্য্য, অনাসক্তি ও নির্ভরতা দেখাইয়াছিলেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহার হৃদয়বত্তা ও দানশীলতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অকপট নিষ্ঠবান্ দানশীল রামবাবু যেন যীশুখৃষ্টের—'তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহা করিবে বাম হস্তকে তাহা জানিতে দিওনা'—এই উপদেশবাণী জীবনে পরিণত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি রামকৃষ্ণসঙ্ঘের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার বাগবাজারস্থ ভবন 'বলরাম মন্দিরে'র দ্বার সাধু-ভক্তমণ্ডলীর নিকট অবারিত ছিল এবং অনেক সময় উহা সাধুভক্তসমাগমে ও সৎপ্রসঙ্গ, ভজন, পাঠ ইত্যাদিতে মুখরিত থাকিত। এই ভক্ত পরিবারের আর একটী বিশেষত্ব—যাহা দেখিয়া অনেকেই নিষ্ঠা-ভক্তির অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত লাভ করিতে পারেন—অতি শিশু ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত ত্রিসন্ধ্যা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা জপ না করিয়া জলগ্রহণ করিবে না। দেহত্যাগকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের মনে শান্তিবিধান করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।
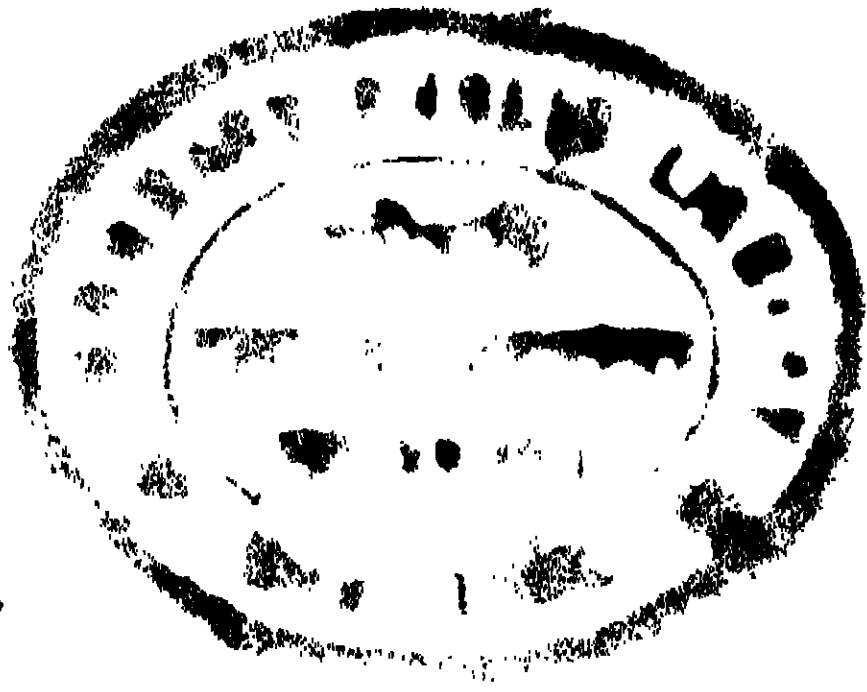
তন্ত্রে সদ্‌গুরুবিচার ও কুলগুরুপ্রথা।

(শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়, বি, এ)

"আমার পিতা তোমার পিতার গুরু ছিলেন, সুতরাং তুমিও আমাকে গুরুত্বে বরণ করিতে বাধ্য"—এই যে অন্যায় দাবী, অসঙ্গত আব্দার, অশাস্ত্রীয় অধিকার ইহা আমাদের এ বঙ্গভূমি ব্যতীত ভারতের আর কুত্রাপি এমন প্রবল নহে। অন্যান্য অঞ্চলে সাধুসন্ন্যাসীরই প্রভাব ও প্রতিপত্তি। সমাজ অবনতমস্তকে তাঁহাদিগকেই গুরু বলিয়া স্বীকার করে—কাহারও প্রাণে ধর্ম্মপিপাসা উপস্থিত হইলে তাঁহাদের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াই সে কৃতার্থ হয়। কিন্তু তন্ত্রশাসিত এ অঞ্চলে তাহা হওয়ার জো নাই। কারণ, তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে গৃহস্থের পক্ষে গৃহস্থ-গুরুগ্রহণই বিধেয়, নতুবা প্রভূত অকল্যাণের সম্ভাবনা। যদিও সাধন-কাণ্ডে তন্ত্রশাস্ত্রের উপযোগিতা বিষয়ে আমরা বিন্দুমাত্রও সন্দিহান নহি, তথাপি এই বিশেষ বিধিটির প্রামাণিকতা এবং যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমরা বিষম সংশয়ান্বিত। উপাখ্যানে আছে যে—কোন চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্রে মানুষের হাতে সিংহের পরাজয় চিত্রিত দেখিয়া কোন সিংহ কোন মানুষকে বলিয়াছিল—"সিংহ যদি ইহার চিত্রকর হইত, তবে চিত্র অন্য আকার ধারণ করিত।" এ কথাটি কি এখানেও প্রযোজ্য নহে?—গৃহস্থগুরুকুল যে স্বীয় আশ্রমের প্রাধান্য ঘোষণার্থ বা আপনাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত এ বিধিটি পার্ব্বতী-মহাদেব-সংবাদের মধ্যে জুড়িয়া না দিয়াছেন, তাহারই বা প্রমাণ কি?

ইংরাজীতে একটা কথা আছে—"Nothing like leather." অর্থাৎ মুচির মতে চাম্‌ড়ার মত জিনিষ আর জগতে নাই। আমাদের ভাষায়ও আছে—"গোয়ালা আপনার দুধ কখনই খাটো করে না।" যে ব্যক্তি যে আশ্রমে আছে তাহার দৃষ্টি তো উহার ভাবে অল্পবিস্তর অনুরঞ্জিত হইবেই—তাহার পক্ষে স্বীয় আশ্রমের গৌরবখ্যাপনেচ্ছা তো স্বাভাবিকই বটে। অথচ সন্ন্যাসীও যদি সমাজে দীক্ষাদান করিতে থাকে তবে গৃহস্থগুরুগণের ও তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততির বৃত্তি উচ্ছেদেরও যথেষ্ট আশঙ্কা। সুতরাং, যাহাতে সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাদের পাওনাগণ্ডায় ভাগ না বসায় এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াই বোধ হয় এ সব বচন শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত করিতেও তাঁহারা বিরত হন নাই। অথবা, আরও একটি কারণ থাকিতে পারে।—তন্ত্রশাস্ত্রে পশু, বীর ও দিব্য এই তিন ভাবের উল্লেখ থাকিলেও কার্য্যতঃ বীরভাবেরই প্রাধান্য দেখা যায়। বীরভাবে আবার নারীই প্রধান সাধন। নারীপ্রতীক অবলম্বনেই বীরসাধক উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কিন্তু এ "পিছলঘাটে" অনেক মহাবীরেরই পদস্খলন হইয়া থাকে। সুতরাং, অধিকাংশ সাধকই দিব্যভাবের সোপানে পৌছিতে না পারিয়া বীরভাবেই কালাতিপাত করিতে বাধ্য হন। ক্বচিৎ যে দু'একজন দিব্যভাবে উপনীত হইতে সক্ষম হন, তাঁহারাই অত্যাশ্রমী হইয়া থাকেন। নতুবা, অপর সাধকমাত্রকেই স্ত্রীগ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে জীবনপাত করিতে হয়। ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব ভোগলুব্ধ মানবকে ভোগের ভিতর দিয়াই ধীরে ধীরে ত্যাগের দিকে ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য যে তন্ত্রশাস্ত্রে এই ব্যবস্থা—তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যথেচ্ছ ভোগের পথে ভয়ও আছে—বিচারখড়্গ সর্ব্বদা সঙ্গে না রাখিলে আপাতরমণীয় ভোগ্যবস্তুতে বদ্ধ হইয়া পড়িবার বিশেষ আশঙ্কা—এক মুহূর্ত্তের জন্যও সদসদ্বিচার হারাইলে সবই গেল! সুতরাং, "বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে চেতাংসি ন যেষাং ত এব ধীরাঃ" এ কবিবাক্য সত্য হইলেও, প্রবর্ত্তকের পক্ষে আপনা হইতে গিয়া আগুনে ঝাঁপ দেওয়া নির্ব্বোধের কর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহান্

উপদেশের সুরে সুর মিলাইয়া তাঁহারই অননুকরণীয় ভাষায় আমরাও বলি—"চারাগাছে বেড়া দিয়ে রাখ্‌তে হয়, তা না হ'লে ছাগল গরুতে খেয়ে অনিষ্ট কর্‌তে পারে। কিন্তু গাছ বড় হ'লে আর বেড়ার দরকার নেই—তখন দশটা হাতী বেঁধে রাখ্‌লেও গাছের কিছুই হবে না।" —ঠিক কথাই তাই। আগে শক্তিসঞ্চয় করিতে হইবে—পরে তাহার যথেচ্ছ ব্যবহার সম্ভবপর। নতুবা সাধনার নামে অনাচার ব্যভিচারের যথেষ্ট সম্ভাবনা। এই জন্যই সাধনপথে প্রবৃত্ত সকলেরই প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের এক সাধারণ উপদেশ—"কামিনীকাঞ্চনত্যাগ"। এই মহান্ আদর্শে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই সাধকমাত্রকে অগ্রসর হইতে হইবে। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" আমরা—যাহারা সমাজে আছি—ভোগের মধ্য দিয়াই তাহাদিগের অগ্রসর হইতে হইবে নিশ্চিত। কিন্তু তাই বলিয়া ভোগই আমাদের জীবনের আদর্শ নহে—ত্যাগই আমাদের ধ্যেয় ও প্রাপণীয়। আমরা হীন দুর্ব্বল অধিকারী বলিয়া ভোগের ভিতর দিয়াই আংশিক ত্যাগ করিতে করিতে চরম সর্ব্বত্যাগের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছি। যদি সেই চরম লক্ষ্য ভুলিয়া ভোগের সহিত আপোষ করিয়া ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য করিতে যাই, তবে এ ইন্দ্রিয়ের রাজ্যেই বদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে—অতীন্দ্রিয় জগতে আর পৌঁছিতে হইবে না—অর্দ্ধপথে নঙ্গর করিয়া বসিয়া থাকিয়াই লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছি বলিয়া আত্মপ্রতারণামাত্র সার হইবে। এই আশঙ্কা আছে জানিয়াই শ্রুতি জলদনির্ঘোষে ত্যাগের মহিমা ঘোষণা করিতেছেন—"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।" এই জন্যই রাম, কৃষ্ণ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত বেদের সাকারবিগ্রহস্বরূপ সকল মহাপুরুষই ত্যাগের পতাকা ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই জন্যই স্ত্রীমাত্রে মাতৃভাব অবলম্বনে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত সাধকমাত্রের প্রতি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ। শাস্ত্রে আছে, "শ্রুতিস্মৃতি-বিরোধে তু শ্রুতিরেব প্রশস্যতে।" শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে যে স্থানে বিরোধ উপস্থিত হয়, সেস্থানে শ্রুতিবাক্যই গ্রাহ্য। শ্রুতিতে যখন সর্ব্বত্রই আমরা ত্যাগের উপদেশ দেখিতে পাই, তখন শ্রুতিবাক্য

ছাড়িয়া এ ক্ষেত্রে তন্ত্রের অনুসরণ করিব কেন? তন্ত্রের এ ভোগত্যাগ-সমন্বয় নিম্নাধিকারীর হস্তে পতিত হইয়া যে পরিশেষে সন্ন্যাসিবিদ্বেষে পরিণত হইয়াছে তাহারও যথেষ্ট নিদর্শন বর্ত্তমান। কারণ, অনেক স্থলে এমনও উল্লেখ দেখা যায় যে—সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করিলে গৃহস্থ সবস্ত্র অবগাহন করিয়া শুদ্ধ হইবে। ইহাতে গৃহস্থের ত্যাগভীতিই সূচিত হইতেছে। ত্যাগের বাতাসে গৃহীর "সাজান বাগান" নাকি "শুকিয়ে যায়"—এই ভাবটি এ প্রথার মূলে বিশেষরূপে জাজ্জ্বল্যমান। ঠিক এই কারণেই বোধ হয় ত্যাগীশ্বর মহাদেবের বিগ্রহে স্পৃষ্ট নৈবেদ্য অভক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যা হউক, সে সব অবান্তর প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া আমরা মূল আলোচ্য বিষয়ের অনুসরণ করি।

তন্ত্রশাস্ত্রই কুলগুরুপ্রথার প্রচারক ও পরিপোষক বলিয়া একটা ভ্রমাত্মক সংস্কার বহুদিন যাবৎ সমাজে চলিয়া আসিতেছে। শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতাই এ ধারণার নিদান। আমরা অনেকেই আজকাল শাস্ত্রচর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া "পরের মুখে ঝাল খাইতে" শিখিয়াছি বলিয়াই আমাদের নানাদিকেই দুর্দ্দশা। নিজেরা যে নিজেদের শাস্ত্র আলোচনা করিয়া সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিব সে প্রবৃত্তি আদৌ নাই—সুতরাং চালনা অভাবে সে শক্তিও অন্তর্হিতপ্রায়। এই অজ্ঞতার বশেই আমাদের মধ্যে অনেকে কুলগুরুপ্রথাদি অদ্ভুত ও অশাস্ত্রীয় দেশাচারের জন্য তন্ত্রশাস্ত্রের উপর অযথা দোষারোপ করিয়া থাকেন। আমরা তন্ত্রশাস্ত্রের বিন্দুবিসর্গও জানি না বলিয়াই এরূপ অভিযোগ উপস্থিত করিতে অগ্রসর হই। নতুবা, তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনায় এ বিশ্বাসের অলীকতা প্রতিপদে প্রতিপন্ন হয়। ফলতঃ, এ সকল বিষয়ে তন্ত্রও শ্রুতির ন্যায়ই উদার। আমরা প্রকৃত শাস্ত্রের চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া কেবল কতকগুলি দেশাচার, লোকাচার ও স্ত্রী-আচারের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জড়ের মত পড়িয়া আছি। যদি কেহ প্রশ্ন করেন, "এ সকল প্রথার ভিত্তি কি?" অমনি একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া আমরা ঝটপট্ উত্তর দেই "এ সকল শাস্ত্রে আছে।" প্রকৃত পক্ষে হয়ত শাস্ত্রের একটী পৃষ্ঠাও কোন দিন উল্টাইয়া দেখি নাই। এই তো আমাদের অবস্থা!

আমরা কেবল শিষ্যব্যবসায়ী গুরুকুলের নিকট হইতে শোনা কথায় বিশ্বাস করিয়া "যেনাস্য পিতরো যাতাঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ তেন যায়াৎ" নীতিরই জড়বৎ অনুসরণ করিতেছি। নিজের মাথা ঘামাইয়া যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিব সে চেষ্টা মোটেই নাই। প্রাণহীন যন্ত্রের মত শুধু কতগুলি দেশাচার জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত অন্ধভাবে প্রতিপালন করিয়া যাইতেছি। "কেন যে ঐ সকল আচার পালন করিতেছি" এ প্রশ্নও মুহূর্ত্তের তরে মনে উদিত হয় না। যদিই বা কখনও হয়, তখনই "শাস্ত্রবাক্যে সন্দেহ তো মহাপাপ" এই অপূর্ব্ব যুক্তিপ্রয়োগে সব কৌতূহল চাপা দিয়া মনকে বেশ ঠাণ্ডা করিয়া রাখি। কিন্তু একবারও ভাবি না যে শাস্ত্র স্বয়ংই বলিয়াছেন—যুক্তির আলোকে শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবে—নতুবা, "যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।" এই মহাতমোগুণ দূর করিবার প্রধান উপায়—সাধারণে শাস্ত্রের অবাধপ্রচার—যাহাতে প্রত্যেকেই নিজে নিজে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম পুরঃসর হিতাহিত বিচার করিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যতই প্রকৃত শাস্ত্রের প্রচার হয়—দেশের পক্ষে, সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল; দেশে যত অধিক পরিমাণে শাস্ত্রের চর্চ্চা হইতে থাকিবে, ততই আমাদের নানা কুসংস্কার তিরোহিত হইবে।—যাক্ সে সব কথা। যে তন্ত্রের দোহাই দিয়া কুলগুরুপ্রথা আজ বঙ্গে অপ্রতিহত প্রভুত্ব করিতেছে, আমরা সেই তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত প্রমাণ প্রয়োগেই বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইব যে, কুলগুরুপ্রথা অবৈধ, অশাস্ত্রীয়, অযৌক্তিক লোকাচারমাত্র এবং তন্ত্র উহার সমর্থক তো নহেনই বরং ঘোরবিরোধী। কিন্তু তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তন্ত্রোক্ত সদ্‌গুরু-বিচারের অন্ততঃ যৎসামান্য পরিচয় গ্রহণ আবশ্যক। নতুবা, তন্ত্র এ বিষয়ে কত উদার ও যুক্তিসহ তাহা পরিস্ফুট হইবে না।

সদ্‌গুরুর আশ্রয়গ্রহণের নিমিত্ত—ব্রহ্মবিৎ মহাপুরুষের শরণাপন্ন হইবার জন্য—আমরা শ্রুতিতে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দেখিতে পাই। তন্ত্রও এ বিষয়ে শ্রুতি অপেক্ষা কোন অংশে পশ্চাদ্বর্ত্তী নহেন। শ্রুতি যেমন বলিতেছেন—

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।

দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

তন্ত্রও বলিতেছেন—"অভিজ্ঞশ্চোদ্ধরেন্মূর্খং ন মূর্খো মূর্খমুদ্ধরেৎ। শিলাং সন্তারয়েন্নৌহি ন শিলা তারয়েচ্ছিলাম্॥"—যেমন নৌকাই স্বীয়গর্ভে প্রস্তরখণ্ড ধারণ করিয়া জলমজ্জন হইতে উহাকে রক্ষা করিতে সক্ষম, কিন্তু এক প্রস্তর খণ্ডের সাহায্যে অন্য প্রস্তরখণ্ড জলের উপর কিছুতেই ভাসিতে পারে না, সেইরূপ অভিজ্ঞ ব্যক্তিই মূর্খকে উদ্ধার করিতে সক্ষম—এক মূর্খ অপর মূর্খকে উদ্ধার করিতে কখনই সমর্থ হয় না। তন্ত্রে যেরূপ সুন্দর গুরুবিচার আছে, কেবল শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত "বিবেকচূড়ামণি" ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে সেরূপ দেখা যায় না। আমরা তন্ত্র হইতে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সদ্গুরুর আশ্রয়গ্রহণ সম্বন্ধে তন্ত্রের অভিমত পাঠককে প্রদর্শন করিতেছি।

কামাখ্যাতন্ত্রে জ্ঞানের মহিমা বর্ণন করিয়া শ্রীমহাদেব বলিতেছেন :—

"অতো যো জ্ঞানদানে হি ন ক্ষমস্তং ত্যজেদ্গুরুং।

অন্নাকাঙ্ক্ষী নিরন্নঞ্চ যথা সন্ত্যজতি প্রিয়ে॥

জ্ঞানত্রয়ং যত্রাভাতি স গুরুঃ শিব এব হি।

অজ্ঞানিনং বর্জ্জয়িত্বা শরণং জ্ঞানিনো ব্রজেৎ॥"

অর্থাৎ, যে অন্নাকাঙ্ক্ষী—যাহার উদর ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলিয়া যাইতেছে, সে যেমন অন্নবান্ গৃহস্থের গৃহেই অন্নপ্রার্থী হয়—যাহার নিজেরই অন্ন জোটে না এমন নিরন্ন গৃহস্থের বাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ যাহার প্রাণ জ্ঞানপিপাসায় আকুল হইয়াছে, তিনিও জ্ঞানদানে অক্ষম গুরুকে দূরে পরিহার করিবেন। যাঁহাতে আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব—এই ত্রিতত্ত্বের জ্ঞান বিরাজমান তিনি শিবস্বরূপ সন্দেহ নাই। জ্ঞানপিপাসু শিষ্য অজ্ঞানী গুরুকে বর্জ্জন করিয়া এতাদৃশ জ্ঞানী মহাপুরুষেরই শরণাপন্ন হইবেন।

এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে—তবে কি এক গুরুর কাছে দীক্ষা লইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করা তন্ত্রশাস্ত্রের অভিমত? না, তা নয়। ইহার নামই গুরুত্যাগ। শাস্ত্র এরূপ গুরুত্যাগের যে কখনই প্রশ্রয় দেন না তাহা

আমরা পরে দেখিতে পাইব। তবে এখানে ইহাও বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ঐরূপ আচরণ তন্ত্রের সম্পূর্ণ অনমুমোদিত হইলে, উপগুরুগ্রহণের বিধান নিরর্থক হইয়া পড়িত। যাঁহারা দুর্ভাগ্যক্রমে নিম্নাধিকারী গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পূর্ব্বগুরু ত্যাগ করিতে হইবে না। কারণ ওরূপ করিলে ভাব নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা। গুরু এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না। তত্ত্বতঃ দেখিতে গেলে আমাদের সকলেরই প্রকৃত গুরু—একমাত্র শ্রীভগবান্ স্বয়ং। ঐশীশক্তিই মানব-দেহাশ্রয়ে গুরুশক্তিরূপে প্রকাশিত। এই জন্যই শাস্ত্র আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন—গুরুতে কখনই মনুষ্যবুদ্ধি করিবে না—সর্ব্বদা ভাবিবে, "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ"। গুরু এক নারায়ণ—মানুষ-গুরুর গুরুত্ব সেই চিন্ময়গুরুর শক্তিতে। সকলেরই গুরুশক্তির কেন্দ্র সেই অন্তর্যামী শ্রীনারায়ণেই সমাহিত—কারণ, 'গুরুপরম্পরার শৃঙ্খল ধরিয়া উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে আমরা সেই একমাত্র উৎপত্তিক্ষেত্রেই উপনীত হইব। এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "মানুষ-গুরু মন্ত্র দেয় কাণে। জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে"। মানুষগুরু উপলক্ষমাত্র—সকল গুরুর ভিতর দিয়াই তিনিই কার্য্য করেন। নতুবা ক্ষুদ্র মানুষের কি সাধ্য জীবের ভববন্ধন মোচন করে? তাই, সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভের সৌভাগ্যে বঞ্চিত নরনারীকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণও বলিতেন—"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ী যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।" অর্থাৎ গুরুতে প্রাকৃত মনুষ্য বুদ্ধি না করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্মবুদ্ধি আরোপ করিবে। বস্তুতঃ, সতী স্ত্রীলোক যেমন একবার যাহার সহিত উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হয় তাহাকে আর কিছুতেই পরিত্যাগ করে না—পতি অন্ধ, আতুর, গলৎকুষ্ঠী হইলেও তাহাকেই প্রাণের একমাত্র আরাধ্যদেবতা-জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে—শিষ্যেরও তাই করিতে হয়। কুলবধূ যেরূপ স্বামিগৃহে শ্বশুর শাশুড়ী দেবর ভাসুর প্রভৃতিরও যথোচিত সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকে, কিন্তু স্বামীর সহিতই তাহার বিশেষ সম্বন্ধ—সে ভাব আর অন্যে আরোপণীয় নহে, সেইরূপ গুরুতেই শিষ্যের একনিষ্ঠা থাকা আবশ্যক। কুলবধূ যেমন স্বামীর গুরুজনের ও পরিবার পরিজনের সেবা করিয়া

গার্হস্থ্যাশ্রমের উদ্দেশ্য—উভয়ের চিত্তশুদ্ধি—সুসিদ্ধ করিয়া থাকে, শিষ্যেরও কর্ত্তব্য সেইরূপ গুরুরূপী জগদ্‌গুরুর সংসারের অপরাপর গুরুজনেরও যথাযথ সেবা দ্বারা দীক্ষার মূল উদ্দেশ্য সাধন। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ উপগুরুর সাহায্যে স্বীয় অপূর্ণতা ও অভাব দূর করিয়া লইতে বাধা তো নাইই, বরং উহাই অবশ্য কর্ত্তব্য। নতুবা, দীক্ষাগ্রহণের কোন সার্থকতাই জীবনে উপলব্ধি হইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের মনোহারিণী ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—"ঢোঁড়া সাপে ব্যাঙ ধল্লে যেমন সাপেরও যন্ত্রণা, ব্যাঙেরও যন্ত্রণা, তেমি অসদ্‌গুরুর পাল্লায় পড়ে শিষ্যেরও দুর্গতি গুরুরও দুর্গতি।"

সদ্‌গুরুর আশ্রয়গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তন্ত্র কেমন সুন্দর ভাবেই না প্রকাশ করিয়াছেন! ঐ শুনুন, তন্ত্র কি বলিতেছেন—

"মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যঃ গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥"

"ভ্রমর যেমন পুষ্পে পুষ্পে মধুর অন্বেষণে উড়াউড়ি করিয়া পরিশেষে যে পুষ্পে মধু আছে তাহাতে বসিয়াই নীরবে মধুপান করে, সেইরূপ জ্ঞানার্থী শিষ্যও প্রথমতঃ নানা আচার্য্যের নিকট যাতায়াত করিয়া অবশেষে যাঁহার নিকট তাহার কাম্য জ্ঞানধন লাভের সম্ভাবনা তাঁহারই চরণে আত্মনিবেদন করিবে।" তন্ত্রে এহেন উপদেশ থাকিতেও কোন্ মূর্খ বলিতে সাহসী হইবে যে—তন্ত্র অবিচারিতভাবে যাকে তাকে গুরুত্বে বরণ করিবার জন্য উপদেশ দেন? ঠিক যেন অধুনাতন সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াই শ্রীমহাদেব বলিতেছেন:—

"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্ল্লভঃ সদ্‌গুরুর্দেবি শিষ্যহৃত্তাপহারকঃ॥"

"হে দেবি! শিষ্যের বিত্তাপহারী গুরু অনেকই আছে। কিন্তু শিষ্যের ত্রিতাপ জ্বালার প্রশমনকারী সদ্‌গুরু দুর্ল্লভ।"

দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই ত্রিসন্ধ্যায় গুরু প্রণামের মন্ত্র দুটি উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু উহাদের মধ্যে যে কি গভীর অর্থ নিহিত তাহা কয়জনের হৃদয়ঙ্গম হয়? ঐ শুনুন শ্রীমহাদেব শিক্ষা দিতেছেন:—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
ইতি মত্বা সাধকেন্দ্রো গুরুস্তাং কল্পয়েৎ সদা।
জ্ঞানিনৈব শিষ্যভক্ত্যা কেবলং নিশ্চিতং শিবে॥"

"জ্ঞানরূপ অঞ্জনদিগ্ধশলাকা দ্বারা (অঞ্জন লেপনে) অজ্ঞানতিমিরান্ধ ব্যক্তির চক্ষুঃ অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি যিনি উন্মীলিত করিয়াছেন সেই মহামহিমময় শ্রীগুরুকে প্রণাম। এই গুরু প্রণামের মন্ত্রটীর তাৎপর্য্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া অর্থাৎ গুরুর এতদূর দায়িত্ব ও অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি ইহা বেশ বুঝিয়া লইয়া জ্ঞানী পুরুষেই সাধক গুরুত্ব কল্পনা করিবে অর্থাৎ জ্ঞানী পুরুষকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবে। তৎপর শিষ্যের ভক্তি দ্বারাই আর বাকী যাহা হইবার তাহা হইবে।"

তিমিররোগাক্রান্ত হইয়া কোন ব্যক্তি যদি দৃষ্টিশক্তিরহিত হয়, আর কোন সুচিকিৎসকের অঞ্জন প্রয়োগে যদি তাহার হৃতদৃষ্টি পুনঃপ্রাপ্ত হয়, তবে সেই চক্ষুদাতার নিকট সে কতই না কৃতজ্ঞ হয়। সাধারণ মানব অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্নদৃষ্টি—তিমিরগ্রস্ত রোগীর চক্ষুঃ দুটি যেমন বাহ্যতঃ বেশ উজ্জ্বল দেখায় কিন্তু তাহা দ্বারা দর্শন কার্য্য চলে না, আমাদেরও সেই অবস্থা। জগতের লোকে হয়ত সহজে বুঝিতে পারে না যে আমরা দৃষ্টিহীন। কিন্তু আমরা তাহা প্রাণে প্রাণে বেশ বুঝিতে পারি। সদ্‌গুরুই জ্ঞানদান করিয়া আমাদিগকে যথার্থরূপে চক্ষুষ্মান্ করিয়া থাকেন। সুতরাং এহেন উপকারীর জন্য আমরা কি না করিতে পারি? এরূপ গুরুর আর বার্ষিক আদায়ের জন্য শিষ্যের বাড়ীতে যাইয়া ধরনা দিয়া পড়িয়া থাকিতে হয় না। শিষ্য তাহার যথাসর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিয়াও যেন তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। "জীবন যৌবন ধন সকলি তোমায়, তুমি প্রভো নাথ মোর রাখ রাঙ্গা পায়।" বলিয়া তাঁহার শ্রীপদে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু আমাদের অনেকের ভাগ্যদোষে অসদ্‌গুরুর পাল্লায় পড়িয়া দৃষ্টিশক্তি লাভ তো দূরে থাক্, চক্ষুর দফা পর্য্যন্ত রফা হইয়া যায়। কোথায় হইবে চক্ষুঃ "উন্মীলিত," তার পরিবর্ত্তে কিনা হয় উন্মূলিত। ইহাপেক্ষা অধিকতর বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে? অদৃষ্টের উপহাস আর কাহাকে বলে!

গুরু প্রণামের মন্ত্রে সকলেই উচ্চারণ করিয়া থাকেন :—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥"

"অখণ্ডমণ্ডলাকার এই চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত সেই পরব্রহ্মের পরম পদ যিনি প্রদর্শন করিয়াছেন সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম।" এখন প্রশ্ন এই—তুমি কি সেই অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচরব্যাপ্ত ব্রহ্মকে করতলামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছ ? গুরু কৃপায় কি তুমি সত্য সত্যই ব্রহ্মদর্শনের অধিকারী হইয়াছ ? সত্য সত্যই কি তোমার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে ? জ্ঞানাঞ্জনশলাকা প্রয়োগ করিয়া গুরু কি যথার্থই তোমার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন ? যদি তাহা হইয়া থাকে তবে তো তুমি ধন্য—তোমার "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা"। আর যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে তো কেবল তোতাপাখীর মত কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ মাত্রই তোমার সার হইয়াছে। তুমি রহিয়াছ সেই অন্ধ পূর্ব্বে ছিলে যা। অথচ কথায় বলিতেছ তুমি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছ, ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করিয়াছ। এরূপে আপনাকে আপনি প্রতারিত করিতেছ ও তাহার ফলে দিন দিন ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছ—জড়ত্বের চরম সীমায় উপনীত হইতেছ। তাই বলি ভাই, আর আত্মপ্রতারণা করিও না। এখনও সময় আছে, এখনও প্রতিকারের উপায় আছে। সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর এবং সুধু কথায় পণ্ডিত না হইয়া কাজে পণ্ডিত হইবার চেষ্টা কর।

শিষ্যব্যবসায়ী গুরুকুল শাস্ত্রের যে কয়েকটী বচনের উপর আপনাদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করেন তাহা আমরা ক্রমশঃ উদ্ধৃত করিয়া, ঐ সংক্রান্ত অন্যান্য বাক্যের সহিত সমন্বয় পুরঃসর উহাদের যথাযথ মীমাংসা লিপিবদ্ধ করিতেছি। সুধী পাঠক সঙ্গতি অসঙ্গতি বিচার করিবেন।—

প্রথমতঃ যোগনীতন্ত্রে নিম্নলিখিত বচনটি দৃষ্ট হয়। যথা :—

"পশুমন্ত্রপ্রদানে তু মর্য্যাদা দশপৌরুষী।
বীরমন্ত্রপ্রদানে তু পঞ্চবিংশতি পৌরুষী॥
মহাবিদ্যাসু সর্ব্বাসু পঞ্চাশৎ পৌরুষী মতা।
ব্রহ্মযোগপ্রদানে তু মর্য্যাদা শতপৌরুষী॥"

অর্থাৎ "গুরুকুলের মর্য্যাদা বা সম্মান—পশুমন্ত্রদীক্ষার বেলায় ১০ পুরুষ, বীরমন্ত্রে ২৫ পঁচিশ পুরুষ, মহাবিদ্যামন্ত্রে ৫০ পঞ্চাশ পুরুষ ও ব্রহ্মজ্ঞানদানে ১০০ শততম পুরুষ পর্য্যন্ত।" ইহাতে এমন কোনঃ কথা নাই যে গুরু-করণের যোগ্য পাত্র না থাকিলেও তাঁহাদের বংশ হইতে শিষ্যকুলের মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। মর্য্যাদার অর্থ সম্মান। সুতরাং ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—তাঁহাদের পুরুষপরম্পরাকে গুরুত্বে বরণ না করিলেও পূর্ব্ব-পুরুষের গুরু বলিয়া যথোচিত সম্মান করিবে। যাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করা যায় তাঁহার সম্বন্ধে সম্বন্ধ সকলের প্রতিই শিষ্যের শ্রদ্ধা হওয়া স্বাভাবিক। ইহাতে শাস্ত্র কোন নূতন কথা বলেন নাই। গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান যত উচ্চতর হইবে, শিষ্যের কৃতজ্ঞতার মাত্রাও ততই বাড়িয়া উঠিবে—এই কথাটিই শাস্ত্র এখানে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, পিচ্ছিলাতন্ত্রের একটি বচন এই :—

"পৈত্রং গুরুকুলং যস্তু ত্যজেদ্বৈ পাপমোহিতঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্॥"

অর্থাৎ, "পাপমোহিত হইয়া যে ব্যক্তি পৈতৃক গুরুকুল ত্যাগ করে, সে যতকাল চন্দ্রসূর্য্যতারা বর্ত্তমান থাকিবে ততকাল ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে।" এ বচনটীর এমন অর্থ নয় যে, পৈতৃক গুরুবংশে যোগ্য পাত্র না থাকিলেও যাকে তাকে গুরু করিতেই হইবে। ঐরূপ অর্থ করিলে সদ্‌গুরুবিচার বিষয়ক অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহা আমরা নিম্নে যথাস্থানে প্রদর্শন করিব। এখানে শুধু এই কথা বলিয়া রাখি যে, পৈতৃক গুরুকুলে যোগ্যপাত্র থাকিতেও যদি কেহ অন্য গুরু গ্রহণ করে তবেই তাহার প্রতি শাস্ত্রের এই ভীতিপ্রদর্শন।

তৃতীয়তঃ, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আর একটি বচন আছে :—

"তস্মাদ্ গুরোর্ব্বংশজাতং বয়োঽল্পমপি পণ্ডিতং।
গুরুং কুর্য্যাত্তু দীক্ষায়ামবিচার্য্য গুরোঃ কুলম্॥"

"অতএব গুরুবংশজাত ব্যক্তি যদি বয়ঃকনিষ্ঠ হন, কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য

থাকে তবে নির্ব্বিচারে তাঁহার নিকট হইতেই দীক্ষাগ্রহণ করিবে।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গুরুবংশীয় ব্যক্তির পাণ্ডিত্য থাকিলেই গুরুকুল নির্ব্বিচারে আশ্রয়নীয়, নতুবা নহে। কেবল, গুরুবংশের খাতিরে যাকে তাকে গুরু করিতে শাস্ত্র কখনই বলেন না। তার পর, পাণ্ডিত্যের কথা। গুরুবংশে পণ্ডিত থাকিলেই যদি তাঁহাকে গুরু করিতে হয়, তবে আর কি ? দেশে এত এত তর্কচূড়ামণি, তর্কালঙ্কার, তর্কপঞ্চানন, স্মৃতিভূষণ, স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি হরেক রকমের উপাধিধারী পণ্ডিত থাকিতে আর ভাবনা কি ? পণ্ডিত মানে কি তাই ? না না, তা নয়। ঐ শুনুন সাধককবি তুলসীদাস বলিতেছেন :—

"পুঁথি পড়্কে তুতি ভয়ো পণ্ডিত না ভয়ো কোই।
এক অক্ষর প্রেম্‌সে প'ড়ে ওই পণ্ডিত হোই॥"

অর্থাৎ, পুঁথি পড়িয়া লোক তোতা হয়—দুচারটা বাঁধা গদের বোলচাল মাত্র ঝাড়িতে শিখে কিন্তু পণ্ডিত হইতে পারে না। ভগবৎপ্রেমের পাঠে এক আধটু বর্ণপরিচয় যার হয়, সেই পণ্ডিত হয়। আবার শুনুন, শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কি বলেন ?

"বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলং।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥"

—"কেবল বাক্যাড়ম্বর ও শব্দচ্ছটাময় শাস্ত্রব্যাখ্যাননৈপুণ্য পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হইয়া ভোগের উপকরণ লাভের সহায়ক হইতে পারে—কিন্তু উহা মুক্তির কারণ নহে।" শাস্ত্র হইতে এরূপ বচন অজস্র পরিমাণে বাহির করিয়া দেখান যায় যে—শাস্ত্রকারদের মতে পাণ্ডিত্য মানে কথার তুবড়ী ছুটান নয়—উহা জীবনের অন্তস্থলের ব্যাপার, সাধন রাজ্যের কথা—প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়। "যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্"—এই ভাবই সর্ব্বশাস্ত্রে প্রচারিত। তাহা না হইলে কি বেদ স্বয়ংই বেদাদিশাস্ত্রের জ্ঞানকে অপরাবিদ্যা বা নিম্নতর জ্ঞানের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিতেন—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি। পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা

কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"—"দ্বিবিধ বিদ্যা জ্ঞাতব্য বলিয়া ব্রহ্মবিদ্‌গণের মত। তাহা পরা ও অপরা। তন্মধ্যে চতুর্ব্বেদ ও ষড়্‌বেদাঙ্গ অপরা বা নিকৃষ্ট শ্রেণীভুক্ত। আর, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায় তাহাই পরা বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে—একজন সংস্কৃতে পণ্ডিত হইলেই তিনি গুরুপদের যোগ্য নহেন। কেউ বা ইংরাজীতে পণ্ডিত হয়, তিনি না হয় সংস্কৃতে পণ্ডিত হইলেন—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু এই পাণ্ডিত্য মানুষের মনের উপরে উপরে ভাসে—ভিতরে গিয়া তাহার মনুষ্যত্বের আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয় না—তাহাকে দেবত্বের গৌরবে মণ্ডিত করে না। তাই না শ্রুতি বলিয়াছেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" মেধাশক্তিতে সাঙ্গবেদ কণ্ঠস্থ করিয়া কিংবা নানা শাস্ত্রবাক্যের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যায় বাহাদুরি দেখাইয়া এই আত্মাকে লাভ করিবে বলিয়া যদি বুঝিয়া থাক, তবে তুমি ভুল বুঝিয়াছ। সমাজের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার নিমিত্তই বালক শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"আমি অমন চালকলা বাঁধার বিদ্যা শিখ্‌বো না।" হে বিদ্যাভিমানি পণ্ডিতকুল! এখনও কি সেই দিব্য বালকের দিব্য ভাবের কথা আপনাদিগের শ্রুতিকুহরে ধ্বনিত হয় নাই?—অথবা, কাঞ্চনের প্রতি অযথা আসক্তির বশীভূত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমেই আপনারা বধিরের ন্যায় আচরণ করিতেছেন? "গ্রন্থ নয় গ্রন্থি—গাঁট", "যেমন চিল শকুনি অনেক উঁচুতে উড়ে কিন্তু তাদের দৃষ্টি থাকে গোভাগাড়ে, তেম্‌নি কামকাঞ্চনে মন রেখে কেবল অনেক শাস্ত্রপাঠ কল্লে কি হবে?"—প্রভৃতি মহাবাণী স্মরণ মনন করিয়া পাণ্ডিত্যের অভিমান বিসর্জ্জন দিন—সরল প্রাণে অন্তর্যামীর শরণাপন্ন হউন—দেখিবেন, আপনাদের ভিতর দিয়াই আবার জগতের কল্যাণার্থ প্রকৃত গুরুশক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে। নিজ নিজ বুকে হাত দিয়া একটু ভাবুন দেখি, গুরু হওয়া কি বিষম দায়িত্বের কাজ—কত ঝুঁকি নিজের মাথায় লইতে হয়! নতুবা, কেবল যেন তেন প্রকারেণ শিষ্যের কাণে একটা মন্ত্র ফুঁকিয়া বৎসরান্তে "বিদায়" আদায় করাই যদি প্রকৃত

গুরুত্বের নিদর্শন হইত, তবে আর কোন গোল ছিল না! এই ভাবের মোহেই তো আজ সমাজ "কাণফুঁকা" গুরুকুলের অত্যাচার উৎপীড়নে জর্জ্জরিত ও উৎসাদিতপ্রায়।

চতুর্থতঃ, কুলার্ণবতন্ত্রের নিম্নোদ্ধৃত বচনটির উপরও কুলগুরুর দল খুব জোর দিয়া থাকেন। যথা—

"মন্ত্রত্যাগাম্ভবেন্মৃত্যুর্গুরুত্যাগাদ্ দরিদ্রতা।
গুরুমন্ত্রোভয়ত্যাগাদ্ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥"

—ইষ্টমন্ত্র ত্যাগ করিলে মৃত্যু হয়, গুরু ত্যাগ করিলে দারিদ্র্য ঘটে, এবং গুরু ও মন্ত্র উভয় ত্যাগ করিলে রৌরবনরকে গতি হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে কথা এই—যাহার গ্রহণ হইয়াছে তাহারই ত্যাগ সম্ভবপর। নতুবা আমি আদৌ মন্ত্রই গ্রহণ করিলাম না, এ অবস্থায় আমার পক্ষে তো মন্ত্রের ত্যাগ হইতে পারে না। যদি বলেন, তোমার পিতা যে মন্ত্র লইয়াছেন সেই মন্ত্র যদি তুমি না লও তবেই তোমার পক্ষে মন্ত্র ত্যাগের অপরাধ হইবে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রথমতঃ ইষ্টমন্ত্র পিতা পুত্রের এক প্রকার নাও হইতে পারে। কারণ 'ইষ্ট' মানে 'অভিলষিত'—জন্মান্তরীণ সংস্কার প্রভাবে কিংবা বর্ত্তমান জীবনের আবাল্য চিন্তার ধারায় যাঁহার দিকে আমি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হই তিনিই আমার ইষ্টদেবতা। বৈচিত্র্যই মানবমনের বিশেষত্ব—মানুষের চিন্তার ধারা নূতন নূতন দিকেই প্রবাহিত হয়। এই বৈচিত্র্য হারাইলেই মানুষের মনুষ্যত্ব চলিয়া যায়—পশুত্ব তাহার স্থান অধিকার করে। মানবমনের এই বৈচিত্র্যের রক্ষণ ও পরিপোষণের নিমিত্তই শাস্ত্র ইষ্ট-নির্ব্বাচনে সকলকে স্বাধীনতা দিয়াছেন। সুতরাং, বংশগত সংস্কারের কথঞ্চিৎ প্রভাব থাকিলেও ব্যক্তিগত সংস্কারের শক্তি আমরা কোন ক্রমেই অগ্রাহ্য করিতে পারি না। যাহারা দীক্ষার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত কোন বিশেষ মূর্ত্তির ধ্যানধারণা করিবার চেষ্টামাত্রও করে নাই—কোন বিশেষ ধর্ম্মভাবের প্রেরণা জীবনে কখনও অনুভব করে নাই—যাহারা কেবল তথাকথিত দেহশুদ্ধির বাসনায় মন্ত্রগ্রহণেচ্ছু—তাহাদের বেলায় কুলদেবতার মন্ত্রে দীক্ষা অনুমোদন যোগ্য হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া এ নিয়ম সর্ব্বত্র নির্ব্বিচারে প্রযোজ্য নহে। কারণ, এমনও তো

অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা বাল্যাবধি স্বাভাবিক সংস্কারের প্রেরণায় কোন বিশেষ ভাবে—বিশেষ মূর্ত্তিতে ভগবান্‌কে ডাকিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বকালীন এই সাধনা কি পণ্ডশ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে?—না, তা কখনই নয়। যথার্থ গুরু স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির বলে শিষ্যের অন্তর্নিহিত সংস্কাররাজির পরিচয় লইয়াই তাহাকে যে পথে চালিত করিতে হয় তাহা করেন, সাধারণ কুলগুরুর দলের মত 'কুলদেবতার' দোহাই দিয়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নাশের প্রয়াস পান না। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি—পিতাপুত্র যে একই ইষ্টের—একই আদর্শের ভাবুক হইবেন এমন কোন কথা নাই। দ্বিতীয়তঃ, কুলার্ণব তন্ত্রের উল্লিখিত শ্লোকের "ত্যাগ" শব্দ নিয়াই বিরোধ। পিতা মন্ত্র গ্রহণ করিলেও আমার পক্ষে উহা সার্থক নহে। আবার, 'গ্রহণ' ও 'ত্যাগ' এই দুটি শব্দ পরস্পরসাপেক্ষ। যে বস্তুর 'গ্রহণ' হইয়াছে তাহারই ত্যাগ হইতে পারে। আমি নিজে আগে গ্রহণ করা চাই, তবেই আমার পক্ষে উহার ত্যাগ সম্ভবপর। সুতরাং, এই "মন্ত্রত্যাগ" মানে একবার যে মন্ত্র গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার ত্যাগ। যে এখনও অদীক্ষিত, তার আবার মন্ত্রত্যাগ কি? সে তো মন্ত্র গ্রহণই করে নাই। গুরুর বেলায়ও ঠিক এই কথাই প্রযোজ্য। কেউ যদি কাহারও নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরে অন্য কোন নূতন গুরুর হিড়িকে পড়িয়া পূর্ব্বগুরু ত্যাগ করে তবেই তাহার এই পাপের ভাগী হইতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া গুরু গ্রহণের পূর্ব্বে গুরুবিচার নিষিদ্ধ নহে। পরন্তু, শাস্ত্রের মতে দীক্ষার পূর্ব্বে সাধুসঙ্গ অবশ্য কর্ত্তব্য। এবং ঐরূপে নানাজনের নানাভাব দেখিয়া তন্ন তন্ন করিয়া প্রত্যেকের প্রত্যেক আচরণের খুঁটিনাটি পরীক্ষা করিয়া যাঁহাকে আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া ধারণা হয় তাঁহারই শ্রীচরণে আপনা বিকাইয়া দিতে হয় ও তদেকশরণ হইয়াই গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হয়। তবেই একদিন না একদিন সিদ্ধিলাভের আশা আছে—নতুবা উহা নিতান্ত সুদূরপরাহত।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা আলোচনা করিলাম তাহাতে দেখা যাইতেছে যে "পৈতৃক গুরুকুল ত্যাগ করিবে না" ইহার অর্থ—পৈতৃক

গুরুকুলে গুরুপদের যোগ্য পাত্র থাকিতে অন্যত্র দীক্ষা গ্রহণ অবিধেয়। আমরা কেন এরূপ মত প্রকাশ করিতেছি তাহা শাস্ত্রোক্ত সদ্‌গুরুর পরিচায়ক লক্ষণ সমূহ আলোচনা করিলেই সহজে বোধগম্য হইবে। যদি গুরুকুল নির্ব্বিচারেই আশ্রয়ণীয় হয় তবে শাস্ত্রে এত গুরুবিচারের ছড়াছড়ি কেন? বংশপরম্পরাক্রমেই যদি গুরুর পদ চিরকাল চলে তবে আর গুরুশিষ্যের এত পুঙ্খানুপুঙ্খ লক্ষণ শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিবার কি আবশ্যকতা ছিল? বলিলেই তো হইত যে, যে যে বংশের শিষ্য আছে, তাহাই আশ্রয় করিয়া থাক। বস্, এককথায় সব গোল চুকিয়া যাইত। কিন্তু তাহা তো শাস্ত্রকারের অভিপ্রায় নয়। তাহা হইলে, গুরুপদের অযোগ্য ব্যক্তির উল্লেখ করিতে শাস্ত্র সর্ব্বত্রই "বর্জ্জয়েৎ" বলিয়া ভণিতা আরম্ভ করিতেন না। তাদৃশ গুরুর শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক সামান্য খুঁতটুকুও শাস্ত্রকারের সতর্ক চক্ষু এড়াইতে পারে নাই। ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া সব দোষেরই লম্বাচওড়া তালিকা করা আছে। সে সব পাঠ করিলে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বেশ শিক্ষালাভ হয়। কিন্তু প্রবন্ধ ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে বলিয়া এখানে আমরা ঐ সকল উদ্ধৃত করিতে বিরত রহিলাম। কৌতূহলাক্রান্ত পাঠক সাধকবর পণ্ডিত ৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় প্রণীত "তন্ত্রতত্ত্ব" (যাহা ইদানীং "আর্থর আভেলন" এই ছদ্মনামধারী—কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ বিচারপতি মাননীয় উড্রফ মহোদয় কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীদিগেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে) পাঠ করিলে অল্পায়াসে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারিবেন।

এক্ষণে আমরা অসদ্‌গুরুর দোষ কীর্ত্তন ছাড়িয়া তন্ত্রোক্ত সদ্‌গুরু-বিচারের কিঞ্চিৎ পরিচয় লইব। তাহা হইলেই সঙ্গে সঙ্গে অসদ্‌গুরুর পরিচায়ক লক্ষণগুলিও মোটামুটি ধরিতে পারিব। কামাখ্যা তন্ত্রে সদ্‌গুরুর লক্ষণাদি সম্বন্ধে বহু উক্তি পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি মাত্র আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ শুদ্ধান্তঃকরণ সদা।
পঞ্চতত্ত্বার্চ্চকো যস্তু সদ্‌গুরুঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ॥

সিদ্ধোঽসাবিতি চেৎ খ্যাতঃ বহুভিঃ শিষ্যপালকঃ।
চমৎকারী দৈবশক্ত্যা সদ্গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে॥
অশ্রুতং সম্মতং বাক্যং বক্তি সাধু মনোহরং।
তন্ত্রং মন্ত্রং সমং বক্তি স এব সদ্গুরুশ্চ সঃ॥
সদা যঃ শিষ্যবোধেন হিতায় চ সমাকুলঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তঃ সদ্গুরুর্গীয়তে বুধৈঃ॥
পরমার্থে সদা দৃষ্টিঃ পরমার্থঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
গুরুপাদাম্বুজে ভক্তির্যস্যৈব সদ্গুরুঃ স্মৃতঃ॥
ইত্যাদিগুণসম্পন্নং দৃষ্ট্বা দেবি! গুরুং ব্রজেৎ।
ত্যক্ত্বাক্ষমং গুরুং শিষ্যো নাত্র কালবিচারণা॥"

অর্থাৎ, যিনি শান্ত ও দান্ত (যাঁহার বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় উভয়ই সংযত), কুলীন (আচার বিনয় বিদ্যা প্রভৃতি নবধা কুললক্ষণ যাঁহাতে বিরাজমান অথবা কৌলধর্ম্ম অর্থাৎ তান্ত্রিক ধর্ম্মে যিনি পারদর্শী), বিশুদ্ধচেতা ও পঞ্চতত্ত্বের উপাসক (পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যা বসুমতীকার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মুখবন্ধে দ্রষ্টব্য), তিনিই সদ্গুরু বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। "ইনি সিদ্ধ মহাপুরুষ" বলিয়া বহুলোকের নিকট যিনি খ্যাত, যিনি শিষ্যদিগের আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধন করিয়া তাহাদিগকে পরিপালন করিয়া থাকেন, যাঁহার ভিতরে অদ্ভুত দৈবশক্তি নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে, তিনিই সদ্গুরু বলিয়া কথিত। যাঁহার বাণী সমাজের দশজনের কাছে অশ্রুতপূর্ব্ব, নবভাবের প্রচারক হইলেও শাস্ত্র ও পূর্ব্বগ মহাপুরুষগণের উপদেশের সহিত অবিরোধী অথচ সকলেরই মনোমুগ্ধকর বটে, তন্ত্রমন্ত্রে যাঁহার সমান পারদর্শিতা তিনিই সদ্গুরু। যিনি সর্ব্বদা শিষ্যের জ্ঞানোন্মেষ ও হিতসাধন করিতে আকুল, যিনি নিগ্রহানুগ্রহে সক্ষম ("শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন"), এমন শক্তিধর মহাপুরুষকেই সদ্গুরু বলিয়া পণ্ডিতগণ বর্ণনা করেন। পরমার্থেই যাঁহার দৃষ্টি সদা নিবদ্ধ—পরমার্থই যাঁহাদ্বারা সর্ব্বদা প্রচারিত, গুরুপাদপদ্মে যাঁহার ভক্তি বর্ত্তমান,—তিনিই সদ্গুরু বলিয়া কথিত। হে দেবি! একটুও কালবিলম্ব না করিয়া অক্ষম গুরুকে

পরিত্যাগপূর্ব্বক উল্লিখিত তাবৎ গুণসম্পত্তি দেখিয়া গুরু নির্ব্বাচন করিবে।

এখন বলুন্ দেখি পাঠক, গুরুকুল যদি নির্ব্বিচারেই আশ্রয়ণীয় হয় তবে এই সব শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা কি? তার পর আরও দেখুন, গুরুনামধারী প্রবঞ্চকদিগের অত্যাচার উৎপীড়নের কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াই যেন শ্রীমহাদেব বলিতেছেন :—

"কেবলং শিষ্যসম্পত্তিগ্রাহকো বহুমারকঃ।
ব্যঙ্গিতশ্চ সমক্ষে যো লোকৈর্নিন্দ্যো গুরুর্মতঃ॥
কায়েন মনসা বাচা শিষ্যং ভক্তিযুতং যদি।
দৃষ্ট্বানুমোদনং নাস্তি তস্য তদ্বস্তুকামতঃ॥
কর্ম্মণা গর্হিতেনৈব হন্তি শিষ্যধনাদিকং।
শিষ্যাহিতৈষিণং লোভাৎ বর্জ্জয়েৎ তং নরাধমম্॥"

"যে কেবল শিষ্যসম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে রত, দীক্ষাচ্ছলে দস্যুবৃত্তিই যাহার উপজীব্য, সাক্ষাৎসম্বন্ধে লোকে যাহাকে নিন্দা করে, তাদৃশ গুরু নিন্দনীয়। শিষ্যকে কায়মনোবাক্যে ভক্তিযুক্ত দেখিয়াও শিষ্যের কোন বস্তুতে কামনাহেতু যে গুরু শিষ্যের প্রতি প্রীত না হয়, পরন্তু লোভবশতঃ গর্হিত কর্ম্মদ্বারা শিষ্যের ধনাদিগ্রহণ করে, তাদৃশ শিষ্যাহিতৈষী নরাধমকে বর্জ্জন করিবে।

এইটুকু বলিয়াই শাস্ত্রকার ক্ষান্ত থাকেন নাই। আরও বলিতেছেন :—

অসম্মতস্তু লোকৈর্যস্তত্র রুষ্টঃ সদাশিবঃ।
রাজস্বং দীয়তে রাজ্ঞে প্রজাভির্মণ্ডলাদিভিঃ॥
যথা তথৈব তস্মৈ তু শিষ্যদানসমর্পণং।
অত্রৈব গ্রাহকা হিংস্রাঃ মণ্ডলাদ্যাঃ স্মৃতাঃ যদি॥
অন্যদ্বারেণ দাতব্যং তাংস্তান্ সন্ত্যজ্য সর্ব্বদা॥

(কামাখ্যাতন্ত্র)

অর্থাৎ যে সাধারণের অনভিমত পাত্র তাহার প্রতি সদাশিব রুষ্ট। প্রজাগণ যেমন মণ্ডলাদির মারফতে রাজস্ব দিয়া থাকে, শিষ্যগণও তদ্রূপ গুরুর মারফতেই ইষ্টোপাসনা অর্পণ করে। কিন্তু সেই মণ্ডলাদি গ্রাহক বা হিংস্রক হইলে যেমন তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্য বিশ্বস্ত পাত্রের

মারফত রাজকর দিতে হয়, শিষ্যও তদ্রূপ করিবেন। অর্থাৎ বিশ্বাস-ঘাতক ধর্ম্মকঞ্চুকী গুরুর দলকে দূরে বর্জ্জন করিয়া প্রকৃত গুরুর শরণাপন্ন হইবেন।

এখনও কি কেউ বলিতে চান যে কুলগুরুপ্রথা শাস্ত্রানুমোদিত? এখনও কি কাহারও সন্দেহ আছে যে কুলগুরুতে গুরুত্বের কিছু না থাকিলে তাঁহাকে বর্জ্জনপুরঃসর সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়? আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি যে, আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে শাস্ত্রবাক্য যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয় গুরুনির্ব্বাচন বিষয়ে শাস্ত্র উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। কিন্তু শিষ্যব্যবসায়ী গুরুকুলের স্বার্থপ্রণোদিত কদর্থ ব্যাখ্যায় তন্ত্র আজ সঙ্কীর্ণতার অপবাদে কলঙ্কিত। নতুবা দেখা যাইবে যে, শ্রুতি সূত্রাকারে যাহা বলিয়াছেন "ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষঃ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ" তন্ত্র তাহারই ভাষ্য টীকা করিয়াছেন মাত্র। শ্রুতিতে যাহা অঙ্কুরিত, তন্ত্রে তাহা ফলপুষ্পশোভিত মহান্ মহীরুহরূপে পরিণত।

হে শিষ্যব্যবসায়ী নামমাত্রধারী কুলগুরুগণ! সাবধান! তোমাদের মন্ত্রতন্ত্রের বাহ্ ভুক্‌তাক্ আর বেশী দিন টিকিবে না—টিকিবারও নয়। পদ্মার পাড়ের মত সব যে চোখের সামনে ধসিয়া পড়িতেছে তাহা কি এখনও দেখিয়াও দেখিতেছ না, বুঝিয়াও বুঝিতেছ না? তোমরা এতদিন নিজেও বুঝিয়াছিলে, পরকেও বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলে যে, কয়েকটি হিজি-বিজি চক্র আঁকিয়াই তোমরা মানুষের মনোরাজ্যের সব খবর আয়ত্ত করিতে সক্ষম। নামের আদ্যক্ষরাদি সহায়ে গণিয়া বাছিয়া আন্দাজে ঢিল ছুড়িয়াই তোমরা শিষ্যের সুপ্ত সংস্কাররাজির সন্ধান লইবার ও তাহার ইষ্টনির্ব্বাচন করিয়া দিবার শক্তি দাবী করিয়াছ। এ নবযুগের উদ্ভিন্ন-প্রকাশে তোমাদের ভণ্ডামি সব ধরা পড়িয়াছে—আর রক্ষা নাই। সময় থাকিতে এখনও সতর্ক হও, অনুতাপের অশ্রুতে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মনমুখ এক করতঃ গুরুশক্তির আধার গুরুপরম্পরার আদিস্বরূপ শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হও। তবেই যদি কোনরূপে ভগবৎকোপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশা থাকে।

বেদ ও শ্রীকৃষ্ণ

(শ্রীবেচারাম নন্দী)

সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি বেদ। বেদ শব্দের অর্থ ধর্ম্ম ও ব্রহ্মপাদক অপৌরুষেয় বাক্য। ইহা ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারিভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বেদে সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও সূত্র আছে।

(ক) সংহিতা

সংহিতায় অদিতি, সবিতা, অগ্নি, ইন্দ্র, মরুৎ, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণকে স্তব করিবার মন্ত্র আছে। 'অচেতনানাং বস্তুনাং চেতনবৎ সম্বোধনং মন্ত্রম্'—বায়ু সূর্য্য প্রভৃতি জড় পদার্থকে চেতনবৎ সম্বোধন করাই মন্ত্র। ঋষিগণ বায়ু প্রভৃতি জড় পদার্থে ঐশিক শক্তি আছে মনে করিয়া ঐ সকল জড় পদার্থকে মন্ত্র দ্বারা স্তব করিতেন। তাঁহারা অচেতন পদার্থের স্তব করিতেন না। তাঁহারা জড় পদার্থে নিহিত ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন। সামবেদে লিখিত আছে—"হে অগ্নি, আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর।" জড় পদার্থ কখন মানবকে পাপ হইতে রক্ষা করিতে পারে না। সংহিতায় 'একং' হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে এই বিবরণ পাওয়া যায়, এবং সবিতার স্তবে লিখিত আছে—সবিতার আদেশ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, মরুৎ সকলেই প্রতিপালন করেন, এই সবিতাও একং সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ। অগ্নি, ইন্দ্র, মরুৎ প্রভৃতি নামে তাঁহারা ব্রহ্মেরই উপাসনা করিতেন। ঈশ্বর এক, উপাধি বশতঃ তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নাম। এ সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন :—

উপাধৌ যথা ভেদতা সন্মণীনাং
তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেষু,
যথা চন্দ্রকানাং জলে চঞ্চলত্বং
তথা চঞ্চলত্বং তবাপীহ বিষ্ণো।

তিনি এক, উপাধি ভেদে ভিন্ন। জলে তরঙ্গ উঠিলে চন্দ্রবিম্ব অনেক দেখায়, কিন্তু চন্দ্র এক। সেইরূপ মানবের বুদ্ধিভেদে ঈশ্বরের নানা নাম।

কোন কোন সংহিতায় অদিতি মাতা, অদিতি পিতা—ইহা বর্ণিত আছে। অদিতি সম্বন্ধে মোক্ষমূলার বলেন,—

"Aditi, an ancient god or goddess, is in reality the earlist name invented to express the infinite, not the infinite as the result of abstract reasoning but the visible infinite, the endless expanse beyond the clouds, beyond the sky."

—অদিতি অনন্ত আকাশের দেব বা দেবী। বিচার শক্তির দ্বারা যে অনন্তের অনুভব করা যায় সে অনন্তের নাম উহা নয়। উহা দৃশ্যমান্ অনন্ত আকাশের দেব বা দেবী। এই অসীম আকাশ হইতে আমরা অনন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ক্ষমতা অনুভব করি; তজ্জন্য পুরাণে অদিতিকে দেবমাতা বলা হয়।

সংহিতার স্থানে স্থানে রূপক বর্ণনা আছে। এই সকল রূপক বর্ণনা হইতে বহু পৌরাণিক উপাখ্যানের উৎপত্তি হইয়াছে। ইন্দ্র বৃষ্টিদাতা। মেঘ বাষ্প হইতে গঠিত হয় এবং বাষ্প সকল কখন কখন নৃত্য করিতে থাকে। অরুণদেব অস্তাচলে উদিত হইলে উষাদেবী পলায়ন করেন। অরুণ রথে আরোহণ করিয়া অশ্ব (হরি) চালনা করেন। এই সকল নৈসর্গিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া অপ্সরা ও উর্ব্বশীর উপাখ্যানের উৎপত্তি হইয়াছে। সংহিতার সহিত পারসিকদিগের অবেস্তা নামক ধর্ম্মপুস্তকের তুলনা করিলে অনেক নূতন তত্ত্ব পাওয়া যায়। পারসিকদিগের উপাস্য দেবতার সাধারণ নাম অহুর। অহুর শব্দ সংস্কৃত অসুর শব্দের রূপান্তর, কারণ পারস্য ভাষায় সংস্কৃত 'স' 'হ'র ন্যায় উচ্চারিত হয়; যথা সংস্কৃত সহস্র ও সপ্তাহ এবং পারসিক হাজার ও হপ্তাহ। সংহিতায় ইন্দ্রের এক নাম বৃত্রহন্, পুরাণে বৃত্র অসুর, কিন্তু সংহিতায় বৃত্র মেঘ। অবেস্তায় মিত্রদেবের এক অনুচরের নাম বেরেথ্রঘ্ন। বেরেথ্রঘ্ন ও বৃত্রহন্ একই শব্দ। ঋগ্বেদ ও সামবেদ সংহিতায় অগ্নিকে "যবিষ্ঠ অগ্নি" বলিয়া

সম্বোধন করা হইয়াছে। এই যবিষ্ঠ শব্দ ও গ্রীকদিগের হেফিষ্টস (Hephaestos) নামক অগ্নিদেব একই শব্দ।

(খ) ব্রাহ্মণ

ঋগ্বেদান্তর্গত ঐতরেয়, ও যজুর্বেদান্তর্গত শতপথ প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্মণ আছে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ তিনভাগে বিভক্ত যথা—বিধি, অর্থবাদ ও বেদান্ত বা উপনিষদ্। বিধি দ্বিবিধ—(১) যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ও (২) ব্রহ্মকাণ্ডগত অজ্ঞাতজ্ঞাপকা অর্থাৎ অজ্ঞেয় ব্রহ্মের আলোচনা। অর্থবাদে বিধির প্রশংসা ও নিষেধের নিন্দা বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের প্রথমাংশে জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ, বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞের বর্ণনা আছে। বাজপেয় যজ্ঞ করিলে যজমান সম্রাট্ হন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ পাপ খণ্ডন করে ইহা বর্ণিত আছে। ব্রাহ্মণের স্থানে স্থানে কথিত আছে যে, সবিতা ও সরস্বতী প্রভৃতি দেব দেবীর উপাসনা করিলে কার্য্য সিদ্ধ হয়। কোন কোন দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, তুমিই স্বামী, তুমিই সর্ব্বভুবনরক্ষক। এই সকল বর্ণনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ঋষিরা বরুণ, মিত্র, সবিতা নামে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন।

(গ) উপনিষদ্

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বেদের একাংশের নাম উপনিষদ্। উপনিষদ্ শব্দ উপ+নি+সদ্ বা ষদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় যোগ করিয়া নিষ্পন্ন করা হয়। যাঁহারা সদ্ ধাতুর অর্থ উপবেশন করা মনে করেন তাঁহাদের মতে শিষ্যগণ গুরু বা আচার্য্যের নিকট উপবেশন করিয়া যে উপদেশ প্রাপ্ত হইতেন তাহাই উপনিষদ্। যাঁহারা সদ্ ধাতুর অর্থ লইয়া যাওয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতে যে বিদ্যা ব্রহ্মের নিকট মানবচিত্তকে লইয়া যায়, তাহাই উপনিষদ্। যাঁহারা উপনিষদ্ শব্দ ষদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মনে করেন, তাঁহাদের মতে, যে বিদ্যা অজ্ঞান নাশ করে তাহাই উপনিষদ্।

"তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদা সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্।"

—শরীর-মন-ইন্দ্রিয়-নিগ্রহরূপ তপশ্চরণ, নিত্য ও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি উপনিষদের অঙ্গ ও সত্যনিষ্ঠা উহার আশ্রয়স্থান। উপনিষদ্ অনেক, যথা, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর, কৈবল্য, গোপালতাপনী ইত্যাদি। কোন কোন উপনিষদে আরণ্যক নামক এক অতিরিক্ত অংশ আছে, তাহাতেও অনেক উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। এক উপনিষদের প্রারম্ভে লিখিত আছে—

"ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।"

—পৃথিবীতে যে সকল বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়, সকলই আত্মারূপী পরমেশ্বর দ্বারা আবরণ করিবে, অর্থাৎ পরমেশ্বর সত্য, জগৎ মিথ্যা, ভাবিবে। জগৎ কল্পিত, এই মনে করিয়া উহা অলীক ও ছায়াবৎ বিবেচনা করিবে। ফলে, সন্ন্যাস দ্বারা আত্মরক্ষা করিবে। অপরের ধন গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিবে না।

শ্রীকৃষ্ণ

কৃষ্ণোপনিষদে বর্ণিত আছে :—

"দেবকী ব্রহ্মপুত্রা সা যা দৈবৈরুপগীয়তে।
নিগমো বসুদেবো যো বেদার্থঃ কৃষ্ণরাময়োঃ॥"

দেবকী ব্রহ্মবিদ্যা এবং বসুদেব শব্দব্রহ্ম বেদপুরুষ। বেদপুরুষ বসুদেবের সাহায্যে ব্রহ্মবিদ্যা হইতে পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বসুদেব ও দেবকীর সন্তান বলা হইয়াছে।

গোপালতাপনী নামক উপনিষদে বর্ণিত আছে যে সনকাদি ঋষিগণ ব্রহ্মলোকে যাইয়া ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন :—

"কঃ কৃষ্ণঃ। গোবিন্দশ্চ কোঽসাবিতি। গোপীজনবল্লভশ্চ কঃ। কা স্বাহেতি।"

অর্থাৎ সনকাদি ঋষিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৃষ্ণ কোন্ দেবতা, গোবিন্দ কাহার নাম এবং গোপীজনবল্লভ কে ও স্বাহা কাহাকে বলে?" ব্রহ্মা সেই ঋষিগণকে এই উত্তর প্রদান করেন—যিনি

পাপ কর্ষণ করেন বা যিনি সৃষ্টিপ্রবাহ আকর্ষণ করিয়া রহিয়াছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ। গবা বেদো যঃ স গোবিন্দঃ অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাকে জানা যায় তিনি গোবিন্দ, এবং যিনি অবিদ্যা, কলা ও পালন শক্তির অধীশ্বর তিনি গোপীজনবল্লভ, ও মায়াকেই স্বাহা বলে। গোবিন্দ ও গোপীজন শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে জ্ঞান ও গোপী শব্দের অর্থ জানা আবশ্যক। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন :—

"অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্।
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা।"

অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, সরলতা, আচার্য্যসেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, চিত্তসংযম, ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহে বৈরাগ্য, অনহঙ্কার, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি সম্বন্ধীয় দুঃখরূপ দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা, পুত্র, দারা, ও গৃহ প্রভৃতিতে অনাসক্তি, ও তজ্জনিত সুখদুঃখাদিতে অনভিনিবেশ এবং ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা হর্ষবিষাদশূন্যত্ব, অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্য অবস্থিতি, তত্ত্বজ্ঞানার্থের দর্শন—এই সকল জ্ঞান; আর এতদ্ভিন্ন যে কিছু তাহাই অজ্ঞান বলিয়া উক্ত হয়। অতএব সরলতা, সত্যপরায়ণতা, নিরহঙ্কার, অহিংসাদি ভাব মনে প্রবল হইলে সেই মহাপুরুষের অস্তিত্ব সর্ব্বত্র অনুভব করা যাইতে পারে। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ পুরুষই গোবিন্দ। তিনিই গোপীজনবল্লভ, কারণ, তিনি নাম ও রূপ দ্বারা জগৎকে রক্ষা করিতেছেন। যো নামরূপাভ্যাং ইদং জগৎ গোপয়তি স গোপী (দৈবশক্তিঃ)। গোপীজনানাং যো বল্লভঃ (অধীশ্বরঃ) স গোপীজনবল্লভঃ। ব্রহ্মা গোবিন্দ প্রভৃতি শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন—"যো ধ্যায়তি ভজতি সোঽমৃতো ভবতি"—যে ব্যক্তি তাঁহার রূপ চিন্তা

করেন এবং জিহ্বা দ্বারা নাম উচ্চারণ করেন তিনি অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন।

"তে হোচুঃ। কিং তদ্রূপং কিং রসনং কিমাহো তদ্ভজনং
তৎ সর্ব্বং বিবিদিষতামাখ্যাহীতি।"

সনকাদি ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁহার রূপ, রস কিরূপ, তাঁহার ভজনাই বা কিরূপ, এই সকল অবগত হইতে অভিলাষ করি, উহা বর্ণনা করুন।

"তদু হোবাচ হৈরণ্যো গোপবেষমভ্রাভং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্।"

ব্রহ্মা প্রথমে তাঁহার কি রূপ তাহার উত্তর প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ হৈরণ্যো (জ্ঞানময়) গোপবেষঃ (ব্রহ্মাণ্ড পালন কর্ত্তা) অভ্রাভং (সাগরবৎ গভীর) এবং কল্পদ্রুমাশ্রিতং (বেদ দ্বারা প্রতিপাদ্য)। অর্থাৎ তিনি জ্ঞানময়, ব্রহ্মাণ্ড-পালনকর্ত্তা, সাগরবৎ গভীর এবং বেদ দ্বারা প্রতিপাদ্য। তাঁহাকে যেরূপে ধ্যান করিতে হয় তৎসম্বন্ধে কতিপয় শ্লোক বলিলেন। সেই সকল শ্লোকের মধ্যে আমরা দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

(১)　"সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥"

(২　"কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতম্।
চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেরিতি॥"

প্রথম শ্লোকটীর অর্থ—তাঁহার নয়নযুগল নির্ম্মল, পুণ্ডরীকের ন্যায়, তাঁহার বর্ণ মেঘসদৃশ, তিনি বিদ্যুৎ-সমুজ্জ্বল আকাশ স্বরূপ, দ্বিভুজ, জ্ঞান-মুদ্রাধারী ও ঈশ্বর। তিনি সচ্চিদানন্দরূপী, তজ্জন্য তাঁহার বর্ণ মেঘের ন্যায় বলা হইয়াছে। বিদ্যুৎ-সমুজ্জ্বল আকাশ স্বরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে তিনি বিদ্যুতের চিৎস্বরূপে স্বয়ং প্রকাশিত। কারণব্রহ্ম ও কার্য্যব্রহ্ম তাঁহার দুটী বাহু, তজ্জন্য তাঁহাকে দ্বিভুজ বলা হইয়াছে। জ্ঞান-মুদ্রাধারী বলার তাৎপর্য্য এই যে, চিত্তবৃত্তিতে তিনি অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ অধিষ্ঠিত। তাঁহাকে বনমালী বলা হইয়াছে, কারণ তিনি বনে (নির্জ্জনে) ভক্তের নিকট প্রকটিত হন।

দ্বিতীয় শ্লোকটীর অর্থ—

কালিন্দী (নির্ম্মলা উপাসনা), তস্যাঃ জলকল্লোলাঃ (মহাতরঙ্গাঃ) তৎসঙ্গী মারুতঃ (নিশ্চলঃ প্রাণবায়ুঃ) তৎসেবিতং কৃষ্ণং চেতসা চিন্তয়ন্ নরঃ সংসৃতেঃ (সংসারাৎ) মুক্তো ভবতি। যে ব্যক্তি নির্ম্মল উপাসনা দ্বারা একাগ্রমনে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন তিনি মুক্তিলাভ করেন।"

গীতার কৃষ্ণও বৈদিক কৃষ্ণ। ভগবান্ অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য কার্য্য করা বিধেয় এই কথা বলিয়া আপনার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াছেন, যথা :—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥"

আমি ভিন্ন সংসারের স্বতন্ত্র কারণ নাই। মণি সকল যেমন সূত্রে প্রোথিত থাকে তদ্রূপ এই বিশাল সংসার আমাতে রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, শিব, জাভে, জুপিটার সব এক। এই কথা শ্রীকৃষ্ণ নিম্নলিখিত শ্লোকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন :—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

অন্য দেবতার ভক্ত যে সকল লোক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে পূজা করে, তাহারাও আমাকেই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অন্য এক স্থলে তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন :—

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥"

যে যে ভক্ত আমার যে যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধাসহকারে অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি তাহাদের সম্বন্ধে সেই সেই মূর্ত্তি সম্পর্কীয়া অচলা শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি। কঠোপনিষদে কথিত আছে—

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান। সাধারণ লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী জ্ঞানচক্ষে তাঁহাকে একাগ্রতাগুণে দেখিতে

পান। এই একাগ্রতাগুণে ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও নারদ, দেবল প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন। তিনি বনে, উপবনে, সমুদ্রে, আকাশে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন।

স্বগৃহে শঙ্কর।

(ঋষি-সমাগম)

(২)

(শ্রীমতী—)

মাতা ও পুত্র এইরূপে বিষণ্ণ মনে কাল কাটাইতেছেন। শঙ্কর আর জননীকে কিছু বলেন না, বিশিষ্টাদেবীও সে কথা আর তুলেন না, মনে করেন বালক শঙ্কর যদি বিষয়টী ভুলিয়া যায়।

একদিন দ্বিপ্রহরে বিশিষ্টাদেবী শঙ্করের পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন শঙ্কর নিজ আসনে গালে হাত দিয়া বসিয়া মুদিতনয়নে কি যেন চিন্তা করিতেছেন, উন্মুক্ত পুস্তকের পত্রাবলি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া তিনি শঙ্করকে একভাবেই অবস্থান করিতে দেখিয়া আর নীরব না থাকিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন, কিন্তু শঙ্করের কোনরূপ সাড়া না পাইয়া তাঁহার কাছে গিয়া গায়ে হাত দিয়া আবার ডাকিলেন। শঙ্কর তখন যেন চমকিত ভাবে চাহিলেন। বিশিষ্টাদেবী দেখিলেন, অশ্রুপ্লাবনে শঙ্করের চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে ; ব্যাকুলতা ও দুশ্চিন্তায় তিনি যেন মর্ম্মপীড়িত।

পুত্রের এই ভাব দেখিয়া তিনি তখন আর কিছু না বলিয়া বিষণ্ণচিত্তে নিজকক্ষে ফিরিয়া আসিলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে শঙ্করকে নিকটে আহ্বান করিলেন। শঙ্কর জননীর নিকটে আসিয়া বসিলেন।

বিশিষ্টা কথায় কথায় বলিলেন, "বাবা! তোমার কি হইয়াছে? তুমি সর্ব্বদা বিমর্ষ হইয়া থাক কেন? আমি দেখিতে পাই তুমি যেন চিন্তাকুল। পূর্ব্বের ন্যায় তোমার আর সে স্ফূর্ত্তি নাই, উদ্যম উৎসাহ নাই, পাঠে আসক্তি নাই; তুমি কি ভাব আমাকে বল। তোমার এই ভাব দেখিয়া আমি বড় কষ্ট পাই।"

জননীর কথায় শঙ্করের হৃদয়নিরুদ্ধ বন্যাস্রোত যেন প্রকাশের পথ পাইল। তিনি মস্তক অবনত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা! আমার মন সেইদিন হইতে দিন দিন ব্যাকুল হইতেছে। আমি আমার কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়াও সাধনের কোন সুযোগ দেখিতেছি না। তাই ভাবিয়া আমার মন এরূপ হইয়া পড়িতেছে।"

বিশিষ্টা বলিলেন, "বাবা! তুমি কি করিতে ইচ্ছা কর তাহাই আমাকে বল, আমি তোমার সমুদয় সুবিধা করিয়া দিব। কিন্তু এরূপ ভাবে থাকিয়া শেষে কি একটা বিষম রোগ করিয়া বসিবে।"

জননীর কথায় শঙ্কর ভাবিলেন ইহাই উত্তম সুযোগ।

এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "মা! শাস্ত্রে বলে মানব সন্ন্যাস ব্যতীত মোক্ষলাভে অধিকারী হয় না এবং যোগ অপেক্ষা উত্তম সাধনাও নাই। অতএব মা! আপনি যদি অনুমতি করেন ত আমি সন্ন্যাস লইয়া যোগ সাধন করি।"

বিশিষ্টা শিহরিয়া উঠিলেন—বলিলেন, "সন্ন্যাস! কেন বাবা! কিসের দুঃখে তুমি সন্ন্যাস লইবে? সন্ন্যাস না লইলে মোক্ষ হয় না, একথা তোমায় কে বলিল? এই যে এত যোগী ঋষি ছিলেন, ইঁহাদের কি মোক্ষ হয় নাই, ইঁহারা কি সন্ন্যাস লইয়াছিলেন? আর কলিকালে ত সন্ন্যাস লইতে শাস্ত্রেরই নিষেধ আছে। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ হইয়া এরূপ ইচ্ছা করিতেছ কেন? ধর্ম্ম কর্ম্ম কর, পিতৃপিতামহগণ যে পথে গিয়াছেন সেই পথে চল—পরিণামে মোক্ষ পাইবে।"

শঙ্কর বলিলেন, "মা! সন্ন্যাস কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় আপনি জানেন না, তাই এরূপ কথা বলিতেছেন। সন্ন্যাস বলিতে ত্যাগ বুঝায়। দেখুন মা, ভগবান্‌কে ভুলিয়া সংসারকে অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই

আমাদের এই বন্ধন, আর সংসারকে ভুলিয়া ভগবান্‌কে অবলম্বন করিতে পারিলে আমাদের মুক্তি হয়—ইহাই সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সংসারকে ভুলা অর্থাৎ সংসার ত্যাগ বা সন্ন্যাস; এই জন্য শাস্ত্রে আছে সন্ন্যাস ব্যতীত মোক্ষ হয় না। মা! ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে সাক্ষাৎভাবে মোক্ষ হয় না। উহাতে পুণ্য হয়, সেই পুণ্যবলে স্বর্গাদিতে ও ব্রহ্মলোকে যায়, সেখানে জ্ঞান অভ্যাস করিয়া ব্রহ্মার সহিত বহুকাল পরে মোক্ষ লাভ করে। অথবা সেই পুণ্য ফলে ইহলোকেই ঋষিকুলে জন্ম হয়। তথায় জ্ঞান লাভ করিয়া সন্ন্যাস দ্বারা মোক্ষলাভ হয়। কিন্তু মা! স্বর্গাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত স্থান হইতে পতনের সম্ভাবনা আছে। সন্ন্যাস দ্বারা জ্ঞান অভ্যাস না করিয়া যে ব্যক্তি কেবল পুণ্য কর্ম্ম করে, তাহার পুণ্য ক্ষয় হইলে আবার সংসারে আসিতে হয়। কিন্তু সন্ন্যাস-পূর্ব্বক জ্ঞান অভ্যাস করিলে ইহলোকেই সদা সদা মুক্তি হয়। যে সব কর্ম্মে পুণ্য হয় তাহারা সন্ন্যাসের বিরোধী, সুতরাং পুণ্য কর্ম্ম ও সন্ন্যাস এক ব্যক্তির পক্ষে এককালে ঘটে না। সন্ন্যাস না লইয়া জ্ঞান অভ্যাস বা পুণ্য কর্ম্ম করিতে গিয়া জ্ঞান অভ্যাস ভালরূপ হয় না। এজন্য মা! মোক্ষের জন্য যত্নবান্ হইলে বা ভগবৎ সাক্ষাৎকারের জন্য চেষ্টা করিলে সন্ন্যাসই অবলম্বন করিতে হয়।"

বিশিষ্টা বলিলেন, "তা বাবা! আমি আগে মরি, তাহার পর তুমি সন্ন্যাস লইও। আমি থাকিতে আর ওরূপ করিও না।"

শঙ্কর বলিলেন, "মা! সন্ন্যাস যদি লইতে হয় তবে আমার এই আট বৎসর বয়সেই লওয়া উচিত। কারণ, মানুষের আয়ু একশত বৎসর ধরিয়া, শাস্ত্রে তাহার চারিভাগের এক এক ভাগে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের বিধি দেখা যায়। আমি যদি বত্রিশ বৎসর বাঁচি তাহা হইলে আট বৎসরে ব্রহ্মচর্য্য, ষোল বৎসরে গার্হস্থ্য, চব্বিশ বৎসরে বানপ্রস্থ করিয়া সন্ন্যাস লইতে হয়। তন্মধ্যে আমার ভাগ্যক্রমে আট বৎসরেই ব্রহ্মচর্য্য শেষ হইয়াছে। কিন্তু মা! ষোল বৎসরে কিরূপে গার্হস্থ্য শেষ হইবে? ইহা যে অসম্ভব। সুতরাং আমার এইবার সন্ন্যাস লওয়াই উচিত। শাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মচর্য্যের পর বৈরাগ্য হইলে একেবারে সন্ন্যাস লওয়া যাইতে

পারে। অতএব মা! আপনি আমায় অনুমতি দিন, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করি। সন্ন্যাসী হইয়া যোগ সাধন করিতে পারিলে যদি অল্পায়ুযোগ খণ্ডিত হয়, তাহারও চেষ্টা করা হইবে।

শঙ্করের কথা শুনিয়া বিশিষ্টাদেবীর অন্তরে কত কি চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। তিনি একবার ভাবিলেন—একি হইল—এই দুধের ছেলে সন্ন্যাসী হইতে চায়! নিশ্চয়ই অধিক অধ্যয়নের পরিশ্রমে তাহার বুদ্ধি বিকলিত হইয়াছে। আট বছরের ছেলে সন্ন্যাস লইবে! একি ছেলেখেলা! কোথায় যাইবে, কাহার নিকট থাকিবে, কোথায় গুরু পাইবে, কি খাইবে, কি করিবে সন্ন্যাসীর কিছুই স্থিরতা থাকে না। সুতরাং যে এখনও নিজের শরীরের যত্ন নিজে করিতে জানে না, ক্ষুধা পাইলে চাহিয়া খাইতে জানে না, দুধটুকু মুখে তুলিয়া দিলে তবে ভাল করিয়া খায়, সে কিনা সন্ন্যাসী হইতে চায়! হাজার হোক ছেলে মানুষ, এই এক খেয়াল হইয়াছে।

তিনি ক্ষণমধ্যে মনে মনে এই সব আলোচনা করিয়া শঙ্করকে বলিলেন, "আচ্ছা বাবা! বল দেখি তুমি সন্ন্যাসী হইয়া কি করিবে, কোথায় যাইবে, কাহাকেই বা গুরু করিবে, ঠিক করিয়াছ?"

শঙ্কর তখন ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "মা! শুনিয়াছি নর্ম্মদাতীরে গোবিন্দপাদ নামে এক মহাযোগী আজ সহস্র বৎসর যোগসমাধিতে বসিয়া আছেন। তিনি সিদ্ধ পুরুষ—যেমন পণ্ডিত, তেমনি যোগী, তেমনি জ্ঞানী। তাঁহার মত দ্বিতীয় ব্যক্তি আর এখন নাই। মা! আপনার অনুমতি পাইলে আমি তাঁহার নিকট যোগ শিক্ষা করিব।"

পুত্রের কথায় বিশিষ্টাদেবীর বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তিনি ভাবিলেন আমরা ত বুড়া হইয়া মরিতে চলিলাম, কিন্তু কোথায় নর্ম্মদাতীরে কে গোবিন্দ যোগী আছেন কাহারও মুখে কখন শুনিলাম না, আর এই বালক এসব সন্ধান কিরূপে পাইল!

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বিশিষ্টা বলিলেন, "বাবা! তা যেন হইল, কিন্তু তুমি বুদ্ধিমান্, লেখাপড়া শিখিয়াছ, বল দেখি তোমার মত বয়সে কি কেহ সন্ন্যাস লইয়া থাকে? সন্ন্যাসের যে কত কঠোরতা তাহা কি তুমি

শুন নাই, তোমার মত বালক কি তাহা সহ্য করিতে পারে? রৌদ্র তাপ নানাদেশের জল, ভিক্ষান্ন ভোজন, কখন বা অনশন, বৃক্ষতলে শয়ন ইত্যাদি কি বালক-শরীরে সহ্য হয়? বড় হও পরে যাহা হয় করিও।"

শঙ্কর বলিলেন, "মা! আপনি আমার শরীরের কষ্টের বিষয় চিন্তা করিয়া আমায় নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু মা! যাহারা পরের অনিষ্ট না করিয়া আপন মঙ্গলের চেষ্টা করে ভগবান্ তাহাদের সহায় হন। আপনি আমায় অনুমতি দিন, দেখিবেন আমার কোন বিপদাপদ্ হইবে না। আর যদি বিপদ্ হইবার হয়, গৃহে বসিয়া থাকিলেও কেহ তাহা নিবারণ করিতে পারিবে না। সুতরাং বিপদের আশঙ্কায় সৎকর্ম্মে বিরত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।"

বিশিষ্টা বুঝিলেন পুত্রকে বুঝান আর তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে।

এই ভাবিয়া তিনি নীরবে কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন এবং গোপনে শঙ্করের অধ্যাপকের নিকট সমুদয় নিবেদন করিয়া পত্র পাঠাইলেন। জননীর সহিত শঙ্করের এই কথোপকথনের বিষয় তাঁহাদের পরিচারিকার কৃপায় পল্লীর অনেকেই জানিতে পারিলেন। আট বৎসরের ছেলে সন্ন্যাসী হইতে চায়, একথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। কেহ কেহ বা কথাটা সত্য কি মিথ্যা জানিবার জন্য বিশিষ্টার গৃহে উপস্থিত হইলেন। বিশিষ্টাদেবীর মুখে সকল শুনিয়া তাঁহারা অবাক্ হইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে নানাজনে নানারূপ পরামর্শ দিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, "ও শঙ্করের মা তুমি কিছু ভেবোনা, ছেলেমানুষ একটা আবদার নিয়েছে, দুদিন বাদে ভুলে যাবে।" আবার কেহ বল্লেন, "হয়ত কোনও সাধু সন্ন্যাসী দেখে সাধু সাজ্‌তে সাধ হয়েছে তুমি দুদিন ঘরে সন্ন্যাসী সাজাইয়া দিও তাহলেই সাধ মিটবে।" অপরে বল্লেন, "দিদি! এক কাজ কর না কেন, অমুক গাঁয়ে একজন খুব গুণী আছে, সে অনেক রকম মাদুলী ঔষধ পত্র দেয়, তার কাছ থেকে মাদুলী এনে পরাও, ছেলে বশ হবে।" আর একজন বলিলেন "তার চেয়ে দিদি! তুমি একটী টুক্‌টুকে মেয়ে দেখে শঙ্করের বিয়ে দাও, তাহলেই সব সেরে যাবে।" কেহ বলিলেন, "আহা, ৮।৯ বছরের ছেলে বৌয়ের কি বুঝে, যে বউ এনে দিলে ঘরে থাক্‌বে?" তদুত্তরে

পূর্ব্বোক্ত রমণী বলিলেন, "তা কেন, ছেলেমানুষ, শ্বশুরবাড়ীর লোকের আদর যত্ন করিবে, সর্ব্বদা লইয়া যাইবে, কত কি জিনিস পত্র দিবে, তাহাতেই ওসব আবদার ভুলে যাবে।"

এক প্রবীণা রমণী বিশিষ্টার নদীস্নানের সঙ্গিনী ছিলেন। তিনি সকলের সকল রকম মন্তব্য শুনিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, "ওরে বাছারা, তোরা সব কি বাজে কথা বলছিস্? শঙ্কর কি তোর আমার ছেলের মত সাধারণ ছেলে। ও ছেলের যে সকলই অসাধারণ, সকলই অদ্ভুত। যে ছেলে দশহাজার সুবর্ণ মুদ্রা হেলা করে পায়ে ঠেলেছে, তাকে কিসের লোভ দেখিয়ে তোরা বশ কর্‌বি?" এই বলিয়া তিনি বিশিষ্টাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি বরং এক কাজ কর, গ্রামের বড় বড় পণ্ডিতদের আনিয়ে তাঁদের কাছে শঙ্করকে বসিয়ে সব কথা বল। তাহলে চাই কি শঙ্কর তাঁদের কথায় সংসারী হবে।"

বিশিষ্টাদেবী এতক্ষণ এই রমণীদিগের বাক্যস্রোতে যেন হাবুডুবু খাইতে-ছিলেন। এক্ষণে তিনি যেন অকূলে কূল পাইলেন এবং উক্ত রমণী যে তাঁহার শঙ্করের অসাধারণ চরিত্রের বিষয় বুঝিয়াছেন তাহা জানিয়া তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না।

অনন্তর তিনি গ্রামস্থ পণ্ডিতগণকে সমাদরপূর্ব্বক গৃহে আনয়ন করিলেন। তাঁহারা শঙ্করকে যথেষ্ট উপদেশ দান করিয়া অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু শঙ্কর সন্ন্যাস বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তিনি কিছুতেই বুঝিলেন না, তথাপি পণ্ডিতগণের কোনরূপ অমর্য্যাদা করিলেন না। বিনীতভাবে নত-মস্তকে সকলেরই বক্তব্য শ্রবণ করিয়া নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন এইরূপে গত হইল। বিশিষ্টাদেবী শঙ্করের অধ্যাপকের নিকট হইতে পত্রোত্তর পাইলেন। অধ্যাপক শঙ্করের মনোভিলাষ শ্রবণ করিয়া তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন, "মা! আপনি শঙ্করের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। আপনি রত্নপ্রসবিনী, সাক্ষাৎ শঙ্কর-জননী এ কথা বিস্মৃত হইবেন না। শঙ্কর হইতে আপনার চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে। শঙ্করকে সাধারণ পুত্র ভাবিয়া তাহার বিরহচিন্তায় কাতর হইবেন না। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই, সেজন্য বৃথা চিন্তায় ব্যাকুল

কেন ? মা ! শঙ্কর আপনার একার নহে, শঙ্কর যে জগতের। সময় হইলে সকলই দেখিতে বুঝিতে পারিবেন। এক্ষণে ভগবৎপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া নির্ভয়ে কার্য্য করিয়া যাউন। শঙ্কর হইতে আপনার ভয় বা চিন্তার কোনও কারণ নাই। আপনি মন শান্ত করুন।”

বিশিষ্টাদেবী অধ্যাপকের পত্র পাইয়া অবাক্ ও আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তিনি অতঃপর কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু একদিন কথায় কথায় শঙ্করকে বলিলেন, “দেখ বাবা! আমি মৃত্যুকালে তোমায় সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি দিয়া যাইব। এখন আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন আর ও কথা তুলিও না। আমার বয়স হইয়াছে, আর কতদিনই বা বাঁচিব ? তারপর তুমি যাহা ইচ্ছা করিও। এখন তুমি পূর্ব্বের ন্যায় লেখাপড়া লইয়াই থাক, বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মে আর তোমার প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাস লইয়া যাহা করিতে এক্ষণে গৃহে বসিয়াও তাহাই কর। তাহাতে তোমার কোনও ক্ষতি হইবে না। তোমাকে ত্যাগ করিয়া আমি সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিতে পারিব না। সুতরাং একান্ত অনুরোধ সন্ন্যাসের কথা তুলিয়া আমাকে আর পাগল করিও না।”

শঙ্কর বুঝিলেন জননীকে আর বুঝাইয়া কোন ফল ফলিবে না, এখন ভগবান যদি দয়া করেন তবেই পথ পাইব, নচেৎ নিরুপায়

(ক্রমশঃ)

৺দ্বারকাধাম ও কয়েকটি তীর্থ দর্শন ।

(শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রাতে উঠিয়া সহর ভ্রমণে বাহির হইলাম। দ্বারকা একটি ছোটখাট সহর। বাড়িগুলি সব পাথরের। দোকানপাট, পোষ্টআফিস, স্কুল প্রভৃতি আছে। এখানে অনেক দ্রব্য পাওয়া যায়। সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি সমস্তই উষর ভূমি—কিছুই জন্মে না। শাক সব্জি সমস্ত দূর হইতে আমদানী করা হয়। এখানে একটিমাত্র বাজার; তাহাও বেলা ৮টার মধ্যে উঠিয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা মৎস্যাশী নহে বলিয়া মাছের বাজার নাই। এখানে পানীয় জলের বড় কষ্ট; কারণ যত কূপ আছে তাহাদের সকলেরই জল অল্পবিস্তর লবণাক্ত। এই কারণে যাত্রিগণের বড়ই অসুবিধা হইয়া থাকে। কয়েকটি মহানুভব ব্যক্তি এই অভাব নিবারণার্থ দূর হইতে যতটা সম্ভব কম লোণা জল আনাইয়া সত্র খুলিয়া দিয়াছেন। স্থানীয় অবস্থাপন্ন অধিবাসিগণ ইহার কোন জলই পান করেন না। তাঁহারা বর্ষাকালে বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখেন এবং সমস্ত বর্ষ ধরিয়া সেই জল পান করেন। এই জল বেশ সুস্বাদু। এখানকার পথ ঘাট ভাল এবং স্থানটিও স্বাস্থ্যকর। সহরের মধ্যে অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মঠ ও মন্দিরাদি আছে। এখানকার লোকগুলি শান্তশিষ্ট ও সঞ্চয়শীল। পোষাক-পরিচ্ছদে ইহাদের ঐশ্বর্য্য বুঝা যায় না, কারণ ইহারা অতি সাদাসিধা পোষাক ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকগণ অধিকাংশই সুশ্রী এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকে। শুনিলাম এখানে কন্যার বিবাহে তাহার পিতাকে অলঙ্কার ও পরিচ্ছদে অন্ততঃ ৩০০০৲ টাকা পণ দিতে হয়। ইহার কমে বিবাহ হয় না। বিবাহ ব্যাপারই ইহাদের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দেয়।

আজ আমরা রণছোড়জীর পূজা করিব। ত্বরায় স্নান সারিয়া মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সকল যাত্রীই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে দেবমূর্ত্তি স্পর্শ

ও পূজা করিতে পাইয়া থাকে। অবশ্য ইহার জন্য কিছু প্রণামী দিতে হয়। মন্দিরের একপার্শ্বে কয়েকজন কর্ম্মচারী খাতাপত্র লইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা নূতন পূজার্থী যাত্রিগণের নিকট হইতে পূজার প্রণামীর টাকা জমা করিতেছেন। পাদস্পর্শ ও পূজার জন্য ॥১০ আনা দিতে হয়; স্নান ও আরতি করিতে হইলে আরও ১।০ টাকা দিতে হয়। এই টাকা অগ্রে জমা না দিলে পূজার্থীকে গর্ভগৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না; কিন্তু যাত্রী বিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা পূজার জন্য তুলসী পত্র ও পুষ্প হস্তে মন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে কর্ম্মচারিগণ আমাদের নিকট প্রণামীর টাকা চাহিল; তখন পূজারীগণের মধ্যে একজন বলিল, "ইঁহাদের নাম লিখিয়াই, ছাড়িয়া দেওয়া হউক পরে টাকা লইলেই চলিবে।" এই হেতু আমরা প্রণামী দিবার অগ্রেই পূজা করিতে পাইলাম।

গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, রণছোড়জীর সমস্ত বেশ উন্মোচিত হইয়াছে, মূর্ত্তি সম্পূর্ণ নগ্ন। কৃষ্ণ-প্রস্তরের অতি মনোমোহন চতুর্ভুজ মূর্ত্তি — মল্লবেশ—হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, গলে বৈজয়ন্তী মালা ও কৌস্তুভ মণি। সমস্তই অতি সুন্দররূপে ক্ষোদিত। মূর্ত্তি উচ্চতায় ২½ বা ৩ ফিট এবং আন্দাজ ৪ ফুট উচ্চ বেদীর উপর স্থাপিত। রণছোড়জীর কোমরের উপর একটি ভল্ল চিহ্ন আছে; ইহার বৃত্তান্ত পরে বলিব। আমরা সহস্তে রণছোড়জীকে সুগন্ধী তৈল মাখাইয়া দধিদুগ্ধাদির দ্বারা উত্তমরূপে স্নান করাইয়া দিলাম। তৎপরে পূজারী মহাশয় আমরা ঠাকুরের জন্য যে সব বস্ত্র লইয়া গিয়াছিলাম, সেগুলি শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গে উত্তমরূপে পরাইয়া দিলেন। অতঃপর আমরা যথারীতি পুষ্পাদি লইয়া পূজা করিলাম।

পূজাদি সাঙ্গ করিয়া আমরা রাণীমহলে গেলাম। তথায় যে কয়টি মূর্ত্তি আছে তাঁহাদের সকলকে স্বহস্তে পূজা করিতে হইলে সাড়ে চারি আনা মাত্র প্রণামী দিতে হয়। এখানকার কার্য্য সমাধা করিয়া বাসায় ফিরিলাম। যাহা হউক এই প্রদেশের বিশিষ্টতা এই যে যাত্রিগণ স্বহস্তে ইচ্ছামত দেবতার পূজা করিতে পায়। ইহাতে যাত্রীর মন প্রীত থাকে। ঠাকুরের ভোগরাগ দুই প্রকার হইয়া থাকে। এক

প্রকার—পুরী, লাড্ডু, বরফি, পেড়া, মিচরী ইত্যাদি। ইহা পূজারীগণের তরফ হইতে হয়। আর এক প্রকার ভোগ অন্ন, ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি। ইহা সারদা মঠের তরফ হইতে হইয়া থাকে। যাত্রিগণ যেরূপ ইচ্ছা ভোগ দিতে পারেন। মন্দিরের উপর সারদামঠের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব বর্ত্তমান; কিন্তু পূজারীগণ বল্লভাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব। সারদা মঠের মোহান্ত শ্রীশঙ্করাচার্য্যজীর বয়স অধিক নহে, প্রৌঢ়ে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহাকে সুপণ্ডিত এবং দয়াবান্ বলিয়া বোধ হইল। বাঙ্গালীগণকে তিনি বড় যত্ন করেন দেখিলাম। আমাদিগকে তাঁহার ভালবাসার একাংশ দান করিয়া মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ আমাদের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা কহিতেন ও উপদেশ দিতেন, এবং বরোদা মহারাজের লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ দেখাইবার জন্য মহারাজের এডিকংকে একখানি সুপারিস-পত্র দিয়াছিলেন। তাঁহার কোন শিষ্যাদি দেখিলাম না।

বৈকালে আমরা রুক্মিণী দেবীর মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। দ্বারকানাথের মন্দির হইতে রুক্মিণী দেবীর মন্দির প্রায় ১॥ মাইল উত্তরে এক প্রান্তর মধ্যে অবস্থিত। এ মন্দিরের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ নজর আছে বলিয়া বোধ হয় না। পূজার কোন ঘটা নাই, যাত্রীও বেশী আসিতে দেখা গেল না। যাহাই হউক, রুক্মিণী দেবীর মন্দির দ্বারকানাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণ মধ্যে না হইয়া কেন যে এত দূরে হইল তাহার কোন কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাইলাম না। এ মন্দিরের কিছু দূরে বরোদা মহারাজের সৈন্যগণের ছাউনি। পাঠকগণ মনে রাখিবেন দ্বারকা ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ বরোদা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সন্ধ্যা হইতেছে দেখিয়া আমরা ফিরিলাম এবং রণছোড়জীর আরতি দেখিয়া বাসায় আসিলাম। আরতির সময় ঠাকুরের প্রতিদিন বিভিন্ন রকম বেশভূষা দেখিতাম।

এখানে আসিলে দেবদর্শনাদি ব্যতীত চক্রতীর্থে স্নান ও শ্রাদ্ধ করিতে হয়। পরদিন প্রাতে আমরা এই কার্য্য সম্পন্ন করি। মন্দিরের অদূরে গোমতী নামক একটী ছোট নদী সাগরে আসিয়া মিলিতা হইয়াছে। সঙ্গমের নিকট খানিকটা স্থান দুইধারে বাঁধান; এই অংশকে চক্রতীর্থ কহে। স্থানীয় লোকে বলে যে, শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে সুদর্শনচক্র এইস্থানে

জল মধ্যে অন্তর্হিত হয়; কিন্তু মহাভারতের সহিত এই প্রবাদের মিল নাই।

চক্রতীর্থে সহরের দিকে ৩।৪টি ঘাট আছে; তন্মধ্যে একটি ঘাট চাঁদনীযুক্ত। এইখানেই লোকে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে। মুণ্ডিত-মস্তক হইয়া চক্রতীর্থে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হয়। চক্রতীর্থে স্নান অমনি হয় না; লোকপ্রতি এক টাকা কর লাগে। কিছুকাল পূর্ব্বে দুই টাকা কর ছিল, এবং আরও পূর্ব্বে কর ততোধিক ছিল। এই কর বরোদারাজের প্রাপ্য। বুঝিলাম না হিন্দু রাজা হইয়া কিরূপে বরোদারাজ এই কর হিন্দু তীর্থযাত্রীর নিকট হইতে গ্রহণ করেন। কোথায় তিনি ধর্ম্মের সহায়ক হইবেন না তাহার প্রতিবন্ধক! অনেক দরিদ্র যাত্রী করের ভয়ে এখানে স্নান করিতে আসে না। গোমতী ঘাটের উপর সঙ্গমনারায়ণ, গোমতী, গোবর্দ্ধনধারী প্রভৃতির মন্দির আছে। গোমতী নদী বহুপ্রকার মৎস্যে পূর্ণ; তাহারা নির্ভয়ে স্ফটিক-স্বচ্ছ জলে খেলা করিতেছে। মানুষকে বিশেষ ভয় করে না, কারণ, এখানকার লোকে মাছ ধরে না। অধিকন্তু তাহারা আহারও যথেষ্ট পায়, কারণ যাত্রিগণের শ্রাদ্ধাবশিষ্ট পিণ্ডাদি সমুদায় এই জলেই নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

এখানে আসিলে যাত্রিগণ প্রায়ই বেটদ্বীপ বা বেটদ্বারকা, গোপীতলাও ও নাগেশ দর্শন করিয়া যান। এই কয়েকটিই দ্বারকার উত্তরে ২০ মাইলের মধ্যেঅবস্থিত। ১০।১১ মাইল দূরে নাগেশ মহাদেবের মন্দির—ইনি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। "নাগেশম্ দারুকবনে।" এই মন্দিরটি প্রান্তর মধ্যে অবস্থিত, নিকটে কোন গ্রামাদি নাই; এইজন্য ইহার কোন জাঁকজমক নাই। মন্দিরের বাহিরে একটি পাথরের বৃষ এবং তাহার পার্শ্বে প্রস্তরে বাঁধান একটি কুণ্ড। কথিত আছে, প্রাচীন কালে দারুক নামে এক দুর্দ্দান্ত রাক্ষস এই বনে বাস করিত; সে সুপ্রিয় নামক এক শিবভক্তকে এখানে ধরিয়া আনিয়া বন্দী করিয়া রাখে। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য মহাদেব সেই রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এখান হইতে ৪ মাইল দূরে গোপীতলাও নামক পুষ্করিণী। পুকুরটির ধারে কয়েকটি মন্দির আছে, তন্মধ্যে গোপীনাথজীর

মন্দিরই প্রধান। এখানে দু একটি মঠ ও ধর্ম্মশালা আছে। প্রবাদ আছে যে, বৃন্দাবনের গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবসানে এখানে আসিয়া দেহত্যাগ করেন। এই পুষ্করিণীর মৃত্তিকা সাধারণ মৃত্তিকার ন্যায় কালো নহে, হল্‌দে। ইহাকে গোপীচন্দন বলিয়া থাকে, এবং উহা তিলকের জন্য ব্যবহৃত হয়। যাত্রীমাত্রেই এই মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। এখান হইতে মাইলখানেক উত্তরে যাইলে সমুদ্রের একটি খাড়ীর নিকট আসা যায়। তথা হইতে নৌকাযোগে বেটদ্বীপ ৫ মাইল। এই কয়টি এক যাত্রায় দেখিতে হইলে গরুর গাড়িতে যাওয়া আবশ্যক। অবশ্য ইহাতে সময় কিছু বেশী লাগে ; দুই দিনের কমে আর কিছুতেই হয় না। শুধু বেট যাইবার জন্য আজকাল মোটর গাড়ী হইয়াছে। ইহাতে একদিনেই যাতায়াত হয়। যাওয়া-আসায় আন্দাজ ৩ ঘণ্টা লাগে ; ভাড়া তিন টাকা মাত্র। আমরা মোটরেই গিয়াছিলাম।

বেট দ্বারকার প্রাচীন নাম শঙ্খদ্বার। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খাসুরকে বধ করিবার পর তাহাকে এইখানে নিক্ষেপ করেন। তাহার মেদাস্থি হইতে এই দ্বীপ সৃষ্ট হয়। পূর্ব্বকালে এখানে বোম্বেটে জলদস্যুগণের বাস ছিল। বোম্বেটের দ্বীপ বলিয়াই বোধ হয় ইহার বর্ত্তমান নাম এইরূপ হইয়াছে। ইংরাজেরা উহাকে Pirate's Island বলে। সহরের পশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন বোম্বেটেদিগের কুল্লোরকোট নামে এক ভীষণ দুর্গ আছে। এই দ্বীপে প্রবেশ করিতে বা বাহির হইতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে দুই পয়সা করিয়া মুন্সিপালের কর দিতে হয়।

আমরা বেলা ১০টার সময় এখানে পৌঁছাই এবং সমুদ্রের খাড়ীতে স্নান সারিয়া মন্দির দর্শন করিতে যাই। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে বরোদা মহারাজার দপ্তরখানা ; দু একটি কর্ম্মচারী ফটকের সম্মুখে বসিয়া আছেন। ইঁহারা গৃহস্থ বা সক্ষম সন্ন্যাসী যাত্রিগণের নিকট হইতে মন্দির প্রবেশের দর্শনীস্বরূপ এক টাকা করিয়া কর আদায় করেন, এবং কেহ এই কর দিতে অস্বীকার করিলে বা অক্ষম হইলে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেন না। দেশীয় অপর কোন রাজ্যে এই অদ্ভুত জুলুম দেখি নাই। দেবদর্শন করিতে এত অধিক পরিমাণ কর ভারতে আর কুত্রাপি নাই। বরোদা রাজ্যের

আয় কম নহে, তবে এরূপ জবরদস্তী কেন? বাস্তবিক মহারাজের এই আচার বড়ই নিন্দনীয়। পূর্ব্বে নাকি এই কর আরও বেশী ছিল। ফটকের বিপরীত দিকে এক গাছতলায় দ্বারকার ছাঁপ দিবার বন্দোবস্ত দেখিলাম। সে কি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার! লোহার শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বেশ ভাল করিয়া পোড়াইয়া দাগ লইতে ইচ্ছুক যাত্রীর বাহুমূলে চাপিয়া ধরা হয়। ঐ স্থানে তখনই ফোস্কা হইয়া পড়ে এবং উহা সারিতে অনেক সময় লাগে। আমি দেখিয়াছি, কাহারও কাহারও এক মাস পর্য্যন্ত লাগিয়াছে। এই ছাপ লইতে আবার দুই চারি আনা পয়সাও লাগে!

আমরা উক্ত দর্শনী জমা দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। সাধারণ মন্দিরের ন্যায় এই মন্দিরের কোন প্রকার চূড়াদি নাই, এইজন্য দূর হইতে কোথায় মন্দির তাহা বুঝিতে পারা যায় না। মন্দিরটি বেশ বড় এবং কয়েকটি মহলে বিভক্ত, ইহার মেঝে সুন্দর মার্ব্বেল পাথরে বাঁধান। কোন মহলে রণছোড়জী, কোন মহলে রুক্মিণীদেবী, কোন মহলে সত্যভামা, কোথাও রাধারাণী, কোথাও লক্ষ্মীদেবী বিরাজ করিতেছেন। প্রবাদ—এখানকার রণছোড়জীর মূর্ত্তিই আসল মূর্ত্তি। ইনি পূর্ব্বে দ্বারকায় ছিলেন, পরে কোন সময়ে মুসলমানগণের অত্যাচারভয়ে ইঁহাকে এখানে আনিয়া লুকাইয়া রাখা হয়। তদবধি ইনি এখানেই আছেন। এখানে রণছোড়জীকে স্বহস্তে পূজা করিতে হইলে ॥০ আনা কর দিতে হয়। আমরা সকলে এই কর জমা দিয়া ভগবানের পূজা করিলাম। ঠাকুরঘরের ভিতর দিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। ঐ সিঁড়ি দিয়া উঠিলে ঠাকুরের শয়ন ঘর দর্শন হয়। এখান হইতে বাহির হইয়া অন্যান্য মহলে অপরাপর দেবদেবী দর্শন করিলাম। দ্বারকা অপেক্ষা এখানকার সকল দেবদেবীরই অলঙ্কার ও আসবাব অধিক। এখানকার পূজারীগণেরও বেশভূষাও খুব জমকাল। ইহারা সকলেই বেশ ভদ্র ও বিনয়ী। পূজা ও দেবদর্শনাদিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাটিয়া গেল। পরে মন্দির হইতে বাহির হইয়া আহারের চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম। শুনিলাম এখানে দুএকটি ঠাকুরবাটী আছে যেখানে কিছু দিলে প্রসাদ মেলে। আমাদের পক্ষে ইহাই সুবিধা। এই জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া "গোঁসাই হাবেলী" নামক এক ঠাকুর বাটীতে

উপস্থিত হইলাম। কিন্তু শুনিলাম, বেলা অধিক হওয়ায় প্রসাদ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে; যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা যৎসামান্য। আমরা তাহাই লইলাম এবং দৈবক্রমে উহাতেই আমাদের যথেষ্ট হইল। অতি উত্তম প্রসাদ—লুচি, পাঁপর ও পায়েস নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি; জিনিষের পক্ষে মূল্য অতি সামান্য। যাহা হউক এইরূপ ঠাকুরবাড়ী যে যাত্রিগণের পক্ষে কতদূর উপকারী তাহা বলা বাহুল্য। এক দিকে পয়সা কম লাগে, অপরদিকে আহার্য্যদ্রব্যগুলি খুব ভাল, কোন অসুখ করে না। আহারাদি সম্পন্ন করিয়া আমরা সমুদ্রতীরে বেড়াইতে লাগিলাম, এবং সন্ধ্যার সময়ে মোটর-গাড়িতে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন আমরা দ্বারকা ত্যাগ করিয়া প্রভাস যাত্রা করি। যাইবার দুইটি পথ আছে, একটি জলপথে এবং দ্বিতীয়টি স্থলপথে। জলপথে জাহাজে করিয়া আসিতে প্রায় ১৫।১৬ ঘণ্টা লাগে। স্থলপথে পোরবন্দর রাজ্য পর্য্যন্ত গোযানে আসিয়া তথা হইতে রেলে প্রভাসে উপস্থিত হইতে হয়। দ্বারকা হইতে পোরবন্দর স্থলপথে প্রায় ৬০ মাইল; গরুর গাড়িতে আসিতে প্রায় ৩ দিন লাগে, ইহাতে যাতায়াতে প্রায় ৩০।৪০ টাকা লাগে। পুনশ্চ উক্ত পথে উপদ্রবের ভয়ও যথেষ্ট আছে। এই পথটুকুতে রেল হইবার কথা অনেকদিন হইতে চলিতেছে। কিন্তু নানা কারণে উহা হইয়া উঠিতেছে না। রেলপথ প্রস্তুতের গোলমাল দেখিয়া এক গুজরাটি ধনী এই পথটুকুতে মোটর চলাচল করিবার আয়োজন করিতেছিলেন শুনিয়া আসিয়াছিলাম। সুখের বিষয়, গত মার্চ্চ মাসে তিনি উহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। মোটর গাড়িতে এই ৬০ মাইল অতিক্রম করিতে প্রায় ৪ ঘণ্টা লাগে, ভাড়া ৩৷৷ টাকা মাত্র। অতএব আগে দ্বারকা যাইবার যে কষ্ট ছিল এখন আর তাহা রহিল না। যাঁহারা জলপথে যাইবার ভয়ে দ্বারাবতী পুরী যাইতেন না, এখন তাঁহারা নির্ভয়ে অল্প খরচে তথায় যাইতে পারিবেন। আমরা জলপথে আসিয়াছিলাম। কিন্তু এবার আর মেল ষ্টীমারে আসা হয় নাই; কারণ উহা প্রভাস বা ভেরাভ্যাল বন্দরে থামে না। অগত্যা আমাদিগকে বোম্বাই কোম্পানির ষ্টীমারে আসিতে হইল। আমরা অপরাহ্ণে দ্বারকা ত্যাগ করিয়া নৌকাযোগে প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে জাহাজের

সন্নিহিত হইলাম। এই জাহাজে উঠা নামা একটু কষ্টকর এবং মেল জাহাজ অপেক্ষা আকারে ছোট বলিয়া তরঙ্গের উপর উহার প্রভুত্বও কিছু কম। উহা সর্ব্বদাই একটু দুলিতে থাকে; ফলে সকলেই একটু অস্বচ্ছন্দতা বোধ করেন। যাহা হউক জাহাজের বন্দোবস্ত মন্দ নহে। আমরা জাহাজে উঠিয়াই শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিলাম।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, এমন সময়ে জাহাজ পোরবন্দরের নিকট উপস্থিত হইল। ইহা পোরবন্দর রাজ্যের বন্দর ও রাজধানী। এই সহরের সমুদায় বাটীই প্রস্তরনির্ম্মিত। সমুদ্রতীরে ৯০ ফিট উচ্চ একটি Light House আছে। ইহার আলোক প্রায় ১৫ মাইল দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যাত্রী ও মাল পত্রের উঠান নামানর জন্য প্রায় ১ ঘণ্টা কাল এখানে অপেক্ষা করিয়া জাহাজখানি নিজের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। আমরাও পুনরায় নিশ্চিন্ত মনে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

এই জাহাজ পথে ছোট বড় যতগুলি বন্দর আছে সব স্থানেই থামে। কারণ ইহা প্রধানতঃ মাল বহন করিয়া থাকে। প্রভাসের পথে মঙ্গরোল নামক আর একটি ছোট বন্দর আছে; এখানে উপস্থিত হইতে প্রায় বেলা ৭॥০টা হইল। বন্দর হইতে অনেক ফলওয়ালা নৌকা করিয়া জাহাজে ফল বেচিতে আসিল। অতঃপর প্রায় ১১ টার সময় আমরা ভেরাভ্যাল বন্দরে উপস্থিত হইলাম।

সমুদ্রতীর বা ভেরাভ্যাল বন্দর হইতে প্রভাস সহর প্রায় দুই মাইল। বন্দরের খুব নিকটেই জুনাগড়—পোরবন্দর রেলের ভেরাভ্যাল ষ্টেশন; নিকটেই একটি বেশ বড় ধর্ম্মশালা আছে, কিন্তু তীর্থযাত্রিগণের মধ্যে খুব অল্প লোকেই এখানে থাকে; কারণ তীর্থস্থানগুলি একটু দূরে পড়ে। সহরে যাইবার জন্য ট্রাম আছে, ভাড়া জনপ্রতি ৴০ আনা। টোঙ্গা এবং গরুর গাড়ীও আছে। টোঙ্গার ভাড়া ১৲টাকার কম নহে, গরুর গাড়ীর ভাড়া অনেক সস্তা। মালপত্র লইয়া টোঙ্গায় যাওয়াই সুবিধা। আমরা টোঙ্গায় মালপত্রাদি পাঠাইয়া দিয়া ট্রামে করিয়া সহরে গেলাম। প্রভাস যে প্রাচীনকালে খুব সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, তাহা এখনও ইহার বিশাল প্রাচীর দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

সহরে যাইয়া সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত সুবিখ্যাত ভাটিয়া ধর্ম্মশালায় আমরা আশ্রয় গ্রহণ করি। সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত হইলেও ইহার মধ্যস্থ কূপটি অতি মিষ্ট জলে পূর্ণ। এই জন্য বহু লোকেই এই ধর্ম্মশালাটি পছন্দ করে। আমাদের এখানে পৌঁছিতে বেলা প্রায় দুইটা হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় সোমনাথের নূতন মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। এই মন্দির ইন্দোরের রাণী প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাই নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। মন্দিরটি বেশ বড়। প্রশস্ত প্রাঙ্গণের সম্মুখে দ্বিতল মন্দির। মাটির নীচে একতল, উপরে একতল। উপরের তলে একটি শিবলিঙ্গ আছে, তাহার পূজা পাঠ অতি সামান্যভাবেই হইয়া থাকে। নীচের তলে সোমনাথ প্রতিষ্ঠিত। লিঙ্গটি বেশ বড় এবং ধূমধামের সহিত পূজিত হইয়া থাকে। লিঙ্গমূর্ত্তিটি স্রক্‌চন্দনাদি দ্বারা অতি সুন্দরভাবে শোভিত হইয়া থাকে। কেবল মাত্র পুষ্পাদি দ্বারা এরূপ সুন্দর সাজান আমরা আর কুত্রাপি দেখি নাই। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা দর্শন করিয়া আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

প্রাতে উঠিয়া তীর্থ-কার্য্যাদি সমাধা করিবার জন্য পাণ্ডার সহিত সরস্বতী-সাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হইলাম। প্রকৃতপক্ষে ইহা কেবল মাত্র সরস্বতী-সাগর-সঙ্গম নহে। সরস্বতী অপর ৪টি স্রোতস্বিনীর (কপিলা, ব্রজনী, লঙ্কাবতী এবং হিরণ্যা) জল বক্ষে লইয়া সাগরে আসিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন। এই স্থান অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিখ্যাত। দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রবধে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য পিতামহের আদেশে এই স্থানে আসিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন ও যজ্ঞান্তে সরস্বতীতে স্নান করেন। এইস্থানের সম্মুখবর্ত্তী সমুদ্রে দ্বাপরযুগে পঞ্চজন নামক দৈত্য তিমিরূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের গুরুদেব সান্দীপণি মুনির পুত্রকে ভক্ষণ করে; এবং ভগবান্ গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তাঁহার পুত্রকে উদ্ধার করিয়া দিবার জন্য এখানকার জলমধ্য হইতে পঞ্চজনকে বিনাশ করেন। কিন্তু তাহাকে বিনাশ করিয়া একটি শঙ্খমাত্র (যাহা পাঞ্চজন্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিল) প্রাপ্ত হইলেন, গুরুপুত্রকে পাওয়া গেল না। অবশেষে যমরাজো

গমন করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করতঃ গুরুপুত্রকে উদ্ধার করেন।

এই স্থানেই বিখ্যাত প্রভাস যজ্ঞ সম্পাদিত হয় এবং যাদবগণ পরস্পর যুদ্ধ করিয়া সমূলে বিনষ্ট হন। একদা নারদ, কণ্ব, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ দ্বারকায় আগমন করেন। উদ্ধত যাদবগণ তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিবার মানসে শ্রীকৃষ্ণপুত্র শাম্বকে গর্ভবতী স্ত্রীবেশে সাজাইয়া তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করেন—"এই স্ত্রীরত্ন কি সন্তান প্রসব করিবে?" ধ্যানপ্রভাবে তাঁহারা সমুদায় জানিতে পারিয়া অতিশয় কোপান্বিত হইলেন এবং "এই শ্রীকৃষ্ণতনয় যদুকুলনাশন এক লৌহমুষল প্রসব করিবে" এই অভিশাপ প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন যাদবগণ নিতান্ত ভীত হইয়া মুষলটিকে এইস্থানের সমুদ্রোপকূলে প্রস্তরময় স্থান সকলের উপর ঘর্ষণ করিয়া প্রায় সমস্তটিকে ক্ষয়িত করিল। যাহা একটু অবশিষ্ট ছিল তাহা সমুদ্র মধ্যে বহুদূরে নিক্ষেপ করিয়া দ্বারকায় ফিরিয়া গেল। কালে যে যে স্থানে ঐ মুষল ঘর্ষিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে শর গাছের ন্যায় এক প্রকার গাছ উৎপন্ন হইল। সমুদ্রক্ষিপ্ত অংশটুকু এক মৎস্য গ্রাস করিয়াছিল; কালক্রমে ঐ মৎস্য মৃত হইলে তাহার উদরমধ্যস্থ লৌহ-খণ্ড দ্বারা এক শর নির্ম্মিত হইল। এদিকে দ্বারকায় ঘোর দুর্নিমিত্ত সকল ঘটিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদুকুল ধ্বংসের সময় সন্নিকট বুঝিলেন এবং যাদব-গণকে প্রভাসতীর্থে যাইবার জন্য আজ্ঞা করিলেন। তাঁহারা এখানে আসিয়া একদিন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও অন্যান্য নানা প্রসঙ্গ লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। মধুপানে মত্ত থাকায় ঐ তর্ক ঘোর বিতণ্ডায় পরিণত হইল; তখন পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অস্ত্র শস্ত্র ফুরাইয়া আসিলে ঐ শর গাছ তুলিয়া তাঁহারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং ঋষিশাপে তাহাতে সকলেই নিহত হইলেন। তখন মধুসূদন বলরামকে অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন যে তিনি নির্জ্জন স্থানে এক বৃক্ষতলে মহা-সমাধিতে আসীন এবং তাঁহার মুখ হইতে অনন্তনাগ নির্গত হইয়া সমুদ্রাভি-মুখে ধাবমান। ইহাতে তিনি পরম নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এক অশ্বত্থ বৃক্ষোপরি উপবেশন করিলেন। জনৈক ব্যাধ দূর হইতে

মৃগভ্রমে তাঁহাকে সেই মুষলাংশনির্ম্মিত শরদ্বারা বিদ্ধ করিল, এবং তিনি যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিলেন।

এইরূপ নানা কারণে প্রভাস তীর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পুরাণে কথিত হইয়াছে। এই জন্য প্রত্যহ স্নানকালে প্রভাসকে স্মরণ করিবার ব্যবস্থা আছে, যথা—"কুরুক্ষেত্র-গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ। তীর্থাণ্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্ত্বিহ ॥"

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

প্রথমাধ্যায়ের সারসংগ্রহ।

(অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

মঙ্গলাচরণ।

(১) তীব্র বৈরাগ্য জন্মিলেই সন্ন্যাসে অধিকার হয়—

বৈরাগ্য—মন্দ, তীব্র ও তীব্রতর ভেদে তিন প্রকার।

১। পুত্র স্ত্রী প্রভৃতির বিনাশে সংসারে সাময়িক বিতৃষ্ণা মন্দ বৈরাগ্য।

২। ইহজন্মে স্ত্রীপুত্রাদিতে একান্ত বিতৃষ্ণার নাম তীব্র বৈরাগ্য।

৩। যে লোকে * গমন করিলে আবার ইহলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়, সেই লোকে যেন আমার গমন না হয়, এইরূপ দৃঢ় ইচ্ছার নাম তীব্রতর বৈরাগ্য।

১। মন্দ বৈরাগ্যে কোনও প্রকার সন্ন্যাস নাই।

২। তীব্র বৈরাগ্যে দুই প্রকার সন্ন্যাসের ব্যবস্থা,

(ক) ভ্রমণসামর্থ্য না থাকিলে কুটীচক সন্ন্যাস,

* অগ্রে সন্ন্যাসের বিধানে লোকবিভাগ দ্রষ্টব্য

(খ) তাহা থাকিলে বহূদক সন্ন্যাস।

(উভয় প্রকার সন্ন্যাসীই ত্রিদণ্ডধারী।)

৩। তীব্রতর বৈরাগ্যে দুই প্রকার সন্ন্যাস

(ক) হংস সন্ন্যাস—তাহার ফল, ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি, তথায় তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভ, পরে মুক্তি।

(খ) পরমহংস সন্ন্যাস,—তাহার ফল, ইহলোকেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ ও মুক্তি।

পরমহংস দুই প্রকারের—(১) বিবিদিষু (জিজ্ঞাসু), (২) বিদ্বান্ (তত্ত্বজ্ঞানবান্)।

(হংস, বিবিদিষু ও গৌণ বিদ্বৎ-পরমহংস একদণ্ডধারী)

এই গ্রন্থে কেবলমাত্র পরমহংস সন্ন্যাসের বিচার করা হইতেছে, এবং সেই সন্ন্যাসের উক্ত দুই বিভাগ প্রতিপাদনই এই গ্রন্থের বিশেষত্ব।

(২) সন্ন্যাসের শাস্ত্রীয় বিধান।

(ক) শ্রৌতবিধান—বৃহদারণ্যক শ্রুতি, ৪।৫।২২ প্রভৃতি। তাহার মর্ম্ম ইহলোক ও পরলোক সমূহ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—অনাত্মলোক, ও আত্মলোক। অনাত্মলোকের তিন বিভাগ—

(১) মনুষ্যলোক—পুত্র দ্বারা লভ্য ;

(২) পিতৃলোক—কর্ম্ম দ্বারা লভ্য ;

(৩) দেবলোক—উপাসনা দ্বারা লভ্য ; এই তিনই ক্ষয়িষ্ণু।

আত্মলোক অক্ষয়, এবং সন্ন্যাসই আত্মলোকলাভের উপায়।

(খ) স্মার্ত্তবিধান—"ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভায়" ইত্যাদি বচন।

(৩) বিবিদিষা সন্ন্যাস।

ইহজন্মে বা জন্মান্তরে যথারীতি বেদাধ্যয়নাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মজ্ঞানেচ্ছা জন্মিলে তদ্ধেতু যে সন্ন্যাস সম্পাদিত হয়, তাহার নাম বিবিদিষা সন্ন্যাস।

সন্ন্যাস দুই প্রকারে সম্পাদিত হইতে পারে—

(ক) জন্মান্তরলাভের কারণভূত কাম্যকর্ম্মাদি ত্যাগ মাত্র।

এইরূপ সন্ন্যাসে স্ত্রীলোকেরও অধিকার আছে।

প্রমাণ—সুলভা, বাচক্নবী, মৈত্রেয়ী ইত্যাদি।

(খ) প্রৈষোচ্চারণ পূর্ব্বক দণ্ডধারণাদিরূপ আশ্রমগ্রহণ।

বিশেষ কারণ বশতঃ এই দ্বিতীয় প্রকারের সন্ন্যাস গ্রহণে অসমর্থ হইলে, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থের পক্ষে কর্ম্মাদির মানসিক ত্যাগরূপ সন্ন্যাসে বাধা নাই।

প্রমাণ—নারদ, বসিষ্ঠ, জনক, তুলাধার, বিদুর ইত্যাদি।

(৪) বিদ্বৎ সন্ন্যাস।

আত্মজ্ঞান লাভ করিবার পর যে সন্ন্যাস অনুষ্ঠিত হয় তাহাই বিদ্বৎসন্ন্যাস। বিদ্বৎসন্ন্যাসের প্রমাণঃ—

(ক) বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ, ৪।৫।২ এবং ৪।৫।১৫—যাজ্ঞবল্ক্যের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার পর সন্ন্যাসগ্রহণ।

(খ) বৃহদারণ্যকে কহোল ব্রাহ্মণ, ৩।৫।১—আত্মজ্ঞান লাভের পর ভিক্ষাচর্য্যের ব্যবস্থা। উক্তবাক্য কোন ক্রমেই বিবিদিষা সন্ন্যাস প্রতিপাদক হইতে পারে না।

(গ) বৃহদারণ্যকে শারীর ব্রাহ্মণ, ৪।৪।২২—আত্মজ্ঞান লাভের পর মুনিত্ব ও প্রব্রজ্যা। উক্তবাক্যও বিবিদিষা সন্ন্যাস প্রতিপাদক হইতে পারে না।

(শঙ্কা)—উক্ত দুই প্রকার সন্ন্যাস স্বীকার করিলে, ভিক্ষুর সংখ্যা স্মৃত্যুক্ত ৪ না হইয়া ৫ হইয়া পড়ে।

(সমাধান)—উক্ত দুই প্রকার সন্ন্যাসকে পরমহংসের প্রকারভেদ ধরিলেই ৪ সংখ্যাই সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ, জাবালোপনিষদে (৪, ৫ ও ৬ কণ্ডিকায়) উভয়ই পরমহংস বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

(শঙ্কা)—তবে উভয়ের মধ্যে ভেদস্বীকার করা হয় কেন?

(সমাধান)—কেননা উভয়েই পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মক। প্রমাণ—আরুণ্যুপনিষৎ ও পরমহংসোপনিষৎ।

(ক) আরুণ্যুপনিষৎ (১।২), তত্ত্বজ্ঞানলাভের কারণ স্বরূপ কয়েকটি কর্ম্ম বিবিদিষা সন্ন্যাসীর আশ্রমধর্ম্মরূপে বিধান করিতেছেন।

(খ) পরমহংসোপনিষৎ বিদ্বৎসন্ন্যাসীর লিঙ্গরাহিত্য, লোকব্যবহারাতীতত্ব, ও ব্রহ্মানুভবমাত্রে পর্য্যবসান প্রতিপাদন করিতেছেন।

স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত ভেদ সমর্থিত হইয়াছে—যথা "সংসারমেব নিঃসারম্" ইত্যাদি বচন বিবিদিষা সন্ন্যাস প্রতিপাদক ও "যদাতু বিদিতং তত্ত্বম্" ইত্যাদি বচন বিদ্বৎ সন্ন্যাস প্রতিপাদক।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, সাধারণ ভাবে বিবিদিষা যখন সকলেরই হইতে পারে, তখন কি প্রকার বিবিদিষায় সন্ন্যাস কর্ত্তব্য।

(সমাধান)—ক্ষুধার্ত্তের ভোজনেই রুচি ও অন্যত্র অরুচির ন্যায় বিবিদিষুর শ্রবণাদিতেই রুচি ও জন্মোৎপাদক কর্ম্মে অরুচি হইলে, সেই বিবিদিষাই সন্ন্যাসের কারণ।

(শঙ্কা)—কি প্রকার তত্ত্বজ্ঞান বিদ্বৎ সন্ন্যাসের কারণ ?

(সমাধান)—দেহে ও বুদ্ধিতে আত্মবুদ্ধির অভাব ও সর্ব্বপ্রকার সংশয়ের তিরোভাব, কর্ম্মক্ষয় এবং অহঙ্কারাভাব এইগুলিই তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ। উপদেশ সাহস্রী, মুণ্ডকশ্রুতি ও গীতা বচন।

(শঙ্কা)—আচ্ছা, বিবিদিষা সন্ন্যাসের ফলরূপ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই যখন আগামী জন্ম নিবৃত্ত হয় এবং যখন ভোগ বিনা বর্ত্তমান জন্মের অবশিষ্টাংশ অপরিহার্য্য, তখন বিদ্বৎ সন্ন্যাসের প্রয়োজন কি ?

(সমাধান)—বিবিদিষা সন্ন্যাস যেমন তত্ত্বজ্ঞান লাভের হেতু, বিদ্বৎ সন্ন্যাস সেইরূপ জীবন্মুক্তি লাভের হেতু।

৫। জীবন্মুক্তি।

(ক) জীবন্মুক্তি কাহাকে বলে ? (স্বরূপ)

(খ) জীবন্মুক্তি কোন্ শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে ? (প্রমাণ)

(গ) জীবন্মুক্তি কি প্রকারে সিদ্ধ হয় ? (সাধন)

(ঘ) জীবন্মুক্তি সিদ্ধির প্রয়োজন কি ? (প্রয়োজন)

৫ (ক)—কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব, সুখ দুঃখ প্রভৃতি চিত্তধর্ম্ম ক্লেশস্বরূপ। সেই হেতু তাহারাই বন্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। সেই বন্ধের নিবারণের নাম জীবন্মুক্তি।

(শঙ্কা)—বন্ধ নিবারিত হইবে কোথা হইতে ? চিত্তধর্ম্মের সাক্ষী হইতে অথবা চিত্ত হইতে ?

(সমাধান)—সাক্ষীর স্বরূপ জানিলেই যখন বন্ধের নিবৃত্তি হয় তখন, বন্ধ সাক্ষীতে নাই, চিত্তেই আছে ; চিত্ত হইতেই বন্ধের নিবৃত্তি হইবে।

(শঙ্কা)—বন্ধ যদি চিত্তের স্বভাবগত ধর্ম্ম হয়, তবে তাহার আত্যন্তিক নিবারণ অসম্ভব।

(সমাধান)—আত্যন্তিক নিবারণ অসম্ভব হইলেও, যোগাভ্যাস দ্বারা তাহার অভিভব সম্ভবপর।

(শঙ্কা)—সেই অভিভবই বা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? কেননা, প্রারব্ধ কর্ম্ম সুখদুঃখাদি ভোগ দিতে ত ছাড়িবে না, সুতরাং চিত্তের বৃত্তি থাকা ও দেহেন্দ্রিয়াদির পরিচালন অপরিহার্য্য। এইরূপে প্রারব্ধই তত্ত্বজ্ঞানকে জন্মিতে না দিয়া বন্ধকে বজায় রাখিবে। সুতরাং জীবন্মুক্তিও ঘটিবে না।

(সমাধান)—জীবন্মুক্তি যখন সুখেরই পরাকাষ্ঠা, তখন উহা প্রারব্ধ ফল মধ্যে গণ্য।

(শঙ্কা)—তবে, তজ্জন্য চেষ্টার প্রয়োজন কি?

(স) কৃষি বানিজ্যের ফলও ত প্রারব্ধাধীন, তবে তাহার জন্য চেষ্টা করা হয় কেন?

(উত্তর)—প্রারব্ধ কর্ম্ম নিজে অদৃষ্ট, তাহা দৃষ্টসাধন ব্যতিরেকে ফল দিতে পারে না। সেই জন্য চেষ্টার প্রয়োজন।

(প্রত্যুত্তর)—তবে জীবন্মুক্তির জন্যও দৃষ্টসাধনের বা চেষ্টার অপেক্ষা আছে ইহা স্বীকার করিতে বাধা কি?

(প্রশ্ন)—আচ্ছা, কৃষিকার্য্যে যেমন প্রারব্ধ প্রতিকূল হইলে চেষ্টা সত্ত্বেও সফলতা লাভ ঘটে না, জীবন্মুক্তি বিষয়েও সেইরূপ প্রারব্ধ প্রতিকূল হইলে চেষ্টা সত্ত্বেও সফলতা লাভ ঘটিবে না।

(উত্তর)—কৃষিকার্য্যে প্রতিকূল প্রারব্ধ অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৃষ্ট প্রতিবন্ধক রূপে দেখা দেয়, এবং সেই প্রতিবন্ধক যেমন কারীরী যাগ প্রভৃতি প্রবলতর কর্ম্ম দ্বারা অপনীত হয়, সেইরূপ প্রতিকূল প্রারব্ধ তত্ত্বজ্ঞান-লাভের প্রতিবন্ধক ঘটাইলে, যোগাভ্যাসরূপ প্রবলতর কর্ম্ম দ্বারা সেই প্রতিবন্ধক অপনীত হইতে পারে।

(প্রশ্ন)—যোগাভ্যাস দ্বারা প্রারব্ধজনিত প্রতিবন্ধক নিবৃত্তির দৃষ্টান্ত কোথায়?

(উত্তর)—বাসিষ্ঠ রামায়ণে উপশম প্রকরণে বর্ণিত উদ্দালক, বীতহব্য প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। তাঁহারা প্রবলতর যোগাভ্যাস দ্বারা প্রারব্ধরক্ষিত দেহও পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন।

(প্রশ্ন)—আজকালকার স্বল্পায়ু জীবের মধ্যে তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

(উত্তর)—আমরা কলির জীব বলিয়া কি আমাদের কামাদিরূপ চিত্তবৃত্তিনিরোধের চেষ্টা করিবারও সামর্থ্য নাই বলিতে চাও? আর যদি প্রারব্ধকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে চিকিৎসাদি মোক্ষ শাস্ত্র পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রতীকারবিধায়ক শাস্ত্রই ত নিষ্ফল হইয়া পড়ে। সত্য বটে কখন কখন শাস্ত্রীয় প্রযত্ন অভীষ্ট ফলদানে সমর্থ হয় না। তাই বলিয়াই কি তাহা নিষ্ফল বলিতে চাও? শাস্ত্রীয় প্রযত্ন যে প্রবল তাহা বসিষ্ঠ রাম-সংবাদে স্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

বসিষ্ঠ বলিলেন—(মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণ)

পুরুষ-প্রযত্ন দ্বারা সকল সময়ে সকল প্রকার সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়। পুরুষপ্রযত্ন দুই প্রকার—শাস্ত্রবিগর্হিত ও শাস্ত্রবিহিত। আবাল্য অভ্যাস, সৎশাস্ত্রচর্চ্চা ও সাধুসঙ্গের সহিত মিলিত হইলে শাস্ত্রবিহিত প্রযত্ন শুভফল প্রদান করে।

যখন প্রারব্ধ দুর্দ্দম বাসনারূপে আবির্ভূত হয়, তখন দেখিবে সেই বাসনা শুভ অথবা অশুভ। শুভ হইলে প্রশ্রয়, অশুভ হইলে দমন বিধেয়।

এই দমন মৃদুযোগ দ্বারা কর্ত্তব্য—হঠপূর্ব্বক নহে, তাহা হইলেই শীঘ্র শুভবাসনার উদয় হইবে। * শুভবাসনার অভ্যাসে আধিক্য হইলে দোষ ঘটিতে পারে, এইরূপ সন্দেহ অকর্ত্তব্য। পরে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে এবং আসক্তি প্রভৃতি কষায় শিথিল হইলে শুভবাসনাও পরিত্যাগ করিয়া চিত্তনিরোধ অভ্যাস করিবে।

৫ (খ)। শ্রুতি ও স্মৃতি, উভয়ত্রই জীবন্মুক্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রৌত প্রমাণ—কঠোপনিষৎ, ৫।১—"বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।"

বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৭ ও কঠ, ৬।১৪—"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে" ইত্যাদি

---

* শুভাশুভফলারম্ভে সন্দিগ্ধেঽপি শুভং চরেৎ।
যদি ন স্যাৎ তদা কিং স্যাৎ যদি স্যান্নাস্তিকো হতঃ॥

অন্য এক শ্রুতিবচন—"সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোঽকর্ণ ইব সমনা অমনা ইব।"

স্মার্ত্তপ্রমাণ—জীবন্মুক্ত নানা স্মৃতিতে নানা নামে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—জীবন্মুক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ, ভগবদ্ভক্ত, গুণাতীত, ব্রাহ্মণ, অতিবর্ণাশ্রম ইত্যাদি।

জীবন্মুক্ত ভগবদ্গীতায় 'স্থিতপ্রজ্ঞ' নামে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ৫৪ শ্লোক হইতে শেষ পর্য্যন্ত—'ভগবদ্ভক্ত' নামে দ্বাদশাধ্যায়ে ১৩ শ্লোক হইতে ১৯ পর্য্যন্ত—'গুণাতীত' নামে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ২১ শ্লোক হইতে ২৬ পর্য্যন্ত।

মহাভারতে—'ব্রাহ্মণ' নামে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মে ২৪৪ অধ্যায়ে এবং সূতসংহিতায় 'অতিবর্ণাশ্রমী' নামে মুক্তিখণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বাসিষ্ঠ রামায়ণেই উৎপত্তি প্রকরণে ৯ম অধ্যায়ে 'জীবন্মুক্ত' নামে বর্ণিত হইয়াছে, তথায় বিদেহমুক্তের সহিত ইহার প্রভেদও প্রদর্শিত হইয়াছে। বসিষ্ঠপ্রদর্শিত জীবন্মুক্তলক্ষণ—(১) চিত্তে বৃত্তি না থাকাতে জীবন্মুক্তের নিকট বাহ্য জগতের লোপ, (২) সুখ-দুঃখে সমতা; যথাপ্রাপ্তে দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ, (৩) জাগ্রৎ থাকিয়াও সুপ্তবৎ; বুদ্ধিতে অভিমান ভোগাদিজনিত বাসনা বা সংস্কারের অভাব, (৪) রাগ দ্বেষাদির অনুরূপ ব্যবহার থাকিলেও অন্তরে স্বচ্ছতা, (৫) অহঙ্কার না থাকাতে বুদ্ধিতে কর্ম্মলেপাভাব, (৬) হর্ষ-ক্রোধভয়শূন্যতা, স্বয়ং অনুদ্বিগ্ন থাকিয়া অপরেরও অনুদ্বেগকরতা, (৭) মানাব-মানাদি বিবিধ বিকল্পরাহিত্য, বিবিধ বিদ্যার আধার হইয়াও তাহার অভিমান ও ব্যবহার বর্জ্জন, চিত্তবান্ হইয়াও নিশ্চিত্ততা, (৮) সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার নিরত হইলেও অন্তরে পরিপূর্ণস্বরূপানুসন্ধানজনিত শীতলতা।

৫ (গ)। দ্বিতীয় ও তৃতীয়াধ্যায়ে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

৫ (ঘ)। চতুর্থাধ্যায়ে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

বেদান্ত প্রচার।

(সমালোচনা)

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)।

হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণ্যগ্রন্থ বেদ। এই বেদ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক। মন্ত্রভাগ সংহিতা নামে পরিচিত এবং দেবগণের স্তুতিতে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্রভাগেরই ব্যাখ্যাস্বরূপ। উহাতে যজ্ঞাদি জীবনের যাবতীয় কার্য্যে মন্ত্রভাগের বিভিন্ন বিনিয়োগ কথিত এবং তদুপলক্ষে নানা আখ্যায়িকাদি বর্ণিত হইয়াছে। উহারই একাংশ আরণ্যক নামে পরিচিত—উহাতে বানপ্রস্থিগণের অরণ্যে অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াকলাপাদির বর্ণনা আছে। ঐ আরণ্যকের শেষাংশে আবার ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক কিছু কিছু বাক্য সন্নিবেশিত আছে। উহাই উপনিষদ্ বা বেদান্ত নামে পরিচিত।

পরমর্ষি জৈমিনি বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসার জন্য সূত্রাত্মক পূর্ব্বমীমাংসা শাস্ত্র রচনা করেন এবং ভগবান্ বেদব্যাস জ্ঞানকাণ্ডের মীমাংসার জন্য উত্তরমীমাংসা রচনা করেন। এই উত্তরমীমাংসাই ব্রহ্মসূত্র, বেদান্তসূত্র, শারীরকসূত্র প্রভৃতি নামে পরিচিত। এমন কি, বেদান্তের মুখ্য তাৎপর্য্য উপনিষদে হইলেও এই ব্রহ্মসূত্রই এক্ষণে বেদান্ত নামে পরিচিত। এই ব্রহ্মসূত্রে কাশকৃৎস্ন, আশ্মরথ্য, বাদরি, ঔড়ুলোমি প্রভৃতি আচার্য্যগণের মত উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে দেখিয়া অনুমান হয়, ইঁহাদের রচিত জ্ঞানকাণ্ডের মীমাংসাত্মক সূত্রও হয়ত কোন না কোন আকারে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে সকল গ্রন্থ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ব্যাসের সূত্রই এক্ষণে ঔপনিষদ ব্রহ্মতত্ত্ব মীমাংসার একমাত্র অবলম্বন।

আমি কে, জগৎটা কি, জগৎকারণ কিছু আছে কি না, মানবের সকল দুঃখের উচ্ছেদ সম্ভব কি না—মানবের এই সকল স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা অবলম্বনে প্রাচীনকাল হইতেই মনীষী ঋষিগণ বহু গবেষণা করিয়া গিয়াছেন

এবং তৎফলে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্যাদি বহু দর্শনশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই অল্পবিস্তর শ্রুতি বা উপনিষদের দোহাই দিয়াছেন বটে, কিন্তু নিজ নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে প্রধানতঃ স্বাধীন যুক্তির উপরই নির্ভর করিয়াছেন। বৌদ্ধ জৈনাদি দার্শনিকগণ আবার বেদের প্রামাণ্য একেবারে অস্বীকার করিয়া যুক্তিবলে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ, স্যাদ্বাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভগবান্ বেদব্যাসও দার্শনিক—তাঁহারও উদ্দেশ্য জগৎসমস্যার সমাধান। কিন্তু তিনি ইঁহাদের সকলের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে গমন করিয়াছেন। ইনিও যুক্তি বিচারের সাহায্য লইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাই তাঁহার মুখ্য অবলম্বন নহে। শ্রুতি-বাক্যই ইঁহার মুখ্য অবলম্বন। এই শ্রুতি ব্যাখ্যা করিতে যেটুকু যুক্তির প্রয়োজন হয় সেইটুকু মাত্র যুক্তি তিনি অবলম্বন করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য দার্শনিকগণের সহিত বিচারকালেও শ্রুতির অনুকূল তর্কের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু ভগবান বেদব্যাসের যথার্থ অভিপ্রায় কি, সূত্র অতি সংক্ষিপ্তভাবে রচিত হওয়ায় তদ্বিষয়ে পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য রচনার পূর্ব্বে অন্য কোন ভাষ্য বা বৃত্তি প্রচলিত ছিল কি না, তাহা এক্ষণে নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। এ বিষয়ে অনুমান দ্বারা কেবল এইটুকু বুঝা যায় যে, বৃত্তিকারের মত বলিয়া একটী মত প্রচলিত ছিল, কিন্তু এই বৃত্তিকার কে, তাহা জানা যায় না বা তাঁহার কোন গ্রন্থও পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, বোধায়ন এই বৃত্তিকার, কেহ কেহ বা বলেন, পাণিনির গুরু উপবর্ষই এতদাখ্যায় পরিচিত। সুতরাং বর্ত্তমানে আমাদের নিকট ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যই সর্ব্বপ্রাচীন ভাষ্য। এই ভাষ্যে অবলম্বিত অদ্বৈতবাদ শঙ্করাচার্য্যের সম্পূর্ণ নিজস্ব নহে; কারণ, মাণ্ডূক্যোপনিষদের গৌড়পাদীয় কারিকায় ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, এবং এই গৌড়পাদ শঙ্করাচার্য্যের গুরুর গুরু বলিয়া প্রসিদ্ধ। শঙ্করাচার্য্যের পরে অনেক আচার্য্য বিভিন্ন প্রকার দ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া সূত্রভাষ্য রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদ-খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও অদ্বৈতকেশরী পূর্ব্বের

ন্যায়ই সিংহনাদ করিয়া মনীষিবৃন্দের শ্রদ্ধাসংকৃত সম্ভ্রম উৎপাদন করিতেছে।

এই ব্রহ্মসূত্রের চারিটী অধ্যায় এবং প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটী করিয়া পাদ আছে, প্রত্যেক পাদে আবার কতকগুলি করিয়া সূত্র। কয়েকটী করিয়া সূত্র লইয়া এক একটী অধিকরণ অর্থাৎ বিচার্য্য বিষয়। ইহাতে জগতের কারণস্বরূপে চেতন ব্রহ্মের প্রতিপাদন, সাংখ্যাদি অন্যান্য দার্শনিকের সম্মত অচেতন প্রধান, পরমাণু প্রভৃতির খণ্ডন, জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিচার, মৃত্যুর পর মানবের বিভিন্ন গতি, বিভিন্ন প্রকার উপাসনার ফল, তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য ও গৌণ সাধন প্রভৃতি জিজ্ঞাসুর যাবতীয় জিজ্ঞাস্য বিষয় সুন্দররূপে বিচারিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত কেন্দ্র নির্দ্দেশ করিতে গিয়া মান্দ্রাজবাসিগণের অভিনন্দনের উত্তরে একস্থানে যে বলিয়াছিলেন,—

"যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, প্রাচীন ও বর্ত্তমান সমুদয় ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর কেন্দ্র কোথায়, যদি কেহ নানাবিধ শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মেরুদণ্ড কি জানিতে চান, তবে অবশ্য ব্যাসসূত্রই এই কেন্দ্র, এই মেরুদণ্ড বলিয়া প্রদর্শিত হইবে।"

—ইহা অতি সত্য কথা।

উক্ত উত্তরেরই আর এক স্থলে স্বামীজি শারীরক ভাষ্যকে অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যকে শ্রুতির 'সুপ্রণালীবদ্ধ বিবৃতি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

যাহা হউক, এই শাঙ্করভাষ্যকে উত্তমরূপে বুঝাইবার জন্য পরবর্ত্তী কালে আবার নানা টীকা টিপ্পনী বিরচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য সনন্দন বা পদ্মপাদের টীকা পঞ্চপাদিকা নামে পরিচিত। পদ্মপাদ কখন সমগ্র ভাষ্যের টীকা রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। পঞ্চপাদিকা নামে বোধ হয় যে, ষোলটী পাদের ভিতর তিনি পাঁচটী পাদের মাত্র টীকা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে মাত্র চতুঃসূত্রীর টীকা পর্য্যন্ত এখন পাওয়া যায়। বিবরণাচার্য্য প্রভৃতি যাঁহারা এই পঞ্চপাদিকার টীকা রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদেরও ঐ চতুঃসূত্রীর অধিক টীকা পাওয়া যায় না। রত্নপ্রভা, আনন্দগিরি, ব্রহ্মবিদ্যাভরণ,

শঙ্করপাদভূষণ প্রভৃতি অনেক ভাষ্যটীকা আছে বটে, কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত ভামতী নাম্নী টীকাই পণ্ডিতসমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কিম্বদন্তী এই যে, সুরেশ্বরাচার্য্য, যিনি পূর্ব্বে মণ্ডনমিশ্র নামে পরিচিত ও কর্ম্মকাণ্ডিগণের অগ্রগণ্য ছিলেন, এবং বাদে শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই শঙ্করাচার্য্যের বরপ্রভাবে বাচস্পতি মিশ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ষড়্দর্শনের টীকা রচনা করেন। বাস্তবিক ভামতীর সূক্ষ্ম বিচারপদ্ধতি ও গভীরভাবে ভাষ্যকারের প্রকৃত অভিপ্রায় উদ্ঘাটনের চেষ্টা দেখিলে এ কিম্বদন্তীর মূল অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। এই ভামতী টীকাটী বেদান্ততত্ত্বের এতদূর প্রয়োজনীয় ও কঠিন গ্রন্থ যে, ইহাকে বুঝাইতে আবার অমলানন্দ সরস্বতীকে কল্পতরু টীকা প্রণয়ন করিতে হইয়াছে এবং অপ্পয়দীক্ষিত আবার ঐ কল্পতরুর পরিমল এবং লক্ষ্মীনৃসিংহ আভোগ নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ভামতী ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে এই সকল টীকার সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক হইয়া পড়ে। বিবরণসম্মত ব্যাখ্যা এবং ভামতী ব্যাখ্যার মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ আছে এবং এই মতভেদ অবলম্বন করিয়া অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের ভিতর দুইটী প্রধান মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু পদ্মপাদের টীকা সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না বলিয়া এবং ভামতীকারের সূক্ষ্ম বিচারশক্তির জন্য পণ্ডিতসমাজে ভামতীকারের মতই বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে, এবং উহাই বহুলভাবে অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মসূত্রের এই সকল ভাষ্য, টীকা ও টীকার টীকা ব্যতীত অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করিয়া স্বাধীনভাবে অনেক গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, যথা বিদ্যারণ্যকৃত পঞ্চদশী, সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি প্রভৃতি, কল্পতরুকার অমলানন্দ সরস্বতীকৃত শাস্ত্রদর্পণ, বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরকৃত ব্যাসাধিকরণমালা, মধুসূদন সরস্বতীকৃত অদ্বৈতসিদ্ধি ইত্যাদি বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এইগুলি বেদান্তের প্রকরণগ্রন্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বঙ্গদেশে বোধ হয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রামমোহন রায়ই প্রথম পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া নিজ মত প্রতিষ্ঠার্থ ব্রহ্মসূত্র শাঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ আংশিক ভাবে প্রচার করেন। কিন্তু বোধ হয় উহা

সাধারণ পাঠকবর্গের ভিতর তত প্রচারিত হয় নাই। প্রায় ৩২ বৎসর পূর্ব্বে ৺ কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় ব্রহ্মসূত্রের যে সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাহাতে শাঙ্করভাষ্য ও ভামতী টীকা একত্রে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয় এবং উহাদের সহিত সূত্রের সরলার্থ এবং শাঙ্করভাষ্যের সরল অনুবাদও সংযোজিত হয়। উহাই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গীয় পাঠকগণকে বেদান্তের শাঙ্করভাষ্যের সহিত পরিচিত হইবার বিশেষ সাহায্য করে। ইহার পর ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্কর-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদের আর দুই একটী চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু বেদান্ত-বাগীশ মহাশয়ের সংস্করণের ন্যায় ব্রহ্মসূত্রের সম্পূর্ণ ও উৎকৃষ্ট সংস্করণ বাঙ্গালা ভাষায় আর একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। ঐ সংস্করণ এক্ষণে আর পাওয়া যায় না এবং উহা পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

যাহা হউক ঐ সংস্করণে ভামতী টীকা বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার অনুবাদ দূরে থাক্, ভাবার্থ পর্য্যন্ত দিবার বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। সুতরাং উহা কঠিন গ্রন্থ বলিয়া অতিশয় অধ্যবসায়শীল সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ বিরল কেহ কেহ হয়ত অদ্বৈতবাদের মর্ম্ম বুঝিতে, উহার সাহায্য লইতে চেষ্টা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সাধারণ বঙ্গীয় পাঠক উহার মর্ম্মার্থ গ্রহণে এতকাল বঞ্চিত ছিলেন।

সম্প্রতি অষ্টোত্তরশত উপনিষদের উদ্যমশীল প্রকাশক লোটাস্ লাইব্রেরির সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বিপুল উদ্যমের ফলস্বরূপ দশখণ্ড বেদান্ত আমরা সমালোচনার্থ পাইয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় যাহার অনুবাদক, বঙ্গদেশে বেদান্তের অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রবিড় মহাশয় যে গ্রন্থের পরিদর্শক এবং বেদান্ত প্রচারে দৃঢ় অধ্যবসায়শীল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় যাহার সম্পাদক, সে গ্রন্থ যে অতি উৎকৃষ্টই হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা সুতরাং ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এবং গ্রন্থসম্পাদন সম্বন্ধে আমাদের দুই একটী সামান্য মন্তব্য প্রকাশ করিয়াই পাঠকগণকে স্বয়ং এই গ্রন্থ দেখিবার জন্য আহ্বান করিব।

রয়্যাল সাইজের ১২৮ পৃষ্ঠা করিয়া দশখণ্ড গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রের চতুঃসূত্রী সমাপ্ত হইতে বোধ হয় এইরূপ আরও দুই খণ্ড লাগিবে। ইহাতে প্রথমতঃ সূত্র, সূত্রের সরলার্থ, শাঙ্করভাষ্য, উহার বঙ্গানুবাদ ও সরলার্থ; ভামতী টীকা, উহার বঙ্গানুবাদ, ভামতীর তাৎপর্য্য ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ সরস্বতী কৃত রত্নপ্রভানাম্নী টীকা দেওয়া হইয়াছে। শাঙ্করভাষ্য ও ভামতীর অন্তর্গত কঠিন কঠিন শব্দের অর্থও দেওয়া হইয়াছে, এবং 'ভাষ্যভামতী প্রভৃতির তাৎপর্য্য' নাম দিয়া ভামতীর টীকা কল্পতরু এবং কল্পতরুর টীকা পরিমল হইতে বেদান্ত সম্বন্ধে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালায় লেখা হইয়াছে। আবশ্যকমতে ইহার ভিতর রত্নপ্রভার টীকার অনুবাদও দেওয়া হইয়াছে, কোথাও কোথাও বা রত্নপ্রভার সহিত ভামতীর যেটুকু মতপার্থক্য অথবা রত্নপ্রভাকারের যেটুকু অতিরিক্ত যুক্তি, সেইটুকু মাত্র আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থের এই অংশে নানা বেদান্তগ্রন্থ হইতে বেদান্ত সম্বন্ধীয় এমন সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের সন্নিবেশ করা হইয়াছে, যাহা একত্র এত সরল ভাষায় কোথাও সন্নিবেশিত দেখি নাই। মধ্যে মধ্যে যে সকল টিপ্পনী সংযোজিত হইয়াছে, সেগুলিও বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে হয়। পরিশেষে প্রত্যেক অধিকরণের শেষে কল্পতরুকারকৃত শাস্ত্রদর্পণ ও বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর কৃত বৈয়াসিক অধিকরণমালা নামক দুইখানি উৎকৃষ্ট বেদান্ত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ও তাহাদের বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্যও সন্নিবেশিত হইতেছে। এই দুইখানি স্বতন্ত্র পুস্তক এইসঙ্গে মুদ্রিত করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই দুইটী গ্রন্থ স্বতন্ত্র হইলেও ইহাদের ভিতর সংক্ষেপে এক একটী অধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্তাদি সন্নিবেশিত থাকায় ইহাদের দ্বারা সূত্র-ভাষ্য-তাৎপর্য্য সহজে মনে রাখিবার বিশেষ সহায়তা হয়। সুতরাং বিস্তৃত আলোচনার পর ইহাদের সহায়তায় এক একটী অধিকরণ অর্থাৎ এক একটী বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে ভাষ্যকার কি কি কথা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়।

অবশ্য যাঁহারা বেদান্ত সম্বন্ধে মোটামুটি একটা জ্ঞানলাভ মাত্র করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে এ গ্রন্থখানি উপযোগী নহে। কিন্তু আমরা একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যাঁহারা অদ্বৈতবাদের একটু বিস্তৃত পরিচয়

চান, অথচ অল্প সংস্কৃতজ্ঞ বা সংস্কৃতভাষায় একেবারে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা একটু ধৈর্য্যের সহিত গ্রন্থখানি পড়িলে বিশেষ লাভবান্ হইবেন। যাঁহারা কেবল বাঙ্গালা মাত্র জানেন, তাঁহারা অনুবাদ, তাৎপর্য্য প্রভৃতি মাত্র পড়িতে পারেন, আর যাঁহারা কিছু সংস্কৃত জানেন তাঁহারা পণ্ডিতের সাহায্য ব্যতীত কঠিন শব্দগুলির অর্থ এবং আক্ষরিক অনুবাদের সাহায্যে শাঙ্কর-ভাষ্যের ও ভামতীর মূলটী একটু চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। যে ভাবে গ্রন্থ সম্পাদিত হইতেছে, তাহার প্রণালী আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। অনুবাদগুলি আক্ষরিক করা হইতেছে এবং তাৎপর্য্য বা ভাবার্থ পৃথক্ দেওয়া হইতেছে। আমাদের বঙ্গদেশে প্রকাশিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ অনেক সময় প্রকৃত অনুবাদপদবাচ্য নহে, অনুবাদ ও ভাবার্থের খিচুড়িবিশেষ মাত্র। ইহাতে মূলের অর্থ যাঁহারা বুঝিবার চেষ্টা করেন তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। আমরা এই গ্রন্থের অনেক স্থল মিলাইয়া দেখিয়াছি, এই গ্রন্থ উক্ত দোষ হইতে প্রায় বিনির্মুক্ত। এমন কি, ৺ কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের উৎকৃষ্ট অনুবাদেও অনেক স্থলে উক্ত দোষ প্রবেশ করিয়াছিল। আশা করি, শেষ পর্য্যন্ত এই উৎকৃষ্ট প্রণালী অনুসৃত হইবে। ভামতী প্রভৃতির অর্থ বুঝিতে হইলে পূর্ব্বমীমাংসা ও নব্যন্যায়ের জ্ঞান অনেক স্থলে আবশ্যক হইয়া থাকে, অথচ বঙ্গদেশে এই দুই শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ভিতর হইতে একরূপ উঠিয়া যাওয়ায় 'ভাষ্যভামতী প্রভৃতির তাৎপর্য্য' অংশে এ বিষয়ে অনেক বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইয়াছে, তথাপি তর্কভূষণ মহাশয় ভূমিকায় লিখিতেছেন যে, বাহুল্যভয়ে এবং গ্রন্থ কঠিন হইবার আশঙ্কায় পরিমলোক্ত অনেক কথা ইচ্ছানুরূপ ভাল করিয়া আলোচনা করিতে পারেন নাই। তর্কভূষণ মহাশয় পাঠকগণের অধিকার বুঝিয়া যে এই সংযম অবলম্বন করিতে পারিয়াছেন, তাহা আমরা প্রশংসনীয় মনে করি।

এইরূপ ভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমরা একটা কথা বলা বিশেষ আবশ্যক বোধ করিতেছি। আজকাল অনেকের এই মত দেখা যায় যে, মূলগ্রন্থের ভাব যত সহজ ও সরল বোধ হয়, তাহার ভাষ্য ও

তাহার টীকা তদপেক্ষা ক্রমশঃ জটিল হইতে জটিলতর হইতে থাকে, ক্রমশঃ মূল বিষয়টী চাপা পড়িয়া পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণের কতকগুলি ভাবমাত্র আমরা প্রাচীন গ্রন্থকারের নামে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। সুতরাং টীকাদির অবলম্বনশূন্য হইয়া যত মূলের দিকে লক্ষ্য করা যাইবে, ততই মঙ্গল। এই কারণে উপনিষদের তাৎপর্য্য বুঝিতে গিয়া তাহার মীমাংসাস্বরূপ ব্রহ্মসূত্রকে আশ্রয় করা, পরে আবার তাহা বুঝিতে শঙ্কর, শঙ্করকে বুঝিতে ভামতী ইত্যাদি ক্রমে পরের বুদ্ধি তস্য বুদ্ধি আশ্রয় করা অপেক্ষা বেদান্তের তাৎপর্য্য বুঝিতে মূল উপনিষদ্‌কে অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। অনেকের মতই বা বলি কেন, স্পষ্টভাবে বলিলে ক্ষতি কি যে, আমরা নিজেরাই উক্ত মতাবলম্বী? আমরা সর্ব্বদাই মূল অবলম্বন করিয়া স্বাধীন চিন্তারই পক্ষপাতী। আমরা বিশ্বাস করি যে, অন্ধভাবে ভাষ্যকার বা টীকাকারের মতবিশেষ অনুসরণ করিতে গিয়া অনেক সময় যথার্থ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তির অবনতিই সাধিত হয়। সুতরাং শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য যে একমাত্র ব্যাসসূত্রে বা শাঙ্করভাষ্যেই পাওয়া যাইবে, এই মতেই আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাসী নহি—টীকাকারদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা ত দূরের কথা। রামানুজাদি অন্যান্য ব্রহ্মসূত্র-ব্যাখ্যাকারগণের উপরও আমরা যথেষ্ট শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, উপনিষদে ধর্ম্মজীবনের ক্রমোন্নতি অনুসারে নিম্নতম দ্বৈতবাদ হইতে উচ্চতম অদ্বৈতবাদ পর্য্যন্ত সকল মতেরই স্থান আছে। সুতরাং সম্প্রদায়বিশেষের মতাবলম্বনে সমস্ত শ্রুতিবাক্য একটীমাত্র মতবিশেষ সমর্থন করিতেছে, ইহা প্রমাণের চেষ্টা ব্যর্থ চেষ্টা ভিন্ন কিছুই নহে এবং শঙ্কর, রামানুজাদি সকল প্রাচীন আচার্য্যগণের উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধার ভাব থাকিলেও সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, সকলেই অল্পবিস্তর এই দোষে দোষী হইয়াছেন।

কিন্তু তাহা হইলেও আমরা অন্ততঃ প্রাচীনগণের ভাব বুঝিবার জন্যও ব্যাসশঙ্করাদি ও তাঁহাদের টীকাকারগণের বক্তব্য বুঝা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। তাঁহারা তাঁহাদের ব্যাখ্যাতব্য গ্রন্থের যে সকল সূক্ষ্ম অভিপ্রায় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে সকল স্থলে একমত হইতে না

পারিলেও অনেক স্থলেই তাঁহাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হই—মনে হয়, তাঁহাদের টীকার সাহায্য ব্যতীত ইহার যে এত গূঢ় তাৎপর্য্য আছে, তাহা বুঝিতে পারিতাম না। আমরা এখনও সমগ্র দশখণ্ড গ্রন্থ পড়িবার সুযোগ পাই নাই, কিন্তু নানাস্থল হইতে কতক কতক অংশ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' নামক দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যের ব্যাখ্যায় ভামতীকার যে বলিয়াছেন, শুধু জন্ম না বলিয়া জন্মাদি অর্থাৎ জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ বা প্রলয় বলিবার কারণ এই যে, শুধু জন্ম নিমিত্ত কারণ হইতেও হইতে পারে, কিন্তু উপাদান কারণ ব্যতীত কিছুতে স্থিতি ও লয় সম্ভবে না, সুতরাং এই সূত্রদ্বারা ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ উভয়ই, ইহাই সূত্রকারের ইঙ্গিত—ভামতীকারের এই কথাটী আমাদের অতি যুক্তিযুক্ত বোধ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, একটী সামান্যমাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম, কিন্তু পঠিত অংশের ভিতর অনেক স্থলে এইরূপ অনেক নূতন আলোক পাইয়াছি। সুতরাং অন্ধভাবে না হইলেও শ্রদ্ধাবান সমালোচকের দৃষ্টিতে আমরা ভাষ্য টীকাদি উত্তমরূপে আলোচনার বিশেষ পক্ষপাতী এবং তজ্জন্যই বর্ত্তমান গ্রন্থখানির অকপটভাবে সর্ব্বান্তঃকরণেই প্রশংসা করিতেছি।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "আত্মহত্যা কর্‌তে গেলে একটী নরুণের দ্বারাই তাহা সাধিত হইতে পারে, কিন্তু অপরকে মারতে গেলে ঢাল তলোয়ারের দরকার হয়; তদ্রূপ নিজের মুক্তিসাধন শুধু গুরুবাক্যে বিশ্বাস থেকেই হতে পারে, কিন্তু অপরকে বুঝাইতে গেলে অনেক শাস্ত্রাদি পাঠের আবশ্যক হয়।" সুতরাং বিশ্বাসী সাধকের পক্ষে ভাষ্যটীকাদিরূপ শাস্ত্রারণ্যে প্রবেশ ত দূরের কথা, তাঁহার পক্ষে একখানি উপনিষদ্ পর্য্যন্ত পড়িবার কোন প্রয়োজন নাই। আবার যিনি যতটা প্রয়োজন বোধ করেন, তিনি ততটা পরিমাণেই গ্রন্থাধ্যয়নের দ্বারা নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তাও লাভ করিতে পারেন। কিন্তু দর্শনশাস্ত্র বলিয়া যখন এক পৃথক্ শাস্ত্রই রহিয়াছে এবং তাহার উদ্দেশ্য যখন বুদ্ধিবৃত্তির চরম উৎকর্ষ সাধন এবং তাহার করণ যখন সুস্পষ্টার্থবোধক পরিভাষা, তখন যতই সূক্ষ্ম দার্শনিকতার

দিকে অগ্রসর হওয়া যাইবে, ততই আপাতজটিলতাও বর্দ্ধিত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। অনেকেই নব্যন্যায়ের অবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাদি কঠিন, তাঁহাদের-নিকট-একরূপ-অবোধ্য ভাষা শুনিয়াই চমকিয়া উঠেন কিন্তু প্রাচীন আধ্যাত্মিক ভাবরাজি—যাহা সাধন ও উপলব্ধিলভ্য—তাহাদিগকে বুদ্ধি দ্বারা সুস্পষ্ট হইতে সুস্পষ্টতর ভাবে বুঝিবার চেষ্টার ফলস্বরূপ এই আপাত-জটিলতা স্বাভাবিক। পণ্ডিত ব্যক্তি যতক্ষণ না কোন প্রতিজ্ঞা বা অনুমানকে নব্যন্যায়ের ছাঁচে ফেলিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, ততক্ষণ যেন তাঁহার স্বাভাবিক তৃপ্তিই হয় না। স্বামীজি অনেক স্থলে ইহাকে intellectual gymnastics নামে অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু অনেকের পক্ষেই যেমন শারীরিক gymnastics এর প্রয়োজন তদ্রূপ এই intellectual gymnastics এর ভিতর দিয়া যাওয়াও অনেকের পক্ষে প্রয়োজন—সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে তত্ত্ব বুঝিবার জন্য এইরূপ চুলচেরা বিচারের হাত এড়াইবার উপায় নাই। যদি তাঁহারা দেশী টীকাটিপ্পনীর হাত এড়াইবারও চেষ্টা করেন, তবে তাঁহাদের ন্যায় অধিকারীকে বৈদেশিক দর্শনের, বৈদেশিক টীকাটিপ্পনীর বা জটিল দার্শনিক বিচারের ফাঁদে পড়িতে হয়। তদপেক্ষা এই দেশী জঙ্গলের মধ্যে ভ্রমণ শ্রেয়ঃকল্প—কারণ, এই সকল গ্রন্থের ভিতরে তবু মধ্যে মধ্যে প্রাণজুড়ান মুক্তি অপবর্গের প্রসঙ্গ আছে, পাশ্চাত্য জঙ্গলে তাহার একরূপ অত্যন্তাভাব বলিলেই হয়। আর উপযুক্ত উপায়ে আমাদের দেশীয় বিচার গুলির প্রয়োগ করিতে পারিলে তাহাতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অন্যতম সাধন—মননেরও সাহায্য হইতে পারে। সুতরাং টীকাটিপ্পনীগুলির অধিকার-বিশেষে বিশেষ উপযোগিতা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে।

'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রের ব্যাখ্যা ষষ্ঠ খণ্ডে সমাপ্ত হইবার পর উহার শেষে সমুদয় ছয়খণ্ডের একটী ৮৪ পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তারিত সূচীপত্র দেওয়ায় এ পর্য্যন্ত গ্রন্থমধ্যে যতগুলি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, অল্পের মধ্যে তাহা বুঝিতে পারা যায়, প্রকৃত পক্ষে উহা গ্রন্থের ছয়খণ্ডের বিশ্লেষণ স্বরূপ মাত্র। কিন্তু উহার সাহায্য গ্রহণ করিতে গিয়া আমাদের সময়ে সময়ে মনে হইয়াছে, ইহা বর্ণানুক্রমিক করিলে কি তাহা

সর্ব্বসাধারণের আরও উপযোগী হইতে না? কারণ, মূলবিষয় ব্যতীত ইহাতে প্রসঙ্গাগত এত প্রয়োজনীয় অবান্তর বিষয় আলোচিত হইয়াছে যে, এই গ্রন্থকে ইংরাজীতে যাহাকে Book of reference বলে তদ্রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু সামান্যভাবে ইহার নানাস্থান হইতে পড়িয়া পরে বিশেষ বিশেষ বিষয় খুঁজিবার জন্য সূচীপত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে গিয়া আমাদিগকে অনেক হাতড়াইতে হইয়াছে। এই জন্য সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি অনুরোধ, ভবিষ্যতে আমাদের এই মন্তব্যটীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া গ্রন্থখানির সর্ব্বসাধারণের পক্ষে উপযোগিতা যেন আরও বর্দ্ধিত করেন।

আর একটী বিষয়ে আর একটু দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করাও আমরা আবশ্যক মনে করি। পড়িতে পড়িতে অনেকগুলি বর্ণাশুদ্ধি আমাদের চক্ষে পড়িয়াছে। অল্প সংস্কৃতজ্ঞগণের উপযোগী করিতে হইলে গ্রন্থের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধি একান্ত প্রয়োজনীয়। এমন কি, অসাবধানতাবশে একস্থলে শাঙ্করভাষ্যের কিয়দংশ ছাড় হইয়া গিয়াছে লক্ষিত হইল, যথা,—তৃতীয় খণ্ডের ২৮৮ পৃষ্ঠায়—'এবময়মনাদিরনন্তো' ইত্যাদি ভাষ্যাংশ ও উহার অনুবাদটী একবারে ছাড় গিয়াছে। মূল কল্পতরুর সহিত মিলাইতে গিয়া শব্দার্থের মধ্যেও দু'একটী ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হইল। এই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে যদি প্রকাশক মহাশয়কে আরও অধিক অর্থব্যয় করিতে হয় এবং তজ্জন্য গ্রন্থের মূল্যও কিছু বর্দ্ধিত করিতে হয়, তাহাও স্বীকার করিয়া এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

গ্রন্থের মূল্য আজকালকার কাগজ প্রভৃতির দুর্ম্মূল্যতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অল্প হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ১।০ সিকা, কিন্তু গ্রাহক হইয়া এক টাকা জমা দিলে ১৲ টাকায় পাওয়া যায়। প্রাপ্তি-স্থান লোটাস্ লাইব্রেরি, ২৮।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকার মধ্যে তর্কভূষণ মহাশয় গ্রাহকগণের গ্রন্থসমাপ্তি বিষয়ে অধৈর্য্য দেখিয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে, এই চতুঃসূত্রী এবং তর্কপাদ ব্যতীত অন্যস্থলে গ্রন্থ অধিক বিস্তৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা বলি, প্রকাশক শ্রীঅনিল-চন্দ্র দত্ত মহাশয় ১০৮ উপনিষদ্ প্রকাশের সংকল্প করিয়া যখন বৃহৎ

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ সম্পূর্ণ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তখন এই গ্রন্থ সুবৃহৎ হইলেও সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। আর যদিই কোন দৈবদুর্বিপাকবশতঃ সমগ্র ব্রহ্মসূত্রভাষ্য প্রকাশিত নাও হয়, তবে অন্ততঃ চতুঃসূত্রী পর্য্যন্ত এইভাবে চালাইতে পারিলে, তাহাই একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ হইবে এবং সর্ব্বসাধারণের তাহাতেই প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। একথা বোধ হয় অনেকেরই জানা থাকিতে পারে যে, চতুঃসূত্রীতেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার সমগ্র সিদ্ধান্তগুলিই একরূপ বিবৃত করিয়াছেন, অবশিষ্টাংশ উহারই বিস্তার মাত্র। এই কারণে অনেকে চতুঃসূত্রী পর্য্যন্ত উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াই বেদান্তবিদ্যায় কৃতবিদ্য হইলাম জ্ঞান করেন।

উপসংহারে বলি, স্বামী বিবেকানন্দ যে বেদান্তজ্ঞান ভারতের নিভৃত গুহা-মঠাদিতে এবং কঠিন সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থের মধ্যে সুগুপ্ত আছে, তাহারই সর্ব্বসাধারণে বিস্তারকল্পে নিজেকে নিজের ভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান গ্রন্থের দ্বারা তাঁহারই এই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আর একভাবে সাধিত হইতেছে বলিয়া মনে করি। সুতরাং আমরা ভগবৎসমীপে এই বেদান্ত প্রচারের চেষ্টার সাফল্য অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি এবং উদ্বোধনের গ্রাহক ও পাঠকবর্গকেও অনুরোধ করি, যাঁহারা এখনও ইহার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হন নাই তাঁহারা সকলেই এই গ্রন্থের এক এক খণ্ডের গ্রাহক হইয়া অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশক মহাশয়ের উৎসাহবর্দ্ধন করিয়া এই গ্রন্থের নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্তিবিষয়ে সহায়ক হউন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জ্ঞানবৃদ্ধি করিয়া তৎসহায়ে জীবনের চরমলক্ষ্য অদ্বৈতবেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মেরই একমাত্র সত্যতা এবং জগতের সম্পূর্ণ মিথ্যাত্ব উপলব্ধিরূপ মুক্তি বা ব্রহ্মনির্ব্বাণের দিকে অগ্রসর হউন।

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়,
২৫।৪।১৭।

কল্যাণভাজনেষু—

সত্য পথ আশ্রয় করে, প্রভুর প্রতি নির্ভর করে, মনমুখ এক করে চলে যাও—দেখ্‌বে অন্তর্যামী ভগবান্‌ই তোমাদের রক্ষা কর্‌বেন। যেখানে ভাবের ঘরে চুরি, যেখানে মন্দবুদ্ধি, স্বার্থপরতা—সেখানেই ভয়-ডর। যে খুঁটি ধরেছে, যে কম্পাস্ (দিগ্‌দর্শনযন্ত্র) পেয়েছে, তার আর মার নেই—সে সর্ব্বত্র জয়ী—সর্ব্বকালে মুক্ত। স্বামিজীর পত্রাবলী পড়্‌বি, দেখ্‌বি কি তেজ—কার সাহসে তিনি সাহসী হয়ে চল্‌তেন। সম্মুখে অমন অদ্ভুত, অমানুষী আদর্শ থাকতে আবার তোদের ভয়? যারা ঠাকুরকে ডাকে তারা যে যমকেও ভয় করে না রে! তোরা কি ভূতের ভজন করিস্ নাকি? * * *

ভগবানের আশ্রম তিনিই চালাবেন। ও কি তোর ইচ্ছায় হচ্চে—না চল্‌চে? তিনিই সব কচ্ছেন। "মা আমার ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।"

ঠাকুরের কোন কাজ মানুষের কর্‌বার সাধ্য নেই। এসব অদ্ভুত ঈশ্বরীয় শক্তির বিকাশ—অচিন্ত্য শক্তির মহিমা। এর মধ্যে পড়ে তোরা কৃতার্থ হয়ে যা!

ঠাকুরের শক্তিতে শক্তিমান্ হয়ে তোরা কাজে লেগে যা। এতে আনন্দ পাবি—শান্তি পাবি। আমরা ভাল আছি। আগামী শনিবারে হয়ত পূর্ব্ববঙ্গে টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে যেতে হবে—উৎসবে। তোরা আমার ভালবাসা ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জান্‌বি। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—
প্রেমানন্দ।

পুরীর দুর্ভিক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের আবেদন।

উড়িষ্যার পুরী জেলার দুর্ভিক্ষের সংবাদ বাংলার জনসাধারণ এতদিন অনেকটা সংবাদপত্রের সংবাদপাঠের মতই পাঠ করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু ক্রমে উহার ভীষণতার পরিচয় পাইয়া উহার নিবারণকল্পে সর্ব্বসাধারণের একটা চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের এবং দেশের দুই চারিটি সাধারণ জনহিতকর সমিতির তরফ হইতে পুরীর দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু উহা এতটা ভীষণ সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে যে, উহার হস্ত হইতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতগণকে রক্ষা করিতে হইলে আরও চেষ্টা এবং আরও অধিক সাহায্যের অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা অন্যান্য সমিতিসকলের মত পুরীর দুর্ভিক্ষনিবারণ কার্য্যে অগ্রসর হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। মিশনের প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে ইতিপূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ, বন্যা ইত্যাদি কার্য্যের উদ্বৃত্ত যে সামান্যমাত্র সম্বল ছিল তাহাতেই এক্ষণে কাজ চলিতেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সহৃদয় জনসাধারণ এতদিন মিশনকে এবম্বিধ কার্য্যে যেরূপ সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষকার্য্যেও তদ্রূপ করিবেন। অর্থ ও বস্ত্রাদি সাহায্য নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। ঠিকানা (১) প্রেসিডেণ্ট, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড়, জিলা হাওড়া; (২) সেক্রেটোরী রামকৃষ্ণ মিশন, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

২৯শে জুন, ১৯২০। (স্বাক্ষর) সারদানন্দ—

সেক্রেটারী, রামকৃষ্ণমিশন।
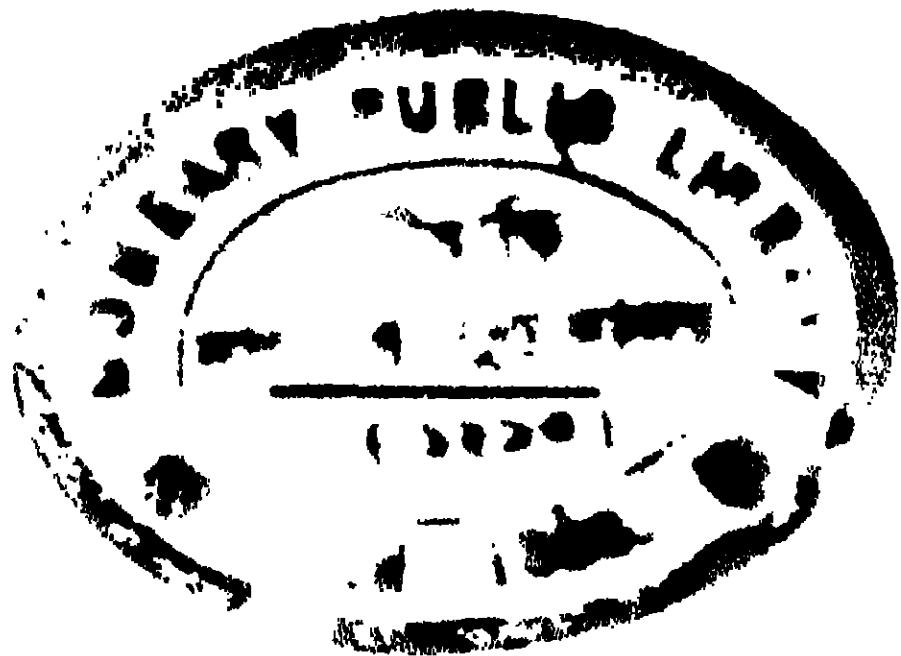
মায়ের কথা।*

(শ্রীমতী সরলাবালা দাসী)

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

আজ মায়ের অর্চ্চনার দিবসে জননীর বিষয়ে যাঁহারা সবিশেষ জানেন না প্রথমে তাঁহাদের অবগতির জন্য দুই একটী কথা বলিব। মায়ের পরিচয়,—তিনি মা, ইহা অপেক্ষা তাঁহার বড় পরিচয় আর কিছুই নাই। মায়ের অন্য পরিচয়—তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নরলীলার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং তিনি বিবেকানন্দপ্রমুখ লোকহিতে সর্ব্বত্যাগী মহাকর্ম্মী বীর সন্ন্যাসী সন্তানগণের জননী। তদ্ভিন্ন তিনি যথার্থই মূর্ত্তিমতী জগজ্জননীরূপা—যে একবারমাত্র প্রাণের সহিত তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছে, সেই তাঁহার ঐহিক পারত্রিক কল্যাণবিধায়িনী মমতার আস্বাদের সহিত তাঁহার ঐ পরিচয় পাইয়াছে।

পিতা—৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মাতা—৺শ্যামাসুন্দরী দেবী।

জন্মস্থান—জয়রামবাটী, জিলা—বাঁকুড়া।

জন্ম—সন ১২৬০, ১৭৭৫ শকাব্দা, ৮ই পৌষ, রাত্রি ২৮ দণ্ড

---

* সিষ্টার নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর নিত্যলীলা-বিগ্রহের অর্চ্চনা দিবসে লেখিকা-কর্ত্তৃক পঠিত।

৩০ পল, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা সপ্তমী। ইং ১৮৫৩ খৃঃ, ২২শে ডিসেম্বর।

নাম—শ্রীশ্রীমতী সারদামণি দেবী।

বিবাহ—১২৬৬ সাল, শ্রীশ্রীমার বয়স তখন ৬ বৎসর মাত্র।

তাঁহার প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আগমন—১২৭৮ সাল, ১লা শ্রাবণ।

নরলীলার অবসানে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যলীলা-বিগ্রহে অবস্থানকাল—১২৯৩ সাল, ৩১শে শ্রাবণ, ইং ১৮৮৬ খৃঃ, ১৬ই আগষ্ট তারিখে রাত্রি ১টার সময়।

শ্রীশ্রীমার ঐরূপে নিত্যলীলা-বিগ্রহে অবস্থানকাল—১৩২৭ সাল, ৪ঠা শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ষষ্ঠী তিথি, রাত্রি ১½ টার সময়।

পুণ্য পৌষমাসকে প্রণাম, জননীর জন্ম-তিথি চান্দ্র অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিকে প্রণাম, এবং যে ধরিত্রী পবিত্র করিয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাকেও আমাদের শত শত প্রণাম।

মা আমার, সন্ততিবৎসলা অপারকরুণাময়ি জননি আমার, আজ আবার তোমার আদরের বিদ্যা-ভবনে তোমারই অর্চ্চনার জন্য, তোমার দীনা তনয়ারা একত্রে মিলিয়াছে। দীনা,—একথা আজ কেন মনে আসে? মাগো, তুমি যাহাদের মা, তাহাদের আবার দৈন্য কিসে সম্ভব? তোমার যে স্নেহ-গৌরবে আমরা আপনাদের গৌরবান্বিতা বলিয়া জানি,—যাহা আমাদের সম্পদে বিপদে, সকল দেশে, সকল কালে, সকল অবস্থায় কি এক অতুল সম্পদের ন্যায়; কি এক অপ্রতিহত শক্তির ন্যায় আমাদিগকে নিত্য বলীয়ান্ করে,—তোমার যে স্নেহের বলে সকল অসাধ্যসাধনে, সকল

দুর্ব্বহবহনে, সকলকেই হৃদয়ে গ্রহণ করিবার ব্রতধারণ করিতেও ভয় পাই নাই,—মাগো, আজিও তো তোমার সেই স্নেহদৃষ্টি ধ্রুবতারকার স্থিরদৃষ্টির মত,আশীর্ব্বাদের অমৃত-কিরণধারায় প্রতিপলে আমাদের অভিষিক্ত করিতেছে, প্রতি নিশ্বাসে, প্রাণের প্রতি স্পন্দনেই তাহা অনুভব করিতেছি। কিন্তু তবুও আজ হৃদয়বীণায় এই অশ্রুসিক্ত সঙ্গীতই বাজিতেছে,—দীনা, তোমার দীনা কন্যাগণ! সেই শুভদিনের কথা আজ মনে পড়িতেছে, যে দিন তোমার শুভ পদার্পণের সৌভাগ্যের আশায় এই বিদ্যালয় পুষ্পপল্লবে সজ্জিত হইত। আজিও কি তোমার এই অর্চ্চনার দিনে তেমনি করিয়াই তুমি হাসিমুখে আসিয়া দাঁড়াইবে, এখনই কি তোমার করুণা-গঠিত প্রতিমাখানি আমরা সেইরূপ নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইব, তোমার সেই পদ্মদলের মত চরণ দু'খানির ধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া ধন্য হইব? মা আমার, সে দিন ফুরাইয়াছে! আজ আর তোমার গাড়ী আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইবে না, তোমার আগমনী সঙ্গীতে যে আনন্দের তড়িৎস্পর্শ প্রাণে প্রাণে ঝঙ্কার তুলিত, আজ আর তাহা বাজিবে না,—আজ তাই প্রাণে জাগিতেছে দীনা,—তোমার দুখিনী কন্যাগণ! মাগো, অনেকদিন তোমার পদতলে আনন্দের অঞ্জলী নিবেদন করিয়াছি, আজ অশ্রুর অঞ্জলীতে তোমার চরণ অর্চ্চনা করি, অশ্রু-গঙ্গোদকে তোমার চরণ পূজা করি। এই নবভাবে পূজাগ্রহণে বুঝি বা তোমার সাধ হইয়াছে, বুঝি বা তাহার প্রয়োজনও হইয়াছে। মাগো, তোমার লীলা-প্রয়োজনেই তুমি কঠিন তুষার রাশিকে খরতাপে সলিলে রূপান্তরিত কর। শত সহস্র খণ্ডতুষার একই বারিপ্রবাহে পরিণত হয়, তাহাদের আর

খণ্ডত্বের ভেদ থাকে না। জননি, আজ তোমার অর্চ্চনার সাফল্য ঐরূপেই হউক—যেন শত শত হৃদয় তোমার শ্রীচরণস্পর্শে বিগলিত হইয়া এক বিশাল প্রেম-প্রবাহে পরিণত হয়,—তাহাদের যেন কিছুমাত্র ভিন্নত্ব থাকে না। আজ এখানে অর্চ্চনা করিতে আমরা যতগুলি ভগিনী একত্র হইয়াছি, জাতি, অবস্থা ও বিভিন্ন সংস্কার প্রভৃতি ব্যবহারিক জগতের এই সমুদয় কাল্পনিক ভিন্নত্ব ভুলিয়া যেন মুহূর্ত্তের জন্যও আমরা এক হইয়া যাই,—মুহূর্ত্তের জন্যও যেন শত শত প্রাণ এক হইয়া এক সহস্রদলপদ্মরূপে বিকশিত হয়,—জগজ্জননি মা আমার, তুমি সেই আসনে অধিষ্ঠিতা হও। তোমার সেই অপার স্নেহ—যাহা ধনী নির্ধনের বিচার জানিত না, জাতি বর্ণ মানিত না, পাপী পুণ্যবানের ভেদ রাখিত না, সকলের সকল সন্তাপহরণে, সকল অভাবপূরণে, সকল কল্যাণবিধানে নিত্য নিযুক্ত থাকিত—সেই স্নেহের স্পর্শ মুহূর্ত্তের জন্যও যেন আমরা প্রতিহৃদয়ে একই অনুভূতিতে অনুভব করি, যেন যন্ত্রিত বীণার ন্যায় শত সহস্র হৃদয়ে আজ সমস্বরে তোমার স্তুতি-সঙ্গীত বাজে,—জননী, " পুণ্য পূজামণ্ডপে তোমার পাদপদ্মে আজ এইমাত্র প্রার্থনা! মা মায়াময়ি, আজ অবগুণ্ঠন মোচন কর, তোমার স্মিতহাস্য-বিকসিত কমল-আনন আজ সকলের কাছে প্রকাশ কর, তোমার করুণনেত্রের অমৃতবর্ষিণী স্নেহদৃষ্টি আজ সকল প্রাণের আমিত্ব-অন্ত-রালের অজ্ঞানান্ধকার দূর করুক! এক চন্দ্রের কিরণে আজ নিখিলজগৎ প্রফুল্ল হোক্। তোমার নর-লীলাবসানের কালে তুমি যে অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছিলে,—সেই চতুর্দ্দিকে মণ্ডলীবদ্ধ যুক্তকরে দণ্ডায়মান তোমার গৈরিকধারী সর্ব্বত্যাগী

স্তবপরায়ণ সন্তানগণ; সেই পুষ্পগন্ধে আমোদিত তোমার অঙ্গসংস্পর্শী পবিত্র বায়ু, আর মধ্যস্থলে তোমার অভয়প্রদ জ্যোতি-উদ্ভাসিত করুণাময়ী প্রতিমা; তোমার সেই মহাপূজার ক্ষণে জাতিবর্ণনির্ব্বিচারে তোমার পাদপদ্মে শত শত উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলী প্রদান, এবং যে অমূল্যক্ষণ আর ফিরিবে না সেই মহামূল্য মুহূর্ত্ত তোমার দর্শনে তোমার পূজায় সার্থক করিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র সেই জনমণ্ডলী,—মা আমার জগজ্জননি, তোমার সেই বিশ্বমাতৃকরূপ আজ আমাদের স্মৃতিপথে উদ্ভাসিত হইয়া আমাদের চিত্তগত সকল মলিনতা ও হীনবুদ্ধি দূর করুক। আজ আমরা সকলে এককণ্ঠে বলি, "জননীর জয় হউক্, আমাদের জীবনে মায়ের নাম জয়যুক্ত হউক্।" সেই মা,—যাঁহার লৌকিক জীবন পবিত্রতার বিমল জ্যোতিস্বরূপ, সেই মায়ের নাম আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউক্। সেই মা,—যাঁহার দৈনন্দিন জীবন ত্যাগের হোমশিখাস্বরূপ, সেই মায়ের নাম আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউক্। সেই মূর্ত্তিমতী স্নেহরূপিণী আমাদের মা, যাঁহার ভালবাসার অমৃত আমাদিগের প্রতিদিনের জীবন মধুময় করিয়া দিত,—যাঁহার আকাশের ন্যায় উদার হৃদয় বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট সকল সন্তানেরই মনের সহিত সমবেদনায় এক হইয়া স্নেহধারায় সকল সন্তাপ দূর করিত, সেই মায়ের নাম আমাদের সকলের জীবনে জয়যুক্ত হউক্। আমরা তাঁহার কন্যা,—এই মহান্ গর্ব্ব আমাদের অপর সকল তুচ্ছ গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিক, আমরা মায়ের কন্যা—এই অনুভূতির অপরাজেয় শক্তি তাঁহার ঈপ্সিত মঙ্গলকর্ম্মসাধনে আমাদিগকে জড়শক্তির সকল প্রবল বাধাই চূর্ণ করিতে সমর্থ করুক, এবং ঐকান্তিক প্রেমে সর্ব্বভূতের সেবাধিকার দান

করিয়া সর্ব্বস্বরূপিণী মা আজ হইতে শত সহস্র মূর্ত্তিতে আমাদের সেবা গ্রহণ করুন—তাঁহার চরণে আজ সকল তনয়ার ইহাই নিবেদন। মাগো, আর এক নিবেদন, আজিকার এই মনের উচ্ছ্বাস, এ যেন বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণিকের জন্য উত্থিত হইয়া বিলীন না হয়, এ উচ্ছ্বাস যেন শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত পূর্ণপাত্রের মত আমাদের জীবন পরিপূর্ণ করিয়া রাখে, এ উচ্ছ্বাস যেন জীবনব্যাপী সাধনারূপে আমাদের জীবনকে ধন্য করে—পবিত্র করে, এ উচ্ছ্বাস যেন সর্ব্বগ্লানিহর প্রেমরূপে পরিণত হইয়া সুখদুঃখের সকল প্রকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত তুচ্ছ জ্ঞান করিতে সমর্থ করিয়া আত্মত্যাগের মহানন্দে আমাদের জীবনকে অভিষিক্ত করে—চিন্ময়ি, এইরূপে তোমার অদর্শনজনিত তাপ আমাদের জীবনে সার্থক হোক্। আজিকার এই মিলন এইরূপে মহামিলন হউক। আমাদের গতজীবনের বহু ভুলভ্রান্তি, বিদ্বেষ বিরোধ, স্বার্থের ক্ষুদ্রতা—যাহা আজ তোমার স্মরণে এখন দূরে রহিয়াছে—এই মিলনমণ্ডপ হইতে ফিরিয়া আবার যেন সাদরে গ্রহণ না করি, যেন পরিত্যক্ত পরিচ্ছদের মত উহাদিগকে ত্যাগ করিয়া প্রতিদিনের সাধনায় অতীতের অশুভ সংস্কার ভুলিয়া তোমার কৃপায়, তোমার সন্তান নামের যোগ্য হইয়া, এ জীবন সার্থক করিতে পারি। কল্যাণময়ি জননি, আজ তোমার চরণাশ্রিতা কন্যাগণকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

স্বস্তি হোক্ শান্তি হোক্ তব আশীর্ব্বাদে হোক্,
নিখিল মঙ্গল,
জননি, করুণাময়ি সর্ব্বজনাশ্রয় হোক্
তব স্নেহাঞ্চল।

মা।

(শ্রী—)

যাহা বিপুলশক্তিমান্ অথচ নীরব তাহার পরিচয় লাভ অতি দুরূহ। ডিনামাইটের ভিতর যে পর্ব্বতচূর্ণকরী, অদ্ভুত শক্তি বিদ্যমান, ডাইন্যামো যে অনন্ত শক্তির আধার, তারহীন বার্ত্তাপ্রেরক যন্ত্র যে জগৎ আলোড়ন-কারী তরঙ্গ প্রেরণে সক্ষম তাহা কে জানিত? কালই ইহাদের পরিচয় প্রদানে সমর্থ। সেইরূপ মানুষের মধ্যেও যিনি অনন্তশক্তিমান্ তাঁহার নীরব সাধনা কালেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। যাঁহাকে অপর দুইজন দস্যুর সহিত জীবন্ত অবস্থায় ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছিল, অন্যূন সহস্র বৎসর পরে সমগ্র ইয়ুরোপ সেই খৃষ্টের পদানত! যে তথাগত বুদ্ধের নামে আজ জগতের, বিশেষতঃ, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম প্রভৃতি স্থানের আবালবৃদ্ধবনিতা মস্তক অবনত করে—যাঁহার পবিত্র স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহার একটী দন্ত, নখর বা কেশের উপর কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয়ে গগনচুম্বী সৌধ বা স্তূপ সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই তথাগতের সুদীর্ঘ জীবদ্দশায় কয়জন লোকই বা তাঁহাকে চিনিয়াছিল—জগতের একতৃতীয়াংশ লোকের তুলনায় তাহারা কয়জন? কিন্তু প্রায় সাত শত বৎসর পরে তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহাই জগতের নিয়ম। মহাপুরুষগণের জীবদ্দশায় তাঁহাদের পরিচয় লাভ খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যতই দিন যাইতে থাকে, মেঘান্তরিত সূর্য্যের ন্যায় তাঁহারা ততই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া লোকচক্ষুর গোচর হইতে থাকেন। কালই ইঁহাদের মহত্ত্বের সাক্ষী। যিনি যত মহৎ তাঁহার শক্তি—তাঁহার প্রদত্ত ভাবরাশি তত দীর্ঘকালব্যাপী কার্য্যকরী হইয়া থাকে। ঈদৃশ পবিত্রাত্মাগণ কখনও আত্মপ্রচারে রত থাকেন না, তাই জগৎ তাঁহাদিগকে জানিতে পারে না। তাঁহারা রাকাচন্দ্রের ন্যায় এই নামযশের জগৎ হইতে বহু ঊর্দ্ধে থাকিয়া প্রেম ও করুণার অমৃতধারায়

এই তৃষিত মরুকে অভিসিঞ্চিত করিয়া শান্তি ও আনন্দের প্রবাহ তোলেন। তাঁহারা বিশ্বের ভূতকে আপনাতে এবং আপনাকে বিশ্বভূতের মধ্যে অনস্যূত দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বিশ্বকল্যাণেই রত থাকেন। ব্রাহ্মণ শূদ্র, উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অসাধু —এ ভেদজ্ঞান তাঁহাদের থাকে না। তাঁহাদের স্থিতিই জগতের অশেষকল্যাণপ্রদ। তাঁহারা যেখানে থাকেন সেখানকার আকাশ পবিত্র—বাতাস পবিত্র—মৃত্তিকা পবিত্র। তাঁহাদের দর্শনে মানুষ পবিত্র হয়—তাঁহাদের সঙ্গলাভে মানুষ ধন্য হয়—তাঁহাদের সেবা করিয়া মানুষ কৃতকৃতার্থ হয়। ঈদৃশ মায়ামুক্ত, জীবৈককল্যাণসাধনব্রত, অহৈতুকীকৃপাসিন্ধু, কামকাঞ্চনগন্ধমাত্রহীন, লীলাবিগ্রহধারী, আপাত-দৃষ্টিতে-সাধারণ-মানববৎ-প্রতীত আত্মার স্পর্শমাত্রে, দৃষ্টিমাত্রে, এমন কি, ইচ্ছামাত্রেই মানবের জীবনস্রোত সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায়—শত শত জন্মের অশুভ সংস্কার দূরীভূত হইয়া শুভসংস্কারের উদয় হয়—মানুষ দেবত্ব, ঋষিত্ব, অমৃতত্ব লাভে ধন্য হয়!

এইরূপ অপার করুণা, প্রেম, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও স্নেহে গড়া একটী মূর্তি এতদিন আমাদের চক্ষুর সম্মুখে দিবারাত্র ঘুরিত, ফিরিত, কথাকহিত, আমাদিগকে খাওয়াইত, আদর-যত্ন করিত, আমাদিগের শত আব্দার সহ্য করিত। আমরা তাঁহাকেই মা বলিয়া জানিতাম। আমাদের কোন ভয়ভাবনা ছিল না—ইহকাল পরকালের কোন চিন্তাই আমাদিগকে ত্রস্ত বা ব্যথিত করিত না। জানিতাম মা আছেন, আমাদের আর ভয় কি। আজ সহসা কাহার রুদ্র ইচ্ছায় সে মঙ্গলমূর্তি আমাদের মধ্য হইতে অপসারিত হইল! কাহার কঠোর আঘাতে সে বীণার তার সহসা ছিঁড়িয়া গেল! কে সে নির্ম্মম যে আমাদের এই সুখের হাট ভাঙ্গিয়া দিয়া আমাদিগকে দীনহীন পথের কাঙ্গাল করিয়া গেল!

কোন মহাপুরুষকে তাঁহার জনৈক শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহারাজ, ভগবান্‌কে ভালবাসিতে পারিব কিরূপে?" তাহাতে তিনি কয়েক দিন পরে তাহাকে নিভৃতে পাইয়া উত্তর দিয়াছিলেন—"তাঁর জন্যে অকিঞ্চন দীনহীন, পথের কাঙ্গাল হ'তে হয়, তবে যদি তাঁকে এতটুকু ভালবাস্‌তে

পারা যায়।" আজ আমাদের সেই কথা মনে পড়িতেছে। মা, তুমি যে উদ্দেশ্যে দেহধারণ করিয়াছিলে—তোমার সন্তানগণকে ভগবদনুরাগী করা-রূপ সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই বুঝি বা, তুমি সহসা আমাদিগের মধ্য হইতে সরিয়া গিয়া আমাদিগকে যথার্থই অকিঞ্চন, দীনহীন, পথের কাঙ্গাল করিয়া গেলে! তোমার অভাবে যাহাতে দিবারাত্র আমাদের তোমাকে মনে পড়ে—তোমার অভাবে যাহাতে আমরা অন্তরে যথার্থ "দীনহীন অকিঞ্চন" হইয়া প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত তোমাকে ডাকিতে পারি—তজ্জন্যই বুঝি তুমি সহসা এত শীঘ্র নিত্যধামে চলিয়া গেলে!

মা, যতদিন শরীরে ছিলে ততদিন তোমার জীবনের প্রত্যেক চেষ্টাটী আমাদের কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তোমার জপ, তপ, ধ্যান, সমাধি—তোমার ব্রত, ত্যাগ, নিষ্ঠা, সংযম,—তোমার সকলের প্রতি সমান ভালবাসা, সেবাপরায়ণতা, দিবারাত্র অক্লান্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান ও নিজ শরীরের সুখদুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা—তোমার সরলতা, নিরভিমানিতা, সহিষ্ণুতা, দয়া ও ক্ষমা—সমস্তই আমাদের শিক্ষার জন্য, আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য। আজ তুমি স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মরূপে বিরাজ করিতেছ। স্থূলভাবে একটীমাত্র শরীরেই তোমার বিশেষ প্রকাশ ছিল—আজ স্থূলদেহের অবসানে তোমার শক্তি সহস্র সহস্র দেহের ভিতর কার্য্যকরী হইবে—নিত্যলীলাবিগ্রহে তুমি সহস্র সহস্র ভক্তহৃদয়ে লীলা করিতে থাকিবে। মা, করুণাময়ি, আমাদিগকেও তোমার সেই লীলাপ্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ কর—তোমার পবিত্রতা, ত্যাগ, তপস্যা, ক্ষমা, সহানুভূতি, নিঃস্বার্থপরতা ও দয়া আবার আমাদের জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠুক। তোমার কোটী-সূর্য্য-অতীত-প্রকাশ পরমসুখদ জ্ঞানমূর্ত্তি আমাদের হৃদয়মন্দিরে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হউক। এতদিন স্থূলচক্ষু দ্বারা বাহিরে তোমাকে দেখিয়াছি—এক্ষণে অন্তশ্চক্ষুসহায়ে ভিতরে তোমাকে দেখিব আর প্রেমানন্দে গাহিব—

"অন্তরে জাগিছ গো মা অন্তরযামিনী।
কোলে করে আছ মোরে দিবসরজনী॥

অধম সুতের প্রতি কেন এত স্নেহপ্রীতি।
প্রেমে যেন একেবারে আহা পাগলিনী॥
এবার বুঝেছি সার, আমি মা'র মা আমার।
চলিব সুপথে সদা শুনে তব বাণী॥"

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ)

সরোবর মাঝে তুমি নীলজল হয়ে থাক
পদ্ম হয়ে ফুটে ওঠ তায়।
লতা'পরে পুষ্পরূপে বিকশিত হয়ে ওঠ
বায়ু হয়ে কাঁপাও তাহায়॥
পশ্চিম গগন তলে লোহিত তপন হয়ে
ধীরে ধীরে তুমি ডুবে যাও।
মেঘ হয়ে সূর্য্যরশ্মি ধরিয়া বিচিত্র বর্ণ
আকাশেতে ছড়াইয়া দাও॥
ঋতুরাজরূপে তুমি নবকিসলয় সাজে
বনানীরে কর সুশোভিত।
কোকিল হইয়া পুনঃ সে সৌন্দর্য্য পান করি
কুহুরবে কর মুখরিত॥
তোমার বিচিত্রলীলা তুমিই জানহ তাহা
মোরা কিছু নাহি বুঝি হরি।
মোহিত হইয়া যাই তোমার এ লীলা দেখি
তোমারেই যাই হে পাসরি॥

শিশুমুখে শুভ্রহাস্যে　　বিকশিত হয়ে ওঠ
　　মাতা হয়ে কর নিরীক্ষণ ।
নববধূ বক্ষে থাক　　সলজ্জ মধুর ভাবে
　　স্বামী হয়ে করহে দর্শন ॥
দরিদ্রের রূপ ধরি　　অতি দীনহীন ভাবে
　　পথপাশে থাকহে পড়িয়া ।
দয়ালু হইয়া পুনঃ　　দরিদ্রের দুখ হেরি
　　করুণায় যাওহে গলিয়া ।
উৎসব গৃহেতে তুমি　　আনন্দ-উজ্জ্বলরূপে
　　গৃহখানি কর আলোকিত ।
শোকের দিনেতে পুনঃ　　সেই গৃহমাঝে আসি
　　অবসাদে ভরে দাও চিত্ত ॥
মোদের হৃদয় মাঝে　　যখন যে ভাব জাগে
　　সব তুমি কর অনুভব ।
মোরা ভাবি আমাদের　　এই সব সুখ দুখ
　　নাহি জানি তোমার বিভব ॥

কঃ পন্থাঃ।

(ব্রহ্মচারী অনন্তচৈতন্য)

"The longest night seems to be passing away, the sorest trouble seems to be coming to an end at last, and the sleeping corpse appears to be awaking * * * * * *. Like a breeze from the Himalayas, it is bringing life into the almost dead bones and muscles, the lethargy is passing away and only the blind cannot see or the perverted will not see that she is awaking, this mother land of ours, from her deep long sleep. None can resist her any more, never is she going to sleep any more, no outward power can hold her back any more, for the infinite giant is rising to her feet."

—*Swami Vivekananda.*

বাংলা জাগিতেছে—বাংলার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভারত আজ জাগিতেছে। মুসলমানগণের বঙ্গ অধিকারের বহুপূর্ব্ব হইতেই তাহার ভাগ্যলক্ষ্মী ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। পূর্ব্ব হইতেই বাংলার গৌরবরবি পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তখনও যাহা কিছু ছিল—তখনও আর্য্যগণের ধর্ম্ম, সভ্যতা, শৌর্য্য, বীর্য্য, উচ্চাদর্শ ও পবিত্রতার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল—তাহাও কালস্রোতে ভাসিয়া গেল সেইদিন, যেদিন অতি অল্পসংখ্যক তুর্কী অশ্বারোহী বিশাল বাংলাদেশকে অনায়াসে হিন্দুর হাত হইতে কাড়িয়া লইল! সূর্য্য ডুবিল—সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার আসিয়া বাংলাকে গ্রাস করিল—তন্দ্রাচ্ছন্ন বাঙ্গালীর নয়নযুগল দীর্ঘকালের জন্য মুদ্রিত হইল! এই দীর্ঘ যামিনীতে বাংলার উপর দিয়া বহু আপদ্ বিপদ্, বহু ঝড় তুফান বহিয়া গিয়াছে—বহু উল্কাপাত, বজ্রপাত তাহার উপর হইয়া গিয়াছে, তবুও বাঙ্গালী জাগে নাই—মধ্যে মধ্যে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কেবল পাশ ফিরিয়া শুইয়া পুনরায় গভীরতর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় বহুযুগ পরে সে আবার ধীরে ধীরে জাগিতেছে; আবার ধীরে ধীরে সে মাথা তুলিতেছে। বাংলার এই নব জাগরণ—ইহা কি স্বপ্ন, না সত্য? এ জাগরণ স্বয়ম্প্রকাশ সূর্য্যের ন্যায় সত্য, ইহাতে কল্পনার বা

সংশয়ের চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান নাই। ভারতের ঋষি, আচার্য্য, দার্শনিক, সাহিত্যিক—ভারতের ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, মূর্খ—ভারতের কৃষক, ব্যবসায়ী, শিল্পী, চাকুরিজীবী—সকলেই অন্তরে অন্তরে গম্ভীরস্বরে এই উদ্বোধন-ধ্বনি শুনিতে পাইতেছে; এবং ঐ দেখ, ভারতের বাহিরে সমগ্র পৃথিবী চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া বাংলার ও সমগ্র ভারতের এই নবজাগরণ সোৎকণ্ঠে লক্ষ্য করিতেছে।

কিন্তু বাংলার ও ভারতের এই জাগরণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জাগরণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। জাপান যে ভাবে জাগিয়াছে, রুশ আজ যে ভাবে জাগিতেছে, ভারত সে ভাবে কখনই জাগিবে না—ইহা সুনিশ্চিত। ভারতের সবই স্বতন্ত্র। তাহার উত্থান, গতি, স্থিতি—তাহার আদর্শ, উদ্যম, ধর্ম্ম—তাহার শিক্ষা, দীক্ষা এবং তপস্যা সকলই স্বতন্ত্র; এই স্বাতন্ত্র্যই তাহার প্রাণ, তাহার জীবন। এই স্বাতন্ত্র্য বলেই সে আজও বাঁচিয়া আছে, এই সংগ্রামশীল পৃথিবীর নিষ্পেষণে সে আজও নিষ্পেষিত হইয়া যায় নাই। এই স্বাতন্ত্র্যকেই অবলম্বন করিয়া সে আবার জাগিতেছে। ভগবদিচ্ছায় রজোগুণী পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া তম-আচ্ছন্ন ভারত কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিয়া অন্ধকারে কিছুই দেখিতে না পাইয়া কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কঃ পন্থাঃ?"—"ওগো, কে কোথায় আছ, এই নিবিড় অন্ধকারে আমায় পথ দেখাও, আলো দেখাও।" পাশ্চাত্য উত্তর করিল—"হতভাগ্য, তুমি জন্মান্ধ কিন্তু আলো আছে, পথ আছে। তুমি আমায় বরণ কর। তুমি চিরপ্রতারিত—তোমার ধর্ম্ম, তোমার পুরোহিত, তোমার শিক্ষা, দীক্ষা, শাস্ত্র তোমার কর্ম্ম, ত্যাগ, তপস্যা চিরকাল তোমায় প্রতারিত করিয়াছে, চিরকাল তোমায় অন্ধকারে রাখিয়াছে। এস, আমার আলোকে দেখ, তোমার চারিদিক্ কি উজ্জ্বল—কি সুখসম্পদে পূর্ণ! ঐ দেখ তোমার সম্মুখে জ্ঞান, গৌরব ও ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত নরনারীগণ কেমন প্রফুল্লচিত্তে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে; আর হতভাগ্য মানব! এই দেখ তোমার দেশ—জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন, ঐশ্বর্য্যহীন, চিরবুভুক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পৌত্তলিক! তোমরা যদি প্রকৃত ধর্ম্মের শুভ্রালোকে আলোকিত হইতে চাও, তবে তোমাদের ঐ কুসংস্কারপূর্ণ শাস্ত্ররাজি অগ্নিকুণ্ডে বা নদীগর্ভে

নিক্ষেপ কর এবং যীশুর উপাসনা কর। আর যদি সুসভ্য হই
সভ্য জগতের সহিত একাসনে উপবেশন করিতে চাও, তবে মাতৃ
ভুলিয়া গিয়া রাজভাষা শিক্ষা কর, ধুতি চাদর গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দি
হ্যাট-কোট-বুটে অঙ্গ আবৃত কর, জীবনীশক্তিবৰ্দ্ধক সঞ্জীবনী সুধা
কর, রমণীগণকে অবাধ স্বাধীনতা দাও—শাঁখা, সাড়ী ফেলিয়া দিয়া
ও জ্যাকেটে তাহাদের কমনীয় অঙ্গের শোভাবৰ্দ্ধন করাও, তাহাদিগ
পুরুষদের সহিত অবাধে এক সঙ্গে বাড়িতে দাও। আর জগতের
ভীষণ জীবনসংগ্রামে যদি জয়ী হইতে চাও তবে, রাজনৈতিক উন্নতি লাভে
জন্য সচেষ্ট হও।" ভারত মূকের মত সব শুনিল। সে মাতৃভাষা ভুলি
কালী কৃষ্ণ ছাড়িয়া যীশু ভজিতে শিখিল, পুরোহিতগণের
মারিল, বেদবেদান্তকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঋষিগণের প্রলাপোক্তি বলি
উপহাসের সহিত উড়াইয়া দিল, মেয়েদের মাথার কাপড় খুলি
বিলাতি পোষাকে অঙ্গ আবৃত করিল এবং চুলের বেণী পৃষ্ঠে ঝুলাই
হস্তে কেতাব দিয়া কলেজে পাঠাইল। ভারতবাসী পরলোক
ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইল—ভগবৎসাধনার অপ্রয়োজনীয়তা বুঝি
রাজনৈতিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করিল—ত্যাগকে আদর্শ ছাড়িয়া
ভোগকে আদর্শ করিল। ইহার ফলে হইল কি? একি, এ যে হিতে
বিপরীত হইল! হিন্দুর বিলাসহীনা, হ্রীসৌন্দর্য্যভূষিতা, পবিত্রস্বভাবা,
চিরসংযতা রমণীকুল আজ যে বিলাস-মগ্ন, গৃহকর্ম্মে ও ব্রত পূজাদির অনুষ্ঠানে
উদাসীন ও নাটকনভেল পাঠে ব্যস্ত হইল! রাজনৈতিক অধিকার লাভকেই
জাতীয় জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া তল্লাভের আশায় ভারত তাহার
মন প্রাণ নিয়োজিত করিল। নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে বক্তাগণের
মুখ হইতে অনল উদ্গারণ হইতে লাগিল—ফলে শত শত যুবক
রাজনৈতিক-আন্দোলন-অপরাধে নির্ব্বাসিত ও কারারুদ্ধ হইল, কেহ কেহ
ফাঁসীকাষ্ঠেও ঝুলিল! কত জনকজননী বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোকে মৃতপ্রায়
হইল, কত সতীসাবিত্রী পতিহারা হইল এবং এক অব্যক্ত আর্ত্তনাদে
ভারতের আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠিল!

কিঞ্চিন্ন্যূন দুই শতাব্দীর পর এক্ষণে শ্রীভগবানের চৈতন্যময় অঙ্গুলি

স্পর্শে তাহার মোহনিদ্রা ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিতেছে, আজ সে খ্রীষ্টীয় পাদ্রিদের তেক কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া পুনরায় তাহার বাপদাদার প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরের, বিষ্ণুশালার ভিতর হইতে চামচিকের বিষ্ঠা পরিষ্কার করিয়া উহা সুমার্জ্জিত করিতেছে, মন্দিরচূড়া হইতে অশ্বত্থ বট প্রভৃতি আগাছা কাটিয়া উহার জীর্ণ সংস্কার করিতেছে, পুনরায় দেবতার ভোগের জন্য চাল-কলার আয়োজন করিতেছে। রাজনৈতিক ভীষণ পরীক্ষার পর আজ অনেকেই বুঝিতেছেন—'না এ পথ ঠিক নয়—রাজনীতি পরিত্যাগ কর, ভারতের পথ স্বতন্ত্র।' প্রায় দ্বাবিংশ বৎসর অতীত হইল পূর্ণ-জ্ঞান-দৃষ্টি-সম্পন্ন আচার্য্য বিবেকানন্দ ভারতের শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন—

"প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটা না একটা বিশেষত্ব আছে, প্রত্যেক ব্যক্তিই বিভিন্ন পথে উন্নতির দিকে অগ্রসর। * * * ব্যক্তি সম্বন্ধে যেমন, ব্যক্তির সমষ্টি জাতি সম্বন্ধেও ঠিক তাই। প্রত্যেক জাতির একটা না একটা যেন বিশেষ ঝোঁক আছে, প্রত্যেক জাতিরই যেন বিশেষ বিশেষ জীবনোদ্দেশ্য থাকে। সমগ্র জাতিকেই যেন সমগ্র মানব-জাতির জীবনকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য কোন এক ব্রতবিশেষ পালন করিতে হয়। নিজ নিজ জীবনোদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিয়া প্রত্যেক জাতিকেই সেই সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। রাজনৈতিক ও সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য নহে, কখনও ছিল না, আর জানিয়া রাখুন, কখন হইবেও না। তবে আমাদের জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য আছে। তাহা এই—সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি একত্রীভূত করিয়া যেন এক বিদ্যুতাধারে রক্ষা করা এবং যখনই সুযোগ উপস্থিত হয় তখনই সমষ্টীভূত শক্তির বন্যায় জগৎকে প্লাবিত করা।"

কিন্তু তখন ভারতের বড় কেহ এই নগ্ন ভিক্ষুকের বাক্যে কর্ণপাত করে নাই। তখন ভারতের তথাকথিত জননায়কগণ মাতৃভূমিকে রাজনৈতিক উন্নতির গৌরবে গৌরবান্বিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর—তাই এই সন্ন্যাসী ভিক্ষুকের বাণী তখন কাহারও অন্তরদেশ স্পর্শ করিতে না পারিয়া ভারত মহাসমুদ্রের কোলাহলময় তরঙ্গরোলের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ তাঁহার বাণী সফল হইতে চলিয়াছে। আজ এই প্রবল রাজ-নৈতিক আন্দোলনের পর বিরল কোন কোন ভাগ্যবান্ জননায়ক বুঝিয়াছেন—রাজনৈতিক আন্দোলনে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল কিছু হইবে না। উহা সম্পূর্ণ বিলাতি আমদানী। ভারতের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু

বাংলা ও ভারতের আশা ভরসাস্থল, পবিত্রহৃদয়, সর্ব্বত্যাগী, অকপট যুবকবৃন্দ,—যাঁহারা মাতৃভূমির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় হৃদয়ের উষ্ণশোণিতধারা বিন্দু বিন্দু পাত করিয়াছেন, যাঁহারা ভারত-জননীর স্নেহপীযুষভরা বদনকমলের দিকে চাহিয়া কঠোর কারাবাস ও নির্ব্বাসনযন্ত্রণা অসীম ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়াছেন,—তাঁহারা যে এই কয়েক বৎসরব্যাপী কঠোর তপশ্চর্য্যার পর ভগবৎকৃপায় রাজনৈতিক আন্দোলনের অসারতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, ইহা দেখিয়া আজ আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে। কিন্তু মনে হয়, এখনও তাঁহারা সকলেই সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য মোহ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন নাই, এখনও তাঁহারা দরিদ্রা ভারত-জননীর ভগ্নকুটীর মধ্যস্থিত নিরুপম রত্নরাজির প্রকৃত সন্ধান পান নাই। তাঁহারা ভগবৎ কৃপায় ধর্ম্মকে ধরিতে পারিয়াছেন—কিন্তু ধর্ম্মের মহান্ ও বিশুদ্ধ আদর্শটীর এখনও সন্ধান পান নাই। এখনও পাশ্চাত্যের চাকচিক্যময় আপাতমনোরম ভোগচিত্র তাঁহাদের চক্ষুকে প্রতারিত করিতেছে, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে উহার মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বলেন—ভারতের ত্যাগ ও বৈরাগ্যমূলক ধর্ম্মের আদর্শ ভারতের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ভারতকে দুঃখ-দারিদ্র্যে নিপীড়িত করিতেছে, ভারতকে পঙ্গু, অথর্ব্ব, পরমুখাপেক্ষী করিতেছে—বৈরাগ্যমূলক ধর্ম্ম ভারতের সকল শক্তি-সামর্থ্য অপহরণ করিয়াছে। সুতরাং এই জাগ্রত নবযুগে সনাতন ত্যাগ মার্গের অনুসরণ দেশ ও সমাজের পক্ষে মহা সর্ব্বনাশকর। যাঁহারা এই ভাবের কথা আজ দেশের লোককে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটী কথাও বলিতে চাহি না—কেবলমাত্র এইটুকু বুঝিবার চেষ্টা করিব যে, তাঁহাদের উক্তি সত্য কি না? বর্ত্তমানে দেশে ঐহিক উন্নতির যে কিছু প্রয়োজন হইয়াছে তাহাতে কোন ভুল নাই। ব্যষ্টি মানব যেরূপ ঐহিক ভোগ্যবস্তু সমূহ কিছু কিছু ভোগ না করিলে সম্পূর্ণ ত্যাগমার্গে আসিতে পারে না, সমষ্টি মানব বা জাতির পক্ষেও তদ্রূপ। কিন্তু তাই বলিয়া উচ্চ আদর্শকে খর্ব্ব করা ত বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। ইন্দ্রিয়সুখভোগ যে স্বল্পকালস্থায়ী এবং উহার ফলও অদূর ভবিষ্যতে ভীষণদুঃখপ্রদ এই কথাটী

তাহাদের কর্ণের নিকট সর্ব্বদা ধ্বনিত করিতে হইবে—তবেই তাহাদের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। অপর পক্ষে, দেশের জনসাধারণের সম্মুখে ত্যাগের মহান্ আদর্শটীকে উজ্জ্বল না রাখিয়া তাহাদিগকে কেবলই ঐহিক ভোগ-সুখের জন্য অনুপ্রাণিত করিলে দেশের ভীষণ সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী—আদর্শকে খর্ব্ব করিলে ত কথাই নাই।

আমাদের জানা উচিত, ত্যাগমার্গ আর কিছুই নহে—উহা ক্ষুদ্রতম ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তম ভোগ্যবস্তু পাইবার উপায় মাত্র। 'Little must be sacrificed for the greater one'—ইহাই সনাতন নিয়ম। অনন্ত ভোগের অধিকারী সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে কীটপরমাণু পর্য্যন্ত সুখভোগ চাহে না কে? আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই সুখভোগের জন্য অধীর। মায়াবাদী সন্ন্যাসী হইতে ঘোর বিষয়ী পর্য্যন্ত সকলেই সুখের জন্যই প্রাণপাত করিতেছে। কিন্তু প্রকৃত সুখ কিসে হয়? বিষয়-ভোগে না বিষয়ত্যাগে?

জগতের লোক ত ভোগের জন্য—ঐহিক উন্নতির জন্য ছুটিতেছেই—উহার জন্য কি আবার শাস্ত্রের বিধান দরকার? পাহাড় হইতে নামিবার সময় অশ্বের রাশ টানিয়া ধরিতে হয়, না উহাকে কশাঘাত করিতে হয়? যে আরোহী রাশ টানিয়া থাকে সেই নিরাপদে নীচে নামিতে পারে, যে রাশ ছাড়িয়া দেয় বা অশ্বকে কশাঘাত করে তাহার পতন ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমাদের মন ত সদাই বিষয় ভোগের দিকে—ঐহিকের দিকে ছুটিতেছে—সমস্ত প্রকৃতিই ঐ ভোগযজ্ঞে ইন্ধন জোগাইতেছে। তবে আর কেন? সেই ভোগযজ্ঞে যদি আরও ঘৃতাহুতি দেওয়া যায় তবে যজ্ঞশালায় আগুন লাগিয়া ঋত্বিক্ ও যজমান সকলেই পুড়িয়া মরিবে। কারণ, "জড়বাদপ্রসূত নির্ব্বুদ্ধিতা প্রতিযোগিতা, অযথা উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অবশেষে ব্যক্তিগত ও জাতিগত মৃত্যু আনয়ন করে।" বিগত ইউরোপীয় মহাসমরই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আমাদের কর্ত্তব্য সদাসর্ব্বদা ভোগের রশ্মি সংযত করিয়া ধরা—সর্ব্বদা ত্যাগ বৈরাগ্যের আদর্শ উজ্জ্বল রাখা—তবেই ঠিক ঠিক ভোগের পথে—ঐহিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব। নতুবা ভোগই করিতে

পারিব না—ত্যাগ ত দূরের কথা। দেশের লোক ত ঐহিক সুখভোগ করিবেই—কেহই তাহাদিগকে রোধ করিতে পারে না। শ্রুতিবাক্যই ইহা সমর্থন করিতেছে :—

"পরাচঃ কামাননুযন্তি বালা-
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥

(কঠোপনিষদ্)

—বালকগণ অর্থাৎ বালকের ন্যায় অবিবেকসম্পন্ন লোক সকল বাহ্য শব্দাদি বিষয়ের অনুসরণ করিয়া থাকে। তাহারা অতি মহৎ বহু-কালব্যাপী অবিদ্যা বাসনাদিরূপ মৃত্যুর পাশ অর্থাৎ জনম মরণাদি ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। এই কারণে ধীরগণ ধ্রুব অর্থাৎ প্রকৃত মোক্ষের স্বরূপ অবগত হইয়া এই জগতে অধ্রুব বা মিথ্যা বস্তু বিষয়ে কিছুই প্রার্থনা করেন না।

এক্ষণে দেখা যাউক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ্যবস্তু সমূহ বর্জ্জন করিয়া মানব কি কি সুখ সম্ভোগের অধিকারী হয়। বিষয়রসের স্পৃহা ত্যাগ করিলে মানব এমন একটী অমৃত-উৎসের সন্ধান পায় যাহা হইতে অনন্তকাল ধরিয়া অমৃত আহরণ করিলেও উহা নিঃশেষিত হয় না—যে সুখ ও সৌন্দর্য্যভোগে বিচ্ছেদ নাই, পরিবর্ত্তন নাই এবং পরিণামে অনন্ত দুঃখ লাভেরও ভয় নাই। সে এমন একটী চিরসুন্দর পুরুষের সন্ধান পায় যাহার সৌন্দর্য্যের নিকট কামিনীর রূপ ত তুচ্ছ, চন্দ্রসূর্য্যের কিরণও পরিম্লান হইয়া যায় এবং যাহাকে লাভ করিয়া কুবেরের ভাণ্ডারও তৃণতুল্য বলিয়া বোধ হয়।

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

'যে বস্তু লাভ করিলে অন্য বস্তু প্রাপ্তিকে তদপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে হয় না এবং যে অবস্থায় অবস্থিত থাকিলে শীতোষ্ণাদি মহাদুঃখেও মানুষ বিচলিত হয় না।' ভোগমার্গ মানবকে চিরকাল প্রতারিত করে মাত্র,

অচিরস্থায়ী সুখের আস্বাদনে মানবকে মোহিত করিয়া অনাদি কাল ধরিয়া তাহাকে জীর্ণ করে মাত্র—"ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তাঃ" এই শ্রুতিবাক্যই ইহার প্রমাণ স্বরূপ এবং একমাত্র বিষয়বর্জ্জনরূপ ত্যাগ-যোগই জীবকে অনাদিকাল ধরিয়া প্রকৃত সুখসম্ভোগ দান করিয়া আসিয়াছে, আসিতেছে ও আসিবে। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী ত্যাগ-যোগই, শুদ্ধ ভারতের নহে, সমগ্র জগতের একমাত্র উচ্চাদর্শ।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কেন রাজর্ষি জনকের ত ত্যাগভোগ দুইই ছিল? ইহার উত্তরে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় বলি—'হাঁ তাহা পারা যায় বটে তবে জনকের ন্যায় বহু বৎসর হেঁটমুণ্ড ঊর্দ্ধপদ হইয়া তপস্যা করিতে হইবে। দুধকে প্রথমে নির্জ্জনে দধি পাতিয়া পরিশ্রমের সহিত মাখন তুলিয়া জলের মধ্যে রাখিলে যেরূপ মাখন জলে মিশিয়া যায় না, সেইরূপ জনকের ন্যায় বহুবর্ষব্যাপী কঠোর তপশ্চর্য্যা ও গভীর সাধনার পর দুর্জ্জ্ঞেয় জ্ঞান লাভ করিয়া সংসারে ভোগের মধ্যে থাকিতে পার, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। কিন্তু তৎপূর্ব্বে যদি উহা করিতে যাও তবে দুধ ও জলে মিশিয়া যাইবে অর্থাৎ সংসারের আপাতমধুর বিষয়ভোগে বদ্ধ হইয়া জন্মমৃত্যুর অধীন হইবে।' হে নবীন, তুমি কি রাজর্ষি জনক হইবার পূর্ব্বে তাঁহার ন্যায় কঠোর তপস্যা করিতে প্রস্তুত আছ, না, শুধু মুখের কথায় ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বা বকল্‌মা দিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে ও জগৎকে প্রতারিত করিতে চাও?

ধর্ম্মের দিক্ দিয়া দেখা গেল যে, ত্যাগমার্গ আমাদিগের অনিষ্টকারী ত নহেই বরং পরম কল্যাণেরই নিদান। এক্ষণে, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক্ দিয়া দেখা যাউক উহা আমাদিগের কি সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধর্ম্মমার্গাবলম্বী নবীনরা বলিয়া থাকেন যে, ত্যাগের আদর্শই ভারতের এই গভীর সর্ব্বনাশের একমাত্র কারণ—উহা জাতিশরীরের ইন্দ্রিয়গুলিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়াছে এবং জনকয়েক ব্যক্তির স্বার্থসুখের জন্য সমগ্র জাতি ও সমাজের কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাস্তবিক যদি তাহাই হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত

আদর্শের প্রতিবিধান ও পরিবর্ত্তন করা যে অবশ্যকর্ত্তব্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা দেখিতে পাই, কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ভারতের সর্ব্বপ্রধান সর্ব্বনাশকর ব্যাপার—ভারত হইতে ব্রাহ্মণ্য, ক্ষাত্র ও বৈশ্যশক্তির হ্রাস এবং ভারতের স্বাধীনতা-হীনতা। কালপ্রবাহে ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনের হীনতায় ঘোর স্বার্থপরতা ব্রহ্মণ্য শক্তির ও কুরুক্ষেত্রের ভীষণ লোকক্ষয়কর সংগ্রাম ভারতের ক্ষাত্র শক্তির ধ্বংসের একমাত্র কারণ। কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধের পর ভারতে উপযুক্ত পুরুষের একান্ত অভাব হইল, আত্মকলহে লিপ্ত হইয়া সমস্ত ভারত খণ্ড খণ্ড অসংখ্য রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল, একে অপরের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইল। ইহার বহুকাল পরে রাজপুত, শিখ ও মহারাষ্ট্র জাতির ভিতর আবার ক্ষাত্র শক্তির বিকাশ দেখা দিয়াছিল কিন্তু স্বার্থপ্রসূত একতাহীনতা, পরস্পর শত্রুতা, অন্তর্যুদ্ধ ও বহিঃশত্রুগণের বারংবার প্রবল আক্রমণে ভারত ক্রমশঃ ক্ষীণশক্তি হইয়া পরিশেষে তাহাদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইল। আর বৈশ্যগণের উপর বৈদেশিকগণের নানাবিধ প্রবল অত্যাচার ও প্রতিযোগিতা ভারতের বৈশ্যশক্তির সর্ব্বনাশ সাধন করিল। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, কালপ্রভাবে ভারতের ধর্ম্মহীনতা, স্বার্থপরতা, ষড়যন্ত্র ও তৎপ্রসূত দুর্ব্বলতা, পরাধীনতা ও তদ্ধেতু ব্যবসায় বাণিজ্যের লোপ প্রভৃতিই ভারতের অবনতির সর্ব্বপ্রধান কারণ। ত্যাগধর্ম্মের বহুল-প্রচার বশতঃ ভারতীয় রাজন্যবর্গ বৈরাগ্যপরায়ণ হইয়া সংগ্রামাদিতে লিপ্ত না হওয়ায় বা সন্ন্যাসিগণের সংখ্যাধিক্য বশতঃ উপযুক্ত সৈন্যসংগ্রহ করিতে অক্ষম হওয়ায় যে ভারত পরপদদলিত হইয়াছে এবং উক্ত কারণ বশতঃই বৈশ্য ও কৃষককুলের অভাব হইয়া দুর্ভিক্ষাদিতে যে ভারত উৎসন্ন গিয়াছে তাহা নহে। পক্ষান্তরে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সময় আর্য্যদিগের মধ্যে ত্যাগের বহুল প্রচার হইত, যে সময় ভারতের পর্ব্বতে, অরণ্যে এবং গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা প্রভৃতি নদীতটে অসংখ্য ইহ-বিমুখ মুনি-ঋষির দর্শনলাভ ঘটিত, যে সময় শত সহস্র শিষ্যসহ ঋষিগণ একমাত্র ভিক্ষান্ন ও রাজবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া তপস্যা, শাস্ত্রচর্চ্চা ও অধ্যাপনায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতেন, সেই সময়েই ভারতের ধর্ম্ম, জ্ঞান, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য

অপূর্ব্ব বিকাশলাভ করিয়াছিল—ভারতের ইতিহাস অদ্যাবধি ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তৎপরে ভগবান্ বুদ্ধদেবের ত্যাগধর্ম্মের প্রচারে যখন ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সন্ন্যাসধর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিল তখন দেশে ধর্ম্ম, নীতি, কর্ম্ম ও শিল্পকলার যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল অন্য কোন সময়ে সেরূপ হইয়াছে কি না সন্দেহ। বর্ত্তমান যুগেও মায়াবাদ বা ত্যাগমূলক ধর্ম্ম ভারতের অবাধ-উন্নতির পথে 'অচলায়তনের' মত দণ্ডায়মান হইয়া উহার অবাধগতির পথে বিশেষ প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়াছে এই যে ভ্রান্ত ধারণা তাহাও সম্পূর্ণ অজ্ঞতামূলক। বরং এই মায়াবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদ বা ত্যাগমূলক ধর্ম্মের দ্বারাই বর্ত্তমান ভারতের যে কি পরিমাণ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অধুনা ভারতের লোক সংখ্যা প্রায় ত্রিশ কোটী। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা প্রায় বিশ কোটী। এই বিশ কোটীর মধ্যে রমণীর সংখ্যা ধরিলাম দশ কোটী, বাকী দশ কোটী পুরুষের মধ্যে বংশপরম্পরাক্রমে-ভিক্ষুকদিগকে গণনা হইতে বাদ দিলে যথার্থ সন্ন্যাসীর সংখ্যা সহস্রের মধ্যে একজন মাত্রও হইবে কিনা সন্দেহ, অবশিষ্ট নয়শত নিরনব্বই জন ব্যক্তিই প্রবৃত্তিমার্গাবলম্বী সংসারধর্ম্মী। তাহারা সকলেই সাংসারিক উন্নতির জন্য কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি সহায়ে এই জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য প্রাণপাত করিতেছে—তাহারা সকলেই অর্থাগমের নব নব উপায় আবিষ্কারের জন্য দেহ মন নিয়োজিত করিয়াছে ও করিতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সহস্র ব্যক্তির মধ্যে একজন মাত্র যে বিষয়ের উন্নতিবিধানে উদাসীন এবং অবশিষ্ট নয়শত নিরনব্বই জন ব্যক্তি যে বিষয়ের উন্নতিবিধানের জন্য বদ্ধপরিকর, সেই বিষয়ের উন্নতি না হইলে তাহার জন্য দায়ী কি ঐ একজন মাত্র সন্ন্যাসী, না ঐ নয়শত নিরনব্বই জন সংসারী? পক্ষান্তরে, সহস্রের মধ্যে ঐ একজনমাত্র ব্যক্তি অবশিষ্টের যে কতদূর কল্যাণ সাধন করিয়াছে তাহাই এক্ষণে দ্রষ্টব্য। আমরা দেখিতে পাই, যথার্থ ত্যাগী ভগবৎপ্রেমিকই স্মরণাতীত কাল হইতে জগতে শান্তি ও প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া অধর্ম্মের গ্রাস হইতে জগৎকে চিরদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। ইতিহাসই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

জগৎ কাহাদের অনুপ্রেরণায় চালিত? ইউরোপ ও আমেরিকা আজ কাহার নামে মস্তক অবনত করে, কাহার শক্তিতে একতাবদ্ধ—কাহার শক্তিতে দণ্ডায়মান তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে খ্রীষ্টের শরীরাবলম্বনে যে মহতী ভগবচ্ছক্তির প্রকাশ হইয়াছিল তাহাই এখনও পাশ্চাত্য জাতিকে রক্ষা করিতেছে। তাই আজও সমগ্র ইয়ুরোপ ও আমেরিকার নগরে নগরে, এমন কি, গ্রামে গ্রামে মহাত্যাগী ভগবান্ খ্রীষ্টের নামে গগনস্পর্শী ধর্ম্মমন্দির সমূহ সগৌরবে দণ্ডায়মান হইয়া মহাভোগবিলাসী জাতির কর্ণেও "Ye cannot worship God and Mammon at the same time."-রূপ ত্যাগের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া উহাকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতেছে। চীন বল, জাপান বল, পারস্য বল, সকল দেশই ত্যাগের শক্তিতে বিধৃত। খ্রীষ্ট, মহম্মদ, কনফুসিয়স, বুদ্ধের পদতলে আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগৎ বিক্রীত—ভারতের ত কথাই নাই। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সকলেই সনাতন ধর্ম্মের রক্ষার জন্য আর্য্যভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহারাই সনাতন ধর্ম্মের সংরক্ষক ও প্রচারক। ভারতের যাহা প্রাণ, হিন্দুর যাহা সম্পদ্, সেই বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি সকলই এই ভোগবিমুখ ঋষি মহর্ষি-গণের মধ্যদিয়াই জগৎসমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। যাহার উপর ভারতের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে, যাহা ভারতের মেরুদণ্ডস্বরূপ, যাহা বিনষ্ট হইলে সমস্ত হিন্দুজাতি অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, সেই সনাতন ধর্ম্মকে একমাত্র সংসারবিমুখ ত্যাগিগণই নগরে, অরণ্যে, পর্ব্বতে, বিহারে ও গুহার মধ্যে অনাদি কাল হইতে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের পদতলে বসিয়াই ভারত এবং সমগ্র জগৎ ধর্ম্মের মহান্ সত্য-সমূহ চিরকাল শ্রবণ করিয়া আসিয়াছে, আসিতেছে ও আসিবে। বর্ত্তমানযুগে ভারতের উপর যে প্রবল জড়বাদের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল, যাহার প্রবল আবর্ত্তে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়া উঠিয়াছিল, এই যুগসন্ধিক্ষণে যদি ত্যাগিশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ভারতে জন্মগ্রহণ না করিতেন তবে আজ বাংলা ও

ভারতের যে কি গভীর অধঃপতন হইত তাহা আমাদের ন্যায় অল্পবুদ্ধি মানবের কল্পনারও অতীত! অধিকন্তু দেখিতে পাই, এই ভীষণ স্বার্থ-পরতার যুগে যাঁহারা সংসারের সমস্ত স্বার্থসুখে জলাঞ্জলি দিয়া কত বিপদ্ আপদ্ ও সংগ্রামের মধ্যে অগ্রবর্ত্তী হইয়া মোহাচ্ছন্ন জন্মভূমির চৈতন্য-সম্পাদন-মানসে আজ বদ্ধপরিকর—যাঁহারা ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতির জন্য তাহার লুপ্ত জীবনীশক্তির পুনরুদ্বোধনে আজ প্রাণপণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ত্যাগী—সন্ন্যাসী। ইহাও স্বীকার করি যে, জীবন সংগ্রামে ভীত বা ঐহিক স্বার্থসাধনেচ্ছু ব্যক্তিও অল্পবিস্তর পরিমাণে ত্যাগমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমাজকে ও নিজকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে ও করিতেছে কিন্তু তাহার জন্য প্রকৃত দায়ী কে? যদি চিকিৎসাশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি কাহারও প্রাণহানির কারণ হয়, তাহার জন্য ঐ ব্যক্তি দায়ী না হইয়া কি চিকিৎসাশাস্ত্র দায়ী হইবে? তদ্রূপ ত্যাগের মহান্ উচ্চাদর্শের আবরণে নিজকে আবরিত করিয়া যদি কোন ব্যক্তি জাতির ও সমাজের অকল্যাণ সাধন করে তবে ঐ প্রবঞ্চকের উপর দোষা-রোপ না করিয়া ত্যাগের মহান্ আদর্শের উপর কলঙ্কক্ষেপন করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য? যাহা হউক, এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ত্যাগের মহান্ শান্তিপ্রদ পন্থাই ভারত এবং সমগ্র জগতের কল্যাণের নিদান। হে নবীন, পাশ্চাত্য দার্শনিকের ত্যাগভোগ-সামঞ্জস্যবাদের মোহাবরণ নয়নযুগল হইতে খুলিয়া ফেলিয়া, একবার শ্রদ্ধাপূতহৃদয়ে ভারতের জীর্ণ কুটীরের দিকে দৃষ্টিপাত কর,—দেখিবে তাহার জীবনীশক্তি ত্যাগরূপ আধারের ভিতর নিহিত রহিয়াছে। উহাকে অবহেলা না করিয়া উহার উপরিস্থিত মলামাটি ধুইয়া ফেল, দেখিবে অচিরেই তাহার উজ্জ্বল কনক-কিরণ সমগ্র জগতের উপর ছড়াইয়া পড়িবে এবং গভীর অমানিশার পথহারা মানব ঐ উজ্জ্বল আলোকে পথ পাইয়া আপনাপন শ্রেয়ের দিকে অগ্রসর হইবে।

যিনি বর্ত্তমান ভারতের গুরু, যিনি বর্ত্তমান ভারতের পথপ্রদর্শক, যিনি গভীর পতন হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার মানসেই ভগবৎ-নির্দ্দেশে অপরিচ্ছিন্ন-ব্রহ্মানন্দ-উপভোগ ত্যাগ করিয়া ভারতমাতার গর্ভে

জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া তাঁহার রত্নপ্রসবিনী নাম সার্থক করিয়াছিলেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটী লোকহিতকর বাণীর উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের সমাপ্তি করিব। পাশ্চাত্যবিজয়ের পর ভারত-প্রত্যাবর্ত্তন কালে দাক্ষিণাত্যের রামনাদ নামক স্থানে তিনি বক্তৃতাকালীন বলিয়াছিলেন—

"আমাদের এই মাতৃভূমিতে এখনও যে ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যার নির্ঝরিণী বহিতেছে, এখনও তাহা হইতে মহাবন্যা প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগৎকে ভাসাইয়া রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ও প্রতিদিন নূতন ভাবে সমাজগঠনের চেষ্টায় প্রায় অর্দ্ধমৃত হীনদশাপন্ন পাশ্চাত্য ও অন্যান্য জাতিকে নূতন জীবন প্রদান করিবে। নানাবিধ মত মতান্তরের বিভিন্ন সুরে ভারতগগন প্রতিধ্বনিত হইতেছে সত্য, কোন সুর ঠিক তালে মানে বাজিতেছে কোনটী বা বেতাল, বটে, কিন্তু বেশ বুঝা যাইতেছে, উহাদের মধ্যে একটী প্রধান সুর যেন ভৈরবরাগে সপ্তমে উঠিয়া অপরগুলিকে আর শ্রুতিবিবরে পঁহুছিতে দিতেছে না। ত্যাগের ভৈরবরাগের নিকট অন্যান্য রাগরাগিণী যেন লজ্জায় মুখ লুকাইয়াছে। 'বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ'—ভারতীয় সকল শাস্ত্রেই এই কথা—ইহাই সকল শাস্ত্রের মূলমন্ত্রস্বরূপ। দুনিয়া দুদিনের একটা মায়ামাত্র। জীবন ত ক্ষণিক-মাত্র। ইহার পশ্চাতে দূরে অতিদূরে, সেই অনন্ত অপার রাজ্য, যাও, সেখানে চলিয়া যাও। এ রাজ্য মহাবীর মনীষিগণের হৃদয়জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, তাঁহারা এই তথা-কথিত অনন্ত জগৎকেও একটী ক্ষুদ্র মৃত্তিকাস্তূপমাত্র জ্ঞান করেন—তাঁহারা ক্রমশঃ সে রাজ্য ছাড়িয়া আরও দূরে—দূরতম রাজ্যে চলিয়া যান। কাল, অনন্ত-কালেরও তথায় অস্তিত্ব নাই—তাঁহারা কালের সীমা ছাড়াইয়া দূরে, অতিদূরে চলিয়া যান। তাঁহাদের পক্ষে দেশেরও সত্তা নাই—তাঁহারা তাহারও পারে যাইতে চাহেন—ইহাই ধর্ম্মের গূঢ়তম রহস্য ভূপ্রকৃতিকে এইরূপে অতিক্রম করিবার চেষ্টা, যেরূপেই হউক, যতই ক্ষতি স্বীকার করিয়া হউক, কোনরূপে প্রকৃতির মুখের অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া অন্ততঃ একবারও চকিতের মত সেই দেশকালাতীত সত্তার দর্শন-চেষ্টা—ইহাই আমাদের জাতির প্রকৃতি। তোমরা আমাদের জাতিকে উৎসাহ উদ্দীপনায় মাতাইতে চাও—তাহাদিগকে এই রাজ্যের কোন সংবাদ দাও, তাহারা মাতিবে। তোমরা তাহাদের নিকট রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার, ধনসঞ্চয়ের উপায়, বানিজ্যনীতি প্রভৃতি যাহাই বল না, তাহারা এক কাণ দিয়া শুনিবে অপর কাণ দিয়া তাহা বাহির হইয়া যাইবে। অতএব জগৎকে তোমাদিগকে এই ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হইবে। এখন প্রশ্ন এই, জগতের নিকট আমাদের শিক্ষার কিছু আছে কিনা। সম্ভবতঃ অপর জাতির নিকট হইতে আমাদিগকে কিছু বহির্বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে—

কিরূপে দল গঠন ও পরিচালনা করিতে হয়, বিভিন্ন শক্তিকে প্রণালীবদ্ধভাবে কাজে লাগাইয়া কিরূপ অল্প চেষ্টায় অধিক ফল লাভ করিতে হয়, তাহা শিখিতে হইবে। ত্যাগ আমাদিগের সকলের লক্ষ্য হইলেও আমাদের দেশের সকল লোক যতদিন পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণরূপে ত্যাগে সমর্থ হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য-জগের নিকট ঐ সকল বিষয় কিছু কিছু শিখিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত ত্যাগই আমাদের সকলের আদর্শ। যদি কেহ ভারতে ভোগসুখই পরমপুরুষার্থ বলিয়া প্রচার করে, যদি কেহ জড়জগৎই ভারতবাসীর ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করে, তবে সে মথ্যাবাদী। এই পবিত্র ভারতভূমে তাহার স্থান নাই—ভারতের লোক তাহার কথা শুনিতে চায় না। পাশ্চাত্য সভ্যতার যতই চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য থাকুক না কেন, উহা যতই অদ্ভুত ব্যাপার সমূহ প্রদর্শন করুক না কেন, আমি এই সভায় দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—ওসব মিথ্যা, ভ্রান্তি—ভ্রান্তি মাত্র। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আত্মাই একমাত্র সত্য, ধর্ম্মই একমাত্র সত্য। ঐ সত্য ধরিয়া থাক।"

গ্রাহ-গ্রাসে শঙ্কর ও সন্ন্যাসের অনুমতি লাভ।

(শ্রীমতী—)

কালের গতি যেমনই বিচিত্র তেমনি রহস্যময়। কখন্ কোন্ উপলক্ষে কি ঘটিবে মানব তাহা বুঝিতে পারে না। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি যেমন অন্ধকে হস্তধারণ পূর্ব্বক অভীষ্ট পথে লইয়া যায়, কালও ঠিক প্রাণিগণকে স্ব স্ব পথে পরিচালিত করিয়া থাকে। মানব জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ঠিক সেই পথেই চলিয়া থাকে। শঙ্কর ও বিশিষ্টার ভাগ্যে আজ তাহাই ঘটিল। শঙ্কর যে সন্ন্যাসের জন্য এত ব্যস্ত, বিশিষ্টাও যে অনুমতি দানে এতই অসম্মত, আজ তাহার নিষ্পত্তির দিন উপস্থিত হইল। যাহা শত চেষ্টাতেও হয় নাই, তাহা আজ অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে চলিল।

প্রত্যুষে শঙ্কর বাটীর সম্মুখস্থ নদীতে স্নানার্থ আগমন করিয়াছেন। নদীর এই ঘাটটী গ্রামের মধ্যে বড় ঘাট। এই ঘাটে বহু লোক নিত্য স্নান করে। আজিও সকলে আপন মনে স্নান করিতেছেন। কেহ বা গঙ্গাদেবীর আহ্বান-মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে নিবিষ্টমনে জলে ত্রিকোণ-মণ্ডল অঙ্কিত করিতেছেন, কেহ বা গাত্র মার্জ্জনায় রত, কেহ বা তর্পণে প্রবৃত্ত হইয়া নদীবক্ষে জলাঞ্জলি দিতেছেন, কেহ বা জপ করিতেছেন। বালকগণ সন্তরণে রত হইয়া মধ্যে মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেছে। শঙ্কর সবেমাত্র কোমর জলে অবতরণ করিয়াছেন, এমন সময় অলক্ষিত ভাবে এক কুম্ভীর আসিয়া তাঁহার পাদদেশ আক্রমণ করিল। কোন জলচর জন্তুর ভীষণ আক্রমণ ভাবিয়া শঙ্কর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া ব্যাকুল ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শঙ্করের চীৎকার শুনিয়া পার্শ্ববর্ত্তী জনগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল এবং একজন তাঁহার হস্ত ধারণ করিল।

কুম্ভীর তখন শঙ্করের একটী পদ দংশন করিয়া তাঁহাকে গভীর জলে টানিতে আরম্ভ করিয়াছে। জলে কুম্ভীরের আকর্ষণ প্রতিরুদ্ধ করা একজন লোকের পক্ষে অসম্ভব। শঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যকারীও অধিক জলে নামিতে বাধ্য হইল। তখন সকলে 'কুম্ভীর' 'কুম্ভীর' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। বালক ও ভীতস্বভাব ব্যক্তিগণ তীরে উঠিয়া পড়িল। কতিপয় সাহসী ব্যক্তি আসিয়া কেহ শঙ্করের হস্ত ধারণ করিল, কেহ বা পূর্ব্ববর্ত্তী সাহায্যকারীর হস্ত ধারণ করিল। বালক শঙ্কর তখন প্রাণভয়ে ভীত হইয়া 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে নদীতীরে মহা কোলাহল উপস্থিত হইল।

বিশিষ্টাদেবী গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে এই কলরব শুনিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিলেন। এমন সময় একজন দ্রুতপদসঞ্চারে আসিয়া বলিল, "ব্রাহ্মণি! তোমার শঙ্করকে কুম্ভীরে ধরিয়াছে—শীঘ্র যাও।"

বিশিষ্টা পাগলিনীর ন্যায় উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া ঘাটে আসিলেন। দেখেন তাঁহার বাছাই 'মা' 'মা' বলিয়া চীৎকার করিতেছে এবং বহু লোকে তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। বৃদ্ধা বিশিষ্টা নিজের অবস্থা

ও সামর্থ্য স্মরণ না করিয়াই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং অপরের ন্যায় পুত্রের হস্তধারণ করিয়া আর্ত্তনাদ সহকারে সকলকে পুত্রের রক্ষার্থ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। পরের জন্য নিজের জীবনকে বিপদাপন্ন জননীই করিয়া থাকেন।

শঙ্কর জননীকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বিপদের সময় আপনার লোক দেখিলে সকলেরই যে দশা হয়, শঙ্করেরই বা তাহা হইবে না কেন? শঙ্কর শাস্ত্র পড়িয়া জ্ঞানী হইয়াছেন বটে, কিন্তু এ জ্ঞান ত তাঁহার প্রত্যক্ষের মত দৃঢ় জ্ঞান হয় নাই। শাস্ত্রজ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞানে পরিণত না হইলে তাহা কখনই প্রাণভয় নিবারণ করিতে পারে না। অল্প বিপদে বা দুঃখে পরোক্ষ শাস্ত্রজ্ঞান মানবকে অবিচলিত রাখিতে পারে, কিন্তু প্রাণসংশয় স্থলে কখনই অবিচলিত রাখিতে পারে না।

দেখিতে দেখিতে গ্রামের বহু লোকই নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই শঙ্করকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত। চূর্ণা নদীটী নাতিগভীর ও নাতিবিস্তৃত বলিয়া কতকগুলি ব্যক্তি টানা জাল দ্বারা কুম্ভীরকে ধরিবার আয়োজন করিল। আবার কেহ কেহ কুম্ভীর বধের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যস্ত হইল। কেহ বা নৌকা সংগ্রহের জন্য ধাবিত হইল।

এ দিকে কুম্ভীর কিন্তু শঙ্করের সহিত অপরাপর লোকগুলিকেও টানিয়া একটু একটু করিয়া গভীর জলে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন সকলেই কতকটা হতাশ হইয়া পড়িল, সকলেই বুঝিল শঙ্করের জীবন রক্ষা আর বুঝি হইল না। কেহ কেহ তখন বিশিষ্টাকে ছাড়িয়া দিতে বলিল, তিনি কিন্তু তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না, বরং আরও ব্যাকুল ভাবে সজোরে শঙ্করের হাত ধরিলেন। শঙ্কর তখন মৃত্যু অবধারিত বুঝিলেন এবং কোনরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া জননীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা! আপনারা এত চেষ্টা করিয়াও আমাকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, দংশনবেদনা আমার অসহনীয় হইতেছে। কুম্ভীর আমাদের সকলকেই গভীর জলে লইয়া যাইতেছে, আমি দেখিতেছি অদ্য আর আমার রক্ষা নাই। আপনারা সকলে আমায় ছাড়িয়া দিন, আমি মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করি। আপনি

যদি অনুমতি দেন, তবেই আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারি, নচেৎ আমার সন্ন্যাস সিদ্ধ হইবে না।" বিশিষ্টা পুত্রের এই কথা শুনিয়া বজ্রাহতের ন্যায় নির্ব্বাক্ হইয়া পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পুত্রকে টানিয়া তীরে আনিবার যত্ন যেন তাঁহার শিথিল হইয়া গেল।

শঙ্কর আবার বলিলেন, "মা! অন্তিম সময়ের আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন। ব্রাহ্মণের বাক্যই সত্য হইল। আর বিলম্ব করিবেন না, এখনও আমার জ্ঞান আছে। কিন্তু আর একটু গভীরজলে যাইলে আর কেহই আমাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। আমায় শীঘ্র অনুমতি দিন।" বিশিষ্টা মৃত্যুকালেও পুত্রের এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা, বাবা! আগে বাঁচো পরে সন্ন্যাসী হইও।" এই বলিয়া বিশিষ্টা পুত্রের সঙ্গে নিজেও প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন এবং পুত্রকে আরও দৃঢ়ভাবে ধরিয়া সাহায্যকারিগণকে বলিলেন "বাবা!, তোমরা আমার বাছাকে ছাড়িও না, ঐ দেখ নৌকা আসিতেছে, নদীতেও জল তত বেশী নহে, যদি অধিক জল হয় তোমরা নৌকা আশ্রয় করিও। তোমরা বাবা, আমার বাছাকে ছাড়িও না।"

শীঘ্রই কতকগুলি লোক নৌকা লইয়া আসিল এবং তাহারা নৌকাযোগে টানা জাল দিয়া কুম্ভীরের গতি রোধ করিল। কুম্ভীরের শরীরে জালস্পর্শ মাত্রই কুম্ভীর শঙ্করকে ছাড়িয়া দিল। তখন সকলেই 'ছাড়িয়া দিয়াছে' 'ছাড়িয়া দিয়াছে' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তীরস্থ লোকগণ আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। বিশিষ্টা কিন্তু এইবার সংজ্ঞা হারাইলেন। সাহায্যকারিগণ বিশিষ্টাকে জলে নিমজ্জিতপ্রায় দেখিয়া পুত্রের সঙ্গে তাঁহাকেও ধরাধরি করিয়া তীরে আনয়ন করিল এবং অবিলম্বে শুষ্কবস্ত্রদ্বারা শঙ্করের ক্ষতস্থান আবৃত করিয়া শঙ্করকে বিশিষ্টার ক্রোড়ে শোয়াইয়া দিল। তীরে উঠিতে উঠিতে বিশিষ্টাদেবীর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি পাগলিনীর ন্যায় শঙ্করকে বক্ষে ধরিয়া বার বার তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর সংজ্ঞাশূন্য না হইলেও নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছেন, উঠিবার শক্তি দূরে থাকুক চক্ষুরুন্মীলন করিবারও সামর্থ্য নাই। গ্রামবাসিগণ

যে যেরূপ ঔষধ জানে সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইল। ইতিমধ্যে একজন বৃদ্ধ কতকগুলি লতাপাতা বাঁটিয়া শঙ্করের ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া দিল। বশিষ্টার পরিচারিকা এই দৃশ্য দেখিয়া নিজ কর্ত্তব্য অবধারণ করিল এবং ত্বরায় গৃহ হইতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ আনিয়া শঙ্করকে খাওয়াইয়া দিল ও মাতাপুত্র উভয়কে পাথার বাতাস করিতে লাগিল। সাহায্যকারিগণ এই অসাধ্যসাধনরূপ পুণ্যের ফলেই বোধ হয় নিজ নিজ বাহাদুরি প্রকাশে বিস্মৃত হইল এবং অপরের প্রশংসাবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া মাতাপুত্রকে গৃহে আনিবার জন্য সেই আর্দ্রবসনেই অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এইরূপে ক্ষণকাল অতিবাহিত হইলে শঙ্কর একটু সুস্থ হইলেন, তখন তাহারা শঙ্করকে ক্রোড়ে করিয়া গৃহে লইয়া গেল। বিশিষ্টা পুত্রকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না—নির্ব্বাক্ ভাবে সেই সাহায্যকারিগণের প্রতি চাহিয়া দুনয়নে অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ওদিকে যাহারা জাল টানিতেছিল তাহারা অল্প আয়াসেই কুম্ভীরকে জালে আবদ্ধ করিয়া তীরে আনিয়া ফেলিল, গ্রামবাসিগণ যে যেখানে ছিল সকলে নানাবিধ অস্ত্রপ্রহারে তাহার বধসাধন করিল।

গ্রামস্থ চিকিৎসকগণের যত্নে শঙ্কর দুই একদিনের মধ্যেই সুস্থ হইয়া উঠিলেন। ঔষধের গুণে কুম্ভীরদষ্ট স্থানটী দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া গেল। তৃতীয় দিবসে শঙ্কর পথ্য পাইলেন। পর্ব্বতপ্রমাণ দুশ্চিন্তার ভার বিশিষ্টার মস্তক হইতে নামিয়া গেল। শঙ্কর কিন্তু অন্য চিন্তায় বিব্রত। তিনি তৃতীয় দিবসে গৃহত্যাগ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন—এ কার্য্য কি করিয়া সম্পন্ন হইবে তাহাই এ কয় দিন ভাবিতেছিলেন। পথ্য পাইয়া তাঁহার সে চিন্তা তিরোহিত হইল। তিনি সময় বুঝিয়া জননীকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে বিনীতভাবে বলিলেন, "মা! আমার শরীরে আর কোনরূপ অবসাদ বা গ্লানি নাই, আমি এক্ষণে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সবল হইয়াছি। অতএব

আপনি অনুমতি করুন আমি এইবার গৃহত্যাগ করি। ত্রিরাত্রের অধিক সন্ন্যাসীর গৃহবাস নিষিদ্ধ।

বিশিষ্টাদেবী পুত্রের কথায় একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন। কুম্ভীরাক্রান্ত পুত্রের প্রার্থনায় তিনি যে সেদিন পুত্রকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়াছিলেন, সে কথা বিশিষ্টাদেবী একরকম বিস্মৃতই হইয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে পুত্রের প্রার্থনা শুনিয়া তিনি যে কি বলিবেন তাহাই ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি পুত্রের কথার কোন উত্তর না দিয়া একটু গম্ভীরভাবে গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন। বিশিষ্টা ভাবিতেছেন পুত্রকে কি বলিবেন, আর কিরূপেই বা তাহাকে সন্ন্যাসে নিবৃত্ত করিবেন। অবশেষে স্থির করিলেন, তিনি পুত্রকে কিছুতেই সন্ন্যাসী হইতে দিবেন না।

শঙ্করের অন্তরালে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বিশিষ্টা পুত্রের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, "বাবা! তুমি ত নির্ব্বোধ নহ, তবে এরূপ কথা কেন বলিতেছ? এখনও তুমি বালক, এখন কি তোমার সন্ন্যাসের সময় উপস্থিত হইয়াছে? আমি সেদিন তোমায় সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়াছি সত্য, কিন্তু কি অবস্থায় তোমায় সে অনুমতি দিয়াছি বল দেখি। তুমি রক্ষা পাইবে না ভাবিয়া তোমার তুষ্টির জন্য অনুমতি দিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি যখন ভগবানের কৃপায় রক্ষা পাইয়াছ, তখন আমার সে অনুমতি তোমার প্রকৃত সন্ন্যাসের অনুমতি হইতে পারে না। তুমি এ অবস্থায় সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে বলিয়া আমি ত তোমায় অনুমতি দিই নাই। অতএব তুমি ও সঙ্কল্প ত্যাগ কর। যাহা সকলে করে তাহাই কর। একান্তই যদি সন্ন্যাসী হইতে হয় ত আমার মৃত্যুর পর হইও।"

শঙ্কর বলিলেন, "মা! আপনার অনুমতি অনুসারে আমি যখন সঙ্কল্পপূর্ব্বক সন্ন্যাস লইয়াছি, তখন আর গৃহে বাস করিব কি করিয়া? যে অবস্থায়ই হউক সন্ন্যাস যখন লওয়া হইয়াছে তখন আর তাহার বিপরীত আচরণ সম্ভবপর নহে। শাস্ত্রে বলে, সন্ন্যাস আশ্রমের পর আর আশ্রম নাই। সন্ন্যাস লইয়া ফিরিয়া আসিলে তাহার আর কোন ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার থাকে না, সমাজও তাহাকে লইয়া ব্যবহার করে না এবং

পরকালে তাহার নরক হইয়া থাকে। মা! আপনি মায়ায় মুগ্ধ হইয়া এসব কথা বলিতেছেন। আপনার মুখে ওরূপ কথা শোভা পায় না।"

মানবের যখন স্বার্থে আঘাত পড়ে, তখন আর সে অপরের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বড় বিবেচনা করিতে চাহে না। বিশিষ্টার এইবার স্বার্থে আঘাত পড়িয়াছে, কাজেই তিনি পুত্রের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে পারিতেছেন না। তিনি তখন নিজ ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পুত্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশিষ্টা বলিলেন, "বাবা! লোকে পুত্রকামনা করে বার্দ্ধক্যে সেবাশুশ্রূষার জন্য এবং পরলোকে পুত্র কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধতর্পণাদি ক্রিয়ার দ্বারা সুখী হইবার জন্য। দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করিয়া এত মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া তোমায় মানুষ করিলাম, তাহার পুরস্কার কি এই হইল! আমি পতিহীনা ও অনন্যপুত্রা, তুমি সন্ন্যাসী হইলে কে আমার মুখে অগ্নি প্রদান করিবে? কে আমার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে, কে আমার মৃত্যুকালে মুখে এক গণ্ডূষ জল দিবে? বাবা! বৃদ্ধা দুঃখিনী মা বলিয়া কি তোমার একটু দয়ারও সঞ্চার হইতেছে না?" এই বলিতে বলিতে বিশিষ্টা "হা! আমার কপাল" বলিয়া শিরে করাঘাত পূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলেন।

শঙ্কর জননীর এই অবস্থা দর্শন করিয়া একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। কিন্তু মনে মনে কাতর ভাবে ভগবচ্চরণে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "ভগবন্! জননী আমার পুত্রস্নেহে আজ অন্ধ। তাঁহাকে আপনি জ্ঞান দিন। নচেৎ তাঁহাকে বুঝাইতে পারি এরূপ সামর্থ্য আমার কোথায়; আর তিনি প্রসন্ন মনে আমাকে ত্যাগ না করিলে আমারও ভবিষ্যৎ সুখের হইবে না। প্রভো, আপনার কৃপায় আমি জীবিত রহিয়াছি, আপনার কৃপাই আমার সম্বল, আপনি এ বিপদে আশ্রয় না দিলে আমি নিরুপায়।"

যাঁহার প্রার্থনায় কমলা দুঃখিনী ব্রাহ্মণীর গৃহে সুবর্ণ আমলকী বৃষ্টি করিতে পারেন, যাঁহার প্রার্থনায় দূরস্থিতা নদী গৃহসমীপবর্ত্তিনী হইতে পারে, তাঁহার প্রার্থনা কি বিফল হয়? ভগবান বিশিষ্টার হৃদয়াকাশে জ্ঞানালোকের একটু উন্মেষ করিয়া দিলেন। বিশিষ্টা শঙ্করের গম্ভীর অথচ

ব্যাকুল ভাব দেখিয়া শান্ত হইলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল, ছিঃ! আমি নিজ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমার পুত্রের মঙ্গল পথে বাধা দিতেছি। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবিলেন, তাই ত পুত্র আমার সন্ন্যাসী হইলে আমি কি করিব?

ইত্যবকাশে শঙ্কর বলিলেন, "মা আপনি কিছুমাত্র ভাবিবেন না, আমি সমস্তেরই ব্যবস্থা করিতেছি। আমাদের সম্পত্তি যাঁহারা পাইবেন, তাঁহারা যে আপনাকে সানন্দে ভরণপোষণ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি তাঁহাদিগকে আপনার সমক্ষে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইতেছি। আপনার মুখাগ্নি আমিই করিব—সন্ন্যাসী হইলেও আমিই করিব। মৃত্যুকালে আপনার সেবাশুশ্রূষা আমিই করিব। আর আপনি যাঁহার দর্শন লালসায় কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন, অন্তিম-কালে আমি আপনাকে তাঁহারই দর্শন করাইব। মা! আপনি আর কি চান বলুন? আমি যে পিতামাতার সন্তান, তাঁহাদের চরণপ্রসাদে আমি কখনই অসিদ্ধমনোরথ হইব না। আমার ধ্রুববিশ্বাস ভগবান্ কখনও ভক্তের বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। তিনি আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেনই। মা! দেখুন সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সন্ন্যাস একান্ত আবশ্যক এবং সন্ন্যাসলাভ করিতে হইলে শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ও তদ্রূপ আবশ্যক। শুধু শাস্ত্র পড়িয়া তর্ক বিচার করিয়া এবং স্বর্গাদিসাধক যাগ-যজ্ঞাদি করিয়া কখন সিদ্ধিলাভ ঘটে না। সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া কেবল ভগবান্‌কে না ধরিতে পারিলে সিদ্ধিলাভ দুর্ঘট। এই সর্ব্বস্বত্যাগেরই নাম সন্ন্যাস। মা! আপনি প্রসন্ন মনে আমায় সন্ন্যাসে অনুমতি দিন। আমি সেই সহস্রবর্ষজীবী সমাধিবান্ গোবিন্দপাদ স্বামীজীর শরণ গ্রহণ করিয়া নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিব। আর সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে কেবল আপনার কেন সমগ্র জগতেরও বহু উপকারের নিমিত্তভাগী হইতে পারিব। মা! শ্রাদ্ধতর্পণ সন্ন্যাসীর করিতে নাই বটে, কিন্তু আপনি কি জানেন না, যে কুলে একজনও সন্ন্যাসী হইতে পারে, সেই কুলের ঊর্দ্ধাধঃ চতুর্দ্দশ পুরুষ কৃতার্থ হইয়া যান। সন্ন্যাসী হইলে কুল পবিত্র হয়, জননী কৃতার্থা হন, বসুন্ধরা পুণ্যবতী হন—ইহা শাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে

ঘোষণা করিতেছেন। মা! আপনি প্রসন্ন মনে আমায় অনুমতি দিন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি আমার কথা ভগবান্ কখন মিথ্যায় পরিণত করিবেন না।"

পুত্রের কথা শুনিতে শুনিতে বিশিষ্টার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছিল। তিনি অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন, "বাবা! তুমি সন্ন্যাসী হইলে কোথায় থাকিবে, কি করিবে, তাহার ত কিছুই স্থিরতা থাকিবে না। আমি কি করিয়া তোমায় সংবাদ দিব এবং তুমিই বা কি করিয়া দূরদেশ হইতে সহসা আসিবে? আমার ভাগ্যে দেখিতেছি অশেষ দুর্দ্দশা আছে।" তখন শঙ্কর বলিলেন, "মা! আপনি শাস্ত্রে বিশ্বাস করুন। শাস্ত্রে বলে, সন্তান প্রবাসে থাকিলে জননী যদি পুত্রকে একমনে স্মরণ করেন, তবে সন্তান সহসা জিহ্বায় মাতৃস্তন্যদুগ্ধের আস্বাদ অনুভব করে। অতএব মা আপনি আমায় স্মরণ করিলেই আমি জানিতে পারিব এবং যথা সময়ে আমি আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইব। আর আপনি ইহাও জানিবেন—যাঁহারা যথাশাস্ত্র সদাচারের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কখন দুর্গতি প্রাপ্ত হন না—তাঁহারা কখন অজ্ঞানে মরেন না। অধিক কি তাঁহাদের মৃত্যু কতকটা ইচ্ছাধীনই হয়। আপনি স্মরণ করিলে আমি জানিতে পারিব এবং আমি আসিবার পূর্ব্বে আপনি কখনই দেহত্যাগ করিবেন না। যাহারা ভগবানের শরণাগত হয় ভগবান্ তাহাদের সহায় হন।"

পুত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া বিশিষ্টা নানা ভাবে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি কখন পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া মস্তকচুম্বন করেন, কখন বা শিরে হাত দিয়া পুত্রকে "দীর্ঘজীবী হও, মনস্কামনা পূর্ণ হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন।

এইরূপ কথোপকথনে মধ্যাহ্ন হইয়া গেল। তখনও পাকাদি গৃহকার্য্য কিছুই আরম্ভ হয় নাই। পরিচারিকা এই সব দৃশ্য দেখিয়া নীরবে দ্বারদেশে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল এবং কখন অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছিল। এইবার পরিচারিকা আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিল না। সে তখন বিশিষ্টাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মা!

আপনারা উভয়েই কি পাগল হইয়াছেন? ঐ রুগ্ন ছেলেকে এত বকাইতেছেন কেন? শীঘ্র অন্ন প্রস্তুত করিয়া উহাকে পথ্য দিন। আহা! বাছা আমার যমের মুখ হইতে প্রাণ পাইয়া সবে কল্য দুটী অন্নপথ্য করিয়াছে।”

পরিচারিকার কথায় বিশিষ্টার সংজ্ঞা হইল। তিনি অশ্রুমোচন করিতে করিতে পাকগৃহে আসিলেন এবং কখন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ, কখন বা অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে পাককার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

যথাসময়ে পাককার্য্য হইয়া গেল। শঙ্কর, বিশিষ্টা ও পরিচারিকা সকলেই ভোজন সমাধা করিলেন। বালক শঙ্কর আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং পরিচারিকা দ্বারা জ্ঞাতিগণকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। জ্ঞাতিগণ ভিতরে ভিতরে প্রায় সকল সংবাদই লইতেছিল। তাহারা পরিচারিকার কথা শুনিয়া আর কালবিলম্ব করিল না। সকলেই অবিলম্বে সদলবলে বিশিষ্টার ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শঙ্কর জ্ঞাতিগণকে যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ করিয়া আসন প্রদান করিলেন। জ্ঞাতিগণ শঙ্করের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে শঙ্কর তাহার সদুত্তর দিয়া বিনীতভাবে তাহাদিগকে বলিলেন, “মহাশয়গণ! পূর্ব্বজন্মের অশেষ পুণ্যফলে আমার সন্ন্যাস গ্রহণে অভিলাষ হইয়াছে। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার সম্পত্তি গ্রহণ করুন এবং আমার জননীর ভরণ-পোষণের ভার লউন”।

জ্ঞাতিগণ কৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, “কেন বাবা! এ বয়সে সন্ন্যাস কেন? এ কি সন্ন্যাসের বয়স? আর কলিকালে ত সন্ন্যাস নাই!”

শঙ্কর বিনীতভাবে বলিলেন, “আপনারা যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, কিন্তু সন্ন্যাসের যে নিষেধ, কলিকালনিষিদ্ধ বলিয়া তাহা নিত্যবিধি নহে—একমাত্র ঘোর কলিতেই নিষিদ্ধ বুঝিতে হইবে। আর এই নিষেধ বাক্যটী স্মৃতিশাস্ত্রের বচন। স্মৃতিশাস্ত্র হইতে শ্রুতির প্রামাণ্য অধিক। সেই বেদমধ্যে সন্ন্যাসের নিত্যবিধিই কথিত হইয়াছে। কোন সময়ের উল্লেখ না করিয়াই তাহাতে উক্ত হইয়াছে—‘যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব

প্রব্রজেৎ' অর্থাৎ যেদিন বৈরাগ্য হইবে, সেই দিনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, তাহাতে কাল বা আশ্রম বিচার নাই। সুতরাং এই বেদবিধির নিকট উক্ত স্মৃতির নিষেধ দুর্ব্বল। তাহার পর এখনও পণ্ডিত ও সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের মধ্যে সন্ন্যাস প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে—উক্ত শাস্ত্রবলেই সন্ন্যাস প্রথা একেবারে বর্জিত হয় নাই। সুতরাং আমার এই সঙ্কল্প অশাস্ত্রীয় বলিয়া ত মনে হয় না। আর এই অল্পবয়সে যে সন্ন্যাসের কথা বলিয়াছেন, তাহার উত্তরও ত ঐ শাস্ত্রেই রহিয়াছে, বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, বয়সের অল্পতায় কোন বাধা নাই।"

এরিষ্টটল ও পরাবিদ্যা (METAPHYSICS)।

(শ্রীকানাইলাল পাল, এম এ, বি এল)

প্লেটোর মতে বিস্ময় হইতেই তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি জন্মে। যে এই বিশাল জগৎটীকে কোন্ দিন বিস্ময়ের চক্ষে দেখে নাই তাহার জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইতে বিলম্ব আছে বুঝিতে হইবে। এরিষ্টটল এ বিষয়ে প্লেটোর সহিত একমত বলিলেও চলে। এরিষ্টটল বলেন, সাংসারিক নানা অভাবে প্রপীড়িত সাধারণ মানবের পক্ষে তত্ত্বালোচনা একান্ত সুকঠিন; কারণ, ভীষণ জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত থাকায় বিশ্বজগতে বিস্ময়কর কোন পদার্থ আছে, এ সন্ধান রাখিবার কোন অবসর তাহাদের ঘটিয়া উঠে না। এই সংগ্রামের ব্যাপার হইতে যিনি ছুটী পাইয়াছেন—সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াই হউক বা সংগ্রামে সাক্ষী থাকিয়াই হউক—তিনিই তত্ত্বালোচনার অধিকারী। আদিম চিন্তাশীল মানব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া প্রকৃতিকে বা তদন্তর্গত কোন একটী বিশেষ পদার্থকে জগতের মূলতত্ত্বরূপে

নির্দ্দেশ করিয়া যান; কিন্তু তাহার দ্বারা সকল রহস্যের মীমাংসা না হওয়ায় পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ প্রকৃতির পরিবর্ত্তে চৈতন্যকেই সেই স্থানে স্থাপন করেন। কিন্তু জড় ও চৈতন্যের প্রকৃতিগত ভেদ থাকায় উহাদের সম্বন্ধ কিরূপে ঘটে এবং জড়ই বা চৈতন্য হইতে কিরূপে সৃষ্ট হয়, সেকথা তখনও অমীমাংসিত রহিয়া যায়। প্লেটোর মতে চৈতন্যই মূলতত্ত্ব, কিন্তু তিনি যে 'ভাবজগতের' পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত এই বাহ্য জগতের সম্বন্ধ কি, সেটা বুঝা সুকঠিন। তাঁহার দর্শন আলোচনায় সময় সময় মনে হয়, তিনি বাহ্য জগতের অস্তিত্ব যেন অস্বীকার করিতেই চান। "ভাবই" (Idea) তত্ত্ববস্তু বা সত্যবস্তু—বাহ্য জগৎ তাহার প্রতিচ্ছায়া (Copy) মাত্র। বাহ্য জগতের তত্ত্বতঃ কোন অস্তিত্বই নাই। কিন্তু মূলতত্ত্ব যদি এক পদার্থ হয় তাহা হইতে এই বহুর —অর্থাৎ প্রতিচ্ছায়ার সম্ভাবনা কোথায়? অদ্বৈতবাদী বলিবেন—ইহাই মায়া, ভেদাভেদবাদী বলিবেন—এটা সেই মূলতত্ত্বের অচিন্ত্যশক্তি, দ্বৈতবাদী বলিবেন—এই দুটী পদার্থ বরাবরই রহিয়াছে বরাবরই থাকিবে। প্লেটোকে দ্বৈতবাদী বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতে হয়, কিন্তু তাঁহাকে অদ্বৈতবাদী বলিব কি ভেদাভেদবাদী বলিব সেটা নিশ্চয় করা সুকঠিন। যাক্ সে কথা। এরিষ্টটলের মত কি ছিল এবং আমাদের (হিন্দুদের) মতামতের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য কোথায় সেইটুকু বর্ত্তমান আলোচনায় আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া আমরা এরিষ্টটলের দর্শনের পরিচয় লাভে অগ্রসর হই।

দর্শনের উদ্দেশ্য সত্য বস্তুর পরিচয় প্রদান করা। দেশ-কালে পরিচ্ছিন্ন বস্তু নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং তাহার গণ্ডীর মধ্যে সত্য লাভের চেষ্টা নিরর্থক। বিজ্ঞান এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের পরিচয় প্রদান করে। পরাবিজ্ঞান বা পরাবিদ্যা সেই অতীন্দ্রিয় পদার্থের পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াসী।

Metaphysics বা পরাবিদ্যা শব্দটী শুনিলেই মনে হয় ইহার আলোচ্য বিষয় পর অর্থাৎ এই প্রতীয়মান বাহ্য জগৎ হইতে ভিন্ন; অথবা এই বাহ্য জগৎকে অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়ানুভূতির গণ্ডী পার

হইয়া যে তত্ত্ববস্তু নিত্য বিদ্যমান তাহাই পরাবিদ্যার আলোচনার বিষয়। এরিষ্টটল বলেন, মূল তত্ত্ববস্তু কি জানিতে হইলে এই বাহ্য জগতের ব্যাপার সকল প্রথমতঃ আমাদের আলোচনা করা আবশ্যক; এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগৎকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে সেই নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় মূল তত্ত্ববস্তুর পরিচয় লাভ ঘটিতে পারে। এরিষ্টটলের "ন্যায় শাস্ত্র" আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, একই বস্তু যুগপৎ বিপরীত ধর্ম্ম বা গুণবিশিষ্ট হইতে পারে না। 'ক' হয় 'খ' হইবে অথবা 'খ' হইবে না। 'ক' যুগপৎ 'খ' হইতে এবং 'খ' না হইতে পারে না; ঐ দুইটী বাক্যের একটী অবশ্যই সত্য হওয়া চাই, তৃতীয় কোন 'বাক্য' হইতে পারে না। ইহাই আধুনিক ন্যায় শাস্ত্রে Laws of Contradiction বা 'বিরোধ নিয়ম' ও Laws of Excluded Middle 'মধ্যাভাব নিয়ম' বলিয়া কথিত হয়। এই দুইটী শুধু ন্যায় দর্শনেরই মূল ভিত্তি নয়, এরিষ্টটলের মতে তত্ত্বজ্ঞানলাভেরও ইহাই মূল সূত্র।

মূল পদার্থ বা তত্ত্ববস্তু কি?—এই প্রশ্ন মনে জাগিলেই সত্যাসত্যের বিচার আপনি উদয় হয়। যাহা সত্য তাহার সত্তা যদি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয় তবে আর তাহাকে সত্য-সংজ্ঞা কিরূপে দেওয়া যায়। আমরা যাহাকিছু দেখি-শুনি ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারই পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং ইহাকে সত্য বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগতের অন্তরালে কি আছে সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনই পরাবিদ্যার প্রয়াস। প্লেটো বলিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষ মরিলেও 'মনুষ্যত্ব' বলিতে যাহা বুঝি তাহার বিনাশ নাই। মানুষের পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং মানুষ নশ্বর হইতে পারে কিন্তু মনুষ্যত্বের পরিবর্ত্তন নাই—বিনাশও নাই। মানুষ বলিতে অব্যাপক পদার্থ বুঝি কিন্তু মনুষ্যত্ব শব্দে ব্যাপকতার পরিচয় পাই। মনুষ্যত্ব একটী 'ভাবপদার্থ' (Idea)। ভাবপদার্থ অপরিবর্ত্তনশীল—ভাবপদার্থ নিত্যপদার্থ—এইরূপ যুক্তিবলে প্লেটো এই প্রত্যক্ষ জগতের অন্তরালে এক ভাবজগতের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া সেই ভাবজগৎকে আবার একটী মূল ভাবপদার্থের বিকাশরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া এই মূল রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন, সেকথা প্লেটোর দর্শনালোচনায় আমরা

জানিয়াছি। হেরাক্লিটিয়ান দার্শনিকগণের মতানুসারে প্লেটো ও সিদ্ধান্ত করেন—যাহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল তাহার আবার সত্যজ্ঞান কিরূপে সম্ভবে? জগৎকে নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বলা হয়—এই কথাটী একটু তলাইয়া বুঝিলে দেখা যায়, ইন্দ্রিয়ানুভূতি বা ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান দেশকালকে অপেক্ষা করে—যাহা দেশকালের অধীন তাহা কখনও অপরিণামী হইতে পারে না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে সেই মূলবস্তুর সন্ধান না পাওয়া গেলেও আমরা সেই মূলবস্তুকে উপলব্ধি করিতে পারি একথা প্লেটো জোর করিয়াই বলিয়াছিলেন। প্লেটো শুধু দার্শনিক ছিলেন না তিনি তত্ত্বদর্শী ঋষি ছিলেন বলিয়া খ্যাত সুতরাং তত্ত্ববস্তুর উপলব্ধি হয় একথা তাঁরই মুখে শোভা পায়। মূলতত্ত্ব পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে তার মূলত্ব নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং মূলতত্ত্ব ব্যাপকবস্তু বা Universal Being.

এরিষ্টটল বলেন, প্লেটোর সিদ্ধান্তে তিনটী প্রধান দোষ বর্ত্তমান। যথা—

প্রথমতঃ—যেটী মূল ভাব-পদার্থ সেটীর সহিত বাহ্য জগতের সম্বন্ধ কি? সেই মূল পদার্থ অবিকারী, অপরিবর্ত্তনীয় থাকিয়া বিকারী পরিবর্ত্তনশীল জগতের কারণ কিরূপে হইতে পারে? তিনি বলেন, এইরূপ প্রশ্নের সদুত্তর প্লেটোর দর্শনে পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া, এই ভাবপদার্থ সশক্তিক বা নিঃশক্তিক সেটীও প্লেটোর দর্শন হইতে বুঝা সুকঠিন।

দ্বিতীয়তঃ—জ্ঞান বলিলেই সীমাবদ্ধ জ্ঞানকে বুঝায়, ব্যাপক পদার্থের জ্ঞান কিরূপে হইবে? বহু পদার্থেই জ্ঞান বিকাশ পায়। এরিষ্টটল আরও বলেন, এই প্রত্যক্ষ জগৎকে বুঝিবার জন্য আবার একটী ভাবজগৎকে অনুমান করিবার কি প্রয়োজন আছে?

তৃতীয়তঃ—সত্তা বলিতে যাহা বুঝি তাহার পরিচয়ও ভাবপদার্থ হইতে পাওয়া যায় না। প্লেটোর মতে ভাবপদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে নাই, অথচ সেই সকল বিষয়ে ভাবপদার্থের ভাব বর্ত্তমান। এরিষ্টটল বলেন, যাহাতে যে পদার্থের গুণ, ধর্ম্ম বা ভাব বর্ত্তমান সেই দুই পদার্থের সম্বন্ধ নিত্য হওয়া চাই। প্লেটো ভাবপদার্থকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া এরিষ্টটলের মতে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

প্লেটো Idea বা ভাবপদার্থকে এই প্রতীয়মান বাহ্যজগৎ হইতে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করেন। তিনি যেন বলিতে চান—বহু না থাকিলেও এক থাকিতে পারে। এরিষ্টটল বলেন, এরূপ ভাবে পৃথক্ করা ব্যাপারটী Abstraction—প্লেটোর বিরুদ্ধে এরিষ্টটলের এইরূপ আপত্তি সাধারণে প্রচারিত। আমরা এই আলোচনায় অগ্রসর হইলে বুঝিতে পারিব বাস্তবিক এই আপত্তির গুরুত্ব কতটুকু। এই স্থলে আমাদের একটী কথা মনে পড়ে। শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় বলিয়াছেন—"নত্বহং তেষু তে ময়ি"—আমাতে তাহারা অর্থাৎ বিশ্বজগৎ রহিয়াছে, তাহাতে অর্থাৎ বিশ্বজগতে আমি নাই। একথা ভগবদ্ভক্তি বিশ্বাসে কেহ মানিয়া লইতে পারেন, চিন্তাশীল দার্শনিক বুদ্ধিবলে এই সিদ্ধান্তের যুক্তিযুক্ত কারণও দিতে পারেন, কিন্তু এই ভগবদ্বাক্য শুনিলেই মনে হয়—এই জগৎ তাঁহার অপেক্ষা করে, তিনি জগতের অপেক্ষা করেন না। জগতের কোন রকম সত্তা থাকিলেই তাঁহার সত্তা স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার সত্তা স্বীকার করিলেই জগতের সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য নহে—ইহাই ভগবদ্বুক্তির সহজ অর্থ মনে হয়। প্লেটো এই সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়াই আমাদের মনে হয়। এই জগৎ ও জগদতীত সত্যবস্তুর সম্বন্ধ কেহ কোন দিন বিচারবলে প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। জ্ঞান-মূর্ত্তি শঙ্করাচার্য্য এই সম্বন্ধ "অনির্ব্বচনীয়" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যান। প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেব—এটী তাঁর 'অচিন্ত্য-শক্তি' বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। আমাদের মনে হয় তত্ত্ববস্তু কেবলমাত্র বিচারলভ্য নয়—দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে এই কথা ঠিক বলিয়াই মনে হয়। সেই সুদূর অতীত হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কত মত স্থাপিত হইল, কত মত পরিবর্ত্তিত হইল, কত মত খণ্ডিত হইল এবং হইতেছে—তৎসমুদয় আলোচনা করিলে মনে হয় সত্যই ভগবান্ বেদব্যাস লিখিয়াছেন—"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"। থাক্ সে কথা, আমাদের আলোচ্য বিষয় এরিষ্টটলের দর্শন এবং তিনি পরাবিদ্যা (Metaphysics) সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন সেইটী মোটামুটি ব্যক্ত করিতে অগ্রসর হওয়া।

দেখা যায়, এরিষ্টটল প্লেটোর দর্শনের বিরুদ্ধে এই প্রকার আপত্তি

উত্থাপন করিলেও তাঁহার মত প্লেটোর মত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন নয়। শুধু যে বিভিন্ন নয় তাহা নয়, উভয়ের মধ্যে বেশ একটা সুন্দর সাদৃশ্য বা ঐক্য আছে। আমাদের মনে হয় প্লেটোর ভাষায় যে ভাবটী বা তত্ত্বটী অপরিস্ফুট ছিল, এরিষ্টটল সেইটীকেই অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র। আমরা দেখিয়াছি—মূল সত্যপদার্থকে অতীন্দ্রিয় বা অপার্থিব বলিয়া নির্দ্দেশ করাই প্লেটোর মতের বিরুদ্ধে এরিষ্টটলের আপত্তির কারণ। যেহেতু (এরিষ্টটল বলেন), তাহা হইলে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সহিত উহার সম্বন্ধ স্থাপন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। দুইটীকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যজগৎ ও অতীন্দ্রিয় মূলসত্তার পৃথক্‌রূপে অস্তিত্ব নির্দ্দেশ না করিয়া তিনি (এরিষ্টটল) এই বহুর মধ্যে সেই একের অস্তিত্ব স্থির করেন এবং বলেন, এই প্রতীয়মান বাহ্যজগৎ তাহা হইতে একেবারে পৃথক্ নয়—তিনিও ইহা হইতে একেবারে বিভিন্ন নন। সেই একই বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন—"The idea is immanent in the thing": এই কথাটী বলিলে যুগপৎ অনেক বিষয় মনে জাগিয়া উঠে। একই বস্তু বর্ত্তমান, তবে প্রকাশ পাওয়া ব্যাপারটা কি তাঁর শক্তির লীলা না মায়ার খেলা ? সে কথার উত্তর প্লেটোর দর্শনেও ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। এরিষ্টটলের মতে সেই মূলবস্তু শূন্যগর্ভ পদার্থ নয়—শুধু একটা Abstraction নয়—সেই তত্ত্ববস্তু Concrete—সগুণ বা সশক্তিক।

এরিষ্টটলের দর্শনালোচনা করিলে আরও বুঝা যায়, Categories- বা সংজ্ঞানির্দ্দেশ ব্যাপারে তাঁর মতের সহিত বিজ্ঞানবাদ বা Idealism এর খুব সামান্যই পার্থক্য। আবার যখন পরাবিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা করেন তখন তাঁকে বাস্তববাদী (Realist) বলিয়া মনে হয়। দর্শনেতিহাস লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই কারণে এরিষ্টটলের দর্শনের মধ্যেও একটা স্ববিরোধ দোষ দর্শন করিয়া থাকেন এবং তিনি বিজ্ঞানবাদী ছিলেন কি বাস্তববাদী ছিলেন সে বিষয়ে একটা সন্দেহ উত্থাপন করেন। এরিষ্টটল প্লেটোর সহিত একমত হইয়া সিদ্ধান্ত করেন—ব্যাপকপদার্থের (Universal) অস্তিত্ব নির্ণয় করাই

বিজ্ঞান বা সংজ্ঞানির্দ্দেশ ব্যাপারের উদ্দেশ্য। আবার অপর পক্ষে তিনি কিন্তু মূলপদার্থকে একটী বিশেষ পদার্থ (Individual)-রূপে নির্দ্দিষ্ট করায় স্ববিরোধ দোষটা বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। তিনি একজন ব্যক্তি (Individual or Person) অথচ তিনি ব্যাপক—এই দুইটী আপাতবিরোধের সামঞ্জস্য বড়ই সুকঠিন। আমাদের প্রাচীন ঋষিগণের নিকট কিন্তু এই বিরোধ বিরোধ বলিয়াই মনে হইত না। মূল পদার্থের অচিন্ত্যশক্তির পরিচয় তাঁহারা ধ্যানে অনুভব করিয়াছিলেন ; তাই এই সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া লইয়াই তাঁহারা সগর্ব্বে উহাকে 'অনির্ব্বচনীয়' বা 'অচিন্ত্য' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।

জ্ঞানলাভ বলিতে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হওয়া বুঝায়। এরিষ্টটল বলেন, প্রথমতঃ আমাদের ব্যাপক বা অবিশেষ জ্ঞান থাকে, তৎপরে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের উদয় হয়। সত্তা সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা চলে—একটী ব্যাপক পদার্থের বিশেষ বিশেষরূপে প্রকাশ হওয়াই বহু পদার্থের অস্তিত্বের কারণ। Matter বা জড় বলিতে আমরা যাহা বুঝি এরিষ্টটল ঠিক তাহাই বুঝিতেন কিনা সন্দেহ। তাঁর মতে (১) যাহা পরিবর্ত্তনের আশ্রয়—যাহাকে আশ্রয় করিয়া উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ ঘটে, বা (২) যাহাতে কার্য্য-উৎপাদিকা শক্তি বর্ত্তমান, (৩) যাহা অরূপ, বা (৪) যাহা অব্যক্ত—তাহাই Matter বা জড় পদার্থ। সুধী পাঠকবর্গ সাংখ্যের প্রকৃতির সহিত এই সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য সহজেই বুঝিতে পারিবেন। ফল কথা, যাহাকে Form বা নাম-রূপ বলা হয় তাহাই কি এরিষ্টটলের জড়পদবাচ্য নহে ?

এই স্থলে এক কথা মনে রাখা দরকার। আমরা দেখি জাগতিক ব্যাপারে অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার অভিব্যক্তি চলিতেছে—যে বীজটী কাল অপরিস্ফুট ছিল সেটী ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইতেছে, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতেছে, কিন্তু মূলপদার্থে সেই প্রকারের অপূর্ণতা থাকিতে পারে না। মূলপদার্থ পূর্ণ। একথা এরিষ্টটল-দর্শন আলোচনার প্রারম্ভে আমরা ইঙ্গিত করিয়াছি।

সত্তা বলিতেই সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তনের বা অভিব্যক্তির কথা মনে আইসে। আমরা যাহা কিছু ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করি তাহার মধ্যে সর্ব্বত্রই বিকাশের পরিচয় পাই। মৃত্তিকা হইতে ঘট হইল—ঘট চূর্ণ হইয়া ধূলা হইল—এই ব্যাপারের প্রত্যেকটীতেই দেখি, একটী রূপ অভিব্যক্ত হয় সঙ্গে সঙ্গে অপর একটী রূপ অনভিব্যক্ত হয়। সত্তার (যাহা প্রতীয়মান হয়) কারণ কি বিচার করিলে দেখা যায়—(১) উপাদান কারণ, (২) নিমিত্ত কারণ ও (৩) অসমবায়ী কারণ লইয়াই সত্তা। ঘট পদার্থ বর্ত্তমান থাকিতে হইলে ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা চাই, নিমিত্ত কারণ কুলালচক্র, কুম্ভকার প্রভৃতি চাই এবং অসমবায়ী কারণ সেই মৃত্তিকার বিশেষ রূপ বা আকৃতির সংযোগ হওয়া চাই। সেই বিশেষ রূপের সংযোগ নাশ হইলে, মৃত্তিকাও থাকিতে পারে, কুম্ভকার প্রভৃতিও থাকিতে পারে কিন্তু ঘটের অস্তিত্ব অসম্ভব। মৃত্তিকা ও কুম্ভকার শুধু দুইটী থাকিলে তাহাদের সাহায্যে ঘট ছাড়া পুতুল ইত্যাদি বস্তুও প্রস্তুত হইতে পারে—ঘট হইবার কারণ কোথায়? সেই হেতু অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা উপাদান, নিমিত্ত, অসমবায়ী কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এরিষ্টটল চারিটী কারণের উল্লেখ করেন। প্রথমতঃ, উপাদান অর্থাৎ যে পদার্থ বা ভূত বা পরমাণু হইতে (out of which) কোন বস্তু জন্মাইবে, (২) নিমিত্ত কারণ অর্থাৎ যাহার দ্বারা (by which) সেইটা উৎপন্ন হইবে, (৩) সেই বস্তুটী যাহা হইবে অর্থাৎ যে রূপ ধারণ করিবে তাহার অভিব্যক্তির (what it is) অনুকূল ব্যাপার, (৪) কি উদ্দেশ্য বা কি নিমিত্ত (for which) সেই বস্তু উৎপন্ন হইবে। আমাদের মনে হয়, প্রথম তিনটী কারণকে আমাদের পূর্ব্বোক্ত তিনটী কারণের সহিত এক করিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং ৪র্থ কারণটীকে ৩য় কারণের অন্তর্গত করিয়া লইলে বিশেষ কোন দোষ হয় না। কোন কোন দার্শনিক প্রথম দুইটী কারণকেই সত্তার বিদ্যমানতার পক্ষে যথেষ্ট কারণ মনে করেন। তাঁহারা বলেন নিমিত্ত কারণ উপাদান সাহায্যে সেই উপাদানের যে রূপ প্রকাশ করিতে চান সেই রূপই অভিব্যক্ত হয়—নিমিত্ত কারণই উপাদানের বিশেষরূপে সংযোগের হেতু।

এরিষ্টটল বলেন, মূলপদার্থ বস্তুতঃ পূর্ণ। উহা আমাদের জ্ঞানে পূর্ণরূপে

প্রতিভাত হয় একথা বলিলে সেই পদার্থকে ছোট করা হয়। মূলপদার্থ বলিতে এরিষ্টটল ঈশ্বরকেই বুঝিয়াছিলেন। তিনি শক্তিসম্পন্ন, সমস্ত ক্রিয়ার মূল বা আশ্রয় কিন্তু স্বয়ং নিষ্ক্রিয় (Source of movement but Himself unmoved)—তিনি অনন্ত চৈতন্যসম্পন্ন, অনন্ত কল্যাণ-গুণসম্পন্ন এবং অনন্তকাল ব্যাপিয়া আত্মধ্যানে নিমগ্ন। এই বাহ্য জগৎ তাঁর ভালবাসার বস্তু। তিনি নিত্যশুদ্ধ, তিনি নিয়ত স্থিরভাবে বর্ত্তমান, সুতরাং কোন দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি ভালমন্দের অতীত—ইহজগতের সুখদুঃখের অতীত। তিনিই একমাত্র বর্ত্তমান সুতরাং সৎ; তিনি অনন্ত চৈতন্যসম্পন্ন সুতরাং তিনি চিৎ; তিনি সকল দুঃখ-দোষাদিরহিত পূর্ণ সুতরাং তিনি আনন্দ।

আমরা মোটামুটীভাবে এরিষ্টটলের তত্ত্ববিজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিলাম। বারান্তরে এই বিষয়ে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

৺দ্বারকাধাম ও কয়েকটি তীর্থদর্শন।

(শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্নানাদি সমাপনান্তর তীর্থেশ্বর সঙ্গেশ্বর মহাদেব দর্শন করিলাম। তীরে অন্য যে কয়েকটি মন্দির ছিল সেগুলি দর্শন করিয়া এখান হইতে কিছু দূরে সরস্বতী তীরে যেখানে বলভদ্র দেহরক্ষা করিয়াছিলেন তথায় উপস্থিত হইলাম। একটি প্রাচীন মন্দির মধ্যে তাঁহার মর্ম্মর প্রস্তরনির্ম্মিত যোগাসনে-সমাসীন মূর্ত্তি দেখিলাম। মূর্ত্তির মুখ হইতে অনন্ত নাগ খানিকটা বাহির হইয়া আছেন। মন্দিরটি অতি জীর্ণ; ইহার সংস্কার

নিতান্ত আবশ্যক। পাণ্ডাগণ মনে করিলে অনায়াসে এই কার্য্য সাধন করিতে পারেন, কারণ, তাঁহাদের অবস্থা খুব ভাল; অথচ তাঁহাদের এদিকে একটুও নজর নাই। বাস্তবিক এখানকার পাণ্ডাগণ নিতান্ত অর্থশোষক; কেবল নিজের গণ্ডা লইয়াই ব্যস্ত। অতঃপর সহর মধ্যে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণভগবানের মন্দিরাদি দর্শন করিয়া সমুদ্রতীরে প্রাচীন সোমনাথ-মন্দির দর্শন করিতে যাইলাম।

পাঠকের অবগতির জন্য সোমনাথের একটি সামান্যমাত্র বৃত্তান্ত নিয়ে দেওয়া হইল। সত্যযুগে সোমদেব অর্থাৎ চন্দ্র প্রজাপতি দক্ষের ২৭টি কন্যাকে বিবাহ করেন; কিন্তু তাহাদের মধ্যে রোহিণীকে তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন। এই জন্য অন্যান্য কন্যাগণ পিতার নিকট অভিযোগ করিলেন। তাহাতে দক্ষ জামাতাকে আনাইয়া সকল কন্যাকে সমান আদর করিবার জন্য অনুরোধ করেন; কিন্তু চন্দ্র তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। তখন দক্ষ তাঁহার ক্ষয়রোগ হউক এই অভিশাপ প্রদান করেন। সোমদেব ক্ষয়রোগাক্রান্ত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকিলে বৃক্ষাদিসকল নিস্তেজ ও স্বাদবিহীন হইতে লাগিল এবং জীবকুল তজ্জন্য ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দেবগণ চন্দ্রের শাপ বিমোচনার্থ দক্ষের নিকট গমন করিলেন। দক্ষ প্রসন্ন হইয়া চন্দ্রকে প্রভাসে সরস্বতীসঙ্গমে স্নান করিয়া মহাদেবের আরাধনা করিতে বলেন। চন্দ্র তদনুসারে এখানে আসিয়া কঠোর তপশ্চরণ করেন। দেবাদিদেব তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া এই বর দিলেন যে, একপক্ষ যাবৎ তোমার কলা ক্ষয় হইতে থাকিবে এবং পরপক্ষে তাহার বৃদ্ধি হইবে। তখন চন্দ্র স্নান করিয়া পূর্ব্বপ্রভা প্রাপ্ত হইলেন। এই জন্য এই স্থান প্রভাস নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার অপর নাম সোমপত্তন; বর্ত্তমানে ইহাকে পত্তন বা পাটন কহিয়া থাকে। যাহা হউক, নিশাপতি মহাদেবকে এই স্থানে লিঙ্গমূর্ত্তিতে থাকিবার জন্য অনুরোধ করায়, তিনি স্বীকৃত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে অবস্থিত হইলেন। চন্দ্র ইঁহার নাম দিলেন ভৈরবেশ্বর সোমনাথ, এবং ইঁহার জন্য সুবর্ণ-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। ইনি ভারতের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। সত্যযুগান্তে

সে মন্দির নষ্ট হইলে, লঙ্কাধিপ দশানন ইঁহার জন্য রৌপ্যমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং ইঁহার শ্রাবর্ণিকেশ্বর সোমনাথ নামকরণ করেন। সে মন্দিরও কালে ধ্বংস হইলে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ এক চন্দনকাষ্ঠের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তখন মূর্ত্তির নাম ছিল শ্রীকালেশ্বর সোমনাথ। এই মন্দির নষ্ট হইবার পর কলিযুগে অনহলবাড়ার রাজা ভীমদেব পাথরের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই যুগে ইঁহার নাম হইল মহাকাল সোমনাথ। এই মন্দির শ্বেত ও রক্ত প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং গভীর পরিখাসমন্বিত উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ইহার শিখরদেশ বিশাল স্বর্ণ-ত্রিশূল এবং প্রধান তোরণ চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্বার দ্বারা শোভিত ছিল। মন্দিরের সম্মুখে সমুদ্রের ধারে বেড়াইবার জন্য সুন্দর প্রস্তরময় অলিন্দ এবং চতুর্দ্দিকে নাটমন্দির, দালান, অতিথিশালা, ভোগশালা, অশ্বশালা, গজশালা, রথশালা প্রভৃতি ছিল। মন্দিরের চূড়া হইতে বহু স্বর্ণঘণ্টাযুক্ত একগাছি স্বর্ণশৃঙ্খল লম্বিত ছিল; আরতির সময় ২০০ ব্রাহ্মণে এই সকল ঘণ্টা বাজাইত। মন্দিরস্থ বহু দেবদেবীর পূজাদির জন্য সহস্র ব্রাহ্মণ নিযুক্ত থাকিত। প্রত্যহ পূজার জন্য হস্তিপৃষ্ঠে গঙ্গাজল আসিত। ৩৫০ স্তাবক, ৩০০ বাদ্যকর, ৩০০ গায়ক এবং ৫০০ নর্ত্তকী সোমনাথের প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য নিযুক্ত ছিল। ৩০০ ক্ষৌরকার নিত্য যাত্রিগণের মস্তকমুণ্ডনে ব্যাপৃত থাকিত। ১০০০ স্বর্ণপ্রদীপে মন্দির নিত্য আলোকিত হইত। লিঙ্গমূর্ত্তি উচ্চে দশ হস্ত এবং পরিধিতে তিন হস্ত ও শূন্যগর্ভ ছিল। ইহার শূন্যগর্ভ বহুকালসঞ্চিত অমূল্য রত্নরাজি দ্বারা পূর্ণ ছিল। মন্দিরের ধনাগার সদা অতুল ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ থাকিত। সোমনাথের সমৃদ্ধির কথা মুসলমান ঐতিহাসিক যথেষ্টরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে বিশাল স্বর্ণচূড় মন্দির আর এখন নাই। গজনীর সুলতান মামুদ ইহা ভগ্ন করিয়া ইহার জগৎবিখ্যাত বৈভব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে। ধ্বংস কার্য্যের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা আলাউদ্দিন খিলিজী ও আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে। মুসলমানগণের কঠোরহস্তে এইরূপে হিন্দুর অনেক কীর্ত্তি লোপ পাইয়াছে; ইতিহাসপাঠক সে সমস্ত অবগত

আছেন। এখন মন্দিরের দুই চারিখানি অস্থিমাত্র পড়িয়া আছে; আর সেই বিপুল আনন্দ-কোলাহলের পরিবর্তে এক ভীষণ নীরবতা বিরাজ করিতেছে! বাস্তবিক এই দৃশ্য দেখিলে চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হয়। এই মন্দিরের চন্দনকাষ্ঠ নির্ম্মিত বিশাল তোরণ এখন আগ্রা কোর্টে রক্ষিত আছে। এই সব ভগ্নাবশেষ দেখিয়া অতি দুখিতান্তঃকরণে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

প্রভাস হইতে ৪ ক্রোশ দূরে প্রাচীসরস্বতী-তীর্থ। এখানে অনেকে স্নান করিবার জন্য আসেন। প্রাচীসরস্বতী হইতে প্রভাস পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানটিকে যাদবস্থলী বলে। এই স্থানটুকুর মধ্যেই পৌরাণিক যাবতীয় ব্যাপার সংঘটিত হয়। সময়াভাব বশতঃ প্রাচীস্নান আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই।

অপরাহ্ণে আমরা যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা দেখিতে যাই। এই স্থানটি ভেরাভাল এবং প্রভাসের মধ্যবর্ত্তী এক প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত। যে অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে শ্রীকৃষ্ণ শায়িত অবস্থায় ব্যাধ কর্ত্তৃক কুলনাশন মুষলাংশনির্ম্মিত শর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ করেণ তাহা এখনও বর্ত্তমান। কিন্তু গাছটি খুব প্রাচীন নহে; বোধ হয় ইহা সেই প্রাচীন কালের গাছের চারা অথবা তাহা হইতে গজাইয়াছে। এই স্থানের নাম ডালকাকুণ্ড; অশ্বত্থ গাছের সন্নিকটে পদম্‌কুণ্ড নামক একটি কূপ আছে। কথিত আছে, ইহার জলে শ্রীভগবান্ তাঁহার রক্তাক্ত চরণকমল বিধৌত করেন। এখানে একটি মন্দির মধ্যে ভগবানের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি আছে।

প্রভাস সহর জুনাগড় রাজ্যের অন্তর্গত এবং উহার বন্দর। ইহাতে অনেক লোকের বাস। সমস্ত বাড়ীগুলিই পাথরে নির্ম্মিত। এখানে বহু দোকান-পশারী আছে এবং প্রায় সব জিনিষই পাওয়া যায়। ইহা এখানকার একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। প্রভাস হইতে আমরা রৈবতক দর্শন মানসে জুনাগড় যাত্রা করি। বৈকালে প্রভাস ছাড়িয়া প্রায় রাত্রি ৯টার সময় আমরা জুনাগড় ষ্টেশনে উপস্থিত হই। সহরটি চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; ইহার ২।৩টি ফটক আছে। এই ফটকগুলি

সন্ধ্যা ৯॥ হইতে সকাল ৫ টা পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে, কেহ যাতায়াত করিতে পারে না। আমরা যত শীঘ্র সম্ভব একখানি গাড়ীতে মালগুলি বোঝাই করিয়া সকলে মিলিয়া পদব্রজেই সহরে চলিলাম। কারণ, আর গাড়ীর জন্য দেরী করিতে গেলেই ফটক বন্ধ হইয়া যাইবে। সহর মধ্যে কয়েকটি ধর্ম্মশালা আছে বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই জৈনদিগের দ্বারা নির্ম্মিত; সেগুলিতে জৈন ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীকে থাকিতে দেয় না। ফলতঃ, বাঙ্গালা থাকিবার জন্য এক আধটি ধর্ম্মশালা আছে; তন্মধ্যে ভাটিয়া ধর্ম্মশালাই ভাল। আবার এই ধর্ম্মশালার মেহতাজির গুণ মন্দ নহে। যাত্রী আসিলে প্রথমে তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করে, পরে কিছু বকশিসের লোভ দেখাইলে তবে স্থান দেয়। আমরাও এইরূপ করিয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই গির্ণার দেখিতে যাত্রা করি। সহর হইতে গির্ণারের পাদদেশ প্রায় ৩ মাইল। রাস্তা ভাল। গরুর গাড়ী বা টোঙ্গায় যাওয়া যায়। ভাড়া এক টাকা পাঁচ সিকা। এই পর্ব্বতের সহিত অনেক পৌরাণিক ব্যাপার জড়িত। মনুর বংশে রৈবত নামে এক রাজা এই দেশ পালন করিতেন। তাঁহার নাম হইতে এই পর্ব্বতের নাম রৈবতাচল বা রৈবতক হইয়াছে। তাঁহার কন্যা রেবতীর সহিত বলরামের বিবাহ হইয়াছিল। এই স্থানে মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ যদুগণের বৈরী কালযবনকে নিহত করেন। অর্জ্জুন ব্রহ্মচারী অবস্থায় বনভ্রমণকালে এই স্থানে আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভগিনী সুভদ্রাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে হরণ করেন। ইহাতে যদুগণের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যস্থতায় বিরোধ মিটিয়া যায় এবং সুভদ্রার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এইখানে ভগবান্ দত্তাত্রেয় কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহার চরণপাদুকা এখানে বর্ত্তমান আছে। ঐজন্য পশ্চিম ভারতের সর্ব্বপ্রকার সাধুসন্ন্যাসীই অতি পবিত্রবোধে এই স্থান দর্শন করিতে আসেন। প্রাচীনকালে এখানে অনেক যোগী ঋষির আশ্রম ছিল। এখনও জঙ্গল মধ্যে সাধুরা আছেন ইহা অনেকের বিশ্বাস। এই স্থানের মাহাত্ম্য এখনও বেশ অনুভূত হয়। বাস্তবিক ইহা সাধনের উপযুক্ত

স্থান। গুজরাট প্রদেশে এত উচ্চ নানাবিধ ওষধিপূর্ণ পর্ব্বত আর দৃষ্ট হয় না।

ধর্ম্মশালা হইতে এক মাইল আসিলে সহরপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যায়। সহরের ফটক পার হইয়া কিছু দূর আসিলে মহারাজ ধর্ম্মাশোক স্থাপিত একখানি সুবৃহৎ শিলালিপি দৃষ্ট হয়। এই শিলালিপি রক্ষার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট ইহার উপর ছাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। এখান হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া একটি ছোট পাহাড়ী নদী সেতুযোগে পার হইতে হয়। তথা হইতে আন্দাজ আধ মাইল নদীর ধারে ধারে যাইলে রেবতীকুণ্ড। এই স্থানে বলরামের সহিত রেবতীর বিবাহ হয়। যাদবগণ রৈবতক বিহারে আসিলে এই স্থানে অবস্থান করিতেন। ইহার সন্নিকটে দামোদর কুণ্ড, কৃষ্ণ-বলরামের মন্দির ও দু-একটি মঠ আছে। এখানে নদীর দুই পারেই বাঁধা ঘাট; অনেক যাত্রী এইস্থানে স্নান করিয়া থাকে। এই স্থান পার হইতে এক পয়সা করিয়া কর লাগে। কিছু দূর অগ্রসর হইলে ভবনাথ মহাদেবের মন্দির ও মৃগীকুণ্ড। এই কুণ্ডের মৃত্তিকা দ্বারা মৃগীরোগ আরাম হয় বলিয়া কথিত আছে। অদূরে দত্তাত্রেয়ের ও অপর কয়েকটি মন্দির এবং জলসরবরাহের স্থান। একটি উচ্চস্থানে চতুর্দ্দিকে গাঁথিয়া একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী করা হইয়াছে; ইহাতে বর্ষার জল সঞ্চিত থাকে এবং ঐ জল নলযোগে সহরে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। এখান হইতে আর একটু যাইলেই রাস্তার শেষ এবং পাহাড়ে প্রবেশ করিবার ফটক। ফটকের বাহিরে ২।৩ খানি দোকান ও ধর্ম্মশালা আছে। গাড়ী এই পর্য্যন্ত আসে। ফটকে জুনাগড় নবাবের পাহারা আছে; এক আনা কর না দিলে তাহারা পাহাড়ে উঠিতে দেয় না। ফটক পার হইলেই পাহাড়ে উঠিবার সিঁড়ি আরম্ভ। সিঁড়িগুলি অতি সুন্দর ও সুরক্ষিত এবং সংখ্যায় ছয় সাত হাজার হইবে। রৈবতকের শৃঙ্গ প্রধানতঃ ৫টি; যথা—অম্বামাতা, গোরক্ষনাথ, গুরু দত্তাত্রেয়, অঘোরশঙ্কর ও কালকা শৃঙ্গ। যাত্রিগণ প্রথম ৩টি দেখিয়াই নিবৃত্ত হইয়া থাকেন।

পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে রাস্তার দুই পার্শ্বে বিশ্রাম স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি পার হইলে গর্ভযোনি।

এইখানে একটি হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী থাকেন এবং কিছু দর্শনী লইয়া যাত্রিগণকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন। আর একটু উঠিয়াই একটি সাধুর আশ্রম। তিনি বহুপরিমাণ শীতল জল জোগাড় করিয়া রাখেন এবং তৃষ্ণার্ত্ত যাত্রিগণকে তাহা বিতরণ করেন। বাস্তবিক এই অবধি আসিতে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যায় এবং জল না পাইলে লোকের যে কি কষ্ট হয় তাহা বলা যায় না। ইহার পর আরও অনেকটা চড়াই করিলে জৈনদিগের তীর্থঙ্কর নেমিনাথের মন্দির। স্থানটি প্রায় ৩০০০ ফিট উচ্চ। মন্দির প্রাঙ্গণ ১৯৫ ফিট লম্বা ও ১৩০ ফিট চওড়া। ৭।৮টি বড় বড় মন্দির ব্যতীত উক্ত প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে ৭০টি ছোট ছোট মন্দির মধ্যে পদ্মাসনে অবস্থিত তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি বিরাজিত। মন্দিরগুলি সমস্তই সুরক্ষিত ও বহু আসবাবে পূর্ণ। জলাভাব নিবারণের জন্য ২টি ছোট ছোট পুষ্করিণী ক্ষোদিত আছে। নেমিনাথের পূজা-ভোগরাগাদিরও কোন ত্রুটি নাই। এখানে একটি মিষ্টান্নের ও চায়ের দোকান আছে। এতদ্ভিন্ন সমগ্র পাহাড় মধ্যে আর কোন দোকান নাই। এখান হইতে আর একটু উপরে উঠিলে গোমুখী নামক প্রস্রবণ পাওয়া যায়। ইহার জল নিঃশব্দে ৩টি গভীর কুণ্ড পূর্ণ করিতেছে। এই জল এত স্নিগ্ধ যে আকণ্ঠ পান করিলেও আকাঙ্ক্ষা মেটে না। কুণ্ডগুলির আশেপাশে কয়েকটি ঘর আছে। শান্তানন্দ নামে এক জন সাধু এইখানে থাকেন। তিনি নিতান্ত অতিথিসৎকার-পরায়ণ। যাত্রী আসিলে তাহাদের যথোচিত যত্ন করেন। ভাত, খিচুরী, রুটি, পুরী, চা প্রভৃতি যে যাহা খাইতে চান তাহাই প্রস্তুত করিয়া খাওয়ান; কেহ রাত্রিবাস করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে বিছানা কম্বল প্রভৃতিও দিয়া থাকেন। পাহাড়ের মধ্যে এই সুবিধা বড় উপেক্ষার বিষয় নহে। একদিনে গির্ণারের চড়াই-উৎরাই যে কি ভয়ানক কষ্টকর তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। আমার মনে হয়, প্রাতে পাহাড় চড়িতে আরম্ভ করিয়া দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া এই আশ্রমে আহারাদি পূর্ব্বক রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে নামিয়া যাওয়া উচিত। এখান হইতে আর একটু উপরে উঠিলেই এই শৃঙ্গটির প্রায় শিখরদেশে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহার নাম অম্বামাতা

শৃঙ্গ এবং উচ্চতা ৩২০০ ফিটের কম নহে। এখানে অম্বাদেবীর মন্দির আছে। এখান হইতে কিছু দূর চড়াই-উৎরাই করিয়া যাইলে গোরক্ষনাথ শৃঙ্গে উপস্থিত হওয়া যায়; উহা উচ্চে ৩৬৬৬ ফিট। মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ কোন কালে এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন মনে হয়। এখানে কোন মন্দিরাদি নাই। কয়েকজন সাধু এখানে থাকেন। গির্ণারের ইহাই সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। এখান হইতে খানিকটা নামিলে পথ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। একভাগ কমণ্ডলুকুণ্ড নামক একটি প্রস্রবণের নিকট গিয়াছে। যোগীরাজ দত্তাত্রেয়ের কমণ্ডলু এখানে থাকিত বলিয়াই নাকি ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে। এখানেও কয়েকজন সাধু বাস করেন। আর একটি পথ গুরু-দত্তাত্রেয় শৃঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। এখানকার সিঁড়িগুলি নিতান্ত অপ্রশস্ত এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চ বলিয়া অতি সাবধানে উঠিতে হয়। এই শৃঙ্গে দত্তাত্রেয়ের চরণচিহ্ন ক্ষোদিত আছে; উহা স্পর্শ করিতে হইলে দুই চারি আনা ভেট দিতে হয়। এখানে একটা বড় ঘণ্টা আছে। যাত্রিগণ চরণপাদুকা পরিক্রম করিয়া ঐ ঘণ্টা বাজাইয়া থাকে। এই শৃঙ্গ উচ্চে প্রায় ২৮০০ ফিট। কালিকাশৃঙ্গ ও অঘোরশঙ্কর শৃঙ্গদ্বয়ে দ্রষ্টব্য কিছুই নাই। পূর্ব্বকালে এইস্থান অঘোরী এবং কাপালিকগণের সাধনক্ষেত্র ছিল। কর্ণেল টড গির্ণারে বেড়াইতে আসিয়া অঘোরশঙ্কর শৃঙ্গে এক ভীষণমূর্ত্তি কাপালিক দেখিয়াছিলেন। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস কালিকাশৃঙ্গের নিম্নে গভীর জঙ্গলে এখনও অনেক কাপালিক আছে। এই সব কারণে যাত্রিগণ কেহই এই শৃঙ্গদ্বয়ে আসে না। প্রথমোক্ত তিনটি শৃঙ্গ দেখিতে অন্ততঃ ৫।৬ ঘণ্টা লাগে। অতঃপর আমরা শান্তানন্দ স্বামীজীর আশ্রমে আসিয়া গোমুখীর শীতল জলে স্নান করতঃ কিছু জলযোগ করিয়া বেলা প্রায় ৩টা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিলাম। পরে রৌদ্রের তেজ একটু কমিয়া আসিলে নামিতে আরম্ভ করিলাম।—পাহাড়ের পাদদেশে ফটকের নিকট উপস্থিত হইতে প্রায় ২ ঘণ্টা লাগিল। ফটকের বাহিরে আসিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। একদিনে পাহাড়ে উঠিয়া নামিয়া আসায় আমাদের এত ক্লান্তি হইয়াছিল যে প্রায় সকলেই চলৎশক্তি হীন হইয়াছিলাম। যতলোক উঠিয়াছিল প্রায় সকলেরই

এইরূপ দশা দেখিয়াছিলাম। একারণ যৎকিঞ্চিৎ উদরস্থ করিয়াই শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করা গেল!

পরদিন প্রভাতে সহরের কতকাংশ দর্শন করা গেল। জুনাগড় বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহর। অনেক সুন্দর হর্ম্ম্যাদি এখানে বর্ত্তমান; খোরার ঘর একখানিও নাই। সব জিনিষই পাওয়া যায়। পথ, ঘাট, বাজার সব ভাল। কলের জল সহরময় সরবরাহ হয়। লোক-সংখ্যাও যথেষ্ট। ইহাই জুনাগড় রাজ্যের রাজধানী। রাজ্যের আয়তন নিতান্ত কম নহে; প্রায় ৩২৮৪ বর্গ মাইল। ইহার বর্ত্তমান নবাব নাবালক। সহর মধ্যে দর্শনীয় অনেকগুলি জিনিষ আছে, যথা:— Upper Court, সক্করবাগ, নবাবের বাগান ও মহল ইত্যাদি। এখানকার পশুশালায় অনেক সিংহ আছে। শুনা যায় গির্ণারের জঙ্গল সিংহপূর্ণ।

ঐ দিবস মধ্যাহ্নে জুনাগড় ত্যাগ করিয়া পরদিবস অপরাহ্নে কাইরা জেলার নিকটস্থ বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত ডাকোরে রণছোড়জি দর্শনের জন্য উপস্থিত হই। শতকরা ৯০ জন যাত্রী দ্বারকা দর্শনান্তে এই স্থান দর্শন করিয়া যান। এখানকার সম্বন্ধে জনশ্রুতি এইরূপ—এক সময়ে দ্বারকার পাণ্ডাগণ অত্যন্ত লোভী হয় এবং অর্থ আদায়ের জন্য যাত্রিগণকে অতিমাত্রায় উৎপীড়ন করে। বোধানো নামে এক পরমভক্ত রাজপুতকে উৎপীড়িত করায় সে মনঃকষ্টে দ্বারকা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ভক্তের কষ্ট দেখিয়া ঠাকুরও তাঁহার সহিত দ্বারকা ত্যাগ করিয়া চলিলেন। ভক্ত তাঁহাকে লইয়া ডাকোরে আসিলেন এবং তথায় তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। এদিকে দ্বারকার পাণ্ডাগণ রণছোড়জীকে মন্দির মধ্যে দেখিতে না পাইয়া চতুর্দ্দিকে খুঁজিতে বাহির হইলেন; অবশেষে ডাকোরের কথা শুনিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর পাণ্ডাদের সহিত ফিরিবেন না এই উদ্দেশ্যে মন্দিরের নিকটস্থ একটী পুষ্করিণী মধ্যে (যাহার নাম তদবধি গোমতী গঙ্গা হইয়াছে) লুক্কায়িত হইলেন। পাণ্ডারা এখানে মন্দির মধ্যে বিগ্রহমূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া বড়ই ব্যাকুল হইলেন এবং বড় বড় বল্লম লইয়া পুষ্করিণীর তলদেশ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। একটী বল্লমের সূক্ষ্মাগ্রভাগ দৈবক্রমে ঠাকুরের ডান

দিকের পাঁজরার উপর লাগিয়া ক্ষত হয়। যাহা হউক, তাহাতেও ঠাকুরকে পাওয়া গেল না। পাণ্ডাগণ শ্রমক্লিষ্ট হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তখন ঠাকুর তাহাদিগকে স্বপ্নযোগে জানাইলেন,—"তোমরা লোভী হওয়ায় আমি এই স্থানে চলিয়া আসিয়াছি এবং এইখানেই থাকিব। তোমরা দ্বারকায় ফিরিয়া যাও, সেখানে যথাস্থানে আমার অবিকল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবে।" তখন পাণ্ডারা দ্বারকায় ফিরিয়া যাইলেন, এবং ঠাকুরও পুকুর হইতে উঠিলেন। সকলে শ্রীঅঙ্গে ক্ষতচিহ্ন দেখিল এবং বুঝিল যে ইহা পাণ্ডাগণের বল্লম দ্বারা উৎপাদিত। তদবধি ঠাকুরের গায়ে ক্ষতচিহ্ন রহিয়া গেল। পাণ্ডাগণ দ্বারকায় ফিরিয়া আসিয়া মন্দির মধ্যে যে মূর্ত্তি দেখিল তাহাতেও ঐ ক্ষতচিহ্ন দেখিল।

আমরা ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া মালপত্র তথায় রাখিয়া দেবদর্শনে চলিলাম। নগরে প্রবেশ করিতে যাত্রিগণকে ⁄০ আনা কর দিতে হয়। জানি না বরোদা রাজ্যের সর্ব্বতীর্থেই এইরূপ কর আদায়ের ব্যবস্থা আছে কি না, তবে আমরা যে কয়টিতে গেলাম, সে কয়স্থানেই এই ব্যবস্থা দেখিলাম বটে। ইহা হিন্দু রাজার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় নহে। সহরের মধ্যে গিয়া দেখিলাম লোকে লোকারণ্য; তিলমাত্র ধারণের স্থান নাই। ইহার কারণ ঐদিন রাসপূর্ণিমা। রাসপূর্ণিমা এখানকার একটি বিশেষ পর্ব্বাহ এবং প্রতিবৎসর ঐ দিবস লক্ষাধিক যাত্রীর সমাবেশ হইয়া থাকে। একে ত ঠাকুরের আসবাবপত্র যথেষ্ট, তাহার উপর, ঐদিন তাঁহাকে বরোদারাজদত্ত সওয়া লক্ষ টাকার মুকুট পরান হয়। যাত্রিগণ তাহাই দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকে। ঘটনাচক্রে সেদিন চন্দ্রগ্রহণ হওয়ায় ভীড়ের মাত্রা আরো একটু বাড়িয়াছিল। যাহা হউক আমরা অতি কষ্টে রণছোড়জীকে দর্শন করিয়া গোতমী গঙ্গা দেখিতে গেলাম। ইহা একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী—বৃহৎ বৃহৎ কচ্ছপে পূর্ণ; ইহার প্রায় চতুর্দ্দিকে বাঁধান, কিন্তু জল বড় ঘোলা। সহরটি বেশ; ভাল ভাল আহার্য্য দ্রব্য মেলে; হোটেল আছে; কিন্তু স্বাদু পানীয় জলের বড় অভাব। ভীষণ ভীড় দেখিয়া আমরা ঐ দিনই রাত্রিকালে ডাকোর ত্যাগ করি।

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

বাসনাক্ষয় প্রকরণ।

(অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাসনাক্ষয়ের ন্যায় মনোনাশও জীবন্মুক্তির কারণ ইহা শ্রুতিতে (ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ ২-৫) আছে।

"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥"

মনই মনুষ্যদিগের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ, বিষয়াসক্ত মন বন্ধনের, এবং নির্ব্বিষয় মন মুক্তির কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

"যতো নির্ব্বিষয়স্যাস্য মনসো মুক্তিরিষ্যতে।
অতো নির্ব্বিষয়ং নিত্যং মনঃ কার্য্যং মুমুক্ষুণা॥" ৩।

যে হেতু এই মনই নির্ব্বিষয় হইলে, মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ইহা শাস্ত্রসম্মত, সেই হেতু যিনি মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি মনকে সর্ব্বদাই বিষয়শূন্য করিয়া রাখিবেন।

"নিরস্তবিষয়াসঙ্গং সংনিরুদ্ধং মনো হৃদি।
"যদা যাত্যুন্মনীভাবং তদা তৎ পরমং পদম্॥" ৪।

বিষয়াসক্তিপরিশূন্য মন হৃদয়ে (১) সংনিরুদ্ধ হইয়া যখন উন্মনীভাব (২) (সঙ্কল্পশূন্যতা) প্রাপ্ত হয় তখন তাহাই পরমপদ, অর্থাৎ সেই অবস্থালাভেই পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়।

---

(১) হৃদয়ে—মনরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের গোলকস্বরূপ হৃৎকমলে।

(২) "অর্থাদর্থান্তরং বৃত্তির্গন্তুং চলতি চান্তরে।
অনাধারা নির্ব্বিকারা যাদৃশী সোন্মনী স্মৃতা।"

চিত্তবৃত্তি যখন এক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক বিষয়ে গমন করে তখন তদুভয়ের মধ্যে চিত্তবৃত্তির যে আধারশূন্য নির্ব্বিকার অবস্থা হয় তাহার নাম উন্মনীভাব। ফলকথা, তাহা মনের বিষয়শূন্য অবস্থা।

"তাবদেব নিরোদ্ধব্যং যাবদ্‌হৃদিগতং ক্ষয়ম্।

এতজ্‌জ্ঞানঞ্চ ধ্যানঞ্চ (১) শেষো ন্যায়স্য বিস্তরঃ॥" ৫

প্রতিদিন যতক্ষণ না মন হৃদয়েই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ সঙ্কল্পবিকল্পশূন্য হয় ততক্ষণ মনোনিরোধ অভ্যাস করিতে হইবে। ইহার নামই জ্ঞান, (২) ইহার নামই ধ্যান। অবশিষ্ট যে সকল শাস্ত্রোপদেশ শুনা যায় তাহা (এই) সংক্ষিপ্ত সাধারণ নিয়মের বিস্তৃত ব্যাখ্যামাত্র।

বন্ধন দুই প্রকার তীব্র ও মৃদু। তন্মধ্যে আসুর সম্পৎ সাক্ষাৎ ভাবেই ক্লেশের কারণ বলিয়া তীব্র বন্ধন, আর কেবলমাত্র দ্বৈত প্রতীতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্লেশস্বরূপ না হইলেও আসুর সম্পৎ উৎপাদন করে বলিয়া মৃদু বন্ধন। তন্মধ্যে বাসনাক্ষয়ের দ্বারাই তীব্রবন্ধনের নিবৃত্তি করা যায়, কিন্তু মনোনাশের দ্বারা উভয় প্রকার বন্ধনেরই নিবৃত্তি করা যাইতে পারে। তাহা হইলে যদি এরূপ আপত্তি করা হয় যে যখন মনোনাশই যথেষ্ট (একাই উদ্দেশ্যসাধক) তখন বাসনাক্ষয়ের প্রয়োজন কি? তাহা ত নিরর্থক। (তদুত্তরে বলি এরূপ আপত্তি করা চলে না), কেননা ভোগের হেতুভূত প্রবল প্রারব্ধ চিত্তের ব্যুত্থান ঘটাইলে, বাসনাক্ষয় তীব্রবন্ধন নিবারণ করিতে উপযোগী হয়। (অনিবার্য্য) ভোগ মৃদু বন্ধনের দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে। তামস বৃত্তি সমূহই তীব্রবন্ধন, সাত্ত্বিক ও রাজসিক এই দুই প্রকারেরই বৃত্তি মৃদুবন্ধন। এই (তত্ত্ব) গীতায় (২।৫৬)

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।"

'দুঃখের কারণ প্রাপ্ত হইলে যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না এবং সুখের হেতু উপস্থিত হইলেও যিনি স্পৃহাশূন্য'—এই শ্লোকের ব্যাখ্যানস্থলে, স্পষ্ট করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে।

তাহা হইলে এস্থলে আপত্তি উঠিতে পারে যে, মৃদুবন্ধনকে যখন অঙ্গীকার করিয়া লইতেই হইবে, এবং বাসনাক্ষয় দ্বারা যখন তীব্রবন্ধনের

(১) পাঠান্তর—"এতজ্‌জ্ঞানঞ্চ মোক্ষঞ্চ অতোঽন্যো গ্রন্থবিস্তরঃ।"

(২) জ্ঞান—নির্গুণ পরব্রহ্মের প্রত্যক্ষ যথার্থজ্ঞানের সাধনা।
ধ্যান—সগুণ পরব্রহ্মের ধ্যান।

নিবারণ করা যায়, তখন মনোনাশ নিষ্প্রয়োজন।' (তদুত্তরে বলি) এরূপ আপত্তি উঠিতে পারে না। কেননা যে সকল অবশ্যম্ভাবী (১) ভোগ দুর্ব্বল প্রারব্ধবশে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই সকল ভোগের প্রতীকার করিতে মনোনাশের উপযোগিতা আছে। সেই প্রকারের ভোগ প্রতীকার দ্বারা নিবর্ত্তিত হইতে পারে, ইহাই বুঝাইবার উদ্দেশ্যে (পূর্ব্বাচার্য্যগণ) এই শ্লোক পাঠ করিয়া থাকেন ;—

"অবশ্যম্ভাবিভোগানাং (২) প্রতীকারো ভবেদ্যদি।
তদা দুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ॥"

যদি (প্রারব্ধকর্ম্ম সমানীত) অবশ্যম্ভাবী ভোগসমূহের (মনোনাশ দ্বারা) প্রতীকার করা হইত তাহা হইলে, নল, রাম ও যুধিষ্ঠির দুঃখের দ্বারা আক্রান্ত হইতেন না।

তাহা হইলে দেখা গেল, বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ, জীবন্মুক্তির সাক্ষাৎ

(১) এস্থলে "দুর্ব্বলপ্রারব্ধাপাদিতানামবশ্যম্ভাবিভোগানাং প্রতীকারার্থত্বাৎ" এরূপ পাঠ অবলম্বনেই অনুবাদ প্রদত্ত হইল। 'অনবাশ্যম্ভাবী' পাঠ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। এস্থলে অবশ্যম্ভাবী শব্দের অর্থ—প্রারব্ধবশে সমানীত হয় বলিয়া লোকে যাহাকে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে করে, কিন্তু তাহা বস্তুতঃ প্রতীকারযোগ্য।

(২) এইস্থলে "অবশ্যম্ভাবিভাবানাং" এইরূপ পাঠ পরিত্যাগ করিয়া "অবশ্যম্ভাবিভোগানাং" এইরূপ পাঠ গৃহীত হইল। কেননা গ্রন্থকার অবশ্যম্ভাবী ভোগের প্রসঙ্গেই উক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'ভাব' পাঠ করিলেও অর্থের বিশেষ বৈলক্ষণ্য ঘটে না। এই শ্লোক পঞ্চদশী গ্রন্থে তৃপ্তিদীপে (১৫৬ সংখ্যক শ্লোক) উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার মূল অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। পঞ্চদশী গ্রন্থে বিদ্যারণ্য মুনি যে ভাবে এই শ্লোকটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ইহার এই রূপ অর্থ দাঁড়ায় যে নল, রাম ও যুধিষ্ঠির—ইঁহারা জ্ঞানবান্ হইয়াও স্ব স্ব প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করিয়া (দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া মায়ামৃগের অনুসরণ করিয়া) দুঃখে পতিত হইয়াছিলেন—প্রারব্ধ এইরূপ অপরিহার্য্য। সেই স্থলে তীব্রবেগ প্রারব্ধের অপরিহার্য্যত্ব প্রদর্শন করিতে এই শ্লোকের প্রয়োগ হইয়াছিল। এই স্থলে মৃদুবেগ-প্রারব্ধের পরিহার্য্যত্ব প্রদর্শন করিতে সেই শ্লোকই ব্যবহৃত হইয়াছে।

সম্বন্ধে সাধন বলিয়া ইহাদের মুখ্যত্ব, এবং তত্ত্বজ্ঞান উক্ত দুই সাধনের উৎপাদক বলিয়া দূরবর্ত্তী হওয়াতে উহার গৌণত্ব। তত্ত্বজ্ঞান যে বাসনা-ক্ষয়ের কারণ তাহা শ্রুতিতে বারবার কথিত হইয়াছে। যথা,—

"জ্ঞাত্বাদেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ" (১)—(শ্বেতাশ্বতর উপ, ১।১১)
স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে জানিলে অর্থাৎ "আমিই সেই" এইরূপ উপলব্ধি করিলে সকল পাশ বা বন্ধনের (অর্থাৎ অবিদ্যাদির এবং তজ্জনিত জন্ম-মরণাদির অথবা অষ্টপাশের) নিবৃত্তি হয়।

'অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।' (কঠ ২।১২)
আত্মাতে চিত্ত সমাধানরূপ অধ্যাত্মযোগ (বা নিদিধ্যাসন) লাভ করিয়া সাক্ষাৎকারান্তে বুদ্ধিমান্ (সাধক) হর্ষশোকরহিত হয়েন।

'তরতি শোকমাত্মবিৎ'। (ছান্দোগ্য উপ, ৭।১।৩)
যিনি আত্মাকে অবগত হইয়াছেন তিনি (অকৃতার্থবুদ্ধিতারূপ) মনস্তাপ অতিক্রম করেন।

'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ' (ঈশাবাস্য উপ ৭)
সেই কালে অথবা সেই পুরুষে (যিনি ঈশ্বরাত্মা ও বিজ্ঞাতৃস্বরূপের অভেদ বুঝিয়াছেন) সর্ব্বত্র একাত্মজ্ঞান লাভ হইবার পর, আত্মাবরণরূপ মোহই বা কি বা বিক্ষেপাত্মক শোকই বা কি? অর্থাৎ মূলাবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে অবিদ্যাকার্য্য শোক-মোহাদিরও আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে।

"জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ" (শ্বেতাশ্বতর উপ ১।৮, ২।১৫ ৪।১৬, ৫।১৩, ৬।১৩)
অবিদ্যা ও তৎকার্য্যের দ্বারা অসংস্পৃষ্ট পরমাত্মাকে জানিলে লোকে অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মরূপ পাশ (অথবা অষ্টপাশ) হইতে বিমুক্ত হয়েন।

এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে তত্ত্বজ্ঞানই মনোনাশের হেতু। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবার পর যে অবস্থা হয় সেই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—

---

(১) কুলার্ণবতন্ত্রে, পঞ্চমখণ্ডে
"ঘৃণালজ্জাভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতিপঞ্চমী।
কুলং শীলং তথাজাতিরষ্টৌপাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

'যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ কেন' কং জিঘ্রেৎ' ইত্যাদি (বৃহদারণ্যক উপ ২।৪।১৪, ৪।৫।১৫)

কিন্তু যে (বিদিততত্ত্বাবস্থায়) এই (ব্রহ্মবিদের) কর্ত্তৃকর্ম্মক্রিয়া-ফলাদি সমস্তই প্রত্যগাত্মার স্বরূপবিজ্ঞান দ্বারা প্রবিলুপ্ত হইয়া আত্মস্বরূপ হয়, তখন সেই অবস্থায় কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন্ কর্ত্তা কোন বিষয় দর্শন করিবে বা আঘ্রাণ করিবে ; ইত্যাদি।

পূজ্যপাদ গৌড়পাদাচার্য্য ও বলিয়াছেন :—

"আত্মতত্ত্বানুবোধেন (১) ন সংকল্পয়তে যদা।
অমনস্তাং তদা যাতি গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহঃ॥" ইতি"

(মাণ্ডুক্যকারিকা ৩।৩২)

পাঠান্তর—আত্মসত্যানুবোধেন……তদগ্রহম্।

শাস্ত্রোপদেশ এবং আচার্য্যোপদেশের গ্রহণের পর "আত্মাই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য বস্তু" এইরূপ জ্ঞান হইলে মন যখন (সঙ্কল্পের বিষয় না থাকাতে) আর সঙ্কল্প করে না তখন মন অমনোভাব প্রাপ্ত হয় এবং গ্রহণীয় বস্তুর অভাব হওয়াতে মন গ্রহণের কল্পনা ত্যাগ করে ('তদগ্রহম্' এই পাঠ ধরিয়া অর্থ করা হইল)।

জীবন্মুক্তির পক্ষে বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ সাক্ষাৎ-সাধন বলিয়া যেমন ইহাদের প্রাধান্য, সেইরূপ বিদেহমুক্তির পক্ষে জ্ঞান সাক্ষাৎ-

---

(১) আনন্দাশ্রম মুদ্রিত মাণ্ডুক্য কারিকার পাঠ (১৪১ পৃষ্ঠা) এইরূপ :— "আত্মসত্যানুবোধেন ন সঙ্কল্পয়তে যদা। অমনস্তাং তদা যাতি গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহম্।" ৩২। সেইস্থলে মুদ্রিত শাঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ—"আচ্ছা এই (৩১ শ্লোকে বর্ণিত) অমনীভাব কি প্রকারে হয়? বলিতেছি। আত্মাই সত্য আত্মসত্য, (ঘটশরাবাদিতে) মৃত্তিকার ন্যায় ; কেননা শ্রুতি বলিতেছেন— (ছান্দোগ্য উ ৬।১।৪) মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ, বিকার (কার্য্যপদার্থ) কেবল শব্দাত্মক নামমাত্র।" শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশের পর সেই আত্মসত্যের অববোধ, আত্মসত্যানুবোধ। সেই বোধ হইলে সঙ্কল্প্য (সঙ্কল্প দ্বারা গ্রহণীয়), বস্তুর অভাব হওয়াতে (মন) আর সঙ্কল্প করে না, যেমন দাহ্যবস্তুর অভাব হইলে অগ্নির জ্বলন নিবৃত্ত হয় সেইরূপ। যে সময়ে এইরূপ হয় (মন) তখন অমনস্তা অমনোভাব প্রাপ্ত হয়। গ্রহণীয় বস্তুর অভাবে মন তখন অগ্রহ অর্থাৎ গ্রহণবিকল্পনাবর্জ্জিত হয়।

সাধন বলিয়া জ্ঞানের প্রাধান্য। কেননা স্মৃতি শাস্ত্রে আছে—"জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যং প্রাপ্যতে যেন মুচ্যতে' ইতি"—'কিন্তু জ্ঞানলাভ হইলেই কৈবল্যলাভ হয় এবং তাহা দ্বারা জীব মুক্ত হয়'।

কৈবল্য শব্দের অর্থ কেবল আত্মার ভাব অর্থাৎ দেহাদিরাহিত্য। তাহা কেবল জ্ঞানের দ্বারাই লাভ করা যায়, কেননা, জীব অজ্ঞানবশতঃই আপনাকে সদেহ বলিয়া কল্পনা করে, সুতরাং একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই সেই সদেহ ভাবের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। উক্ত স্মৃতিবাক্যে যে 'এব' (জ্ঞানাদেব) শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে তদ্দ্বারা এই বুঝিতে হইবে যে কর্ম্ম দ্বারা কৈবল্যলাভ হয় না। কেননা শ্রুতিতে (কৈবল্য উপ ২, মহানারায়ণ উপ ১০।৫) আছে "ন কর্ম্মনা ন প্রজয়া"—[কর্ম্মের দ্বারা বা প্রজার দ্বারা (অমৃতত্ব লাভ করা যায় না)] সেই হেতু, যিনি জ্ঞানশাস্ত্রের অভ্যাস না করিয়া, যথাসম্ভব বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ অভ্যাস করিয়া সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাহার কৈবল্যলাভ হয় না। কেননা (তদ্দ্বারা) লিঙ্গদেহের ক্ষয় হয় না। অতএব 'এব' এই শব্দের দ্বারা এই দুইটী অর্থাৎ কর্ম্ম ও উপাসনা পরিহৃত হইতেছে। "এবং তাহার দ্বারা (জীব) মুক্ত হয়" ইহার অর্থ—জ্ঞানদ্বারা যে কেবলত্ব বা দেহাদিরাহিত্যের প্রাপ্তি ঘটে তদ্দ্বারাই সমুদায় সম্বন্ধ হইতে বিমুক্ত হয়।

বন্ধন অনেক প্রকারের, কেননা বন্ধন শ্রুতির অনেক প্রসিদ্ধ স্থলে "অবিদ্যাগ্রন্থি" "অব্রহ্মত্ব" "হৃদয়গ্রন্থি" "সংশয়" "কর্ম্ম" "সর্ব্বকামত্ব" "মৃত্যু" "পুনর্জন্ম" এই সকল শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। অজ্ঞান হইতে এই সকল বন্ধনের উৎপত্তি, এবং (একমাত্র) জ্ঞান দ্বারাই সকলগুলির নিবৃত্তি হয়। সেই অর্থে নিম্নলিখিত শ্রুতিবচনগুলির প্রমাণ :—

"এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সৌম্য" (মুণ্ডক ২।১।১০)।

হে প্রিয়দর্শন! সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়গুহায় অবস্থিত এই সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মকে, যে অধিকারী পুরুষ আপনারই স্বরূপ বলিয়া জানেন, সেই বিদ্বান্ 'অবিদ্যাগ্রন্থি' অর্থাৎ 'আমি অজ্ঞ' এইরূপ অজ্ঞানের সহিত যে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ তাহা এই শরীরে অবস্থানকালেই বিনাশ করেন।

(যঃ হ তৎ পরমং) ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” (মুণ্ডক উপ ৩।২।৯)

[যে পুরুষ সেই পরম ব্রহ্মকে ‘আমিই সেই’ এইরূপে নিঃসন্দেহভাবে অবগত হয়েন সেই ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ ব্রহ্মই হয়েন।]

“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥” (মুণ্ডক উপ, ২।২।৮)

‘কার্য্য—অবর ও কারণ—পর, এই উভয়রূপ অর্থাৎ সর্ব্বস্বরূপ সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে পর, চিৎ এবং অহঙ্কারের পরস্পর তাদাত্ম্যাধ্যাসরূপ হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, যাবতীয় সংশয় বিচ্ছিন্ন হয় এবং অনারব্ধফলক সঞ্চিত ও আগামী কর্ম্মসমূহ নাশপ্রাপ্ত হয়’।

“যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ” (তৈত্তিরীয় উপ, ২।১।১

যে হার্দ্দাকাশ পরমব্রহ্মের স্থিতিস্থান বলিয়া উৎকৃষ্ট, সেই হার্দ্দাকাশে যে বুদ্ধিরূপা গুহা আছে, তাহাতে স্থিত অর্থাৎ অভিব্যক্ত ব্রহ্মকে যে অধিকারী পুরুষ “আমিই সেই” এইরূপ জানেন, তিনি যাবতীয় বাঞ্ছনীয় ভোগ এককালেই উপভোগ করেন, অর্থাৎ যিনি সকল আনন্দের রাশিস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন, তিনি ব্রহ্মানন্দের লেশস্বরূপ সকল কাম্যবস্তু-ভোগজনিত আনন্দ এককালেই উপভোগ করেন।

“তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” (শ্বেতাশ্বতর উপ, ৩।৮, ৬।১৫)

সেই অজ্ঞানের পরপারে অবস্থিত জ্যোতিঃস্বরূপ পরমপুরুষকে জানিয়াই মৃত্যুকে (জন্মমৃত্যুকে) অতিক্রম করা যায়।

“যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ (১) সদা শুচিঃ।

স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে॥” (কঠ উপ, ৩.৮)

কিন্তু যিনি বাহ্যবিষয়ে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি নিবারণের সাধন স্বরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া নিগৃহীত মনোবিশিষ্ট অতএব সর্ব্বদা পবিত্র বা স্বচ্ছান্তঃকরণ হইয়াছেন, তিনিই সেই ব্রহ্মরূপ পদ প্রাপ্ত হয়েন যে ব্রহ্মপদ হইতে প্রচ্যুত হইয়া তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

---

(১) আনন্দাশ্রমের টীকাহীন দ্বিতীয় সংস্করণের “অমনস্কঃ” পাঠ ভ্রমাত্মক। সটীক সংস্করণের ‘সমনস্কঃ’ পাঠই সঙ্গত।

"য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি"

—(বৃহ উপ, ১৷৪৷১০)

যে কেহ এইরূপে বাহ্যৌৎসুক্যের নিবৃত্তি করিয়া আপনাকেই 'আমিই (সকল ধর্ম্মাতীত) ব্রহ্ম' এইরূপে অনুসন্ধান করেন, তিনি (বামদেবের ন্যায়) এই সমস্তই (অর্থাৎ মনু, সূর্য্য প্রভৃতি সকল বস্তুই) হয়েন।—এই প্রকার অসর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি বন্ধনের নিবৃত্তির প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য সমূহ এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত এই বিদেহমুক্তি জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই লব্ধ হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে। কেননা অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্মে আরোপিত এই সকল বন্ধন, বিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞান) বিনষ্ট হইলে পর তাহাদের পুনরুৎপত্তি সম্ভবে না, এবং তাহারা অনুভূতও হয় না। তত্ত্বজ্ঞানলাভের সহিত এককালেই যে বিদেহ মুক্তির লাভ ঘটিয়া থাকে একথা ভাষ্যকার (ভগবান্ শঙ্কর) সমন্বয় সূত্রের ভাষ্যে (ব্রহ্মসূত্র ১৷১৷৪ ভাষ্য দ্রষ্টব্য) (১) সবিস্তার বিচার করিয়াছেন। আরও সূত্র আছে—

"তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ"

(ব্রহ্মসূত্র ৪৷১৷১৩)

সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে পর ভাবী পাপের অলেপ এবং সঞ্চিত পাপের বিনাশ ঘটে। কেন না শ্রুতি সেই মর্ম্মেই উপদেশ করিয়াছেন।

(১) ৺কালীবর বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক অনূদিত বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে, ১৪১, ১৪২ ও ১৪৩ পৃষ্ঠায়।

স্বামী প্রেমানন্দের পত্র।

(১)

১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার,

২৪।৮।১৭।

পরমকল্যাণীয়াসু—

তোমার চিঠি ক'দিন হ'ল পেইছি। মাঝে সর্দ্দি হয়ে ক'দিন ভুগ্‌লাম, এখন ভাল আছি। শ্রীযুত হরি মহারাজ ও শ্রীশ্রীমহারাজ পুরীতে সুস্থ আছেন।

ক্রোধ, অভিমান এসব অবিদ্যার ঐশ্বর্য্য। ইহাদের সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করবার চেষ্টার নাম সাধন, ভজন, যোগ, বৈরাগ্য। যদি উহাদের প্রশ্রয় দাও তবে ত মহা অনর্থ ঘটাইবে। ক্রোধ চণ্ডাল। যখনই উদয় হবে অমনি ভগবানের কাছে কাঁদ্‌বে—প্রার্থনা কর্‌বে। তাঁর কৃপায় উহারা পালাবে। চণ্ডালের স্পর্শ কর্‌লে স্নান করাই কর্ত্তব্য; আর অভিমান প্রত্যক্ষ নরক। ঐ অভিমানই জগৎকে মোহে ডুবিয়ে রেখেছে। ইহাকে দূর করার নাম তপস্যা।

ভগবানে ভক্তি বিশ্বাসই মনুষ্যজীবনের সার। নতুবা এ সংসার মরুভূমিতুল্য। নিত্য অগ্রসর হও—ভক্তিশ্রদ্ধা লাভ করে জীবন ধন্য কর, ইহাই প্রভুর নিকট প্রার্থনা। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী—প্রেমানন্দ।

(৩)

কলিকাতা, ৫।১০।১৭।

কল্যাণবরেষু—

শ্রীমান্—, তুমি ও কি লিখেছ—'ন চ কৃষ্ণবৎ'? কিন্তু আমরা তাঁর কোটী রেণুর রেণু,—তস্য রেণু, তস্য রেণু! ছিঃ! অমন লিখ্‌তে নেই।

কোথায় সূর্য্য আর কোথায় জোনাকি পোকা! ছিঃ! আমার ঘৃণা করে। আমি যেন ভক্তের দাসানুদাস—তস্য দাস, তস্য দাস হয়ে থাক্‌তে পারি। তোমায় ঠাকুর কৃপা করে এসব বুঝিয়ে দিন।

ঐ সব কল্লে কি হয় জান ? একটা দল বাঁধে ও সঙ্কীর্ণতা আসে। গণ্ডীর মধ্যে পড়ে পচে মরে ! তোমরা কোথা সাগরের মাছ হবে না পাতকোতে পড়্‌তে চাও ? বড়ই আক্ষেপের বিষয় ! অনন্ত অসীম ব্যাপার। সাধুসঙ্গ কর, ঠাকুরের নাম কর, গণ্ডীর পার হও। সাবধান সাবধান—এগিয়ে পড়, এগিয়ে পড়। আমার দেহ কিছু সুস্থ হচ্ছে। * * *

শুভানুধ্যায়ী—প্রেমানন্দ।

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ১৬ই শ্রাবণ, ইংরাজী ১লা আগষ্ট, রবিবার, আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মহাপ্রয়াণের ত্রয়োদশ দিবসে, তাঁহার নিত্যলীলা-বিগ্রহের অর্চ্চনা উপলক্ষে বেলুড় মঠে ও বাগবাজার, ১নং মুখার্জ্জি লেনস্থ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বাটীতে বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ ও কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বহু ভক্ত ঐ দিবস ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। মঠে সর্ব্বসমেত আড়াই হাজার পুরুষ-ভক্ত ও দরিদ্র-নারায়ণ এবং বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বাটীতে ৬।৭ শত স্ত্রীভক্ত সমবেত হইয়া পূজাদি দর্শন ও প্রসাদগ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বাগবাজার সিষ্টার নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয়ে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশস্থ মঠ ও মিশনের অন্যান্য কেন্দ্রসমূহেও ঐ উপলক্ষে বিশেষ পূজার্চ্চনা ও প্রসাদবিতরণ হইয়াছিল।

ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়ে গত মে মাসে সর্ব্বসমেত ২৩০৫ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৭৮১ জন নূতন ও ১৫২৪ জন পুরাতন।

মিঃ এম, পি, এম, পিলাই কাইক্লাট হইতে উক্ত চিকিৎসালয়ে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন। তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দুর্ভিক্ষ-নিবারণ কার্য্য।

(পুরী)

গত মাসে আমরা সাধারণভাবে পুরীর দুর্ভিক্ষ-নিবারণ কার্য্যের সংবাদ পাঠকবর্গকে প্রদান করিয়াছি। কারণ, তখন সবেমাত্র কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় বিশেষ বিবরণ কিছুই আমাদের হস্তগত হয় নাই। সম্প্রতি বিশেষ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে ভুবনেশ্বর ও কানাস এই দুইটী কেন্দ্র হইতে কার্য্য চলিতেছে। বিগত ২৬শে জুন ভুবনেশ্বর কেন্দ্র খোলা হয় এবং এ পর্য্যন্ত ১৬টী গ্রাম উক্ত কেন্দ্রভুক্ত হইয়াছে। ২৬শে জুন হইতে ১৭ই জুলাই মধ্যে চারিবার চাউল বিতরণ করা হইয়াছে। ১ম সপ্তাহে (২৬শে জুন) ৩ খানি গ্রামের ২৩ জন লোককে ১/৬ সের চাউল, ২য় সপ্তাহে [illegible]খানি গ্রামের ২৫ জন লোককে ১০ সের, ৩য় সপ্তাহে ৪খানি গ্রামের ১২৬ জন লোককে ৬১ সের এবং ৪র্থ সপ্তাহে ১৬ খানি গ্রামের ৬৭৪ জন লোককে ৩৪৷৷৯ সের চাউল বিতরণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত ৩/ মণ চাউল মুষ্টি-ভিক্ষায় দেওয়া হইয়াছে।

কানাস কেন্দ্র ১৪ই জুলাই খোলা হয়। ঐ কেন্দ্র হইতে ১ম সপ্তাহে (১৪ই জুলাই) ২৭ খানি গ্রামে ২২৬ জন লোককে ১১১২ সের, ২য় সপ্তাহে ২৮ খানি গ্রামে ২৮২ জন লোককে ১৪/৪ সের চাউল বিতরণ করা হইয়াছে। ইহার উপর মুষ্টিভিক্ষা বাবদ প্রায় ১/ মণ চাউল প্রদত্ত হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষের অবস্থা অতি ভীষণ। আমরা সেবকগণের নিকট হইতে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে যে পত্র পাইয়াছি পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের কঙ্কালসার ছিন্নবস্ত্রাবৃত আকৃতি দেখিলে অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তিরও হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয়। আমরা যে যে গ্রাম পরিদর্শন করিতে গিয়াছি সেই সেই গ্রামেই অন্নবস্ত্রের অত্যন্ত অভাব

দেখিয়াছি। সদ্বংশজাত মধ্যবিত্ত ঘরের স্ত্রীলোকগণ বস্ত্রের অভাবে ঘরের বাহির হইতে সমর্থ হইতেছেন না, অনেক স্থলে চটের থলে পরিয়া কোনরূপে নামমাত্র লজ্জানিবারণ করিতেছেন। বহুস্থানে স্বামী স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। 'সেঁয়া' নামে এক প্রকার ঘাসের বীজ ও শাকপাতা সিদ্ধ করিয়া খাইয়া লোকেরা জীবনধারণ করিতেছে। ইহা আমরা নিজচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। আমাদের যে চাউল আছে তাহাতে বেশী দিন চলিবে না। আর অন্ততঃ ৪০০ জোড়া কাপড় জোগাড় করিয়া পাঠাইবেন। আরও কেন্দ্র খোলা প্রয়োজন—আরও সাহায্য চাই।"

পাঠকবর্গ উল্লিখিত বিবরণ পাঠে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের দুর্দ্দশার কথা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রাম ও লোকের সংখ্যা আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ধীরে ধীরে বাড়াইতে হইতেছে কিন্তু আবশ্যক মত অর্থবল নাই। এক্ষণে প্রতি সপ্তাহে ৬৫০৲ টাকার চাউল দরকার, শীঘ্রই ১০০০৲ টাকার চাউলের কমে কিছুতেই হইবে না। এই সেবাকার্য্য একমাত্র সহৃদয় দেশবাসীর সাহায্যের ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করিতেছে। যত শীঘ্র তাঁহারা সাহায্য প্রেরণ করিবেন ততই মঙ্গল, নতুবা সাহায্যাভাবে শত শত বুভুক্ষু-নারায়ণ অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

অর্থ ও বস্ত্র সাহায্য নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। (১) প্রেসিডেণ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, পোঃ বেলুড়, জেলা হাওড়া। (২) সেক্রেটারী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার কলিকাতা।

২২।৭।২০ (স্বাঃ) সারদানন্দ।

মাতৃদর্শনে।

(বিমলানন্দ নাথ)

সেটি আমার জীবনের নিত্যস্মরণীয় দিন। সে দিনের শোনা কথা আমার কর্ণরন্ধ্রে আজিও পর্য্যন্ত থাকিয়া থাকিয়া ঝঙ্কার তুলে, সে দিনের দৃশ্য-চিত্র আমার চিত্তের সমস্ত চঞ্চলতা উপেক্ষা করিয়াও এক একবার স্থির-সৌন্দর্য্যে ভাসিয়া তার অপরূপ নিজত্বের আভাস হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়, যে দিন মা! জীবনে প্রথম আপনার শ্রীচরণদর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল।

ইহার পূর্ব্বে কতবার মায়ের বাড়ী গিয়াছি। একটা উদ্দেশ্যহীন জীবনের চলাফেরার নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া ভুলে যেন মায়ের আবাস-মন্দিরের দ্বারদেশে আসিয়া বসিয়াছি। ভিক্ষার্থীর মত বসিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না—সুন্দর দেবমন্দিরদ্বারে দৃষ্টিহীনের যদৃচ্ছাচালিত আগমনের মত, বুঝি অন্তরস্থ আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায়, আত্মাভিমানের যষ্টিতে ভর দিয়াও, কোন্ শুভমুহূর্ত্তে ক্লান্তিবশে নিজের অজ্ঞাতসারেই বসিয়াছি।

বসিয়াছি, আবার দ্বারদেশ হইতেই ফিরিয়াছি, মাকে দেখি নাই। অগণ্য ভক্ত-নরনারী বাল, বৃদ্ধ যুবা, মাতৃচরণ দর্শনের প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষায় দলে দলে আমার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিয়াছে, শিবের ত্রিশূলে আঁকা সে পথের পার্শ্বে বসিয়া আমি তাদের চলাফেরা দেখিয়াছি। তৃপ্তির ভারে তাহাদের অবনমিত ভূমি-সম্বদ্ধ দৃষ্টি সংসারদৃশ্যের প্রতি অবহেলা দেখাইয়া, কতবার আমার চক্ষুকে মাতৃদর্শনের জন্য প্ররোচিত করিয়াছে, তবু আমি মাকে দেখি নাই।

পুত্র আপনার বিজ্ঞতাকে যত বড় মনে করে, মা তাহাকে ততই ছোট

দেখেন। সে অভিমানে ফুলিয়া যখন সমস্ত পৃথিবীকেও আপনার আয়ত্তের অনুপযোগী মনে করে, তখনও মা দেখেন ছেলে তাঁর কত শিশু। অভিমান-ভারে জীবের আত্মদেহের যে সঙ্কোচ আসে এটা বুঝিতে পারেন একমাত্র মা। এই সঙ্কোচ দেখিয়া তাঁহার করুণানয়নে অশ্রু ঝরে। সাধুর হৃদয় এ মরণের দেশে সেই অবিরাম-ক্ষরিত অশ্রুবিন্দু ধরিবার কমণ্ডলু। সেখানে পড়িয়া আপনার অবিরাম গতিশীলতার ক্লান্তি অপনোদনের জন্য বুঝি তার বিশ্রাম লইবার সাধ হয়। কিন্তু জীবের কি সৌভাগ্য, বিশ্রাম লইতে আসিয়াও সেখানে তার গতিপ্রিয়তার অবসান হয় না। জীবের কল্যাণে সাধুহৃদয়স্থ সেই অচঞ্চল অমৃতসাগরে এক একবার বিক্ষোভ উঠে। আমার সৌভাগ্য-বশে একদিন সহসা তাহাতে বিক্ষোভ উঠিল। সাধূপদিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীমাকে আমি দেখিতে চলিলাম।

কিন্তু কি দেখিব? মাকে কেমন দেখিব? যাঁর চরণপ্রান্তে জগদ্গুরু তাঁর অননুমেয় দ্বাদশবৎসরের সাধনফল উপহার দিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া-ছেন, কলুষিত দেহমন ও অভিমানবিড়ম্বিত বুদ্ধি লইয়া তাঁহাকে কি আমি দেখিবার অধিকারী? তবু আমাকে দেখিতেই হইবে, মহাত্মার ইচ্ছা আমার হাত ধরিয়া আমাকে মা দেখাইতে লইয়া চলিয়াছে। আমি বুঝি নাই কিন্তু সাধু বুঝিয়াছেন আমি মাতৃহারা, অথবা তাঁহার হৃদ্‌গত চিরন্তন করুণা আমার এ অবস্থা বুঝিয়াছে।

যথার্থ ই কি 'জগতের মা'কে দেখিতে চলিয়াছি? অন্তর বাহির কোনও দিক্ হইতে ইহার উত্তর আসিবার অবসর রহিল না। আমি মাকে দেখিলাম।

মাকে দেখিলাম আপাদমস্তক শুভ্রবসনাবৃতা—কেবল শ্রীচরণযুগল মেঝের উপর সন্তর্পণে বিন্যস্ত রহিয়াছে।

আবাল্য কল্পনা-সেবী আমি, কিন্তু কল্পনার কোন সূত্র দিয়াও ত মায়ের এ অপূর্ব্ব সংস্থান আমি ধরিতে পারি নাই! অবস্থানভেদে দেবতার মাহাত্ম্য সূচিত হয়, অবস্থানের বিশেষত্বে তাঁহারও বিশেষত্ব। পূর্ণ ঐশ্বর্য্যময়ী শ্রীদুর্গা দশভুজে দশপ্রহরণধারিণী, সিংহাসুরবাহনা। সংহারমূর্ত্তিময়ী তারা "শব-হৃদ্‌ঘোরাট্টহাসা পরা।" মায়ের স্নেহ কিন্তু সন্তান মৃদুমধুরহাস্যময়ী

জননীর দুই বাহুর বন্ধন মধ্যেই অনুভব করিয়া থাকে। অবশ্য সন্তান সেখানে শিশু।

কিন্তু এখানে আসিয়া এমনটি দেখিলাম, যাহা দেখিবামাত্র আমার সমস্ত কল্পনা আপনার ভিতরে আপনাকে লুকাইয়া এক মুহূর্তে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া বুঝি স্বপ্ন দেখিল, জগদম্বার অভয়চরণ তাঁর নবাগত পুত্র-অতিথিকে আবাহন করিতেছে। বিস্ময়পুলকে মায়ের শ্রীচরণে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিবার প্রথম প্রয়াসেই মায়ের কথা আমার কর্ণগোচর হইল—"এস, এস, এস!" দেহের সমস্ত রক্তবিন্দু বিপুল উল্লাসে কোলাহল করিয়া উঠিল। সত্যই তখন আমার মনে হইল, আমার পূর্ব্বের 'আমি' মাতৃ-মন্দিরের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। মায়ের অভয় পদে যে আজ মাথা লুটাইল, মায়ের পদরজস্পর্শে নূতন দেহ মন লইয়া সে আজ নূতন হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

"এস, এস, এস"—মায়ের একি আবাহন বাণী। আমি ত, মা, ইহার পূর্ব্বে একটি দিনের জন্যও তোমাকে দেখি নাই, তুমি কি আমাকে দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক, কবে দেখিয়াছ, মা? তুমি কি আমাকে দেখিতেছ? যদি তাই, কতদিন হইতে দেখিতেছ মা! আমার মত আরও অগণ্য, যাহারা পূর্ব্বে আমারই মত আপনাদের মাতৃহারা মনে করিয়া উদ্দেশ্যহীন জীবন লইয়া তোমার ওই অপূর্ব্ব অভয়বাণী-কর্ণিকাপূর্ণ শ্রীপাদ-পদ্মপ্রান্তে মাথা লুটাইয়াছে, তাহাদেরও কি তুমি এমনি মধু হইতেও সুমধুর আপ্যায়নে তৃপ্ত করিয়াছিলে? তাহাদেরও কি এমনি করিয়া দেখিয়াছ? তাই যদি, কতদিন পূর্ব্বে তাদের দেখিয়াছ মা। তাহারাও কি তোমার দেখা, তোমার শ্রীচরণে মস্তক অবনত করিবার পূর্ব্বে, আমারই মত জানিতে পারে নাই?

না জানি মায়ের মুখনিঃসৃত কত উপদেশ কথা শুনিব, কত সদসৎ-বিচার, কত আত্মানাত্মবিবেকের শাস্ত্রপ্রসঙ্গ—গুরুর নিকট হইতে শিষ্য যাহা নিত্য নিত্য পাইবার দাবী করে—ভাবিয়াছিলাম, মা সেইরূপ কত কথাই না আমাদের শুনাইয়া কৃতার্থ করিবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তার ত কিছুই হইল না! শুধু মায়ের দুখানি চরণ আর অবগুণ্ঠনাবৃত শ্রীমুখনিঃসৃত ওই তিনটি কথা "এস, এস, এস!" শ্রীচরণাঙ্গুলিতে কি আধ্যাত্মিক শক্তি

নিহিত রাখিয়াছ, মা, যে স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া গেল! "এস, এস, এস"—বেদের কোন্ ঋক্ ওই কয়টি কথার মধ্যে ভরিয়া রাখিয়াছ যে, শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা অমরস্পন্দনে কোন পূর্ব্বাস্তিত্ব-স্মৃতির পৃষ্ঠে নৃত্য করিয়া উঠিল!

"এস, এস, এস"—কতদিন এই কথার কথা ভাবিয়াছি, কত নীরব নিশীথে বসিয়া এ, ও, তা চিন্তা করিতে গিয়া শুনিতে পাইয়াছি, ওই অতি কোমল স্বর দিগ্বলয়-প্রান্ত হইতে আগত সপ্তস্বরার ঝঙ্কারের মত আকাশ-হৃদয়ে স্পন্দিত হইতেছে। সংসারদাব-দগ্ধ আমি কোথাও শান্তি না পাইয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বোঝা বহিতে নিজেকে অশক্ত বুঝিয়া এক একদিন যখন নৈরাশ্যের বালিশে মাথা দিয়া শুইয়াছি, তখনই ওই কোমল কথা আমার অন্তঃশ্রবণের সেবা করিতে আসিয়াছে—অমনি হৃদয় শীতল হইয়াছে, চিন্তা ঘুমাইয়াছে, মানবজীবনের এক রহস্যময় দ্বার আপনি আপনি উদ্‌ঘাটিত হইয়া ঐ মধুময়ীবাণী দেহের প্রতি রক্তবিন্দুতে এক আকুল পুলক মাখাইয়া দিয়াছে। "এস, এস, এস"—মনে হয় যেন কোন্ অনাদিকাল হইতে ওই আবাহনবাণী, আমার ও আমার সঙ্গে আমারই মত সংসার-ভোগ-লুব্ধ অসংখ্য-আমাদের অনুসরণ করিয়া আসিতেছে।

বয়াটে ছেলের মত বাপের সঙ্গে আপনাকে সমান ভাবিয়া তাঁহার নিকট হইতে নিজের হিস্যা পূর্ণমাত্রায় বুঝিয়া, হিসাবনিকাশ চুকাইয়া কোন্ অনাদিকাল হইতেই না আমরা আত্মাভিমানের পৃষ্ঠে চাপিয়া পিতৃ-পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছি! বিকার-রহিত নিম্মম পিতা সহাস্য-বদনে আমাদের বিদায় দিয়াছেন। কোথায় যাইতেছি জানিতে চাহেন নাই, কেন যাইতেছি জিজ্ঞাসা করেন নাই, অথবা আমরা জিজ্ঞাসা করিতে যেন অবসর দিই নাই।

মনে করিয়াছি, নিজের নিজের অধিকার পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়া আমরা পিতাকে নিঃস্ব করিয়াছি। বুঝি নাই, পূর্ণ হইতে পূর্ণ বাহির করিয়া লইলে আবার কেমন করিয়া পূর্ণ অবশিষ্ট থাকে। বুঝি নাই, ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্ম বাদ দিলে যিনি অবশিষ্ট থাকেন তিনি ব্রহ্মময়ী—বুঝি নাই, পূর্ণমমতা নির্ম্মমতার প্রতিরূপ, গুণাশ্রয়া গুণময়ী আদ্যাশক্তি নির্গুণ ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি।

সেই মা পূর্ণমাতৃত্ব, পূর্ণমমতায় জীবসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই আপনা হইতে আপনাকে প্রকাশ করিয়া সন্তানগণকে অভয় অঙ্কে ফিরাইবার জন্য তাহাদের পিতৃত্যাগে পূর্ণভাবেই যে ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাহাও ত বুঝিতে পারি নাই! প্রদীপ্ত অনল হইতে বিস্ফুলিঙ্গের বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গেই অনলশিখায় এই আবাহন বাণী—"এস, এস, এস" ধ্বনি—উঠিয়াছে।

প্রথমে শুনি নাই, বহির্গমনের পূর্ণব্যাকুলতায় সে অমৃতময়ী আবাহন বাণী শুনিয়াও শুনি নাই—মায়ের এই অন্যায় মমতায় বিরক্ত হইয়াই যেন আবাহন কথার প্রতিস্পন্দনে দূর হইতে আরও দূরে চলিয়া আসিয়াছি। তাহার পর শুনিতে পাই নাই। সংসারের ঘনাবর্ত্তমধ্যে ইন্দ্রিয়ের কোলাহল আর সে আদিকথা আমাদের শুনিতে দেয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে শুনিতে লাগিলাম, সেই আবর্ত্তমুখে পুঞ্জপুঞ্জ বিম্বরাশিতে প্রতিফলিত চিৎ-প্রতিবিম্ব মহামায়ার সেই জগৎপ্রান্তগামী আবেদনধ্বনি—নানা বর্ণসংযোগে কি এক মোহকর আবেশকর আহ্বান—পঞ্চীকৃত অধ্যাত্মগান "এস, এস, এস।" রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের মধ্য দিয়া তাহা আকর্ষণীমন্ত্রে এমন মুখর হইয়া উঠিল যে, আমরা আমাদের পূর্ব্বাস্তিত্ব একেবারে ভুলিয়া সেই আবর্ত্তে আত্মসমর্পিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। "এস, এস, এস"—স্বপ্নরাজ্যের পারে সুষুপ্তির দেশে জড়জগতের কাঠিন্য-প্রতিহত সেই আদিবাণী আমাদের জাগ্রৎচৈতন্যের অশ্রুত হইয়া রহিল।

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।"—স্বয়ম্ভু মন হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্ম্মুখী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কেমন করিয়া জীব তাহাদের সাহায্যে অন্তরের দিকে লক্ষ্য করিবে? এখন সে দেখিতে পায়, রূপ তাহার আঁখিকে প্রলুব্ধ করিতে নিরন্তর ইঙ্গিত করিতেছে—"এস, এস, এস"। ধ্বনি তার শ্রবণকে প্রমত্ত করিতে সুরের উপর সুর ঢালিয়া কেবলই শুনাইতেছে—"এস, এস, এস।" গন্ধ, স্পর্শ, রস সেই প্রকার মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ছলনার আকর্ষণে আমাদিগকে দেশ হইতে দেশান্তর, দিন হইতে দিনান্তর, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা—যুগের পৃষ্ঠে আসন পাতিয়া কোন্ স্বপ্নরাজ্য-সীমান্তের দিকে লইয়া চলিয়াছে। সেখানে লইয়াও ত তাহাদের আকর্ষণের নিবৃত্তি নাই,--আকর্ষণের উপর

আকর্ষণ, ভূপতনশীল বস্তুর গতির উপর গতি বাঁধিয়া আকর্ষণময়ী ধরিত্রীর মত কেবলই সে বলিতেছে—"এস, এস, এস"।

দিনের পর দিন চলিয়া গিয়াছে, কত বর্ষ, কত যুগ অতীতে ঢলিয়া পড়িয়াছে, কত মরুদেশ সাগরে ডুবিয়াছে, কত সাগরের জল শুকাইয়া মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, কত নদী পথ ভুলিয়াছে, কত গিরি গলিয়া নদীতে পরিণত হইয়াছে, মোহাকৃষ্ট সংসারাবদ্ধ তোমার সন্তান চলিতে চলিতে এমন একস্থানে উপস্থিত যে, আর একপদ অগ্রসর হইলেই অন্ধকার-সাগর তাহার সকল অস্তিত্বই গ্রাস করিয়া ফেলে!

ইহার মধ্যে সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে দুই একবার বুঝি তার চৈতন্য হইয়াছিল, মোহের ভিতর হইতেও এক একবার চপলাচমকের মত তার স্বরূপ তার চোখের উপর ফুটিয়া তাহাকে এক একবার ব্যাকুল করিয়াছিল! তাই আজ মরণের দ্বারে আসিয়া, আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া, 'কে আমার পরমাত্মীয় কোথায় আছ, আমাকে রক্ষা কর' বলিয়া যেমন সে কাতরকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়াছে, অমনি সে যেন শুনিল—"এস, এস, এস"। জগন্মাতার হৃদয় হইতে যেন নূতন ভাবে উদ্বেলিত বাৎসল্যের স্নেহভরা বাণী সহসা তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে ফিরিয়া চাহিল। সম্মুখে অগণ্য তরঙ্গ মৃত্যুর আলিঙ্গনের মত তাহাকে সাগরগর্ভে প্রবেশের আবাহন করিতেছে। দক্ষিণে বামে পশ্চাতে অনন্তকালবারিধি তাহার পিতৃসমীপে ফিরিবার সমস্ত আশা কুক্ষিগত করিয়া তাহার পিপাসার্ত্ত দৃষ্টির উপরে অন্ধকারের উপর অন্ধকার ঢালিয়া দিতেছে। মা! তোর সন্তান নিজে কেমন করিয়া তোর অভয়চরণপ্রান্তে ফিরিবে?

"এস, এস, এস"—সে যে শুনিয়াও শুনিতে পাইল না, স্বকর্ম্মরচিত ঘনান্ধকারের বেড়া ভাঙ্গিয়া তার ব্যাকুল অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি অন্ধকার ছাড়া আর যে কিছুই দেখিতে পাইল না! সংসারের সর্ব্বলালসার তৃপ্তিসাধন করিতে গিয়া লালসাকেই সে যে কেবল অগণ্যমুখে ক্ষুধার্ত্ত করিয়াছে! আর নিজে নিত্য নিত্য ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর—পরিণামে আত্মশক্তি হইতে একান্ত বিচ্যুত হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত মরণের পথেই চলিয়াছে। গহ্বরমুখী যানারোহী হতভাগ্যের মত নিজের চেষ্টায়

আর যে তার গতিরোধের উপায় নাই! "আমরা যে মরি, মা, আমরা যে মরি!"

"কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।" ধীর যাহারা তাহারা বুঝিল মরিলে ত চলিবে না, যে কোন উপায়ে বাঁচিতেই হইবে। বাঁচিতেই হইবে, কিন্তু যানের উপর দাঁড়াইয়া উন্মত্তের চীৎকারে চারিদিকে ছুটাছুটি করিলে ত যানের গতিরোধ হইবে না। গতিরোধ করিতে হইলে যে কোনও উপায়ে গতির কারণ এঞ্জিনে উপস্থিত হইতে হইবে, যে দিকে কল টিপিলে অধোগতি, তাহার বিপরীত দিকে না টিপিলে মৃত্যুর গ্রাস হইতে তাহাদের নিস্তার নাই। অমৃতত্বের অভিলাষে তাহারা 'আবৃত্তচক্ষুঃ' হইয়া ইন্দ্রিয়নিরোধে যত্নবান্ হইল।

কিন্তু মহামায়ে, তোমার এই মায়াধিষ্ঠিত জগতে তোমার ধীর ছেলে আছে ক'জন মা?

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।" সিদ্ধিলাভের জন্য হাজার হাজার লোকের ভিতর এক আধ জন যত্ন করে। কিন্তু হায়, এই অগণ্য যতির মধ্যে যাহারা তোমাকে তত্ত্বতঃ অবগত হয়, তাহারা আবার কয়জন? অঙ্গুলিপল্লবে তাহাদের গণনা করিতেই যে লজ্জা হয়। অবশিষ্ট—গণনায় যাহাদের সংখ্যা করিতে ওষ্ঠাধর অবসন্ন হয়—তোর সেই মৃত্যুভীত সন্তানগণ—সাধনহীন, ভজনহীন, মন্ত্রহীন, আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার চিন্তা পর্য্যন্ত করিতে অশক্ত—তাহাদের গতি কি হইবে মা?

মৃত্যুসমস্যাসমাধানে অসমর্থ হইয়া মরণভীত শশকের মত যেই মানব একবার আপনাতে আপনি লুকাইতে চক্ষু মুদিল, অমনি সে শুনিল—"এস, এস, এস!"

এবারে চোখ চাহিতে একি! "অপারে দুস্তরে অত্যন্তঘোরে বিপৎ-সাগরে মজ্জমান" দেহধারীদিগের নিস্তারনৌকার মত, অভয় শ্রীচরণ দু'টি সম্মুখে রাখিয়া মুখে অনন্ত আশ্বাসের বাণী পুরিয়া কে মা তুমি, কোন্ আলোকরাজ্যের অধীশ্বরী পঞ্চভূতে দেহ গড়িয়া পথহারা সর্ব্বস্বহারা সন্তানকে তার স্বগৃহে লইতে আসিয়াছ?

উত্তর অনন্তকাল ধরিয়া দিগ্‌দিগন্তে ধ্বনিত হইতেছে—

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥"

মূঢ় শুনিতে পায় না, শ্রদ্ধাহীন শুনিতে চায় না, সংশয়াত্মা শুনিয়াও শুনে না, তবু তুমি আসিতেছ—যুগে যুগে যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় দেখিয়া পরমপুরুষ নিজের মায়া অবলম্বনে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তুমিও অমনি তোমার মহাশক্তির বিকাশ লইয়া লীলার সাহায্য করিতে সঙ্গে সঙ্গে দেহধারণ করিয়াছ।

সাধুর কথায় বলি, "এক শক্তি কতবার গুপ্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে গুপ্তভাব প্রাপ্ত হইল, কে তাহা বলিতে পারে?"* চিরচৈতন্যময়ি! তোমার দেহধারণ সম্বন্ধেও আমরা ঠিক সেই কথাই বলিতে পারি। কে বলিতে পারে মা, তুমি কখন, কোথায়, কিরূপে, জগতের কি অবস্থায় আত্মপ্রকাশ কর? আমাদের এই ক্ষুদ্র আঁখি, কতটুকু তার দৃষ্টির পরিধি—সেকি তোমাকে ঠিক দেখিতে সমর্থ হইয়াছে? ওই কুসুমাদপি কোমল ছোট আবরণটির ভিতরে তুমি যে জগদ্ব্যাপী বিশ্বরূপ লুকাইয়া তোমার সন্তানদিগকে দেখা দিতে পার, মানবমন তার ক্ষীণতম ধারণা করিতেও যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

আপনার ভিতরে আপনার স্বরূপকে লুকাইয়া কতবারই না তুমি এইরূপ চিরবালিকার মূর্ত্তিতে আমাদের মধ্যে আসিয়াছ! সাধুর মুখে শুনিয়াছি, সদসৎবিচার বুদ্ধি দ্বারা, ধ্যানধারণাদি উপায়ে ব্রহ্মতত্ত্ব বরং নির্ণয় করিতে পারা যায়, কিন্তু অবতারতত্ত্ব নির্ণয় অতি দুরূহ। আবার অবতারতত্ত্ব নির্ণয়ও বরং জীবের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু যে মহাশক্তিকে আশ্রয় করিয়া অবতার পুরুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা সেই মহতো মহীয়সী ব্রহ্মময়ীকে তত্ত্বতঃ বুঝিতে পারা জীবের পক্ষে একান্তই অসম্ভব। ইচ্ছাময়ি! তোমারই ইচ্ছা তাহাকে এমন জটিলতাবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে যে, নিজেই তুমি আপনার স্বরূপ বুঝিতে সঙ্কুচিতা—বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে তোমার ভক্তিবিহ্বল সন্তানদের মুখের প্রতি চাহিয়া থাক, বুঝিতে পার না, ধন মান বিত্তার

* স্বামী সারদানন্দ লিখিত 'ভারতে শক্তিপূজা'

প্রচণ্ড অভিমান লইয়া সংসারে সর্ব্ববিষয়ে অনভিজ্ঞা এক বালিকার শ্রীচরণপ্রান্তে ব্যাকুলনেত্রে তাহারা কেন চাহিয়া থাকে!

হে বৈষ্ণবীশক্তি অনন্তবীর্য্যা বিশ্ববীজ পরমামায়া, এ 'কেন'র উত্তর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর' দিতে পারেন নাই, দেবতারাও পারেন নাই, মানুষে কেমন করিয়া পারিবে? তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে আপনার ভিতরে লুকাইয়াছ, কে তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে? তাহারা কেবল তোমার অদ্ভুত স্নেহের আকর্ষণে তোমার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে, অপূর্ব্ব মাতৃত্বে মুগ্ধ হইয়া ওই অভয়চরণতলে মাথা লুটাইয়াছে, অপূর্ব্ব করুণায় গলিয়া অশ্রুর অঞ্জলি দিয়া শ্রীপদ ধৌত করিয়াছে। জানিতে আসিয়া জানার কথা ভুলিয়াছে—অমৃতরসে হৃদয় পূর্ণ করিয়া এ অমৃতপ্রস্রবিণীর মূলের কথা বিস্মৃতিসাগরে জন্মের মত ডুবাইয়া চক্ষু মুদিয়াছে। ভক্ত কেবল জানিয়াছে তুমি তার মা, তার আপনার বলিতে যে যেখানে আছে সে সকলের মা। আপনার জন খুঁজিতে, তোমারই দেশ-কাল-পাত্র-জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে অপূর্ব্ব সন্তানবাৎসল্যের মধ্য দিয়া সে জগৎ দেখিতে শিখিয়াছে, আর শিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিয়াছে তার মা জগতের মা।

জগতের মা। কামগন্ধহীন দেহমন, নিশ্চিহ্ন দেহাত্মবুদ্ধি, পূর্ণ মাতৃত্বের এরূপ শ্রীমন্দির কেহ ত কখন দেখি নাই! সৃষ্টিকাল হইতে আজি পর্য্যন্ত কেহ কখন দেখিয়াছে বলিয়া ত শুনি নাই! হে বঙ্গ! এরূপ মাকে বক্ষে ধরিয়া তুমি ধন্য, আজ তুমি দেবকুলেরও চিরসেব্য-তীর্থ-মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছ।

জগদম্বে তুমি চিরকুমারী—বাপ মায়ের ঘরে আপনাকে আপনি লইয়া চিরানন্দময়ী বালিকা—দক্ষের ঘরে সতী, হিমালয়ের ঘরে গৌরী, অম্ভৃণ ঋষির ঘরে বাণী। কোনও স্থানে কোনও কালে তোমাকে আত্মপরিচয় দিতে হয় নাই। চিরদিন তোমার ভিতর হইতে তোমার স্বরূপ বাহির হইয়া বেদমুখে জগৎকে তোমার পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

অনিমন্ত্রিত হইয়াও পিতৃগৃহ দক্ষালয়ে যজ্ঞদর্শনে যাইবার জন্য যখন তুমি ব্যাকুল হইয়াছিলে, শিবের বারংবার বাধায় তোমার বিদ্যাশক্তি অকস্মাৎ তোমার ভিতর হইতে বাহির হইয়া পরমদেবকে তোমার স্বরূপ বিদিত

করিয়াছিল। সুকান্তকোমল দেহাবরণের ভিতর হইতে অপূর্ব্ব রূপ-শক্তির বিকাশ লইয়া দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব—দেখিয়া মহেশ্বর পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

শুম্ভনিশুম্ভের উৎপীড়নে হৃতরাজ্য দেবগণ গিরিরাজের পাদমূলে সমবেত হইয়া যখন সমস্বরে অপরাজিতা বিষ্ণুমায়ার পূজায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, পার্ব্বতি! বালিকামূর্ত্তিতে সে সময় গঙ্গাস্নান করিতে তুমি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলে। জগদম্বার অনন্তরূপনাক্ষ্যা দেবমুখনিঃসৃত, মুখরিত-দিগন্ত সে অপূর্ব্ব স্তব শুনিয়া বিস্মিতনেত্রে তাহাদের পানে চাহিয়া তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—"তোমরা কাহার স্তব করিতেছ?"

ক্ষুদ্র বালিকার প্রশ্নে দেবসঙ্ঘ নীরব হইয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ। কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে? এ জগতে এক তুমি ভিন্ন আর কে আছে যে তোমার স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ? তোমার অনন্তরূপের যতটুকু যে আভাস পাইয়াছে, তাই তাহার বোধের সীমা। তবে কেমন করিয়া দেবতারা বলিবে, যিনি ব্যাপ্তিরূপে, চিতিরূপে, বুদ্ধিরূপে, শ্রদ্ধা, দয়া, মাতৃরূপে, এমন কি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ভ্রান্তিরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন —সে অনন্তরূপের মীমাংসায় দেবতারা কেমন করিয়া বলিবে স্বরূপতঃ তিনি কে?

দেবতারা উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু উত্তরের ব্যাকুল প্রতীক্ষায় জগদম্বার স্বরূপস্মরণে তোমারই মুখের পানে চাহিল। মা! তুমিও বুঝি উত্তরের প্রতীক্ষায় বিনম্রমুখে জাহ্নবীজলে প্রতিবিম্বিত তোমার সে শিব-বাঞ্ছিত শ্রীমূর্ত্তির পানে চাহিয়াছিলে! অমনি কাঞ্চনগৌরাবরণ হইতে তোমার স্বরূপ ইন্দ্রনীলরূপে বাহির হইয়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়ে! তুমিই তোমাকে শুনাইয়া দিলে—"শুম্ভকর্ত্তৃক নিরাকৃত, নিশুম্ভকর্ত্তৃক পরাজিত এই দেবসঙ্ঘ আমারই স্তব করিতেছে।"

শত আবরণের ভিতরে শ্রীমূর্ত্তি রচিয়া যতই তুমি আপনাকে গোপন করিবার চেষ্টা কর না কেন, মহামায়ে! তোমার অভয়শ্রীচরণের অঙ্গুলি-সঙ্কেতের মধ্য দিয়া নিত্য সেই বেদবাণী তোমার আশ্রিত সন্তানদের কর্ণে নিনাদিত হইতেছে—

"অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মাং দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্॥
*　　*　　*
যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥"*

মায়াবাদ ও জগৎ।

(পথিক)

বিজন বনপথের ভীত, শ্রান্ত, নিভৃত পথিক যেমন করিয়া অদূরে শান্তিসমাকুল লোকালয়প্রাপ্তির আশায় নিজ উপস্থিত ত্রাস ও অবসাদের ভিতরেও একটা সান্ত্বনার সন্ধান পাইয়া ত্রস্তপদে পথ অতিক্রম করিতে থাকে, রোগ, শোক, মৃত্যু ও দুর্দ্দশার প্রবল বাত্যাপীড়িত সংসারকান্তারের অসহায় পান্থও তেমনি করিয়া একটা স্বায়া পূর্ণ সুখের কল্পনা করতঃ দৃষ্টদোষবহুল, ত্রিতাপজর্জ্জরিত তাহার বর্ত্তমান জীবনসমস্যার একটা সমাধান করিয়া লইতে উৎসুক হয়। শীর্ণকায়

* "আমি রাষ্ট্রী (সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী), আমি উপাসকদিগের ধনাদি বাঞ্ছিতদাত্রী, এবং আমিই চিকিতুষী (নিয়ত সর্ব্বদর্শিনী); সুতরাং উপাস্যদিগের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠা। আমি সর্ব্বরূপে সর্ব্বশরীরে বিরাজিত রহিয়াছি, আমিই সমস্ত বস্তুর সত্তা বা জীবনরূপে অধিষ্ঠিত। এই অনন্তজগৎব্যাপী অমরবৃন্দ যেখানে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তদ্দ্বারা আমারই উপাসনা করা হয়। * * * আমি ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মত্ব-বিষ্ণুত্বও প্রদান করিতে পারি, মহাযোগী করিয়া দিতে পারি এবং তত্ত্বজ্ঞানীও করিয়া দিতে সমর্থ হই।"

রোগশয্যাশায়ী আতুরের আশা—তাহার ব্যাধি চিরকাল থাকিবে না, একদিন সে ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবেই; দরিদ্র বুভুক্ষিত আর্ত্তের ভরসা—একদিন সে সুদিনের মুখ দেখিবে, তখন সে উদর পূর্ণ করিয়া ভোজন করিতে পারিবে; দৈন্যদশাগ্রস্ত অভিজাতের বিশ্বাস—একদিন বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিবেনই, তখন সে দশের সঙ্গে সমান হইয়া চলিতে পারিবে। শুধু বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন নরজগতের সম্বন্ধেই যে একথা সাজে তাহা নহে, ইতর প্রাণীজগতেও Instinct বা সহজাত-জ্ঞানের অন্তরালে এই সত্যই প্রকাশিত রহিয়াছে। দুঃখ-প্রতিকারের চেষ্টাই চেতনের লক্ষণ, কিন্তু দুঃখকে অস্থায়ী বলিয়া যদি জ্ঞান না থাকে তবে তাহার প্রতিকারের চেষ্টাও যে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় তাহা স্বতঃসিদ্ধ। আবার অন্ধকারকে বুঝিতে হইলে যেরূপ আলোকের জ্ঞান থাকা আবশ্যক, সেইরূপ একটা স্থায়ী সত্তার সহিত তুলনায়ই যে অস্থায়িত্বের জ্ঞান হওয়া সম্ভব ইহা মনোবিজ্ঞানসম্মত সত্য। আমরা দুঃখকে দূরে সরাইয়া দিয়া পাইতে চাই সুখ—নিরবচ্ছিন্ন অনন্ত অপার আনন্দ, ক্ষুদ্রতার সীমা ভগ্ন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাই পূর্ণতাকে। শিল্প, বিজ্ঞান, নীতি, দর্শন প্রভৃতি মানবের যাবতীয় চেষ্টার মূলেই নিহিত রহিয়াছে সেই এক সত্য—পূর্ণতার অনুসন্ধান। বস্তুর অস্তিত্বের জ্ঞান থাকিলে তবেই তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি জন্মে, কিন্তু এই পূর্ণতার জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে একদিন না একদিন পূর্ণতার বিকাশ মানবজীবনে হইবে তবে ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে সেই পূর্ণতা প্রথম হইতেই তথায় বিদ্যমান ছিল; কারণ, অসৎ হইতে যে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না ইহা দর্শন ও বিজ্ঞান-সম্মত সত্য। আর মানুষ নিজকে পূর্ণ, স্বাধীন বা মুক্ত মনে না করিয়া এক মুহূর্ত্তও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, কথা কহিতে পারে না কিম্বা শ্বাস প্রশ্বাসও ফেলিতে পারে না। সুতরাং পূর্ণতা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে—বাহির হইতে উহা আসিবে না। আমাদের প্রত্যেক চেষ্টা, প্রত্যেক কার্য্যের ভিতর দিয়া যেন সেই পূর্ণতাই আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতেছে। আবার ইহাও যুক্তিসিদ্ধ যে, যাহা পূর্ণ তাহা এক,

অদ্বিতীয়, অবিনশ্বর, সর্ব্বব্যাপী, অজ, নিত্য, শাশ্বত চিৎসত্তা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। সেই পূর্ণতাই আমাদের স্বরূপ—তাহাকে অভিব্যক্ত করার চেষ্টাই জীবন।

কিন্তু সুগভীর দার্শনিক গবেষণাকে একটু বিশ্রাম দিয়া এই জগৎটাতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সদাসর্ব্বদা যাহা ঘটিতেছে সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কি দেখিতে পাই?—সেই স্বতঃসিদ্ধ পূর্ণতা ও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের মাঝখানে যেন একটা পর্ব্বতপ্রমাণ দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর বিদ্যমান রহিয়াছে। মানুষ চায়—জগতের যাবতীয় রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে, তাহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে কে যেন অব্যক্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলিয়া দিতেছে—"সকল রহস্যের দ্বার আমার নিকট উন্মুক্ত," কিন্তু তাহার সীমাবদ্ধ মনবুদ্ধি তাহাকে নিজের গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যাইতে না পারিয়া যেন গিরিগাত্রে প্রতিহত পাষাণখণ্ডের ন্যায় ফিরিয়া আসিতেছে, প্রকৃতির বজ্রকঠোর নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া সে যেন পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দ্দূলের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। মানুষ সুকোমল কল্পনার নিপুণ তুলিকায় জীবন-ফলকে কতই না নিখুঁত নিরবদ্য সুখের ছবি আঁকিয়া লইতেছে, তাহার হৃদয়ের নিভৃত কোণে বসিয়া কে যেন কাণে কাণে বলিতেছে—"সুখ, সে তো আমার চিরন্তন অধিকার," কিন্তু কঠোর বাস্তবের ভীষণ সংঘর্ষে আসিয়া তাহার সাধের সজ্জিত কল্পনার রাজ্য ভীষণ মরুভূমিতে পরিণত হইয়া যাইতেছে—প্রকৃতি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর স্বরে বলিতেছে, "আমি যতটুকু মঞ্জুর করি ততটুকুই তোমার।" সকলেই জানে—রূপযৌবন, ধনজন, সহায়সম্পদ্ সকলকেই গ্রাস করিবার জন্য অনিবার্য্য কাল লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, তথাপি মানুষ প্রাণপণ শক্তিতে উহাদিগকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। মানুষের অন্তরের অন্তরে এক অস্ফুট শব্দ ধ্বনিত হইতেছে—"আমি অমর," কিন্তু মৃত্যু সজোরে কেশ আকর্ষণপূর্ব্বক কঠোর স্বরে বলিতেছে—"তুমি আমার দাস।" মোট কথা, এই জগৎটা যেন পরস্পরবিরোধী দুইটি ভাবের একটা অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ, পূর্ণতা ও অপূর্ণতার একটা অনির্ব্বচনীয় সমাবেশ, সত্য ও

মিথ্যার একটা অসম্ভব সংযোগ। পূর্ণতাকে ছাড়িয়া জীবনটা দাঁড়াইতেই পারে না, আর জগতের সাধারণ দৈনন্দিন জীবন—সেটা তো একটা প্রকাণ্ড অপূর্ণতা! ইহাই মায়া। মায়াটা একটা কিম্ভুতকিমাকার পদার্থ বিশেষ নহে, জগতে যাহা প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে তাহাই মায়া। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন :—"Maya is a statement of the facts of the universe, of how it is going on. People generally get frightened when these things are told to them. But bold we must be. Hiding facts is not the way to find a remedy". *

"Jnana yoga."

যাহা সদাসর্ব্বদা ঘটিতেছে—স্বচক্ষে দেখিতেছি, তাহাকে অস্বীকার করিব কেমন করিয়া? সুতরাং মায়াকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে।

'অধ্যাস' বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইয়া আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন :— সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য † নৈসর্গিকোহয়ম্ লোকব্যবহারঃ।" (শারীরক ভাষ্য—উপোদ্‌ঘাত প্রকরণ)

আত্মা দেহ নহেন ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য কথা; তথাপি পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত দেহেন্দ্রিয়সংঘাতকে "আমি" বলিয়া থাকেন, পুত্রকলত্রাদি আমা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তথাপি উহাদের সুখদুঃখে আমি নিজকে সুখী দুঃখী মনে করিয়া থাকি, ইহাই সাধারণ লোকব্যবহার,' ইহাকেই আচার্য্য 'মায়া' আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন।

এই মায়াকে বুঝিতে অগ্রসর হইয়া অনেকেরই, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালী দ্বারা গঠিত মনে এক বিষম ভ্রম উপস্থিত হয়। তাঁহারা মনে করেন, যেমন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের দ্বারা আম্রের ভূপতন ব্যাপার ব্যাখ্যা

---

* এই সংসারগতির যথাযথ বর্ণনার নামই মায়া। সাধারণতঃ লোকে একথা শ্রবণ করিলে ভীত হয়। আমাদিগকে সাহসী হইতে হইবে। অবস্থার বিষয় গোপন করিলে রোগপ্রতিকার হইবে না।

† এই যে সাধারণ লোকব্যবহার বা ব্যবহারিক জগৎ ইহা সত্য ও অসত্যের মিশ্রণ হইতে উদ্ভূত।

করা যায়, সেইরূপ মায়া একটি Theory বা তত্ত্ববিশেষ যদ্দ্বারা জগৎ ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা নহে, জগতে অহরহঃ যাহা ঘটিতেছে 'মায়া' তাহারই উক্তি মাত্র—ব্যাখ্যা নহে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন:—"Thus we find that Maya is not a Theory for the explanation of the world; it is simply a statement of the facts as the they exist *Jnana yoga.*

স্বামিজীর এই উক্তির সহিত আচার্য্য শঙ্করের বেদান্ত-ভাষ্য তুলনায় পাঠ করিলে পরস্পরের ভিতর কোনই বিরোধ দৃষ্ট হয় না, বরং ইহাই যে আচার্য্যেরও অভিমত তাহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আমরা এ বিষয়ের বহু প্রমাণ শারীরক ভাষ্য, উপনিষদ্ ভাষ্য ও আচার্য্য প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু জটিল দার্শনিক বিচারের অবতারণায় প্রবন্ধটিকে অযথা দীর্ঘ ও দুরূহ করা আমাদের অভিপ্রেত নহে বলিয়া, সে চেষ্টা হইতে বিরত হইলাম। যাহা হউক, মায়াবাদকে এই অর্থে গ্রহণ করিলে অদ্বৈতবাদের মূল কথা কি দাঁড়ায় তাহাই এক্ষণে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্।

বৈদান্তিক বলিতেছেন:—"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থ-কোটিভিঃ। ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥" অর্থাৎ ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে "ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা" এই বাক্যের 'সত্য' ও 'মিথ্যা'—এই কথা দুইটির যথার্থ তাৎপর্য্য কি তাহাই প্রথমে নিশ্চয় করিতে হইবে। প্রথমতঃ দেখা যাক্ এই 'সত্য' কথাটির যথার্থ তাৎপর্য্য কি। আমরা প্রথমে একটি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া, তাহাতে কি অর্থে এই শব্দদুইটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বৃহদারণ্যকে (২।১।২০) আছে:—"স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেৎ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ

---

* অতএব আমরা দেখিতেছি, মায়া সংসাররহস্যের ব্যাখ্যার নিমিত্ত মতবাদ বিশেষ নহে। সংসারের ঘটনা যে ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা তাহারই বর্ণনা মাত্র।

সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি তস্য উপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্ ।” *

উদ্ধৃত মন্ত্রটিতে দেখা যাইতেছে, প্রাণকে বলা হইয়াছে 'সত্যং' আর আত্মাকে বলা হইয়াছে 'সত্যস্য সত্যং'। পরবর্ত্তী দুইটি ব্রাহ্মণে "প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যং" এই মন্ত্রাংশ ব্যাখ্যাচ্ছলে শ্রুতি নিজেই দেখাইতেছেন যে, প্রাণেই সমস্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বলিয়া প্রাণকে বলা হইয়াছে 'সত্যং'; আবার প্রাণেরও প্রতিষ্ঠা হইতেছেন আত্মা, কাজেই আত্মাকে বলা হইয়াছে 'সত্যস্য সত্যং'। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে যাহা সকলের প্রতিষ্ঠা এবং যাহার অস্তিত্বের জন্য অপর কোনও প্রতিষ্ঠার আবশ্যক নাই, অর্থাৎ যাহা স্বপ্রতিষ্ঠ তাহাকেই 'সত্য' আখ্যায় আখ্যায়িত করাই শ্রুতির অভিপ্রায়। এই জন্যই শ্রুতি প্রথমতঃ সকল চরাচর ভূতের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ প্রাণকে 'সত্য' কথা দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া তাহার সত্যতাকেও আপেক্ষিক প্রমাণ করতঃ আত্মাকে 'সত্যস্য সত্যং' বা একমাত্র নিরপেক্ষ সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। অর্থাৎ জগতের যাবতীয় পদার্থই ভূত সমূহের পঞ্চীকরণ দ্বারা উৎপন্ন, সুতরাং উহাদের মূল হইতেছে ভূত সমূহ, আবার ভূত সমূহের মূলে রহিয়াছে আকাশ (ether), আকাশের মূল প্রাণ (universal energy), প্রাণ আবার আত্মায় প্রতিষ্ঠিত, আত্মা অপর কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত নহেন—তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ সুতরাং আত্মাকে অপর কোনও মৌলিকতর পদার্থে পর্য্যাবসিত করা যাইতে পারে না বলিয়া

* "প্রসিদ্ধ ঊর্ণনাভি (মাকড়শা) যেমন স্বশরীরোৎপন্ন সূত্র দ্বারা ঊর্দ্ধে যায়, এবং অগ্নি হইতে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গসমূহ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, ঠিক তদ্রূপ এই আত্মা হইতে (বিজ্ঞানময় আত্মা জাগরিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে আত্মা স্বস্বরূপে অবস্থান করে, সেই আত্মা হইতে) সমস্ত প্রাণ (শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গ), সমস্ত লোক (ভোগস্থান স্বর্গাদি), সমস্ত দেবতা (ইন্দ্রিয় ও ভোগস্থানের অধিপতিগণ) এবং সমস্ত ভূত (প্রাণিগণ নানাকারে—দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদিরূপে) উত্থিত হয়, সেই আত্মার রহস্যের নাম হইতেছে—সত্যের সত্য। প্রাণসমূহ সত্য, এই আত্মা সে সমুদায়েরও সত্য অর্থাৎ সত্যতাসম্পাদক।"

তিনিই একমাত্র নিরপেক্ষ সত্তা। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার উপনিষদ্ ভাষ্যে অন্যত্র সত্য ও অনৃত বা মিথ্যা এই কথা দুইটি নিম্নলিখিত রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"সত্যমিতি যদ্রূপেন যৎ নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি। যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং তদ্রূপং ব্যভিচরদনৃতমিত্যুচ্যতে।" * (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—২।১ ভাষ্য।)

সুতরাং 'ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা' এই সিদ্ধান্ত বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য এই দাঁড়াইতেছে যে, একমাত্র ব্রহ্মই অব্যভিচারী ও অপর-নিরপেক্ষ সত্তা, জগতের সত্তা ব্যভিচারী ও আপেক্ষিক। আর স্থূল দৃষ্টিতে বরফকে জল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু বলিয়া বোধ হইলেও বিশ্লেষণপটু বিচক্ষণ ব্যক্তি যেমন তাহাকে জল বলিয়াই বোধ করেন, সেইরূপ স্থূলদর্শীর নিকট জীবজগৎ ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইলেও সূক্ষ্মদর্শী ধীরের নিকট উহা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে—ইহাই "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" এই বাক্যের তাৎপর্য্য।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, যদি জীব ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে তবে জগতে এত বৈষম্য, এত সুখ দুঃখ, এত অভাব অভিযোগ রহিয়াছে কেন? তদুত্তরে বেদান্ত বলিতেছেন—এই যে বৈষম্য, এই যে নিত্য-মুক্ত হইয়াও বদ্ধের মত ব্যবহার, এই যে সত্য ও মিথ্যার অসম্ভব সংযোগ, এই 'নৈসর্গিক লোকব্যবহার'ই মায়া। উহা কোথা হইতে, কবে বা কেন আসিল সে বিষয়ে প্রশ্নই নিরর্থক; কারণ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি জগতে যাহা নিরন্তর ঘটিতেছে 'মায়া' তাহারই উক্তি মাত্র—Statement of the facts, as they exist. এ বিষয়ে যাহাই বলা হউক না কেন ঘটনা যাহা তাহাই থাকিবে, সুতরাং এ বিষয়ের মীমাংসার দ্বারা মানুষের কোনই পুরুষার্থ সাধিত হয় না বলিয়া তাহা নিরর্থক অতএব ত্যাজ্য।

---

* যাহা যেরূপ বলিয়া নিশ্চিত তাহার সেই রূপ যদি অব্যভিচারী অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয় হয় তবে তাহা সত্য। আর যাহা যেরূপ বলিয়া নিশ্চিত তাহার সেই রূপের যদি ব্যভিচার হয় তবে তাহা অনৃত বা মিথ্যা।

'সুত্তপিটকের' অন্তর্গত 'মজ্‌ঝিমনিকায়' নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, একদা 'মালঙ্ক্যপুত্ত' নামক কোনও ভিক্ষুর মনে জগৎ নিত্য কি অনিত্য, সত্য কি মিথ্যা ইত্যাদি নানা সংশয় উপস্থিত হইলে তিনি বুদ্ধদেবকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করেন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে যে উত্তর প্রদান করেন তাহার সার মর্ম্ম এই—"যদি কাহারও শরীরে বিষাক্ত শর বিদ্ধ হয় তখন তাহার পক্ষে সে শর কোথা হইতে আসিল, কেন আসিল, উহা আসিতে পারে কি না, কি কি উপাদানে উহা নির্ম্মিত ইত্যাদি বিতর্ক যেমন নিরর্থক এবং ঐরূপ বিচারে প্রবৃত্ত আহতের মৃত্যু যেরূপ অবশ্যম্ভাবী সেইরূপ তোমার প্রশ্নও সম্পূর্ণ নিরর্থক; কারণ, ঐরূপ প্রশ্নে তোমার কিছুমাত্র উপকার হইবে না এবং জগতের সুখদুঃখ জন্মমৃত্যুও যেমন আছে তেমনি থাকিবে। যাহা রহিয়াছে তাহা থাকিবে, তোমাকে যাইতে হইবে তাহার বাহিরে।"

এই সুখ দুঃখ ব্যাপারটাই মায়া। উহার ব্যাখ্যা হইয়া গেলে উহা আর থাকে না, যেমন ভেল্কীবাজীর তত্ত্বনিরূপণে আর ভেল্কী লাগে না। যতক্ষণ আছে ততক্ষণই মায়া। সমগ্র বেদান্তশাস্ত্র বলিয়া দিতেছেন এই মায়ার বাহিরে যাইবার উপায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন—"These are facts, but there is no explanation, but the Vedanta shows the way out" * *Jnana yoga.*

বেদান্ত শাস্ত্র এই জগৎটাকে মিথ্যা বলিয়াছেন—বন্ধ্যাপুত্র, আকাশ-কুসুম বা অশ্বডিম্ব, বলিয়া নহে; কি অর্থে বলিয়াছেন তাহাও আমরা দেখাইয়াছি—"যদ্রূপেন যন্নিশ্চিতং তদ্রূপং ব্যভিচরদনৃতমিত্যুচ্যতে।" জগৎটাকে বাল্যে যেমন দেখিতাম, যৌবনে তদপেক্ষা ভিন্ন দেখিয়াছি, আবার বার্দ্ধক্যে দেখিতেছি তাহারও বিপরীত। কাল যেখানে আনন্দের অট্টহাস্য দেখিয়াছি, আজ শুনিতেছি সেখানে শোকের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ। জগৎ ব্রহ্মের তুলনায় ঐরূপ ব্যভিচারী বলিয়া বেদান্ত বলিতেছেন "জগৎ মিথ্যা"। কথাটা শুনিতেছি, একটু একটু না বুঝিতেছি এমনও

* ইহাই ঘটিতেছে দেখিতেছি, কিন্তু ইহার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বেদান্ত ইহার গণ্ডীর বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দেয়।

নহে; অন্ততঃ দুঃখের সময়, স্বজনবিয়োগের সময় অথবা ব্যর্থতার সময়ও একটু না একটু সকলেই বুঝিয়াছি—অথচ কথাটার বিরুদ্ধে সহস্র প্রকার যুক্তি উত্থাপন করিতেছি, কথাটাকে মিথ্যা দুঃখবাদ (pessimism) বলিয়া উড়াইয়া দিতে কতই না ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছি; মন যেন কিছুতেই উহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে, উহা ভাবিতেই সে শিহরিয়া উঠিতেছে। কিন্তু যতই যাহা বলি বা করি না কেন, মনের চোথ-ঠারায় অন্তরাত্মার চৈতন্য লোপ হইয়াছে কি? বুকে হাত দিয়া কে কবে যথার্থ দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিয়াছি—"জগৎটা সত্য"। এই যে বিপরীত ব্যবহার ইহাই মায়া, এই ব্যবহারটাই জগৎ।

এখানে আপত্তি এই হইতে পারে যে, যাহারা লীলাকে স্বীকার করিয়া জগৎটাকে লীলাময় ভগবানেরই লীলা বলিয়া মনে করেন তাঁহারা তো জগৎটাকে মিথ্যা বলেন না—তাঁহারা বলেন, তিনিই জগৎ—যা কিছু সব তাঁরই, তিনিই।

খাঁটি সত্য কথা—সবই তাঁর, সব তিনিই! কিন্তু জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অনুসন্ধান কর, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস ও কিম্বদন্তী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখ, এই খাঁটি সত্য কথা যথার্থ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া কায়মনোবাক্যে তাহা পালন করিয়া গিয়াছেন জগতের মুকুটমণিস্বরূপ এইরূপ মহাত্মা কয়টি পাইবে? কোটিতে একটি মিলিবে কি না সন্দেহ। আর অবশিষ্ট আমরা করিতেছি কি? জগতের বাহিরটা লইয়াই আমরা ব্যস্ত। 'অহংমমে'র গণ্ডী কাটিয়া জগতের প্রভুকে দূরে কোন্ দূরে সরাইয়া দিয়া আমরা নিজেরাই কর্ত্তা, ভর্ত্তা, সমাজসংস্কারক, দেশহিতৈষী কত কি সাজিয়া বসিয়া আছি। যথার্থ অকপট চিত্তে বল দেখি, আমরা কে কোন্ কাজটি ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া, তাঁহাকেই অন্তর্য্যামীরূপে হৃদয়ের ভিতরে-বাহিরে নিরন্তর অনুভব করিয়া সম্পাদন করিতেছি? 'জগৎ তাঁরই লীলা অতএব তিনিই'—একথায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না, ইহা ধ্রুব সত্য কথা। তাঁর ইঙ্গিত ব্যতীত একটি তৃণও সঞ্চালিত হইতে পারে না। কিন্তু আমরা তাঁহারই শক্তি দ্বারা সর্ব্বথা নিয়ন্ত্রিত হইয়াও মিথ্যা অভিমানে

মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া নিজেরাই কর্ত্তা সাজিয়া বসিয়া আছি ;—এই যে আমাদের মিথ্যাব্যবহার বেদান্ত শাস্ত্র ইহাকেই 'মায়া' বলিয়াছেন—ইহাই জগৎ।

এই মিথ্যাব্যবহারের অতিরিক্ত জগৎ বলিয়া কোনও পদার্থ নাই—"ন হ্যস্ত্যবিদ্যা মনসোঽতিরিক্তা মনোহ্যবিদ্যা ভববন্ধহেতুঃ।" জগৎ, অবিদ্যা বা মায়া মনেতেই অবস্থিত, মনই এই মিথ্যা লোকব্যবহারের এক মাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা, এই মিথ্যাব্যবহারের নিবৃত্তিতে জগৎ বলিয়া কিছুই থাকে না। "যত্র নাস্তি মহামায়া তত্র ভাতি ন কিঞ্চন"—যাহা থাকে তাহা ভূমা বা যথার্থ লীলাময় পরমেশ্বর। মনের এই মিথ্যাব্যবহারের মূলে রহিয়াছে বাসনা ও অহঙ্কার। বাসনাই জগৎ সৃষ্টি করিতেছে—'আমি' 'আমার'ই জগৎ বা মায়া, 'তিনি' বা 'তাঁর'ই মোক্ষ বা ভূমা। জগতে নামরূপ যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে সবই 'আমি' 'আমার'কে অগ্রে লইয়া মনই সৃষ্টি করিতেছে। নামরূপই জগৎ, তাহা লোকব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা এক পল্লীগ্রামবাসী বৃদ্ধকে জানিতাম, তিনি "বঙ্গবাসী" পড়িতে ভালবাসিতেন। বৃদ্ধ বুঝিয়া লইয়াছিলেন, 'বঙ্গবাসী' অর্থ খবরের কাগজ। তিনি যার হাতে যে কাগজ দেখিতেন অমনি জিজ্ঞাসা করিতেন—ওখানা কবেকার 'বঙ্গবাসী'? আমরা যদি বলিতাম, 'বঙ্গবাসী' নয় 'নায়ক', তিনি বলিতেন—ওঃ, ছোট 'বঙ্গবাসী'। ইংরেজী কাগজ হইলে বলিতেন, ইংরেজী 'বঙ্গবাসী'। আমরা যদি তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম তবে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "ওসব তোমরা বোঝগে, আমি বুঝি— সবগুলোতেই খবর থাকে তো সবই 'বঙ্গবাসী', কোনটা ইংরেজী, কোনটা বাঙ্গালা, কোনটা ছোট, কোনটা বড়, বাস্।" বৃদ্ধের সাদা মন অত নামরূপ কল্পনা করিতে নারাজ, তাই তিনি বঙ্গবাসী, হিতবাদী, নায়ক, বসুমতী, Bengali, Amrita Bazar সকলের ভিতরে সেই এক তত্ত্বকে জানিতেন—সবগুলোতেই খবর থাকে তো সবই 'বঙ্গবাসী'। এইরূপে ব্যবহারের সুবিধার জন্য মানুষ বস্তুতে নামরূপ আরোপ করিয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ, উহা তাহার যথার্থ স্বরূপ নহে—নামরূপকে বাদ দিলে যাহা থাকে

তাহাই বস্তুর যথার্থ স্বরূপ—তাহাই ব্রহ্ম। স্বয়ং শ্রুতি বলিতেছেন :—
"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" * (ছাঃ উঃ ৬।১।৪)

বস্তুতঃ, নামরূপই যে জগৎ এবং তাহা যে লোকব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই নহে, একটু চিন্তা করিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অতএব প্রবন্ধবিস্তৃতির ভয়ে সে বিষয়ের বিস্তৃত শাস্ত্রীয় বিচার হইতে আমরা নিবৃত্ত হইলাম। সুতরাং সত্যের অনুরোধে এই লোকব্যবহার-স্বরূপ নামরূপাত্মক জগৎকে একবার কেন সহস্রবার বলিব 'মিথ্যা'! মিথ্যাকে মিথ্যা বলিতে এত ভয় কিসের?

কেহ কেহ হয়তো বলিবেন—হউক মিথ্যা, কিন্তু সে কথা অত জোর গলায় বলিবার দরকার কি, সত্য কথা বলিবারও তো একটা রকম আছে, সকল সত্য কথাই কি সকল স্থানে প্রযোজ্য? সত্যও একটু বয়ে সয়ে বলিতে হয়। দেশের সমাজের এই ভীষণ দুরবস্থার দিনে, দেশের বুকে অনশন, অর্দ্ধাশন ও মহামারীর এই পৈশাচিক তাণ্ডবনৃত্যের সঙ্কটাপন্ন মুহূর্ত্তে দেশকে 'জগৎ মিথ্যা' এইরূপ দারুণ সত্যকথা শুনান কি ভাল? তাহা হইলে জাতি যে আর জাগিবে না, দেশ যে আর উঠিবে না, মায়ের বুকে পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য যে আর ঘুচিবে না! জীবন সমস্যার এই ভীষণ সন্ধিক্ষণে মায়ের বুকে তোমার বেদান্তের সর্ব্বনেশে সত্য কথার বিষাক্ত ছুরিকা আর হানিয়া কাজ নাই—যথেষ্ট বেদান্ত 'মা' শুনিয়াছেন, অতএব আর না, তোমার বেদান্তের সত্য কথা লইয়া তুমি হিমালয়ের গুহা আশ্রয় কর, আমরা দূর হইতে গন্ধপুষ্পে নিত্য তোমার বেদান্তকে পূজা করিব!

উত্তরে আমরা এই বলিতে চাই যে, মিথ্যাদ্বারা যে সত্যকে লাভ করা যায় না এ কথা কি আমরা আজও বুঝি নাই—চালাকী দ্বারা যে মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হয় না সে কথা কি আবার নূতন করিয়া বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া দিতে হইবে? মা যদি আমাদের সত্যিকার মা হন তবে সত্যের মঙ্গলশঙ্খ নিনাদেই তিনি জাগিবেন। মিথ্যার শূন্য আস্ফালনে যে মাকে জাগাইতে চাই, সে মা আসল মা নহে, তাহার

* বিকার বা নামরূপ জিনিষটা বাক্যের আরম্ভ মাত্র, মৃত্তিকাই সত্য।

বক্ষে শান্তির পীযূষপ্রস্রবণ নাই, হাসিতে প্রেমের অমৃতমন্দাকিনী নাই। তাহার স্পর্শে হিংসা-দ্বেষ ও স্বার্থমলিনতা মুছে কৈ? সে যে রূপকথার ডাকিনী—মায়ের রূপ ধরিয়া নকল বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া ঐন্দ্রজালিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ছটা দেখাইয়া পরিণামে শুধু আমাদের রক্তপানে নিজের শোণিতপিপাসা তৃপ্ত করাই তাঁর উদ্দেশ্য। অতএব সাবধান! 'ঠেকে শেখার চেয়ে দেখে শেখা ভাল'—মিথ্যার আহ্বানে মিথ্যাই আসিবে। ভূতের আবাহনের মন্ত্র গালিগালাজ, মিথ্যা কথা—দেবতার আবাহনের মন্ত্র অভ্রান্ত-সত্য বেদবাক্য। মিথ্যা মন্ত্রে ভূতের আবাহন হয়—দেবতার নহে। ভারতমাতার সুসন্তান স্বামী বিবেকানন্দ কি বলিতেছেন শুনুন :—

"Truth does not pay homage to any Society ancient or modern. Society has to pay homage to truth or die." * *Jnana yoga.*

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'মায়া একটা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ নহে। জগতে নিত্য যে ব্যাপার সর্ব্বদা প্রত্যেক ব্যক্তিতে লক্ষিত হইতেছে তাহাই মায়া—Statement of the facts of the universe. আমরা সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও যে হীনের মত জড়সড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি—ইহাই মায়া। জগৎ ভগবানের—আমরা তাঁর যন্ত্র, একথা মুখে বলিয়াও যে আমরা নিজেকে অসহায় দুর্ব্বল মনে করিতেছি—ইহাই মায়া। ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতে সেই একই পরব্রহ্ম বিরাজিত রহিয়াছেন ইহা অস্বীকার না করিয়াও যে আমরা হিংসা, দ্বেষ ও ভেদবুদ্ধি দ্বারা নিয়ত জর্জ্জরিত হইতেছি—ইহাই মায়া। ত্যাগেই যথার্থ সুখ, দেশের জন্য বিশ্বের জন্য আপনাকে বিলাইয়া দিতে পারিলেই যে আনন্দ, ক্ষুদ্র 'আমি'টার গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দিয়া সমগ্র ধরণীর সঙ্গে তাহাকে মিশাইয়া দিতে পারিলেই যে যথার্থ শান্তি ইহা বুঝিয়াও যে আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থে অন্ধ হইয়া, এক ফোঁটা মান যশের আশায়, মুহূর্ত্তের

---

* সত্য প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজকে সম্মান প্রদর্শন করে না। সমাজকেই সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে।

একটা উত্তেজনার অভিলাষে তুচ্ছ ভোগের পশ্চাতে ধাবমান হইতেছি—ইহাই মায়া। সকলকেই একদিন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে একথা নিশ্চয় জানিয়াও যে আমরা ত্যাগ বৈরাগ্যের নামে শিহরিয়া উঠি, এমন কি, কোনও মহৎ কার্য্যে বিন্দুমাত্র আত্মত্যাগ দেখাইতেও কুণ্ঠিত হই—ইহাই মায়া। এক কথায় বলিতে গেলে স্বার্থপরতাই মায়া আর সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্যতাই ব্রহ্মসদ্ভাব বা মোক্ষ। এই মায়াই জগৎ—ইহার অতিরিক্ত আর জগৎ নাই, যাহা আছে তাহা অনন্ত জ্ঞান, অপার আনন্দ, অসীম প্রেম বা ভূমা।

সুতরাং 'ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা' বেদান্তের এই গুরুগম্ভীর মঙ্গলশঙ্খ নিনাদেই মায়ের নিদ্রা ভঙ্গ করিতে হইবে। মায়ের আত্মবিশ্বাসহীন, ভয়বিহ্বল কোটী কোটী সন্তানের হৃদয়তন্ত্রী নিনাদিত করিয়া নির্ভয়ে ঘোষণা করিতে হইবে—হে অভয়, অমৃত, সত্যস্বরূপ, নিঃস্বার্থপরতার বিগ্রহস্বরূপ, অনন্ত শক্তি অনন্ত বীর্য্যের আধার ব্রহ্ম, মিথ্যা ভয়, স্বার্থপরতা, দুর্ব্বলতা ও ভেদবুদ্ধিরূপ মায়ার জগৎ পরিত্যাগ করিয়া তুমি উঠ—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"—ইহাই এ যুগের ঋষিকণ্ঠনিঃসৃত মূলমন্ত্র।

বেদান্তের এই মহান্ উপদেশ ভারতীয় জীবনে কিরূপ কার্য্যকরী হইবে—শুধু ভারতীয় জীবনে কেন, সমগ্র বিশ্বে কিরূপে শান্তির ধবলগঙ্গাপ্রবাহ প্রবাহিত করাইয়া দিবে, ভবিষ্যতে আমরা সে বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এখানে শুধু এই মাত্র বলিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মন্দের যেমন একটা উত্তেজনা আছে ভালরও সেইরূপ একটা ভীষণ উত্তেজনা আছে; সেই উত্তেজনার বশে মনে মনে যথার্থ ভাল করিবার অভিপ্রায় থাকিলেও আমরা অনেক সময় মন্দই করিয়া বসি। যথার্থ শ্রেয়কে প্রাপ্ত হইতে হইলে আমাদিগকে ব্যস্তবাগীশ হইলে চলিবে না—হইতে হইবে ধীর, বিবেচক, সত্যপ্রিয়, নির্ভীক ও কার্য্যতৎপর। উত্তেজনার ঘোরে অনেক সময় হিতৈষীর সৎপরামর্শও আমাদের নিকট বাজেকথা বলিয়া মনে হয়, ঋষিবাক্যকেও old foolদের বৃথা জল্পনা বলিয়া বোধ হয় এবং তাহার বিরুদ্ধে নানা

হাসিতামাসাপূর্ণ রং-পরং লাগাইয়া আমরা নিজেদেরই তরলতা ও স্থূল-দর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকি। প্রাচীনগণ কোন্ কথা কি উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম যথাযথরূপে তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা না করিয়া উত্তেজনার চাঞ্চল্যে আমরা তাঁহাদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়া তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ হইতে ভ্রষ্ট ও তাঁহাদিগের প্রতি যাহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন তাহাদের মনে অযথা ক্লেশ উৎপাদনের কারণ হইয়া থাকি। ঋষিগণ দুই প্রকার সত্যের কথা বলিয়া গিয়াছেন, প্রথমতঃ—দেশকাল-নিরপেক্ষ সত্য, দ্বিতীয়তঃ—দেশকালসাপেক্ষ সত্য। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সত্যগুলি দেশকাল ভেদে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইবে, কিন্তু প্রথমশ্রেণীর সত্যগুলি কোন কালেই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না; সেগুলিকে শ্রদ্ধার সহিত সকলকেই শিরোধার্য্য করিয়া লইতেই হইবে—অবশ্যই অন্ধভাবে নহে; বিচারসহায়ে সেগুলিকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে এবং তপস্যা-দ্বারা সেগুলিকে জীবনে অনুভব করিতে হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর সত্য-গুলিকে প্রথমশ্রেণীর সত্য সকলের অনুকূল ভাবে, দেশকালের উপযোগী করিয়া পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু, প্রথমশ্রেণীর সত্যগুলি আজ আর দেশকালের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না, গায়ের জোরে এই কথা বলিয়া যদি উহাদিগকেই, আমরা হাসি-ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিতে যাই তবে সুসভ্য পুত্রের বৃদ্ধ পিতাকে আতুরালয়ে পাঠাইয়া দেওয়ার মত ব্যবস্থা হয় না কি? যাহা হউক যদি আমাদের উদ্দেশ্যের সরলতা থাকে, যদি মন মুখ এক করিয়া মান যশের প্রত্যাশা বর্জ্জনপূর্ব্বক আমরা যথার্থ সত্যকে অনুসন্ধান করি তবে সত্যের ভগবান্ একদিন না একদিন অবশ্যই আমাদিগের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবেন সন্দেহ নাই।

শঙ্করের সংসার ত্যাগ।

(শ্রীমতী—)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শঙ্কর জ্ঞাতিবর্গকে তাঁহার সন্ন্যাসের সঙ্কল্প ও উহার শাস্ত্রীয় বিধান সংক্ষেপে জ্ঞাপন করাইলেন। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই একজন জ্ঞাতি একটু ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "তাতো সব বুঝা গেল, এখন আমাদের কি করিতে হইবে বল।" পার্শ্ববর্ত্তী একজন তাঁহাকে চুপি চুপি বলিল, "আরে বাবা, বিষয়টা লেখা পড়া করে নেবে ত নাও না। আর বাজে কথায় সময় নষ্ট কেন?" যে ব্যক্তি শঙ্করকে কৃত্রিম স্নেহ দেখাইয়া পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনের অবতারণা করিয়াছিলেন, তিনি একটু বিরক্তির ভাণ করিয়া অপর সকলের প্রতি ইঙ্গিত করিয় বলিলেন "আহা! অত ব্যস্ত কেন, সব ঠিক হইতেছে।" তাহা শুনিয়া আর একজন মৃদুস্বরে বলিলেন, "কর্ত্তা যেন বিষয়ের লোভ রাখেন না, স্পষ্ট কথা বল্লেই দোষ হয়।"

শঙ্কর ও বিশিষ্টা উভয়েই এই সমুদয় কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইতেছিলেন, কিন্তু তুচ্ছ বিষয়লুব্ধ ব্যক্তিদের ইহাই স্বভাব জানিয়া তাঁহারা যেন তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না। বিশিষ্টা মনে মনে ভাবিলেন, "আহা! বিষয়লুব্ধগণের হৃদয় কি কপটতা পূর্ণই হয়! বাছা আমার সবই ছাড়িয়া যাইতেছে তথাপি তাহাদের দুঃখ দূরে থাক, দুই একটী কথার বিলম্বও সহিতেছে না। আর আমিই বা কয়দিন? তোরাই সব ভোগ করিস্"।

শঙ্কর নিজের বক্তব্য শেষ করিলে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞাতিটী শঙ্করের বহু প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "শিবগুরুর ছেলের মুখে এইরূপ কথাই শোভা পায়। আমরা জানি শিবগুরুও সংসারধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন না; তুমি তাহারই পুত্র, তোমার তো বাবা এইরূপই হইবার কথা। তা যাহা

হউক এত শীঘ্র গৃহত্যাগ করিও না; এই সেদিন মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়াছ, আর একটু সুস্থ হও পরে যাইও।"

বৃদ্ধের বাক্য শেষ হইতে না হইতে শঙ্কর স্বীয় জননীকে প্রদর্শন করিয়া, বলিলেন "মহাশয়গণ! এই আমার জননী, আমি আমার সমুদয় সম্পত্তি আপনাদিগকে দিতেছি; আপনারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলুন, যতদিন মা আমার জীবিতা থাকিবেন, ততদিন আপনারা আমার ন্যায় সযত্নে তাঁহার ভরণপোষণ ও সেবাশুশ্রূষা করিবেন। জননী দেহত্যাগ করিলে সবই আপনাদের হইবে। কিন্তু যতদিন জননী জীবিতা থাকিবেন ততদিন এই বিষয়ের উপস্বত্ব আপনারা গ্রহণ করিবেন না।"

শঙ্করের বিষয়সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল। একজন বিধবার ভরণপোষণ ও দানধ্যানে ব্যয় করিয়াও ক্ষয় হইতে পারে না। সুতরাং শঙ্করের এরূপ প্রস্তাবে অসম্মত হইবার কোন কারণই নাই। জ্ঞাতিগণ একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "তা নিশ্চয়ই হইবে। তোমার বাবা! কোন ভাবনা নাই। আমরা সকলে মিলিয়া তোমার জননীর সেবা করিব। তুমি তোমার জননীর এক সন্তান, আজ হইতে আমরা এতগুলি ব্যক্তি তাঁহার সন্তান হইলাম।"

জ্ঞাতিগণের বাক্যে শঙ্কর ও বিশিষ্টা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তখন শঙ্কর একখণ্ড কাগজ লইয়া এই কথা লিখিয়া নিজ নাম স্বাক্ষর করিলেন এবং জ্ঞাতিগণের দ্বারাও নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন।

এইবার শঙ্করের বন্ধন মুক্ত হইল। তাঁহার বদন সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুমসম প্রফুল্ল হইল। বিশিষ্টা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন। পরিচারিকা বিশিষ্টার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। জ্ঞাতিগণ আনন্দে আপ্লুত হইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কারণ, স্বাক্ষর-পত্রখানি নিরাপদ্ স্থানে রাখা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক—কি জানি কালবিলম্ব হইলে যদি কিছু গোল ঘটে।

এই সব ব্যাপারে প্রায় অপরাহ্ণ হইয়া গেল। শঙ্কর জননী সমীপে যাইয়া বহু জ্ঞানপূর্ণ মিষ্ট কথা বলিয়া জননীকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন। বিশিষ্টা শঙ্করের কথা শুনিয়া বলিলেন, "বাবা! আর আমায় বুঝাইতে

হইবে না, আমি প্রকৃতিস্থা হইয়াছি। আমি প্রাণ ভরিয়া তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতেছি—তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, তোমার কীর্ত্তি জগতে অক্ষয় হইবে। বাবা, তুমি সামান্য মানব নহ, তোমার জন্মের পূর্ব্বে তোমার পিতা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—ভগবান্ শঙ্কর মনুষ্যরূপে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাই তোমার নাম আমরা 'শঙ্কর' রাখিয়াছি। যাও বৎস যাও, তোমার শঙ্কর নাম সার্থক কর। শঙ্করই জগতের যাবৎ জ্ঞানশাস্ত্রের আদি গুরু, তুমি সেই জ্ঞানশাস্ত্র প্রচার করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন কর। আমরা মানব, তাই সময়ে সময়ে একথা ভুলিয়া গিয়া তোমাকে পুত্র বলিয়া মায়ায় মুগ্ধ হই।"

জননীর মুখে শঙ্কর সহসা এই কথা শুনিয়া রোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন। তিনি ব্যাকুলভাবে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে জননীর চরণে লুণ্ঠিত হইলেন এবং গদগদস্বরে বলিলেন, "মা! যদি আমার কিছু হয় ত আপনার আশীর্ব্বাদেই হইবে। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আমি কোন দিন বিস্মৃত না হই।"

বিশিষ্টা পুত্রবাক্যে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয়সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তিনি পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া অশ্রুবর্ষণে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। কে জানে জননীর সেই আশীর্ব্বাদ-পূত অশ্রু-অভিষেক জগতের জ্ঞানরাজ্যে শঙ্করের অভিষেক কি না? ধন্য তুমি শঙ্কর! আজ 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' তুমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইলে। আর ধন্য বিশিষ্টাদেবি! আজ তুমি তোমার প্রাণপ্রতিম একমাত্র পুত্রকে জগতের হিতে উৎসর্গ করিয়া দিলে।

ইত্যবকাশে জ্ঞাতিগণ শঙ্করের সন্ন্যাসবার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন। গ্রামস্থ জনগণ দলে দলে শঙ্করের সন্ন্যাস দেখিতে আসিতেছেন। বালক বালিকাগণ পিতামাতার সঙ্গ গ্রহণ করিল। গ্রামে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। পরিচারিকা গৃহদ্বারে এই লোকসমাগম দেখিয়া মাতাপুত্রকে সংবাদ দিল। মাতাপুত্রের স্নেহালিঙ্গন ভঙ্গ হইল। শঙ্কর জননীর বক্ষঃস্থল ত্যাগ করিয়া বহির্দ্বারে আসিলেন ও দেখিলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিজ্ঞ অজ্ঞ জনসাধারণ তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত। দেখিবামাত্র তিনি তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ

করিয়া গৃহে আনয়ন করিলেন। কিন্তু গৃহে স্থান কোথায়! পুঁথিপত্র এবং পূজাপাঠের দ্রব্যসম্ভারে গৃহ পূর্ণ, এত লোকের স্থান সে গৃহে কোথায়? অগত্যা লোকগণ সব দণ্ডায়মান রহিলেন।

শঙ্কর কাহাকে আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে দণ্ডকমণ্ডলু ও বহির্ব্বাস লইয়া জননীসমীপে পুনরায় আসিলেন এবং জননীর চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া সষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন। দর্শকবৃন্দ শঙ্করের এই ভাব দেখিয়া নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া যিনি যেখানে ছিলেন তিনি সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া শঙ্কর গাত্রোত্থান করিলেন। আজ যেন শঙ্কর আর সে বালক শঙ্কর নাই, আজ তাঁহার মুখে এক দিব্যজ্যোতি প্রকাশিত—শরীর হইতে কি যেন এক প্রভাব নির্গত হইতেছে। সেই নবনীতকোমল নাতিস্থূল সুঠাম দেহ, সেই ভস্মলাঞ্ছিত গৌরকান্তি বপু, সেই ত্রিপুণ্ড্রমণ্ডিত প্রশস্ত উন্নত ললাট, সেই প্রশান্তদৃষ্টি আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগল আজ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। এতদিন সকলে শঙ্করকে যেরূপ দেখিয়াছিল, আজ যেন তাহারা আর সেরূপ দেখিতে পাইল না। আজ যেন শঙ্করের বালকত্ব কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ কল্পনাচক্ষে দেখিলেন বৈরাগ্যমূর্ত্তি ষোড়শবর্ষীয় বালক শুকদেব ভূমিষ্ঠ হইয়া যেন আজ বনে প্রস্থান করিতেছেন! কাহারও মুখে কোন কথা নাই। সকলেই এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আজ বিমুগ্ধ। আজ জ্বলন্ত ত্যাগের দৃষ্টান্ত সম্মুখে দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত। এমন সময় শঙ্কর ধীরপদসঞ্চারে গৃহত্যাগ করিলেন। পশ্চাতে বিশিষ্টাদেবী জনতা অপসারিত করিয়া সহসা কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শঙ্কর রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া জন্মভূমিকে প্রণাম করিতে যাইয়া যেমন পশ্চাৎ ফিরিলেন, অমনি আবার জননীকে সম্মুখে দেখিলেন। তিনি জন্মভূমির উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া আবার জননীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। জননী পুত্রকে শেষ চুম্বন করিবেন বলিয়া অন্তঃপুর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং প্রাণ ভরিয়া আবার পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন এবং নিজ পদধূলি পুত্রের শিরে দিয়া আবার আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিন্তু এবার আর তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। জননীর শেষ

নীরবে ব্যক্ত হইয়া গেল। শঙ্কর তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও জ্ঞাতিগণকে উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিলেন। বাল্যের ক্রীড়াসহচর বালকগণ শঙ্করের সহিত ইদানীং বড় মিশিত না। তাহারা আজ শঙ্করকে দেখিতে আসিয়া বিচলিত হইল এবং জনতা ঠেলিয়া শঙ্করের সম্মুখে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "ভাই, আমাদের ছাড়িয়া তুই কোথায় যাইতেছিস্। আমরা তোর সঙ্গে খেলিতে আসিনা বলিয়া কি তুই রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছিস্?" শঙ্কর বাল্যবন্ধুগণের প্রেমে একবার যেন বিচলিত হইলেন। তিনি তাহাদের গলা জড়াইয়া বলিলেন, "ভাই, তোমরা কাঁদিও না, আমি আবার আসিব, বড় হও সব বুঝিতে পারিবে"।

যাঁহার নামে জগৎ একদিন কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক অবনত করিবে, যাঁহার প্রভাবে জগতের সমক্ষে মোক্ষদ্বার আবার উদ্ঘাটিত হইবে, তাঁহার সন্ন্যাসে প্রকৃতিদেবীই কি নিশ্চিন্তা থাকিতে পারেন? তিনিও যেন আজ অপরূপ শোভা ধারণ করিলেন। সমীরণ মন্দ মন্দ বহিয়া সকলের শরীরে পুলক সঞ্চার করিতে লাগিল। জীব-জন্তু-পশু-পক্ষী যেন কি এক অপূর্ব্ব স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। বৃক্ষলতা নিজ কুসুম-ভার অবনীতলে বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। মানবজাতির যে যেখানে অবস্থিতি করিতেছিল, সকলেই যেন ক্ষণকালের জন্য নিজ নিজ কল্যাণ চিন্তায় নিমগ্ন হইল।

বর্ষাসমাগমে তারকামণ্ডলবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কালাডিবাসী জনগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া শঙ্কর ধীরপদসঞ্চারে চলিয়াছেন। ক্রমে তিনি নিজ কুলদেবতা শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে আসিলেন। সেখানে তিনি নিজ দেশাচার অনুসারে সাষ্টাঙ্গে যেমন প্রণাম করিতেছেন অমনি কে যেন বলিয়া উঠিল—"শঙ্কর তোমার কুলদেবতার মন্দির যে যায়, নদীর ভাঙ্গনে শীঘ্রই তিনি জলগর্ভে বিলীন হইবেন; তুমি তাহার কি প্রতিবিধান করিলে?"

শঙ্কর ইহা দৈববাণী জ্ঞান করিলেন। তিনি তখনই উত্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে কোলে করিয়া নিজ বাসগৃহের সমীপবর্ত্তী একটী উচ্চ ভূমিতে স্থাপন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া

বলিলেন, "ভগবন্! আপনি এই স্থানে অক্ষয় হইয়া থাকুন। ভক্তগণ এই স্থানে আপনার শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করিবেন।" অতঃপর তিনি বিদায় লইলেন।

বিশিষ্টাদেবী এই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন। দুই নয়নে অশ্রু দরদর ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল—হস্তপদ অবশ, মস্তক অবগুণ্ঠনশূন্য। তিনি আর পুত্রের অনুসরণ করিলেন না। শঙ্করও আর পশ্চাৎ চাহিলেন না, তিনি সম্মুখদৃষ্টি হইয়া রাজপথ ধরিয়া ধীরে ধীরে গ্রামের বহির্দ্দেশে আসিলেন। গ্রামবাসিগণ এইবার একে একে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গম্ভীরভাবে গৃহে ফিরিতে লাগিল। কেহ বা শঙ্করের পদধূলি লইয়া নিজ শিশুপুত্রের মস্তকে দিল। শঙ্কর যতই দূরে যাইতে লাগিলেন জনতা ততই তরল হইতে লাগিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি নিঃসঙ্গ হইলেন এবং এই ভাবে কিয়দ্দূর যাইয়া রাত্রিযাপনের জন্য একটী শিবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রত্যূষে কোথায় যাইবেন তাহা বিধাতাই জানেন।

বিশিষ্টা শ্রীকৃষ্ণসমীপে ভূতলশায়িনী হইয়া এতক্ষণ পড়িয়া আছেন। পরিচারিকা সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিশিষ্টাকে বহু অনুনয় বাক্যে ফিরাইয়া আনিল। বৃদ্ধার মনে হইতেছিল—'আহা বাছা আমার পুস্তকগতপ্রাণ, কিন্তু সে ত কোন পুস্তক লইয়া গেল না! আহা যদি বাছা কোন পুস্তকের জন্য আবার ক্ষণেকের তরেও ফিরিয়া আসে তবে তাহার চাঁদমুখখানি আর একবার দেখিয়া লই।' কিন্তু যে বালক পরমার্থ লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে সে কি আর জগতের কোন বস্তুতে আসক্ত থাকিতে পারে?—পাণ্ডিত্যের উপকরণ কি তাহাকে ফিরাইতে পারে? বিশিষ্টা মানসচক্ষে পুত্রের মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে গৃহে ফিরিলেন।

কিন্তু গৃহে আসিয়া তিনি কি করিবেন? গৃহ যে আজ শূন্য! সকলই যে শঙ্করের স্মৃতিমণ্ডিত—যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই যেন শঙ্করের মূর্ত্তি অঙ্কিত! বিশিষ্টার প্রাণ হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তিনি সত্বর শঙ্করের পাঠগৃহে প্রবেশ করিলেন। আশা, তথায় শঙ্করকে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু প্রবেশ করিবামাত্রই পুত্রের পুস্তকাদির প্রতি তাঁহার

দৃষ্টি পড়িল। তিনি ত্বরান্বিতা হইয়া পুত্রের সেই প্রিয় পুঁথিপত্র সযত্নে গুছাইতে লাগিলেন। কিন্তু পুস্তকাদি দর্শনেই তাঁহার বক্ষঃস্থল অশ্রুতে ভাসিয়া গেল। পুস্তক গুছাইতে গুছাইতে তিনি দেখিলেন, একখানি প্রশস্ত পত্রে অতি যত্নে এই শ্লোক কয়টী লিখিত রহিয়াছে।—

"বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো, ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ (১)
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ, পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ (২)
স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ, সুশান্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ (৩)
দেহাদিভাবং পরিবর্জ্জয়ন্তঃ স্বাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ (৪)
ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তো, ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ (৫)

---

* বেদান্তশাস্ত্রোক্ত বাক্যে যাঁহারা প্রতিনিয়ত প্রীতিপ্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা ভিক্ষালব্ধ অন্নেই পরিতৃপ্ত, যাঁহারা শোকবিকারবিহীন চিত্তে নিয়ত বিচরণ করেন, (বেশভূষা পরিশূন্য) সেই কৌপীনধারী পুরুষেরাই ভাগ্যবান্ বলিয়া অভিহিত হয়েন। ১।

বৃক্ষমূলমাত্র যাঁহাদের আশ্রয়স্থল, যাঁহাদের হস্তদ্বয় কেবল ভোজ্যবস্তু আহরণের জন্য নহে, (ছেঁড়া) কাঁথার ন্যায় যাঁহারা বিলাসলক্ষ্মীকে ঘৃণা করেন, এইরূপ কৌপীনধারী পুরুষেরাই নিশ্চয় ভাগ্যবান্ বলিয়া অভিহিত হয়েন। ২।

স্বকীয় হৃদয়ের আনন্দেই যাঁহারা সদাসর্ব্বদা পরিতৃপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, যাঁহাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ প্রশান্তভাবে সংস্থিত, দিবানিশি যাঁহারা ব্রহ্মসুখে রমণ করিতেছেন, ঈদৃশ কৌপীনধারী ব্যক্তিরাই নিশ্চয় ভাগ্যবান্ বলিয়া অভিহিত হয়েন। ৩।

দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা স্বকীয় আত্মাতেই পরমাত্মার দর্শনলাভ করেন, যাঁহারা কি অন্ত কি মধ্য কি বাহির কিছুই চিন্তা করেন না, ঈদৃশ কৌপীনধারী পুরুষেরাই নিশ্চয় ভাগ্যবান্ বলিয়া অভিহিত হয়েন। ৪।

পবিত্র ব্রহ্মনামের অক্ষর যাঁহারা প্রতিনিয়ত উচ্চারণ করেন, 'আমিই ব্রহ্ম' ইহাই যাঁহারা প্রতিনিয়ত চিন্তা করেন, যাঁহারা ভিক্ষালব্ধ বস্তু ভোজন করিয়া (সানন্দে) চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করেন, ঈদৃশ কৌপীনধারী পুরুষেরাই নিশ্চয় ভাগ্যবান্। ৫।

বিশিষ্টা শ্লোক 'কয়টী পড়িলেন। সংস্কৃত ভাল জানিতেন না, তবুও মোটামুটী ভাবটা বুঝিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "আহা, বাছা আমার এই সব ভাবিয়া সন্ন্যাসী হইল। ভগবন্! তুমি তাহাকে রক্ষা কর।"

এরিষ্টটল ও পরাবিদ্যা (METAPHYSICS)।

(শ্রীকানাইলাল পাল, এম এ, বি এল)

(২)

আমরা গতবারে দেখিয়াছি এরিষ্টটলের মতে প্রত্যেক বস্তুর ৪টী কারণ আছে। (১) উপাদান কারণ—ইহাকে ইংরাজিতে Matter আখ্যা দেওয়া হয়। যথা—মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ। (২) নিমিত্ত কারণ—ইহাকে Efficient cause বলা হয়। যথা—কুম্ভকার, কুলালচক্র প্রভৃতি ঘটের নিমিত্ত কারণ; কুম্ভকারের চেষ্টা ও কুলালচক্র প্রভৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে ঘট-সৃষ্টি হইতে পারে না। (৩) অসমবায় কারণ বা Formal cause—মৃৎপিণ্ডের বিশেষরূপে সংযোগ সাধন ব্যতীত ঘট উৎপন্ন হয় না। কুম্ভকার যখন ঘট সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করে তখন প্রথমে ঘটের আকৃতি বা রূপ মনে মনে স্থির করিয়া লয়, পরে মৃৎপিণ্ডকে সেইরূপ আকারে আকারিত করে। অন্য কথায়, ঘটের একটা ছবি বা নক্‌সা সে মনে মনে আঁকিয়া লয়। (৪) উদ্দেশ্য অর্থাৎ Final cause—মানুষ উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কায করে না, কুম্ভকার

যখন ঘট গড়ে তখনও তার একটা উদ্দেশ্য থাকে। এই চারিটী কারণের বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যায়, তাহারা Matter, Force, Idea ও Motive বা Purpose এর পরিচায়ক। এই চারিটী কারণের সংযোগে পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই চারিটী কারণ বস্তুমাত্রকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ Substance বা বস্তু বলা এরিষ্টলের মতে অযৌক্তিক। আপাতদৃষ্টিতে চারিটী কারণকে পৃথক্ বলিয়া মনে হইলেও একটু চিন্তা করিলে দেখা যায়—Force, Idea ও Motive—এই তিনটী একেরই অন্তর্ভুক্ত। কুম্ভকার প্রথমে ঘটের Idea বা ভাবটী স্থির করিয়া নিজশক্তি (Force) প্রয়োগে স্বীয় উদ্দেশ্য (Purpose) সিদ্ধ করিবার জন্য ঘট সৃষ্টি করে। ঘটের উপাদান (Matter) কুম্ভকারের অপেক্ষা করে না, কিন্তু অপর তিনটী কারণই কুম্ভকারের চেষ্টার অপেক্ষা করে। সুতরাং এই তিনটী কারণের একটী নাম দেওয়া হয়—Idea. সুতরাং ঘটের ভাবটী (Idea) কুম্ভকারের মনে উদয় হওয়ায় ঘটসৃষ্টির জন্য কুম্ভকারের হস্তাদিসঞ্চালন ঘটে এবং কুম্ভকারের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়। অতএব দেখা গেল Idea বা ভাবটীই প্রধান; তাই তিনটী কারণকে Idea বা ভাবের অন্তর্গত করিয়া লওয়া হয়।

বস্তুসৃষ্টির জন্য Matter বা উপাদান ও Idea বা ভাব—এই দুইটী কারণ বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন। সৃষ্টির (Becoming) পূর্ব্বে তাহারা আপনা আপনি উৎপন্ন হইয়াছে—একথা বলা অযৌক্তিক; কারণ, তাহা হইলে সত্তার (Being) পূর্ব্বেই তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; তাহাতে স্ববিরোধ দোষ আসিয়া পড়ে। সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহারা উৎপন্ন হইয়াছে একথা বলিলেও স্ববিরোধ দোষ ঘটে, সুতরাং সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে তাহারা বর্ত্তমান—অন্য কথায়, তাহারা অনাদিকাল হইতেই বর্ত্তমান—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। প্লেটোর সহিত এরিষ্টটলের এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ দেখা যায় না। সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি কি এরিষ্টটল বা প্লেটোর Idea ও Matter? প্লেটোর দর্শনালোচনা করিলে প্রথমতঃ মনে হয়, তিনি যেন এই দুইটীকে বিরুদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; এবং সেই কারণেই এরিষ্টটল তাঁহার দর্শনের বিরুদ্ধে ঘোরতর

আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। কারণ, এরিষ্টটল বলেন, যাহা একেবারেই বিরুদ্ধ তাহাদের সংযোগ হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। বস্তুতঃ কি তাহাই? চুম্বকের উত্তর মেরু (Positive pole) দক্ষিণ মেরুকে (Negative pole) আকর্ষণ করে—এটী কি প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঘটনা নহে? একখণ্ড চুম্বকের দুই প্রান্তে বিপরীত শক্তি দেখা যায়—ঠিক মধ্যস্থলে কোন শক্তিই নাই, কিন্তু সেই চুম্বককে দ্বিখণ্ড করিলে সেই মধ্যস্থল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া বিপরীত শক্তিসম্পন্ন হয়। মূল তত্ত্ববস্তুও কি চুম্বকের মধ্যস্থলের মতন নহে? যখনি সৃষ্টি তখনই Idea ও Matter; বস্তুতঃ, তিনি দেশকালের অতীত, সৃষ্টির পরপারে—Idea ও matter এর গণ্ডীর বাহিরে। থাক্ এখন এ একথা।

প্লেটোর Non-being (অভাব পদার্থ) ও Matterকে কেহ কেহ পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। নির্দ্দেশ করিবার কারণও যথেষ্ট রহিয়াছে; কারণ, Non-being বলিতে প্লেটো তাহাতে সত্তার অভাবই ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু সত্তার-অভাব (Reality) আর মিথ্যা-পদার্থ এক নয়, একথা ভুলিয়া যাওয়া সমীচীন নহে। বন্ধ্যাপুত্র একেবারে মিথ্যা-পদার্থ কিন্তু মরীচিকা একেবারে মিথ্যা নয়; কারণ, তাহার বস্তুর সত্তা না থাকিলেও তাহার প্রতীতি হইয়া থাকে। আমাদের মনে হয়, প্লেটো Non-being বলিতে মরীচিকার মতন প্রতীয়মান পদার্থকে বুঝাইয়াছিলেন। এই কথা মনে করিলে Non-being ও matterকে পৃথক্ করিয়া বুঝিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

দেখা যায়, মৃৎপিণ্ড (matter বা উপাদান) ভাবের (Idea) সাহায্যে ঘটরূপ ধারণ করে। মৃৎপিণ্ডে ঘট-উৎপাদন-সামর্থ্য আছে। সাংখ্যের ভাষায় মৃৎপিণ্ডে ঘট অব্যক্ত অবস্থায় বর্ত্তমান; ইংরাজিতে ইহাকে Potential অবস্থা বলে। সুতরাং মৃৎপিণ্ডকে অব্যক্ত বা Potential ঘট এবং ঘটকে ব্যক্ত বা Actual ঘট আখ্যা দেওয়া চলে। অতএব বুঝা গেল, matter বা উপাদান বা জড় বলিতে অব্যক্ত অবস্থাকে বুঝায়; Idea বা ভাবটী সেই অব্যক্ত অবস্থাকে ব্যক্ত করে। অন্য কথায়—Matter বা জড়ের পরিণতি Idea, অথবা Idea

বা সেই ভাবটীই জড়ের (Matter) লক্ষ্য। সুতরাং Idea ও Matter উভয়ের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধের সম্ভাবনা নাই। যাহা অব্যক্ত আছে তাহা ব্যক্ত হইবার জন্য সততই প্রয়াস পাইতেছে—ইহাতেই Matter ও Form এর মিলন ও বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। প্লেটো একটীকে পুরুষ অপরটীকে স্ত্রী পদবাচ্য বলিয়াছিলেন। সাংখ্যও তাহাই বলেন। এরিষ্টটলেরও সেই মত। হিন্দুদার্শনিক ও ঋষিকুলের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন শ্রীভগবানে তিনটী শক্তি নিয়ত বর্ত্তমান—স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। জীবশক্তি দ্বারা জগৎ ধৃত রহিয়াছে (একথা ভগবদ্‌গীতায়ও পাওয়া যায়—"জীবভূতং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ")। মায়াশক্তি—আবরিকাশক্তি। মায়াশক্তি হিন্দুদার্শনিকমাত্রেই—কি অদ্বৈতবাদী কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সকলেই—স্বীকার করেন। সুতরাং এই দুইটী শক্তি প্রধান প্রধান হিন্দুদার্শনিকগণের স্বীকার্য্য। তবে স্বরূপশক্তি সকলে স্বীকার করেন না। স্বরূপশক্তি বলিতে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-শক্তিকে বুঝায়। সন্ধিনী শক্তি হইতে সত্তা বা সৎ, সম্বিৎ শক্তি হইতে চিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি হইতে আনন্দের পরিচয় পাই। অন্য কথায়, স্বরূপশক্তি বলিতে "সচ্চিদানন্দ"কে বুঝায়। ফলে, শুধু কথার ঝগড়াই হইয়া থাকে; কারণ, শ্রীভগবান্ যে সচ্চিদানন্দ একথা নিরীশ্বরবাদী ছাড়া সকলেই স্বীকার করেন। সত্তা বা সৎ বলিতে যাহা বুঝি তাহারই বিকাশ কি Matter নয়? Idea বলিতে যাহা বুঝি তাহাই কি চিৎ-এর পরিচয় দেয় না? আরও এক কথা, যে সকল দার্শনিক ঋষিগণ জীবশক্তি ও মায়া-শক্তি স্বীকার করেন এবং সিদ্ধান্ত করিতেও কুণ্ঠিত হন না, তাঁহাদের মতে জীবশক্তিতে স্বরূপশক্তিগত সৎ ও চিৎ অংশ ব্যক্তভাবে থাকে, আনন্দাংশ অব্যক্তভাবে থাকে এবং মায়াশক্তিতে চিৎ ও আনন্দাংশ অব্যক্তভাবে থাকে এবং সৎ ব্যক্তভাবে থাকে। বস্তুতঃ, স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি একই বস্তুর ব্যক্তাব্যক্তাবস্থা মাত্র। এরিষ্টটল যখন Matter বা জড়কে অব্যক্ত অবস্থা বলেন ও Idea বা ভাবকে ব্যক্তাবস্থা বলেন, তখন আমাদের এই সকল হিন্দুদার্শনিক ঋষিগণের সিদ্ধান্তের কথা মনে পড়ে। এরিষ্টটল-দর্শন আলোচনায় হিন্দুদর্শনের কথা কাহারও নিকট অপ্রাসঙ্গিক

মনে হইতে পারে, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য এরিষ্টটল-দর্শনালোচনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মতামতের সহিত প্রাচীন আর্য্যঋষিদের মতামতের সাদৃশ্য আলোচনা করা। আশা করি সুধী পাঠকবর্গ অপরাধ লইবেন না।

কোন একটী উদ্দেশ্যসাধন করিতে হইলে শক্তি বা Force এর প্রয়োজন। সেই শক্তির বলেই Matter Ideaয় উপনীত হয়। এই কারণে এরিষ্টটল গতি বা শক্তির অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বাহ্যজগতের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, একই পদার্থে যুগপৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা বর্ত্তমান। শিশুর তুলনায় বালক ব্যক্তপদার্থ কিন্তু যুবকের তুলনায় তাহাকেই আবার অব্যক্ত বলিতে হয়। যেখানে পরিণাম আছে—অভিব্যক্তির সম্ভাবনা আছে—সেখানেই এই নিয়ম বর্ত্তমান, সেখানেই যুগপৎ Matter এবং Idea অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থার মিলন। অপূর্ণ পদার্থেরই পূর্ণতাপ্রাপ্তি হইতে পারে, অনভিব্যক্ত বস্তুরই অভিব্যক্তি সম্ভব। সুতরাং মূলতত্ত্ববস্তু Idea মাত্র, সেখানে Matter-এর সংস্পর্শও ঘটিতে পারে না। মূলবস্তু যদি অপূর্ণ হইতেন তবেই তার পূর্ণতার দিকে গতি সম্ভব হইত।' কিন্তু মূলবস্তু অপূর্ণ হইলে তাঁহাকে আর মূলবস্তু বলা যায় না; সুতরাং তাঁহাকে Immaterial বা অজড় বা শুদ্ধ-চৈতন্যময় বলিতেই হইবে। Matter বলিতে এরিষ্টটল অপূর্ণ বা অব্যক্ত অবস্থাকেই বুঝাইয়াছিলেন এবং সেই Matter-এর চরম পরিণতি Idea. সুতরাং মূলবস্তুতে Matter এবং Idea একীভূত; কারণ, Matter সেখানে তার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া Ideaর সহিত এক হইয়া পড়িয়াছে। বেদান্ত বলেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," গীতায় উক্ত হইয়াছে—"বাসুদেব সর্ব্বম্। সেই ব্রহ্মের অনুভূতি যাঁহার হইয়াছে তিনিই ঐ সত্য উপলব্ধি করেন, তিনিই দেখেন Matter এবং Idea এক হইয়া গিয়াছে—জড় বলিতে আর কিছুই নাই, জড়ও চৈতন্য হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক কি তাহাই নয়? যাহাকে আমরা অচেতন বা জড় বলি একটু বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে কি তাহাতেই চৈতন্যের পরিচয় পাই না? বৃক্ষলতাকে সাধারণে জড় পদার্থই বলিত, কিন্তু বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানালোকে সাধারণের সে

ধারণা ক্রমশঃ দূর হইয়া যাইতেছে। প্রাচীন ঋষিগণের যোগবলের কথা ছাড়িয়া দিন, সহজ স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাঁহাদের নিকট যে সকল তত্ত্ব প্রতিভাত হইত, আমরা শ্রদ্ধা বিশ্বাস হারাইয়া শুধু যে সেই সকল বিষয়ে অজ্ঞ সাজিয়া আছি তাহা নহে, আমাদের সহজ দৃষ্টিও লোপ পাইতে বসিয়াছে—সহজ কথা বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে হয়।

আমরা দেখিতে পাই, বীজ বৃক্ষাকারে পরিণত হয় আবার বৃক্ষ হইতে বীজ উৎপন্ন হয়। কোন শক্তিমান্ ব্যতিরেকে কোন শক্তি থাকিতে পারে না। অন্য কথায়, অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত হইবার পক্ষে শক্তি বা শক্তিমানের সাহায্য প্রয়োজন। মূলপদার্থ যদি অব্যক্ত পদার্থ হইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে ব্যক্ত করিবার জন্য কোন শক্তিমানের প্রয়োজন হইত। কিন্তু সে কথা স্বীকার করিলে তাঁহাকে আর মূল-পদার্থ বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। সুতরাং (এরিষ্টটল বলেন) মূলপদার্থ অব্যক্ত পদার্থ নয়, অপূর্ণ বস্তু নয়। অসৎ হইতে সৎ-এর উৎপত্তি হয় না—একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। তাই এরিষ্টটল বলেন, জগৎ যে আদিম অবস্থায় বিশৃঙ্খলভাবে ছিল এরূপ মনে করা অযৌক্তিক; কারণ, তাহা হইলে মূল বস্তুতে অপূর্ণতা দোষ আসিয়া পরে। সেই মূলতত্ত্ব-বস্তুই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের Motive বা Force, Form বা Efficient এবং Final cause.

গতি বলিতেই শক্তিমানের অপেক্ষা করে। মূলপদার্থ শক্তিমান্ না হইলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গতি সম্ভব হইত না। গতির কারণ শক্তি, শক্তির কারণ শক্তিমান্—এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হইলে অনবস্থা দোষ আসে; কারণ, একটী শক্তির কারণ অপর একটী শক্তি এবং তাহার কারণ তৃতীয় শক্তি স্বীকারে কোন স্থলেই বিশ্রাম করিবার অবসর থাকে না।

তিনি অর্থাৎ মূলতত্ত্ববস্তু শক্তিমান্—কিন্তু তিনি কি গতিশীল? প্রতীয়-মান জগৎ যেমন নিয়তগতিশীল তিনিও কি তাহাই? একথা স্বীকার করিলে এ পর্য্যন্ত যাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে সমস্তই খণ্ডিত হইয়া পড়ে। তবে তিনি কি শক্তিমান্ নহেন? এ কথা বলাও অযৌক্তিক হইবে। তিনি শক্তিমান্ হইয়া গতিহীন। চুম্বক যেমন নিজে স্থির থাকিয়া লৌহের গতি

জন্মায় সেইরূপ তিনিও নিজে স্থির থাকিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ত পরিবর্ত্তন করাইতেছেন; শুধু তাহাই নয়—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি স্থির, অচঞ্চল, অপরিণামী। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে তাঁর সম্বন্ধে সুখদুঃখ, ভালমন্দ, কোন বিশেষণই প্রযোজ্য নহে। তিনি পূর্ণানন্দ—কারণ, তাঁর কোনই অভাব নাই।

আমাদের জ্ঞান ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতেছে; যেটী অব্যক্ত ছিল সেটী ব্যক্ত হইতেছে। আগন্তুক কোন জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই—যাহা একেবারেই আগন্তুক তাহার কোন জ্ঞান হইতে পারে না। আমরা যখন কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করি তখন প্রথমতঃ একটী প্রতীতি (perception) হয়, এবং তারপর অনুভূতি (conception) হয়। Perception বা প্রতীতি অনেক স্থলে ইন্দ্রিয়কে দ্বার করিয়াই হইয়া থাকে। আমাদের জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় পৃথক্, অর্থাৎ আমি জ্ঞাতা ও বিষয়টী জ্ঞেয়রূপে আমার নিকট পৃথক্‌ভাবে প্রতীয়মান্ হয় এবং জ্ঞানের সাহায্যে উভয়ের ঐক্য সংঘটিত হয়। অন্য কথায়, আমার জ্ঞানের যে অংশ অব্যক্ত ছিল তাহাই ব্যক্ত হয়। আমাদের জ্ঞান যে কোন কারণেই হউক পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানেরই আবার কতকাংশ অব্যক্ত। কিন্তু মূলতত্ত্ববস্তু অপরিচ্ছিন্ন এবং তিনি চৈতন্যময়। সুতরাং তাঁর জ্ঞান কোন অংশে আবরিত নয়। তিনি স্বয়ম্প্রকাশ পূর্ণজ্ঞান—কারণ, তার কোন অংশই অব্যক্ত নহে। তিনি পূর্ণজ্ঞান—তাই তিনি আত্মধ্যানে নিমগ্ন। এরিষ্টটল বলেন, জীব সেই পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ মূলবস্তুর ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

তিনি যে শুধু জগতে আছেন তাহা নয়, তিনি জগদতীতও বটেন। জগতের মধ্যে নিয়মরূপে তাঁর প্রকাশ দেখিতে পাই, জগতের বাহিরে তিনি নিয়মকর্ত্তারূপে বর্ত্তমান। জগতে যে শৃঙ্খলা দেখি তাহার কারণ—মূলতত্ত্ববস্তু এক এবং তিনি চৈতন্যময়। তিনি সত্যরূপে জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তিনি চৈতন্যরূপে ইহার শৃঙ্খলা সাধন করিতেছেন এবং আনন্দরূপে জগৎকে আপনার অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন।

৺দ্বারকাধাম ও কয়েকটি তীর্থদর্শন।

(শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দাস)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি).

ডাকোর ত্যাগ করিয়া আমরা শুক্রবার মরটাকা উদ্দেশে যাত্রা করি এবং রবিবার প্রত্যুষে তথায় উপস্থিত হই। এখান হইতে সাত মাইল দূরে মান্ধাতা গ্রামে বিন্ধ্যপর্ব্বতের উপর দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম 'ওঁকারেশ্বর' বিদ্যমান। তাঁহারই দর্শনমানসে আমরা তথায় যাইতেছি। ষ্টেশন হইতে মান্ধাতায় যাইবার জন্য গরুর গাড়ী ও টাঙ্গা পাওয়া যায়; ভাড়া সামান্য। আমরা গরুর গাড়ী করিয়া বেলা ১০টার সময় নর্ম্মদা তীরে গ্রামমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহা ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত নিমার জেলায় অবস্থিত। গ্রামটি প্রকৃতপক্ষে তিন ভাগে বিভক্ত; কিয়দংশ নর্ম্মদার দক্ষিণতটে বিন্ধ্যগিরির উপর এবং অপরাংশ বাম তটে ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের উপর। বিন্ধ্যপর্ব্বতের উপর যে অংশ তাহার নাম শিবপুরী এবং এইখানেই ওঁকারনাথের মন্দির বিদ্যমান। ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের উপরের অংশ দুইভাগে বিভক্ত; একভাগের নাম বিষ্ণুপুরী এবং অপর ভাগের নাম ব্রহ্মাপুরী। আমাদের শিবপুরীতে বাসা লইবার ইচ্ছা ছিল কারণ এখানকার দর্শনীয় যাহা কিছু তাহার অধিকাংশই ঐ পারে। কিন্তু আমাদের মালপত্র অনেক থাকায় নৌকায় পারাপারের অসুবিধা হইবে ভাবিয়া আমরা ব্রহ্মাপুরীতেই বাসা লইলাম। বাসাগুলি সব মেটে দোতলা। এখানে প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি খুব ধূমের সহিত মেলা হয়। আমরা যখন এখানে আসি তখন সেই মেলা ভাঙ্গিয়া গেলেও কিছু ভীড় ছিল। এই জন্য খুব মনোমত বাসা পাওয়া গেল না।

প্রথমতঃ স্থানটির পৌরাণিক পরিচয় প্রদান করিব। পুরাকালে

কোন সময়ে তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে দেবর্ষি নারদ বিন্ধ্যপর্ব্বতে আগমন করেন। বিন্ধ্য যথাবিধি তাঁহার অতিথিসৎকার করিলেন। ইতিপূর্ব্বে নারদ শুনিয়াছিলেন যে, বিন্ধ্য "আমাতে সব আছে কিছুরই অভাব নাই" এই বলিয়া অহঙ্কার করিতেন। কিন্তু এক্ষণে সেই কথার সত্যতায় সন্দিহান হইয়া তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বিন্ধ্য দীর্ঘনিঃশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "বিন্ধ্য! তোমার অহঙ্কার সত্য নহে, কারণ মেরু তোমা অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া দেবগণ তোমাতে বাস না করিয়া তথায় বাস করেন।" নারদ প্রস্থান করিলে বিন্ধ্যের মনে বড় ক্ষোভ উপস্থিত হইল এবং এই অভাবের প্রতিকারের জন্য তিনি দেবাদিদেবের শরণাপন্ন হইলেন। নিরন্তর ছয় মাস কাল তাঁহার ধ্যান করিলে শিব প্রসন্ন হইয়া প্রকট হইলেন এবং তাঁহাকে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। বিন্ধ্য কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "প্রভো! কৃপা করিয়া আমাকে ইচ্ছামত শরীর-বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা প্রদান করুন, এবং শাস্ত্রবর্ণিত আপনার জ্যোতির্ম্ময় ওঙ্কাররূপ প্রদর্শন করান।" মহাদেব তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন। তখন সিদ্ধ ও দেবগণ মহাদেবের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শন করিতে আসিলেন এবং ঐ রূপে তথায় তাঁহাকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহাদেব তাহাতে সম্মত হইলেন এবং ঐ মূর্ত্তির নাম হইল 'ওঁকারেশ্বর'। যাহা-হউক, অতঃপর বিন্ধ্য তাঁহার অভাব পূরণের নিমিত্ত প্রত্যহ নিজ অঙ্গ বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন। আকাশমার্গ অবরুদ্ধ হইল; মর্ত্ত্যে সূর্য্যালোক প্রবেশের পথ বন্ধ হইল। তখন মুনি ঋষিগণ জগতের কল্যাণের নিমিত্ত বিন্ধ্যগুরু অগস্ত্যের নিকট গমন করিয়া ইহার প্রতিকারের জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি ইহাতে স্বীকৃত হইয়া মনে মনে উপায় স্থির করতঃ শিষ্যের নিকট গমন করিলেন। বিন্ধ্য গুরুদেবকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে তিনি প্রস্থানোদ্যত হইয়া তাঁহাকে আদেশ করিলেন, "বৎস, যাবৎ আমি ফিরিয়া না আসি তাবৎ তুমি এই অবস্থায় থাক।" এই বলিয়া তিনি দক্ষিণ দেশে গমন করিলেন এবং পুনরায় আর বিন্ধ্যের নিকট ফিরিয়া আসিলেন না।

বিন্ধ্য গুরুবাক্য অবহেলা করিয়া আর মস্তকোত্তোলন করিতে পারিলেন না—চিরকালের জন্য ছোট হইয়া রহিলেন।

প্রথমেই আমরা বিষ্ণুপুরীতে গিয়া নারায়ণের মন্দির দর্শন করিলাম। মন্দিরটি বেশ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন; এবং নর্ম্মদার বাঁধান ঘাটের উপরই অবস্থিত। মন্দিরমধ্যে নারায়ণ মূর্ত্তি বিরাজিত। অতঃপর আমরা আমাদের বাসার কিছু পশ্চাতে অমরেশ্বর মহাদেবের মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। এই মন্দিরটি বড় হইলেও পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন নহে। মন্দিরে অমরেশ্বর লিঙ্গমূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কয়েকটি মূর্ত্তিও বিরাজিত আছে। প্রত্যহ প্রাতে এখানে ১৩০০ মৃৎ-শিবলিঙ্গ নির্ম্মিত ও পূজিত হইয়া থাকে। এই মন্দিরের পশ্চাতে ব্রহ্মাপুরী। ২।৩টি ছোট ছোট মন্দির ব্যতীত এখানে দেখিবার আর কিছুই নাই। সন্ধ্যার সময় আমরা নর্ম্মদাতটে পর্ব্বতের উপর আসিয়া উপবেশন করিলাম। উভয়পার্শ্বে গগনস্পর্শী হরিদ্বর্ণ পর্ব্বত মধ্যে কুল কুল রবে প্রবাহমানা সরিদ্বরা নর্ম্মদা! সে দৃশ্য যে কত মনোরম তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এখানে কিছুক্ষণ বসিলে স্বতঃই প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। বাস্তবিকই এই স্থান সাধনার অনুকূল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পর্ব্বতগুহা মধ্যে অনেক তপঃপরায়ণ সাধু বাস করেন। গুহাগুলির মধ্য হইতে ক্ষীণ দীপালোক সন্ধ্যার সময় বড় সুন্দর দেখায়। স্থানীয় লোকে নর্ম্মদাকে গঙ্গা অপেক্ষা পবিত্রতরা মনে করে; তাহারা বলে গঙ্গায় স্নান করিলে যে ফল নর্ম্মদা দর্শনমাত্রেই সেই ফল হয়। এমন অনেক সাধু আছেন যাঁহারা নর্ম্মদা পরিক্রমণকেই মহা তপস্যা মনে করেন; তাঁহারা চিরজীবন কখন নর্ম্মদা তীর পরিত্যাগ করেন না। শুনা যায়, প্রতিবৎসর প্রায় ৩০০ সাধু নর্ম্মদা পরিক্রমণ করিয়া থাকেন। এই পবিত্র নর্ম্মদাতীরে সান্ধ্যক্রিয়াদি সমাপন করিয়া আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রত্যুষেই আমরা অপরপারে শিবপুরী দর্শন করিতে যাই। যাত্রী পার করিবার জন্য নৌকা প্রভাত হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত পারাপার করিতেছে। শিবপুরীই যথার্থ মান্ধাতা গ্রাম। ইহা ছোট বটে—তবে ব্রহ্মাপুরী বা বিষ্ণুপুরী অপেক্ষা অনেক বড়। নর্ম্মদা হইতে ৫০।৬০ ফুট

উচ্চে বিন্ধ্যের পার্শ্বদেশের কিছু উচ্চে লম্বালম্বি ভাবে এই গ্রাম অবস্থিত। নদীর সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত একটি রাস্তার দুই দিকে দুই সারি দোতলা বাটী আছে। নিচের ঘরগুলিতে দোকান বা বাজার, এবং উপরের ঘর-গুলিতে অধিবাসীদিগের বাস। আমরা নর্ম্মদার পূজা দিয়া স্নান করিলাম। নর্ম্মদা কি মৎস্যবহুল নদী। কিছু ছোলাভাজা ছড়াইয়া দিলে হাজার হাজার বড় বড় মৎস্য আসিয়া উপস্থিত হয়—এমন কি, ৮।১০ সের ওজনের মাছ পর্য্যন্ত! সে যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার—হৃষিকেশের গঙ্গায় যেরূপ সেই রকম। কিছুক্ষণ মাছের খেলা দেখিয়া আমরা ওঁকারনাথের পূজা করিতে গেলাম। ঘাটের কিছু উপরেই মন্দির। ইহা নিতান্ত ছোটও নহে, খুব বড়ও নহে। ইহার উচ্চতা কম না হইলেও পর্ব্বতের ঢালুগায়ে নির্ম্মিত হওয়াতে দূর হইতে ইহাকে উচ্চ বলিয়া বোধ হয় না। ইহা দুইতলে বিভক্ত, উপরকার তলে ওঁকারের সাক্ষীমূর্ত্তি ও নিম্নতলে ওঁকারনাথ, ভগবতী, গণেশ, নন্দী প্রভৃতি বিরাজিত। নাটমন্দিরের সম্মুখে একটি ছোট ঘরে ভগবতীর মূর্ত্তি এবং তাঁহার দক্ষিণ দিকে আর একটি ঘরে ওঁকার জ্যোতির্লিঙ্গের মূর্ত্তি আছে। লিঙ্গমূর্ত্তিটি ছোট এবং সুগঠিত নহে। ইঁহার একস্থান হইতে একটু একটু জল চোঁয়াইতেছে—দেখিয়া মনে হয় লিঙ্গটির সহিত কোন প্রস্রবণের সংযোগ আছে। মন্দিরের পাশের একটি মহলে পূজারী-গোঁসাইগণ বাস করেন। প্রাচীনকালে ওঁকারনাথের জন্য নরবলির বন্দোবস্ত ছিল, এই জন্য তখন যাত্রিগণ এখানে বড় আসিত না। ১৮২৪ সাল হইতে ইংরাজেরা সে প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন।

গ্রামটির নাম মান্ধাতা কেন হইল তাহা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। স্থানটির খুব প্রাচীন নাম ছিল বৈদূর্য্যশৈল; পরে সূর্য্যবংশীয় রাজা মান্ধাতা এখানে আসিয়া রাজবাটী নির্ম্মাণ করেন এবং নিজ নামানুসারে ইহার নাম পরিবর্ত্তন করেন। মন্দির হইতে কিছু উপরে উঠিলে একটি প্রাসাদ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই মান্ধাতার রাজবাটী বলিয়া কথিত হয়। মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ এই স্থানটি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ বলিয়া এখান হইতে ৭।৮ মাইল পশ্চিমে নদীতীরে মাহিষ্মতী পুরী স্থাপন করেন। সূর্য্যবংশীয়গণ এই স্থান ত্যাগ করিলে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ইহাকে তাঁহার রাজধানী করেন। ইদানীন্তন

কালে ইন্দোররাজগণের রাজ্যপাট কিছুকাল এখানে ছিল। এখনও মাহিষ্মতীপুরে অহল্যা বাইর কেল্লা ও অন্যান্য কয়েকটি কীর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। মান্ধাতা গ্রামটির চারিদিকে ২।৩ মাইল পর্য্যন্ত যে সকল হর্ম্ম্য ও দেবায়তনাদির ভগ্নস্তূপ রহিয়াছে তাহা দেখিলে মনে হয় যে, এক কালে এই গ্রাম অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল; বিধর্ম্মিগণের অত্যাচারই নাকি ইহার শ্রীহীনতার কারণ। ইহার বর্ত্তমান অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মন্দির হইতে নর্ম্মদার তীর দিয়া আন্দাজ দুই মাইল পশ্চিমোত্তর দিকে যাইলে কাবেরী নামক এক ক্ষীণকায়া নদীর সহিত নর্ম্মদার সঙ্গম দেখিতে পাওয়া যায়। পবিত্রস্থানে অনেক যাত্রী এখানে স্নান করেন। দুই একটি মন্দিরও এখানে আছে। সঙ্গমস্থল হইতে পাহাড়ের উপর উঠিলে রামানুজ সম্প্রদায়ের বেশ একটি বড় মঠ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। এখান হইতে প্রায় আধমাইল পূর্ব্ব-দিকে আসিলে মুচুকুন্দের কেল্লার ভগ্নস্তূপ। তথা হইতে একটু পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে যাইলে গৌরী-সোমনাথের ভগ্ন মন্দির। ঐ দিকে আরও দুই মাইল অগ্রসর হইলে সিদ্ধেশ্বরের অতি সুন্দর মন্দির। ইহা দেখিবার জিনিষ বটে—কিন্তু এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত। এখানে আসিবার পথটুকু রাশি রাশি ভগ্নস্তূপে পরিপূর্ণ; তাহা দেখিলে মনে বড় কষ্ট হয়। এই স্থানের প্রায় এক মাইল পূর্ব্বে নর্ম্মদা হইতে এক শাখানদী বহির্গত হইয়াছে। সেই স্থানে কয়েকটি ভাল মন্দির আছে। তথা হইতে আরও একটু অগ্রসর হইলে একটি নালা দেখিতে পাওয়া যায়; উহার নাম রাবণ নালা। এই নালার মধ্যে প্রায় দ্বাদশ হস্ত উচ্চ কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত দশহস্ত-একমুণ্ডবিশিষ্ট রাবণ মূর্ত্তি আছে। মাহিষ্মতীপুরাধীপতি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া রাবণ এইখানে নাকি শিবপ্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।

ওঁকারজীর পর আমরা মহাকাল দর্শনের জন্য উজ্জয়িনী যাত্রা করি। মরটাকা হইতে উজ্জয়িনী অধিক দূর না হইলেও মাঝে ফতেবাদ নামক স্থানে গাড়ী বদল করিতে হয়। আমরা রাত্রি ১১ টার সময় মরটাকা

ত্যাগ করিয়া ভোর ৫টার সময় উজ্জয়িনী আগমন করি। প্রভাস হইতে আসিবার সময় আমাদের স্বদেশবাসী এক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হয়। তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন যে উজ্জয়িনীতে মাধো কলেজে এক বাঙ্গালী শিক্ষক আছেন, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি সব বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সাধারণে তিনি "ব্যানার্জ্জি বাবু" নামে পরিচিত। সমগ্র উজ্জয়িনী তাঁহাকে ঐ নামে চেনে। গাড়ীতে উঠিয়া ব্যানার্জ্জি বাবুর বাড়ী চল বলিলেই হইল, কোন ঠিকানা বলিবার আবশ্যক নাই। উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইয়া আমরা ষ্টেশনে জিনিষপত্র সমস্ত রাখিয়া দুই জন মাত্র ব্যানার্জ্জি বাবুর সন্ধানে চলিলাম। তাঁহার বাসা ষ্টেশনের খুব নিকটে, মাধো কলেজের সম্মুখে। তিনি বাটীর বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন; আমাদের কি প্রয়োজন তাহা শুনিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ ষ্টেশনে আসিয়া দুইখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া সকলকে সিন্ধিয়ারাজের ধর্ম্মশালায় লইয়া চলিলেন। ইহা ষ্টেশন হইতে ৭।৮ মিনিটের পথমাত্র। তথায় ধর্ম্মশালার রক্ষককে ডাকাইয়া আমাদের জন্য ৩টী ঘরের বন্দোবস্ত করাইয়া দিলেন। জিনিষপত্র সমস্ত সেখানে গোছান হইলে, তিনি আমাদের একজনকে লইয়া বাজারে গেলেন ও আবশ্যক দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিয়া দিলেন। আমরা যে কয়দিন সেখানে ছিলাম তিনি এইরূপে আমাদের সাহায্য করিয়াছিলেন—যেথায় যাইতাম, তিনি সঙ্গে যাইতেন, এবং নিজে না পারিলে অপর কাহাকে পাঠাইয়া দিতেন। শুধু আমাদের নহে, বাঙ্গালী যে কেহ এখানে আসেন তাঁহাদের সকলকেই তিনি এইরূপ যত্ন করেন। তাঁহার সৌজন্য ও পরোপকারিতা সকলেরই অনুকরণীয়।

আমরা যে ধর্ম্মশালায় উঠিলাম তাহা একটি প্রকাণ্ড দ্বিতল সৌধ—যেন একটি রাজপ্রাসাদ। বড় বড় ঘর—সুন্দর পাথরের মেঝে, বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, পরিষ্কার রন্ধনশালা। সমস্ত ঘরে বৈদ্যুতিক আলোক। জলের কোন অভাব নাই; অনেক কল, তাহাতে দিন রাত জল থাকে। আবার সাধুসন্ন্যাসীকে প্রত্যহ ধর্ম্মশালা হইতে ভোজ্যদান করা হয়। এখানে সর্ব্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। বাস্তবিক ইহা বড়ই আরামপ্রদ—এই প্রকার ধর্ম্মশালা ভারতের কোথাও দেখি নাই।

উজ্জয়িনী সহর প্রাচীন মালবরাজ্যের সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী এবং সিপ্রা নদীতটে অবস্থিত। পৌরাণিক যুগে ইহার নাম ছিল অবন্তী। দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত লিখিত ইতিহাস সমূহে ইহা অবন্তী বলিয়া বর্ণিত আছে। ইহা ভারতের সপ্ত মোক্ষদায়িকা নগরী সমূহের অন্যতম। স্থানটি আরও বিখ্যাত হইবার কারণ এই যে এখানে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম মহাকাল আছেন এবং ইহা ৫১ মহাপীঠের মধ্যে একটি মহাপীঠ। বাস্তবিক পক্ষে বারাণসী ব্যতীত এইরূপ সংযোগ আর্য্যাবর্ত্তের অন্য কোন নগরীতে নাই। ইহাই উজ্জয়িনীর বিশেষত্ব। কিন্তু বর্ত্তমান উজ্জয়িনী প্রাচীন অবন্তী নহে। অবন্তী এখন (সম্ভবতঃ ভূমিকম্পে) ভূগর্ভে প্রোথিত এবং তদুপরি বনস্থলী বিরাজিত। ৮।১০ হাত খুঁড়িলে প্রাচীন সহরের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কোন কোন সময়ে বর্ষায় মাটির এক স্তর ধুইয়া গেলে নানাপ্রকারের প্রস্তর অলঙ্কার ও প্রাচীন দ্রব্যাদি বাহির হইয়া পড়ে। এই জন্য এখানকার লোকে ঐ স্থানকে "রোজগারকা সদাবরত" বলিয়া থাকে। বর্ত্তমান উজ্জয়িনী ইহার ২ মাইল উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত। প্রাচীনকালে এই স্থান ৺কাশীর ন্যায় বিদ্যাচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। হিন্দু ভৌগোলিকগণ এখান হইতে যামোত্তর বৃত্ত (Meridian) কল্পনা করেন। বিক্রমাদিত্যের সময় এখানে মানযন্ত্র ছিল। মোগলরাজ বাবর ঐ যন্ত্রের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখন উহা মহারাজ জয়সিংহ-প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রমহল সহরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত আছে; কিন্তু তাহার অবস্থা অতি শোচনীয়। বর্ত্তমান উজ্জয়িনী সহরটি মন্দ নহে। এখানে অনেক লোকের বাস; বহু দোকান পসারি, বাজার, স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি আছে; এখানকার চন্দন কাষ্ঠের চিরুণি ও আতর প্রসিদ্ধ।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বৈকালে আমাদিগকে মাধো কলেজ দেখাইলেন। কর্ত্তৃপক্ষের দুই এক জনের সহিত আমাদের আলাপও করাইয়া দিলেন। এখন কলেজটি স্কুলে পরিণত হইয়াছে। যেরূপ সুবন্দোবস্তে বিদ্যালয়টি পরিচালিত দেখিলাম তাহাতে বোধ হইল কলিকাতার কোন স্কুল (গবর্ণমেণ্ট বা প্রাইভেট) তাহার সমকক্ষ নহে। তাহার পর আমরা

অঙ্কপাত তীর্থ দেখিতে চলিলাম। উহা ধর্ম্মশালা হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে—সহর অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। এই হেতু ২ খানি টোঙ্গা ভাড়া করিলাম। এখানকার টোঙ্গাগুলি বেশ ভাল ও শস্তা। সিপ্রাতটে দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট এই তীর্থ। ইহার অপর নাম 'সান্দিপনী মুনির আশ্রম'। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাঁহাদের শিক্ষাগুরু সান্দিপনী মুনির নিকট এই আশ্রমে থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করেন। এখানে বিষ্ণুর বিশ্বরূপ ও সান্দিপনী মুনির মূর্ত্তি আছে। বৈষ্ণবগণ এই স্থানটি অতি পবিত্র জ্ঞান করেন। মন্দিরগুলির অবস্থা ভাল না হইলেও মন্দ নহে। স্থানটি খুব নির্জ্জন। এখান হইতে কিছুদূর যাইলে অনন্তনারায়ণের মন্দির। অতঃপর আমরা সহরের প্রধান প্রধান স্থানগুলি দেখিতে দেখিতে বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়াই আমরা সিপ্রার অপর পারে অবস্থিত ভৈরবগড়ে সিদ্ধনাথের মন্দির দর্শন করিতে যাই। এই স্থানটি এখানকার মধ্যে খুব বিখ্যাত। বহু সাধু ফকির এখানে থাকেন। সিদ্ধনাথের ঘাটটি বেশ। সিপ্রাও নর্ম্মদার ন্যায় কচ্ছপ ও মৎস্যবহুল নদী। কিছু আটা কিনিয়া আমরা ছড়াইতে লাগিলাম—আর দলে দলে বড় বড় মৎস্য আসিয়া খাইবার জন্য লাফালাফি করিতে লাগিল। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, এই ঘাটে কখন কখন অর্দ্ধনারী-অর্দ্ধমৎস্য মূর্ত্তি দেখা যায়। এখানে গোয়ালিয়র রাজের জেলখানা আছে। ইহার নিকটে কালভৈরবের মন্দির।

এখান হইতে সিপ্রার এই পারে আসিয়া মহাকালী বা অবন্তীদেবীর মন্দির দর্শন করি। ইহা ৫১ মহাপীঠের অন্যতম ; এখানে সতীর উপরৌষ্ঠ পতিত হয়। মায়ের রূপ অতি ভীষণ। দূরত্বের জন্য এখানে অধিক যাত্রী আসে না। এখান হইতে কিছু দূরে ভর্তৃগুহা। ইহা ভূগর্ভ-নিহিত অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন মনুষ্যনির্ম্মিত একটি বৃহৎ গুহা ; কয়েকটি পাঞ্জাবী গোঁসাই এখানে থাকেন। তাঁহারা একটি আলোকের সাহায্যে গুহার সমস্ত স্থান আমাদিগকে দেখাইলেন। বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ভর্তৃহরি এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। এইস্থানে এখনও তাঁহার আসন

রহিয়াছে এবং উহা প্রত্যহ পূজিত হইয়া থাকে। এখান হইতে আমরা সহরের নিকটস্থ রামঘাটে আসিয়া সিপ্রায় স্নান করি এবং মহাকাল দর্শন করি। মহাকালের মন্দির সুপ্রশস্ত। পূজার্থীরা চতুর্দ্দিকে নানা কার্য্যে ব্যস্ত। ফিরিস্তানামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে মহাকালের মন্দির সোমনাথের মন্দিরের তুল্য। ইহার স্তম্ভসকল স্বর্ণময় ও রত্নখচিত ছিল। গর্ভগৃহের ক্ষীণালোক রত্নগুলিতে প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত। এখন সে সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। মুসলমান সুলতান আলটামাস ১২৩৫ সালে সে রত্নরাজি হরণ করিয়া মন্দির ধ্বংস করে। বর্ত্তমান মন্দির ১৭৪৫ সালে নির্ম্মিত হয়। আমরা পাণ্ডাঠাকুরের সাহায্যে যথাবিধি পূজা করিলাম। প্রতি সোমবার অতি সমারোহে মহাদেবের পূজা হইয়া থাকে, তখন নানা বেশে সজ্জিত লিঙ্গমূর্ত্তি বড় সুদৃশ্য হয়। এখান হইতে ৫।৭ মিনিটের পথের মধ্যে হরসিদ্ধিদেবীর মন্দির। এই মন্দিরও বেশ বড়। রাজা বিক্রমাদিত্য এই দেবীর সম্মুখে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। ইহার নিকটে আরও দু'একটি দেব দেবীর মন্দির আছে। এই সব দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিতে প্রায় ১২টা হইয়া গেল।

উজ্জয়িনী শুধু হিন্দুদের তীর্থ নহে। জৈন ও বৌদ্ধগণও ইহাকে অতি পবিত্র বলিয়া গণনা করেন। এই স্থানে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৩ অব্দে শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী জৈনগণের মধ্যে বিবাদ হয় এবং তাঁহারা পরস্পর পৃথক্ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন। এখানে বৌদ্ধগণের এক বিখ্যাত মঠ ছিল এবং বুদ্ধদেবের এক প্রধান শিষ্য কচ্ছপ এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

উজ্জয়িনীতে আসিলে নিম্নোক্ত কয়টি স্থানও দেখিয়া যাওয়া উচিত, যথা :—রণজি সিন্ধিয়ার ছত্রী, দৌলতরাও সিন্ধিয়ার রাজপ্রাসাদ, রাণা খাঁর বাগান, মৌলানা সাহেবের কবর এবং কালিয়দি। শেষোক্ত দ্রষ্টব্যটি সহর হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত সিপ্রামধ্যস্থ একটি দ্বীপের উপর বিরাজিত একটি জলপ্রাসাদ। ইহার নির্ম্মাণকৌশল অতি চমৎকার। তীর হইতে একটি ছোট সেতু এই দ্বীপ পর্য্যন্ত গিয়াছে। কালিদাসের ঋতুসংহারে নাকি ইহার বর্ণনা আছে। এই কালিয়দি এক ব্যক্তি দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই

বলিয়া অনুমিত। ভিন্ন ভিন্ন নৃপতি কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ইহা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

উজ্জয়িনী দর্শন সাঙ্গ করিয়া আমরা রাজস্থানের মুকুটমণি চিতোরনগরী দেখিতে যাই। রাজপুতনা-মালওয়া রেলে দিল্লীর পথে কিছু দূর আসিলেই চিতোরগড় ষ্টেশন। ইহার খুব নিকটেই প্রশস্ত ধর্ম্মশালা; তথায় থাকিতে কোন কষ্ট নাই। আমরা অতি প্রত্যুষে আসিয়া এই ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করি এবং স্নানাহারাদি করিয়া প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় চিতোর দেখিতে যাই।

চিতোর ধর্ম্মশালা হইতে দুই মাইল পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। নগরীর নিকট দিয়া একটি ক্ষুদ্রকায়া নদী প্রবাহিত। একটি প্রস্তরনির্ম্মিত সেতু দ্বারা নদী পার হইয়া নগরীতে প্রবেশ করিতে হয়। উহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মহারাণাগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বর্ষা ভিন্ন অন্য কালে নদীতে জল খুব কম থাকে এই জন্য তখন হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। নগরটি ছোট হইলেও মন্দ নহে। বাড়ীগুলি সব পাথরের এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১০,০০০ হইবে। এখানে স্কুল, হাঁসপাতাল, বাজার প্রভৃতি আছে। পূর্ব্বকালে এখানে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত করিবার জন্য টাকশাল ছিল। সহরের পূর্ব্বাংশে বিখ্যাত চিতোরগড়। পার্শ্ববর্ত্তী সমতল ক্ষেত্র হইতে প্রায় ৫০০' ফিট উচ্চ একটি খাড়া পাহাড়ের উপর এই গড় অবস্থিত। সহর হইতে গড়ে উঠিবার পথ ধীরে ধীরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপর দিকে উঠিয়া গিয়াছে। পথটি বেশ প্রশস্ত; গরুর গাড়ী অনায়াসে উপরে উঠিতে পারে। রাস্তার এক পার্শ্বে পর্ব্বতগাত্র অপর পার্শ্বে প্রায় ছয় হাত প্রশস্ত উন্নত প্রাচীর। প্রাচীরের উপর দিয়াও উঠিবার বেশ পথ আছে। এক এক করিয়া সাতটি ফটক পার হইয়া তবে দুর্গের উপরে পৌঁছাইতে হয়। ইহার মধ্যে নীচেকার দুইটি ফটকের নিকট মহারাণার:ফৌজ আছে; তাহাদের নিকট ছাড়পত্র লইয়া তবে উপরে উঠিতে হয়। উঠিবার পথে মেবারের স্বাধীনতা-রক্ষার্থে-আত্মোৎসর্গকারী বিখ্যাত বীরপুরুষগণের স্মরণার্থ বহু প্রস্তরস্তম্ভ প্রোথিত দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকে পবিত্রজ্ঞানে সেইগুলির গাত্রে সিন্দুর মাখাইয়া রাখিয়াছে। পথিমধ্যে এক স্থানে একটি পুষ্করিণী

আছে, তাহা নানাবর্ণের মৎস্যে পরিপূর্ণ। পর্ব্বতের উপরিভাগ দৈর্ঘ্যে ৩½ মাইল এবং প্রস্থে কোন স্থান অর্দ্ধ মাইলের অধিক নহে। ইহার আয়তন অন্যূন ২০০০ বিঘা হইবে। কোন্ সময়ে এই গড় নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে কিম্বদন্তী এইরূপ যে, মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন ইহার নির্ম্মাতা। গড়ের উপরে ও আশে পাশে ময়ূর সকল স্বচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। এখানে দেখিবার অনেক জিনিষ আছে, এই জন্য স্থানীয় কোন লোককে সঙ্গে আনা উচিত, তাহা না হইলে কোন্‌টি কি তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। পাহাড়ের উপর এক দরজীর বাস। এখন সে-ই guide (প্রদর্শক)-এর কাজ করে। কিছু বক্‌শিস পাইলে সে সব স্থানগুলি দেখাইয়া দেয়। আমরা তাহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই কেল্লার উপরে ১৫৬৭ সাল পর্য্যন্ত মেবারের রাণাগণ বাস করিতেন এবং তদবধি চিতোর তাঁহাদের রাজধানী ছিল। কত প্রাচীন স্মৃতি এবং বীরত্বের অপূর্ব্ব গৌরবকাহিনী বক্ষে লইয়া এই গড় দণ্ডায়মান তাহা ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। এখানে উপস্থিত হইলে, সেই সব অতীত ইতিহাস যেন চক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাণা কুম্ভের বীরত্ব, চণ্ডের আত্মত্যাগ, প্রতাপ সিংহের অমানব তেজস্বিতা প্রভৃতি স্মরণ করিয়া বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে; আবার তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সহিত নিজেদের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া প্রাণে এক গভীর বেদনা ও নৈরাশ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। হায়! কালের কি বিচিত্রা গতি! এই জগদ্বিখ্যাত দুর্গ এখন পরিত্যক্ত—দুই চারিটী কুলী ভিন্ন এখানে কেহ বাস করে না! অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, অশ্বের হ্রেষারব, বন্দী ও চারণগণের স্বাধীনতা-মহিমাব্যঞ্জক গীতি আর এই স্থানকে মুখরিত করে না—তাহার পরিবর্ত্তে এক বিরাট্ নিস্তব্ধতা ও প্রগাঢ় বেদনা হতাশভাবে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া মধ্যে মধ্যে বায়ুর শাঁ শাঁ শব্দের সহিত দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে!

চিতোর নগরীতে কালিকা দেবীর মন্দির, মীরাবাই'র কৃষ্ণমন্দির, অন্নপূর্ণার মন্দির, কুক্কুরেশ্বর মন্দির, শেকলজির মন্দির, নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির, নবলক্ষভাণ্ডার, পদ্মিনীর প্রাসাদ, শিঙ্গার চৌরি ও কুম্ভরাণার জয়স্তম্ভ প্রভৃতি

এখনও বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্তটি চিতোরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দির। ইনিই এক সময়ে প্রকট হইয়া বলিয়াছিলেন "মৈ ভুখা হুঁ"। এই মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সব মন্দিরেই প্রত্যহ রীতিমত পূজাদি হইয়া থাকে। কুম্ভরাণার জয়স্তম্ভ একটি সুদৃশ্য জিনিষ। তিনি গুজরাট ও মালবের সম্মিলিত মুসলমান বাহিনীকে হারাইয়া দিয়া এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। ইহা ১২২ ফিট উচ্চ এবং ৯ তলে বিভক্ত। প্রত্যেক তলে জানালা আছে। ইহার তলদেশের ব্যাস ৩০ ফিট। উপরে উঠিবার সুন্দর সিঁড়ি আছে। সমগ্র স্তম্ভগাত্র সুন্দর ভাস্কর্য্যকার্য্য দ্বারা শোভিত। টড্, ফারগুসন প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইহার কারুকার্য্যের শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন। এখানে জলকষ্ট নাই, কারণ, বহু পুষ্করিণী আছে। সমস্ত স্থানগুলি নিখুঁত ভাবে দেখিতে গেলে তিন চারি দিন সময় লাগে। আমরা একদিনেই যতদূর সম্ভব প্রধান প্রধান স্থানগুলি দেখিয়া রাত্রি ৮ টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। চিতোরগড়ের সুখ্যাতি রাজস্থানের সকল ব্যক্তির মুখেই এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। তাহারা বলে "গড় তো চিতোর গড় আর সব গড়িয়া"। রাণাগণ সূর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া এখনও ভারতে সর্ব্বত্র পূজ্য। রামচন্দ্রের পুত্র কুশ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

অতঃপর আরও কয়েকটি স্থান দর্শনান্তে আমরা দ্বারকা-ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করি। প্রবন্ধ বিস্তৃতির ভয়ে তৎসমুদয়ের আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

(সমাপ্ত)

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

বাসনাক্ষয় প্রকরণ।

(অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এস্থলে এক আশঙ্কা উঠিতেছে যে, বর্ত্তমান দেহের বিনাশের পর বিদেহ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে—একথা অনেকেই বলিয়া থাকেন।

শ্রুতি বলেন—

তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে অথ সম্পৎস্যে ইতি

(ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২)

সেই আচার্য্যবান্ পণ্ডিত মেধাবী অবিদ্যাবন্ধবিনির্মুক্ত পুরুষের (মোক্ষ-প্রাপ্তি বিষয়ে) সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ না (প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া) দেহপাত হয়; তখন (দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই) বিদেহমুক্ত হন।

বাক্যবৃত্তিগ্রন্থে ভাষ্যকার (শঙ্করাচার্য্য) কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে :—

প্রারব্ধকর্ম্মবেগেন জীবন্মুক্তো যদা ভবেৎ।

কঞ্চিৎ কালমথারব্ধকর্ম্মবন্ধস্য সংক্ষয়ে * ॥ ৫২

* বাক্যবৃত্তি-টীকাকার বিশ্বেশ্বর-ধৃত পাঠ কিন্তু এইরূপ। (আনন্দাশ্রম গ্রন্থাবলী—বাক্যবৃত্তি) :—

"কঞ্চিৎকালমনারব্ধকর্ম্মবন্ধস্য সংক্ষয়ে" ইত্যাদি,

এই শ্লোকের টীকার অবতরণিকায় বা আভাষে তিনি লিখিয়াছেন :—"(ভাষ্যকার) এইরূপে (ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে) বিদেহমুক্তির নিষ্ঠা বলিয়া এক্ষণে (এই শ্লোকে) বলিতেছেন যে, ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হইবামাত্রই পুরুষের সমস্ত অজ্ঞান একেবারে বিদূরিত হইয়া যাওয়া অসম্ভব; সেই হেতু সঞ্চিতকর্ম্মের ক্ষয়েই জীবন্মুক্তি হয়। এবং টীকায় লিখিয়াছেন—"পুরুষো যদানারব্ধকর্ম্মবন্ধস্য সংক্ষয়ে জীবন্মুক্তো ভবেৎ তদাপ্রভৃতি প্রারব্ধকর্ম্মবেগেন সহ কর্ম্মফলহেতু-ভোগহেতুভূত-রাগাদিসংসারবাসনালেশেন সহ কঞ্চিৎকালমবতিষ্ঠতে—ইত্যন্বয়ঃ।"

নিরস্তাতিশয়ানন্দং বৈষ্ণবং পরমং পদম্।
পুনরাবৃত্তিরহিতং কৈবল্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ৫৩

(সাধক) যখন জীবন্মুক্ত হন, তখন প্রারব্ধকর্ম্মের বেগ বশতঃ (শরীরে) কিছুকাল অবস্থান করেন। পরিশেষে প্রারব্ধকর্ম্মজনিত বন্ধন সম্যগ্‌রূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তিনি ব্যাপক পরমাত্মার কৈবল্য নামক পরমপদ লাভ করেন। কোন আনন্দই সেই পরমপদের আনন্দের সমকক্ষ নহে এবং সেই পরমপদ লাভ করিলে পুনর্ব্বার সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

ব্রহ্মসূত্রকার (ব্যাস)-ও বলিয়াছেন।—

"ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে"। (ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৯)

(জ্ঞানী) অপর অর্থাৎ আরব্ধফল পুণ্য-পাপ ভোগের দ্বারা ক্ষয় পাওয়াইয়া বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্ত হন (১)।

বসিষ্ঠও বলিয়াছেন :—

জীবন্মুক্তপদং ত্যক্ত্বা স্বদেহে কালসাৎকৃতে।
বিশত্যদেহমুক্তত্বং পবনোঽস্পন্দতামিব ॥ (মু,বা, প্রকরণ, ৯।১৪)

জ্ঞানীর দেহ কালকবলিত হইলে, তিনি জীবন্মুক্তের অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া বায়ুর স্পন্দহীনতা প্রাপ্তির ন্যায় বিদেহমুক্তের অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন।

(সমাধান)—ইহা দোষ নহে। কেননা যাঁহারা 'বিদেহমুক্তি' এই পদটী ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ পদের অন্তর্গত 'দেহ' শব্দের দ্বারা দুইটী ভিন্ন ভিন্ন বস্তু লক্ষ্য করিয়া উক্ত 'বিদেহমুক্তি' পদ ব্যবহার করায়, উহার অর্থ সম্বন্ধে যে দুইটী মত উৎপন্ন হইয়াছে তাহারা পরস্পর বিরোধী নহে। 'বিদেহমুক্তি' এই (সমাসের) মধ্যে যে 'দেহ' শব্দ রহিয়াছে তদ্দ্বারা অনেকেই (বর্ত্তমান ও ভাবী) সকল প্রকার শরীর সমূহকেই বুঝাইবার উদ্দেশ্যে উক্ত পদ ব্যবহার করেন। আমরা কিন্তু কেবল ভাবী দেহ-মাত্রকে (অর্থাৎ বর্ত্তমান দেহনাশের পরবর্ত্তী দেহসমূহকে) লক্ষ্য করিয়া ঐ শব্দের ব্যবহার করিতেছি। কেননা, সেই সকল শরীরই যাহাতে রচিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই জ্ঞানার্জ্জন করা হয়। পক্ষান্তরে বর্ত্তমান দেহ

(১) সঞ্চিতকর্ম্ম জ্ঞানে দগ্ধ হইয়া যায়, প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগদ্বারা ক্ষয় পাইয়া থাকে। অনন্তর তাহার শেষ হইলেই অর্থাৎ দেহপাত হইলেই পরমমোক্ষ কৈবল্য লাভ হয়।

পূর্ব্বেই আরব্ধ হইয়া গিয়াছে, এই হেতু জ্ঞানের দ্বারাও তাহার আরম্ভ নিবারণ করিতে পারা যায় না। আর এই বর্ত্তমান দেহের নিবৃত্তি করাও জ্ঞানার্জ্জনের ফল বা উদ্দেশ্য নহে। কেননা, প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয়ের দ্বারা অজ্ঞানীদিগেরও বর্ত্তমান দেহ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। (যদি বলা যায়) তাহা হইলে 'বর্ত্তমান লিঙ্গদেহের নিবৃত্তিকেই জ্ঞানার্জ্জনের ফল বলনা কেন? কেননা জ্ঞান ব্যতীত সেই লিঙ্গদেহের নিবৃত্তি হয় না।—(তদুত্তরে আমরা বলি,) এরূপ বলিতে পার না, কেননা (দেখা যায়) জীবন্মুক্ত-পুরুষের জ্ঞান হইলেও সূক্ষ্মশরীরের নিবৃত্তি হয় না। যদি বল, প্রারব্ধকর্ম্ম কিছুকাল ধরিয়া জ্ঞানের প্রতিকূলতা করিয়া জ্ঞানকে সূক্ষ্মদেহনিবৃত্তি-বিষয়ে বাধা দিলেও সেই প্রতিবন্ধ বিনষ্ট হইলে পর জ্ঞান লিঙ্গদেহের নিবৃত্তি সাধন করিতে সমর্থ হইবে;—তদুত্তরে বলি, না তাহা ঠিক নহে। কেননা পঞ্চপাদিকা গ্রন্থের আচার্য্য (পদ্মপাদাচার্য্য) প্রতিপাদন করিয়াছেন, "(যেহেতু) জ্ঞান কেবল অজ্ঞানেরই নিবৃত্তি করিয়া থাকে" ইত্যাদি। (১) যদি জিজ্ঞাসা কর "তাহা হইলে লিঙ্গদেহ নিবৃত্তির কি উপায়?"—তদুত্তরে বলি, যে করণ, উপাদান প্রভৃতি সামগ্রী দ্বারা লিঙ্গদেহ নির্ম্মিত, তাহাদের নিবৃত্তি হইলেই লিঙ্গদেহ নিবৃত্তি হয়। কোনও কার্য্যের (কৃত বস্তুর) নিবৃত্তি করিবার দুইপ্রকার উপায় আছে; এক—প্রতিকূল বস্তুর সদ্ভাব বা উপস্থিতি; দ্বিতীয়—করণ, উপাদান প্রভৃতি সামগ্রীর নিবৃত্তি। যেমন বায়ুরূপ প্রতিকূল বস্তুর আবির্ভাবে কিম্বা তৈলবর্ত্তি প্রভৃতি সামগ্রীর অভাবে দীপ নিবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ। লিঙ্গদেহের সাক্ষাৎ প্রতিকূল বস্তু আমরা দেখিতে পাই না। আর লিঙ্গদেহের সামগ্রী দুই প্রকারের; যথা—প্রারব্ধ-কর্ম্ম ও অনারব্ধ কর্ম্ম। সেই দুইপ্রকার কর্ম্মবশতঃ অজ্ঞানীদিগের লিঙ্গ-দেহ ইহলোকে ও পরলোকে অবস্থান করে। জ্ঞানীদিগের অনারব্ধ বা সঞ্চিতকর্ম্ম জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয় এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগের দ্বারা নিবৃত্ত হয়; সেইহেতু যেমন তৈলবর্ত্তির অভাবে দীপ নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ সামগ্রীর অভাবে জ্ঞানীদিগের লিঙ্গদেহ নিবৃত্ত হয়। অতএব সেই (লিঙ্গদেহের নিবৃত্তি) জ্ঞানের ফল নহে।

আশঙ্কা—আচ্ছা, এই যুক্তি অনুসারে ত বলা যায় যে ভাবীদেহের

আরম্ভ না হওয়াও জ্ঞানের ফল নহে। (১) যদি তাহাকে জ্ঞানেরই ফল বলেন তবে জিজ্ঞাসা করি—ভাবীদেহের আরম্ভাভাবই কি জ্ঞানের ফল, অথবা ভাবীদেহের আরম্ভাভাবকে (যাহা পূর্ব্ব হইতে রহিয়াছে তাহাকে) বজায় রাখাই জ্ঞানের ফল? প্রথমটীকে আপনি জ্ঞানের ফল বলিতে পারেন না; কেননা, ভাবীদেহের আরম্ভাভাব প্রাগভাবরূপে অনাদিকাল হইতে (অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্ব হইতে) সিদ্ধ হইয়া আছে (সেইহেতু তাহা জ্ঞানের ফল হইতে পারে না)। আর দ্বিতীয়টীকে (অর্থাৎ ভাবীদেহের আরম্ভাভাব বজায় রাখাকে) আপনি জ্ঞানের ফল বলিতে পারেন না; কেননা, অনারব্ধকর্ম্মরূপ সামগ্রীর নিবৃত্তি দ্বারাই ভাবীদেহের যে আরম্ভাভাব প্রাগভাবরূপে রহিয়াছে তাহাকে বজায় রাখা যাইতে পারে। আরও দেখুন, ভাবীদেহের আরম্ভনিবৃত্তি জ্ঞানের ফল হইতে পারে না, কেননা, অবিদ্যানিবৃত্তিই জ্ঞানের ফল (বলিয়া পদ্মপাদাচার্য্য কর্তৃক সিদ্ধ হইয়াছে)।

এই আশঙ্কার উত্তরে বলি—ইহা দোষ নহে। কেননা, ভাবীজন্মের আরম্ভাভাব প্রভৃতিকেই জ্ঞানের ফল বলিয়া শ্রুত্যাদিশাস্ত্র নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং এই মত প্রামাণিক। "যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে" (কঠ, ৩।৮)—যে ব্রহ্মরূপ পদ হইতে প্রচ্যুত হইয়া সেই বিজ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে আর জন্মিতে

---

(১) পদ্মপাদাচার্য্যকৃত পঞ্চপাদিকা, ১ম পৃষ্ঠা ২২শ পংক্তি (বিজয়নগরম্ সংস্কৃত গ্রন্থাবলী)—"ব্রহ্মজ্ঞানং হি সূত্রিতমনর্থহেতুনিবর্হণম্। অনর্থশ্চ প্রমাতৃতাপ্রমুখং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বম্। তদ্যদি বস্তুকৃতং, ন জ্ঞানেন নিবর্হণীয়ম্, যতোজ্ঞানমজ্ঞানস্যৈব নিবর্ত্তকম্। তদ্যদি কর্তৃত্বভোক্তৃত্বমজ্ঞানহেতুকং স্যাৎ ততো ব্রহ্মজ্ঞানমনর্থহেতুনিবর্হণ-মুচ্যমানমুপপদ্যেত।" ব্রহ্মজ্ঞানই অনর্থহেতু-নিবারণের উপায় বলিয়া সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। প্রমাতৃত্বজনিত কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বই সেই অনর্থ। তাহা যদি বস্তুর (আত্মতত্ত্বের) স্বভাবগত হয়, তাহা হইলে তাহা জ্ঞান দ্বারা নিবারিত হইতে পারে না; যেহেতু জ্ঞান কেবল মাত্র অজ্ঞানেরই নিবৃত্তি করিতে পারে। সেই কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব যদি অজ্ঞানজনিত হয় তাহা হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানকে অনর্থহেতু-নিবারক বলিলে তাহা যুক্তিসঙ্গত হয়।

(১) "ন জ্ঞানফলম্"—ইহা আনন্দাশ্রমের সটীক সংস্করণের পাঠ। এই পাঠাবলম্বনেই অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

হয় না। (১)—ইত্যাদি যে সকল শ্রুতি বাক্য উদাহৃত হইয়াছে তাহারাই এই বিষয়ে প্রমাণ। আর জ্ঞান অজ্ঞানেরই নিবর্ত্তক এই (পঞ্চপাদিকা-চার্য্যের) সিদ্ধান্তের সহিত যে বিরোধের কথা বলিতেছেন, তাহা হয় না;—কেননা, পঞ্চপাদিকাচার্য্যের অজ্ঞান শব্দে অজ্ঞানের অব্যভিচারী সহচর অব্রহ্মত্বাদিকেও বুঝান উদ্দেশ্য। কেননা, তাহা না হইলে অনুভবের সহিত বিরোধ হয়, যেহেতু অজ্ঞাননিবৃত্তির ন্যায় অব্রহ্মত্বাদিনিবৃত্তিও তৎসঙ্গে অনুভূত হয়।

অতএব ভাবীদেহনিবৃত্তিরূপ বিদেহমুক্তি জ্ঞানের সহিত এককালেই লব্ধ হইয়া থাকে। এই মর্ম্মে যাজ্ঞবল্ক্যের বচন শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যথা—"অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" (বৃহদা, উপ, ৪।২।৪)—হে জনক, তুমি জন্মমরণরূপ ভয়রাহিত্য নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইয়াছ; এবং "এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্" (বৃহদা, উপ, ৪।৫।১৫)—অরে মৈত্রেয়ি! সন্ন্যাসের সহিত ('ইহা আত্মা নহে' 'ইহা আত্মা নহে' এইরূপে) যে আত্মজ্ঞান উক্ত হইয়াছে সেই আত্মজ্ঞানই অমৃতত্ব লাভের উপায়। অন্য শ্রুতিতেও আছে—'তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি' ইতি—(নৃসিংহপূর্ব্বতাপনীয় উপ, ১।৬)—তাঁহাকে এইরূপ জানিয়া জ্ঞানী এই শরীরে অবস্থান কালেই অমৃত হয়েন। যদি বলা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও, সেই তত্ত্বজ্ঞানের ফলভূত যে বিদেহ-মুক্তি তাহা তৎকালে উৎপন্ন না হইয়া কালান্তরে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে যেমন জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে (কর্ম্মাবসানে ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত) কর্ম্ম-জনিত এক অপূর্ব্বের কল্পনা করা হয় সেইরূপ জ্ঞানজনিতও এক অপূর্ব্ব কল্পনা করিতে হয়। সেইরূপ করিলে কিন্তু জ্ঞানশাস্ত্র কর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে।

আর যদি বলেন যে, যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি মন্ত্রাদি দ্বারা প্রতিবদ্ধ থাকিয়া কালান্তরে ফলদায়ক হয়, সেইরূপ জ্ঞানও প্রারব্ধকর্ম্মদ্বারা প্রতিবদ্ধ থাকিয়া কালান্তরে বিদেহমুক্তি প্রদান করিবে। তাহা হইলে বলি, এইরূপ বলিতে পারেন না; কেন না, এই স্থলে (সেইরূপ) বিরোধ নাই। ভাবীদেহের অত্যন্তাভাবস্বরূপ বিদেহমুক্তি যাহা আমাদিগের অভিপ্রেত,

(১) অর্থাৎ বিজ্ঞানই ভাবীজন্মের অনারম্ভের কারণ।

তাহার সহিত প্রারব্ধের (যাহা কেবল মাত্র বর্ত্তমান শরীরকে বজায় রাখে, তাহার) যদি বিরোধ থাকিত তাহা হইলে প্রারব্ধদ্বারা জ্ঞানের প্রতিবন্ধ হওয়া সম্ভব হইত। অধিকন্তু (আপনার মতে জ্ঞান ক্ষণিক হইয়া পড়ে এবং) সময়ান্তরে নিজে থাকে না বলিয়া এইরূপ জ্ঞান কি প্রকারে (নিত্য) মুক্তি দিতে সমর্থ হইতে পারে ? ইহার উত্তরে যদি বলেন, চরম সাক্ষাৎকার-রূপ অপর এক জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, আমরা বলি তাহা বলিতে পারেন না ; কেননা, সেইরূপ জ্ঞানের কোনও সাধন পাওয়া যায় না। যে প্রারব্ধ প্রতিবন্ধ ঘটায় সেই প্রারব্ধের নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই গুরু, শাস্ত্র, দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অশেষ সংসার বিকাশের নিবৃত্তি হওয়াতে কি আপনার সাধন হইবে ? তাহা হইলে যদি বলেন "ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ" (শ্বেতাশ্বঃ, ১।১০)—এবং পরিশেষে আবার বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়— এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ কি ? তদুত্তরে বলি—উক্ত শ্রুতির অর্থ এই যে প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয়ে, দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অশেষ কার্য্যের কারণ না থাকাতে তাহারা নিবৃত্ত হয়, আর উৎপন্ন হয় না—ইহাই শ্রুতির অর্থ।

এই হেতু, আপনি যাহাকে বিদেহমুক্তি বলেন অর্থাৎ বর্ত্তমান-দেহের অভাবরূপ-বিদেহমুক্তি, তাহা পরে অর্থাৎ বর্ত্তমান দেহনাশের পরে হয় হউক, আমরা কিন্তু যাহাকে বিদেহমুক্তি বলি তাহা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই লব্ধ হয়। এই উদ্দেশ্যেই ভগবান্ শেষ বলিয়াছেন—(পরমার্থসার, ৮১ সংখ্যক শ্লোক)

তীর্থে শ্বপচগৃহে বা নষ্টস্মৃতিরপি পরিত্যজন্দেহম্।
জ্ঞানসমকালমুক্তঃ কৈবল্যং যাতি হতশোকঃ ॥ (১)

(১) ট্রিভেন্‌ড্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী, দ্বাদশগ্রন্থ শেষাচার্য্যপ্রণীত পরমার্থসার, ৮১ সংখ্যক শ্লোক (এই গ্রন্থ আর্য্যাপঞ্চাশীতি নামেও পরিচিত)—এই শ্লোকের রাঘবানন্দকৃত টীকার অনুবাদ—"কোন্ স্থানে কি প্রকারে তত্ত্বজ্ঞানীর দেহপাত হয় ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—সেই "হতশোক" অর্থাৎ শোকবিনির্মুক্ত পুরুষ জীবদ্দশাতেই মুক্ত ; কেননা, তিনি "জ্ঞানসমকালমুক্তঃ"—জ্ঞানোদয় কালেই মুক্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ বিলোমক্রমে তাঁহার পিণ্ড (দেহ) অণ্ডে (ব্রহ্মাণ্ডে), সেই অণ্ড, তাহার কারণভূত ক্ষিতিতে, সেই ক্ষিতি তাহার কারণভূত জলে, সেই জল তৎকারণভূত

—তীর্থস্থানেই হউক, অথবা চণ্ডালগৃহেই হউক, স্মৃতিযুক্ত থাকিয়া হউক, অথবা লুপ্তস্মৃতিক হইয়াই হউক (অর্থাৎ সজ্ঞানেই হউক অথবা অজ্ঞানেই হউক), তিনি দেহত্যাগ করিলেও (পূর্ব্বে) জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত ও হতশোক হইয়া কৈবল্যলাভ করেন।

সেইহেতু 'বিদেহমুক্তি বিষয়ে, তাহার সাক্ষাৎসাধন তত্ত্বজ্ঞানকেই প্রধান বলা যুক্তিসঙ্গত। বাসনাক্ষয় এবং মনোনাশ জ্ঞানের সাক্ষাৎসাধন নয় বলিয়া অর্থাৎ ব্যবহিতসাধন বলিয়া তাহারা গৌণ। দৈবসংস্কারের (গীতোক্ত দৈবীসম্পৎ) দ্বারা আসুর সংস্কারের ক্ষয় হয় বলিয়া দৈবসংস্কার জ্ঞানের সাধন, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

'শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ'
ইতি শ্রুতিঃ। (বৃহদা, উপ, ৪।৪।২৩)। (মূলে পশ্যতি)।

সেই হেতু যিনি আত্মাকে কর্ম্মাদি সম্বন্ধশূন্য বলিয়া বুঝিয়াছেন তিনি প্রথমে দান্ত হইয়া অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া এবং তদনন্তর শান্ত হইয়া অর্থাৎ অন্তঃকরণে তৃষ্ণাসমূহ হইতে নিবৃত্ত হইয়া, (পরে) উপরত হইয়া অর্থাৎ এষণাত্রয়বিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিধিপূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিয়া, তিতিক্ষু হইয়া অর্থাৎ যাহাতে প্রাণবিয়োগ না হয় এইরূপ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহন করিতে অভ্যাস করিয়া, সমাহিত হইয়া অর্থাৎ আত্মাতে সম্যক্-প্রকারে চিত্তনিবেশ করিয়া আত্মাতেই অর্থাৎ নিজের দেহেন্দ্রিয়াদিতেই আত্মাকে অর্থাৎ যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া চেতনা দিতেছেন তাঁহার

জ্যোতিতে, সেই জ্যোতি তাহার কারণভূত বায়ুতে, সেই বায়ু আকাশে, সেই আকাশ তামস অহংতত্ত্বে, একাদশ ইন্দ্রিয় রাজস অহংতত্ত্বে এবং ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ সাত্ত্বিক অহংতত্ত্বে, এই ত্রিবিধ অহংতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব অব্যক্তে, অব্যক্ত তাহার অধিষ্ঠাতা পুরুষে এবং পুরুষ স্বকীয় মহিমায় পরম পুরুষে—এইরূপে (বিলোমক্রমে) তাঁহার দেহ ও দৈহিকপ্রপঞ্চ স্বকীয় জ্যোতিতে সংহৃত হইয়াছে। এই হেতু গঙ্গাদি 'তীর্থে' বা শ্বপচগৃহে (কোন নীচ ব্যক্তির আবাসে,) নষ্টস্মৃতি (বিলুপ্ত স্মৃতি) অথবা প্রবুদ্ধ হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেও তিনি কৈবল্য প্রাপ্ত হন। এই হেতু কথিত হইয়াছে :—

"যত্র যত্র মৃতো জ্ঞানী যেন বা কেন মৃত্যুনা।
যথা সর্ব্বগতং ব্রহ্ম তত্র তত্র লয়ং গতঃ॥"

সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন, অর্থাৎ তাহাই আমার স্বরূপ এইরূপ উপলব্ধি করিবেন।

স্মৃতিও বলিয়াছেন :—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ, পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥

(গীতা, ১৩৮—১২)। ইতি

অর্থ—এই কুড়িটি গুণ জ্ঞানের সাধন বলিয়া গীতায় উক্ত হইয়াছে।

১। অমানিত্বম্—যে ব্যক্তি বিদ্যমান বা অবিদ্যমান গুণের জন্য আত্মশ্লাঘা করে তাহাকে মানী বলে। সেইরূপ স্বভাব না থাকার নাম অমানিত্ব।

২। অদম্ভিত্বম্—যে ব্যক্তি লাভ, পূজা বা খ্যাতির উদ্দেশ্যে নিজের ধর্ম্ম-প্রকটন করে তাহাকে দম্ভী বলে। সেইরূপ স্বভাব না থাকা অদম্ভিত্ব।

৩। অহিংসা—কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা পর-পীড়াবর্জ্জনের নাম অহিংসা।

৪। ক্ষান্তিঃ—অপরে অপকার করিলেও চিত্তের যে নির্ব্বিকারতা তাহার নাম ক্ষান্তি।

৫। আর্জ্জবম্—কুটিলতা রাহিত্য।

৬। আচার্য্যোপাসনম্—যিনি মোক্ষের উপদেশ করেন তাঁহার সেবা।

৭। শৌচম্—মৃত্তিকা জল প্রভৃতির দ্বারা বাহ্যশৌচ এবং ভাবশুদ্ধির দ্বারা অর্থাৎ দ্বেষাসক্তি প্রভৃতি বর্জ্জনদ্বারা আন্তরশৌচ।

৮। স্থৈর্য্যম্—মোক্ষসাধনে প্রবৃত্ত হইলে যে সকল বিঘ্ন আইসে, তাহাদিগকে গণনা না করা।

৯। আত্মবিনিগ্রহঃ—দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতির প্রচার সঙ্কোচ অর্থাৎ লক্ষ্যের প্রাতিকূলে তাহাদিগের চেষ্টার নিবারণ।

১০। ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্—লৌকিক বা বৈদিক (স্বর্গাদিস্থানে লভ্য) রূপরসাদি ভোগ্যবস্তুতে স্পৃহাভাব।

১১। অনহঙ্কারঃ—দর্পরাহিত্য।

১২। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্—জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি প্রভৃতি হইতে যে সকল বেদনা ও দৈন্যাদি দোষ জন্মে তাহা বিচারপূর্ব্বক দর্শন করা।

১৩,১৪। পুত্রদারগৃহাদিষু অসক্তিঃ, অনভিষঙ্গঃ—

সক্তিঃ শব্দে মমতামাত্র, অভিষঙ্গঃ অর্থে তাদাত্ম্যাভিমান। পুত্র পত্নী গৃহপ্রভৃতিতে মমতারাহিত্য এবং তাহাদের সুখাদিতে আপনাকে সুখী এবং দুঃখাদিতে আপনাকে দুঃখী মনে না করা।

১৫। ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু নিত্যং সমচিত্তত্বম্—

সমচিত্তত্ব শব্দে হর্ষবিষাদরাহিত্য। ইষ্ট প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা হর্ষাভাব এবং অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা বিষাদাভাব।

১৬। অনন্যযোগেন ময়ি অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ—ভগবান্ বাসুদেব হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, অতএব তিনিই আমার গতি—পরমেশ্বরে এইরূপ অবিচ্ছিন্না নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি।

১৭। বিবিক্তদেশসেবিত্বম্—স্বভাবতঃ শুদ্ধ কিম্বা অশুচি-সর্পব্যাঘ্রাদি-রহিতস্থানে অবস্থান। অরণ্য নদীপুলিন দেবগৃহ প্রভৃতি স্থানে চিত্ত প্রসন্ন হয় এবং আত্মাদিভাবনা উপস্থিত হয় বলিয়া জ্ঞানিগণ সেইরূপস্থলে অবস্থান করেন।

১৮। জনসংসদি অরতিঃ—প্রাকৃত (শাস্ত্রীয় সংস্কারশূন্য) অবিনীত, কলহোন্মুখিতচিত্ত ব্যক্তিগণের সমবায়ে অবস্থানে অপ্রবৃত্তি।

১৯। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্—অধ্যাত্মশাস্ত্রজ জ্ঞানে নিত্যভাব বা নিষ্ঠা।

২০। তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্—তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন যে সংসারনিবৃত্তি, তদ্বিষয়ে আলোচনা। সেইরূপ আলোচনা দ্বারা তাহার সাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে।

এই কুড়িটি জ্ঞানের সাধন বলিয়া জ্ঞান শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। এই কুড়িটি ভিন্ন, যাহা কিছু জ্ঞানের বিরোধী তাহা 'অজ্ঞান' শব্দবাচ্য।

অন্যবস্তুতে অহংবুদ্ধির নাম অভিষঙ্গ। শেষোক্ত শ্লোকের তৃতীয় চরণে যে 'জ্ঞান' শব্দ আছে তাহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ—জ্ঞা-ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে অন্ প্রত্যয় করিয়া জ্ঞান শব্দে, যাহা দ্বারা জানা যায় অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন এইরূপ অর্থ পাওয়া গেল।

মনোনাশ জ্ঞানের সাধন এই কথা বেদ স্মৃতি প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ আছে। যথা—"ততস্তু তং পশ্যতি (১) নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইতি শ্রুতিঃ

(মুণ্ডক উপ ৩।১।৮)

—সেই হেতু (ব্রহ্মদর্শনযোগ্যতা লাভহেতু) সেই নিরবয়ব আত্মাকে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতে করিতে অপরোক্ষরূপে জানিতে পারেন।

"অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।"

(কঠ উপ ২।১২)

—আত্মাতে চিত্ত সমাধানরূপ অধ্যাত্মযোগ লাভ করিয়া আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হর্ষশোকরহিত হয়েন।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন—অর্থাৎ প্রত্যগাত্মাতে সমাধিপ্রাপ্তি দ্বারা, দেব অর্থাৎ আত্মাকে জানিয়া।

"যং বিনিদ্রাঃ জিতশ্বাসাঃ সন্তুষ্টাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাস্তস্মৈ বিদ্যাত্মনে নমঃ॥" ইতি স্মৃতিঃ।

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব রাজধর্ম্ম, ভীষ্মস্তবরাজ, ৪৭।৫৪)। (১)

নিদ্রাত্যাগ করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাসকে জয় করিয়া সন্তোষ অবলম্বন

---

(১) পাঠান্তর—পশ্যতে।

(১) বঙ্গবাসী সংস্করণ ১৪২০ পৃষ্ঠা, তথায়—"সন্তুষ্টাঃ" স্থলে "সত্ত্বস্থাঃ," "বিদ্যাত্মনে" স্থলে "যোগাত্মনে" এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

করিয়া, এবং ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করিয়া যোগিগণ যে স্বপ্রকাশ জ্যোতি-স্বরূপ বস্তু দর্শন করেন, সেই জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার।

অতএব, এই প্রকারে জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির প্রয়োজনানুসারে, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি (মনোনাশ, বাসনাক্ষয় ও তত্ত্বজ্ঞান) এই তিনটী সাধনের মুখ্যত্ব ও গৌণত্বের ব্যবস্থা সিদ্ধ হয়। (অর্থাৎ জীবন্মুক্তিতে মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের প্রাধান্য এবং বিদেহমুক্তিতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রাধান্য।)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বোধন—শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত। পোঃ করটিয়া, টাঙ্গাইল হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় গ্রন্থকার হিন্দু ও মুসলমানগণের মিলন কামনা করিয়া মিলনের অন্তরায় অপসারণে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার মতে হিন্দুদের মূর্ত্তিপূজা এবং মুসলমানদের গো-কোরবাণী—দুই সমাজের দুইটি ধর্ম্মানুষ্ঠান মিলনের দুইটি বিশিষ্ট অন্তরায়। গ্রন্থকার মুসলমানগণকে শাস্ত্রপ্রমাণ সহায়ে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, হিন্দুরা মূর্ত্তিপূজক নহে—তাহাদেরই মত একেশ্বরপূজক। সুতরাং মিলনের এই অন্তরায় অযৌক্তিক ও ভ্রমাত্মক। গো-কোরবাণীর সমর্থন তিনি করেন না, অশাস্ত্রীয় এ কথাও বলেন না। বর্ত্তমান হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের বিশিষ্ট কয়েক ব্যক্তির মতানুসরণ করিয়া তাঁহাদের কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—গো-কোরবাণী বর্ত্তমানে দেশের পক্ষে অকল্যাণকর, গো-জাতির সংরক্ষণে দেশের মহা মঙ্গল, সুতরাং পরিত্যাজ্য। উপসংহারে তৃতীয় আর একটি অন্তরায় উল্লিখিত হইয়াছে—বিদ্বেষমূলক সাহিত্য-প্রচার। গ্রন্থকার এইরূপ সাহিত্য-রচনা যাহাতে আর না হয় তজ্জন্য লেখকগণকে অনুরোধ করিয়াছেন এবং হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্র হইতে অনেকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ধর্ম্মের সমন্বয় দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

গ্রন্থকারের মঙ্গল চেষ্টা প্রশংসার্হ এবং অনুকরণীয়। হিন্দু এবং মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে জানিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিলে ভেদ বিদ্বেষাত্মক

না হইয়া স্বীয় স্বীয় বিশেষত্ববোধক বলিয়াই জ্ঞান হইবে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা উভয় সমাজের জানাজানির কতকটা সহায়ক হইবে। ইহার বহুল প্রচার এবং আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

বৃন্দাবন কথা—লেখক শ্রীপুলিনবিহরী দত্ত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ২৷৷০ মাত্র।

বাংলা ভাষায় শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধে এরূপ তথ্যপূর্ণ পুস্তক সম্ভবতঃ এই প্রথম। এই পুস্তকখানি সকল শ্রেণীর পাঠকেরই মনোরঞ্জন এবং উপকার সাধন করিবে। গ্রন্থকার বহু পরিশ্রমে ও নিপুণতার সহিত একাধারে তীর্থতত্ত্ব ও তীর্থকাহিনী ঐতিহাসিক শিলমোহরের ছাপ দিয়া আধুনিক রুচির অনুকূল করিতে স্বীয় দক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক বিভাগে 'বৃন্দাবন কথা' একটি সম্পদ্‌রূপে বিবেচিত হইবার যোগ্য। এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

সংবাদ ও মন্তব্য।

ভুবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিগত জুন, জুলাই ও আগষ্ট মাসের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জুন—রোগীর মোট সংখ্যা ১০২৪, তন্মধ্যে ৫৬৫ নূতন,—৩২৬ পুরুষ ও ২৩৯ স্ত্রীলোক। দৈনিক গড় ৩৪·১৩।

জুলাই—রোগীর মোট সংখ্যা ৯১৪, তন্মধ্যে ৫১০ নূতন;—২৯১ পুরুষ ও ২১৯ স্ত্রীলোক, দৈনিক গড় ৩০·৭৭।

আগষ্ট—রোগীর মোট সংখ্যা ১১৭৯, তন্মধ্যে ৭৭৬ নূতন;—৪৪৬ পুরুষ ও ৩৩০ স্ত্রীলোক, দৈনিক গড় ৩৮·০৩। এই মাসে ২টী অস্ত্রচিকিৎসাও হইয়াছে।

গত জুন ও জুলাই মাসে বন্যার দরুণ যাতায়াতের অসুবিধা হেতু রোগীর সংখ্যা কিছু কম হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আবার পূর্ব্ববৎ বাড়িয়া চলিয়াছে।

উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়টীর উন্নতি সাধন করিতে হইলে মাসিক অর্থ-সাহায্য প্রয়োজন। আশা করি, সহৃদয় জনসাধারণ এই সদনুষ্ঠানের উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-নিবারণ কার্য্য।

(পুরী, তমলুক ও ঘাটাল)

গতবারে আমরা পুরী দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য্যের বিবরণ ও মহানদীর জলপ্লাবনে ঐ সকল দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানের শোচনীয় অবস্থা পাঠকবর্গের নিকট জ্ঞাপন করিয়াছি। জলপ্লাবনে এতদঞ্চলের হৈমন্তিক ধান্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। অনেক স্থানের ধান্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতের আশাও একরূপ নির্ম্মূল। বস্ত্রাভাবও খুব বেশী। সেবকগণ ক্রমাগত বস্ত্র চাহিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের হাতে নূতন কিম্বা পুরাতন বস্ত্র কিছুই নাই। ঐ অঞ্চলে এখন ভুবনেশ্বর, কানাস, গরিসাগোদা—এই তিনটী কেন্দ্র হইতে সেবাকার্য্য চলিতেছে। ভুবনেশ্বর কেন্দ্র হইতে ৩৩ খানি গ্রামে ৪ সপ্তাহে ১৫০/৬ সের, কানাস হইতে ৩১ খানি গ্রামে ১৬৭/৮॥ সের ও গরিসাগোদা হইতে ২৯ খানি গ্রামে ৭৫।২ সের—সর্ব্বশুদ্ধ ৩৯২॥৬। সের চাউল ও সাধ্যানুযায়ী বস্ত্রাদি বিতরণ করা হইয়াছে।

তমলুক এবং ঘাটালের জলপ্লাবনে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য্যের সংবাদও ইতিপূর্ব্বেই সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। তমলুকে ১২ খানি গ্রামে সপ্তাহে ৩৫/০ মন চাউল, ৫/০ মন ডাল এবং লবণ ও লঙ্কা স্থানীয় সেবাশ্রম কর্ত্তৃক দান করা হইতেছে। চিকিৎসাভিজ্ঞ সেবকগণ প্রত্যহ গ্রামে গ্রামে যাইয়া রোগীদিগের তত্ত্বাবধান ও ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতেছেন। ঘাটাল কেন্দ্রের কার্য্য ৩ সপ্তাহকাল চালাইয়া বর্ত্তমানে প্রয়োজনাভাবে বন্ধ করা গিয়াছে। উক্ত তিন সপ্তাহে তথায় ২০ খানি গ্রামে মোট ৫২/০ মন চাউল ও ১০০ শত নূতন ও ১০০ শত পুরাতন বস্ত্র বিতরণ করা হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান হইতে সাহায্যার্থ আবেদন পত্রাদি পাইতেছি। কিন্তু অর্থাভাবে আমরা তাহার কিছুই করিতে পারিতেছি না। সম্প্রতি ফরিদপুরের কোটালীপাড়া অঞ্চলের অবস্থা খুব শোচনীয় জানিয়া আমরা তথাকার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের হস্তে সামান্য অর্থ দিয়া সেবাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছি।

কটক জেলার জেনাপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বন্যাপ্রসূত দুরবস্থার বিবরণসহ আবেদন পত্র পাইয়া সম্প্রতি তথায়ও আমরা সেবক প্রেরণ করিয়াছি। যথাসময়ে তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

সমস্ত দেশব্যাপী অভাব, হাহাকার ও ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে! আশাকরি, সহৃদয় দেশবাসী এই ঘোর দুর্দ্দিনে যথাসাধ্য সাহায্য দানে কুণ্ঠিত হইবেন না। অর্থ, বস্ত্র প্রভৃতি সাহায্য নিম্নলিখিত যে কোন এক ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। (১) প্রেসিডেণ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড়, হাওড়া। (২) সেক্রেটারী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

১৬।৯।২০ (স্বাঃ) সারদানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন দুর্ভিক্ষ ও বন্যানিবারণ ভাণ্ডারে

প্রাপ্তি-স্বীকার।

গত জুলাই মাসে বেলুড় মঠে প্রাপ্ত।

শ্রীযুক্ত ডি, এন, মজুমদারের মাতা, লতাগুড়ি ১০,
" প্রঃ হেমচন্দ্র ব্যানার্জ্জী, পাবনা ৫,
" কৃষ্ণচন্দ্র নন্দী ব্রাদাস, কলিকাতা ৫,
" ললিতমোহন গাঙ্গুলী, বর্ম্মা ৫,
" বি এন, মুখার্জ্জী পাটনা ১,
" পাওলো রেপ্‌স, মায়াবতী আশ্রম ২,
" নলিনীকুমার রায়, মাদারিপুর ১,
" আত্মারাম, সিমলা পাহাড় ৫,
" শশধর মুখার্জ্জী, বানপাল ১০,
" ত্রিকম্‌দম রাওজী, কলিকাতা ১০,
" শিবচন্দ্র ব্যানার্জ্জী, কলিকাতা ৩,
" গোবিন্দবল্লভ দে প্রভৃতি, নিলগিরি ৪,
" এম টি নরসিংহ রাও, আদনি ৭।/০
শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী, কলিকাতা ২০,
শ্রীযুক্ত এ, আর, মজুমদার, নাটোর [illegible]
শ্রীযুক্ত টি, এসোসিয়েসন, বালি মিল ৫(১০
" অশ্বিনীকুমার ঘোষ, মাইঙ্গিয়ান ২০,
" বি, রামচন্দ্র প্রভৃতি, সিমলা ১৫,
" এস, এম, সেন, কুষ্টিয়া ২,
" ভি, বিশ্বনাথ আয়ার, কারুর ১,
" নটবর খারা, বজবজ ৭৵০
" শ্যামাপদ ব্যানার্জ্জী, গার্ডেনরিচ ১,
" ভি, কে, এস, আয়ার, সন্দকন ১,
" স্বামী পরমানন্দ, বোষ্টন ৫১৩।১৫
শ্রীমতী নিরুপমা দেবী, বহরমপুর ২,
শ্রীযুক্ত রাম, রোড়ী ২৩,
" রামেন্দ্রচন্দ্র রায়, ভবানীপুর ১,
" জে, সি, দালাল, খুলনা ১০,
" জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত, আসনসোল ১০,
" এম, এল, গোস্বামী, পেগু ৫,
" চারুচন্দ্র দাস, কলিকাতা ১,
" ক্যাম্বেল মেডিকেল কলেজ " ১০,

জাতীয়জীবনে বেদান্ত।

(পথিক)

ভারতমাতার সুসন্তান বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ আমেরিকাতে বেদান্তের বিজয়দুন্দুভি ঘোষিত করিয়া যেদিন জননীর ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিলেন সে আজ প্রায় তেইশ বৎসরের কথা। তখনও ভারতে জাতীয় জীবনের সূত্রপাত হয় নাই। সূত্রপাত হইলেও তাহাতে জীবনস্পন্দন অনুভূত হয় নাই। তার পর এই কয় বৎসর ধরিয়া কত সুখ দুঃখ, আশা নিরাশার মধ্য দিয়া, ভালমন্দ কতপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আজ সে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। জাজ্বল্যমান বর্ত্তমানের কোলে দাঁড়াইয়া আজ স্বভাবতঃই মনে হইতেছে, সেই দূর অতীতের একটী পুরাতন কাহিনী —পুরাতন হইয়াও আজ তাহা নূতনের বেশে আসিয়াছে, তাহাকে বরণ করিয়া লইতে আজ কিন্তু আমরা প্রস্তুত। আজ মনে হইতেছে সেই কথা—যে মরমের কথা, যে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা, যে অমানুষী সূক্ষ্মদর্শিতাপূর্ণ অথচ সহজ সরল কথাটি স্বামিজী সিংহলে অবতরণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন :—"Each race similarly has a peculiar bent, each race has a peculiar *raison d'etre,* each race has a peculiar mission to fulfil in the life of the world. Each race has to make its own result, to fulfil its own mission. Political greatness or military power is never the mission of our race; it never was, and, mark my words, it never will be. But there has been the other mission given

to us, which is to conserve, to preserve, to accumulate, as it were, into a dynamo, all the spiritual energy of the race, and that concenrtated energy is to powr forth in a deluge on the world whenever circumstances are propitious." * তার পর কত বার, কত প্রকারে সে কথা তিনি তাঁর দেশবাসিগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কতবার বলিয়াছেন—"And therefore, if you succeed in the attempt to throw off your religion and take up either politics or society, or any other thing as your centre, as the vitality of your national life the result will be that, you will become extinct." † সে দিনের সে কথা দেশের প্রাণে কেমন লাগিয়াছিল তাহা জানিনা, আজ কিন্তু সেই পুরাতন কথার, গরীব সন্ন্যাসীর সেই বাসিকথার সম্পূর্ণ না হউক, কতকটার প্রতিধ্বনি দেশের আকাশে শুনা যাইতেছে। আজ আমরা অনেকেই বুঝিয়াছি ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র 'পলিটিক্স' বলিয়া কোনও পদার্থ এদেশের ধাতে নাই, ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই দেশকে আত্মলাভ করিতে হইবে, পূর্ণগৌরবে

---

* প্রত্যেক জাতিরও একটা না একটা যেন বিশেষ ঝোঁক থাকে। প্রত্যেক জাতিরই যেন বিশেষ বিশেষ জীবনোদ্দেশ্য থাকে। প্রত্যেক জাতিকেই যেন সমগ্র মানবজাতির জীবনকে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিবার জন্য কোন এক ব্রতবিশেষ পালন করিতে হয়। নিজ নিজ জীবনোদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিয়া প্রত্যেক জাতিকেই সেই সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয়। রাজনৈতিক বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য নহে—কখন ছিলও না, আর জানিয়া রাখ, কখন হইবেও না। তবে আমাদের অন্য জীবনোদ্দেশ্য আছে। তাহা এই—সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি একত্রীভূত করিয়া যেন এক বিদ্যুতাধারে রক্ষা করা এবং যখনই সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই এই সমষ্টীভূত শক্তির বন্যায় সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করা।

† অতএব যদি তোমরা ধর্ম্মকে ছাড়িয়া পাশ্চাত্য অনুকরণে রাজনীতি, সমাজনীতি বা অপর কিছুকে কেন্দ্র করিয়া উহাকেই তোমাদের জাতীয় জীবনের উৎসপ্রস্রবণ রূপে গ্রহণ কর, তবে ফল দাঁড়াইবে এই যে, তোমাদের এই জাত পৃথিবীবক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।

প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। কিন্তু বুঝাটাও যেন অনেকটা "মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না" গোছের বুঝা হইয়াছে—কতকটা ভাসা ভাসা ভাবে বুঝিয়াছি। প্রাণের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া উহা আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কাজটিকে আয়ত্ত করিয়া লইতে পারে নাই। যদি পারিত তবে বুঝায় এবং কাজে, চিন্তা ও কথায় এতটা গড়মিল হইত না। সুতরাং এবিষয়ে আরও আলোচনার প্রয়োজন। যে সন্দেহগুলি পূর্ব্বচিন্তার ফলে চিত্তে লুক্কায়িত থাকিয়া ঠিক ঠিক বুঝিবার অন্তরায় ঘটাইতেছে, তাহাদিগকে লইয়া একটা বোঝাপড়ার বিশেষ দরকার।

এ বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন এই যে, আমরা ধর্ম্মের ভিতর দিয়া দেশের উন্নতি চাই, অথবা দেশের উন্নতির ভিতর দিয়া ধর্ম্মকে চাই? দেশের উন্নতি উদ্দেশ্য—ধর্ম্ম উপায়, অথবা ধর্ম্ম উদ্দেশ্য—দেশের উন্নতি উপায়? প্রশ্নটিকে এইরূপ ভাবে উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় এই যে, উদ্দেশ্যের জন্য উপায়ের পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন আবশ্যক হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। উদ্দেশ্যই মুখ্য, উপায় গৌণ, উদ্দেশ্যই সিদ্ধি, উপায় সাধন। ছাদে উঠা উদ্দেশ্য, উপায় সিঁড়ি, মই, দড়ি, গাছ ইত্যাদি। সেইরূপ ধর্ম্ম ও দেশের উন্নতি, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি উদ্দেশ্য কোন্‌টি উপায় তাহাই আমাদের সর্ব্বপ্রথমে নির্ণয় করা উচিত।

যদি বলি দেশের উন্নতি উদ্দেশ্য, ধর্ম্ম উপায়, তবে দেশের উন্নতি হইল মুখ্য আর ধর্ম্ম হইল গৌণ। অতএব যাহাতে দেশের উন্নতি হয় সেইরূপ ভাবে ধর্ম্মকে কাটিয়া ছাটিয়া, পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত করিয়া লইতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। আমরা কিন্তু ধর্ম্ম অর্থে কতকগুলি আচার-ব্যবহার, নিয়ম-পদ্ধতি বুঝি না, পরন্তু সনাতন অপরিবর্ত্তনশীল সত্যকেই বুঝিয়া থাকি। ইহাই ধর্ম্ম বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার সর্ব্ববাদিসম্মত ব্যাপক সংজ্ঞা। যদি তাহাই হয় তবে ধর্ম্মকে গৌণভাবে অবলম্বন করা কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মকে উপায় ও দেশের উন্নতিকে উদ্দেশ্য বলিতে পারি না।

এখন দেখা যাক্, ধর্ম্মকে উদ্দেশ্য ও দেশের উন্নতিকে উপায়স্বরূপে

গ্রহণ করা যায় কি না। বলা বাহুল্য যে, উপরোক্ত ন্যায়ে বিচার করিলে এ পক্ষে সিদ্ধান্তে কোনই দোষ হয় না। অর্থাৎ ধর্ম্ম বা সত্যকে লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যদি স্বদেশ-সেবারূপ উপায় অবলম্বন করা যায় তবে তাহা ন্যায় বা অধ্যাত্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় না। এ বিষয়ে আরও নানা প্রকার শঙ্কা উত্থাপন করা যাইতে পারে; পাঠকের সুবিধার জন্য সেগুলি প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত করিলে মন্দ হইবে না।

প্র :—'ধর্ম্ম বা সত্যকে লাভ করিবার জন্য স্বদেশসেবাকে উপায়-স্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে'—এ কথা ন্যায়বিরুদ্ধ না হয় না হউক কিন্তু 'অধ্যাত্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে' এ কথা বলা চলে না। কারণ, জড়ের সেবার দ্বারা যে চৈতন্যস্বরূপ সত্যকে লাভ করা যাইতে পারে না এ বিষয়ে সকল অধ্যাত্মশাস্ত্রই একমত। ইহকালের বা পরকালের যাহা কিছু তৎসমুদয়ে সম্পূর্ণ বিরাগ উপস্থিত হইলে তবেই অধ্যাত্মবিষয়ে অধিকার জন্মে, সুতরাং স্বদেশের উন্নতির জন্য অনুরাগী হইলে পরমার্থ হইতে যে ভ্রষ্ট হইতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

উ :—জড়ের সেবা দ্বারা যে চৈতন্যের অধিগম হয় না এবং আসক্তির লেশমাত্র বিদ্যমান থাকিতেও যে সত্যলাভ অসম্ভব সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না—উহা বেদবাক্য। কিন্তু দেশের সেবা বা স্বদেশ-উন্নতি বিষয়ে এ সত্য সকল সময়ে প্রযুজ্য হইতে পারে না। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে মানুষের ভাব দ্বারাই তাহার কার্য্যের গতি নিয়মিত হইয়া থাকে। ভক্ত-সাধক যেমন স্বীয় ভাব-ভক্তির প্রভাবে মৃণ্ময় প্রতিমাতে চিন্ময়ের অবাধ অনুভব সর্ব্বদা লাভ করিয়া থাকেন, জড়স্বভাব স্থুলদৃষ্টি লোকের নিকট উহা মৃণ্ময়রূপে প্রতিভাত হইলেও যেমন সাধকের নিকট উহা নিত্য চিন্ময়, সেইরূপ ভাববিহীন স্থুলদর্শীর নিকট স্বদেশ জড় বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও যথার্থ ভাবুক সাধকের নিকট তাহা নিত্য চিন্ময়। ব্রহ্মৈকদেশে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া সর্ব্বদা ভাবযুক্ত হইয়া তাহার স্মরণ, চিন্তন ও সেবাদি দ্বারা চিত্তকে সর্ব্বদা তদাকারকারিত করিবার যে চেষ্টা তাহাকেই অধ্যাত্মশাস্ত্র 'উপাসনা' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এইরূপ উপাসনা দ্বারাই যে

অধিকাংশ লোক ধীরে ধীরে পূর্ণ সত্যকে লাভ করিয়া থাকেন, ইহাই সমগ্র অধ্যাত্মশাস্ত্রের অভিমত। অবশ্য এইরূপ সাধকও থাকিতে পারেন, যাঁহারা কোনও রূপ ব্যক্ত আলম্বনকে অবলম্বন না করিয়াও সত্যলাভ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতীব বিরল। ঈষন্মাত্র দেহজ্ঞান থাকিতেও সাধকের সম্পূর্ণ অব্যক্তে নিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব। গীতা স্পষ্ট বলিতেছেন :—"অব্যক্তা হি গতির্দ্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।"

যদি শিব, সূর্য্য, গণেশ, বিষ্ণু, দুর্গা প্রভৃতি পরমেশ্বরের ব্যক্তভাবের উপাসনা দ্বারা সত্যলাভ সম্ভবপর হয় তবে তাঁহাকে স্বদেশে মূর্ত্তভাবে চিন্তা করিয়া তাঁহার সেবায় সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারিলে যে সত্যলাভ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? আসক্তি বা কামনা বিষয়ে যে সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছে তাহারও মীমাংসা ঐরূপই বুঝিতে হইবে। যেমন অপরাপর ঈশ্বরবিগ্রহ সমূহের উপাসনার ফলে সাধকের সমস্ত কামনা-বাসনা জ্ঞানানলে দগ্ধ অথবা প্রেমসলিলে ধৌত করিয়া দিতে পারিলেই তদ্দ্বারা চরমসত্যের অনুভূতি লাভ সম্ভবপর হয়, এখানেও সেইরূপ সমস্ত বাসনা ও ক্ষুদ্রতা বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র শুদ্ধপ্রেমকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতে পারিলেই সাধক ক্রমশঃ স্বদেশের ভিতর দিয়া চরমসত্যলাভে সমর্থ হইবেন। এক বিষয়ে কিন্তু সাধককে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। ভাব-বিহীন মন্ত্র-আওড়ানতে বা বাহ্যপূজার আড়ম্বরে যেমন পূজকের হৃদয়ে দেবতার আবির্ভাব হয় না, তাহার চেষ্টা যেরূপ শ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হয়—তাহাতে ভক্তি-প্রেমের আবির্ভাব না হইয়া যেমন অহঙ্কার, দাম্ভিকতা ও ধর্ম্মাড়ম্বরের মাত্রাই বাড়িয়া যায়—সেইরূপ যথার্থ ভাবটিকে হারাইয়া শুধু বাহ্য-সভ্যতার চাকচিক্য দ্বারা যদি স্বদেশ-মাতৃকার অর্চ্চনা করিতে যাওয়া যায় তবে নিষ্ঠুর 'প্রতিযোগিতা' ও 'ভোগতারতম্য' প্রভৃতি দুরতিক্রমণীয় পাপ সমূহের উৎপত্তি হইয়া সর্ব্বনাশের পথই পরিষ্কার হইবে ;—বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দেশ তাহার সাক্ষী। সুতরাং প্রাচ্যের ভাব ও পাশ্চাত্যের পদ্ধতি এই উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইতে পারিলেই সিদ্ধি অনায়াসলভ্য হইতে পারে।

প্রঃ—'জো সো করে' সত্যকে লাভ করাই যখন আমাদের উদ্দেশ্য

তখন অত গোলমাল হাঙ্গামার ভিতর যাওয়ার আমাদের প্রয়োজন কি? তদপেক্ষা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া, প্রবল বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক বিবিক্তসেবী ও ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করাই কি অধিক নিরাপদ্ নহে? স্বদেশ দেবতার সেবা করিতে যাইয়া সহস্রপ্রকার কর্ম্মের ভিতর আপনাকে নিয়োজিত রাখা—সে তো 'খাল কাটিয়া কুমীর ডাকার' মত অযথা চিত্তবিক্ষেপ জন্মিবার সুবিধাই করিয়া দেওয়া মাত্র। তাহাতে পতনের ভয়ই অধিক। আমাদের মনে রাখা উচিত—"সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্"।*

উঃ—আপত্তিটি সম্পূর্ণ একদেশী, সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে বেশ যুক্তিসঙ্গত মনে হইলেও ইহার ভিতর তলাইয়া দেখিবার অনেক কথা আছে। যে মূলতত্ত্বের উপর আপত্তিটি প্রতিষ্ঠিত তাহা এই:—প্রথমতঃ, যাহাতে বিক্ষেপের কারণ উপস্থিত হইয়া মূল উদ্দেশ্য হইতে সাধককে দূরে সরাইয়া না দেয়, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া বিক্ষেপের কারণকে দূর করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ, তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক কোনও অবান্তর বিষয়ে মনকে অনুরক্ত হইতে না দিয়া যাহা ইষ্ট তদ্বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন চিত্তবৃত্তি-প্রবাহের সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করা। এই সাধারণ তত্ত্ব দুইটি যে সকল প্রকার সিদ্ধিরই মূলমন্ত্র হওয়া উচিত সে বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তিই থাকিতে পারে না। কিন্তু উপরোক্ত আপত্তিটিতে যেরূপ ভাবে এই সাধারণ প্রতিজ্ঞা দুইটি প্রয়োগ করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে তাহাতে সম্পূর্ণ একদেশিতার আশ্রয় লইয়া ক্ষিপ্রতার সহিত একটা মত প্রকাশ করিয়া ফেলা হইয়াছে মাত্র। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কারণ-নাশেই কার্য্যনাশ হয়। এখন দেখা যাক্, যে বিক্ষেপ হইতে আমরা দূরে থাকিতে চেষ্টা করিব তাহার মূল কোথায়। 'রাগ-দ্বেষ' এই দুইটি ছাড়া বিক্ষেপের অন্য কোনই কারণ নাই। যাহার যে বিষয়ে অনুরাগ বা দ্বেষ নাই সে বিষয় কিছুতেই তাহার বিক্ষেপ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। 'রাগ-দ্বেষ' মনের ধর্ম্ম, বিষয়ের নহে। যদি বিষয়ের ধর্ম্ম হইত তবে উহার সংস্পর্শে

* এ জগতে সকল বস্তুই ভয়ান্বিত, একমাত্র বৈরাগ্যই অভয়প্রদ।

সকল মনেই 'রাগ-দ্বেষ' উৎপন্ন হইত। আলোর ধর্ম্ম প্রকাশ করা; উহার সংস্পর্শে কোথাও বস্তু-প্রকাশ হইতেছে কোথাও হইতেছে না—এরূপ দেখা যায় না। পুরুষ আপনার মনের 'রাগ-দ্বেষ' বিষয়ে আরোপ করিয়া বিষয় গ্রহণ করে। এমন কি, চিত্তনিহিত 'রাগ-দ্বেষ' দ্বারাই বিষয়ের সৃষ্টি করে—যেমন স্বপ্নাবস্থায় বাহ্য বিষয়ের লোপ হইলেও পুরুষ মনোপ্রভাবে আপন জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহা ভোগ করতঃ সুখদুঃখ অনুভব করে।

"স্বপ্নেহর্থশূন্যে সৃজতি স্বশক্ত্যা ভোক্ত্রাদি বিশ্বং মন এব সর্ব্বম্।
তথৈব জাগ্রত্যপি নো বিশেষস্তৎ সর্ব্বমেতন্মনসো বিজৃম্ভণম্॥*

(বিঃ চূঃ, ১৭২)

সুতরাং, চিত্তে 'রাগ-দ্বেষ' বর্ত্তমান থাকিলে বাহ্যতঃ বিষয়ের সংস্রব পরিত্যাগ করিলেই যে বিক্ষেপের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া গেল ইহা ভাবা মূঢ়তা মাত্র। যে পর্য্যন্ত না মন হইতে 'রাগ-দ্বেষ' সমূলে উৎপাটিত হইতেছে সে পর্য্যন্ত গহন অরণ্যে একাকী চোখ-কান বন্ধ করিয়া থাকিলেও বিক্ষেপের অভাব হইবে না। "বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাম্"—(আসক্তিবান্ ব্যক্তির বনে গেলেও বিষয়চিন্তার নিবৃত্তি হয় না)। যাঁহাদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা জানেন যে 'রাগ-দ্বেষ' লইয়া বিবিক্ত-সেবা, বিষয়ের সংস্রব অপেক্ষাও কত অধিক বিক্ষেপের কারণ হইয়া থাকে। দুই একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার কথা উল্লেখ করা এখানে মন্দ হইবে না। একজন সাধকের একদা কোনও ব্যক্তির সহিত সামান্য বচসা হয়, তাহাতে সাধকটি ঐ ব্যক্তির উপর খুব বিরক্ত হন্। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই সাধকটি বিবিক্তসেবী হইয়া ধ্যানাদি অভ্যাসে মনোনিবেশ করেন। সাধকটি বলেন যে, ঐ যে ব্যক্তির উপর তিনি রুষ্ট হইয়াছিলেন, ধ্যান করিতে বসিলেই তাঁহার মন সে ব্যক্তির একটি জীবন্ত জাগ্রত মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া গভীর অভিনিবেশ সহকারে তাঁহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইত। সে বিবাদের রকমই বা কত! অমন বিবাদ মানুষ মানুষের সহিত করিতে

---

* যেমন বিষয়শূন্য স্বপ্নাবস্থায় মন নিজ শক্তিপ্রভাবে ভোক্তৃভোগ্যাদি নিখিল বিশ্বের সৃজন করে, জাগ্রৎ অবস্থাতেও তদ্রূপ; ইহাতে কোন বিশেষত্ব বা পার্থক্য নাই। সুতরাং এই সকলই মনের বিলাস বা কল্পনামাত্র।

পারে না। সাধকটি অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন মনকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না তখন সন্তাপিত চিত্তে বন্ধুভাবে ঐ ব্যক্তির সহিত কিছুকাল বাস করার পর ঐ বিষয়ে তাঁহার চিত্তবিক্ষেপ দূর হইয়া যায়।

অপর একজন সাধক বলেন, তাঁহার কতকগুলি বন্ধু ছিলেন; তাঁহারা সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত গল্পগুজব আমোদ-আহ্লাদ করিতেন। সাধকটি বন্ধুদিগকে ছাড়িয়া নির্জ্জনে সাধনা করিবার সময় অনুভব করিতেন যেন ঐ সকল বন্ধুরা তাঁহার চারিপাশে খুব আসর জমাইয়া বসিয়া গিয়াছেন এবং তিনি তাঁহাদের সহিত কত আজগুবী গল্প, হাসি-তামাসা করিতেছেন! সাধকটি ইহাও বলেন যে, বন্ধুদিগের সহিত গল্প করিবার তাঁর একটা নেশার মত হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই তিনি নির্জ্জনে চলিয়া গিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন যে বন্ধুদিগের সংস্রব পরিত্যাগ করিলেই তাঁহার নেশা কাটিয়া যাইবে। এইরূপ কতই না ব্যাপার সাধকজীবনে নিত্য অনুভূত হইয়া থাকে; ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা জানেন। অবশ্যই বিবিক্তসেবা যে সম্পূর্ণ নিরর্থক তাহা প্রমাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। মাঝে মাঝে নির্জ্জন বাস করা যে প্রয়োজন তাহা সকল সাধকই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহাতে মনের জুয়াচুরি ধরা পড়ে এবং বন্ধনের কারণ যে কোথায় তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। শুধু এড়াইয়া চলিলেই যে বিক্ষেপের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না, মনের অন্তর্নিহিত 'রাগ-দ্বেষ'কে জয় করাই যে বিক্ষেপ নিবারণের একমাত্র উপায় তাহা সুপ্রমাণিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ 'রাগ-দ্বেষ' পুরঃসর বিষয়ের চিন্তাই বিক্ষেপের কারণ। গীতামুখে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন :—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে"। ইত্যাদি *

অতএব যাঁহারা 'রাগ-দ্বেষ' সম্পূর্ণ জয় করিতে পারেন নাই তাঁহাদের পক্ষে সহসা সঙ্গত্যাগ অপেক্ষা উদ্দেশ্য ঠিক রাখিয়া সাবধানে বিষয়ের কাছে কাছে থাকিয়া সৎসঙ্গ ও অভ্যাসের দ্বারা ধীরে ধীরে মনের সমতা অভ্যাস করাই অধিক ফলপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই। কর্ম্মেন্দ্রিয় বিষয়ে রত থাকুক

* যে ব্যক্তি নিয়ত বিষয়চিন্তা করে তাহার সেই সকল বিষয়ে আসক্তি জন্মে।

ক্ষতি নাই, কিন্তু চিত্তকে সর্ব্বদা স্থির রাখিতে চেষ্টা করিতে হইবে মূল উদ্দেশ্যে।

"যস্ত্বিন্দ্রিয়ানি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥"* (গীতা, ৩৭)

পক্ষান্তরে কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত রাখিয়া মনে মনে বিষয় গ্রহণ করিলে তাহাতে লাভ না হইয়া লোকসানের মাত্রাই অধিক হইবে।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"† (গীতা, ৩৬)

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ লইয়াই মানুষের প্রকৃতি গঠিত। চরমসত্তা বা তুরীয় অবস্থা এই তিন গুণেরই পারে অবস্থিত। তমোগুণের আধিক্যে জড়তা, আলস্য, অনুৎসাহ, ভয় প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহাকে দূর করিবার জন্য কর্ম্মের প্রেরণা লইয়া আসিতে হয়, নিজেকে নানা হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিতে হয়। রজোগুণের লক্ষণ প্রবৃত্তি, উহা দুঃখ ও অশান্তির জনক। সেই দুঃখ নষ্ট করিবার জন্য নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করিতে হয়। উহা সত্ত্ব-মিশ্র-রজের ধর্ম্ম। তার ফলে সম্পূর্ণ নিষ্কাম হইতে পারিলে শুদ্ধ-সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হয়; তাহার ফল জ্ঞান ও সুখ। কিন্তু উহাও বন্ধনের কারণ, কেননা শুদ্ধ-সত্ত্বগুণের ফলে যে জ্ঞান ও সুখ অনুভূত হয় তাহাও সীমাবদ্ধ। গীতা বলিতেছেন, "সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ"—অর্থাৎ সেই সত্ত্ব ক্ষেত্রজ্ঞকে 'আমি সুখী, আমি জ্ঞানী,' এই প্রকার অভিমানাত্মক সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা বন্ধন করিয়া থাকে। কিন্তু এই সত্ত্বগুণ 'দগ্ধেন্ধনাগ্নিবৎ' (দগ্ধ-ইন্ধন অগ্নির ন্যায়) নিজেই উপশান্ত হইয়া যায়—উহাই 'অবাঙ্-মনসোগোচর' (বাক্য-মনের অতীত) তুরীয় অবস্থা।

---

* যে ব্যক্তি মন দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে নিয়মিত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মযোগের আরম্ভ করে, সেই ব্যক্তি ইতর মিথ্যাচার ব্যক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশেষিত হয়।

† যে ব্যক্তি বাহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে নিরুদ্ধ রাখিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়ের অনুধাবন করিতে থাকে, সেই ব্যক্তি বিমূঢ়াত্মা—তাহাকে কপটাচার বলা যায়।

ধ্যানাদি সত্ত্বগুণের কার্য্য, সুতরাং উপরোক্ত ক্রমে রজস্তমঃ অভিভূত করিয়া দিতে না পারিলে যথার্থ ধ্যান হওয়া অসম্ভব। একটি বাসনা বা সামান্য দ্বেষ চিত্তে লুক্কাইত থাকিলেও যে যথার্থ ধ্যান হয় না ইহা সকল সাধকই নিত্য উপলব্ধি করিতেছেন। সুতরাং ক্রমলঙ্ঘন করিলে সাধকের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হইয়া থাকে। এ জন্যই শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি।"* আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে ভগবানের পাঠশালা এই সংসারে 'ডবল্ প্রমোশনের' বন্দোবস্ত নাই।

দারুণ তমোগুণ অনেক সময়ে সত্ত্বের বেশে আসিয়া সাধককে প্রতারিত করিয়া থাকে—আলস্যকে নিস্পৃহতা, ভয়কে শমতা, অনবধানতাকে বৈরাগ্য বলিয়া ধারণা জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু যে সাধক যথার্থ অকপট, 'ভাবের ঘরে যাহার চুরি' নাই, সে সাধক তাহাতে প্রতারিত হয় না। সুতরাং 'পাশ কাটাইয়া' যাইবার চেষ্টা নিজের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করা মাত্র।—"এ যে নহে পথ পালাবার।" পলাইয়া যাইবে কোথায়? মন সঙ্গে সঙ্গেই আছে। বরং দৃঢ় অভ্যাস দ্বারা মনকে জয় করিতে পারিলে তখন সাধক বনেই থাকুক অথবা গৃহেই থাকুক উভয়ই তাহার তুল্য।

গুণত্রয়ভেদে বৈরাগ্যও মানুষের তিন প্রকার হইয়া থাকে। আলস্য ও জড়তা হেতু যে কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি, উহা তামস; উহা ত্যাগের ভাণ মাত্র—ত্যাগ নহে। আর ইষ্টবিয়োগ, ব্যর্থতা, লাঞ্ছনা বা শরীরায়াসভয় প্রভৃতি কারণে মনে মনে ভোগের ইচ্ছা থাকিলেও যে ভীতি বা দ্বেষজনিত কর্ম্মত্যাগ তাহা রাজস ত্যাগ; তাহাতে যথার্থ ত্যাগের ফল যে আনন্দ তাহা লাভ হয় না, কারণ হৃদয়নিহিত অতৃপ্ত বাসনারাশি তাদৃশ ত্যাগীকে যাতনা দিতে থাকে ও জোর করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া দেয়। আর হৃদয় হইতে সমস্ত আসক্তির অপগমে যে বন্ধন-

---

* অহঙ্কারবশে—'আমি যুদ্ধ করিব না'—অর্জ্জুনের এই প্রকার সঙ্কল্পের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—তোমার এই 'ব্যবসায়' (সঙ্কল্প) মিথ্যা, কারণ তোমার প্রকৃতি (রজোগুণাত্মক ক্ষত্রিয়-স্বভাবই) তোমাকে (যুদ্ধে) প্রবৃত্ত করিবে।

কারণের স্বাভাবিক অবসান তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। ঐরূপ ত্যাগীর পক্ষে বন বা রাজসম্পদ্ উভয়ই সমান। তিনি সমাধি অবলম্বন করিয়া বনেই অবস্থান করুন অথবা লোকশিক্ষার্থ জনপদেই বিচরণ করুণ—সর্ব্বাবস্থাতেই মুক্ত।'

সুতরাং যথার্থ নির্ব্বিণ্ণচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে ধ্যানযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক বনে অবস্থান উপপন্ন হইলেও, যাহার হৃদয় হইতে 'রাগ-দ্বেষ' অপসারিত হয় নাই, যিনি 'গোলমাল ও হাঙ্গামার' ভয়ে বৈরাগ্য-যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক বিক্ষেপের হাত হইতে বাঁচিয়া যাইতে ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে উহা কিছুতেই শ্রেয়স্কর হইতে পারে না। শ্রীভগবান বলিতেছেন :—

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥"*

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২০।৬-৭)

প্রধানরূপে এক একটি যোগ সাধকবিশেষের অবলম্বনীয় হইলেও অপ্রধান বা সহকারিরূপে অপর যোগগুলিও অবশ্য অবলম্বনীয়। সুতরাং ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, যিনি যে যোগই অবলম্বন করুন না কেন সিদ্ধির নিমিত্ত অপর যোগাঙ্গ সমূহেরও কিছু কিছু তাঁহাকে অভ্যাস করিতে হইবে। যিনি কর্ম্মযোগের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছুক তিনি যদি ইহা মনে করেন যে 'বৈরাগ্য' জ্ঞানযোগের সাধন কর্ম্মযোগের নহে, তবে তাঁহার মহাভুল বুঝা হইবে। অনাসক্তিই বৈরাগ্য—বিষয়ের নিকট হইতে ভয়ে পলায়ন করা নহে। সুতরাং বৈরাগ্যসাধনে একটু শিথিলপ্রযত্ন হইলেই কর্ম্মযোগী যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া সোপান পংক্তিতে পতিত ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় সোপান হইতে সোপানান্তরে

---

* জনগণের শ্রেয়ঃ (মোক্ষ) সাধনেচ্ছায় আমি জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি—এই ত্রিবিধ যোগের উল্লেখ করিয়াছি ; এতদ্ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। তন্মধ্যে ঐহিক-পারত্রিক বিষয়সুখ ও তৎসাধনভূত বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মে বিরক্ত সন্ন্যাসিগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং ঐ সকলে অবিরক্তচিত্ত কামিগণের পক্ষে কর্ম্মযোগ সিদ্ধিপ্রদ।

পতিত হইয়া গভীর জলে নিমজ্জিত হইবেন। অপরাপর যোগ সম্বন্ধেও ঐরূপ।

প্রঃ। বেশ কথা, আসক্তি থাকিবে না অথচ কর্ম্ম করিব, ইহাই তো কর্ম্মযোগের উপদেশ? যদি আসক্তিই না রহিল তবে আর কর্ম্মের প্রয়োজন?

উঃ। অপ্রয়োজনই বা কি? প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বোধ আসক্তিরই কথা। যাহার আসক্তি নাই তাহার কর্ম্মে বন্ধন বা ক্লেশ বোধ নাই; সুতরাং কর্ম্ম করা অপ্রয়োজন এ ভাব তাহার আসিতেই পারে না।

"প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা নৈব ধীরস্য দুর্গ্রহঃ।
যদা যৎ কর্ত্তুমায়াতি তৎকৃত্বা তিষ্ঠতঃ সুখম্॥"*

(অষ্টাবক্রসংহিতা)

তাদৃশ ধীর ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়া লোক-সংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

"সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥"†

(গীতা, ৩।২৫)

প্রঃ। আচ্ছা, অনাসক্তভাবে দেশের সেবা করিয়া সাধক নিজ উদ্দেশ্য—চরমসত্য লাভ করিতে পারিবেন ইহা না হয় বুঝা গেল, কিন্তু অনাসক্তি যত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে মানুষের কর্ম্মের প্রসারও তো ততই কমিতে থাকিবে। আমাদের শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণ বলেন যে আসক্তিতেই কর্ম্মের প্রসার এবং অনাসক্তিতেই কর্ম্মের সঙ্কোচ হয়। এমতাবস্থায় অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিলে দেশের দুর্দ্দশা দূর হইবার কোনও সম্ভাবনা আছে কি? এইরূপ অনাসক্তভাবে কাজ করিয়া দেশের শিল্প-বিজ্ঞানাদির তেমন উন্নতি হইবে কি—যেমন পাশ্চাত্যের হইয়াছে?

* যখন যে কায আসে তাহা যথাযথ করিয়া যে ধীর অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তি আনন্দে অবস্থান করেন, তাঁহার পক্ষে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কিছুতেই উদ্বেগকর হয় না।

† আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ফলাভিসন্ধিযুক্ত হইয়া যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, আত্মজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিগণও অনাসক্তভাবে লোক সংগ্রহেচ্ছু (লোক সাধারণকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করণেচ্ছু) হইয়া সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন।

উঃ। আসক্তি কমিলেই যে কর্ম্ম কমিয়া যাইবে এ কথা কিরূপে সিদ্ধ হইল? দুঃখবোধই কর্ম্ম পরিত্যাগের কারণ, আর আসক্তি দুঃখবোধের কারণ; সুতরাং আসক্তির অভাবে কর্ম্মে ক্লেশবোধ বা শ্রান্তির অভাব হইবে এবং তখনই কর্ম্মে যথার্থ আনন্দ আসিবে। "Intense work with intense rest"—উদ্দাম কর্ম্মশীলতার সহিত গভীর শান্ত ভাব—ইহাই কর্ম্মযোগের মূলমন্ত্র। আর উহা সম্ভবপর, কেননা Selflessness is tirelessness (শ্রান্তিশূন্যতাই স্বার্থত্যাগ)। সুতরাং অনাসক্তির সঙ্গে সঙ্গে যে কর্ম্ম কমিয়া যাইবেই তাহা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে।

গীতা বলিয়াছেন—

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥* (৪।১৮)

কর্ম্মে আসক্তি না থাকিলে, কর্ম্মের কর্ম্মত্ব আর থাকে না; তখন পুরুষ যাহাই করুণ না কেন তিনি সর্ব্বদা মুক্ত, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

যিনি যত অধিক নিঃস্বার্থ তিনি তত অধিক কাজ করিতে পারেন এবং তাহারই কাজ তত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" ঐরূপ নিঃস্বার্থ কর্ম্মীই কাজে সম্পূর্ণ তন্ময় হইতে পারেন; আর কাযে যদি ইষ্টের সেবা-বুদ্ধি থাকে তবে কাযে তন্ময় হওয়াও যা ইষ্টে তন্ময় হওয়াও তাহাই।

অথবা যদি আসক্তিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কাহারও কর্ম্ম শুষ্কপত্রের মত আপনিই খসিয়া পড়িয়া যায়, যদি তিনি—আমরা যাহাকে দেশহিতকর কার্য্য বলি—তাহাতে আপনাকে আর নিযুক্ত রাখিতে না পারেন, তবে তাদৃশ ত্যাগী মহাপুরুষের দ্বারা যে দেশের কোনই কল্যাণ সাধিত হইবে না তাহা মনে করা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। কারণ, ঐরূপ ত্যাগি-চূড়ামণি ব্রহ্মভূত মহাত্মাগণের জীবন, সংসার-জলধিতে ভ্রমণকারী দিশাহারা নাবিকদিগের জীবনের ধ্রুবতারা-স্বরূপ। কর্ম্মপথে ভ্রমণকারী সাধকের চিত্তে যদি কখনও স্বার্থানুসন্ধান বা আসক্তির ঘনঘটা উত্থিত হইয়া তাহাকে দুঃখগহনে

* যে ব্যক্তি কর্ম্মের মধ্যেও অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মের মধ্যেও কর্ম্ম দেখিয়া থাকেন, মনুষ্যগণের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ এবং তিনিই যোগী ও সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা।

চালিত করিতে উদ্যত হয়, তবে ঐরূপ ত্যাগি-শিরোমণির জীবনালোকই তাহাকে সুপথে চালিত করিয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিতে সর্ব্বথা সাহায্য করিয়া থাকে। তাদৃশ শিবস্বরূপ মহাপুরুষগণের নামোচ্চারণেও আসক্তি, অভিলাষ ও অমঙ্গল সিংহগর্জ্জনে ফেরুপালের মত দূরে পলায়ন করে। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারাই জাতীয়-জীবন-তরণীর কর্ণধার-স্বরূপ।

এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখিলে মন্দ হইবে না। কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত হইয়া কোন কোন সাধক মনে করেন—"সম্পূর্ণ আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা হইল কর্ম্মযোগের সিদ্ধ অবস্থার লক্ষণ, সুতরাং সাধন অবস্থায় কিছু কিছু আসক্তি রাখিতে হইবে।" এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে অগ্রসর হইয়া অনেক সাধক আশানুরূপ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। দীর্ঘকাল কর্ম্মানুষ্ঠানের পরও অনেক সাধককে বলিতে শুনা গিয়াছে—"দীর্ঘকাল তো কর্ম্ম করা গেল, কিন্তু মন স্থির হইল কৈ? হৃদয়ে যথার্থ আনন্দ না আসিয়া তো চাঞ্চল্যই বাড়িয়া যাইতেছে।" আমাদের মনে রাখা উচিত যে, 'ঘোগ' বন্ধ না করিয়া সমস্ত দিন ক্ষেতে জল-সেচন করিলে যেরূপ ঐ জল ক্ষেতে না যাইয়া বাহির হইয়াই যায়, সেইরূপ প্রথম হইতেই সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা না করিলে কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। আমি সাধ করিয়া বাসনাকে পুষিয়া রাখিব আর বাসনা আপনা-আপনি চলিয়া যাইবে, ইহা কি সম্ভবপর কথা? বাসনার সঙ্গে আপোষে বন্দোবস্ত হয় না। সাধন অবস্থাতেই মনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে—বাসনাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে। নিপুণ মল্ল যেরূপ নিজে সর্ব্বদা সাবধান থাকিয়া নানা প্রকারে প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্লান্তি সম্পাদনপূর্ব্বক পরিশেষে তাহাকে পরাস্ত করিয়া ফেলে; যথার্থ কর্ম্মযোগীরও সেইরূপ ইন্দ্রিয়নিচয়কে সর্ব্বদা কর্ম্মে ব্যাপৃত রাখিয়া বাসনাজয়পূর্ব্বক তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বশে আনয়ন করিতে প্রথম হইতেই বিশেষ যত্নপর থাকা কর্ত্তব্য। "যৌন্ সাধন তৌন্ সিদ্ধি"—সিদ্ধির যাহা লক্ষণ সাধন অবস্থায় তাহাই সাধনস্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এতটুকুও এদিক-ওদিক করিলে চলিবে না। "সর্ব্বত্রৈব

হ্যধ্যাত্মশাস্ত্রে কৃতার্থলক্ষণানি যানি তান্যেব সাধনান্যুপদিশ্যন্তে যত্নসাধ্যত্বাৎ যানি যত্নসাধ্যানি সাধনানি লক্ষণানি চ ভবন্তি তানি।"*

(শাঙ্কর-ভাষ্য, গীতা, ২।৫৫)

সিদ্ধ-অবস্থা ও সাধন-অবস্থাতে প্রভেদ এইটুকু যে সিদ্ধতে যাহা স্বাভাবিক, সাধন অবস্থায় তাহা যত্নসাধ্য। 'সিদ্ধ-অবস্থায় বাসনা থাকিবে না আর সাধন-অবস্থায় থাকিবে' এ ধারণা নিতান্ত সর্ব্বনেশে ধারণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই প্রভেদটুকু না বুঝিবার ফলে অনেক অকপট সাধককে অযথা কষ্ট পাইতে আমরা দেখিয়াছি। যাহা হউক, এখন দেখা যাক বর্ত্তমান দেশকাল ও শক্তিসামর্থ্য অনুসারে কি প্রণালীতে এই বিরাট্ উপাসনা-কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

সর্ব্বপ্রথমে আত্মবিশ্বাসের সুদৃঢ় পাষাণ-ভিত্তির উপরে জননী জন্মভূমির পবিত্র মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। স্মরণাতীত কাল হইতে বৈদেশিক বিজেতাগণ আমাদিগকে শুনাইয়া আসিতেছে—"তোমরা হীন, তোমরা দুর্ব্বল, তোমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তোমাদের বেদ অসভ্য মানবের যুক্তিহীন প্রলাপোক্তি, তোমরা অসভ্য বর্ব্বর।" শুনিয়া শুনিয়া আমরা তাহাই হইয়া গিয়াছি; যে দিন হইতে আমরা আত্মবিশ্বাস হারাইয়াছি সে দিন হইতেই আমাদের অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে। আমাদিগকে আজ লইয়া আসিতে হইবে সেই আত্মপ্রত্যয় যাহা শিশু নচিকেতাকে যমালয় হইতে আত্মজ্ঞান লাভ করাইয়া ফিরাইয়া আনিয়াছিল। বীর্য্যপ্রদ উপনিষদের মহান্ আত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী হইয়া আমাদিগকে মহাবীর্য্যবান্ হইতে হইবে—উহার সার্ব্বজনীন, সার্ব্বভৌমিক, বিশাল, উদার অথচ সহজ সরল উপদেশসমূহ সর্ব্বসাধারণের ভিতর অকাতরে ছড়াইয়া দিতে হইবে; এবং উহাকেই অবলম্বন করিয়া সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইবে। দেশে উপনিষদের আলোচনা বহুল পরিমাণে হইলে, শিক্ষার অভাব, অর্দ্ধশিক্ষা বা কুশিক্ষার ফলে উহাদিগের প্রতি লোকের যে

---

* সকল আধ্যাত্মশাস্ত্রেই কৃতকৃত্যতার যে সকল লক্ষণ অর্থাৎ কৃতার্থ (জীবন্মুক্ত) ব্যক্তির যাহা লক্ষণ তাহাই সাধনস্বরূপে উপদিষ্ট হইয়া থাকে, যেহেতু এ সকল লক্ষণ যত্নসাধ্য। যে সকল সাধন যত্নসাধ্য তাহাই (কৃতকৃত্য সাধকের) লক্ষণ হইয়া থাকে।'

ভীতি বা ভুল ধারণা আছে তাহা সহজেই দূরীভূত হইয়া দেশের লোকের হৃদয়ে যথার্থ সত্যের জ্যোতি প্রকাশিত হইবে, যথার্থ আত্মপ্রত্যয় ও শ্রদ্ধার উদয় হইবে, সকল প্রকার ভেদবুদ্ধি ও অল্পপ্রাণতা দূরীভূত হইয়া যথার্থ সমদর্শিতা ও একপ্রাণতার আবির্ভাব হইবে। ভারতের বহু শাখায় বিভক্ত, পরস্পর-বিবদমান, বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত জাতীয়শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিবার একমাত্র উপায়—উপনিষদের মহান্ আত্মতত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন। মূলব্যাধি দূরীভূত হইলে যেমন আনুষঙ্গিক উপসর্গ সকল আপনা হইতেই শান্ত হইয়া যায়, সেইরূপ উপনিষদের এই মহান আত্মতত্ত্ব জাতিহৃদয়ে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হইলে সকল দুঃখ, সকল দৈন্য নিশ্চয়ই অপসারিত হইবে।

স্বার্থশূন্যতার সুবর্ণবেদীর উপর জননীর রত্নসিংহাসন স্থাপন করিতে হইবে। দাসসুলভ ঈর্ষা, প্রভুত্বপ্রিয়তা, আরামপ্রিয়তা ও হীন স্বার্থানুসন্ধানই জাতিকে সকল প্রকার মহৎকার্য্য ও সংহত-চেষ্টার অনুপযোগী করিয়া রাখিয়াছে। আমরা নিজের একটু আরামের চেষ্টায়ই সারাদিন ছুটাছুটি করিতেছি, দেশের বা দশের জন্য চিন্তা বা কার্য্য করিবার অবসর আমাদের কোথায়? আমরা বক্তৃতা দিতে পারি—কাজ করিতে পারি না; করিলে ভাল হয় বুঝি, কিন্তু করিবার সাহস বা ক্ষমতা নাই। অপরে করিয়া দিলে নির্লজ্জের মত তাহার ফলভোগ করি, আবার গোপনে গোপনে তাহারই নিন্দায় পঞ্চমুখ হই। সুতরাং নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, জনহিতকর অনুষ্ঠান সমূহের জন্য সমিতি গঠন করিয়া, সাধারণে শিক্ষাবিস্তার, দুঃস্থের সেবা, পল্লীর স্বাস্থ্য, কৃষি ও বানিজ্যের উন্নতি প্রভৃতি সেবাকার্য্যে স্বার্থশূন্যতা ও কর্ম্মকুশলতা-অভ্যাসশীল যথার্থ 'মানুষ'—যথার্থ citizen গড়িয়া তুলিতে হইবে। শূন্য উপদেশে কাজ চলিবে না। "Be and make, let that be your motto"—'নিজে মানুষ হও এবং অপরকেও মানুষ হইতে সাহায্য কর—এই তোমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হউক। "কথা অনেক হইয়াছে, এখন আমাদের মুখ কিছু দিন বন্ধ থাকিলেও ক্ষতি হইবে না। এখন আমাদের কাজ কথা বলুক।" "One ounce of

practice is worth twenty thousand tons of big talk." —অনেক বড় কথায় এতটুকুও কাজ হয় না, কিন্তু এতটুকু যথার্থ কাজে অনেক বড় কাজের পথ পরিষ্কার হয়। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"—(এই যোগধর্ম্মের অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠান মহৎ সংসারভয় হইতে ত্রাণ অর্থাৎ রক্ষা করিয়া থাকে)। স্বার্থ-পরতা বা বাসনাকেই বেদান্তশাস্ত্র মায়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বাসনাই জগৎ, বাসনাকে ছাড়িয়া দিতে পারিলেই জগৎকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল; তার পর, যাহা থাকে তাহা আর জগৎ নহে—তাহাই ব্রহ্ম। এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে স্বার্থত্যাগ করিতে অভ্যাস করিয়াই, আমরা যথার্থ বেদান্তের সাধনায় অগ্রসর হইব—বেদান্তের "ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা"-বাণীর যথার্থ অনুভূতি লাভ করিয়া নিজেরা ধন্য ও সকলকে ধন্য করিব। আমাদের বেদান্ত শুধু পুঁথিতে আবদ্ধ থাকিবে না, আমাদের দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে আমরা এইরূপে বেদান্তকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিব। স্বামিজী ইহাকেই Practical Vedanta আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

প্রেম, সত্যানুরাগ, বীর্য্যবত্তা ও সমদর্শিতার ভিত্তিতে সাম্য-মৈত্রীর সুরম্য হর্ম্ম্য রচনা করিয়া শান্তির গগনস্পর্শী ধবলকেতু তাহাতে উড্ডীন করিয়া দিতে হইবে। সেই মঙ্গলকেতু সর্ব্বত্র শান্তির বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া জগতে স্বর্গরাজ্য গড়িয়া তুলিবে। স্বার্থ, সঙ্কীর্ণতা, ঈর্ষা-দ্বেষ ও ভেদদৃষ্টির প্রভাবেই জগতে এত অশান্তি এত অত্যাচার ও নরকের বিভীষিকার সৃষ্টি হইয়াছে,—মানুষ মানুষের রক্তপানে উন্মত্ত হইতেছে, একজাতি অপর জাতির সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে! সুতরাং নিজেরা প্রথমতঃ সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হইয়া, সঙ্গে সঙ্গে জগতের অন্যান্য জাতিদিগকে এই মহান্ সত্য শিক্ষা দিয়া জগতে যথার্থ শান্তি-সাম্য-মৈত্রী স্থাপনের আয়োজন আমাদিগকেই করিতে হইবে। নিজে শান্তিতে থাকিতে হইলে প্রতিবেশীকেও শান্তিপ্রিয় করিয়া লইতে হয়, নতুবা নিজেরও শান্তিতে থাকা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং পৃথিবীর সর্ব্বত্র বেদান্তের এই মহান্ সত্য নির্ভয়ে প্রচার করিয়া পৃথিবীতে যথার্থ শান্তি স্থাপনের পৌরোহিত্য আমাদিগকেই করিতে হইবে।

ভয়, দুর্ব্বলতা, আরামপ্রিয়তা ও স্বার্থানুসন্ধানই পাপ—উহাই মায়া—উহাই জগৎ! উহাদিগকে সবলে উৎপাটিত করিয়া মুক্ত কেশরীর মত নির্ভয়ে ধরণীর সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া শান্তির বার্ত্তা আমরাই—পদদলিত, উপেক্ষিত আমরাই—ঘোষণা করিব!

তবে এস, নূতন যুগের নবীন সাধক! হৃদয়ভরা প্রেম ও প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ লইয়া এস—মুখে সত্য, ললাটে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, নয়নে দৃপ্ত সাহস ও সর্ব্বাঙ্গে কর্ম্মকুশলতার বিদ্যুচ্চমক লইয়া এস! তোমার প্রতি পদক্ষেপে, স্বার্থ, দুর্ব্বলতা ও মিথ্যার তুচ্ছ বাধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাক্! জগতের যেখানে যে রত্ন আছে, তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া যে যাহা সংগ্রহ করিতে পার সব লইয়া এস, যার যা আছে—হউক ক্ষুদ্র, হউক তুচ্ছ—তাই লইয়া এস মায়ের শ্রীচরণে অঞ্জলি প্রদান করি! আমরা সিদ্ধিলাভ করিয়া এস জগৎকে তাহা অকাতরে বিলাইয়া দিয়া নিজেরা ধন্য ও সকলকে পবিত্র করি! স্থল-জল-বিমান কম্পিত করিয়া বলি "বন্দেমাতরম্"!!

এস মা!

(শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ)

এস মা আনন্দময়ি, আবার এই নিরানন্দময় বঙ্গভূমিতে আসিয়া তোমার আনন্দধারায় সমস্ত দেশ প্লাবিত করিয়া দাও! তোমার আগমনের সময় সমাগত। পরম শোভাশালী শরৎঋতুর মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশে পূর্ণশশধর উদিত হইয়া রজত-কিরণ-ধারায় অর্দ্ধজগৎ প্লাবিত করিতেছে। জলস্থল কুসুমসম্পদে ভূষিত হইয়া যেন তোমারই আগমন-প্রতীক্ষায় পথপানে চাহিয়া আছে। তুমি ত মা, প্রতিবৎসর এমনই দিনে বঙ্গকুটীরে শুভ পদার্পণ করিয়া থাক। এবারও সেই দিন ত

আগতপ্রায়। এস মা, তোমার দীন সন্তানগণের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া আবার এস ! রোগে, শোকে, অনাহারে, দুঃখে, দৈন্যে আজ যে ভারতবাসী বড়ই প্রপীড়িত মা ! তাহারা ক্ষুধায় একমুষ্টি অন্ন পায় না, পিপাসায় জল পায় না, রোগে ঔষধ পায় না, শোকে সান্ত্বনা পায় না ! জগতের কেহই ত তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহে না ! কেহই ত এ দুঃসময়ে তাহাদের সহায় হইতে আসে না ! তুমি বিনা আর কে তাহাদের দেখিবে, জননি ! সন্তানের মা বিনা আর কে সহায় আছে ?

একদিন ছিল, যেদিন এদেশ ধনধান্যপুষ্পসম্ভারে জগতের সকল দেশের সেরা বলিয়া পূজিত হইত—সমগ্র জগৎ যেদিন তাহাদের অশন-বসন প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তুর নিমিত্ত এই ভারতভূমির পানে সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া থাকিত ; একদিন ছিল, যখন বলে, বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, বিদ্যায় এদেশ জগতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত, কিন্তু অদৃষ্টচক্রের কঠোর আবর্ত্তনে ভারত-ভাগ্যাকাশে দুঃখধূমকেতুর উদয় হইয়াছে ! কতদিনে যে তাহার অস্ত হইবে জানি না। আজ ভারতমাতা মলিন-বদন ও রুক্ষকেশে, দীন সাজে জগতের সমক্ষে উপনীতা ! অতীতের মহিমামণ্ডিত স্মৃতি ব্যতীত আজ আর তাঁহার কিছুই অবশিষ্ট নাই ! রাজরাণী আজ ভিখারিণী—পথের কাঙ্গালিনী সাজিয়াছে ! ত্রিংশকোটী সন্তানের জননী আজ অশন-বসনের জন্য পরের দ্বারস্থ ! এখনও তাঁহার ক্ষেতভরা ধান কিন্তু তবু তাঁহার সন্তানের পেটে অন্ন নাই ! ভারতবাসী আজ বাস্তবিক জীবন্মৃত। প্লাবন, দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা প্রভৃতি আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক অত্যাচারে ভারতের হাস্যমুখরিত শান্তপল্লী আজ নীরব শ্মশান ! একদিন যেখানে কোলাহল-ময় রাজপথ ছিল, একদিন যেখানে পল্লীর কুটীরে কুটীরে গোলাভরা ধান, দুগ্ধবতী গাভী, নদী-ভরা মাছ ছিল—একদিন যে পল্লীর নিবিড় ছায়াশীতল বাসভবন স্বাস্থ্যসম্পদে হাস্যমুখরিত ছিল—আজ সেখানে ব্যাঘ্র শিবা প্রভৃতি শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী বিদ্যমান ; ভয়ে সেদিকে কোন পথিক যায় না। ভারতের—বিশেষতঃ বঙ্গের—সকল পল্লীর অবস্থা আজ প্রায় এইরূপ !

কেন আজ সুজলা সুফলা শ্যামা ভারতভূমি এদশায় উপনীতা? প্রধান কারণ,—ভারতভূমি আজ হিংসাদ্বেষের লীলাস্থল। যে স্থানে আব্রহ্ম-কীট-পতঙ্গ সকলের হৃদয়েই স্বর্গীয় ভালবাসা বিরাজ করিত, যে দেশে একটী লোকের দুঃখ দেখিয়া শতলোকের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, যাহাদের ধর্ম্মে "জীবে প্রেম" "স্বার্থত্যাগ" প্রভৃতি উদার মহান্ ভাব সকল প্রচলিত ছিল, যে দেশে একদিন লোকে নিজের শত বিপদ তুচ্ছ করিয়াও পরের মঙ্গলের নিমিত্ত—দুঃখীর দুঃখ মোচনের নিমিত্ত ছুটিয়া যাইত, আজ সে দেশে এক ভ্রাতার দুঃখে অপর ভ্রাতা আনন্দ পায়, তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে না! এক ভ্রাতা হয়ত উপবাসে দিনযাপন করিতেছে, আর একই গৃহে অপর ভ্রাতা চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় চতুর্ব্বিধ অন্ন-ব্যঞ্জনে উদরপূর্ত্তি করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। যেস্থানে ভ্রাতায় ভ্রাতায় এই ভাব সেস্থানে লোকে অপরের জন্য স্বার্থত্যাগ করিবে, অপরের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তন্নিবারণের চেষ্টা করিবে এ যে স্বপ্নেরও অগোচর! দেশময় কেবল 'স্বার্থ' 'স্বার্থ' এই রব! স্বার্থ ছাড়া একটী কথাও কেউ বলে না। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থান্বেষণে ব্যস্ত, পরের দিকে কে আর ফিরিয়া চায়? যেখানে স্বার্থপরতা সেই স্থানেই নানা উপায়ে স্বার্থ বজায় রাখিবার চেষ্টা—ফলে পাপ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে শান্তির আলয় অশান্তিপূর্ণ হইয়াছে। সত্য, সরলতা, বন্ধুভাব, বিশ্বাস এসব ভারতভূমি হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে—আর তথায় স্থান লইয়াছে মিথ্যা, কপটতা, ছলনা, অবিশ্বাস প্রভৃতি। 'জীবে প্রেম' যে দেশে ধর্ম্মের সূত্র ছিল, আজ 'ছুঁওনা', 'ছুঁওনা' ভাবে সে দেশ পরিপূর্ণ। মেশামিশি গলাগলি ভাব আর নাই। ধর্ম্মের স্থান অধর্ম্ম আসিয়া গ্রহণ করিয়াছে। আমরা চাই শুধু অর্থ। যে উপায়েই হোক না কেন, অর্থোপার্জ্জনই আজ আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে। আবার অর্থোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ আসিয়া আজ আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছে। বৈদেশিক সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া উহার উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা না বুঝিয়া সকলই অনুকরণ করিতেছি। লাভের

মধ্যে বিচারহীন অনুকরণের ফলে গুণটুকু না হোক, দোষটুকু সম্পূর্ণ আসিয়া আজ আমাদের সমাজ প্লাবিত করিয়াছে। পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিতে যাইয়া তাহাদের তেজ, বীর্য্য, সাহস, তাহাদের কর্ম্ম-তৎপরতা, তাহাদের স্বদেশপ্রিয়তা, জাতীয় উদ্দেশ্যলাভের নিমিত্ত তাহাদের সমবেত চেষ্টা, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগ এসকলের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িল না—আমরা দেখিলাম ও শিখিলাম কেবল তাহাদের বিলাসপ্রিয়তা। বিলাসিতার স্রোতে ভারতভূমি আজ ডুবু ডুবু। আমরা এমন বিলাসী হইয়া পড়িয়াছি যে আমাদের চোক্ষের সম্মুখে লোক অনাহারে মরিতেছে, তবু আমরা বিলাসিতা একটু কমাইয়া তাহাদের বাঁচিবার উপায় করিতে পারিতেছি না। জলাভাবে লোক শুষ্ককণ্ঠে চীৎকার করিতেছে; আমরা শুনিতেছি, দেখিতেছি, কিন্তু সামর্থ্য থাকিতেও তাহাদের পানীয় জলের সুব্যবস্থা করিতেছি না। কত গ্রামবাসী, প্রতিবেশী নিত্য ম্যালেরিয়া, ইন-ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে ভুগিয়া মরিতেছে—আমরা গ্রামে থাকিয়া চেষ্টা করিলে হয়ত উহাদের প্রতিরোধের উপায় করিতে পারিতাম; কিন্তু আত্মসুখচিন্তা আমাদের এত অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে যে, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অশেষপ্রকারে আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিতেছে, যথেষ্ট অর্থ ও লোকবল থাকা সত্ত্বেও, আমরা তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে ফেলিয়া রাখিয়া নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারসহ সহরে চলিয়া আসিতেছি ও তথায় বেশ আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাইতেছি। দেশে জনসাধারণ মরিতে বসিয়াছে তাহাতে আমাদের কি?—ধন্য আমাদের স্বার্থপরতা! আজ যাহাও এক-আধটু দেশের ও দশের কাজ করিবার এষণা দেখা যাইতেছে, তাহারও পশ্চাতে পর্ব্বতপ্রমাণ নামযশের আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থবুদ্ধি রহিয়াছে! আমরা সকলেই Leader বা সর্দ্দার হইতে চাই, কিন্তু কেহই 'শিরদার' হইতে চাহি না; বক্তৃতা করিবার সময় আমরা পঞ্চমুখ হই—কেবল কাজের বেলায় নারাজ!

ভাল হউক, মন্দ হউক আমরা চাই নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য। স্বার্থত্যাগ-মূলক আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া আমরা ভোগসহায়ে মানুষ হইতে চাই! বনিয়াদ কাঁচা রাখিয়া আমরা তাহার উপর সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ

করিতে ইচ্ছা করি!' আমরা এই ধ্রুব সত্যটা বুঝি না বা বুঝিতে চেষ্টা করি না যে, যেখানে নিঃস্বার্থপরতা, প্রীতি, উদারতা, আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায়, উদ্যম ও আজ্ঞাবহতা নাই, সেখানে কখনও 'মানুষ' তৈয়ারী হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সাধনায়ই মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। রজোগুণের ভিতর দিয়া—বিচারসহকৃত প্রবল কর্ম্মশীলতার ভিতর দিয়াই মানুষের আত্মশক্তি জাগ্রত হয়—তাহার অন্তরস্থ অনন্তশক্তির স্ফুরণ হয়। এই আত্মশক্তির জাগরণ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সাধনা। কতকগুলি মতমতান্তরে বিশ্বাস বা অন্ধভাবে কতকগুলা লোকাচার বা দেশাচার মানিয়া চলাই ধর্ম্মসাধনা নহে। আত্মা যখন জাগ্রত হন তখন সকল দিকেই তাঁহার প্রকাশ দেখা যায়। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই মানুষ বলীয়ান্ হইতে থাকে। দুর্ব্বলতা ধর্ম্মের চিহ্ন নহে—অধর্ম্মের চিহ্ন। ধর্ম্মের লক্ষণ সবল হওয়া—'অভীঃ' হওয়া—স্বাবলম্বী হওয়া। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন যখন এই ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে থাকে তখন জাতীয় জীবনেও তাহার লক্ষণ দেখা দেয়। যে জাতির মধ্য হইতে নীচভাব, দীনভাব, স্বার্থ, আলস্য ও পরমুখাপেক্ষার ভাব দূর হইতেছে—যে জাতি নিজের অন্নবস্ত্রের, নিজের শিক্ষার, নিজের স্বাস্থ্যের সকল অভাব দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে—অপর কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া নাই—সে জাতির লোকেরা ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছে বুঝিতে হইবে। অবশ্য ভাব-ভক্তিতে তন্ময় হওয়া অথবা ধ্যানে দেহজ্ঞানরহিত হওয়া ধর্ম্মলাভের চরম লক্ষণ বটে, কিন্তু এরূপ লোক সমগ্র জাতির মধ্যে মুষ্টিমেয় হয় মাত্র। অবশিষ্ট সকলে চরিত্রবান্, নির্ভীক, উদ্যমী, পরোপকারী হইয়া দেশের ও জগতের কল্যাণসাধন করিয়া থাকে।

কিন্তু মা, আমাদের মধ্যে সে লক্ষণ কই? আমরা ত দিন দিন স্খলিতচরিত্র, ভীরু, নিরুদ্যম, স্বার্থপর হইতে চলিয়াছি। তাই মনে হয়, আমরা তোমায় ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা তোমার সন্তান—এ কথা মনে থাকিলে ত আমরা এতদূর নীচ হইতে পারিতাম না। একি মোহমেঘে ভারতগগন আচ্ছন্ন করিয়াছ, মা! যে তোমাকে ডাকিতেও

আমরা ভুলিয়াছি! শুনিয়াছি, জননী সন্তানের দুঃখ দেখিতে পারে না—সন্তান যদিও মাকে ভুলিয়া যায় মা কি কখনও সন্তানকে ভুলিতে পারে? মা ভুলিলে ত সন্তান বাঁচিতে পারে না! আজ তোমার সন্তানগণ বিপন্ন—তুমি বিনা তোমার সন্তানকে আর কে বিপন্মুক্ত করিবে? এস মা অভয়া! তোমার অভয় চরণযুগলের ছায়া দিয়া, তোমার অভয়হস্তের আশ্বাস দিয়া তোমার আর্ত্ত সন্তানগণকে রক্ষা করিবে এস! আজ আমরা অন্নহীন বস্ত্রহীন! এস মা অন্নদে, তোমার অন্নপূর্ণারূপে ভারতের গৃহে গৃহে অন্নদান কর! হৃদয়ে ভক্তি নাই! মা ভক্তিদায়িনি, তোমার সন্তানগণের হৃদয়ে ভক্তির উৎস প্রবাহিত কর! আমরা আজ দুর্ভিক্ষে, রোগে, শোকে ভীত, প্রপীড়িত, শক্তিহীন হইয়াছি! মহাশক্তিরূপিনি মা, তোমার যে শক্তির কণিকামাত্র লাভ করিয়া দেবগণ অসুরজয়ী হইয়াছিলেন, আজ আমাদের সেই শক্তি দাও! আমাদের হৃদয় হইতে হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা মুছিয়া দিয়া উহা মৈত্রী, ভালবাসা, স্বার্থহীনতায় ভরিয়া দাও! আমরা যেন সর্ব্বভূতে তোমার প্রকাশ দেখিয়া "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" করিয়া ধন্য হই! এস মা আনন্দময়ি! তোমার আনন্দধারায় সমস্ত দেশ প্লাবিত করিয়া আমাদের নিরানন্দময় জীবনের অবসান করিয়া দাও! দূর করিয়া দাও দেশ হইতে দুঃখ, দৈন্য, দুর্ভিক্ষ, রোগ-শোক—তোমার আগমনে দেশে আবার চিরশান্তি বিরাজ করুক! তোমার মঙ্গলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভারতসন্তান আজ ভেদ-গর্ব্ব-অভিমান ভুলিয়া নবোৎসাহে নূতন উদ্যমে তোমারই সেবায় ব্রতী হউক—বলবীর্য্যে, শৌর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে ভারত আবার সেই প্রাচীন গৌরব-শ্রী ধারণ করুক।

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যেত্র্যম্বকেগৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

সুশীল মাষ্টার।

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)

ক্রমাগত তিনবার, এফ্‌-এ পরীক্ষায় ফেল করিবার পর বাবা বিরক্ত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধন হইতে আমাকে মুক্তি দিলেন। কলেজ ছাড়িতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না, কিন্তু সাধের কলিকাতা ছাড়িতে মন কিছুতেই রাজী হইল না। পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার মত সৎসাহস তখনও আমার হয় নাই! কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাড়ী ফিরিতে বাধ্য হইলাম। বাবার মেজাজ আমি ভালরকমই জানিতাম, তাঁহাকে চটাইয়া দিয়া নিজেকে অসুবিধার মধ্যে ফেলিবার মত আহাম্মক কোন দিনই আমার ছিল না। একান্ত বাধ্য-পুত্রের মত বাবার ইঙ্গিতে জমীদারী কাজকর্ম্ম দেখিতে লাগিলাম। কয়েক মাসের মধ্যেই জমীদারী সংক্রান্ত কার্য্যে আমার দক্ষতার পরিচয় পাইয়া এবং কলেজে পড়িয়া যে আমার মাথা খারাপ হইয়া যায় নাই, তাহার বহুতর প্রমাণ পাইয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। সত্যই প্রায় একবৎসর মধ্যেই আমি বাবার প্রায় বারো আনা কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিলাম। আমলা, নায়েব, গোমস্তারা আমি যে কালে এক জন জবরদস্ত জমীদার হইব তাহা বুঝিয়া লইল। সহুরে বাবু আমি— জমীদারী শাসন করিতে গিয়া এত বদলাইয়া গেলাম যে সময় সময় নিজেই বিস্মিত হইয়া যাইতাম।

আজকালকার অনেক অসার উপন্যাস যেমন "ঝক্‌ঝকে রেশমী বাঁধাই" "সোনার হরপে নাম লেখা" ইত্যাদির জোরে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে অনায়াসে প্রতিষ্ঠালাভ করে, আমিও মানুষ যাহাই হই না কেন, যথাসম্ভব হালফ্যাসানের বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, নাকে সোনার চশমা আঁটিয়া, দাড়ীগোঁফ্‌ কামাইয়া অনায়াসেই গ্রাম্য যুবকগণের মধ্যে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া লইলাম। তাসপাশা খেলা, পরনিন্দা,

তামাক-সিগারেট পোড়ানো দস্তুর মত চালিতে লাগিল। আমার এই সমস্ত বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই আমি বড়লোক ও জমীদারের ছেলে বলিয়া এত হেয়ভাবে আমার খোসামুদী করিত যে অনেক সময় হাস্যসম্বরণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। ইহাদের নীচসঙ্গে আমি ক্রমে ক্রমে গর্ব্বিত, অভিমানী ও সঙ্কীর্ণহৃদয় হইয়া পড়িতেছি—বেশ বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু দলের মোহ আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। একরকম বেশ নিশ্চিন্ত-আলস্যে হাস্যকৌতুকে গ্রাম্যজীবনের দীর্ঘ অবসর কাটিয়া যাইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা সান্ধ্যভ্রমণের নাম করিয়া নদীতীরে বসিয়া জটলা করিতেছিলাম। বিষয় পরনিন্দা, আর পরচর্চ্চা—বলাই বাহুল্য। এমন সময় কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয়গুলির কথা উঠিল। আমাদের অন্যতম রমাপতি ঘোষ অত্যধিক উৎসাহের সহিত আগ্রহান্বিত শ্রোতৃবৃন্দের নিকট অভিনেত্রীগণের রূপ, গুণ, ভঙ্গিমা ইত্যাদি বিবিধ প্রকারে বর্ণনা করিয়া সকলকে নিস্তব্ধ করিয়া দিল। সে কলিকাতায় অবস্থান কালে কেমন সমস্ত আশ্চর্য্য উপায়ে তথাকার দুই-এক জন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রীর সহিত পরিচিত হইয়াছিল, কেমন করিয়া রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষকে স্বীয় অভিনয়নৈপুণ্যে মুগ্ধ করিয়া তথায় অবৈতনিক ভাবে যোগদান করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিল, ইত্যাদি নানা কথা বলিতে বলিতে বলিয়া উঠিল, "কেমন অতুল! যে কলিকাতায় গিয়া থিয়েটার দেখে নাই তার জন্মই বৃথা! তুমি কি বল'? আমি মৃদুহাস্যে উত্তর করিলাম, "তা বৈ কি?" ইতিমধ্যে উপেন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "আমাদের বরাতে তা আর কৈ হ'ল। হরিপুরের বাবুরা তবু যা'হোক্ একটা সখের থিয়েটার করেছেন, তাই দেখ্‌ছি। শুনেছি, তাদেরও নাকি অনেকটা কলিকাতার মতই।"

রমাপতি উচ্চহাস্য করিয়া বলিল—"পাগল আর কি? ভদ্রলোকের কাছে ফের একথা বলিস্‌নি, গায়ে থুতু দেবে। কার সঙ্গে কার তুলনা! কথায় যে বলে—"

এমন সময় বিনোদ বলিয়া উঠিল, "আহা ছেড়ে দাও ভাই ও উজবুক্‌টার

কথা। তবু যা হোক্ হরিপুরের বাবুরা তো একটা কিছু কর্‌ছেন, তোমরা তো কেবল তাঁদের নিন্দে কর্‌তেই পটু, কাজে তো এ পর্য্যন্ত কিছু কর্‌তে দেখলাম না।" রমাপতি বিনোদের মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "অতুল যদি ইচ্ছে করে তো হতে কতক্ষণ! আর আমরা যদি করি তা'হলে হরিপুরের পার্টি যে আমাদের কাছে দাঁড়াতে পার্‌বে না, এটা আমি বুক ঠুকে বল্‌তে পারি।" উপস্থিত সকলেই কোলাহল করিয়া রমাপতির মত সমর্থন করিল এবং আমার মত জানিবার জন্য ব্যগ্র হইল। আমি যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া বলিলাম, "থিয়েটার তো আর একা করা যায় না—দশজনের কাজ। তোমরা সকলে মিলে যদি চেষ্টা কর তা'হলে আমার আপত্তি নেই।" রমাপতি-প্রমুখ তিন-চারজন আনন্দে ও উৎসাহে একেবারে লাফাইয়া উঠিল। 'অতুল যখন রাজী তখন তো হয়েই গেছে'—বলিয়া রমাপতি নাট্যশালা সম্বন্ধীয় স্বীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার পরিচয় দিতে লাগিল।

নেহাত একঘেয়ে উত্তেজনাহীন পল্লি-জীবনের মধ্যে আমোদ উপভোগ করিবার একটা লোভনীয় সুযোগ সম্মুখে পাইয়া আনন্দিতই হইলাম। বাবাকে সম্মত করা অবশ্য আমার পক্ষে কিছু কঠিন হইল না। হরিপুরের বাবুদের সহিত জমীদারী লইয়া আমাদের মনোমালিন্য লাগিয়াই থাকিত। তাহারা থিয়েটার করিতেছে, আমাদেরও একটা থিয়েটার পার্টি না হইলে মান থাকে না, ইহা বাবাকে বুঝাইয়া দিবামাত্র তিনি সম্মতি দিলেন। জমীদারী চালাইতে হইলে পাশের জমীদারের সহিত টেক্কা দিয়া চলিতে হইবে তো? এই রকম একটা আড়া-আড়ি ভাব আমাদের মধ্যে অনেক দিন চলিয়া আসিতেছে। বংশের নিয়মানুসারে আমার মধ্যেও হরিপুর-বিদ্বেষ গজাইয়া উঠিয়াছে মনে করিয়া বাবা তাঁহার উপযুক্ত বংশধরের ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ ভাবিয়া হৃষ্ট হইলেন—এ সংবাদও আমার কর্ণে আসিল। আমরা সকলে মিলিয়া উৎসাহের সহিত উপযুক্ত আয়োজন-উদ্যোগে ব্যস্ত হইলাম। বাবা কেবল বলিলেন, "পোষাক পরিচ্ছদ এবং ষ্টেজ যাতে হরিপুরের চেয়ে ভাল হয়, তাই করো; যখন নেবেছো তখন লোক-নিন্দে যাতে না হয় দেখ্‌তে হবে তো? টাকার জন্য কোন চিন্তা নেই।"

(২)

নিজে মহৎ না হইলেও মহত্ত্বের আদর্শটা বুঝিতাম। উদ্ধত-প্রকৃতি ধনীসন্তান হইয়াও, সর্ব্বদা নীচ চাটুকারগণ-পরিবেষ্টিত থাকিয়াও গ্রামের একটী যুবককে আমি যথার্থ ভালবাসিতাম, প্রাণে প্রাণে শ্রদ্ধা করিতাম। এই যুবক সুন্দরপুরের সর্ব্বজনপ্রশংসিত সুশীল মাষ্টার। দর্পী ও উদ্ধত, বিলাসী ও ক্ষমতাগর্ব্বিত হইলেও আমি হৃদয়হীন ছিলাম না, তাই তাহার পরদুঃখবিগলিত হৃদয়ের মহত্ত্ব দর্শনে মোহিত হইয়াছিলাম।

একদিন মাঘমাসের প্রভাতে আমি ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছি। বিজন নদীতীরে দাঁড়াইয়া সূর্য্যোদয় দেখিতেছিলাম, এমন সময় পদশব্দে চমকিয়া ফিরিয়া দেখি, সুশীল মাষ্টার—নগ্নপদ, একটী মাত্র গেঞ্জি গায়ে, হাতে একটা কাপড়ের পুঁটলী। আমি ঈষৎ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুশীলবাবু যে? এমন অবস্থায় এত ভোরে—ব্যাপার কি?" আমাকে দেখিবামাত্র কুণ্ঠা ও লজ্জায় তাঁহার মুখখানি রক্তবর্ণ হইল। বিনয়নম্র স্বরে বলিলেন, "স্নান করে এই কাপড় ক'খানা ধুয়ে নিয়ে যাব মনে করছি।" বলিতে বলিতে তিনি জলের ধারে গেলেন এবং পুঁটলীটি খুলিয়া একে একে কাপড় কয়খানি ধুইতে লাগিলেন। তীরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম তাহা বিষ্ঠাপূর্ণ! আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওকি সুশীল বাবু! ও সব কাপড় নিজে কেন ধুচ্ছেন—কি হয়েছে?" তিনি নতমস্তকে উত্তর করিলেন, "ও পাড়ার একটী বৃদ্ধা মুসলমান স্ত্রীলোকের একমাত্র ছেলেটী আজ কয়েকদিন হ'ল জ্বরাতিসারে ভুগ্‌ছে। বেশী পুরোনো কাপড় সংগ্রহ করতে পারা যায় নি, তাই ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছি; আবার দরকারে লাগ্‌বে।" তিনি জলে দাঁড়াইয়া কাপড়গুলি ধুইতে লাগিলেন, আর আমি তীরে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম—এই ভয়ানক শীতে অনাবৃত গাত্রে ইনি জলে দাঁড়াইয়া পরের জন্য মেথরের কাজ করিতেছেন, আর আমি যথাসম্ভব মূল্যবান্‌বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়াও শীতে কাঁপিতেছি! সেদিন তাঁহার তরুণ-সুন্দর মুখখানিতে প্রভাতের স্বর্ণোজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মি যে পুণ্যপ্রভা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, তাহা আমার মোহান্ধ-নয়নও অপার্থিব বলিয়া বুঝিতে পারিয়াই যেন কিছুক্ষণের জন্য নিষ্পলক হইয়াছিল।

আর একদিন 'বাজারে একটী জেলের নিকট হইতে ভয় দেখাইয়া আমাদের নায়েব বাবু প্রায় আড়াই-টাকা মূল্যের একটী রোহিতমৎস্য একটাকা দিয়া লইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, এমন সময় সুশীল মাষ্টার তথায় উপস্থিত হইয়া ঘটনা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। আমিও কিছুদূরে দাঁড়াইয়া কৌতূহলের সহিত ব্যাপারটী লক্ষ্য করিতেছিলাম। নায়েব বাবু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আপনি তো মশায় বেশ লোক্! কোথায় ভদ্রলোকের হয়ে দুটো কথা বল্‌বেন, না একটা ছোটলোক জেলের দিকে টান্‌ছেন? বলিহারি ভদ্রতা! থানার হেড্‌কনেষ্টবল বাবু বলিলেন, "ছেড়ে দিন মাষ্টার বাবু! অমন করে কি ও সব ছোটলোককে নাই দিয়ে মাথায় তুল্‌তে আছে? বেটারা যেমন বজ্জাত নায়েব মশাই তার ঠিক শিক্ষা দিচ্ছেন।" নায়েব বাবু জমীদার বাবুর প্রতি সহাস্য কৃতজ্ঞদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চাকরকে মাছটী তুলিয়া লইবার ইঙ্গিত করিলেন। জেলেটী এতক্ষণও আম্‌তা আম্‌তা করিয়াছে, কিন্তু পুলিশের লোক দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। সুশীল মাষ্টারের অনুনয়-বিনয়ে নায়েব বাবু কর্ণপাত করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। তথাপি সুশীল বাবু বলিলেন, "নায়েব মশায়! আর একবার বিবেচনা করে দেখুন।" তিনি একটু উপেক্ষাভরে হাসিয়া বলিলেন, "এ সব জমীদারী ব্যাপার, এর মধ্যে গণ্ডগোল কর্‌তে আস্‌বেন না, মাষ্টার বাবু!" সহসা সুশীল মাষ্টারের দৃষ্টি আমার উপর পড়িবামাত্র তিনি ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন অতুলবাবু! নায়েব মশাই অকারণ এই গরীবের দেড় টাকা লোকসান কর্‌ছেন— আপনি নিশ্চয়ই এর একটা বিহিত কর্‌বেন।" তাঁহার এই আবেগাকুল মিনতির মধ্যে কতখানি বিশ্বাস ও দৃঢ়তা! আমি অগ্রসর হইয়া নায়েব বাবুকে বাকী দেড় টাকা দিতে বলিলাম; তিনি অগত্যা ম্লানহাস্যে দেড়টী টাকা দিতে গেলেন। প্রথমে নায়েব ও হেড্‌কনেষ্টবল, পরে আমাকে দেখিয়া জেলেটী এত ঘাবড়াইয়া গেল যে কিছুতেই টাকা লইতে রাজী হইল না। সুশীল মাষ্টার হাসিয়া বলিলেন, "দেখ্‌ছিস্ না, তোর মনিব এখানে দাঁড়িয়ে, তিনি যখন নিজে তোকে নিতে বল্‌ছেন,

তখন আর তোর ভয় কি?" জেলেটা কম্পিতহস্তে টাকা গ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমি স্নেহপূর্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম, "কিছু মনে কর্‌বেন না সুশীল বাবু! উঁরা এ রকম কাজে সিদ্ধহস্ত, জানেন তো সব!" তিনি একটু মৃদু হাসিয়া আমার দিকে চাহিয়া চলিয়া গেলেন—সে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রশংসনীয় চকিতদৃষ্টির মধ্য দিয়া সমবেদনার সূক্ষ্মাবরণমণ্ডিত এমন একটী মহত্ত্বের ছবি দেখিয়াছিলাম, যাহা আজ পর্য্যন্তও আমার স্মৃতিপটে চিরনবীনভাবে জাগ্রত রহিয়াছে।

যাহা হউক গত এক বৎসরের মধ্যেও ইঁহার সহিত একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারি নাই। অবস্থার পার্থক্য তাহার কারণ নহে—প্রকৃতিগত তারতম্যই তাহার প্রধান কারণ। তথাপি গ্রামের সমস্ত যুবকগণের মধ্যে সুশীল মাষ্টারকেই আমি শ্রদ্ধা করিতাম, তাঁহার কোন উপকার করিতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করিতাম। একদিন স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার নাইট-স্কুলটী পরিদর্শন করিয়াছিলাম। গ্রামের অশিক্ষিত গরীব বালক ও যুবকগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আগ্রহ আমার বিশেষ কিছুই ছিল না। কেবল সুশীল মাষ্টারের প্রতি বন্ধু-প্রীতি প্রকাশ করিবার জন্যই পাঠশালাটীর জন্য একটী টিনের ঘর করিয়া দিয়াছিলাম। আজ এই থিয়েটার পার্টির মধ্যে যদি তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের খুবই সুবিধা হইবে, মনে মনে অনেক চিন্তা করিয়া হৃষ্ট হইলাম।

(৩)

প্রভাতে সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে ছাত্রাবাসে উপস্থিত হইলাম। সুশীলবাবু একখানি পুস্তক পড়িতেছিলেন। বইখানি সরাইয়া রাখিয়া তিনি মৃদুহাস্যে বলিলেন, "আসুন অতুলবাবু! হঠাৎ এদিকে কি মনে করে? আজ আমাদের খুব সৌভাগ্য বল্‌তে হবে।" "নিশ্চয়ই"—বলিয়া অন্যতম শিক্ষক হিরণ্ময় বাবু আমার দিকে সহাস্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। হিরণ্ময় বাবু সুশীল মাষ্টারের বন্ধু। কিন্তু হিরণ্ময় বাবুকে দেখিলে কেন যেন আমার একটু ঈর্ষা হইত বুঝিতে পারিতাম না। ইহাদের উভয়ের শিষ্টাচারের উত্তরস্বরূপ যথেষ্ট সৌজন্যের সহিত বলিলাম, "নিন

আর লজ্জা দেবেন না। আপনাদের সঙ্গে মেশ্‌বার যোগ্য নই বলেই ইচ্ছাসত্ত্বেও সঙ্কোচে আস্‌তে পারি না। আর আপনারাও তো দয়া করে আমাদের ওদিক্‌টায় পা দেবেন না!" সুশীল মাষ্টার একটু লজ্জিত হইয়া মস্তক নত করিলেন। আমি বলিয়া যাইতে লাগিলাম—"লজ্জিত হবেন না; কেবল এক আপনাকে লক্ষ্য করে আমি একথা বল্‌ছি নে। এত বড় একটা গ্রাম, এত ভদ্রলোক—অথচ কেউ কারও বিপদে-আপদে সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাক্‌ দেখাটা পর্য্যন্ত করে না। সেই জন্যই একতা নেই, আর তারই ফলে দলাদলি ইত্যাদি ভদ্রসমাজের লজ্জাকর সব বিশ্রী ব্যাপার ঘটে। সকলে একমত হয়ে কাজ করাটা আমাদের দেশে ক্রমেই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যাক্‌ সে সব কথা, যাতে গ্রামের দশজনের মধ্যে একটা প্রীতির বন্ধন স্থাপিত হয় সেজন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। আপনারা শিক্ষিত ও চরিত্রবান—আপনাদের নিকট এ রকম কাজে সহানুভূতির আশা নিশ্চয় করতে পারি!" সুশীল মাষ্টার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু কাজে কতদূর পেরে ওঠা যাবে বল্‌তে পারি নে; তবে আপনার উদ্দেশ্য সাধু হলে ভগবানের কৃপায় অবশ্য পূর্ণ হবে!" আমি গর্ব্বিতস্বরে কহিলাম "দেখুন সুশীলবাবু! সেদিন গ্রামের অভাব অভিযোগের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে দেখলাম যে, একটা রঙ্গালয় থাকা অতীব প্রয়োজন। আমার কথা শুনে অনেকেই উৎসাহের সঙ্গে এ প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। ভেবে দেখ্‌লাম এই উপলক্ষে প্রায় প্রত্যহই সকলে একবার একত্র হবার সুযোগ পাওয়া যাবে। নির্দ্দোষ আমোদের মধ্য দিয়ে সাধারণকে নৈতিক চরিত্রগঠনের সহায়তা করাই অবশ্য আমাদের থিয়েটারের প্রধান লক্ষ্য। অভিনয়ের ভিতর দিয়ে ধর্ম্মের মোটামোটী তত্ত্বগুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ারও খুব সুবিধা। এই সব কারণেই থিয়েটার আজ কাল সভ্যসমাজের একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ হয়ে পড়েছে। কারণ, লোকশিক্ষার এমন আমোদপূর্ণ অথচ সহজ পথ আর নেই বল্‌লেই হয়।"

সুশীল মাষ্টার একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন "অতুল বাবু! লোকশিক্ষার জন্য আপনার উদ্যম প্রশংসনীয়। কিন্তু থিয়েটার দিয়ে কতদূর

কি করে উঠ্‌তে পার্‌বেন, সেটা ভাব্‌বার বিষয়। আমার ভয় হয়, এ থেকে পরিণামে কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা ও উচ্ছৃঙ্খল যুবক সৃষ্টি করা হবে।"

আমি উপেক্ষাভরে একটু হাসিয়া বলিলাম, "আপনার ধারণা অনেকাংশে সত্য, সে কথা অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই; সেই জন্যই তো আপনাদের নিকট এসেছি। কারণ, আমরা সকলে মিলে যদি এর মধ্যে থাকি তা'হলে কি আমরা এ সব বিষয়ে সাবধান থাক্‌বো না?"

হিরণ্ময় বাবু সহসা বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন অতুল বাবু থিয়েটারের উৎকট বাই কোনদিন সংযমের বাহুবেষ্টনে ধরা দেয়নাই। বোধ হয় আপনার জানা থাক্‌তে পারে, কলিকাতায় অনেক কলেজের ছেলে থিয়েটার দেখার নেশায় মাটী হয়ে গেছে। যা হোক, যে কল্পনা নিয়ে কাজে হাত দিচ্ছেন তা বাস্তবে পরিণত করা দুঃসাধ্য।"

হিরণ্ময় বাবু কি ভাব হইতে কথা কয়েকটী বলিলেন জানি না; কিন্তু আমার মনে হইল এ শুধু বন্ধুভাবে উপদেশ নয়, ইহার মধ্যে একটা তীব্র ব্যঙ্গ নিহিত আছে। আমি কলিকাতায় থাকিতে খুব থিয়েটার দেখিতাম; আজ ইনি আমার সেই ঝোঁক্‌টাকে উৎকট বাই বলিয়া উপহাস করিলেন। আমার উদ্ধত, অভিমানী হৃদয় আঘাতে ফুলিয়া উঠিল, অনেক কষ্টে তাহাকে সংযত করিলাম। তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া সুশীল মাষ্টারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, "যা'হোক যখন একটা বিষয় আরম্ভ করা গেছে—আর আমরা বহুদূর অগ্রসর—তখন আর ফির্‌বার উপায় নাই। সব বিষয়েই হাঁ ও না দুইদিকেই যুক্তি আছে। আমি আশা করি ভবিষ্যতে এ থেকে গ্রামের যথেষ্ট উন্নতি হবে। আমরা কি কেবল থিয়েটার নিয়ে বসে থাক্‌বো? ক্রমে আরও দশটা বড় কাজে হাত দিতে হবে। এইজন্যই আমার ইচ্ছা যে আপনারাও এতে যোগদান করুন। আপনার কি মত সুশীল বাবু?"—উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, তাঁহার নির্ম্মল ললাটে চিন্তার কুঞ্চিত রেখা। তিনি ধীরভাবে বলিলেন, "আমায় ক্ষমা করুন, আমোদ কর্‌বার মত অবসর আমার মোটেই নেই। গ্রামে যথেষ্ট ভদ্রযুবক আছেন, যাঁরা উৎসাহ ও উল্লাসের সঙ্গে আপনার সহযোগী হবেন। কাজেই

আমি যোগ না দিলেও কিছু আটকাবে না। তবে একটী কথা,—বিষয়টা একটু ভেবে চিন্তে আরম্ভ করবেন।"

আবার অযাচিত উপদেশ! আমার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। হিরণ্ময় বাবুকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গস্বরে কহিলাম, "যাক্, উপদেশের জন্য আমি আসি নি, শুধু আপনাদের যোগদান করবার অনুরোধ করতেই এসেছিলাম; তা আপনিও বোধ হয় এঁর সঙ্গে একমত?" অবজ্ঞাভরে মস্তকান্দোলন করিয়া তিনি তাহা সমর্থন করিলেন। প্রত্যাখ্যানে ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যেমন করিয়া পারি, ইহার প্রতিশোধ লইবই।

নাটকাভিনয়ের 'নির্দ্দোষ আমোদ' উপভোগ করিবার জন্য স্থানীয় যুবকবৃন্দের আগ্রহপূর্ণ চেষ্টায় শীঘ্রই গ্রামখানি কোলাহলময় হইয়া উঠিল। কলিকাতা হইতে দৃশ্যপট ও সাজ-সরঞ্জাম আসিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। অভিনেতার অভাব নাই; উত্তেজনার ঝোঁকে বৃদ্ধ নায়েব বাবু পর্য্যন্ত মন্ত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করিলেন, তর্করত্ন মহাশয় নারদ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষির ভূমিকা গ্রহণ করিবার সম্মতি জানাইলেন; কিন্তু নৃত্যগীতাদির জন্য বালক ভদ্রসমাজে দুর্ল্লভ। ছেলে সংগ্রহ করিবার ভার রমাপতি স্বেচ্ছায়ই গ্রহণ করিল। সকলেই আনন্দে মত্ত, কিন্তু আমি এ আনন্দ পরিপূর্ণ প্রাণ ঢালিয়া উপভোগ করিতে পারিলাম না। আমার যখনই সেদিনের ঘটনা মনে হইত, তখনই যেন নিগূঢ় লজ্জায় আমার সমস্ত আনন্দ শিহরিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া যাইত। সমস্ত অভিমান, সকল গর্ব্ব সঙ্কুচিত করিয়া সহজ সরলভাবে বন্ধুত্বের দাবী করিলাম—বিনিময়ে পাইলাম অবহেলা!—হায়! সুশীল মাষ্টার! তুমি কি জান যে আমি তোমাকে কতখানি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিতাম—যে দৃষ্টি তুমি অনায়াসে ঈর্ষা-কলুষিত করিয়া দিলে?

সন্ধ্যাবেলা রমাপতি আসিয়া বলিল "অতুল, ছেলে জোগাড় করাই দেখ্‌ছি প্রধান কথা, নইলে সব মাটী হবে। গোটাকতক পছন্দসই ছেলে আছে বটে, কিন্তু—" রমাপতিকে নীরব হইতে দেখিয়া ঔৎসুক্যের সহিত বলিলাম, "কিন্তু কি—বলেই ফেল না!"

রমাপতি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "জানই তো, ছোট লোকের

ছেলেগুলো সব ঐ সুশীল মাষ্টারের পাঠশালায় পড়ে। তার মধ্যে কয়েকজনকে না আনতে পার্‌লে তো আর উপায় দেখ্‌ছি নে।"

উপেন তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, "ও হরি! বলি এর আর বেশী কথা কি?—'তু'করে ডা'ক্‌লেই বই ফেলে ছুটে আস্‌বার জন্য ছটফট কর্‌বে।"

তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রমাপতি বলিল, "না হে, তত সোজা নয়, আমি বাজিয়ে দেখে'ছি—কিছুতেই ঘাড় পাত্‌তে চায় না! অবশ্য জোর কর্‌লে কি আর আনা যায় না, কিন্তু তা'হলে সুশীল মাষ্টার কি মনে কর্‌বেন?"

বিনোদ একরাশ সিগারেটের ধূম উদ্গারণ করিয়া কহিল, "আর রেখে দাও, অত মনে করা করি ভাব্‌তে গেলে আর এসব কাজ চলে না।" রমাপতি উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তা পার্‌তাম, যদি অন্য কেউ হ'ত। আর কথাটা কহিতে তোর লজ্জা হ'ল না! সেবার তোর মার ব্যারামের সময় তুই তো বাড়ী ছিলি নে; ঐ বেচারাই তো সেবা-শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তুলেছিল। সকলেই ওর কাছ থেকে উপকার পেয়ে থাকি, কাজেই অনর্থক তাঁর মনে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? কি বল অতুল? তুমি বরং নিজে গিয়ে কাল তাঁকে বুঝিয়ে বলে এর একটা ব্যবস্থা কর। চক্ষুলজ্জায় তোমার কথা ঠেল্‌তেও পার্‌বে না—দুকুলই বজায় থাক্‌বে এখন।"

সকলেই একবাক্যে রমাপতির প্রস্তাব সমর্থন ক'রল। বন্ধু বা ইয়ার সমাজে প্রতিপত্তির লাঘব হইবে কিম্বা কাপুরুষ প্রমাণিত হইব আশঙ্কায় যথেষ্ট ইচ্ছাসত্ত্বেও পূর্ব্বদিনের ঘটনাটা বলিয়া আপত্তি প্রকাশ করিতে পারিলাম না—উদাস-স্বরে কহিলাম "আচ্ছা, কাল সকালে আমিই গিয়ে তাঁকে অনুরোধ কর্‌বো, তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। ভাবিলাম, পূর্ব্বদিনের কথাবার্ত্তায় একটু ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাইয়াছিল, কাল একটু নম্রভাবে কথাবার্ত্তা বলিলেই সুশীল মাষ্টার খুসী হইবেন। হয়তো সেদিনের ব্যবহারে তিনি নিজেও লজ্জিত হইয়া থাকিবেন। আমার বন্ধুত্বকে উপেক্ষা করিয়া তিনি ভাল কাজ করেন নাই—ইহা বুঝিয়া হয়তো অনুতপ্ত হইয়াছেন। হায় অন্ধ ক্ষমতাভিমান! তখনও কি আমি জানি যে দ্বিতীয়বার সমুদ্রমন্থনেও হলাহলই উঠিবে?

পরদিন প্রভাতে ছাত্রাবাসে যাইতে হইবে মনে হইবামাত্র এমন একটা সলজ্জ সঙ্কোচ অনুভব করিলাম যে কোন মতেই আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত কাছারীতে বসিয়া হিসাবের খাতা দেখিয়া কাটাইয়া দিলাম। অপরাহ্ণে ছাত্রাবাসে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল সুশীল মাষ্টার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে অপেক্ষা করিতেছেন। ভৃত্যকে তাঁহাকে আমার কক্ষে লইয়া আসিবার আদেশ দিয়া ভাবিতে লাগিলাম—নিশ্চয়ই সুশীল মাষ্টার অনুতপ্ত হইয়াছেন, নতুবা তিনি নিজেই আজ আমার কাছে আসিবেন কেন? এমন সময়ে সুশীল মাষ্টার ও হিরণ্ময় বাবু কক্ষে প্রবেশ করিলেন। হিরণ্ময় বাবুকে দেখিয়াই আমার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। অন্তরের অপ্রসন্নতা হাস্যেরদ্বারা আবরণ করিয়া সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বলিলাম "এটা আমার খুবইসৌভাগ্য বল্‌তে হবে যে দুজনেই একসঙ্গে উপস্থিত! এখন কি খবর, বলুন। "আপনাদের কি উপকারে লেগে ধন্য হতে পারি?"

তারপর কেন যেন বলিয়া ফেলিলাম, "আমাকে আপনার মত মানুষই মনে কর্‌বেন সুশীল বাবু!" তিনি লজ্জায় নতমস্তক হইলেন।

হিরণ্ময় বাবু নিম্নস্বরে বলিলেন, "হাঁ একটু প্রয়োজনই আছে, শুন্‌লাম আপনি নাকি সুশীলের পাঠশালা থেকে কয়েকটী ছেলেকে থিয়েটারে যোগদান কর্‌বার আদেশ দিয়েছেন?"

বুঝিলাম এ সব রমাপতির কাণ্ড। যাহা হউক প্রকৃত কথা গোপন করিয়া পরিষ্কার বলিলাম "হ্যাঁ, তাতে আপনাদের আপত্তির কারণ?"

"ছেলেগুলো লেখাপড়া শিখ্‌ছে, আপনি ইচ্ছে কর্‌লে এদের বাদ দিয়ে অন্য স্থান থেকেও তো সংগ্রহ কর্‌তে পারেন?"

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "হাঁ, তা পারি বটে, কিন্তু কোন দরকার দেখ্‌ছি নে। আজ বাদে কাল যাদের লাঙ্গল চষে বা মজুরী করে খেতে হবে, তাদের আবার লেখাপড়ার মূল্য কি? তার চেয়ে এখানে দু'দশ জন ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশ্‌লে সভ্য সমাজের আদব কায়দা শিখে অনেক উন্নত হতে পার্‌বে। থিয়েটারের ছেলেদের লেখাপড়া

শেখাবার বন্দোবস্তও আমরা করেছি। আর যদি ভালরকম নাচ-গান শিখ্‌তে পারে তো দুদিন পরে দু'পয়সা রোজগার করে গরীব বাপ-মার সাহায্যও কর্‌তে পারবে!"

সহসা সুশীল মাষ্টার বলিয়া উঠিলেন, "কিচ্ছু না, থিয়েটারে ঢুকিয়ে ওদের মাথা খাওয়া হবে মাত্র; এমন কি আপনাদের দেখাদেখি আদর পেয়ে, টেরিকাটা, সিগারেট্ খাওয়া ইত্যাদি বিলাসিতায় অভ্যস্ত হয়ে কালে যে শারীরিক পরিশ্রম করে খাবে, তারও উপায় থাক্‌বে না। আপনি বুঝে দেখুন, নিজেদের আমোদ-লিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য কতক-গুলি গরীবের ছেলের সর্ব্বনাশ করা ঠিক কি না!"

সুশীল মাষ্টারের স্পষ্ট ও সতেজ উত্তরে আমার ক্ষমতাগর্ব্বিত অভিমান গর্জ্জিয়া উঠিল—বিরক্তি বিকৃতস্বরে কহিলাম, "সুশীল বাবু! আপনাদের আমার সম্বন্ধে দেখ্‌ছি উত্তম ধারণা জন্মে গেছে! গরীবের ছেলেদের মাথা খাওয়ার জন্যই আয়োজনটা বটে! উচ্চশিক্ষা পেয়েও আপনারা থিয়েটারের necessity বোঝেন না, দুঃখের বিষয়! আরও দুঃখের বিষয় যে আমি আপনাদের সঙ্গে একমত হতে পার্‌লাম না। ভবিষ্যতে এ সব নিয়ে কোন অপ্রিয় সমালোচনা আপনার মুখ থেকে না শুন্‌লেই সুখী হব।"

বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় উভয়ে বিদায় হইলেন। যাইবার সময় সুশীল মাষ্টার এমন একটী মর্ম্মভেদী কাতরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেলেন, যাহার কল্যাণ-স্পর্শে আমার উদ্ধত কঠোরতা ক্ষণকালের জন্য যেন বিমূঢ় হইয়া গেল; স্বীয় দুর্ব্বলতায় ক্ষুব্ধ হইলাম! ভাবিতে গেলে মহাবিস্ময়ের মধ্যে চিন্তা পথ হারাইয়া ফেলে—এই তরুণ যুবকের প্রহেলিকাময় দৃঢ়তায় সাময়িক বিচলিত হইলেও ফল্গুর মত একটা ক্ষুদ্র প্রীতির প্রবাহে কেন আমার ঈর্ষাবিষতিক্ত, ক্ষমতাদৃপ্ত চিত্ততল চির-সরস!

সন্ধ্যাবেলা "রিহর্শ্যাল-রুমে" সকলের নিকট সেদিনের ঘটনা বিবৃত করিলাম। রমাপতি উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "বটে! ইনি দেখ্‌ছি ক্রমে সুন্দরপুরের "পোপ" হয়ে দাঁড়াতে চান!"

উপেন বলিল, "হবে না কেন? আপনারাই তো প্রশংসা করে করে মাষ্টারটার মাথা খেয়েছেন, নৈলে এত আস্পর্দ্ধা! বাবু মাটীর মানুষ কিনা, অন্য কেউ হলে—" বাধা দিয়া বিনোদ বলিল, "আমি গোড়া থেকেই জানি ব্যাটার আগাগোড়া ভণ্ডামি। কেনরে বাপু, পরের ছেলে না হয় গোল্লায়ই যাবে, তা নিয়ে তোর এত মাথাব্যথা কেন!"

ইতিমধ্যে হরিপদ, উপেনের গা টিপিয়া কানে কানে কি যেন বলিল। উপেন খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং চারিদিক হইতে সকলেই সুশীল মাষ্টারের নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। ক্রমে নিন্দোক্তি অশ্লীলতার শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিল; বল্গাহীন অসংযত রসনার দৌরাত্ম্যে অবশেষে বাধ্য হইয়া ধমক দিয়া বলিলাম, "আঃ থামোনা সব, কি আরম্ভ করলে? কাজের কথা একটাও নেই, কেবল বাজে কথা!"

রমাপতি বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "চুপ কর সব, অতুলের প্রাণে বড় লাগ্‌ছে! দেখ অতুল, এমনি করে তুমি যদি প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে কোন বিহিত না কর, তাহলে বল, আমরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই— অনর্থক এ গোলমাল কেন!"

আমি শুষ্ককণ্ঠে কহিলাম, "কই প্রতীকার করবো না এমন কথা তো আমি বলিনি? তবে অনর্থক নিন্দা—তাই বল্‌ছিলাম! যাক্, কি করা যায় বল দেখি, রমাপতি?"

বিনোদ বলিয়া উঠিল, "আপনি ইচ্ছে করলেই তো ও আপদকে গ্রাম-ছাড়া কর্‌তে পারেন!" আরও অনেকে অনেক কথাই বলিল। অবশেষে, অনেক বাদানুবাদের পর রমাপতির পরামর্শক্রমে পরদিন গ্রামের সকলকে জমাদারের হুকুম জানাইয়া দেওয়া হইল—"সুশীলমাষ্টারের নৈশ-বিদ্যালয়ে যে ছেলে পড়াইতে পাঠাইবে, তাহার দশ টাকা জরিমানা হইবে; অধিকন্তু তাহাকে বিদ্রোহীপ্রজা গণ্য করিয়া আইন মোতাবেক-কার্য্য আমলে আসিবে।"

সন্ধ্যাবেলা রমাপতি বাগ্দী, কাওরা ও মালীদের কয়েকটী ছেলে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইল,—সংবাদ পাইলাম পাঠশালাও বসে নাই। নীচ

পারিষদকুলের আনন্দের সীমা নাই! কেউ কেউ আমাকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল—"একেই তো বলে জমীদার! বাপু, শিমুলগাছে গা চুল্‌কাতে আসা!"

অন্যক্ষেত্রে হইলে হয়তো বিজয়গর্ব্বে আমিও এই সব হৃদয়হীন চাটুকারদের জঘন্য উল্লাসে যোগদান করিতাম। কিন্তু হায়! প্রতিদ্বন্দ্বী কে?—যাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—সেই সুশীল মাষ্টার। পাঠশালাটী ভাঙ্গিয়া দিবার আদেশ দিতে আমি কি প্রাণে বেদনা অনুভব করি নাই? হায় উদার যুবক! কঠোর ন্যায়দণ্ডের মত অবিচল না থাকিয়া যদি তোমার এই গুণমুগ্ধ বন্ধুটীর প্রতি একটু আনম্র হইয়া সহৃদয় ব্যবহার করিতে তাহা হইলে ফল অন্যরূপ হইত। হয়তো তিনি আমার প্রতি কোন অন্যায় ভাব হইতে এ কার্য্য করেন নাই, হয়তো তাঁহার মনে কোন স্বার্থপূর্ণ অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু অজ্ঞান শিশুও অগ্নিতে হস্তার্পণ করিলে কবে তাহা দগ্ধ হয় নাই? ভাবিতে ভাবিতে অনেক অতীত ঘটনা স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিল—যাহার প্রত্যেকটী সুশীল মাষ্টারের পূতচরিত্রের মহিমময় অভিব্যক্তি। সমবেদনায়, সম্ভ্রমে আমার চিত্ত অনুতপ্ত হইতেছে বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু অভিমানের নিকট বিবেক পরাজিত হইল—ক্ষণিক দৌর্ব্বল্য ঝাড়িয়া ফেলিলাম।

(আগামী বারে সমাপ্য)

কাশীতে শঙ্কর।*

ভাষ্যপ্রণয়নের আয়োজন।

(শ্রীমতী—)

গুরু গোবিন্দপাদের প্রসাদে শঙ্করের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবার পর সমাধি-ভঙ্গ-অবস্থাতেও, তাঁহার অন্তর হইতে 'ইহা করিব' 'উহা করিব' এইরূপ সঙ্কল্প-বিকল্প, অথবা 'আমি ভোক্তা' 'আমি কর্ত্তা' 'আমি জ্ঞাতা' এইরূপ অহংজ্ঞান, দীপনির্ব্বাণের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তিনি এতদিন স্বয়ং-উপস্থিত কর্ত্তব্যমাত্রই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ও কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া সম্পাদন করিতেন; কোনরূপ প্রবৃত্তি বা দ্বেষের বশীভূত হইয়া কিছুই করিতেন না। কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাপ্ত হইলে মনটা তাঁহার সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে দেখিত এবং অধিক্ষণ এভাবে থাকিলে তাঁহার মনই লয় হইয়া যাইত; তিনি কিছুই দেখিতেন না, তাঁহার সমাধি উপস্থিত হইত। কিন্তু ভগবান্ বিশ্বনাথের নিকট হইতে ভাষ্যরচনার আদেশ প্রাপ্ত হইবার পর সর্ব্বত্র শিবভাব দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে তাঁহার হৃদয়ে ভাষ্যরচনার প্রবৃত্তি জাগরূক হইল—আবার যেন কর্ত্তৃত্বাভিমান, আবার যেন সঙ্কল্প-বিকল্প ফিরিয়া আসিতে লাগিল!

কেবল কি তাহাই? আজ ভাষ্যরচনার জন্য নানা যুক্তি, বহু বিচার, প্রভূত তর্ক, বিবিধ কৌশল এবং অসংখ্য সিদ্ধান্তরূপ বিষয় নিচয়, সূর্য্য-গ্রহণে নক্ষত্ররাজির ন্যায় শঙ্করের মানসাকাশে সহসা উদিত হইতে লাগিল! যিনি শাস্ত্রার্থ-সাহায্যে সেই শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্র-রাশিকে, তরণী সাহায্যে পরপারাগত ব্যক্তির তরণীত্যাগের ন্যায় পরিত্যাগ

---

* সংসারত্যাগের পর শঙ্করের নর্ম্মদাতীরে গুরু গোবিন্দপাদের সহিত সম্মিলন ও তাঁহার কৃপায় ব্রহ্মজ্ঞানলাভ এবং তৎপরে কাশী গমন ইত্যাদি বিষয় ইতিপূর্ব্বে 'শঙ্কর প্রসঙ্গ' শীর্ষক প্রবন্ধক্রমে উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। উদ্বোধন, ৭ম বর্ষ—১০ম, ১৪শ ও ১৯শ সংখ্যা এবং ৮ম বর্ষ—৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ১২শ ও ১৩শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

করিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়কে আজ সেই শাস্ত্রার্থ-চিন্তা আসিয়া আবার অধিকার করিয়া বসিল!

কেন আজ এরূপ হইল? কেন আজ শঙ্করের সেই নির্ব্বাত-নিস্তরঙ্গ হৃদয়সরোবরে সঙ্কল্প-বিকল্পরূপ তরঙ্গ উত্থিত হইল? কেন শঙ্করের সেই নির্ম্মল চিত্তাকাশে কর্ত্তৃত্বাভিমানরূপ মেঘ দেখা দিল? কেন সে নির্গুণ ব্রহ্মভাব দর্শনের পরিবর্ত্তে সগুণ ব্রহ্মভাব বা শিবভাবের দর্শন হইতে লাগিল?

সিদ্ধ যোগীর বুদ্ধিতে ইহার রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে বিলম্ব হইল না। শঙ্করের বিবেকবুদ্ধি বলিয়া দিল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের তাঁহার সেই অপূর্ণ প্রবল পরোপকার প্রবৃত্তি, জ্ঞান বিতরণ দ্বারা জগতের যথার্থ হিতসাধনের প্রভূত অচরিতার্থ বাসনা আজ প্রারব্ধকর্ম্মরূপে পরিণত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেই সকল প্রবৃত্তি আজ পুঞ্জীভূত হইয়া পরমকল্যাণের প্রতিমূর্ত্তি শিবভাবের সদৃশ হওয়ায় বিশ্বনাথের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তাই আজ বিশ্বনাথ শঙ্করের প্রারব্ধরূপে পরোপকার এবং শাস্ত্রার্থ-চিন্তারূপ স্বর্ণ শৃঙ্খল হস্তে ধারণ করিয়া ব্যাধের ন্যায় তাঁহার চিত্তরূপ শুকপক্ষীকে আবদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। তাই তাঁহার হৃদয়ে আজ সঙ্কল্প বিকল্প এবং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ পুনরায় দেখা দিতেছে। তাই তাঁহার সমাধি-ভঙ্গাবস্থাতে নির্গুণ ব্রহ্মভাব দর্শনের পরিবর্ত্তে সগুণ ব্রহ্মভাব বা শিবভাবের দর্শন ঘটিতেছে। কিন্তু যে পক্ষী একবার শৃঙ্খল ছেদন করিয়াছে, যে বিহঙ্গ একবার উন্মুক্ত বহির্ব্বায়ু সেবন করিতে পাইয়াছে—স্বাধীনতা-সুখের অমৃতময় আস্বাদ একবার অনুভব করিয়াছে, সে কি কখন স্বর্ণ-শৃঙ্খলেও আবদ্ধ হইতে চাহে? সুতরাং এক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কি তন্নির্ণয়ে আজ শঙ্কর ব্যস্ত হইলেন। আর সেই কারণে তিনি সর্ব্বদাই ধ্যানস্থভাবে অবস্থিতি করেন। শিষ্যগণের নিকট শাস্ত্রব্যাখ্যা, বা কাশীধামের তীর্থরাজি-দর্শনাদি কার্য্য সকলই রহিত হইয়া গেল। তিনি সকল বিষয়েই উদাসীন—সর্ব্বদাই যেন কিসের ধ্যানে নিমগ্ন।

বাস্তবিক জ্ঞানাভ্যাস অজ্ঞানের আবরণশক্তিকে সহজে ধ্বংস করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তিরূপ প্রারব্ধকর্ম্মকে ভোগ-

ব্যতিরেকে নষ্ট করিতে পারে না; সেই কারণেই জ্ঞানী ব্যক্তি সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা অজ্ঞানের আবরণশক্তি নষ্ট হওয়ায় তাহাতে তিনি আবদ্ধ হন না; সুতরাং আর নূতন বিক্ষেপও উৎপন্ন হয় না। তাহার পর আবার এই বিক্ষেপের বিষয় যদি সত্ত্বগুণের কার্য্যসংক্রান্ত হয়, তাহা যদি পরোপকার, শাস্ত্রচর্চা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্ম বিষয়ক হয়, তাহা হইলে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া আরও কঠিন হয়। মুমুক্ষুর পক্ষে পাপকর্ম্ম যেমন ত্যাজ্য পুণ্যকর্ম্মও তদ্রূপ ত্যাজ্য। কিন্তু মুমুক্ষুব্যক্তি পাপকর্ম্ম ত্যাগ যত সহজে করিতে পারেন পুণ্যকর্ম্ম ত্যাগ তত সহজে পারেন না। পুণ্যকর্ম্ম-প্রবৃত্তি স্বর্ণের শৃঙ্খল, পাপকর্ম্ম-প্রবৃত্তি লৌহের শৃঙ্খল; এই লৌহশৃঙ্খল কঠিন হইলেও স্বর্ণ-শৃঙ্খলের ন্যায় দুশ্ছেদ্য নহে। তাই আজ শঙ্করের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য-প্রবৃত্তি প্রারব্ধকর্ম্মে পরিণত হইয়া ভাষ্যরচনা কার্য্যে শঙ্করকে প্রবৃত্ত করাইল।

সমাধি-সিদ্ধ শঙ্কর প্রারব্ধকর্ম্মের এই খেলা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি মুমুক্ষু-কণ্ঠহার গীতাগ্রন্থের সেই—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥

অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতির সদৃশই চেষ্টা করিয়া থাকেন। ভূত সকল প্রকৃতিরই অনুগমন করে, নিগ্রহ করিয়া কি হইবে?—বাক্য স্মরণ করিয়া; সেই—

উদাসীনবদাসীনমসক্তং সর্ব্বকর্ম্মসু

অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি উদাসীন ব্যক্তির ন্যায় থাকিয়া সর্ব্বকর্ম্মে অনাসক্ত থাকেন—বাক্য স্মরণ করিয়া; সেই—

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং

অর্থাৎ জন্মগত-কর্ম্ম করিয়া, হে কৌন্তেয়, কেহ পাপে লিপ্ত হয় না,—বাক্য স্মরণ করিয়া; সেই—

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে অবস্থিতি পূর্ব্বক যিনি কর্ম্ম সকল করেন জলে পদ্মপত্রের ন্যায় তিনি পাপে লিপ্ত হয়েন না। যাঁহার 'আমি কর্ত্তা'-ভাব নাই, যাঁহার বুদ্ধি (ইষ্ট বা অনিষ্ট বোধে) কর্ম্মে লিপ্ত হয় না, তিনি যদি এই সমুদয় লোককে নিধনও করেন তাহা হইলেও আবদ্ধ হয়েন না— ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। তিনি স্থির করিলেন "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" এই বেদোক্ত মহামন্ত্রের শেষভাগ তিনটীকে পরিত্যাগ করিয়া সাক্ষিভাবের শরণাপন্ন হইয়া ভাষ্য-রচনাদি কার্য্য করিবেন।

গোবিন্দ পাদের নিকট জ্ঞানযোগ সাধনকালে শঙ্কর বহুযত্নে প্রথমে সর্ব্ববিষয়ে আত্মার 'সাক্ষি'ভাব অনুভব করিতে শিক্ষা করেন। ইহাতে সিদ্ধ হইলে তিনি আত্মার 'চেতয়িতৃ'ভাব অনুভব করিতে শিক্ষা করেন। সেই 'চেতয়িতৃ'ভাবে অভ্যস্ত হইলে, তিনি, আত্মার 'কেবল'ভাব অনুভবে অভ্যাস করেন। সেই 'কেবল'ভাব অভ্যস্ত হইলে তিনি আত্মার 'নির্গুণ'-ভাব অনুভব করিতে যত্ন করেন। ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি গুরু-আদেশে কাশী আসিয়াছেন ও বিশ্বনাথের দর্শন পাইয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে জগদুদ্ধারে-প্রবৃত্তিজনিত প্রবল প্রারব্ধকর্ম্মের তাড়নায় তিনি সাক্ষি-ভাবের স্তর হইতে নিম্নস্তরে অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-রূপ জীবভাবের স্তরে অবতরণ করিতে বাধ্য হইতেছেন দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, তিনি নিজের সাক্ষিরূপতা দৃঢ় রাখিয়া ভাষ্যরচনা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন। বাস্তবিক যথার্থ পরহিত-সাধন-বাসনা বা অনুত্তম পুণ্য-প্রবৃত্তি কাহাকেও যদি ব্রহ্মলোক হইতে জগতে আনয়ন করে তাহা হইলে তাহা কখন তাঁহাকে কর্ম্মে লিপ্ত করে না। শিবের আদেশে কর্ম্ম করিয়া কি শঙ্কর আর আত্মবিস্মৃত হইতে পারেন? জ্ঞান-সাধনার প্রথম বা নিম্নতম সোপানও কি কখন পরিত্যাগ করিতে পারেন? অগত্যা নিজে সাক্ষিভাবে অবস্থিতি করিয়া ভাষ্যরচনা করিবেন স্থির হইল। ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে ইহা কি সাধারণ কথা?

ইহা কি সহজ ব্যাপার ? তাই আজ কয়দিন শঙ্কর ধ্যানস্থ থাকিয়া নিজের কর্ম্মমার্গ স্থির করিতেছেন।

উদার কবি ব্যক্তি কোন রস নিজে আস্বাদ করিয়া ক্ষান্ত হন না, তিনি পাঁচজনকে দিয়া তাহা ভোগ করেন ; তাহাতে যদি তিনি পণ্ডিত ও সাধু হন তাহা হইলে জগৎ তাঁহার নিকট উপকৃত হয়। শঙ্করের চিত্ত যেমন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল, অমনি একটী কবিতা রচিত হইল ; কবিতাটী এই :—

(আত্মপঞ্চক)*

নাহং দেহো নেন্দ্রিয়ান্যন্তরঙ্গং, নাহঙ্কার প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ।
দারাপত্যক্ষেত্রবিত্তাদি দূরঃ, সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্মা শিবোঽহম্ ॥১

রজ্জ্বজ্ঞানাদ্ভাতি রজ্জুর্যথাহিঃ, স্বাত্মাজ্ঞানাদাত্মনো জীবভাবঃ।
আপ্তোক্ত্যা হি ভ্রান্তিনাশে স রজ্জু, র্জীবো নাহং দেশিকোক্ত্যা শিবোঽহম্ ॥২

আভাতীদং বিশ্বমাত্মন্যসত্যং, সত্য জ্ঞানানন্দরূপে বিমোহাৎ।
নিদ্রামোহাৎ স্বপ্নবৎ তন্ন সত্যং, শুদ্ধঃ পূর্ণো নিত্য একঃ শিবোঽহম্ ॥৩

---

* আমি দেহ, ইন্দ্রিয়নিচয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) কিম্বা তাহাদের কার্য্য (দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন) নহি ; আমি অহঙ্কার, পঞ্চপ্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান) কিম্বা বুদ্ধিও নহি—দারা, অপত্য, ক্ষেত্র, বিত্তাদি ত দূরের কথা ; পরন্তু আমি সকলের সাক্ষী শিবস্বরূপ নিত্যপদার্থ যে প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ যিনি জীবভাবে জীবাত্মারূপে প্রকাশ পাইতেছেন—সেই পরমাত্মা।১

রজ্জুজ্ঞানের অভাবহেতু যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ স্বরূপজ্ঞানের অভাবহেতু পরমাত্মাতে জীবভাবের আরোপ হইয়া থাকে ; তৎপর জ্ঞানী ব্যক্তির উপদেশে ঐ ভ্রম অপনীত হইলে যেমন রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই জ্ঞান হয়—সর্পভ্রম আর থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশে অজ্ঞান নিরাকৃত হইলে 'আমি জীব নহি—আমি শিবস্বরূপ পরমাত্মা' এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়।২

নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় সকল যেমন সত্যবৎ প্রতীত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতঃ এই মিথ্যা সংসার সত্য-জ্ঞান-আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাতে সত্যবৎ প্রতিভাত হয়, কিন্তু তাহা সত্য নহে ; সুতরাং আমি সেই নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মঙ্গলস্বরূপ, একমাত্র পরমাত্মা।৩

মত্তো নান্যৎ কিঞ্চিদত্রাস্তি বিশ্বং, সত্যং বাহ্যং বস্তু মায়োপক্লৃপ্তম্।
আদর্শান্ত র্ভাসমানস্য তুল্যং, মযাদ্বৈতে ভাতি তস্মাচ্ছিবোঽহম্ ॥৪
নাহং জাতো ন প্রবৃদ্ধো ন নষ্টো, দেহস্যোক্তাঃ প্রাকৃতাঃ সর্ব্বধর্ম্মাঃ।
কর্ত্তৃত্বাদি শ্চিন্ময়স্যাস্তি নাহঙ্কারস্যৈব হ্যাত্মনো মে শিবোঽহম্ ॥৫
নাহং জাতো জন্মমৃত্যু কুতো মে, নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসে কুতো মে।
নাহং চিত্তং শোকমোহৌ কুতো মে, নাহং কর্ত্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে ॥৬

এদিকে সনন্দন প্রমুখ শিষ্যগণ শঙ্করের এই ভাব দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত ও চিন্তিত হইলেন। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অন্তরে ভয়েরও সঞ্চার হইতে লাগিল। একে ত গুরুগত প্রাণ, গুরুভক্ত শিষ্যদিগের স্বভাবতঃই সর্ব্বদা মনে হইত—পাছে কোন সেবাপরাধ ঘটিয়া গুরু-ভক্তির ত্রুটী হয়, যদি গুরু অসন্তুষ্ট হয়েন। তাহাতে শঙ্করের এই ভাবে তাঁহারা মনে মনে বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সহসা সাহস করিয়া কেহ কিছু শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিতেও পারিলেন না।

শিষ্যগণ মধ্যে সনন্দন বিদ্বান এবং পণ্ডিত হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই তিনি শঙ্করের বড় প্রিয় শিষ্য বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনিই সকলের আগ্রহে এবং নিজের অন্তরের ব্যাকুলতায় গুরুদেবকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন।

একদিন দ্বিপ্রহরে শঙ্কর আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন, সনন্দন ধীরভাবে শঙ্করের চরণপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া করজোড়ে বিনীত ভাবে

আমা হইতে ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই; সত্যবৎ প্রতীয়মান যে সকল বাহ্য বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় তৎসমুদয়ই দর্পণান্তর্গত প্রতিবিম্বের ন্যায় অদ্বৈতস্বরূপ আমাতে প্রতিফলিত আছে মাত্র; অতএব আমি সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা।৪

আমার জন্ম, বার্দ্ধক্য বা বিনাশ কিছুই নাই, এই সকলই দেহের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম বলিয়া কথিত; কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি চিন্ময় আত্মারই শক্তি—জীবভাবরূপ অহঙ্কারের নহে; অতএব আমি সদা শিবস্বরূপ পরমাত্মা।৫

অতএব আমি যদি দেহ নহি তবে আবার আমার জন্ম-মৃত্যু কি?—যদি প্রাণ নহি তবে আবার ক্ষুধা-তৃষ্ণা কি?—যদি আমি চিত্ত নহি তবে আমার শোকমোহই বা কি? যদি কর্ত্তাই নহি তবে আমার বন্ধন-মোক্ষই আর কোথায়?৬

বলিলেন—"ভগবন্! সহসা আপনার এই ভাবান্তরের কারণ কি? দুর্ভাগ্য-বশতঃ আমরা কি কোনও কারণে আপনার শ্রীচরণে অপরাধী হইয়াছি? নচেৎ আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত ব্রহ্মসূত্রের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণে কয়দিন আমরা বঞ্চিত হইতেছি কেন? উহা ত আপনি নিত্য উপদেশচ্ছলে আমাদিগকে শুনাইতেন। প্রভো! দয়া করিয়া বলুন আমাদের কি কোনও অপরাধ হইয়াছে?"

সনন্দনের বাক্যে শঙ্কর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "বৎস সনন্দন! ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া তদনুসারে অদ্বৈততত্ত্ব জগতে প্রচার করিবার জন্য আমার প্রতি ভগবান্ বিশ্বনাথের আদেশ হইয়াছে। কিন্তু সনন্দন, এই কার্য্য ত সাধারণ কার্য্য নহে, ইহা অতীব দুরূহ কর্ম্ম। তুমি বোধ হয় জান এই গ্রন্থের অর্থ এপর্য্যন্ত বহুজনে বহুরূপে করিয়া গিয়াছেন। সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। শুনিয়াছি ইঁহাদের মধ্যে আবার একুশজন বৃত্তি বা ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন; অথচ উঁহাদের মধ্যে কেহ কাহারও সহিত একমত নহেন। কিন্তু অনেকে আবার ব্যাসের শিষ্য-সম্প্রদায়ভুক্ত। ব্যাসদেব স্বয়ং কিছু ইহার প্রকৃত বৃত্তি বা ভাষ্য কিছুই করেন নাই। আর সূত্রগুলিও এরূপভাবে রচিত যে সহজে ইহার প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝা যায় না। অথচ বিশ্বনাথের, আদেশ এবং গুরুদেবেরও ইচ্ছা যে ইহার ভাষ্য রচিত হয়। বৎস সনন্দন! কিরূপে একার্য্য সাধিত হইবে তাহাই আমি ভাবিতেছি।"

আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া সনন্দন প্রভৃতি শিষ্যগণ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচন হইয়া উঠিলেন। ভগবান্ বিশ্বনাথ কিরূপে কখন আচার্য্যকে ভাষ্যরচনার আদেশ প্রদান করিয়াছেন, একথা জানিবার জন্য তাঁহাদের হৃদয়ে মহা কৌতূহল উপস্থিত হইল। সনন্দন তখন পুনরায় বিনীতভাবে বলিলেন, "ভগবন্! বিশ্বনাথ কিরূপে কখন আদেশ করিলেন ইহা জানিতে আমাদের সকলেরই বড়ই ঔৎসুক্য হইতেছে আমরা কি ইহা জানিতে পারি?"

আচার্য্য তখন গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম করতঃ বলিলেন "বৎস! সেদিন যে সেই চণ্ডাল আমাদের পথরোধ করিয়াছিলেন,

তিনি যখন নিজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করেন তখন কি তোমরা দেখ নাই ?” সনন্দন সঙ্কুচিত ও বিস্মিত হইয়া কহিলেন “ভগবন্! আমরা দেখিলাম চণ্ডাল সহসা অদৃশ্য হইল এবং আপনি নতজানু হইয়া বিশ্বনাথের স্তব করিলেন! ইহা ভিন্ন আমরা আর কিছুই জানি না বা দেখি নাই। তখন হইতে এ বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তদবধি আপনার এই ধ্যানস্থভাব দর্শনে আর সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।”

আচার্য্য তখন শিষ্যগণ সমক্ষে বিশ্বনাথের সেই অপার করুণার কথা সমুদয় বলিলেন এবং শিবমহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

সনন্দন প্রভৃতি শিষ্যগণের অন্তরে এসময় যে কি ভাবের উদয় হইতেছিল তাহা বর্ণনাতীত। কেহ ভাবিলেন “আহা, আমরা কি দুর্ভাগ্য, আচার্য্য দেখিলেন আর আমরা তাঁহার নিকটে থাকিয়াও কিছু দেখিতে পাইলাম না।” আবার কেহ ভাবিলেন “আমরাই ধন্য যে এরূপ সিদ্ধ গুরুর আশ্রয় লাভ করিয়াছি, এমন গুরুর সঙ্গ কখনই ত্যাগ করিব না।” কেহ মনে করিলেন “আচার্য্য দেখিলেন আর আমরা দেখিতে পাইলাম না, ইহার কারণ কি ?” কিন্তু পরক্ষণে নিজের মনেই তাহার উত্তর মিলিল—তিনি বুঝিলেন নিশ্চয়ই তাঁহাদের অন্তরে গুরুভক্তি নাই, তাই তাঁহারা বিশ্বনাথ-দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন।

এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে সকলেরই সেই ভাবনিদ্রা ভঙ্গ হইল। সনন্দন পুনরায় কহিলেন “ভগবন্! আপনি যে সূত্রব্যাখ্যা আমাদিগকে শুনাইতেছেন, তাহা কি ব্যাসের সম্মত ব্যাখ্যা নহে ? ইহাতে যে কোনরূপ অর্থান্তর হইতে পারে, তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি না।”

আচার্য্য তখন একটু হাসিয়া কহিলেন “বৎস সনন্দন! তোমারা যে ব্যাখ্যা শুনিতেছ, ইহা সেই ব্যাসপুত্র শুকদেব কৃত ব্যাখ্যা। তিনি পিতা ব্যাসের মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলেন তাহাই সম্প্রদায়ক্রমে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাহাই তোমরা শুনিতেছ।”

আচার্য্যের বাক্যাবসানে একজন প্রবীণ শিষ্য বলিলেন, "ভগবন্! আমরা একসময় শুনিয়াছিলাম যে ব্যাসদেব, স্বরচিত সূত্রগ্রন্থ অতিশয় দুর্ব্বোধ হওয়ায় তাঁহার ভাষ্য করিবার মানসে স্বয়ংই নাকি শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ ও সূতসংহিতা নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়া যান। তাহা যদি হয় তবে ব্যাসের মতে সূত্রার্থ জানিবার পক্ষে অসুবিধা কোথায়? আর সূত্রার্থ লইয়া এত মতভেদই বা কেন?"

এই বৃদ্ধ শিষ্যটী ওঙ্কারনাথে গোবিন্দপাদের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি গোবিন্দপাদের জীবিতকাল মধ্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই, এজন্য গুরু-আদেশে শঙ্করেরই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। শঙ্কর তাঁহাকে সম্মানপূর্ব্বক বলিলেন "মহাত্মন্! ইহা সত্য। কিন্তু ইহাতে সূত্রের অক্ষরার্থ নাই, সূত্রানুক্রমেও সূত্রার্থ প্রদর্শিত হয় নাই। তদ্ব্যতীত উহাদের প্রকৃত অর্থাবগতিও সহজ ব্যাপার নহে। ভাগবত-পুরাণখানিকে বৈষ্ণবগণ উপাসনা প্রধান করিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং সূতসংহিতাখানিকে শৈবগণ শিবোপাসনা-প্রধানরূপে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু কি ব্রহ্মসূত্র, কি ভাগবত, অথবা কি সূতসংহিতা ইহারা সকলেই চিন্তামণি-সদৃশ। ইহারা সকলই সগুণ উপাসনার যেমন অনুকূল, তদ্রূপ নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানেরও অনুকূল। এজন্য অধিকারিভেদে উহার ব্যাখ্যায় মতভেদ ঘটিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য তাহা গরুড়-পুরাণে উক্ত হইয়াছে এবং সূতসংহিতাও যে ভাষ্য তাহা সূতসংহিতার মধ্যেই উক্ত হইয়াছে। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। কিন্তু উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে সূত্রাক্ষরার্থ সূত্রানুক্রমে ব্যাখ্যা নাই বলিয়া এবং নানা জনে ব্রহ্মসূত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া উহার প্রকৃত অর্থ প্রদর্শন সহজ ব্যাপার নহে। যাঁহারা অপর ভাষ্যাদি দেখিয়াছেন তাঁহারা আমাদের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা শুনিলে যে একটুও সন্দিহান হইবেন না, তাহা আশা করা অসঙ্গত। বুদ্ধি নির্ম্মল না হইলে ভাল জিনিষকেও মন্দ বলিয়া বোধ হয়।"

এই কথা শুনিয়া সনন্দন বলিলেন, "ভগবন্! যদি তাহাই হয় তবে ব্রহ্মসূত্রের এরূপ একখানি ভাষ্য প্রয়োজন যাহাতে সকল মতের উল্লেখ

থাকিবে এবং তৎপরে শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা প্রকৃত সত্য মতই নির্ণীত হইবে; যেন ভবিষ্যতে পণ্ডিতগণ আর নানা মতের ব্যাখ্যা শুনিয়া কোনরূপে মোহিত না হন। শুকমুখাগত ব্যাখ্যাই নিশ্চয় ব্যাসের অভিমত ব্যাখ্যা, এবং তাহাতেই প্রকৃত সত্য নির্ণীত হইয়াছে। অধিকারিভেদে কর্ত্তব্যের ভেদ বা সাধনের ভেদ হইতে পারে, কিন্তু সত্যের ভেদ হইতে পারে না।"

সনন্দনের কথা শুনিয়া আচার্য্য একটু সংযত ভাবে বলিলেন "সাধুগণ! আমি এই সকল বিষয়ই বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছি। স্বাধীনভাবে একার্য্য করিতে হইলে ইহা এত কঠিন বোধ হইত না; অপরের রচিতসূত্রের ব্যাখ্যারূপে করিতে হইতেছে বলিয়া একার্য্য অতীব গুরুতর বলিয়া বোধ করিতেছি। দেখ বৎস! সত্য একই বটে এবং সেই সত্যলাভের জন্য যে সকল উপায় তাহা অধিকারি-ভেদে নানা হইলেও সকলেরই লক্ষ্য যে সেই এক সত্য, ইহা অল্পবুদ্ধি মানবকে বুঝান সহজ ব্যাপার নহে।"

ইহাতে সেই বৃদ্ধ শিষ্যটী পুনরায় কহিলেন "ভগবন! যাঁহার উপর গুরু গোবিন্দপাদের অপার কৃপা হইয়াছে, যিনি সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্ত্তি বিশ্বনাথের আশীর্ব্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহার আবার ভাবনা কি? আপনার পরিচয় কি আমাদের নিকট অবিদিত আছে? আপনি সাক্ষাৎ শিবাবতার। প্রবল প্রারব্ধকর্ম্মের বিড়ম্বনায় আজিও আপনাতে আমাদের মনুষ্যবুদ্ধি অপনীত হইল না"। এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধের নয়নপ্রান্তে দুই-একটী অশ্রুবিন্দু দেখা দিল।

আচার্য্য সম্ভ্রমপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "মহাত্মন্! আপানাদিগের আশীর্ব্বাদে সকলই সম্ভব। কিন্তু দেখুন! যাহা প্রকৃত সত্য তাহা কি কখন ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা যায়? আর যে যাহা রচনা করে তাহাতেই কি সে ব্যক্তি নিজ বক্তব্য সকল কথা মনের মত করিয়া বলিতে পারে? অবশ্য সূত্রে যে কথা অস্পষ্ট থাকে ভাষ্যে তাহা বিস্তৃত হওয়ায় স্পষ্ট হইবে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বত্র সেই মহামতির মনোভাব প্রকাশিত হইবে কি না তাহার নিশ্চয়তা কি?

তাঁহার পুত্র শুক হইতে প্রাপ্ত ব্যাখ্যা বলিয়া নিশ্চিতই আমাদের ব্যাখ্যা তাঁহার অভিমতই হইবে, কিন্তু অধিকারিভেদে যে তিনি অন্য অর্থও লক্ষ্য করেন নাই, তাহা কে বলিবে? সূত্রের নানা অর্থ থাকা দোষাবহ নহে। মহাত্মন্! এই সব কারণে ভাবিতেছি একার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইবে!"

এই কথা বলিয়া আচার্য্য কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, "দেখুন, এসম্বন্ধে অনেক বলিবার ও ভাবিবার বিষয় আছে। ব্যাসসূত্রে অপরাপর সকল দর্শনের মত খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল দর্শনের মধ্যে পাঁচখানি দর্শন ঋষিপ্রণীত। সেই ঋষিগণ সকলেই সত্যদর্শী, সুতরাং তাঁহাদের প্রচারিত মত কখন ভ্রান্ত হইতেও পারে না। এজন্য সুধী-সমাজে অনুমান করা হয়, তাঁহাদের মত কালবশে শিষ্যসম্প্রদায় কর্তৃক বিকৃত হইয়াছে এবং এই বিকৃত অংশের নির্ণয় পূর্ব্বক তাহার খণ্ডন সাধারণ ব্যাপার নহে। কেবল আর্যমত কেন, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি যত মত আছে, তাহাদেরও খণ্ডন করিতে ব্যাসদেব ত্রুটি করেন নাই। এই সব মত অবৈদিক বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু ইহাদেরও মূল উপনিষৎ মধ্যেই রহিয়াছে। বর্ত্তমান জৈন বৌদ্ধ মতগুলি সেই বেদান্তোক্ত মতেরই বিস্তার বা পরিণতি। সুতরাং বর্ত্তমান জৈন ও বৌদ্ধমতের সহিত উপনিষদুক্ত জৈন-বৌদ্ধমতের পার্থক্য কি, ব্যাস কোন জৈন-বৌদ্ধমত লক্ষ্য করিয়াছেন এই সকল বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ভাষ্য করা আবশ্যক হইবে। তাহার পর, যে ভাষায় যে ভাবে ভাষ্যরচনা করিতে হইবে, সে ভাষায় সে ভাব কালের প্রভাবে যেন দুর্ব্বোধ্য বা অরুচিকর না হইয়া যায়। দেখুন, বৈদিক সংস্কৃত আজ সহজবোধ্য নহে বলিয়া ইহার প্রচার কত অল্প। এ সকল বিষয় ভাবিয়া ভাষ্যরচনা না করিলে উহা অভীষ্ট ফলপ্রদ হইবে না।"

এই কথা বলিয়া আচার্য্য সনন্দনকে বলিলেন "সনন্দন! এই কাশী নগরী বিদ্যার জন্য বিখ্যাত। তোমরা ব্রহ্মসূত্রের প্রাচীন ভাষ্য এবং বিভিন্ন মতবাদের গ্রন্থ যত পার সংগ্রহ কর। অতঃপর এখান হইতে আমরা বদরিকাশ্রমে যাত্রা করিব। ভাষ্যরচনার পক্ষে সেই স্থানই উত্তম বলিয়া বোধ হইতেছে।"

সনন্দন ব'ললেন, "ভগবন্! বদরিকাশ্রম যাইবার বাসনা কেন করিতেছেন? কাশী নগরী হইতে সে স্থানকে উত্তমই বা কেন বলিতেছেন, ইহা জানিতে আমাদের বড়ই কৌতূহল হইতেছে!"

আচার্য্য বলিলেন, "সনন্দন! তথায় যাইবার কারণ অনেক। প্রথম দেখ, সে স্থানটী নির্জ্জন ও নিরুপদ্রপ এবং তপস্যার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। শুনা যায়, বহু মুনি-ঋষি এবং স্বয়ং ব্যাসদেব এখনও তথায় অবস্থান করেন। সেই স্থানেই ব্যাসদেব এই ব্রহ্মসূত্র এবং মহাভারত পুরাণাদি সমুদয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেখানে ব্যাসের সহিত যদি সাক্ষাৎ নাও হয় তাহা হইলেও স্থানটী নিরুপদ্রপ বলিয়া তথাকার বৃক্ষ-প্রস্তর প্রভৃতি স্থির বস্তুগুলি এখনও ব্যাসের সেই শাস্ত্রচিন্তার সাক্ষ্য দিতে পারে এবং যোগবলে সেই সকল ভাবের সহজে পুনরুদ্ধারও হইতে পারে। যাহা হউক, তোমরা কাশী হইতে যে সকল পুস্তকাদি সংগ্রহ হইতে পারে, তাহা সংগ্রহ কর।"

আচার্য্যের এই ইচ্ছা ক্রমে কাশীবাসী সকলে বিদিত হইলেন। অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মূল্যবান্ বহু গ্রন্থ আনয়ন করিতে লাগিলেন। অতুল প্রতিভাসম্পন্ন শ্রুতিধর শঙ্কর সেই সকল গ্রন্থ একবার মাত্র পাঠ করিয়াই গ্রন্থের সারাংশ চিরতরে চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া লইতে লাগিলেন। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই কাশীতে লভ্য যাবৎ পুস্তকের সারসংগ্রহকার্য্য শেষ হইয়া গেল এবং পুস্তকগুলি যথাস্থানে ফিরাইয়া দিয়া সশিষ্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যপ্রণয়ন মানসে বদরিকাশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

দৃঢ়তা।*

(স্বামী পরমানন্দ)

হিমাদ্রিবৎ অটল বিশ্বাস-সম্পন্ন হও। সতর্কতা ও প্রফুল্লতা অবলম্বন কর। ঈশ্বরে দৃঢ়বিশ্বাসী হও। সাহসী, সত্যপরায়ণ ও স্বার্থশূন্য হও। কখনও ভীত হইও না, পশ্চাৎদিকে তাকাইও না, অগ্রসর হও। সর্ব্ব অবস্থাতেই দৃঢ়তা অবলম্বন করা সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ শিক্ষা। মানবের সাহায্য চাহিও না, পরন্তু ঈশ্বরের কৃপাকাঙ্ক্ষী হও। তিনিই তোমায় রক্ষা করিবেন। তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর, কেবল তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া যাও। মানবের সাহায্য ত অনিশ্চিত, মানবদেহধারী বন্ধুরা স্বার্থপর—তাহারা অনেক সময় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া থাকে। ঈশ্বরই একমাত্র প্রকৃত বন্ধু। তিনি কেবল ভালবাসার জন্যই ভালবাসিয়া থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার একখানি পত্রে বলিয়াছিলেন :—"ঈশ্বরই একমাত্র সূক্ষ্মদর্শী। মূর্খ লোকে যা বলে বলুক ; আমরা তাহাদের সাহায্যও চাই না, তাহাদিগকে অবজ্ঞাও করি না। আমরা সেই সর্ব্ব-শক্তিমান্ প্রভুর দাস। মানুষের ক্ষুদ্র চেষ্টার দিকে যেন আমাদের দৃষ্টি না পড়ে। এগিয়ে পড়, এগিয়ে যাও। বহু দিনের একাগ্র চেষ্টায় তবে একটী চরিত্র গঠিত হয়। তা'বলে হতাশ হইও না। সত্যের একবর্ণও অন্যথা হইবে না। বহু বৎসর ধরিয়া উহা আবর্জ্জনাবৃত থাকিতে পারে, কিন্তু একদিন না একদিন সত্য প্রকাশ হইবেই হইবে। সত্যের বিনাশ নাই—ধর্ম্ম ও পবিত্রতা অবিনাশী। আমি চাই একজন খাঁটী পবিত্র লোক! একগাদা লোকে আমার প্রয়োজন নাই। বৎস, দৃঢ়তা অবলম্বন কর। অপরের সাহায্যের প্রত্যাশা করিও না। সকল মানবের সাহায্য অপেক্ষাও ঈশ্বর কি অনন্তগুণে মহত্তর নহেন? পবিত্র হও—ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, তাঁহার উপর নির্ভর কর, তাহা হইলেই তুমি ঠিক পথে থাকিবে—কিছুতেই তোমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না।"

---

* 'The Path of Devotion' নামক পুস্তক হইতে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

দুঃখকষ্ট সময়ে সময়ে আমাদের চরিত্রবল বৃদ্ধি করিবার জন্য আইসে। তাহারা পরীক্ষাস্বরূপ। তাহাদের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং সোৎসাহে ঐ সকলকে জয় করিয়া যাইতে হইবে। মনে রাখিও, তাহারাই চরিত্রগঠনের পক্ষে প্রকৃষ্ট উপাদান। যত বিপদে পড়িবে ততই সাহায্যের জন্য জগন্মাতাকে মনে পড়িবে। এইজন্য ঈশ্বরানুরাগিণী পাণ্ডবজননী কুন্তী ঈশ্বরের নিকট দুঃখশোক প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কারণ, তাহা হইলেই তিনি কখন ঈশ্বরকে ভুলিবেন না। সাধারণতঃ যখন আমাদের সমস্তই সহজ সুখপ্রদ বলিয়া বোধ হয় তখন আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া যাই। সুতরাং বহু সৌভাগ্যের কথা যে, এই দুঃখদৈন্যরূপী শিক্ষক আসিয়া আমাদের কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

আদর্শের অনুবর্ত্তন করিতে হইলে প্রত্যেককেই অত্যধিক সাহসিকতার সহিত প্রতি কার্য্যের সম্মুখীন হইতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ 'মদীয়-আচার্য্যদেব' নামক পুস্তকে কি বলেন, তাহা স্মরণ কর—"সমগ্র জগৎ তোমায় ধ্বংস করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেও তুমি কি তোমার আদর্শকে দৃঢ়তার সহিত ধরিয়া থাকিতে পারিবে?" এইরূপ নির্ভীকতা ও স্বার্থত্যাগ চাই। দুর্ব্বলমনা লোকের দ্বারা সত্যানুভূতি সম্ভবপর নয়। জীবনের সকল কর্ত্তব্য সাহসের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে। কাহাকেও ভয় করিলে চলিবে না। পবিত্রতা ও ঈশ্বরত্ব তোমার জন্মগত অধিকার—উহাতে বিশ্বাস কর ও কাজ করিয়া যাও।

স্বার্থশূন্য ব্যক্তির কিসের ভয়? স্বার্থপরতাই সমস্ত ভয় ও দুঃখের মূল। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপর ব্যক্তির পাপভয় থাকে না। ইহা জানিয়া সকল ভয় ভাবনা পরিহার কর। ধর্ম্ম কেবলমাত্র নির্ভীক হইতেই শিক্ষা দেয়, আর এই নির্ভীকতা পবিত্র চিন্তা ও পবিত্র কর্ম্ম হইতে আইসে। 'গতস্য শোচনা নাস্তি'—যাহা গত হইয়া গিয়াছে তাহার দিকে তাকাইও না। বর্ত্তমান অবস্থাতে সম্পূর্ণরূপ নিঃস্বার্থপর হইয়া সকল কার্য্য করিয়া যাও।

কর্ম্মযোগ এত কঠিন ও গহন যে, এমন কি মহাজ্ঞানীদেরও ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।"

অবসন্নতা সময়ে সময়ে আসে বটে, কিন্তু ঐ অবস্থায় আমাদিগকে ধীর ও অধ্যবসায়শীল হইতে হইবে। ঈশ্বরের গতি কুহকময়! যাবজ্জীবন তীব্র সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। সহস্রবার বিফলপ্রযত্ন হইলে কি হয়! আবার নবোৎসাহে অগ্রসর হইতে হইবে। সংগ্রামই জীবন। সকল প্রকার বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইবার জন্য সাহস অবলম্বন করিতে হইবে। তবে এস, আমরা প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে চেষ্টা করি। বীর্য্য! বীর্য্য!! কোণে বসিয়া কাঁদিলে চলিবে না। উঠ, দাঁড়াও—সমস্ত দুর্ব্বলতাকে দূরে ছুড়িয়া ফেল। আত্মা অবিনাশী—অমর; আত্মায় পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। তবে কাহার ভয়? সাহসে ভর করে এগিয়ে পড়। "অভীঃ"—কিছুতেই ভয় পাইও না; কেবল এগিয়ে যাও। তুমি নিত্যমুক্ত, তুমি অমৃতস্বরূপ। দেখ যেন কেহ তোমায় দুর্ব্বল, দুষ্ট বা পাপী না বলে; কারণ, তুমি তাহা নহ। তুমি পবিত্র—সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক।

তবে তাঁর পদে আশ্রয় নিয়ে আবার ভয় কেন?—তথায় কেবল সুখ, কেবল শান্তি! যাঁহার ভক্তি আছে তিনি যথার্থই ভাগ্যবান্। ভগবান্ বলেন—"আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই গো!" ঠিক ঠিক ভক্তি লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। যিনি এই ভক্তিধনের অধিকারী এবং দৃঢ়তা ও সংযমের সহিত স্তুতিনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া কার্য্য করিতে পারেন, তিনিই ধন্য!

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন কঠোর সংগ্রাম ও ক্লান্তির অবস্থা আসে যে, তখন সকল জিনিষই দুষ্কর ও বিষাদময় দেখায়। কিন্তু স্মরণ রাখিও এই সকল অবস্থা অতিক্রম না করিয়া কখন কোন যথার্থ উন্নত চরিত্র গঠিত হয় নাই। সুতরাং আমাদিগকে নির্ভীক ও সহনশীল হইতে হইবে। কতকগুলি অজ্ঞ লোক এই জগৎটাকে একটা সুরম্য উদ্যানবিশেষ মনে করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক উহা সেরূপ নহে। উহা সর্ব্বথা কণ্টকময়; সুতরাং এই জগতে বিচরণ করিতে হইলে আমাদিগকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। সতর্ক হওয়া যে শুধু ভাল তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে ইহা একান্ত আবশ্যক।

জাগ্রত-অবস্থায় তোমার গৃহে চোর প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বদাই সতর্ক ও জাগ্রত থাকিতে চেষ্টা করিবে। এবং তাহা হইলেই তোমার অমূল্যধন অপহৃত হইবার কোন আশঙ্কা থাকিবে না। সর্ব্বোপরি তোমার নিজের উপর ও নিজ আদর্শের উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকা সর্ব্বথৈব আবশ্যক।

সকল প্রকার দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া সত্যের বিস্তৃত আলোকে এস, তাহা হইলে সকল বস্তুর যথার্থ স্বরূপ দেখিতে পাইবে। সর্ব্বদা মনে রাখিও—কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য আমরা সত্যপথ অবলম্বন করি নাই বা কাহারও জন্য উহা ত্যাগও করিব না। সত্যের জন্যই আমরা সত্যপথ আশ্রয় করিয়াছি এবং যাবজ্জীবন উহাকে ধরিয়া থাকিবই। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর—"হে ঈশ্বর, আমাদিগকে বল দাও, সত্যের আলোক দেখাও, যেন আমরা সত্যপথে থাকিয়া তোমার সেবা করিতে পারি।" এই পথে থাকিয়া যদি মৃত্যুও ঘটে তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু কোন দুর্ব্বলতার জন্য যেন আমরা কখন ঐ পথ ত্যাগ না করি।

ইহাও জানিয়া রাখিবে যে, অবস্থাবিপর্য্যয় শরীর ও মন উভয় পক্ষেই সমান ভাবে আসিয়া থাকে। সে জন্য হতাশ হওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে; পরন্তু দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত খানদানী চাষীর গল্পের কথা মনে কর:—একদা কোন এক গ্রামে দুইজন চাষা বাস করিত; তন্মধ্যে একজন জাতচাষী, ও অপর জন তাঁতী। তাঁতী নিজের ব্যবসায়ে অধিক লাভ না হওয়ায় অধিক লাভের আশায় কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিল। বছর দুই অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাঁতী হতাশ হইয়া চাষ ছাড়িয়া পুনরায় নিজের ব্যবসায় ধরিল। কিন্তু যে জাতচাষী, সে বার বৎসর অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হইলেও চাষ ছাড়িল না—কারণ, তাহার চাষ ব্যতীত আর অন্য পেসা নাই। ইহাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সরল গ্রাম্য ভাষায় 'খানদানী চাষা' বলিতেন।

এইরূপ ভক্তিও দুই রকমের দেখা যায়। একজন ভগবৎ ভক্তির অধিকারী হইয়াই জন্মিয়াছে—সে অন্য কিছুই জানে না; অপর একজন উহা লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রথম ব্যক্তি সহস্র

বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও এবং আজীবন কঠোর সংগ্রাম করিয়াও ঈশ্বরের অনুভূতি লাভ করিতে না পারিলেও ভক্তিপথ ত্যাগ করে না। কিন্তু অপর ব্যক্তি সামান্য বাধা উপস্থিত হইলেই ঐ পথ ছাড়িয়া আবার সংসারে মন দেয়। প্রথম ব্যক্তির ভালবাসা পবিত্র ভালবাসা—ভালবাসার জন্যই ভালবাসা। অপর ব্যক্তি স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া ঈশ্বরারাধনায় রত হয় এবং আশানুরূপ ফল না পাইলেই ঐ পথ ত্যাগ করিয়া যায়।

অধ্যবসায় ও দৃঢ়চিত্ততা সর্ব্বথা প্রয়োজন। উহা ব্যতিরেকে কোন উন্নতিই সম্ভব নহে। প্রকৃতির উপর যত কম নির্ভর করিতে চেষ্টা করিবে তোমার আভ্যন্তরীণ শক্তি ততই জাগরিত হইয়া উঠিবে। স্তুতিনিন্দা বা অপরের কথা ও কার্য্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া দৃঢ়তার সহিত আপন পথে অগ্রসর হও। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ" অর্থাৎ আত্মোন্নতি লাভ করিতে হইলে নিজের ভিতর কোন প্রকার দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিলে চলিবে না। কোন কারণে কোন অবস্থার ভিতরেই দুঃখ বা অবসাদকে তোমার মধ্যে স্থান পাইতে দিবে না। সতর্কতা ও দৃঢ়চিত্ততা অবলম্বন কর—প্রকৃত বীর হও। দৃঢ়তার সহিত নির্ভীকচিত্তে বল, "আমার ভিতর অনন্তশক্তি রহিয়াছে, আমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব।" সমস্ত দুর্ব্বলতা মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইবে, সমস্ত সঙ্কীর্ণতা বিলয় পাইবে এবং তুমি অনন্ত সুখ ও শান্তিতে বিরাজ করিবে।

বাহ্যবস্তুর উপর কোন আশা করিও না। তোমার সমস্ত চিন্তা-শক্তিকে অন্তরে নিয়োজিত কর এবং অন্তরের অন্তরে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে থাক। হৃদ্‌পদ্মাসনে বসাইয়া দিবারাত্র তাঁহার সেবা করিতে থাক। মানবজীবনে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।

জাগতিক কোন কিছুতেই প্রকৃত সুখ নাই। কেমন করিয়াই বা থাকিবে? জগতের সমস্তই যে পরিবর্ত্তনশীল। সুখদুঃখ ক্ষণিক—উভয়েই দুদিনের জন্য; কাজেই অবিচলিত ভাবে উহাদের সহ্য করিয়া যাও। যিনি 'সুখদুঃখে সমে কৃত্বা' নির্ব্বিকার ভাবে থাকিতে পারেন তিনিই

প্রকৃত বীর। ধৈর্য্য ধারণ কর, ধৈর্য্যই অন্তে জয়ী হইবে। সাহসী সৈনিক পুরুষের ন্যায় আমাদের দৃঢ়বিশ্বাসের উপর দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে। শরীর চিরদিন থাকে না, কিন্তু আত্মা ও চরিত্র চিরস্থায়ী। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে চরিত্র গঠন করিতে যত্নবান্ হও।

তুমি পবিত্র, তুমি মুক্ত, দুর্ব্বলতা তোমার সাজে না—নিজের উপর বিশ্বাসবান্ হও। এমন বিশ্বাসসম্পন্ন হও, যেন তোমার অস্তিত্বের প্রতি পরমাণু তোমার আজ্ঞায় চলিবে। সন্দিগ্ধচিত্ত লোক লক্ষ্যে পঁহু'ছতে পারে না। স্বামিজী বলেন, "যে নিজের উপর বিশ্বাস রাখে না, সে ত নাস্তিক।" সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে তোমার নিজের উপর বিশ্বাসবান্ না হইলে তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাসসম্পন্ন হইতে পার না।

প্রভু আমাদের দ্বারা কি করাইবেন তাহা আমরা জানিতে পারি না। কিন্তু এইটী ঠিক জানি যে আমরা তাঁহার সন্তান—তিনি নিশ্চয়ই আমাদিকে ঠিক পথে চালাইবেন এবং সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন। ইহাই আমরা চাই। সারা বিশ্ব আমাদের প্রতিকূল হউক, আমরা গ্রাহ্য করিব না। আমরা চাই কেবল ধীর, আজ্ঞাবহ ও দৃঢ়বিশ্বাসসম্পন্ন সৈনিক হইতে। কর্ম্মযোগ অতীব দুর্গম পথ বটে, কিন্তু এইটী মনে রাখিও—কোন মহৎ কার্য্যই মহান্ স্বার্থত্যাগ ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না।

উঠ, জাগ, বাহ্যিক জগতের দিকে চাহিও না—অন্তরের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ কর—সেইখানেই প্রকৃত সুখ ও শান্তি মিলিবে। ইহা নিশ্চিত জানিও—শান্তি একমাত্র অন্তরের অন্তস্থলেই পাইবে, অন্য কোথাও উহা নাই। আমরা নিজেরা শান্ত না হইলে শান্তি কোথাও মিলিবে না। সুতরাং অন্তরমধ্যে শান্তির অন্বেষণ কর, তাহা হইলেই তুমি মুক্ত হইবে। তখন কোন বাহ্যিক বিঘ্নই তোমার শান্তিভঙ্গ করিতে সক্ষম হইবে না। নিজের উপর বিশ্বাসবান্ হও—এগিয়ে যাও। সত্যের জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে বীরের ন্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর—তাহা হইলেই তোমার শান্তি আসিবে!

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

বাসনাক্ষয়-প্রকরণ।

(অনুবাদক শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এস্থলে আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে যে—বিবিদিষা সন্ন্যাসী উক্ত তিনটী (সাধন) অভ্যাস করিয়া বিদ্বৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, উক্ত সাধনত্রয় কি পূর্ব্বাভ্যাস ক্রমেই চলিতে থাকিবে অথবা উক্ত সাধনত্রয়ের অভ্যাসে পুনর্ব্বার (নূতন) সম্পাদন প্রযত্নের অপেক্ষা আছে ? এস্থলে প্রথম কল্পটী বলিতে পার না, অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকিবে একথা বলিতে পার না, কেননা তত্ত্বজ্ঞানের ন্যায় অপর দুইটী অযত্ন সদ্ধ বলিয়া (বিদ্বৎসন্ন্যাস কালে) তাহাদিগকে প্রধান বলিয়া ভাবিতে পারা যাইবে না সুতরাং তাহাদের প্রতি প্রাধান্য জনিত আদরও হইবে না। আর নূতন প্রযত্নের অপেক্ষা আছে একথাও বলিতে পার না, কেননা অপর দুইটির ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানকেও যত্নসাপেক্ষ বলিলে তাহাকে অপ্রধান ভাবিয়া তৎপ্রতি ঔদাসীন্যও আসিবে না।

এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলি—এইরূপ দোষ উঠিতে পারে না, কেননা আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে (বিদ্বৎসন্ন্যাস কালে) তত্ত্বজ্ঞানের অনুবৃত্তিমাত্র থাকিবে অর্থাৎ অভ্যাসবশতঃ পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকিবে এবং অপর দুইটী সম্বন্ধে প্রযত্ন করিতে হইবে। কথা এই যে তত্ত্বজ্ঞানাধিকারী দুই প্রকার, এক প্রকার কৃতোপাস্তি অর্থাৎ যাহারা উপাসনারূপসাধনসম্পন্ন এবং অপর প্রকার অকৃতোপাস্তি অথাৎ যাহারা তদ্রূপ সাধনসম্পন্ন নহে। তন্মধ্যে যদি প্রথম প্রকারের অধিকারী উপাসনা দ্বারা উপাস্য সাক্ষাৎকার করিয়া পরে তত্ত্বজ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত হয়, তবে বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ, (উপাসনার দ্বারা) দৃঢ়তর হইয়া থাকাতে, তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর বিদ্বৎসন্ন্যাস ও জীবন্মুক্তি আপনা হইতেই

সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানাধিকারীই শাস্ত্রসম্মত মুখ্য অধিকারী। বিদ্বৎসন্ন্যাস ও বিবিদিষা সন্ন্যাস স্বরূপতঃ পৃথক্ হইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রে উভয় প্রকার সন্ন্যাস একত্র উক্ত হওয়াতে উহার 'সংকীর্ণ' বা মিশ্রত্বের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

আজকাল যে সকল (তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সু) অধিকারী দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের অধিকাংশই অকৃতোপাস্তি অর্থাৎ উপাসনাসম্পন্ন নহে; তাহারা কেবল ঔৎসুক্যবশতঃই সহসা তত্ত্বজ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত হয়। এবং তাৎকালিক বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ সম্পাদন করিয়া থাকে এবং ইতিমধ্যে (সঙ্গে সঙ্গে) শ্রবণ-মনন ও নিদিধ্যাসন নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। এই সকল সাধন দৃঢ়ভাবে অভ্যস্ত হইলে, অজ্ঞান সংশয় ও বিপর্য্যয় দূরীভূত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান সম্যক্ ভাবে উদিত হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান একবার উদিত হইলে তাহার বাধক প্রমাণ না থাকাতে এবং যে অবিদ্যা একবার নিবৃত্ত হইয়াছে তাহার পুনরুৎপত্তির কারণ না থাকাতে সেই তত্ত্বজ্ঞান শিথিল হইয়া পড়ে না বটে, কিন্তু বাসনাক্ষয় ও মনোনাশের অভ্যাস দৃঢ়ভাবে সম্পাদিত না হওয়াতে, ভোগপ্রদ প্রারব্ধ আসিয়া তাহাদিগকে সময়ে সময়ে বাধা দিলে সেই বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ সবাত-প্রদেশস্থ দীপের ন্যায় হঠাৎ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। বাসনাক্ষয় বিষয়ে বসিষ্ঠ বলিতেছেন ;—

পূর্ব্বৈভ্যস্ত প্রযত্নেভ্যো বিষমোহয়ং হি সংমতঃ। (১)
দুঃসাধ্যো বাসনাত্যাগঃ সুমেরুন্মূলনাদপি॥ (উপশমপ্রকরণ ৯২।১০)

পূর্ব্বোক্ত উপায়সমূহের মধ্যে এই বাসনাত্যাগরূপ উপায় অতি কঠিন; পণ্ডিতেরা এইরূপ মনে করিয়া থাকেন যে সুমেরু পর্ব্বতের সমূলে উৎপাটন অপেক্ষাও বাসনাত্যাগ দুঃসাধ্য।

(মনোনাশ বিষয়ে) অর্জ্জুনও বলিতেছেন ;—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ (গীতা, ৬।৩৪)

---

(১) মূলের পাঠ—সংস্মৃতঃ।

হে ভক্তজনপাপাদিদোষাকর্ষণ শ্রীকৃষ্ণ! হে ঐহিক-পারত্রিক সর্ব্বসম্পদাকর্ষণ কৃষ্ণ! মন যে কেবল স্বভাবত চঞ্চল তাহা নহে, মন দেহেন্দ্রিয়াদির বিক্ষোভকর; প্রবল বিচার দ্বারাও ইহাকে সংযত করা যায় না, এবং বিষয়বাসনাবিজড়িত থাকাতে ইহাকে সহজে ভেদ করাও যায় না। আকাশে দোধূয়মান বায়ু যেরূপ কুম্ভাদির দ্বারা রোধ করা অসাধ্য মনের নিরোধ করাও সেইরূপ অসাধ্য মনে করি।

এইহেতু ইদানীন্তন বিদ্বৎসন্ন্যাসাদিগের পক্ষে জ্ঞানের অনুবৃত্তিমাত্র চলিবে এবং বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ বিষয়ে প্রযত্ন করিতে হইবে—ইহাই সিদ্ধান্ত। এ স্থলে প্রশ্ন হইতেছে—আচ্ছা যে বাসনার ক্ষয় করিবার জন্য যত্ন করিবার উপদেশ দেওয়া হইতেছে, সেই বাসনা শব্দে কি বুঝিতে হইবে? এই হেতু বসিষ্ঠ সেই বাসনার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন:—

দৃঢ়ভাবনয়া ত্যক্ত পূর্ব্বাপর বিচারণম্।
যদাদানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্ত্তিতা॥ (উপশম প্রঃ, ৯১।২৯)

পূর্ব্বাপর বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক (আমি আমার এই প্রকার দৃঢ়-সংস্কারের সহিত যে (দেহাদি) পদার্থের গ্রহণ হয় তাহাকেই বাসনা বলে।(১)

ভাবিতং তীব্রসংবেগাদাত্মনা যত্তদেব সঃ।
ভবত্যাশু মহাবাহো বিগতেতরসংস্মৃতিঃ॥ (ঐ, ৩১।৩০)

হে মহাবাহো! তীব্র সম্বেগ-সংস্কার বশতঃ লোকে যাহাই ভাবনা করে, অবিলম্বে তাহাই হইয়া যায়। এবং তাহার অন্য সকল প্রকার স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। (২)

---

(১) রামায়ণের টীকাকার বলেন:—'বাসয়তি' দেহাদিভাবে আত্মাকে তদ্রূপ করিয়া দেয় এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা বাসনা শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে।

জীবন্মুক্তগণ পূর্ব্বাপর বিচারশীল; তাঁহাদের দেহাদিসংস্কার বাসনা নহে; কারণ সেই সংস্কারবিরোধী বিচার দ্বারা সমাক্রান্ত থাকাতে তাহা তাঁহাদিগকে দেহাদিভাবে বাসিত করিতে পারে না।

(২) মূলে "ভাবিতঃ" পাঠ আছে। উক্ত টীকাকার বলেন:—অজ্ঞানের সহিত উক্ত দেহাদিসংস্কারের বিরোধ না থাকায়, তীব্র সম্বেগবিশিষ্ট ভাবনার দৃঢ়তাবশতঃ, (সেই দেহাদি সংস্কার অজ্ঞানীকে) দেহাদি ভাবে বাসিত করিতে পারে, ইহাই শ্লোকের মর্ম্ম।

তাদৃগ্রূপোহি পুরুষো বাসনাবিবশীকৃতঃ।
সংপশ্যতি যদৈবৈতৎ সদ্বস্ত্বিতি বিমুহ্যতি॥ (ঐ, ৩১)

লোকে আপনার ভাবিতরূপ প্রাপ্ত হইলে, বাসনা দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকাতে, যখনই বিচার করে তখনই 'ইহাই উৎকৃষ্ট' এই ভাবিয়া বিমুগ্ধ হয়। (১)

বাসনাবেগবৈবশ্যাৎ স্বরূপং প্রজহাতি তৎ।
ভ্রান্তং পশ্যতি দুর্দৃষ্টিঃ সর্ব্বং মদবশাদিব॥ (ঐ, ৩২)

বাসনাবেগে অভিভূত হইয়াছে বলিয়া সেই ব্যক্তি সেই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারে না। মাদকদ্রব্য সেবন হেতু লোকে যেমন বিলুপ্ত-বিচারশক্তি হয় সেও সেইরূপ হইয়া সকল বস্তুই বাসনা দ্বারা উপস্থাপিত জগদ্রূপ সকল বস্তুই ভ্রান্তভাবে দেখিয়া থাকে।

লোকের নিজ নিজ দেশাচার, কুলধর্ম্ম ভাষা এবং তদন্তর্গত অপশব্দ সুশব্দ প্রভৃতিতে যে অত্যন্তাসক্তি দেখা যায় তাহাই এবিষয়ে সাধারণ ভাবে দৃষ্টান্ত হইতে পারে। পরে বাসনার প্রকারভেদ উল্লেখ করিয়া বিশেষভাবে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইবে। এই প্রকার বাসনাকে লক্ষ্য করিয়াই বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে :—

স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তৎকর্ম্ম কুরুতে যৎকর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে॥ ইতি (বৃহদা, উ, ৪।৪।৫)

সেই আত্মা, যিনি সাধারণতঃ কামময়, (তিনি) যে প্রকার কামনা-বিশিষ্ট হয়েন, তদনুরূপ অধ্যবসায়বিশিষ্ট হইয়া থাকেন এবং সেই অধ্যবসায় যে প্রকার কর্ম্মের অনুকূল হয়, তিনি সেই প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; এবং যে প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন সেই প্রকার ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

---

(১) মূলের পাঠ কিন্তু এইরূপ :—"যৎ পশ্যতি তদেতৎ তৎ সদ্বস্ত্বিতি বিমুহ্যতি।"

টীকাকার ব্যাখ্যা করেন :—বাসনা যেমন দেহাদিকে আত্মা বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, সেইরূপ বাহ্যবস্তুকেও সত্ত্বাবান্ বলিয়া (বস্তুতঃ আছে বলিয়া) দেখাইয়া দেয়। বসতীতি বস্তু—যাহা আছে, তাহাই বস্তু। তাহাও আত্ম-সত্ত্বা দ্বারা লোককে বাসিত করে বলিয়া বাসনা শব্দের ব্যুৎপত্তি তাহাতেও খাটিতে পারে।

বাসনার প্রকারভেদ বাল্মীকি এই প্রকারে দেখাইয়াছেন :—

বাসনা দ্বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা তথা।
মলিনা জন্মহেতুঃ স্যাচ্ছুদ্ধা জন্মবিনাশিনী॥

(বাসিষ্ঠ রামায়ণ, বৈরাগ্যপ্রকরণ, ৩।১১)

শুদ্ধা মলিনা ভেদে বাসনা দুই প্রকার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মলিনা বাসনা পুনর্জন্ম লাভের কারণ এবং শুদ্ধা বাসনা পুনর্জন্ম-বিনাশের কারণ।

অজ্ঞানসুঘনাকারা ঘনাহংকারশালিনী।
পুনর্জন্মকরী প্রোক্তা মলিনা বাসনা বুধৈঃ॥ (ঐ, ১২)

পণ্ডিতগণ বলেন যে মলিন বাসনা অজ্ঞান দ্বারা ঘনীভূতাকৃতি হয় এবং তাহা দৃঢ়াহংকারসম্বলিত। এই বাসনাই পুনর্জন্মলাভের হেতু হয়। (১)

পুনর্জন্মাঙ্কুরং ত্যক্ত্বা স্থিতা সংভৃষ্টবীজবৎ।
দেহার্থং ধ্রিয়তে জ্ঞাতজ্ঞেয়া শুদ্ধেতি চোচ্যতে॥ (ঐ, ১৩)

(তাঁহারা বলেন যে) যে বাসনা জ্ঞাতব্য (আত্মতত্ত্ব) অবগত হইয়া ভৃষ্টবীজের ন্যায় পুনর্জন্মের অঙ্কুর বিনষ্ট করিয়া (জ্ঞানিগণ কর্তৃক) কেবল দেহধারণ নির্ব্বাহ জন্য রক্ষিত হইয়া থাকে তাহাকে শুদ্ধা বাসনা বলে। (২)

(১) রামায়ণের টীকাকার বলেন :—বাসনা-বীজ অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে অজ্ঞানই সুন্দর ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রে সুঘনাকারা বিষয়ানুসন্ধানাভ্যাসদ্বারা-পরিপুষ্টাকৃতি—বাসনাই বীজ. কেননা বাসনা রাগদ্বেষাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। নিবিড়াহঙ্কার সেই ক্ষেত্রের উপসেচক ক্ষেত্রিক, তাহার দ্বারাই সেই বাসনা বর্দ্ধিত ও বিস্তারিত হইয়া শোভা পায়।

(২) এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় রামায়ণের টীকাকার বলেন :—যেমন বীজের অভ্যন্তরে অঙ্কুর সকল সূক্ষ্মভাবে থাকে, এবং কাল ও জলাদিসম্বন্ধহেতু আবির্ভূত হয়, সেইরূপ (ভাবী) জন্মসমূহ বাসনার অভ্যন্তরে বাস করে এবং কামকর্ম্মাদিনিমিত্তবশে আবির্ভূত হয়; কারণ যাহা একান্ত অসৎ তাহার উৎপত্তি সম্ভবে না। পরে তত্ত্বজ্ঞান যখন অবিদ্যাক্ষেত্র দগ্ধ করিয়া দেয়, তখন সেই অবিদ্যাক্ষেত্রের অন্তর্গত জন্মাঙ্কুরসমূহ বিনষ্ট হইলেও বাসনা স্বকীয় ও পরকীয় প্রারব্ধ দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়া, ভৃষ্টবীজের (খৈ প্রভৃতির) ন্যায় কেবলমাত্র দেহধারণরূপ প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিবার জন্য অবশিষ্ট থাকে। তাহাকেই শুদ্ধ বাসনা বলে।

'অজ্ঞানসুঘনকারা'—অজ্ঞান দেহাদি পঞ্চকোশ এবং সেই দেহাদির সাক্ষী চিদাত্মা এতদুভয়ের ভেদকে আবরণ করিয়া রাখে অর্থাৎ বুঝিতে দেয় না। সেই অজ্ঞান দ্বারা যাহার আকার সম্যক্ প্রকারে ঘনীভূত হইয়াছে তাহাকেই 'অজ্ঞানসুঘনাকারা' বলা হইতেছে। যেমন দধির সহিত মিলিত হইলে দুগ্ধ ঘনীভূত হইয়া যায়, অথবা যেমন তরল ঘৃত অত্যন্ত শীতল স্থানে দীর্ঘকাল ধরিয়া রক্ষিত হইলে অত্যন্ত ঘন হইয়া যায়, (অজ্ঞান দ্বারা) বাসনাও সেইরূপ ঘনীভূত হইয়া যায় বুঝিতে হইবে। এস্থলে ঘনীভাব শব্দে ভ্রমপরম্পরা বুঝিতে হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ষোড়শাধ্যায়ে আসুরসম্পৎ বর্ণনা করিবার কালে সেই মলিন বাসনা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥ (গীতা, ১৬।৭)

আসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ (ধর্ম্মে প্রবর্ত্তক) বিধিবাক্য ও অনর্থ হইতে নিবর্ত্তক নিষেধবাক্য জানে না। ঐ সকল ব্যক্তিতে সুচিতা, আচার বা সত্যনিষ্ঠা থাকে না।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরং।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥ (ঐ, ৮)

সেই আসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকে যে আমরা যেরূপ অসত্য-বহুল, এই জগৎও তদ্রূপ; ধর্ম্মাধর্ম্ম বলিয়া জগতের কোনও প্রতিষ্ঠা নাই। এই জগতের ঈশ্বর বলিয়া কোনও ব্যবস্থাপক নাই। এই জগৎ স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ হইতেই নিরন্তর উৎপন্ন হইতেছে। কামই জগতের হেতু, এতদ্ব্যতীত অন্য কি জগতের কারণ হইতে পারে?

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ (ঐ, ৯)

এই মত অবলম্বন করিয়া নষ্টাত্মা স্বল্পবুদ্ধি ক্রূরকর্ম্মা ব্যক্তিগণ জগতের বিনাশের নিমিত্ত জগতের শত্রুরূপে উত্থিত হয়।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ (ঐ, ১০)

যে সকল কামনার পূরণ হওয়া অসম্ভব এই প্রকার কামনা আশ্রয় করিয়া এবং কাপট্য, গর্ব্ব ও ঔদ্ধত্যযুক্ত হইয়া তাহারা মোহবশতঃ অশুভ মত সকল অবলম্বন করে এবং মদ্যমাংসাদি অশুচিদ্রব্য-সাপেক্ষ নিয়মাদি পালনে তৎপর হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

চিন্তামপারমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ (ঐ, ১১)

তাহারা মরণান্ত অপরিমেয় চিন্তা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কামোপভোগই পরম পুরুষার্থ এবং তাহাই একমাত্র কর্ত্তব্য এইরূপ সংস্কারাপন্ন হইয়া,

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ (ঐ, ১২)

এবং শত শত আশারূপ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হইয়া এবং কামক্রোধের বশীভূত হইয়া কামোপভোগের নিমিত্ত অসদুপায়ে প্রচুরপরিমাণ অর্থোপার্জ্জনের ইচ্ছা করে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

উপনিষৎ চতুষ্টয়—এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে ঈশ, কেন, কঠ ও মাণ্ডুক্য, এই চারি খানি উপনিষৎ মূল ও অন্বয়মুখী ব্যাখ্যাসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যাখ্যাটী অতি সহজ ও সুন্দর হইয়াছে। পুস্তকখানি নিত্যপাঠের পক্ষে বড়ই উপযোগী হইবে। শ্রদ্ধেয় প্রকাশক মহাশয় এই পুস্তক খানি তাঁহার গুরুদেবের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষ করিয়া সাধারণ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যম অতীব প্রশংসনীয়। আশা করি তিনি অন্যান্য প্রধান প্রধান উপনিষদ্‌গুলিও এইরূপে প্রকাশিত করিতে সচেষ্ট হইবেন। দুই পয়সার ডাক টিকিটসহ নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিলে যে কেহ এই পুস্তক খানি বিনামূল্যে পাইবেন। ঠিকানা :—ম্যানেজার—যোগাশ্রম, বেনারস সিটি।

সংবাদ ও মন্তব্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বন্যা ও দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। সম্প্রতি কটক জিলায় জেনাপুর নামক স্থানে একটী নূতন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। আমরা বারান্তরে ঐ সকল কার্য্যের বিবরণ প্রকাশ করিব। কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য অর্থ ও বস্ত্রাদি সাহায্য প্রার্থনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন বন্যা ও দুর্ভিক্ষনিবারণ কার্য্যে সাহায্য

প্রাপ্তি-স্বীকার।

গত জুলাই মাসে উদ্বোধন কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত।

আলিপুর বার লাইব্রেরী, মাঃ
শ্রীযুত কানাইলাল পাল ও
„ নিত্যলাল মুখার্জ্জি, কলিকাতা ৮৭॥০
শ্রীযুত দক্ষিণাপ্রসাদ বসু, ময়মনসিংহ ২,
„ জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত, আসানসোল ২৫।৶০
„ মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, কলিকাতা ১,
„ অঘোরনাথ ঘোষের ভগ্নী „ ১০,
„ প্রসন্নকুমার সরকার, ঢেন্‌কানল ৪,
„ ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীহট্ট ২০,

গঙ্গামণি দাসীর এষ্টেট, মাঃ
শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র শীল, কলিকাতা ২৫,
„ বিশ্বেশ্বর তেওয়ারী, সুসঙ্গ ১,
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ১,
শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দাসী, কলিকাতা ১০০,
„ জীবনবালা দেবী, ওকান ১০,
„ মুক্তকেশী দাসী, কলিকাতা ২৫,
পুওর ফাণ্ড সোসাইটী, ই, আই, রেলওয়ে
ট্রাফিক্ অডিট, কলিকাতা ১০,

গত আগষ্ট মাসে বেলুড় মঠে প্রাপ্ত।

মেডিকেল কলেজ রসায়ন বিভাগ
কলিকাতা ৩৬,
শ্রীযুক্ত গনেন্দ্রনাথ নাগ, বাগের হাট ৯৬৴০
„ বিভূতিভূষণ নন্দী, কলিকাতা ১,
„ এইচ, ডি, মান্না এণ্ড কোং, „ ১০,
„ সি, আর, দাস, ডুমরাও ৫০,
„ দুর্গাপদ ব্যানার্জ্জী, কলিকাতা ৩.

শ্রীযুক্ত এম, টি, নরসিংহ রাও, ব্যালারি ৩,
বেঙ্গল ব্যাঙ্ক বড়বাজার ব্রাঞ্চের
দেশীয় কর্ম্মচারীগণ, কলিকাতা ২৫৴০
হলতুগাঁও পুওর ফণ্ড, আসাম ১৩,
শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঠাকুর, ময়মনসিংহ ১,
„ হরিশঙ্কর কায়স্থ, সিমলা ৫,
মাঃ, " আত্মারাম, সিমলা ৫,

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সরকার, মুরশিদাবাদ ২৲
„ ভূদেবচন্দ্র সরকার, বর্দ্ধমান ৪০০৲
„ টি, দাস, রামপুর ৫৲
„ নগেন্দ্রনাথ মিত্র, চেৎলা ৫৲
„ শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, নওয়াখালী ১৲
„ কাজোরা কালিয়ারি, অন্দল ৩৵০
„ সুধীরচন্দ্র দে, সিমলা ১০৲
„ রাম, রোহ্‌ড় ২৬৷৵০
„ গৌরচন্দ্র লাহা, কলিকাতা ১০০০৲
„ জনৈক বন্ধু কলিকাতা ১০০০৲
„ জনৈক সেবক „ ১৲
„ ভুবনমোহন বসু, শাঁখারি ৩০৲
শ্রীমতী বিনাপাণি দাসী, „ ১০৲
শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র বসু, „ ১০৲
„ রামময় চাটার্জ্জী, জগদ্দল ১৩৲
„ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, ভবানীপুর ১০৲
„ ডাঃ অধীরশরণ বসু, শাঁখারি ১০৲
„ সি, ব্যানার্জ্জি, কলিকাতা ১৲
„ এম, সি, দেব, সগইন ১৲
„ মহিমারঞ্জন গুপ্ত, কলিকাতা ২৲
„ পান্নালাল সিংহ, ধপ ১০৲
„ জনৈক বন্ধু, রাওয়ালপিণ্ডি ১০৲
„ পি, এন, নাগ, কলিকাতা ৫৲
„ স্বামী মাধবানন্দ মায়াবতী ১২৲
„ মণীন্দ্রভূষণ দত্ত, রাঙ্গামাটী ৫০৲
„ জে, এন, বিশ্বাস, মুরাগাছা ১৲
„ রায় বাহাদুর জি, সি, নাগ, ঢাকা ৫৲
„ কৃষ্ণচন্দ্র নন্দী ব্রাদার্স, কলিকাতা ৫৲
„ চারুচন্দ্র দাস, কলিকাতা ১৲
„ অমৃতলাল মুখার্জ্জী, কোন্নগর ১০৲
„ রাজকুমার বক্সী, কলিকাতা ৫৲
„ সরোজকুমার সুর „ ২০৲
„ এ, কে ঘোষ, বর্ম্মা ১০৲
শ্রীমতী গিরীবালা দাসী বালি ৫৲
ডি, টি, এস আফিসের কর্ম্মচারীবৃন্দ, হাবড়া ১৩৲
হিতসাধন ভাণ্ডার মুখবেড়িয়া ২০৲
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ মিত্র, কাহেলো ২৲

শ্রীযুক্ত রথহরি দত্ত, কলিকাতা ১৲
তালতলা হাইস্কুলের ছাত্রবৃন্দ, „ ৮৷৵০
শ্রীযুক্ত এস, সি, মিত্র, আগ্রা ১০৲
„ রবীন্দ্রনাথ দে, সিরাজগঞ্জ ।০
„ জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত, আসানসোল ২২।০
„ ডি, পাল, কলিকাতা ৫৲
ফ্রেণ্ডস্ এসোসিয়েসন, সুনামগঞ্জ ৪।/০
শ্রীযুক্ত ভগবতীপ্রসাদ, বেনারস্ সিটি ৪৲
„ বীরেশ্বর তেওয়ারি, মুসঙ্গ ১৲
„ তিনকড়ি দে, কলিকাতা ১০০৲
„ জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ১৲
„ মহিলা সমিতি, কুচবিহার ২০৲
„ বিশ্বম্ভর দয়াল, কটক ১০৲
„ এস, পি, নিয়োগী, জোনপুরসিটি ৫৲
„ বসন্ত রক্ষিত কলিকাতা ৫৲
„ শ্যামাপদ ব্যানার্জ্জী, „ ২৲
„ কে, সি, নরঞ্জন, লাহোর ২৲
„ এইচ, শ্রীনিবাস রাও, কোলহার, ১৲
„ সি, সি, মিত্র, কলিকাতা ১৫৲
„ নারায়ণচন্দ্র বসাক, বোম্বে ১০
„ কোন্নগর ক্লাব রিলিফ ফণ্ড ২৫৲
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী, কলিকাতা ২০০৲
„ রামরূপ দ্বিবেদী, জোদপুর ৫৲
„ যদুপতি চাটার্জ্জী, কলিকাতা ৫০৲
„ ডাঃ জে, এন মজুমদার „ ৫০৲
শ্রীমতী ক্ষিরোদসুন্দরী ও
„ অমিয়বালা গুপ্তা, বরিশাল ৩৲
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুহ, ডায়মণ্ডহারবার ২৮৲
„ রঙ্গচন্দ্র লাহিড়ী, রংপুর ৫৲
হেডমাষ্টার, রায় ইনষ্টিটিউসন, বুরুল ২৩৲
শ্রীযুক্ত আশ্বিনীকুমার ঘোষ, বর্ম্মা ১৲
শ্রীমতী সুশীলাবালা গোস্বামী, মিহিজাম ৫৲
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন, দিল্লী ৫৲
„ টি, আর, কুপস্বামী, পিলে, ত্রিচিনাপল্লী ৫৲
মাঃ "উপেন্দ্রচন্দ্র রায়, কান্দিরপাড় ১৩৵০
শ্রীযুক্ত ভানুজকান্ত সরকার, রাজারামপুর ১৲
সটারস্, আর, এম, এস্, বোম্বাই ৫৲

মনুষ্যসমাজে বৈদিক ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

মনুষ্য জন্মাবধি সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। যাহা দুঃখ বা 'হেয়' সে তাহা ত্যাগ করে এবং যাহা সুখ বা 'উপাদেয়' তাহাই সে গ্রহণ করিতে চায়। এই প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষ কর্ম্ম করে। কর্ম্মের দ্বারা জগতের ও নিজ সম্বন্ধে সে অভিজ্ঞতা লাভ করে। সেই অভিজ্ঞতা আবার সংস্কাররূপে তাহার মনে গাঁথিয়া যায় এবং প্রবল সংস্কার সকলই মানব চক্ষে চরিত্র বলিয়া প্রকটিত হয়—ইহাই ব্যক্তিগত ধর্ম্ম। কিন্তু সভ্য সমাজে বাস করিতে হইলে কিরূপ ব্যক্তিগত ধর্ম্ম লাভ করিতে হইবে যাহার দ্বাবা নিজের এবং মনুষ্য সমাজের মঙ্গল হইতে পারে তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সুখের আশায় আমরা কার্য্য করিয়া থাকি। পরন্তু এমন অনেক কার্য্য আছে যাহার দ্বারা আমার নিজের সুখ হইতে পারে কিন্তু মনুষ্য-সমাজে তাহা মহা অনিষ্টকর। সেইরূপ কার্য্যে যদি আমরা উদ্যোগী হই তাহা হইলে বাহ্য জগৎ আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে এবং সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখেরই কারণ আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমার গৃহে চাউল নাই আমার অভাবরূপ দুঃখ অপসরনের নিমিত্ত আমি অপরের ক্ষেত্র হইতে ধান্য কাটিয়া লইয়া আসিলাম—ক্ষেত্রস্বামী আসিয়া আমাকে যথোপযুক্ত প্রহার করিল, কিম্বা যদি সে আমাপেক্ষা দুর্ব্বল হয় তাহা হইলে হয় তাহাকে আমি বুদ্ধি বলে বা দৈহিক বলে বিতাড়িত করিয়া দিতে পারি। এই ভাবে যদি প্রত্যেক মানব নিজের মানসিক এবং দৈহিক বল অবলম্বন করিয়া কাম এবং ক্ষুধা জাত অভাবরূপ দুঃখকে দুর করিবার

অছিলায় জগতের অপর দুর্ব্বল এবং অর্ব্বাক্ জাতি এবং বর্ণ সমুদয়ের নাশের দ্বারা নিজের জীবন এবং উন্নতি প্রতিষ্ঠিত করে তাহা হইলে পাশ্চাত্য দার্শনিক Darwin তাঁহার Survival of the fittest নামক আসুরিক-নীতির দ্বারা ঐ সকল কার্য্যের সমর্থন করিতে পারেন বটে কিন্তু হিন্দু দার্শনিক বিবেকানন্দ Give up is the watchward of Hindusim এই দৈবী-নীতির দ্বারা ঐরূপ মানবীয় কার্য্যকলাপ খণ্ডন করিতেছেন। কারণ পূর্ব্বে ক্ত নীতির অবলম্বনে জগতের দুর্ব্বলের স্থান থাকে না, কতকগুলি সবল সম্পন্ন ব্যক্তি বা সমাজই থাকিয়া যায়। উদ্ভিদ, পশু প্রভৃতি সমাজে survival of the fittest এই নীতি অত্যধিক প্রবল; তন্মধ্যে পশুসমাজে কিঞ্চিৎমাত্র রক্ষণী-নীতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও মাত্র বলবানের ভোগের নিমিত্ত। পশু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ জনসমাজেও ঐ নীতি অতি প্রবল মাত্রায় বর্ত্তমান—বানর বা হটেণ্টো তাহার পরিচয়। তাহরা প্রজাদিগকে রক্ষা করে নিজের ভোগের নিমিত্ত—কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটিতে অধীনের মৃত্যুই ধার্য্য হইয়া থাকে। তাহাদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার কেহই নাই। অতি সভ্য মানব সমাজেও এই নীতি এখনও প্রবলাকারে বর্ত্তমান। ইহারই প্রভাবে অতীতে ইজিপ্ট, ব্যাবিল, গ্রীক, পারস্য, কারথেজ, রোম প্রভৃতি বহু জাতির ধ্বংস সাধিত হইয়াছে এবং ইহুদি প্রভৃতি বহুজাতি উদ্বাস্তু হইয়াছে এবং অশেষ কল্যাণকর বহু সামাজিক এবং জাতীয় ধর্ম্মের বিলোপ সাধিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানেও বহু লোহিত, কৃষ্ণকায় এবং কিম্পুরুষ জাতির বিলোপ সাধন ঘটিতেছে—মাত্র বলবানের অস্তিত্ব রহিয়া যাইতেছে।

কিন্তু 'জোর যার মুল্লুক তার' এই ভোগাত্মক আসুরি-নীতির বিরুদ্ধে অতি আদিম কাল হইতে ত্যাগাত্মক দৈবী-নীতির অভ্যুত্থান হইয়াছে বটে কিন্তু সে ক্ষীণ কণ্ঠস্বরের প্রতি ভোগলিপ্সু মানব কর্ণপাত করিতে ইচ্ছুক হয় নাই। কিন্তু ক্রমে ঐ দৈবী-নীতি প্রবল হইতে প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে এবং ক্ষণে ক্ষণে তাহার ন্যায়ের বজ্র নিক্ষেপে কত যুগে কত শত যথেচ্ছাচারী অসুর চূর্ণ হইয়া ধূলিতে মিশিয়া গিয়াছে। স্বাভিজ্ঞতা ফলে মানব ইহা লাভ করিয়াছে। সৃষ্টির ক্রমবিকাশের সহিত সৃষ্টির প্রারম্ভে

কাম ও ক্ষুধা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দৈহিক শক্তিকে অবলম্বন করিয়া প্রতি মানব অধিক ভোগের নিমিত্ত নিজ নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। পরন্তু বলশালী ব্যক্তির প্রাধান্য ফলে অত্যাচারিত হইয়া ইতর সাধরণে সমবেত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে উত্থিত হওয়ায় বলশালী ব্যক্তিরা বুঝিতে পারিল যে ইতর সাধারণ কেবলমাত্র তাহাদের ভোগ্য নহে পরন্তু সাহায্যকারী। এইরূপে সেই বলশালী ব্যক্তি বা রাজারা প্রজাকে পালন ও রক্ষা এবং প্রজারা ভোগের দ্বারা তাঁহাদের পুষ্টি সাধন করিতে থাকায় মনুষ্যসমাজে আদান প্রদান প্রথম আরম্ভ হইল। এই আদান-প্রদান-নীতি অন্ততঃ পক্ষে কিঞ্চিৎমাত্রও ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। নচেৎ রাজা-প্রজা এবং প্রজা-প্রজার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব। রাজার বহু ভোগ্য বস্তুর প্রয়োজন বটে এবং প্রজা উহা যোগাইতে বাধ্য বটে, কিন্তু রাজা প্রজাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া উহা সংগ্রহ করিতে পারেন না এবং প্রজাকে তিনি সকল আপদ হইতে রক্ষা করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। এবং প্রজাপালন করিতে গিয়া রাজাকে এমন কতকগুলি আইনকানুন গড়িতে হয় যাহাতে সমবেত ভাবে সকলের মঙ্গল হয়; কিন্তু প্রজাদিগের মধ্যে পরস্পর কিছু ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। রাজা হত্যাপরাধে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিলেন—অপরাধী ব্যক্তির আত্মীয়েরা যদি রাজশাসন না মানিয়া বিরুদ্ধাচরণ করেন তাহা হইলে সমাজে বিশৃঙ্খলতা অবশ্যম্ভাবী।

এই প্রকারে এক দেশান্তর্গত, এক ভাষাবলম্বী, একই প্রকার শারীরিক গঠন সম্পন্ন জাতির মধ্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজের উত্থান হইয়া থাকে। এবং এই সকল ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে অনবরত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। প্রত্যেক সমাজই নিজের ভোগসুখের আয়তন বৃদ্ধিকল্পে অপর সমাজের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। এই সংঘর্ষের ফলে ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল সমাজগুলি সবলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বৃহত্তর সমাজের সৃষ্টি করে এবং কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজগুলি কোন মহাবল সম্পন্ন ব্যক্তির অধীনে একত্রিত হইয়া এক বিরাট জাতীয় সমাজে পরিণত হয়। সমাজ যতই বৃহৎ হউক এবং রাজাপ্রজার মধ্যে যতই সামঞ্জস্য বিধান হউক, রাজা বহু শক্তিসম্পন্ন বলিয়া

নিজের সদসৎ কর্ম্ম Divine Right এর উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে ছাড়েন না এবং পক্ষান্তরে বড় বড় প্রজারা ক্ষুদ্র বিজিত সমাজের উপর নিজেদের প্রভুত্ব আরোপ করিতেও বিরত হন না। এইরূপ ভোগেচ্ছু মানবের প্রভুত্বাভিলাষের ফলে "সমাজে এক সম্প্রদায় বরাবরই থাকিয়া যায় যাহারা চিরকাল পদদলিত, লাঞ্ছিত এবং slave বলিয়া খ্যাত এবং যাহাদের অসন্তোষ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ভবিষ্যৎ কালানলের কারণ হইয়া নিহিত থাকে। অবসর পাইলেই জমিদারেরা সমবেত হইয়া রাজার নিকট হইতে বহু সম্মান এবং ক্ষমতা নিজেদের হস্তে গ্রহণ করেন এবং রাজাও বিজাতীয় শত্রুপরি অভিযানকল্পে সকলের উপর নিজের প্রাধান্য অটুট রাখিয়া থাকেন, কিন্তু সেই যে দরিদ্র সমাজ যাহারা রাজার এবং জমিদারের জন্য লড়াই করে' এবং নিজেদের বুকের রক্ত দিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জমি কর্ষণ করিয়া উচ্চ সম্প্রদায়কে পুষ্ট করে, তাহার বিনিময় স্বরূপ তাহারা অতি অল্পই লাভবান্ হয়।

অপর দিকে দেখা যায় অতি আদিমকাল হইতেই কতকগুলি পরিবার স্বদেশের স্বাস্থ্য অরুচিকর হওয়ায় কিম্বা অত্যাচারিত বা বিতাড়িত হইয়া নূতন দেশে নবোপনিবেশের স্থাপন করে এবং সকলে একত্রিত হইয়া সামাজিক ব্যবস্থা নিরূপণ করিয়া থাকে। ক্রমে প্রজাবৃদ্ধির সহিত সকল মনোনীত উপযুক্ত ব্যক্তি একত্রিত হইয়া সমাজ পরিচালনা করায় প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি হয় এবং মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাঁহাকেই কোন কোনও স্থলে নেতৃত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সহিত কাম ও ক্ষুধা তাহাদের নানা হাবভাব প্রকাশ করিয়া মানবকে নানা ভাবে অভাবগ্রস্ত করিয়া থাকে। যেমন স্বদেশজাত কোনও খাদ্যের দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ সত্ত্বেও অপর দেশীয় কোনও উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য দেখিলে উহা অধিকারে আনিবার প্রবৃত্তি স্বতঃই প্রকটিত হয়। নিজ বুদ্ধিবলে নানা ভোগ্য বস্তুর উৎপাদন সত্ত্বেও অপর দেশীয় সকল উৎকৃষ্ট দ্রব্যের প্রতি মানব চক্ষের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হয় তথা প্রজাবৃদ্ধির সহিত সকল সমাজই নিজের প্রসারতা কল্পনা

করে এবং ইহারই ফলে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। যতই উৎকৃষ্ট প্রজাতন্ত্র হউক না কেন ক্ষুৎকামপরতন্ত্র স্বার্থান্ধ মানব নিজ প্রকৃতিগত ধর্ম্ম পরাভূতকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করাইয়া হয় সেই সমাজের বিলোপ সাধন করে, না হয় তাহার প্রাকৃত বিকাশ নিরোধ করিয়া কতকগুলি ভোগের করণস্বরূপ নরপশুর সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া দেয়, আর না হয় সংঘর্ষের ফলে নিজেরাই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা বৌদ্ধযুগের ভারতীয়, গ্রীক এবং রোমান প্রজাতন্ত্রের উল্লেখ করিতে পারি। আবার কদাচ জেতা এবং পরাজিতের চিন্তার সমবায়ে নব সভ্যতার অভ্যুদয়ও দেখা গিয়াছে; কিন্তু ইহা অতি বিরল।

বিচারহীন প্রবৃত্তিপরিচালিত পশু জাতির মধ্যে সমাজ সম্ভব নহে, কারণ তাহার নিজস্ব বলিয়া কিছুই নাই। বোধ হয় অতি পুরাকালে আদিম নরপশুদেরও মধ্যে ঐরূপ ছিল। পরে যখন তাহারা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, দাস, পশু, খাদ্য এবং গৃহ নিজস্ব বলিয়া ঘোষণা আরম্ভ করে তখন হইতেই তাহার প্রতিবেশীর সহিত তাহাকে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হয় এবং প্রত্যেক সবল প্রতিবেশীকে তাহার যথেচ্ছাভোগের কিছুমাত্র হ্রাসের দ্বারা দুর্ব্বল সম্বন্ধে রক্ষনী-নীতি অবলম্বন করায় প্রথম পরিবার সৃষ্টির সহিত সমাজেরও সৃষ্টি হয়। এবং একই নীতি অবলম্বনে শেষে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর ক্রম বর্দ্ধমান্ সমাজ বৃহৎ জাতিতে পরিণত হয় ও ঐ সকল পূর্ব্বোল্লিখিত ক্রমে রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইতে থাকে। কিন্তু ভোগ ও স্বাধিকার মানবের সাধারণ প্রবৃত্তি। বহুকাল ধরিয়া ব্যক্তিগত সংঘর্ষে ক্লান্ত হইয়া মানব যখন সমাজ প্রতিষ্ঠা-কল্পে পারিবারিক জীবন অবলম্বন করে তখন হইতেই সে তাহার ভোগ ও স্বাধিকার বৃত্তিকে হ্রাস করিয়া ত্যাগ ও রক্ষণী-নীতিকে অবলম্বন করে। কিন্তু কালে যথোপযুক্ত ভোগ ও স্বাধিকার-বৃত্তি পরিতৃপ্ত না হওয়ায় তাহার নিকট পুরাতন সমাজ অরুচিকর বোধ হয়। তখনই তাহারা প্রচলিত সমাজের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিয়া নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠায় কৃতসংকল্প হয়। ফলে অতি বৃহৎ রাজতন্ত্র প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় কিম্বা অতিবৃহৎ প্রজাতন্ত্র রাজতন্ত্রে পর্য্যবসিত

হইয়া থাকে কিম্বা বৃহৎ জাতীয় সমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

স্বাধিকার-বিরোধ-সামঞ্জস্য এবং সমাজ-রক্ষা-কল্পে কর্ম্মক্ষেত্রে দেশ-কালানুযায়ী ঐহিক প্রতিপত্তির আদর্শ রাজা বা দেশ নেতৃগণের যে ব্যবস্থা তাহাই রাজনীতি। এই সমাজ ও রাজনীতি আর একটি প্রবল শক্তির দ্বারা বিশেষ রূপে অনুপ্রাণিত হয়—উহা ধর্ম্ম। অতি প্রাচীনকাল হইতে বিরাট, অতি ভীষণ, অত্যদ্ভুত, অতিসুন্দর জীব ও প্রকৃতিপুঞ্জ ভীতি ও কল্পনাময় মনুষ্যহৃদয়কে চমৎকৃত করে। বিশ্ববেদের এই প্রথম উপাসনা কাণ্ডের আরম্ভ। কুসংস্কার বশবর্ত্তী হইয়াই হউক বা সেই সর্ব্বভূতান্তর্গামী বিশ্বাত্মার স্বস্বরূপ প্রকটনহেতু বাস্তব কোনও অনুভূতি হেতুই হউক, ক্রমে ঐ বিশ্ববেদের উপাসনা কাণ্ড বৃহৎ কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত হয়। এই ধর্ম্ম-বৃক্ষ মানবসমাজে ইহার মূল এত গভীররূপে প্রবেশ করায় যে উহাকে উৎপাটন করিয়া ফেলিতে হইলে সমগ্র সমাজ ধ্বংস হইয়া যায়। ভীতি ও কল্পনা-সম্পন্ন মানব এই ধর্ম্মের আশ্রয় না লইয়া থাকিতে পারে না এবং ইহারই শক্তিতে সে তাহার ভোগ প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে শিক্ষা করে। এবং এই বিংশশতাব্দীতে আমরা যেরূপ সূর্য্য, চন্দ্র, সমুদ্র, পর্ব্বত, অন্ধকার, মেঘ, বিদ্যুৎ, অগ্নি, নদী, বৃক্ষ, সর্প প্রভৃতি জীব ও পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক বস্তুকে অবলোকন করি তাহারা সে চক্ষে তাহা দেখিত না; তাহাদের হৃদয়ে ভীতি ও বিস্ময় যুগপৎ উত্থিত হইয়া অত্যধিক কল্পনাশক্তি সহায়ে তাহারা সেই গুপ্ত সত্যকেই বোধ হয় অনুভব করিত। ক্রমে যখন অত্যধিক শক্তিসম্পন্ন কোনও মানব তাহার উপাস্য বস্তুর বন্দনা নানা ছন্দে আরম্ভ করে, তখন সঙ্গীতপ্রিয় আদিমানব তাহাকেই ব্রাহ্মণের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাঁহারই শাসন সমাজে অব্যাহতরূপে চলিতে থাকে এবং সমাজ বা জাতীয় নেতৃগণ এরূপ ভাবে তাঁহাদের রাজনীতির পরিচালনা আরম্ভ করেন যে যেন এই ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়াই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মানবের সমাজগত ও জাতিগত অভ্যাস এত প্রবল যে যদিও তাহাদের দেবতা সকলের অধীশ্বর, এইরূপ

ধারণা সত্ত্বেও, তাহারাই দেবতাদের অধিক প্রিয়, এইরূপ অনুভব হেতু অপর সমজ বা জাতির প্রতি দ্বেষ করে। এবং কোন্ সমাজ বা জাতির দেবতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা অস্ত্রের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। এইরূপ পরাজিত জাতি বা সমাজের দেবতারা ধীরে ধীরে লোকচিত্ত হইতে অন্তর্হিত হন এবং পরে কোনও এক দেবতা জাতীয় শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ক্রমে ধর্ম্মের অনুশীলনের সহিত জগৎরঙ্গমঞ্চে দার্শনিক সম্প্রদায়ের অবতরণ হয়, কারণ, জীবন-সমস্যার সহিত জগদ রহস্য জড়িত। সাধারনতঃ দরিদ্র সমাজেই ইঁহাদের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। জীবন—সমস্যা' দরিদ্রসমাজে অতি প্রবল মাত্রায় বর্ত্তমান। তাহারাই সর্ব্বপ্রথম জগতে নিজেদের স্থান নির্ণয় করিতে চায় এবং সবলের দ্বারা পীড়িত হইয়া অজানা সর্ব্বশক্তিমান্ দেবতার নিকট তাহারাই প্রথম প্রার্থনা করে। দারিদ্র্যই তাহাদিগকে সংযমী হইতে শিক্ষা দেয় এবং ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করে, কারণ তাহারা যাতনা কিরূপ তাহা জানে। সমবেদনা, সহানুভূতি, দয়া, ত্যাগ প্রভৃতি শব্দের অর্থ তাহারাই প্রথম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে এই সম্প্রদায়ের ধীর গভীর চিন্তার ফলে অবতার বা Prophet এরা আগমন করেন। করুণাত্মা এই অবতারেরা উচ্চ সম্প্রদায়ের নানা নির্যাতন সত্ত্বেও অতীতের ইতিহাস হইতে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং সত্যকে আবিষ্কার করিবার সে কঠোর সাধনার পথ (যাহা উঁহারা আবিষ্কার করেন) তাহা মানব সমাজে প্রচার করিয়া সকল সম্প্রদায় এবং জাতিকে সাম্য এবং স্বাধীনতার দিকে টানিয়া আনিয়া ধর্ম্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠাকল্পে জীবন দান করিয়া থাকেন। Carlyle-এর Hero as Divinity এবং Hero as Prophet এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইতিহাস খুলিলে দেখা যায় ইঁহাদের গতি অব্যাহত। যতদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের সুসমাচার তৎকালীন জগতে প্রচারিত হয় ততদূর পর্য্যন্ত মানব সমাজ তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য এবং তাঁহাদের সাম্যনীতি বহু জাতীয় সমাজকে একত্রিত করিয়া এক বিরাট ধর্ম্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু অল্প চিন্তাশীল রজঃশক্তি সম্পন্ন ক্ষত্রিয়সমাজে উহা প্রবেশ করিবা মাত্র তাহাদের হস্তস্থিত অসি

অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ দুর্ব্বল সমাজ, জাতি এবং ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনের দ্বারা নিজ পুষ্টি সাধন করে। যে সাম্য, মৈত্রীর উপর জগদাচার্য্যেরা নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, তাহা রক্ষণ-নীতির প্রচার না করায় নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহারা যে সত্য প্রচার করিয়াছেন তাহাই একমাত্র সত্য—অনন্ত ভাবময়ের রাজ্যে অপর সত্য থাকিতে পারে কিম্বা পরে প্রকটিত হইতে পারে একথা তাঁহারা প্রচার না করায় অপরাপর ধর্ম্ম এবং জাতীয় সঙ্ঘের পরস্পর চির সংঘর্ষ থাকিয়া যায় এবং তাঁহাদের জগতে সাম্য এবং মৈত্রী নীতির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চিরকালই বিফল হইয়া আসিয়াছে—তাহা দ্বারা মানব এক গণ্ডী হইতে অপর গণ্ডীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে মাত্র। পৃথিবীতে যত বড় বিশাল ধর্ম্মেরই প্রতিষ্ঠা হউক না কেন উহা সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। উহা সংকীর্ণতার গণ্ডীকে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করিয়াছে মাত্র। বলিতে পার, ঐ সকল ধর্ম্মের দ্বারা কত অসভ্য সভ্য হইয়াছে, কত দুর্দ্দান্ত শান্ত হইয়াছে, কত অরণ্য বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে ; কিন্তু অপর পক্ষ বলিবেন হইয়াছে বটে বহু রক্তপাতের পর, বহু সংঘর্ষের ফলে এবং বহু নগরকে অরণ্যে পরিণত করিয়া।

কিন্তু ভারতেতিহাসের ধারা অন্যরূপ। ঐতিহাসিকের দূরবীক্ষণ সাহায্যে যতদূর পর্য্যন্ত ভারতগগণ পর্য্যবেক্ষণ করা যায় তাহাতে নানা গ্রহ উপগ্রহের দৃষ্টিগোচর হয় সত্য কিন্তু বেদরূপ এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যই বৈদিক জগৎকে সংযত করিয়াছে। এই অসাধারণ চিন্তা-রাশি কত কালের ধর্ম্মানুশীলনের ফল তাহা বলা অসম্ভব। ঋগ্বেদ মানব ধর্ম্মেতিহাসের প্রথম খণ্ড। ইহা পাঠ করিলে দেখা যায় মানবীয় উপাসনা কাণ্ডের উষাকালে অত্যদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য্য, অতিসুন্দর প্রকৃত্যুপাসনা হইতে আরম্ভ করিয়া এবং তাহারই মধ্য দিয়া এক বিরাট ব্রহ্মের উপলব্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। রক্ষণ-প্রাণ বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টরা উচ্চ ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধি করিয়াই তাঁহারা নিম্ন উপাসনাগুলিকে মুছিয়া ফেলেন নাই, কারণ নানা ভাবের মধ্য দিয়া একই সত্ত্বাকে উপলব্ধি করা হইয়াছে। ভাব বৈচিত্র্য হেতু ভারতে কোনও সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই, কারণ বৈদিক তপোবনে

প্রথমেই প্রচারিত হইয়াছে—একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি। প্রতিযুগে এই সমন্বয়ের বাণী ভারতগগণে ঘোষিত হইয়াছে কিন্তু ঐ মহাসত্য হিমারণ্যকে অতিক্রম করিয়া কদাপি অন্যত্র ধাবিত হয় নাই। বহুবার বহুসত্য, বহুভাব, বহুসভ্যতা ভারত হইতে ভারতেতর প্রদেশে প্রচারিত হইয়াছে বটে কিন্তু এ মহাসত্য কেহ ধরিতে পারে নাই। কতবার কত বিদেশী দস্যু ভারতের কত মন্দির চূর্ণ করিয়া কত রত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে কিন্তু এ রত্নের সন্ধান কোনও ক্রমে পায় নাই। ধর্ম্ম প্রচারের ছলে, সাম্য-মৈত্রী স্থাপনের অছিলায় জগতের অমরত্ব বিষয়ক কত জ্ঞানামৃত বৈদেশিক নামেমাত্র ধর্ম্মবীরেরা নিষ্ঠীবণ ত্যাগে কলুষিত করিয়াছেন, কিন্তু এ অমৃতের কলস নির্জ্জনে কোন্ অরণ্যে নিহিত ছিল তাহা কেহ জানে নাই। হয়ত তখন সময় উপস্থিত হয় নাই বলিয়া জগৎ ঐ মহাবাক্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল এবং শ্রীভগবানও তাই নানা অবতার হইয়া নানা যুগে, নানা দেশে, নানা ভাবে, নানা ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভবিষ্যৎ সমন্বয় মহাসৌধ নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং যখন প্রকৃতি বশীভূত হইয়া মানবীয় সভ্যতায় পরস্পরের আদান প্রদানে সাহায্য করিলেন, যখন মানবের 'বিশ্বসমাজ' সম্বন্ধে ধারণা হইতে লাগিল, তখন শ্রীভগবান পুনরায় সমন্বয়াচার্য্যরূপে আবির্ভূত হইলেন এবং নিজ মনুষ্য জীবনের দ্বারা মূর্ত্ত এবং প্রচার করিলেন "যত মত তত পথ"রূপ প্রেমধর্ম্ম। একথা ভারতে নূতন নহে—বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র, কাব্য, ইতিহাস ও দর্শনে পুনঃ পুনঃ এই একই সত্য ধ্বনিত হইয়াছে। যখনই ভারত ভারতী নিজ স্বভাবজাত কামকলুষিত চিত্ত হইয়া এই সমন্বয় ধর্ম্মকে ভুলিয়াছে তখনই ভারতের ভগবান সিংহনাদে প্রচার করিয়াছেন—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং—আর ভক্ত প্রার্থনা করিয়াছেন—

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগং পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি।
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথ জুষাং।
নৃনামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

এই সমন্বয়ের ভাব ভারতের মজ্জাগত বলিয়া, ধর্ম্মের নামে হত্যা এবং

অত্যাচারের দ্বারা ধর্ম্মসেবীরা নিজ ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করেন নাই। বিভিন্ন মতাবলম্বীকে ভারতবাসী সমাজের নিম্নস্তরে স্থান দিয়াছে বা পণ্ডিতেরা বিভিন্ন মতের বিরুদ্ধে নানা ছন্দে-বন্দে গালিগালাজ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিধর্ম্মীর সর্ব্বনাশ হেতু সামরিক অভিযান তাঁহারা কখনও করেন নাই বা একজনও Neroর ন্যায় সম্রাট ভারতে জন্মে নাই এবং Spanish inquisitionএর বিষয় তাঁহারা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই। পরন্তু অতি অরুচিকর ধর্ম্ম হইলেও তাহাতে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও সত্য থাকে তাহাও ভারতমহাধর্ম্মে স্থান পাইয়াছে এবং তৎসম্প্রদায়ীকে নিজ ভাবানুরূপ সেই ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই সাধনমার্গে উৎসাহিত করা হইয়াছে। এই সমন্বয়ই ভারতীয় ধর্ম্মকে এত বৈচিত্র্য সম্পন্ন করিয়াছে।

বহু সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে ভারতের ঋষিগণ আর এক মহাসত্য প্রচার করিয়া জগতের সকল সংঘর্ষের সমাপ্তি করিয়া গিয়াছেন। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—সবই ব্রহ্ম—বৈচিত্র্য কেবল প্রকাশের তারতম্যে। আমি বুদ্বুদ্ তুমি হয়ত প্রকাণ্ড তরঙ্গ কিন্তু আমাদের উভয়েরই পশ্চাতে এক মহাসমুদ্রই বর্ত্তমান—সমুদ্র হইতেই আমরা উঠিয়াছি এবং উভয়েই সমুদ্রেই লীন হইব। "পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ"—পণ্ডিতেরা পশু, চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সমদর্শী। আর্য্যেরা ভারতীয় অনার্য্যের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াও তাহাদের নাশের দ্বারা নিজ পুষ্টিসাধন করেন নাই, তাহার কারণ তাঁহাদের বেদ বলিতেছেন—'সর্ব্বংখল্বিদং' ব্রহ্ম। যাঁহারা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা জাতি বা বর্ণের বিচার করেন নাই পরন্তু ইতরের জন্যই ব্যবহারিক চতুর্ব্বর্ণের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যদি 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' তবে সাঁওতাল, ভীল, কোল, পেরিয়াদের সহিত একই প্রকার সমাজিক ব্যবস্থা স্থাপন কর নাই কেন? উত্তরে আমরা বলি—বৈদিক ঋষিগণ এই ব্যবহারিক রাজ্যে দেখিয়াছিলেন যে সর্ব্ব বস্তুই ত্রিগুণের বশবর্ত্তী। তাহার মধ্যে যাহা সাত্ত্বিক তাহাই জীবকে প্রকৃত সত্যের সন্নিকটস্থ করে উদ্দেশ্য—সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন হওয়া—সাম্য স্থাপন করিতে গিয়া তামসিক গুণাবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত নহে। শূদ্রকে সাত্ত্বিক করিয়া

গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাই ব্রাহ্মণ জীবনের একটি উদ্দেশ্য হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই হেতু ব্রাহ্মণকেও শূদ্রের ন্যায় অসদাচার সম্পন্ন হইতে হইবে তাহা কে বলিল? বৈদিক যুগে কোনও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। যতই তাঁহারা অনার্য্য রাজ্য অধিকার করিতে লাগিলেন ততই স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। এই বর্ণাশ্রম রূপ বিদ্যালয় নিম্ন শ্রেণী হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবার চারিটী সোপানে বিভক্ত। আর্য্য ঋষিরা এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দ্বারা সামাজিক মহারহস্য সমাধান করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি যাহার রহস্য অপর জাতির নিকট গুপ্ত রহিয়াছে। অনেকেই জাতিভেদ অত্যন্ত ঘৃণিত বলিয়া প্রকাশ করেন, কিন্তু সকল সমাজেই দেখা যায় যে এই ঘৃণিত বস্তুর জন্যই প্রাণপণে চেষ্টা। চিরকালই Helots, Plebeians, Serfs প্রভৃতি সকল সমাজে রহিয়া গিয়াছে। সকল সমাজেই বহুবলসম্পন্নব্যক্তি বা পণ্ডিতমণ্ডলীই অপরকে শাসন করিয়াছেন এবং স্বস্ব সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। Popeকে না মান Lutherকে মানিতে হইবে—ওমরকে না মান আলিকে মানিতে হইবে। যাহারা যাঁহাকে মানিবে তাঁহাকে লইয়া সম্প্রদায় গঠন এবং ইতরের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিবেই। সদসৎ গুণের আদর অনাদর চিরকালই বর্ত্তমান থাকিবে, উচ্চকে জোর করিয়া নিচে টানিয়া সংস্কারকেরা নামাইবার চেষ্টা করিলেও সমাজ তাহা শুনিবে না। এই হেতুই ঋষিরা গুণ-কর্ম্ম-বিভাগানুযায়ী চতুর্ব্বর্ণ সৃজন করিয়া গিয়াছেন এবং ইহারই ফলে অব্রাহ্মণ স্ত্রীজাতিকে মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া ভারতীয় সমাজ স্বীকার করিয়াছেন এবং করিতেছেন। উদাহরণ স্থলে আমরা কক্ষীবাণ, দীর্ঘতমা, বশিষ্ঠ, বাক্, ঐলুষ, কবষ, সত্যকাম, গার্গী, মৈত্রেয়ী, জানশ্রুতি, নারদ, বেদব্যাস, বিদুর, প্রহ্লাদ, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত যুগে এবং ঐতিহাসিক যুগে দক্ষিণ দেশীয় বহু শূদ্রকুলোদ্ভব মহাত্মাগণ (যাঁহারা আলোয়ার বলিয়া খ্যাত), কবীর, রুইদাস, যবন হরিদাস, মীরাবাই প্রভৃতি অসংখ্য পুণ্যকীর্ত্তি বিদ্বান এবং বিদুষীগণের নাম কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হওয়া যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে যে সকল ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা সদাচার বিহীন হইয়াছেন তাঁহাদিগকে সমাজ 'জাতঃপাত' করিয়াছেন এবং তাঁহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগের সমাজ সমস্যাও এই বৈদিক অদ্বৈত এবং সমন্বয় ভিত্ত্যাবলম্বী গুণকর্ম্মাণুযায়ী সমাজ বিভাগের উপরই নির্ভর করিতেছে। পাশ্চাত্য ভূমিতে যে সকল অতি-সাম্যবাদীরা সমাজের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সমাজকে একীভূত করিয়া এক শূদ্র সমাজে পরিণত করিতে চেষ্টিত তাঁহাদের সে চেষ্টা কখনও সফল হইবে না, কারণ জগদ্ব্যাপী এক worker, artisan এবং peasant সম্প্রদায় অসম্ভব। চিরকালই জগতে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি এবং কলাবিৎ পণ্ডিতেরাই সমাজের শীর্ষদেশে থাকিবেন। যদি চিন্তাশীল ব্যক্তি সকল জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন তাহা হইলে মানবীয় সকল অনুশীলন এবং সভ্যতা লোপ পাইয়া মনুষ্য হইতে এক জাতীয় বানর সমাজের প্রাদুর্ভাব হইবে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সে নব নব সত্য আবিষ্কার করেন সাধারণে তাহারই Practical application করিয়া থাকেন। পুনশ্চ Anarchism মতাবলম্বীরা যে No god, No marriage, No government মতের প্রচার করিতে যাইতেছেন, এমন কি ইহার রক্ষণ করিতে গেলেও ক্ষাত্রশক্তির প্রয়োজন। মানবের সত্তার উপর যাঁহারা 'resist no evil' প্রতিষ্ঠিত করিতে চান তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কামাদি রিপুবশীভূত মানব সদসৎ মিশ্রিত। সমাজে হীন এবং হিংস্রক জীবের অভাব হইবে না এবং তাহাদের জন্য চিরকালই দণ্ডনীতির প্রয়োজন; কাজে কাজেই ক্ষত্রিয় সমাজের স্থিতি অবশ্যম্ভাবী। 'সকল মানবই যদি সৎপথে চলে এবং ভাল হয় তাহা হইলে government এর প্রয়োজন কি'— ইহা কেবল কথার কথা মাত্র থাকিয়া যাইবে। পুনরায় যদি আমরা ঈশ্বর না মানি তাহা হইলে মানবের সদসৎ কর্ম্মের Standard কি করিয়া স্থির হইবে। ঈশ্বর বা এক অদ্বৈতাত্মা যদি আমরা না মানি তাহা হইলে মানবের জন্ম মৃত্যু উদ্দেশ্য বিহীন হইয়া মানবীয় সমাজ এক চির-বিপ্লবের আকর হইয়া উঠিবে। কেন আমরা পরস্পরের জন্য ত্যাগ করিয়া

একই সমাজে বাস করিব ? কেন আমরা নিজ স্বার্থানুসন্ধানে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিব না ? দুর্ব্বলের এ জগতে থাকিবার প্রয়োজন কি ? তাহার উত্তরে তুমি হয়ত বলিবে যে দয়ারূপ বৃত্তি মানব হৃদয়ে স্বতঃই বর্ত্তমান, সেই হেতু মানব ত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু অপর পক্ষ যদি বলিয়া বসেন যে আমরা দয়া করি নিজের সুখের জন্য। কিন্তু সুখই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে জগতে এরূপ যথেষ্ট ভোগ্য বস্তু আছে যাহার দ্বারা আমার বিশেষ সুখ লাভ হয় কিন্তু তোমার তাহাতে ক্ষতি হইতে পারে —আমার তাহাতে বিশেষ ভাবিবার অবসর নাই। তাহার উত্তরে তুমি হয়ত বলিবে যে যখন আমরা একই সমাজে বাস করিতেছি তখন আমাদিগকে পরস্পরের জন্য ত্যাগ করিয়া চলিতেই হইবে। আমরা পরস্পর অপেক্ষা না করিয়া চলিতে পারি না, কারণ সমাজ একটি বৃহৎ চেতনদেহের ন্যায়। যেমন দেহের সবল সুস্থতা রক্ষা করিতে হইলে প্রত্যঙ্গের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, নচেৎ কোনও অঙ্গের অসুস্থতা বশতঃ সমগ্র দেহে সেই ব্যাধির সঞ্চার হইয়া ভবিষ্যতে সর্ব্বাঙ্গ শিথিল করিয়া ফেলিতে পারে, তেমনি সমাজে অসহায় দরিদ্র থাকা মানে সমাজ দেহ অসুস্থ। তথা সমাজ দেহের প্রতি-ব্যষ্টি যখন চেতন তখন যন্ত্রবৎ অপরের দ্বারা চালিত না হইয়া আমাদিগকে পরস্পর পরস্পরকে দেখিতেই হইবে। তদুত্তরে অপর পক্ষ বলিয়া থাকেন, সমাজ শরীরে যথেষ্ট অব্যবহার্য্য অংশ বর্ত্তমান, যাহাদের উপকারিতা আমরা কিঞ্চিন্মাত্রও উপলব্ধি করিতে পারি না ; সেই হেতু আমরা সর্ব্ব বিষয়ে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নই, বরং সেই অকর্ম্মণ্যদিগকে মানব সমাজ হইতে বহিস্কৃতই আমরা করিয়া দিতে ইচ্ছুক ! নীতি যদি এইরূপ বলে তাহা হইলে দুর্ব্বলের স্থান কোথায় ? পুনশ্চ সমাজের বিভিন্নতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে, এখন কোন্ সমাজের আদর্শ ঠিক তাহা কি প্রকারে স্থির করিবে ? দৃষ্টও হইতেছে যে প্রতি সমাজ নিজ উন্নতি কল্পে অপরের বিনাশের উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। সেই হেতু জড়বাদের উপর যত বড় সমাজই প্রতিষ্ঠিত হউক এবং যিনি যতই সাম্যনীতি প্রচার করুন, যতদিন পর্য্যন্ত বৈদিক সমন্বয় এবং অদ্বৈতনীতি জগৎ অবলম্বন না করিবে ততদিন পর্য্যন্ত মানবের সদসৎ কর্ম্মের standard

নিরূপিত হইবে না,, পরন্তু চিরসংঘর্ষই চলিতে থাকিবে। বেদ বলিতেছেন সর্ব্বভূতান্তর্যামী এক আত্মা বর্ত্তমান, সেই হেতু সমাজসেবা অর্থে সেই এক বিরাটের উপাসনাই হইয়া থাকে। শিক্ষা ও ধর্ম্মের দ্বারা মানবান্তর্গত পূর্ণত্ব এবং দেবত্বকে প্রকটিত করিতে হইবে। যে কর্ম্ম মানবকে সেই পূর্ণত্ব এবং দেবত্বের দিকে অগ্রসর করে তাহা সৎকর্ম্ম। এই সৎকর্ম্মই শিক্ষা এবং ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে এবং যে কর্ম্ম মানবান্তর্গত পূর্ণত্ব এবং দেবত্বকে অপ্রকাশিত করে তাহাই অসৎ বা অবৈদিক কর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে।

আত্মা চিরপূর্ণ, অভাব সেখানে সম্ভবে না। জীব নিজ পূর্ণত্ব এবং দেবত্ব বিস্মৃত হইয়া নিজেকে অহঙ্কারের বশবর্ত্তী করিয়া সদা অভাব অনুভব করিতেছে এবং এই অভাবকে অপনোদন করিবার নিমিত্তই Strugle for existence আরম্ভ হইয়াছে। দর্শনেন্দ্রিয় বর্ত্তমান সত্ত্বেও তাহাতে অস্তারোপ করিয়া দর্শনশক্তির অভাব অনুভব এবং বাহ্যজগৎ হইতে তাহা লাভ করিবার চেষ্টা যেরূপ বাতুলতা সেইরূপ আত্মার পূর্ণত্বকে অঙ্গীকার না করিয়া মাত্র বাহ্যজগৎ হইতে মানবের উচ্চাদর্শ গঠনের সকল প্রচেষ্টা, সকল অনুশীলন মূর্খতা ও দ্বন্দ্বের কারণ মাত্র। বর্ত্তমানে এই অহঙ্কাররূপ ক্ষুদ্র গণ্ডী ভাঙ্গিয়া সেই নিজ পূর্ণ স্বরূপ অনুভব করিতে হইবে। অহঙ্কার সর্ব্বদাই স্বার্থের জন্য মানবকে কর্ম্মে প্রণোদিত করিতেছে এবং নানা কৌশলে ভোগকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে গিয়া 'মরীচিকা ভ্রান্ত মৃগের' ন্যায় চারিদিকে ছুটাছুটী করে, কিম্বা 'কস্তুরী গন্ধে মুগ্ধ মৃগের' ন্যায় অরণ্যে ছুটাছুটি করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়—সে জানে না যে কস্তুরী তাহার নিজ নাভিতেই বর্ত্তমান। যাঁহার এই অহঙ্কার নাশপ্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারই নিকট সেই 'বৃহৎ অহং' পরিচয় দিয়াছেন, তখন তিনি পূর্ণত্বকে জানিয়া আর ক্ষুদ্র অভাব অনুভব করেন না। এই অহঙ্কার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগ প্রবৃত্তিরই সমষ্টি, কিম্বা দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে উহা 'অনাদি বাসনা'। এই অহঙ্কাররূপ ব্যাধির একমাত্র ঔষধই—ত্যাগ। যিনি যতটুকু ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার ততটুকু অহঙ্কার নাশ হইয়া প্রকৃত 'অনন্ত অহং' ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সৎকর্ম্মের অপর নাম ত্যাগ বলিলেই চলে। এই সৎকর্ম্মের দ্বারা ধীরে ধীরে মানবের সকল অহঙ্কার নাশ পাইয়া সত্যস্বরূপ আত্মাকে প্রকটিত করে। ইহাই মানবের চরম সাধনা এবং সিদ্ধি।

বৈদিক ঋষিরা আর এক মহা সত্যের প্রচার করিয়া সমাজকে আরও দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন—উহা পুনর্জ্জন্ম। জীব সদসৎ কর্ম্মের দ্বারা ক্রমবিকাশ বা ক্রমসংকোচ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বহু জন্মের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া তাহা দ্বারা যে যেরূপ কর্ম্ম করে তাহার সেইরূপ গতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অসৎ কর্ম্মের দ্বারা অধস্তন গতি এবং সৎ কর্ম্মের দ্বারা উর্দ্ধ গতি প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা এই জীবনটাকে প্রথম এবং শেষ বলিয়া মনে করেন তাঁহারা বলেন, আমাদিগকে প্রবাহাকারে চলমান্ মানব সমাজের ব্যক্তিগত অনুশীলনের দ্বারা উন্নতি করিতে হইবে। সেই হেতু শিক্ষা বা অনুশীলনের প্রয়োজন। কিন্তু ব্যক্তিগত এবং সমাজগত জীবন সন্তানবৎ বলিলে কার্য্যকারণাত্মক ব্যষ্টি জীবনের কৃত সমষ্টিকর্ম্মের ফল নির্দ্দিষ্ট হয় না বা মানবজন্মগত সংস্কার সকলেরও কিছুই মীমাংসা হয় না; উপরন্তু 'Eat drink and be marry' এই নীতিকে অবলম্বন করিয়া স্বার্থান্ধ প্রতি ব্যক্তি সমাজের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নিজ ভোগসাধনের দ্বারা ক্ষণিক জীবন 'যেন তেন প্রকারেণ' চরিতার্থ করিতে থাকিবে।

কিন্তু অপর পক্ষে প্রাচ্য ভারতে নামেমাত্র বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুরা এখন দেশ, কুল এবং স্ত্রী আচার সম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। বেদের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইয়া যদি বর্ত্তমান হিন্দু সমাজনেতৃবৃন্দেরা দেশ কালানুযায়ী সমাজ গঠন না করেন, যদি উচ্চ শ্রেণীরা প্রত্যেক নিম্ন সমাজকে ধর্ম্ম, শিক্ষা এবং চরিত্রের দ্বারা নিজেদের সমকক্ষ না করিয়া লন তাহা হইলে এই অতি পুরাতন হিন্দু সমাজ কালপুরুষের অঙ্গুলি সঙ্কেতে হাওয়ায় বিলীন হইয়া যাইবে। নিম্ন সম্প্রদায়ের এখন যথেষ্ট আত্মসম্মান বোধ হইয়াছে, বর্ত্তমানে যদি তাহাদিগকে পূর্ণমাত্রায় কিন্তু ধীরে ধীরে নিষ্ঠুর সেকেলে সমাজ-আইনের শৃঙ্খল হইতে—যাহারা উপযুক্ত, তাহাদিগকে—মুক্ত না করেন তাহা হইলে এই বৃহৎ হিন্দুসমাজ অতি

সন্নিকট কালের মধ্যেই খৃষ্ট বা মুসলমান সমাজে পরিণত হইবে। উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকদের নিজ নেতৃত্ব বজায় রাখিবার নিমিত্ত অদ্যাবধি যত প্রকারের সমাজশৃঙ্খল নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাই তাহাদের চিরবন্ধনের কারণ হইবে। স্মৃতি চিরকালই পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং হইবে। এখন পুনরায় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণেরা নবস্মৃতি গঠন করিয়া নিম্ন শ্রেণীদের সমাজকারা হইতে মুক্ত করিয়া জগতের শীর্ষস্থানেই চিরকাল অবস্থান করুন। ব্রাহ্মণ যদি যথার্থ শক্তিসম্পন্ন হয়েন তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিতে কেহ পারিবে না, কারণ এ জগৎ শক্তির নিকট পরাস্ত। যাহারা দুর্ব্বল তাহারাই নিজ আত্মরক্ষা করিয়া থাকে গণ্ডীর সৃজন করিয়া, কিন্তু কালে এই গণ্ডীই তাহাদের অবরোধ ও সমাধির কারণ হইয়া থাকে। অতি পুরাতন হিন্দুসমাজে নানা আবর্জ্জনা জমিয়াছে, এখন সমাজের সকল দ্বার মুক্ত করিয়া জ্ঞানালোক প্রবেশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে হইবে যাহাতে আলোক প্রকৃষ্টরূপে প্রবৃষ্ট হইয়া সকল অস্বাস্থ্যকর বীজাণু নষ্ট করে, যাহা সত্য এবং ব্যবহার্য্য তাহাই রক্ষা করিতে হইবে। উহাতে কাহারও ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই। সত্য কখনও নাশ হয় না। কারণ যে বেদ আমাদের আদর্শ, তিনি বলিতেছেন,

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"

কথা প্রসঙ্গে।

(১)

গিরিবক্ষ ভেদ করিয়া যখন কোন ক্ষুদ্র নির্ঝর ভূমিষ্ঠ হয় তখন মনে হয় অদূরেই বুঝি কোন ঊষর ভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া উহা নিজের সকল অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিবে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ তাহাকে কিছুতেই স্থির থাকিতে দেয় না, পর্ব্বত-প্রমাণ সকল বাধাকে তুচ্ছ করিয়া বিরাট পিপাসী মরুর জ্বালাময় জঠর হইতেও নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহার গন্তব্য স্থান মহাসমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়। পথিমধ্যে ধীরে ধীরে আরও কত ক্ষুদ্র বৃহৎ সলিল রাশি তাহার পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে; কখনও বা কত শুষ্ক খাত তাহার জলে পূর্ণ হইয়া স্বীয় অভিষ্টাভিমুখে ধাবিত হয় এবং নিজেও নিজের গানে বিভোর হইয়া কত শুষ্ক প্রদেশে জল সিঞ্চন করিয়া পরে নিজের নাম রূপ ত্যাগ করিয়া এক মহাসাগরে বিলীন হয়। সেইরূপ ইদানীং ঈশ্বর-কল্প মানব হইতে যে প্রেমের ধর্ম্ম-প্রবাহ উপস্থিত হইয়াছে উহা শাখাপ্রশাখারূপ ধারণ করিয়া সকল ধর্ম্ম-নদীর শুষ্ক হৃদয় প্রেম-প্লাবিত করিয়া উহাদের পুনরুজ্জীবিত করিবে,—আবার কত শত নব-প্রসূত ধর্ম্মধারা তাহাতে পরিসমাপ্ত হইয়া বহু ঊষর প্রদেশকে সিক্ত করিবার জন্য তাহারই পুষ্টি সাধন করিবে।

* * *

পৃথিবীতে অদ্যাবধি যে সকল ধর্ম্ম বা মতবাদ সৃষ্ট হইয়াছে পারি-পার্শ্বিক ভাবসকলকে হিংসা করাই তাহার প্রাণস্পন্দের প্রথম আভাস। সকল নবভাবের উত্থান হইয়াছে ইতর ভাব সকলের দোষ দর্শন করিয়া, প্রসারিত হইয়াছে দুর্ব্বলের নাশ করিয়া, পুষ্ট হইয়াছে অপরের ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া। তখন এক ধর্ম্মী অপর ধর্ম্মীকে অসুর, যবন, বারবেরিয়ান, হিদেন, কাফের বলিয়া জানিত। বহুবার ধর্ম্মের সত্য প্রচারিত হইয়াছে তরবারির দ্বারা, পুণ্য ও অক্ষয় স্বর্গ উপার্জ্জিত

হইয়াছে বিধর্ম্মীর রক্তে অবগাহন করিয়া, অযাচিত প্রেমের দান হইয়াছে পশু শক্তি চরিতার্থ করিয়া।

* * *

কাহারও অনিষ্ট করিও না, পার'ত সাহায্য কর—কাহাকেও তাহার ধর্ম্ম হইতে চ্যুত করিও না, তাহাকে তাহারই মধ্যে আলোক দেখাও—বিপ্লব নিষ্প্রয়োজন, শান্তি স্থাপন করিয়া ঈশ্বর লীলার পার্ষদত্ব গ্রহণ কর—এই নবসত্য জীবনে পরিণত করিয়া আমিত্বের প্রসার কর—'আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' এই নীতির মধ্য দিয়া। এখানে 'হিত' শব্দের অর্থ 'সেবা'। কারণ যাঁহারা আত্মার অখণ্ডত্ব স্বীকার করেন তাঁহাদের নিকট 'হিত' শব্দটি সাহসমাত্র। পরমাত্মাকে লইয়া জীবের আত্মত্ব, অতএব প্রেমই আমাদের স্বাভাবিক—'হিত' বা 'উপকার' নহে।

* * *

Toleration মানে দয়া করিয়া অপর ধর্ম্মকে উপেক্ষার চক্ষে দেখা নহে, পরন্তু সত্যকে লাভ করিবার অপর একটি পথ বলিয়া শ্রদ্ধা করা—যেমন ঋজু কুটিল সকল নদীর গন্তব্যস্থান একই মহা-সমুদ্র যাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর নাম রূপের গণ্ডী থাকে না। 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি', 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহম,' 'যত মত তত পথ'—এই সত্য বৈদিক, পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক যুগে তিন মহাত্মাদ্বারা প্রচারিত হইয়াছে।

* * *

অদ্বৈত বেদান্তের আলোকে সকল ধর্ম্মকে দেখিলে এক বিশ্বাত্মা সর্ব্বত্র পূজিত হইতেছেন বুঝা যাইবে—সকল জাতির মধ্যে একত্বের সূত্র কোথায় তাহাও নিশ্চিত হইবে। বেদান্তর্গত জীব ও জগতের ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচ, পুনর্জ্জন্মবাদ, আত্মার পূর্ণত্ব ও অমরত্ব, ব্রহ্মের নিত্য ও লীলার সমন্বয় আধুনিক জড়বিজ্ঞান ও দর্শনের এবং অপরাপর ধর্ম্মের দুর্ব্বোধ্য সমস্যাকে সরল করিয়া দিবে।

* * *

'বাদশাহী আমলের টাকা ইদানীং চলে' না বটে কিন্তু তাই বলিয়া

ধাতু গুলিকেও কি ছুঁড়িয়া ফেলিতে হইবে?—বাতুল ছাড়া এমন আর কে করিবে? নূতন যুগে পুরাতন প্রথা চলে না বটে, তা বলিয়া পুরাতন সত্য ও সাধনাগুলিকে বাদ দিলে চলিবে না—তাহা হইলে আত্মা, ঈশ্বর, মুক্তি, পুনর্জন্ম প্রভৃতি প্রত্যক্ষ এবং যুক্তিসিদ্ধ সত্য সকল, এবং জ্ঞান, ভক্তি, রাজ এবং কর্ম্ম প্রভৃতি যোগ মার্গ সকল নিঃশেষে অস্বীকার করিতে হয়। স্বদেশীয় এগুলিকে নির্ম্মমভাবে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বিদেশীয় বর্জ্জন করিলে থাকিবে কি?

* * *

হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় হয় না—দিবা রাত্র একত্রে বাস করিতে পারে না। যাঁহারা পাঁকাল মাছের মত সংসারে বাস করিতে পারেন, শাস্ত্র তাঁহাদিগকে কর্ম্মযোগী বলিতেছেন, ভোগী নহে। সেই ত্যাগাত্মা নিষ্কাম কর্ম্মী বা বিরাট উপাসকগণকে ভোগী আখ্যা প্রদান করা মানে 'গোলাপ'কে 'ঘেঁটু' ফুল বলা।

* * *

আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কর্ম্মযোগই সাধকের নিমিত্ত শাস্ত্রে একমাত্র ব্যবস্থা নহে। জ্ঞান বা কর্ম্ম, নিত্য বা লীলা সকলই সেই এক অনন্তকে উপলক্ষ করিয়া। বিদ্বেষ নিষ্প্রয়োজন। হাতাহাতির দ্বারা কেবল বিদ্বেষ প্রকাশ পায় না—গালাগালির দ্বারাও বটে। ধর্ম্ম বা সমাজনীতির আলোচনা করিতে গিয়া তর্জ্জার লড়াই বাধাইয়া নিজেদের জনসমাজে হাস্যাস্পদ করা উচিত হয় না বলিয়াই বোধ হয়।

(২)

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

প্রকৃতির কর্ম্মপ্রবাহ অবিরাম গতিতে চলিয়াছে—তুমি আমি এই প্রকৃতির অন্তর্গত। যে শরীর, মন, বুদ্ধি অহংকার লইয়া তুমি, আমি

গঠিত তাহা ত ভগবানের অপরা প্রকৃতি। আমাদের প্রত্যেকটি কার্য্য, প্রত্যেকটি চিন্তা এই প্রকৃতিতে স্বতঃই ঘটিতেছে—আর আমরা যে মনে করিতেছি এই সকল কর্ম্ম ও চিন্তা আমরাই করিতেছি—ইহাও প্রকৃতিরই একটি ঘটনা।

প্রকৃতি এক অভিন্ন নিরবচ্ছিন্ন সত্তা—বস্তুতঃ এই প্রকৃতির কোন এক অংশে যখন একটি স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের ভাব উত্থিত হয় তখনই এই অভিন্ন নিরবচ্ছিন্ন সত্তা বহুধা বিভক্ত দেশকাল-নিমিত্ত-নিয়মাধীন বহু বস্তু, ঘটনা ও চিন্তার সমষ্টিরূপে প্রতিভাত হন। এক বহু হইয়া পড়েন। অহঙ্কারই জীবের স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভগবানের অপরা-প্রকৃতিরূপা এক অখণ্ড সত্তাকে বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতিতে পরিণত করে।

প্রকৃত্যা ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

অহঙ্কার প্রসূত স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব বুদ্ধিই এই মোহ রচনা করে। যিনি এই অহঙ্কার বশে "আমি কর্ত্তা" এইরূপ মনে করেন, তিনি বিমূঢ় অর্থাৎ ভগবানের অপরাপ্রকৃতিরূপ সত্য দেখিতে পাইতেছেন না; যাঁহার স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব বুদ্ধি তিরোহিত হয়—তাঁহার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হয়, অপরা-প্রকৃতিরূপে প্রতীয়মান ভগবানের অদ্ভুত লীলা দর্শন করেন। "তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা" দেখিয়া তিনি স্থির হইয়া পড়েন। জীবের স্বতন্ত্র কর্তৃত্বরূপ মোহ দূরীভূত হয়—তাহার 'আমিত্ব' ক্ষুদ্র শরীরের গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া এক বিরাট আমিতে পরিণত হয়।

জীবের অহংকারই আদিঅজ্ঞান। শরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ 'আমি'টি নিজকে অপূর্ণ মনে করে এবং প্রকৃতির অন্তর্গত যাবতীয় বস্তুকে আপনা হইতে ভিন্ন মনে করে। নিজের 'ক্ষুদ্রত্ববোধ' ও অপরের সহিত 'ভেদবোধ' এই দুইটিকে অবলম্বন করিয়াই বাসনা উত্থিত হয়। বাসনা হইতে কর্ম্ম এবং কর্ম্ম হইতেই জন্মমৃত্যুলক্ষিত সংসারের উৎপত্তি।

যাঁহার এই অজ্ঞান তিরোহিত হয় তিনি দেখেন তিনি বিরাট, তিনি পূর্ণ এবং তিনিই 'বহুধাত্মমূর্ত্ত্যা' এই বিচিত্র প্রকৃতি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার আর বাসনার সম্ভাবনা নাই—কাজেই সংসার

অসম্ভব। তিনি মুক্ত—তিনি একে প্রতিষ্ঠিত—তিনি অপরাপ্রকৃতি রূপে প্রতীয়মান ভগবানের সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন।

তার পর ভগবানের পরাপ্রকৃতি। তিনি 'চৈতন্য', তিনিই সাক্ষী। অপরাপ্রকৃতি চৈতন্যময়ী—পরাপ্রকৃতি চৈতন্য স্বরূপা। একরূপে তিনি বিশ্বসংসার সাজিয়া বসিয়াছেন—অন্যরূপে তিনি উহা দেখিতেছেন। দ্রষ্টা না থাকিলে দৃশ্যের অস্তিত্বই যে থাকে না। 'যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ' 'দ্রষ্টারূপে' নিজেরই 'দৃশ্যরূপটি' ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

সংসারের আদিজনক জীবের প্রথম অজ্ঞান-স্বরূপ এই স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব-বোধ তিরোহিত হইলে কি থাকে? এক অখণ্ডসত্তা নিজেই দৃশ্য সাজিয়া নিজেই দেখিতেছেন। দর্পণের সম্মুখে বসিয়া নানা প্রকার মুখভঙ্গী করিয়া কত আনন্দ পাই, ইহা আমাদের এক প্রকার খেলা; ভগবানের দৃশ্য ও দ্রষ্টারূপ ধারণ আমাদের নিকট আমাদেরই অনুষ্ঠিত উপযুক্ত খেলার একটি বিরাট অভিনয় বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, ভগবান নিজকে দেখিয়া নিজে আনন্দে মুগ্ধ হইতেছেন!

এইরূপ মনে হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, কারণ, আমাদের মন দেশকালনিমিত্তাধীন। আমরা প্রয়োজন ব্যতীত কর্ম্মের সার্থকতা দেখিতে পাই না—এমনকি ঐরূপ কর্ম্মের সম্ভাবনা বুঝিতেও অসমর্থ।

কিন্তু আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে ভগবান দেশকালনিমিত্তের অধীন নহেন—তিনিই একরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সাজিয়া বসিয়াছেন এবং সেই রূপটির মধ্যেই দেশকাল নিমিত্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাজেই তিনি কেন এই বেশ ধারণ করিলেন, কেনই বা তিনি সাক্ষীরূপে ইহা দেখিতেছেন—এই সব কথা জিজ্ঞাসা করা বে-আইনী। ইহার উত্তর দেওয়া যায় না বলিয়া ইহা বে-আইনী নয়—এইরূপ প্রশ্ন ন্যায়তঃ করা যায় না বলিয়াই ইহা বে-আইনী। দেশকালনিমিত্তপাশে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কোন বস্তুকে ধরিতে পারা যায় সন্দেহ নাই—কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের গণ্ডী অতিক্রম করিলেই দেশকালনিমিত্তের গণ্ডী অতিক্রম করা হয় বলিয়াই ভগবানকে এই গণ্ডীর মধ্যে ধরিবার প্রয়াস মানবমনের অজ্ঞানপ্রসূত দম্ভপ্রণোদিত অনধিকার প্রবেশ—এক

কথায় ধৃষ্টতা। ভগবান এক, কাজেই তিনি অখণ্ড, পূর্ণ, নিত্য, শাশ্বত, সনাতন, মুক্ত, অসীম; তিনি কোন প্রকার প্রয়োজন বা অভাব বশে কর্ম্ম করিলে তাঁহার স্বরূপ বজায় থাকে না—তাঁহার ভগবানত্ব বজায় থাকে না—তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত দেশকালনিমিত্তাধীন একটি জীববিশেষে পরিণত হন।

আর এক কথা, ভগবানের সৃষ্টির প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রশ্নও যেমন অসঙ্গত, যাঁহারা এই প্রশ্ন মানিয়া লইয়া উত্তর দিয়াছেন—তাঁহাদের উত্তরও তেমনি অসঙ্গত। ভগবান একটি বিরাট খেলা সৃষ্টি করিয়াছেন—আমাদের মত খেলা হইতে আনন্দ পাইবার জন্য। জীববুদ্ধি মানবের আনন্দের প্রয়োজন থাকিতে পারে—কিন্তু আনন্দস্বরূপের আনন্দ লাভের ইচ্ছা কিরূপ? ইহা কি 'সোনার পাথর বাটির' মত একটি অদ্ভুত হেঁয়ালী নয়? আনন্দের অভাব পূরনের নিমিত্ত তিনি আপনাকে বহু করিয়া নানা বেশে, নানা ঢঙে, নানা রঙ্গে সাজিয়া অদ্ভুত এক অভিনয় রচনা করিয়া আনন্দে মশগুল হইয়া আছেন—এ ভাবটি কবির মন মুগ্ধ করিতে পারে—তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কাছে ইহা একটি আজগুবি 'সোনার পাথর বাটি,' কল্পনামাত্র। ভগবান স্বয়ং গীতামুখে বলিতেছেন—"ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা"। প্রথমতঃ আনন্দ স্বরূপ ভগবানের আনন্দের অভাব নাই। দ্বিতীয়তঃ যাহা আনন্দ তাহাই তিনি—কাজেই তাঁহার পক্ষে 'আনন্দ লাভ' একটা অলীক কল্পনামাত্র—দুইটি বস্তুর মধ্যে ভেদ না থাকিলে এক অপরকে পাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ তিনি দেশকাল নিমিত্তাধীন নহেন—কাজেই (যদিও তাঁহার 'আনন্দলাভ' সম্ভব হইত) এই 'আনন্দ লাভ' কোনও কার্য্য বিশেষের উপর নির্ভর করিতে পারে না। তিনি বহু হইলে আনন্দ পাইবেন বা তাঁহার আনন্দ বাড়িবে, নচেৎ নহে এরূপ কথা বলা অসঙ্গত—তাঁহার শাস্ত্রসিদ্ধ স্বরূপ বিরুদ্ধ। চতুর্থতঃ যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে দেশকালনিমিত্তাধীন মানবমনরচিত ভাষাদ্বারা কিছুতেই ব্যক্ত হইতে পারে না—এমন কি স্বয়ং ভগবান মানব বিগ্রহ ধারণ করিয়া এই অতিপ্রাকৃত প্রশ্নের জবাব অদ্যাবধি মানব ভাষায় দিতে পারেন নাই।

অতএব অসাধ্য সাধনে প্রয়াস করিয়া নিমিত্তাতীতকে নিমিত্তের গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিয়া কতকগুলি কল্পনাপ্রসূত আকাশকুসুমবৎ অলীক হেঁয়ালী রচনায় কি ফল? সত্যকে বরণ করিয়া লই যে তিনি পূর্ণ, তিনি আনন্দস্বরূপ তথাপি তিনি এই পরাপ্রকৃতি ও অপরাপ্রকৃতি সাজিয়া বসিয়াছেন। বে-আইনী 'কেন'টি ছাড়িয়া দিয়া এই সত্য বরণ করিয়া লই এবং স্বতন্ত্র কর্তৃত্ববোধস্বরূপ অজ্ঞানের মূল গ্রন্থিটি খুলিবার জন্য সমুদয় চেষ্টা নিয়োজিত করিয়া এই মহান্ সত্য উপলব্ধি করি।

প্রশ্ন হইতে পারে,—যদি সবই এক, চেষ্টার প্রয়োজন? বস্তুতঃ যদি দৃঢ় ধারণা হয় যে সবই এক তাহা হইলে ঐ গ্রন্থি ভিন্ন হইয়াছে—আমি প্রয়োজনাতীত হইয়াছি—আমি সত্যলাভ করিয়াছি। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন "Seek not and it is God" কিন্তু যতক্ষণ ভেদবুদ্ধি থাকিবে ততক্ষণ সত্যলাভের চেষ্টাও থাকিবে—যতক্ষণ অহঙ্কারচালিত হইব ততক্ষণ বিমূঢ় হইয়া সংসারাবর্ত্তে সুখদুঃখ ভোগ করিতেই হইবে—কাজেই এই আবর্ত্ত হইতে নির্গত হইবার চেষ্টাও থাকিবে। এই অবস্থায় কার্য্যাকার্য্যও থাকিবে। যে ভাব ও কার্য্য অহঙ্কারকে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া রাখে তাহাই মুক্তিপথের অন্তরায় অতএব অসৎ কর্ম্ম—আর যাহা উহাকে শরীর মনের গণ্ডী লঙ্ঘন করাইয়া বিরাটের দিকে লইয়া যায় তাহাই সৎকর্ম্ম। আমিত্ববোধকে শরীর হইতে মনে, মন হইতে বুদ্ধিতে, বুদ্ধি হইতে শুদ্ধ-অহঙ্কারে লইয়া যাওয়াই সাধনা। তারপর 'শুদ্ধ অহঙ্কার' বা 'বিরাট অহং'ও আপনা আপনি সরিয়া পড়ে—থাকে 'অবাঙ্-মনসগোচরম্ বোঝে প্রাণ বোঝে যার'। এই সত্যের উপলব্ধি, এই যুগেও হইয়াছে। শ্রুতির শুদ্ধাদ্বৈত ব্রহ্মআখ্যায় যাঁহার আভাস দেওয়া হইয়াছে—তাহা 'চরম সত্য'—যেখানে পরাপ্রকৃতিও নাই অপরাপ্রকৃতিও নাই দ্রষ্টাও নাই দৃশ্যও নাই।

(৩)

মানুষ যবে থেকে সমাজবদ্ধ হ'ল তবে থেকেই তার সমস্যার আরম্ভ, আর নূতন নূতন যত সমস্যা বাড়ছে, ততই তার পূরণের উপায়েরও রকমারী হচ্ছে। যে দেশের প্রাণ যে রকম তার রাস্তাও তার অনুরূপ,

সন্ধান নিয়ে। পরে দাও বিদ্যুৎ বেগে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের ভিতর তাই ছড়িয়ে—দাও দেখি, দেশটাকে একবার সেই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করে দেখ্‌বে তোমার লাখ বক্তৃতায় ও কোটি প্রবন্ধে যা না হয়েছে একটি কথায় তাই হবে।

সন্ন্যাসী স্তুতি

(ব্রহ্মচারী নন্দদুলাল)

হে সন্ন্যাসি, ওগো ভারতের আদর্শের পরিপূর্ণ মহান্ মূরতি !
মহিমা মণ্ডিত তব কম তনুখানি, প্রেম দিয়া গড়েছে প্রকৃতি।
স্নেহভক্তি করুণার তিন স্রোতঃস্বতী তব হৃদে মিলেছে আসিয়া,
ক'রে স্নান পাপীতাপী কাঙ্গাল পতিত, সব ভয় যায় বিদুরিয়া।
কেন তব এত দয়া, কেন তুমি এতই মহান, ভাবিয়া না পাই,
লুটে শির তব পদে, বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখে তোমাপানে চাই।
চাহ নাই ভুক্তি মুক্তি, চাহ নাই সুখ, বিলায়ে দিয়াছ আপনায়,
অভাগার, পতিতের তরে কাঙ্গালের জীর্ণবাস ল'য়েছ মাথায়।
অপমানে করিয়াছ অঙ্গের ভূষণ, হে মানীর শিরোমণি প্রভু,
অপমান স'য়েছ নীরবে, পাইয়াছ বহুমান, তুমি স্থির তবু।
ডাকেনাই যে তোমারে গেছ তার কাছে, ফিরায়েছে, তবু ফিরনাই,
আসিয়াছে বহুমানী ধনী, যুক্তপাণি ডাকিয়াছে, ফিরেছে বৃথাই।
সিংহসম চলিয়াছ, আপনার গন্তব্যের পথে, পিছু ফির নাই,
কে রুধিবে তবগতি, কার সাধ্য, মূর্ত্ত বিশ্বেশ্বরে দেখিবারে পাই।
রূপ গেছে হীন হ'য়ে, প্রভু তব কাছে হে, রূপের অনন্ত ভাণ্ডার,
বিশ্বনাথ যার হৃদে, তার কাছে, মরতের রূপ হেয় হীন ছার।
ওগো দেব দেব, ওগো নাথ, ওগো বিশ্বগুরু, লহ প্রণতি চরণে,
তোমার আদর্শ পথে, টেনে নাও তব দাসে জীবনে মরণে॥

সুশীল মাষ্টার।

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩)

সেদিন অমরকবি শ্রীযুক্ত গিরীশবাবুর "পাণ্ডব গৌরব" ও তৎসহ একখানি গীতিনাট্য অভিনীত হইবে। সন্ধ্যার পর হইতে নাট্যশালায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছে। অভিনেতাগণ গাড়োয়াণী ফ্যাসানে চুল ছাঁটিয়া ও রঙ্গিন গেঞ্জির উপর মিহি পাঞ্জাবী পরিয়া সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছিল; তাহাদের প্রত্যেকটী অহঙ্কৃত ভঙ্গী "আমরা বড় বাহাদুর" এই ভাবে দর্শকগণকে বুঝাইয়া দিতেছিল। উজ্জ্বল আলোকমালা পরিশোভিত রঙ্গমঞ্চের কৌতূহলময় দৃশ্য তখনও যবনিকান্তরালে; উপবিষ্ট দর্শকমণ্ডলী উত্তরোত্তর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন, আমি "গ্রীণরুমের" একপ্রান্তে বসিয়া অভিনেতাগণের সাজসজ্জা দেখিতেছিলাম, এমন সময়ে রমাপতির দৃষ্টি আমার উপর পড়িবামাত্র সে বলিয়া উঠিল "বাঃ! অতুল যে হাত-পা গুটিয়ে বেশ বসে আছ? প্রথমেই যে অপেরাখানা—তোমারই main part first scene এ-ই তোমায় appear হতে হবে, সে কথা ভুলে গেলে নাকি?" আমি নীরবে উঠিয়া পরিচ্ছদ পরিধান করিতে লাগিলাম—রমাপতি সাহায্য করিতে লাগিল। আমি মৃদুস্বরে বলিলাম "দেখ ভাই, আজ তো বাবা এসেছেন—তাঁর সামনে কি করে এই সব অশ্লীল ভঙ্গী করে প্রেমের কথা কইব! বিশেষ আবার মদ ফদ খাওয়া আছে; আমার ভাই ভয়ানক লজ্জা করছে!"

রমাপতি সস্নেহ তিরস্কার করিয়া কহিল, "তোমার দেখছি, একটুও Moral courage নেই। সত্য সত্যই যে তুমি করছো না, এটা কি কর্ত্তা মহাশয় বুঝবেন না?—আর্টের কথাই আলাদা।"

"সব তো বুঝি—কিন্তু তবুও ভয় করে, বাবা শেষে মনে করেন—"বাধা

দিয়া রমাপতি বলিল, "ওহো, বুঝেছি, ওরকম Weakness অনেকের প্রথম প্রথম থাকে বটে।" সহসা সে বাহিরে চলিয়া গেল এবং বাহির হইতে ইসারা করিয়া আমায় ডাকিল, আমি বাহিরে আসিলে সে ষ্টেজের তল হইতে একটী বোতল ও গ্লাস্ বাহির করিয়া আনিল। গ্লাসটী আমার হাতে দিয়া বলিল "এই ওষুদটুকু লক্ষ্মী ছেলের মত ঢক্ করে খেয়ে ফেল, সব সেরে যাবে এখন।" আমি জড়িতস্বরে বলিলাম "এ বুঝি মদ?"

"তোমার যে বুদ্ধি! পাগল আর কি? এটা ব্র্যাণ্ডি—ওষুদ—মদ নয়। আমি গ্লাসটী তাহার হাতে ফিরাইয়া দিতে গিয়া বলিলাম "ও একই কথা; আমি এ কোনদিন খাই না—খাবোও না।"

রমাপতি ব্যঙ্গ করিয়া বলিল "সুশীল মাষ্টার শিখাইয়া দিয়াছে বুঝি, যে ওষুদ হিসেবে একটু খেলেও নির্জ্জলা চরিত্তিরটী অমনি নষ্ট হয়ে যাবে?"

"সুশীল—শুনিবামাত্র রোষে আমার ঈর্ষ্যা জ্বলিয়া উঠিল। আমি সকল দিক হইতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী, ইহা এই সহৃদয় বন্ধুর সম্মুখে প্রমাণ করিবার জন্য পানপাত্র ওষ্ঠ-সংলগ্ন করিলাম—তরল পাপরাশি আমার হৃদয়ের সমস্ত দুর্ব্বলতা দগ্ধ করিয়া উদরে চলিয়া গেল! রমাপতি ক্রূর হাস্যে গ্লাসটী ফিরাইয়া লইল। আমি তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিলাম, "অনেক পাপে তুমি আমায় দীক্ষা দিয়েছো বন্ধু! শেষ পর্য্যন্ত থেকো।" রমাপতি বিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া চলিয়া গেল। আমি অবশিষ্ট সজ্জা শেষ করিবার জন্য 'গ্রীণরুমে' প্রবেশ করিলাম। যখন বাহিরে আসিতেছি, তখন দেখি একটী ছেলেকে রমাপতি ধম্‌কাইয়া মদ খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছে। হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। রমাপতি বলিতেছে, "নে—আমি বল্‌ছি, তোর বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখিস্ নাচ্‌তে গাইতে কেমন স্ফূর্ত্তি পাবি! নে—দেরী করিস্ নি, খেয়ে ফেল্ বল্‌ছি।"

বালক কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মাষ্টার বাবু বল্‌তেন—'পাপ আর পারা কখনও হজম হয় না'।"

সুরা-রক্তিম চক্ষু দু'টী ঘূর্ণিত করিয়া রমাপতি বলিল, "মাষ্টার বাবু তো

ভারি শিখিয়েছেন ! গুরুজনের কথা হেলা করা ও্য পাপ এ কথা শেখায় নি? নে, তাড়াতাড়ি খা—এ সময় কেউ দেখ্‌তে পাচ্ছে না।”

“তিনি আরও বল্‌তেন—‘যতই লুকিয়ে পাপ করি না কেন, ভগবান্ সব দেখ্‌তে পান’।”

রমাপতি শেষে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল, “মাষ্টারটা তোর মাথা খেয়েছে দেখ্‌ছি ! ছেলেবেলায় ঈশ্বর-ফিশ্বর কিরে ? ও সব বুড়োদের কথা ! আর ছোটলোক বাগ্দীর আবার মদ খেতে দোষ কি ? নে, এ রকম মাল তোর চোদ্দ পুরুষে চোখেও দেখেনি ! আদর করে দিচ্ছি কিনা ? নে—খা, আমি বল্‌ছি এ খেলে তোর ভাল হবে, তা বিশ্বেস হচ্ছে না ? ছোটলোক আর বলে কাকে ? ভাল চাস্ তো খা বল্‌ছি।”

বালক তথাপি সম্মত হইল না দেখিয়া রমাপতি একরকম জোর করিয়া তাহার গলায় ঢালিয়া দিতে অগ্রসর হইল। ভীত বালক অস্ফুট চীৎকারে আপত্তি জানালে রমাপতি টলিল না। আমি অগ্রসর হইয়া বাধা দিয়া বলিলাম, “ছিঃ ! রমাপতি, এগুলো সব কি হচ্ছে ?” রমাপতি নিরব ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে আমাকে বিদ্ধ করিয়া বালককে ছাড়িয়া দিল। হরিপদ তাড়াতাড়ি আসিয়া রমাপতির হাত হইতে গ্লাসটী লইয়া নিঃশেষ করিল। আমি পাষাণ মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া গেলাম। সেদিন আমি মদ্যপান করিয়াছি জানিতে পারিয়া অনেকেই অসঙ্কোচে আমার সম্মুখেই মদ্যপান ও অশ্লীল আলাপ করিতে লাগিল ; দেখিয়া ক্রোধে ও লজ্জায় হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। শাসন করিবার পথ স্বহস্তে রুদ্ধ করিয়াছি। দেখিলাম অধিকাংশ অভিনেতাই সুরাপানে বেশ অভ্যস্ত। কতকগুলো মাতাল লইয়া লোকশিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছি ! সুশীল মাষ্টারের ভবিষ্যদ্বানী হাড়ে হাড়ে ফলিল। হায় ! কোথায় সে গর্ব্বিত অপমানবোধ ! সুরার মোহময় বিহ্বলতায় আমার অভিমানদৃপ্ত হৃদয় আজ পাপের তাণ্ডব-নৃত্য-চঞ্চল চরণে সম্পূর্ণ অবনম্র !

তৃতীয় দৃশ্যের অভিনয় কোন মতে শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়াছি, এমন সময় উপেন সহসা আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “ভাই, তুমি যা বলেছ—ফাষ্ট ক্লাস ; সকলেই ধন্য ধন্য কর্‌ছে !” উপেনের এই অসংযত

ঔদ্ধত্যে ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাক, একটু ম্লানহাস্তে 'বটে' বলিয়া গলা ছাড়াইয়া লইলাম। বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, যে "বাবু" বলিয়া কথায় কথায় কুকুরের মত খোসামুদী করিত, সেও কিনা আজ অসঙ্কোচে "ভাই" "তুমি" ইত্যাদি সম্বোধনে আপ্যায়িত করিল! এক পাত্র সুরার কি অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব! একঘণ্টার মধ্যে আমার মনোরাজ্যে কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন!!—সহসা রমাপতিকে ডাকিয়া অস্বাভাবিক আগ্রহে বলিলাম "কৈ, আর একবার!" অধরে মৃদুহাস্য চাপিয়া সে গ্লাস লইয়া আসিল, আমার হাতে দিয়া বলিল "বুঝ্‌তে পেরেছ এইবার!—" আমি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া এক নিশ্বাসে পাত্র শূন্য করিলাম! মস্তিষ্ক ঘুরিতে লাগিল—অর্দ্ধোন্মাদের মত অঙ্কের পর অঙ্ক ধরিয়া পৈশাচিক উল্লাস করিতে লাগিলাম। দর্শকবৃন্দের অতর্কিত প্রশংসাধ্বনি তীক্ষ্ণ তীরের মত ছুটিয়া আসিয়া মাঝে মাঝে মর্ম্মবিদ্ধ করিতে লাগিল। একবার রঙ্গমঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া "ষ্টেজ্ ম্যানেজারের" নিকট গিয়া কেন যেন বলিয়া ফেলিলাম "আলোগুলো বড় বেশী তীব্র একটু কমিয়ে দিলে হয় না?" তিনি অর্থহীন শূন্যদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিতেই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গ্রীণরুমে" ফিরিয়া আসিলাম। তখন গীতিনাট্যের অভিনয় সমাপ্ত হইয়াছে।

"পাণ্ডব গৌরব" অভিনয় আরম্ভ হইল। আমার উন্মাদ চিন্তা তখন মোহের মসীমলিন অন্ধকারে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। ক্ষিপ্তের মত অভিনয় করিয়া যাইতে লাগিলাম। কেবল দর্শকগণের করতালি ধ্বনিতে মাঝে মাঝে চম্‌কিয়া উঠিতেছিলাম, মনে পড়ে। কৃত্রিম অভিনয় সমাপ্ত হইল। পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া স্বীয় কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম। পথে আসিতে আসিতে আমার ব্যথিত স্মরণে কেবল এই কয়টী কথাই বার বার জাগিতেছিল—"আমার জীবন নাট্যের প্রকৃত অভিনয়েরও আজ নূতন অঙ্ক—নূতন দৃশ্য!" অসহ্য গরম বোধ হইতেছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিলাম। তখনও ভাল করিয়া প্রভাত হয় নাই। শীতল প্রভাত-বায়ু স্পর্শে আমার ঘর্ম্মসিক্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। কণ্টকিত কলেবরে দিবা ও যামিনীর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম—আমার

জীবনেও তো আজ অতীত-ভবিষ্যতের বিচিত্র সন্ধি ! পশ্চাতের আকর্ষণ নাই—সম্মুখের নিবারণ নাই—পতনের নিশ্চিত লক্ষ্য নাই, অথচ ধীরে ধীরে বেশ নামিয়া যাইতেছি !—মনে পড়িল একদিন সুশীল মাষ্টারের সম্মুখে সদর্পে বলিয়াছিলাম 'ভবিষ্যতে ইহা হইতে গ্রামের যথেষ্ট উন্নতি হইবে !' গ্রামের উন্নতি দূরের কথা—আমার উন্নতি তো প্রত্যক্ষ ! মাৎসর্য্যের অন্ধত্বে মহত্ত্বের নিকট মস্তক অবনত করিতে লজ্জিত হইয়াছিলাম ; আর আজ নাটকীয় উত্তেজনায়—!—যাক্ নিষ্ফল চিন্তায় কোন লাভ নাই। শয্যায় লুটাইয়া পড়িয়া ক্ষোভের বেদনায় অসহায় শিশুর মত রোদন করিতে লাগিলাম।

পরদিন বেলা ১০টার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলাম। স্নানান্তে অভ্যাসবশতঃ দর্পন সম্মুখে আনিয়া স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া লজ্জায় নিজের চোখের দিকেও চাহিতে সাহস হইল না ! পূর্ব্ব রাত্রির সমস্ত ঘটনা জীবন্তভাবে স্মৃতিপটে উদিত হইল। একটা গ্লানির বেদনায় অন্তর ভরিয়া উঠিল। পিতার নিকট লাঞ্ছিত হইবার আশঙ্কায় বিবেকের লাঞ্ছিত ধিক্কার কেন ক্ষণিকের উন্মাদনায় বরণ করিয়া লইলাম। সুদীর্ঘ জীবনের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলাম—একটী বৎসরের বিনিময়েও যদি কেহ একটী ক্ষুদ্র দিন ফিরাইয়া দিত ! হৃদয়ের নিভৃতপ্রদেশ হইতে পঞ্জর-পিঞ্জর কাঁপাইয়া তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ব্যর্থ আশা দগ্ধ করিয়া বহির্গত হইল মাত্র—কেহ উত্তর দিল না !

বাঙ্গালার পল্লীসমাজে আমার মত 'নাট্যবিকার' গ্রস্তের অভাব নাই। তাহাদের অনেকেরই অবস্থা যে আমার মত তাহা অতিরঞ্জিত না করিয়াও অনায়াসে বলা যাইতে পারে। এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে একটী পাঠশালার অভাবে ছেলেপিলেরা বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে না, সেখানেও উৎসাহপূর্ণ নাট্যসমিতি সকল সগর্ব্বে লোকশিক্ষা দিতেছে ! সাধারণের চরিত্রগঠনোপযোগী আদর্শ চরিত্র (?) সকল উলঙ্গ করিয়া দেখাইবার সুন্দর ব্যবস্থা করা হইতেছে ! হায় ! মাতঃ জন্মভূমি ! তোমার বক্ষ এইসব হৃদয়হীন প্রেতের তাণ্ডব-নৃত্য-লীলাভূমি না হইলে তুমি সোনার বাঙ্গালা হইয়াও "চলমান্ শ্মশান" উপাধি লাভ করিবে কেন ? শত শত

মুদ্রা ব্যয়ে আমরা ললিত-কলা-বিদ্যা হিসাবে নাট্যানুশীলন করিতে পারি, সুকণ্ঠ সুন্দর বালকগুলির অর্দ্ধস্ফুট মস্তিষ্কগুলি চর্ব্বন করিবার সুন্দর ব্যবস্থা করিতে পারি,—কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে 'কিন্তু'র সুদীর্ঘ তালিকা হাজির করিতে চাহিনা; কেননা, যে আমোদ বা স্ফূর্ত্তি করিল না, সে হতভাগ্যের বাঙ্গালা দেশের যুবক বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হওয়া উচিত!

পরের দোষ বা ক্রটীগুলি অতি সামান্য হইলেও আমরা বড় করিয়া দেখি, তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া নিরপেক্ষ সমালোচনায় অগ্রসর হই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রবল দোষ, অমার্জ্জনীয় অপরাধগুলিও সামান্য বা তুচ্ছ প্রতিপাদনের চেষ্টা আমাদের অন্তরে বেশ সজাগ থাকে। নিজের মধ্যে যাহা কিছু অন্যায়, দুর্ব্বল বা দোষযুক্ত তাহার উপর সযত্নে ভদ্রতার আবরণ নিক্ষেপ করিয়া বেশ শান্তশিষ্ট, সদালাপী মানুষটী সাজিয়া সমাজে চলাফেরা করি। যথেষ্ট সাবধানতা সত্বেও যদি কোন অন্যায় ধরা পড়িয়া যায়, তাহার বারো আনা দোষ পরের ঘাড়ে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করি। সেই থিয়েটারের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে সমস্ত অন্যায় আমি করিয়াছি, তাহার হিসাব নিকাশ করিতে গিয়া রমাপতির উপর ঘৃণায় আমার চিত্ত বিকৃত হইয়া উঠিল! এমন সময় রমাপতিকে হাস্যমুখে উপস্থিত দেখিয়া আমি ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলাম "তুমি আমার সম্মুখ হতে এখনি দূর হও। বন্ধুত্বের ভান করে তুমি আমার সর্ব্বনাশ করছো—ভগবানকে ধন্যবাদ তোমার জোচ্চুরী এত শীগ্‌গীর ধরা পড়ে গেছে!" রমাপতি হতভম্বের মত আমার দিকে ম্লান দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিল "আমার দোষ কি অতুল! আমি তো তোমায়—"

আমি মাটিতে পদাঘাত করিয়া বলিলাম "তোমার কোন কথা শুনতে চাই না, শুধু আমার সম্মুখ থেকে দূর হও।"

ভীরু কুকুরের মত পেছন দিকে চাহিতে চাহিতে রমাপতি চলিয়া গেল। আমার বুকের উপর হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। থিয়েটার তো ভাঙ্গিয়া দিলামই, অধিকন্তু পূর্ব্ব সঙ্গীগণের সহিত বাক্যালাপ

পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলাম। অস্বাভাবিক আগ্রহের সহিত জমীদারীর কাজকর্ম্ম দেখিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে একদিন শুনিলাম অত্যধিক মদ্যপান নিবন্ধন যকৃতের পীড়ায় রমাপতি শয্যাশায়ী ও আমাকে একবার দেখিতে চায়। ভাবিলাম ভগবান্ পাপীর উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিয়াছেন—উহার বাড়ীতে যাওয়া প্রয়োজন বোধ করিলাম না। সেদিন বিকাল বেলা যখন তাহার ছোট ভাইটি ম্লানমুখে আসিয়া আমাকে পুনরায় রমাপতির কাতর আহ্বান জানাইল—তখন আর নিষ্ঠুর হইয়া থাকিতে পারিলাম না—হাজার হোক একদিন বন্ধু তো ছিল।

রমাপতির ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখি তাহার শয্যাপার্শ্বে সুশীল মাষ্টার বসিয়া আছেন। আমার সমস্ত দেহ জানি না কেন একটা অসীম লজ্জায় শিহরিয়া উঠিল! আমার সহসা থিয়েটারপার্টি উঠাইয়া দেওয়ার কথা লইয়া গ্রামে নানা গুজব রটিয়াছিল—বলা বাহুল্য তাহাতে আমি কর্ণপাত করি নাই। কিন্তু সুশীল মাষ্টার না জানি কি মনে করিয়াছেন! তাঁহার চোখের দিকে চাহিতেও আমার সাহস হইল না! সুশীল মাষ্টারের উপস্থিতির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া রমাপতির সহিত সামান্য দুই চারিটা কথা বলিয়াই স্তব্ধ হইলাম। বার বার মনে হইতে লাগিল উঠিয়া যাই—লজ্জায় সঙ্কোচে গতিরোধ হইল! কোন অপরিহার্য্য বিশেষ কারণ উল্লেখ করিয়া যে বিদায় লইব তাহাও ঘটিয়া উঠিল না। এমন সময় সুশীল মাষ্টার আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "অতুলবাবু! আপনার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে; কয়েকদিন হইতেই যাব যাব মনে করছি, কিন্তু রমাপতি বাবুর অসুখের জন্য সময় করে উঠতে পারি নাই।" আমার হৃৎপিণ্ডটা সজোরে যেন কে নাড়িয়া দিল। এই যুবককে দেখিলে যে কেন এইরূপ হয় বুঝিতে পারি না! আমি স্খলিত স্বরে বলিলাম, "আজ্ঞে আমার ওখানে দয়া করে গেলে সুখী হব।" তারপর আর থাকা আমার পক্ষে অসহ্য হইল। সংক্ষেপে রমাপতির নিকট বিদায় লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। অর্থ, প্রতিপত্তি, সম্মান, ক্ষমতা, সুনাম সবই আমার আছে, তথাপি এই নগণ্য দরিদ্র স্কুলমাষ্টারকে দেখিলে আমার গর্ব্বিত হৃদয় দমিয়া যায় কেন?—রহস্যজটিল প্রহেলিকা!

অপরাহ্ণে অন্তরভরা অস্বাচ্ছন্দ্য লইয়া সুশীল মাষ্টারের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। স্বীয় আত্মাভিমানকে সতর্ক প্রহরীর সঙ্গিনের মত উদ্যত করিয়া রাখিয়াছিলাম, যেন এই সৌম্যকান্তি যুবক আমার মনের উপর তাহার রহস্যময় প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে! এমন সময় সুশীল মাষ্টার উপস্থিত হইলেন। সহজ, সরল ভঙ্গী! তা অবাধ-কপট সারল্যের ভান নহে তো?

কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়াই তিনি বলিতে লাগিলেন, "অতুল বাবু, কর্ত্তব্যের অনুরোধে আজ আপনাকে একটী অনুরোধ কর্‌তে এসেছি! এই রমাপতি বাবু একদিন আপনার বন্ধু ছিল। তার সাংসারিক দুরবস্থার কথা আপনার অবিদিত না থাকাই সম্ভব। ছোট দুইটী ভাই আর বুড়ো মা এদের চালাবার আর কোন উপায় নাই।"

আমি শুষ্ককণ্ঠে বলিলাম "আমাকে আপনি কি করতে বলেন? কৈ, রমাপতি তো কিছু বল্‌লে না? আপনাকে বল্‌তে বলেছে বুঝি?"

"আমাকে?—না, আমি বুঝ্‌তে পেরেই বল্‌ছি! অন্তত পক্ষে আপনাদের এষ্টেটে তাকে একটা চাকরী দিয়ে প্রতিপালন করুন—আমার এ প্রার্থনা আপনার পূরণ কর্‌তেই হবে।"

আমি শান্তকণ্ঠে বলিলাম, "জানেন, এই রমাপতি একদিন আপনার বিরুদ্ধে আমাকে নানা প্রকারে উত্তেজিত করেছে?" সুশীল মাষ্টার নীরব রহিলেন। "আরও জানেন যে সে আমার কি সর্ব্বনাশ করেছে? না, আপনি কি মনে করেন যে আমি দয়া কর্‌বার উপযুক্ত পাত্র?" সুশীল মাষ্টার তথাপি নিরব। এই নিরব উপেক্ষায় আমি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলাম। ম্লানহাস্যে মুখ ফিরাইয়া বলিলাম, "কেবল পরোপকারের খাতিরেই বোধ হয় আমার মত চরিত্রহীনের নিকট এসেছেন, নৈলে আমার মত লোকের সঙ্গে আলাপ করাও বোধ হয় আপনি দোষের মনে করেন।"

আহত সুশীল মাষ্টারের গৌরগণ্ডদ্বয় রক্তিম হইল। কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি বলিলেন, "অতুল বাবু! আপনার সঙ্গে উদ্ধতভাবে তর্ক করা উচিত নয়। আমার সম্বন্ধে যে কোন প্রকার ধারণা করবার আপনার যে অধিকার আছে, তা বাক্যচ্ছটায় ক্ষুণ্ণ কর্‌তে চাই না।

তবে আমার এইটুকু—অনুরোধ আর যাই ভাবুন, এ কখনও ভাববেন না যে আমি মানুষকে ঘৃণা করি।"

"আমি আপনার পাঠশালা ভেঙ্গে দিয়েছি, আপনার সম্বন্ধে নানা প্রকার কুৎসা রটনা করেছি; তবু আপ'নি আমাকে ঘৃণা করেন না?"

"না।"

'আশ্চর্য্য! তবে মনের মত ক'রিয়া ঝগ্‌ড়া করিয়া লইতে পারিলাম না!" কি বলিব বু'ঝতে না পারিয়া উত্তেজনায় ক্ষুব্ধকণ্ঠে ব'ললাম, "জানেন সুশীল বাবু আমি মদ খেয়ে'ছ, আমি আরও অনেক জঘন্য কাজ করেছি—আমার রু'চ অত্যন্ত বিকৃত হয়ে গেছে! যদি আপনার বন্ধুত্বের একটু আশ্রয় পেতাম তা হ'লে হয় তো প্রথম ধাক্কাতেই সামলে নিতাম কিন্তু—; না, প্র'তদিন দিবারাত্র আমি মনের সঙ্গে, বাসনার সঙ্গে, কি ঘোরতর যুদ্ধ কর্‌ছি—আপনি বুঝ্‌বেন না!"

একি? আমি যেন অকস্মাৎ আত্মচৈতন্য ফিরিয়া পাইলাম!—এসব কথা উঠাইলাম কেন? সুশীল মাষ্টার, না জানি কি মনে ক'রিতেছেন! কিন্তু সরল উদার যুবক অত ভাবিলেন না। গভীর সমবেদনায় আমার হাতখানি ধরিলেন—কি শীতল সে পুণ্যস্পর্শ! অবিচলিত অথচ গাঢ় স্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন, "দেখুন অতুলবাবু! সচরাচর আমাদের মধ্যে যে সব কুভাব দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সেগুলি প্রকৃতিগত নয়, অভ্যাস-গত। তাই অনেক কাজ আমরা খারাপ বুঝ্‌তে পেরেও অভ্যাসের তাড়নায় তা করে থাকি। আমি দেখেছি, অনেকে অনুতপ্ত হয়ে—আর কর্‌বো না বলে সঙ্কল্প করেছে—কিন্তু তা ধরে রাখ্‌তে পারে'নি। বোধ হয় মানুষ মাত্রেই এর সত্যতাকে প্রমাণ কর্‌তে সাক্ষ্য দেবে। এই যে অনুতাপ—এই যে ভাল হবার জন্যে একটা ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা—এই যে কু-অভ্যাসগুলি পায়ে দলে দাঁড়াবার একটা চিরন্তন চেষ্টা, এইটেই কি প্রমাণ করে না যে সৎ ও ভাল হওয়াটাই আসল প্রকৃতিগত ভাব, আর যা কিছু ভুল মাত্র—ক্ষণিকের নেশা—শাগ্‌গীরই ছুটে যায়? অনেকে খুব সুন্দর যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে থাকেন ক্রমাগত অন্যায় ও অপকার্য্য কর্‌তে কর্‌তে মানুষের বিবেক নিভে যায়? কিন্তু আমার মনে হয়,

বিবেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের চির জাগ্রত মহিমালোক—অল্প হোক্, বেশী হোক্, আর নিবু-নিবু হোক্—জ্বলবেই। তবে যে মানুষ অন্যায় কাজ বারম্বার করে, তখন বুঝ্‌তে হবে সদসৎ বিচার শক্তি সে হারিয়ে ফেলে নাই—কেবল প্রকৃতি অভ্যাসকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে না বলে; তা বলে অভ্যাসের এমন ক্ষমতা নেই যে বিবেককে একেবারে ডুবিয়ে রাখ্‌বে। তাই দুদিন আগে হোক আর পরে হোক, বিবেক স্ব-মহিমায় একদিন দীপ্ত হয়ে ওঠে—আর সমস্ত অভ্যাস, সমস্ত দুর্ব্বলতা তার স্পর্শে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তখনি পাপী পুণ্যবান হয়—পশু মানুষ হয়—মানুষ দেবতা হয়।” ভাবাবেগে সুশীল মাষ্টার অনর্গল বলিয়া যাইতেছিলেন, সহসা যেন লজ্জিত হইয়া, নিম্নস্বরে বলিলেন “মাপ কর্‌বেন অতুলবাবু! অনেক বাজে বক্‌লাম।”

আমি হাসিয়া বলিলাম “এই রকম বাজে কথা যদি গোড়ায় আপনি মাঝে মাঝে আমায় শোনাতেন, তা’হলে অনেক বাজে কাজের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতাম্।”

“যাক্ সে কথা! তা’হলে রমাপতি বাবুকে একটা চাক্‌রী দেবেন বলুন?”

“কৈ—আপনার স্কুলের কথা তো বল্‌ছেন না? আর পাঠশালার দরকার নেই বুঝি?”

“না—আপনার সঙ্গে আর পেরে উঠ্‌বো না অতুলবাবু! ওসব কথা পরে হবে। আপাততঃ—”

আমি উঠিয়া সুশীল বাবুর হাত ধরিয়া বলিলাম, “আপাততঃ আমায় বন্ধুভাবে গ্রহণ কর্‌তে হবে; তারপর যা যা উচিত বিবেচনা করেন, আমায় আদেশ কর্‌বেন। যদি তা না পারেন তবে বিদায় হ’ন; আপনার কোন কথা শুন্‌তে চাই না।”

সুশীলবাবু গাঢ়স্বরে বলিলেন “আমায় বাঁধবেন না অতুলবাবু! বড়লোকের স্নেহমোহে ভুলে শেষে বা কাজ ভুলে যাই!” আমি বলিলাম, “আমি বড়লোক নই, আমি আপনার বন্ধু—অতুল; আর আপনি আমাদের সুশীল মাষ্টার।”

(সম্পূর্ণ)

স্বপ্নতত্ত্ব।

(১১)

(শ্রীসরসী লাল সরকার)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)*

পাশ্চাত্য দেশে সংগৃহীত স্বপ্ন বৃত্তান্তের তালিকা আলোচনা করিলে কতকগুলি নূতন রকমের স্বপ্নের ঘটনা লিপিবদ্ধ দেখা যায়। ঐগুলির বিশেষত্ব এই যে—একাধিক ব্যক্তি একই রাত্রে একই প্রকার স্বপ্ন দেখিয়াছে। বিখ্যাত দার্শনিক হেনরী বার্গসোঁ স্বপ্নতত্ত্বের যেরূপ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং যে ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করা গিয়াছে, সেরূপ কোন ব্যাখ্যা দ্বারা এই একাধিক লোকের যুগপৎ স্বপ্নদর্শনের মীমাংসার কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না। যাহাহউক নিম্নে এইরূপ স্বপ্নদর্শন সম্বন্ধে কতকগুলি বিবরণ সংগৃহীত করিয়া দেওয়া হইতেছে।

লেখকের এইরূপ একটি সত্য স্বপ্নের বিবরণ জানা আছে, যাহাতে একজন মৃতব্যক্তি যিনি অল্পদিন ইহধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে একই রাত্রে তিনজন বিভিন্ন ব্যক্তি তিনটি পৃথক্‌স্থান হইতে স্বপ্নে দেখেন। তাঁহার একজন আত্মীয় তাঁহাকে কলিকাতা হইতে স্বপ্নে দেখেন। তাঁহার আর একজন আত্মীয় কুমারখালি হইতে তাঁহাকে স্বপ্নে দেখেন। মৃতব্যক্তির নিজগ্রামস্থ একজন সেই গ্রামেই তাঁহাকে স্বপ্নে দেখেন। বোধ হয় যেন সেই রাত্রে এই মৃতব্যক্তিটি তাঁহার সূক্ষ্মশরীরে পরলোক ছাড়িয়া ইহধামে আসিয়া তাঁহার তিনজন আত্মীয়লোককে স্বপ্নে দর্শন দিয়া সান্ত্বনা দান করিয়া যান।

মনস্তত্ত্বসভা হইতে প্রকাশিত কোনও পুস্তকে লিপিবদ্ধ এইরূপ একটি ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।— *

* ২১ বর্ষ-৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ মাসের উদ্বোধন দ্রষ্টব্য।

* Phantasms of Living, II, 382.

পেনিন্‌সুলার যুদ্ধের (Peninsular war) সময় দুই ভ্রাতা যুদ্ধ শিখিবার জন্য ডোভারে (Dover) আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের পিতা মিঃ সুইদিনব্যাঙ্ক (Mr Swithinbank) ও ছেলেদের দেখিবার জন্য ডোভারে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্যান্য পরিবারবর্গ ব্রাডফোর্ড (Bradford) সহরে তাঁহাদের নিজের বাড়ীতে ছিলেন। দুই ভাই সৈন্যাবাসের পৃথক্ স্থানে শয়ন করিতেন। তাঁহাদের পিতাও একটি পৃথক্ স্থানে শয়ন করিতেন।

একদিন সকালে পিতার পুত্রদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পিতা বলিলেন, কল্যরাত্রে আমি একটি নূতন রকমের স্বপ্ন দেখিয়াছি। তাহা শুনিয়া এক ভাই বলিলেন, আমি এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। আর এক ভাই বলিয়া উঠিলেন যে, আমিও স্বপ্ন দেখিয়াছি যেন আমাদের মাতা মৃতা হইয়াছেন। ইহাতে আর দুইজন আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কারণ তাঁহারাও ঠিক ঐ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। যেদিন এই স্বপ্ন দৃষ্ট হইয়াছিল, সেই দিনই তাঁহাদের মাতার মৃত্যু হইয়াছিল।

মিসেস্ ক্রো তাঁহার একখানি পুস্তকে সত্য স্বপ্নের অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। * সেই পুস্তকে নিম্নলিখিত স্বপ্ন বিবরণটি নিজের জানা ঘটনা বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঘটনাটি এইরূপ:—

ইংলণ্ডের একটি নগরে মাতা ও কন্যা একই বিছানায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। মাতা স্বপ্নে দেখিলেন যে তাঁহার ভগিনীপতি যেন তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহার ভগিনীপতি তখন আয়ারলণ্ডে ছিলেন। তিনি যেন তাঁহার ভগিনীপতিকে দেখিতে আয়ারলণ্ডে গিয়াছেন। তিনি ভগিনীপতির ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে শয্যাশায়ী এবং আসন্ন মৃত্যুর অবস্থায় দেখিলেন। ভগিনীপতি তাঁহাকে স্নেহচুম্বন দিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি ভগিনীপতির পাংশু, শীর্ণ, মৃতপ্রায়

* The Night Side of Nature—by Mrs. Crowe.

অবস্থা দেখিয়া চুম্বন দিতে ভয় পাইলেন এবং এই দৃশ্য দেখিয়া ভয় পাইয়া জাগ্রত হইলেন। ঠিক এই সময় তাঁহার কন্যাও জাগ্রত হইলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখিলাম! তাহাতে তাঁহার মা বলিয়া উঠিলেন, আমি আমার ভগিনীপতিকে স্বপ্নে দেখিতেছিলাম। কন্যা বলিলেন, আমিও তাঁহাকেই স্বপ্নে দেখিতেছিলাম। আমি স্বপ্নে দেখিলাম যেন আমি বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, সেই সময় আমার মেসোমহাশয় শবমোড়া কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—প্রিয় তোমার মাতা আমাকে চুম্বন দিতে অস্বীকার করিলেন। আমি নিশ্চয় জানি তুমি আমার প্রতি এরূপ নির্দ্দয় হইবে না।

পরদিন সকালে উঠিয়া মাতা আয়র্লণ্ডের খবরের কাগজে জন্ম মৃত্যুর সংবাদ খুঁজিয়া দেখিতে দেখিতে তাঁহার ভগিনীপতির মৃত্যু সংবাদ তাহাতে লিপিবদ্ধ দেখিলেন; পরে সংবাদ লইয়া জানিলেন, যে রাত্রে তাঁহারা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সেই রাত্রেই তাঁহার ভগিনীপতি ইহধাম ত্যাগ করেন। স্বপ্নের এইটি আশ্চর্য্য ঘটনা যে কন্যাদৃষ্ট স্বপ্ন যেন তাহার মাতার দৃষ্টস্বপ্নের পরিশিষ্ট, কিম্বা যেন নাটকের পরের অঙ্কের মতন দেখান হইতেছে।

অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত স্বপ্নবিষয়ক মতামত একটি পুস্তকে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আছে।* অসভ্যজাতিগণের মধ্যে বিশ্বাস যে আমরা যখন স্বপ্ন দেখি, তখন আমাদিগের আত্মা আমাদিগের জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। যে আত্মা নিদ্রিত দেহ পরিত্যাগ করে; তাহার সহিত অনেক সময় মৃতব্যক্তিদিগের আত্মার সহিত সাক্ষাৎ হয়। এই আত্মা দেহ পরিত্যাগ করিয়া অনেক জিনিস দেখিতে পায়, যাহা আমরা দৈহিক জীবনে দেখিতে পাই না। এই সব দৃশ্যগুলিই স্বপ্নদৃশ্যের ভিত্তি। ইহাও একটি আশ্চর্য্যের বিষয় যে পৃথিবীর বিভিন্ন অসভ্য

* Tylor—Primitive Culture.

জাতিদিগের মধ্যে স্বপ্ন বিষয়ে প্রচলিত এই বিশ্বাসের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

যদিও আমরা আমাদের সাধারণ স্বপ্ন আলোচনা করিলে, অসভ্য জাতিদিগের এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করি না, কিন্তু অসাধারণ স্বপ্নবৃত্তান্ত আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলে, এই সভ্য যুগের পূর্ব্বতন যুগের প্রচলিত বিশ্বাস যেন বাধ্য হইয়া আমাদের গ্রহণ করিতে হয়।

নিম্নে দুইটি মহিলার যুগপৎ একই প্রকার স্বপ্ন দর্শনের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। এই স্বপ্নবিবরণটি মনস্তত্ত্ব-সভায় প্রকাশিত একটি পুস্তক * হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এইরূপ স্বপ্নের ঘটনা অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাসকে কিরূপ দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে তাহা পাঠকবর্গ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। বৃত্তান্তটি এইরূপ:—

"১৮৮৩ সালের ১০ই জুন রাত্রে আমি নিম্নলিখিত স্বপ্নদর্শন করিয়াছিলাম। আমাকে কে যেন বলিল যে মিস্ ইলিয়ট্ (Miss Elliot) মরিয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ স্বপ্নেই যেন তাহার ঘরের দিকে দৌড়াইয়া গেলাম, ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার বিছানার নিকট উপস্থিত হইলাম। তাহার মুখের উপর হইতে কাপড় টানিয়া লইলাম। তাহার শরীর একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে দেখিলাম। তাহার চক্ষু দুইটি বিস্তৃত ভাবে খোলা রহিয়াছে। একদৃষ্টে ঘরের ছাদেরদিকে তাকান রহিয়াছে। ইহাতে আমি এত ভয় পাইলাম যে বিছানার পায়ের নিকট বসিয়া পড়িলাম। তাহার পর আমি কিছুই জানি না। জাগিয়া দেখি যে আমার ঘরে শুইয়া রহিয়াছি। বিছানা হইতে আমার শরীর অর্দ্ধেক বাহিরে পড়িয়া গিয়াছে। তখন ঘড়িতে ৫টা বাজিয়াছে। আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার অগ্রেই এই অসন্তোষকর স্বপ্ন বিবরণ আমার ভগ্নীকে বলিয়া ছিলাম।"

উপরোক্ত স্বপ্ন বিবরণ মনস্তত্ত্ব সভার পত্রিকায় মিস্ কনষ্টান্স বিভানের

* Phantasms of The Living.

(Miss Constance Bevan) স্বাক্ষর প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার ভগ্নী মিস্ এলসি বিভান (Miss Elsie Bevan) সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, তাঁহার ভগ্নী সকাল বেলা তাহাদের শয়ন করিবার ঘর পরিত্যাগ করিবার পুর্ব্বেই এই স্বপ্ন তাহাকে বলিয়াছিলেন।

মিস্ ইলিয়ট্ যাহার মৃত্যুর বিষয় মিস্ বিভান স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তিনি মৃতা হয়েন নাই জীবিতা ছিলেন। মনস্তত্ত্বসভার পত্রিকায় মিস্ ইলিয়টের কথিত বিবরণ এইরূপ প্রকাশ হইয়াছে।—

"আমি ১০ই জুন প্রাতঃকালে জাগিয়া চিৎ হইয়া ঘরের ছাদের দিকে তাকাইয়া শয়ন করিয়াছিলাম। সেই সময় আমি যেন দরজার শব্দ শুনিতে পাইলাম। তাহার পর বোধ হইল কেহ যেন ঘরে প্রবেশ করিল এবং আমার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু এত অধিক ঝুঁকে নাই, যাহাতে আমার চক্ষুর এবং ঘরের ছাদ-যাহার প্রতি আমি তাকাইয়াছিলাম, এই উভয়ের মধ্যে আসিয়া পড়ে। বুঝিতে পারিলাম, মিস্ কনষ্টান্স্ আসিয়াছে, সেই জন্য আমি মোটেই নড়িলাম না। কিন্তু সে আমাকে চুম্বন না করিয়া হঠাৎ যেন নিজেকে সরাইয়া লইল এবং বিছানার পায়ের দিকে গুঁড়ি মারিয়া বসিল। ইহাতে আমি বড়ই আশ্চর্য্যবোধ করিলাম। আমি যে ঠিক জাগ্রত আছি তাহা নিজের নিকট প্রমান করিবার জন্য নিজের চক্ষু অনেকবার খুলিলাম ও মুদ্রিত করিলাম। তাহার পর আগন্তুক দরজাটি খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছে কিনা দেখিবার জন্য ঘাড় ফিরাইলাম, কিন্তু দেখিলাম দরজা তখনও বন্দ রহিয়াছে। ইহাতে আমার মনের মধ্যে এক প্রকার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। আমি আর সেই মূর্ত্তিটির দিকে তাকাইতে সাহস করিলাম না। সেই মূর্ত্তিটি গুড়িগুড়ি হইয়া সেই অবস্থায় বসিয়াছিল এবং আস্তে আস্তে আমার পায়ের উপর হইতে বিছানার কাপড় সরাইতে ছিল। আমি পাশের ঘরের লোককে ডাকিবার জন্য চেষ্টা করিলাল, কিন্তু আমার গলা দিয়া মোটে আওয়াজ বাহির হইল না। এই মুহূর্ত্তে সে যেন আমার পা আল্‌গা করিয়া স্পর্শ করিল। ইহাতে যেন আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একটি ঠাণ্ডা স্রোত বহিয়া

গেল। ইহার পর, যে পর্য্যন্ত না আমি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া কন্‌ষ্টান্সকে খুঁজিয়া ছিলাম তাহার মধ্যে আমার কিছুই মনে নাই; কারণ, যে পর্য্যন্ত না আমার এই ঘরের দুইটি দরজাই ভিতর দিক হইতে বন্ধ আছে, এইটি না লক্ষ্য করিয়াছিলাম, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার বোধ হইয়াছিল যে কন্‌ষ্টান্স নিশ্চয়ই ঘরের মধ্যে আছে। সেই সময় ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, ৫টা বাজিয়া কয়েক মিনিট হইয়াছে মাত্র।"

সেই বাড়ীর মিস্ আণ্টোনিয়া বিভান (Miss Antonia Bevan) সাক্ষ্য দিয়াছিলেন যে মিস্ ইলিয়ট্ সকালে উঠিয়াই কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে এই অসন্তোষকর স্বপ্নের বিবরণটি বলিয়া ছিলেন। মিস্ ইলিয়ট্ কি অবস্থার ভিতর দিয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ এই অবস্থাটিকে স্বপ্নাবস্থা বলা উচিৎ কি জাগ্রতাবস্থা বলা উচিৎ, মনস্তত্ব সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার স্থির মীমাংসা করেন নাই। যাহা হউক মিস্ ইলিয়টের এই অভিজ্ঞতার সহিত মিস্ কন্‌ষ্টান্স বিভানের স্বপ্নের আশ্চর্য্য মিল দেখা যায়।

পরে একটি প্রবন্ধে আমাদের দেখাইবার ইচ্ছা আছে যে স্বপ্নে আমাদের সূক্ষ্মদেহ নিদ্রিত জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে পারে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রকার স্বপ্নের ঘটনা পরে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। উপরোক্ত স্বপ্নের ঘটনায় মিস্ কন্‌ষ্টান্স বিভানের সূক্ষ্মদেহ, মিস্ ইলিয়টের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, এইরূপ অনুমান হয়।

এইরূপ জীবিত কিম্বা মৃতব্যক্তির সূক্ষ্মদেহঘটিত স্বপ্নে একাধিক লোকের যুগপৎ একই স্বপ্নদর্শনের বহু দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু আর এক শ্রেণীর যুগপৎ স্বপ্নদর্শন আছে যাহা উপরোক্ত গুলির মত সূক্ষ্মদেহের সিদ্ধান্ত দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। নিম্নে এই শ্রেণীর কতকগুলি স্বপ্নের ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। যাঁহারা এই সকল স্বপ্ন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা কি ভাবে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও স্বপ্নের সঙ্গে দেওয়া যাইতেছে। তবে

তাঁহাদের এই ব্যাখ্যাগুলি যে ঠিক একথা বলা যায় না। এই প্রবন্ধের শেষভাগে এই সব স্বপ্নের যে অন্য প্রকার ব্যাখ্যা সম্ভব তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইবে।

ডান্টজিগ (Dantzig) হোটেলে একদিন ঝড়ের রাত্রে, যে সমস্ত যাত্রী রাত্রিবাস করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই এক স্বপ্ন দেখেন যে একটী গাড়ী ঘড়্ ঘড়্ শব্দ করিয়া কতকগুলি যাত্রী লইয়া হোটেলের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল।*

এই স্বপ্নের এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয় যে ঝড়ের রাত্রে ঝড়ের জন্য যে শব্দ হইতেছিল তাহা নিদ্রিতাবস্থার ভিতরই অনেকের অনুভূতিগোচর হইয়াছিল। এই অস্ফুট অনুভূতি ধরিয়া তাহার ব্যাখ্যার হিসাবে এই স্বপ্নের সৃষ্টি হইয়াছিল। স্বপ্নদর্শনকারী সকলেই সম অবস্থাপন্ন। সেই জন্য তাহাদের একই প্রকার অনুভূতি একই প্রকার স্বপ্নের সৃজন করিয়াছিল।

পরদিন সকালে অধিকাংশ যাত্রী প্রত্যেকে আসিয়া হোটেলের চাকরের কাছে এই প্রকার যাত্রী আসিবার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে আশ্চর্য্য করিয়াছিলেন এবং ইহা হইতে জানা গিয়াছিল যে সকল যাত্রীই একই স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন।

বুরড্যাক (Burdach) এই স্বপ্নের কথা উল্লেখ করিয়া নিজের একটী স্বপ্নের কথা বলিয়াছেন। তিনি একদিন ঝড়ের রাত্রে একটি সরাইএ থাকেন। তথায় স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি একটি উচ্চ পাহাড়ের ধার দিয়া অন্ধকার রাত্রে গাড়ী হাকাইয়া যাইতেছেন। একজন সহযাত্রী তাঁহার সঙ্গে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। এই সহযাত্রীটিও ঐ সরাইএ রাত্রে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তিনিও ঐ স্বপ্ন দেখেন।

বহুলোকের একই স্বপ্ন দেখিবার বিষয়ে নিম্নলিখিত ঘটনাটি কিছু কৌতূহলপ্রদ, কারণ এই বহুলোকদৃষ্ট স্বপ্নটি মিথ্যা হইয়াছিল। *

মিসেস্ অগিলভি (Mrs Ogilvie) নামক একটি স্ত্রীলোকের ফ্যাণ্টি

---

* Nudow—Versiwch einer Theorie des Schlafs.

(Fanti) নামে একটি ছোট কুকুর ছিল। মিসেস্ অগিলভির একটি পুত্র এবং তিনটি কন্যা ছিল। মিসেস্ অগিলভি বৃদ্ধা হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহার নিজের ঘরেই প্রাতরাশ খাইতেন। যেদিনের স্বপ্ন বিবরণের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে সেদিন তাঁহার ছোট দুইটি কন্যা অন্য এক জনের বাড়ীতে গিয়াছিল এবং সেই খানেই রাত্রিবাস করিয়াছিল।

সকাল বেলা যখন নীচের ঘরে মিসেস্ অগিলভির বড় মেয়ে এবং ছেলে প্রাতরাশ খাইতে বসিয়াছিল, তখন ছেলে তাহার ভগ্নীকে বলিল, "আমি রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি যে ফ্যান্টি পাগল হইয়াছে।"

তাহা শুনিয়া ভগ্নী বলিল, "কি আশ্চর্য্য আমিও ঠিক উহাই স্বপ্নে দেখিয়াছি। কিন্তু দেখ, এ সব কথা মাকে বলা হইবে না। কারণ তাহা হইলে তিনি ব্যস্ত হইবেন।"

কিছুক্ষণ পরে এই মেয়ে যখন তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল, তখন তাহার মাতা বলিলেন, "দেখ ফ্যান্টিকে সাবধান করিয়া রাখিও, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন সে পাগল হইয়াছে।"

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে তাহাদের ছোট ভগ্নীদ্বয় ঐ রাত্রে বাড়ীতে ছিল না। তাহারা ফিরিয়া আসিলে, তাহারা কেমন আরামে কাটাইয়াছে জিজ্ঞাসা করাতে একজন উত্তর দিল যে "সেখানে নিদ্রা ভাল হয় নাই। আমি স্বপ্নে দেখিতেছিলাম যে ফ্যান্টি পাগল হইয়াছে, এমন সময় ভগ্নী আমাকে জাগাইয়া বলিল যে "দেখ দিদি, আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে ফ্যান্টি পাগল হইয়া গিয়াছে এবং তাহার পর সে একটি বিড়াল হইয়া গেল, তখন আমরা তাহাকে আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিলাম।"

বাড়ী শুদ্ধ সকলেই এইরূপ স্বপ্ন দেখিলেন বটে, কিন্তু ফ্যান্টি কুকুরটি বহুদিন বাঁচিয়া ছিল। পাগলও হয় নাই, কিম্বা কাহারও কোন অনিষ্টও করে নাই।

* The Book of Dreams and Ghosts—by Andrew Lang. p. 4

এই স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা হইতে পারে, যে হয়ত স্বপ্নের দিন ফ্যাণ্টির ব্যবহারে এমন কিছু অস্বাভাবিকত্ব হইয়াছিল যাহা কেহ জাগ্রত জ্ঞানের মধ্যে স্পষ্ট ধরিতে পারেন নাই, কিন্তু অজ্ঞাত মনের দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই অজ্ঞাতমনের ধারণা সকলের মনেই হইয়াছিল এবং সেই ধারণা সকলের মনে একই প্রকার স্বপ্নের সৃষ্টি করিয়াছিল। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে যে অনেকটা কষ্টকল্পনা রহিয়াছে, তাহা পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন। (ক্রমশঃ)

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

বাসনাক্ষয়-প্রকরণ।

(অনুবাদক শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সেই স্থলেই লোকে অহঙ্কারপরবশ হইয়া কি প্রকার চিন্তা করে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ (গীতা-১৬।১৩-১৬)

অদ্য আমার এই লাভ হইল, এবং এই অভিলষিত প্রিয়বস্তু পরে পাইব; আর আমার এই ধন আছে এবং পুনরায় ঐ ধন আমার হইবে।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥

ঐ শত্রু আমি বিনাশ করিয়াছি এবং অপর যে সকল শত্রু আছে

তাহাদিগকেও আমি বিনাশ করিব, আর আমি কর্ত্তা, আমি ভোগী, আমি কৃতকৃত্য, আমি বলবান্ এবং আমি সুখী।

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥

আমি ধনবান্ কুলীন; আমার তুল্য আর কে আছে? আমি যজ্ঞ করিব আমি দান করিব, আমি আনন্দ করিব, এই প্রকারে অজ্ঞান দ্বারা বিমোহিত হইয়া থাকে।

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥

বিবিধ প্রকারের অভিলাষবশতঃ বিক্ষেপপ্রাপ্ত হইয়া এবং মোহময় জাল-দ্বারা মৎস্যের ন্যায় সমাবৃত হইয়া এবং কামোপভোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া তাহারা অশুচি নরকে পতিত হয়।

ইহা দ্বারা এইরূপ অহঙ্কার যে পুনর্জন্মলাভের কারণ, তাহা বর্ণিত হইল। তাহা আবার সবিস্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥ (গীতা ১৬।১৭।১৯)

তাহারা (সাধুদিগের কর্তৃক পূজিত না হইয়া) আপনাদিগের দ্বারা বিবিধগুণোপেত বলিয়া পূজিত হয়। তাহারা অনম্রস্বভাব, এবং ধনাদিজনিত মান ও অহঙ্কারবিশিষ্ট হয়। তাহারা কপটতা বা বাহ্যিক আড়ম্বরযুক্ত নামমাত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, এবং সেই সকল অনুষ্ঠান ও শাস্ত্রবিহিত প্রণালীতে সম্পাদন করে না।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥

তাহারা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধবিশিষ্ট হইয়া এবং পরগুণে দোষাবিষ্কারপরায়ণ হইয়া স্বদেহে ও পরদেহে (তৎতৎ বুদ্ধি ও কর্ম্মের সাক্ষীভূত) আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥

সেই মদ্বিদ্বেষী ক্রূরস্বভাব পাপকর্ম্মকারী নরাধমদিগকে আমি পুনঃ পুনঃ সংসারে অতিক্রূর ব্যাঘ্রাদি যোনিতেই নিক্ষেপ করিয়া থাকি।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিমিতি॥

হে কৌন্তেয় সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ জন্মে জন্মে আসুরী যোনিতে জন্মলাভ করিয়া আমাকে না পাইয়া তদপেক্ষা অধিকতর নিকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে যাহাকে শুদ্ধবাসনা বলে, তাহাতে জ্ঞাতব্য বস্তুর জ্ঞান থাকে। অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বস্তুর জ্ঞানেই শুদ্ধ বাসনার লক্ষণ। সেই জ্ঞাতব্য বস্তু কি প্রকার, তাহা ভগবান্ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন।

(১৩।১২।১৭)

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥

যে বস্তুকে জানিতে হইবে তাহা আমি প্রকৃষ্ট রূপে বর্ণনা করিব। তাহাকে অবগত হইয়া লোকে অমৃতলাভ করে; তাহা আদিহীন পরব্রহ্ম, তাহাকে পণ্ডিতগণ না সৎ না অসৎ এইরূপ বর্ণনা করেন।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্ত পদ, সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সর্ব্বত্রই তিনি শ্রবণশক্তি সম্পন্ন, তিনি সকল বস্তু ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥

তিনি ইন্দ্রিয়গণের রূপরসাকারাদিবৃত্তিতে প্রকাশমান হইয়াও সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত, তিনি সর্ব্বসংশ্লেষ-রহিত হইয়াও সকলের ধারক এবং সত্ত্বাদিগুণ-রহিত হইয়াও সুখদুঃখাদিরূপে পরিণত গুণসমূহের উপলব্ধিকর্ত্তা।

বহিরন্তশ্চভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥

তিনি (চরাচর) ভূতগণের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত আছেন, তিনি চলিষ্ণু ও অচল, তিনি সূক্ষ্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া দুরধিগম্য। যতদিন অবিদিত থাকেন ততদিন তিনি সুদূরে অবস্থিত এবং বিদিত হইলে অতি নিকটবর্ত্তী (আত্মা)।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥

তিনি অবিভক্ত হইয়াও সকভূতে বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত আছেন। সেই জ্ঞেয় বস্তুই ভূতসমূহের অবস্থিতিকালে তাহাদের ধারক প্রলয়কালে তাহাদের ভক্ষক, এবং উৎপত্তিকালে তাহাদের উৎপাদক।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পারমুচ্যতে।

যিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থেরও জ্যোতিস্বরূপ, যিনি অজ্ঞান হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

এ স্থলে তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণ এই উভয় প্রকার লক্ষণ দ্বারা যাহাতে পরমাত্মাকে অবগত হইতে পারা যায় এই নিমিত্ত পরমাত্মার সোপাধিক ও নিরুপাধিক এই উভয় প্রকার স্বরূপই বর্ণিত হইয়াছে। যাহা কোনও সময়ে (অর্থাৎ আগন্তুক ভাবে) (লক্ষয়িতব্য বস্তুর সহিত) সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে লক্ষিত করে তাহার নাম তটস্থ লক্ষণ। যথা দেবদত্তনামক ব্যক্তিবিশেষকে বুঝাইতে হইলে তাহার গৃহ তাহার তটস্থ লক্ষণ। (১) যাহা তিন কালেই (ভূত, বর্ত্তমান্ ও ভবিষ্যতে) লক্ষয়িতব্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট থাকিয়া তাহাকে লক্ষিত করে তাহা স্বরূপ লক্ষণ। যেমন চন্দ্রকে বুঝাইতে হইলে 'প্রকৃষ্ট প্রকাশ' তাহার স্বরূপ লক্ষণ।

(এস্থলে একটী আপত্তি উঠিতেছে—)

আচ্ছা বাসনার লক্ষণ করিবার কালে "পূর্ব্বাপর বিচার ত্যাগরূপ স্বভাব ধরিয়া বাসনার লক্ষণ করা হইয়াছে ৩পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। জ্ঞাতব্য বস্তুর জ্ঞানই

(১) 'দেবদত্তকে ?' এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা যায় "এই গৃহ যাঁর তিনি দেবদত্ত," তাহা হইলে গৃহ দেবদত্তের তটস্থ লক্ষণ হইল।

শুদ্ধবাসনার লক্ষণ এইরূপ বলা হইয়াছে এবং সেই জ্ঞান বিচার হইতেই জন্মে। সুতরাং বিচার শূন্য না হইলে যদি 'বাসনা' না হয় তবে এই শুদ্ধবাসনা বিচারযুক্ত হইয়া কিরূপে বাসনাশব্দবাচ্য হইল? শুদ্ধবাসনায় লক্ষণও খাটিতেছে না।

উত্তর—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না, কেন না বাসনার লক্ষণ করিবার কালেও (৩পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) দৃঢ় সংস্কারের সহিত এই শব্দগুলি লক্ষণে সংযোজিত হইয়াছে। যেমন অহঙ্কার, মমকার, কাম ক্রোধ প্রভৃতি মলিন বাসনা (পূর্ব্ব পূর্ব্ব) বহুজন্মে দৃঢ়রূপে ভাবিত হওয়াতে এই জন্মে পরের উপদেশ বিনাই উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ তত্ত্বের প্রথমোৎপন্ন জ্ঞান বিচারজন্য হইলেও সেই তত্ত্ব দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর আদরের সহিত ভাবিত হওয়াতে পরবর্ত্তিকালে, সম্মুখবর্ত্তী ঘটের ন্যায় বাক্য, যুক্তি পরামর্শ বিনাই একেবারে স্ফূরিত হইয়া থাকে। জ্ঞানের সেই প্রকার অনুবৃত্তির সহিত মিলিত যে ইন্দ্রিয়ব্যবহার তাহারই নাম শুদ্ধবাসনা এবং সেই শুদ্ধবাসনা কেবল দেহধারণ ও জীবন রক্ষার নিমিত্ত উপযোগী হয়; তাহা দম্ভ, দর্প প্রভৃতি আসুরীসম্পৎ কিম্বা জন্মান্তরের হেতু ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। যেরূপ ব্রীহিপ্রভৃতির বীজ ভাজা হইলে তদ্দ্বারা কেবল শস্যাগার (মরাই) পূর্ণ করা চলিতে পারে তদ্দ্বারা রুচিকর অন্ন কিম্বা (নূতন) শস্য উৎপাদিত হইতে পারে না সেইরূপ।

মলিন বাসনা তিন প্রকার যথা—লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা, দেহবাসনা।

সকল লোকে যাহাতে আমার নিন্দা না করে বা আমাকে স্তুতি করে, আমি সর্ব্বদা সেইরূপ আচরণ করিব এইরূপ প্রবল ইচ্ছার নাম লোক-বাসনা। সেইরূপ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করা অসাধ্য বলিয়াই উক্ত বাসনা মলিন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দেখ বাল্মীকি (নারদকে) "কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান" (রামায়ণ বালকাণ্ড ১।১) অধুনা (এই) সংসারে কোন ব্যক্তি গুণবান্ বীর্য্যবান্ ইত্যাদি (বিশেষণ সমূহের) দ্বারা নানাপ্রকারে প্রশ্ন করিলেন। নারদ সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন "ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রাম নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।" "ইক্ষ্বাকু

বংশসম্ভূত সর্ব্বজনবন্দিত রামই সেইরূপ ব্যক্তি।" সেইরূপ রামচন্দ্রেরও এবং পতিব্রতাশিরোমণিভূতা জগন্মাতা সীতারও এরূপ লোকাপবাদ রটিল, যে তাহা কানে শুনা যায় না, অন্যের কথা কি বলিব? আরও দেখ বিশেষ বিশেষ দেশের মধ্যে পরস্পর প্রচুর নিন্দাবাদও শুনা যায়। দাক্ষিনাত্য—ব্রাহ্মণগণ উত্তর দেশীয় (আর্য্যাবর্ত্ত বাসী) বেদবিদ্ ব্রাহ্মণদিগকেও মাংসাহারী বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন এবং তাঁহারাও আবার দাক্ষিণাত্য-ব্রাহ্মণদিগকে মাতুলকন্যা বিবাহ করে এবং যাত্রাকালে মৃত্তিকানির্ম্মিত (রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যবহৃত?) পাত্রাদি বহন করে বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। আবার দেখ ঋগ্বেদীয়গণ কণ্বশাখা অপেক্ষা আশ্বলায়নশাখাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিয়া থাকেন কিন্তু বাজসনেয়ীগণ (শুক্লযজুর্ব্বেদীগণ) তাহার বিপরীত মনে করেন।

এইরূপ, নিজ নিজ কুল, গোত্র, বন্ধুবর্গ, ইষ্টদেবতা প্রভৃতির প্রশংসা এবং পরকীয়ের নিন্দা, বিদ্বান্ হইতে আরম্ভ করিয়া স্ত্রীজাতি ও রাখাল পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই প্রচলিত আছে।

ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন :—

শুচিঃ পিশাচো বিচলো বিচক্ষণঃ।
ক্ষমোঽপ্যশক্তো বলবাংশ্চ দুষ্টঃ॥
নিশ্চিন্তচোরঃ সুভগোঽপি কামী।
কো লোকমারাধয়িতুং সমর্থঃ?॥ ইতি

[লোকে শুচি ব্যক্তির, পিশাচ (বা যক্ষ) নাম রটাইয়া থাকে, বিচক্ষণ ব্যক্তিকে গর্ব্বিত বলিয়া নিন্দা করে, ক্ষমাশীল ব্যক্তিকে (প্রতীকারে) অক্ষম বলে, বলবান্ ব্যক্তিকে দুষ্ট (নিষ্ঠুর) বলে, চিন্তাহীন (আত্মসমাহিত) ব্যক্তিকে চোর বলে এবং সুদর্শন ব্যক্তিকে কামী বলে। সংসারে কোন্ ব্যক্তি সকল লোককে তুষ্ট করিতে পারে?]

"বিদ্যতে ন খলু কশ্চিদুপায়ঃ সর্ব্বলোকপরিতোষকরো যঃ।"
সর্ব্বথা স্বহিতমাচরণীয়ং কিং করিষ্যতি জনো বহুজল্পঃ ।২॥ ইতি চ

[যদ্দ্বারা সংসারের সকল লোককেই তুষ্ট করা যাইতে পারে এইরূপ কোনও উপায় নাই। সেইহেতু সর্ব্বপ্রকারে নিজের কল্যাণসাধন করিবে।

(সংসারের) লোক নানা কথাই কহিয়া থাকে ; তাহারা তোমার কি করিবে ?]

এইহেতু, লোকবাসনা একটি মলিন বাসনা, উহাই বুঝাইবার উদ্দেশ্যে, মোক্ষশাস্ত্রসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে যিনি যোগীশ্রেষ্ঠ তিনি নিন্দা ও স্তুতিতে নির্বিকার থাকেন।

শাস্ত্রে বাসনা তিনপ্রকার (যথা)—

পাঠবাসন (পাঠাসক্তি) শাস্ত্রবাসন (বিবিধ বিদ্যাসক্তি) ও অনুষ্ঠান-ব্যসন।

ভরদ্বাজে পাঠব্যসন দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ভরদ্বাজ তিন জন্মে সমস্ত পুরুষায়ুষ্কাল ধরিয়া বেদ অধ্যয়ন করিয়া চতুর্থ জন্মে ইন্দ্রকর্তৃক প্রলোভিত হইয়া, সেই জন্মেও অবশিষ্ট বেদসমূহ অধ্যয়ন করিতে উদ্যম করিয়াছিলেন। সেই পাঠও অসাধ্য বলিয়া তদ্বিষয়ক বাসনা মলিনবাসনা। ইন্দ্র তাঁহাকে সেই উদ্যমের অসাধ্যতা বুঝাইয়া দিলেন এবং পাঠ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য সগুণ ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিলেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সেইরূপ বহু শাস্ত্রপাঠে আসক্তি ও মলিন বাসনা, কেননা তাহাতে চরম পুরুষার্থ লাভ হয় না। কাবাষর গীতায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায় :—

"কশ্চিন্মুনির্দুর্বাসা বহুবিধশাস্ত্রপুস্তকভারৈঃ সহ মহাদেবং নমস্কর্তুং

টীকা। এই গ্রন্থের অন্যান্য প্রতিলিপিতে—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার অনুবাদঃ—কথিতআছে ভরদ্বাজ তিন আয়ুষ্কাল ধরিয়া (কেবল) ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়াছিলেন। তিনি জীর্ণকায় ও বৃদ্ধ হইয়া শয়ান আছেন এমন সময়ে ইন্দ্র তাঁহার নিকটে গমন করিয়া কহিলেন "ভরদ্বাজ যদি তোমাকে চতুর্থ আয়ুষ্কাল প্রদান করি, তবে তুমি তাহা পাইলে কি কর ? তিনি বলিলেন "তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করি। তখন ইন্দ্র তাহাকে তিনটি পর্ব্বত সদৃশ অপঠিত গ্রন্থরাশি দেখাইলেন। সেই তিন গ্রন্থরাশি হইতে এক এক মুষ্টি লইয়া ভরদ্বাজের সন্নিকটে গিয়া তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া কহিলেন ভরদ্বাজ ইহাদের সকলগুলিই বেদ জানিও।

মাগতস্তৎসভায়াং নারদেন মুনিনা ভারবাহীগর্দ্দভসাম্যমাপাদিতঃ কোপাৎ পুস্তকানি লবনার্ণবে পরিত্যজ্য মহাদেবেনাত্মবিদ্যায়াং প্রবর্ত্তিতঃ ইতি।

দুর্ব্বাসা নামে কোনও মুনি বহুবিধশাস্ত্রপুস্তকের বোঝা লইয়া মহাদেবকে নমস্কার করিতে আসিয়াছিলেন। সেই সভায় নারদমুনি তাঁহাকে ভারবাহী গর্দ্দভের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্ব্বাসা পুস্তকের বোঝা লবণসমুদ্রে ফেলিয়া দিলেন। তদনন্তর মহাদেব তাঁহাকে আত্মবিদ্যায় প্রবৃত্ত করিয়া দিলেন। যে ব্যক্তি অন্তর্মুখ নহে ও গুরুকৃপায় বঞ্চিত তাহার কেবল বেদশাস্ত্রাধ্যয়নের দ্বারা আত্মবিদ্যা জন্মে না। এই মর্ম্মে শ্রুতিবচন আছে (কঠ ২।২৩ মুণ্ডক ৩।২।৩)

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন" ইতি

[এই প্রত্যাগভিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ, বেদাধ্যয়েনের দ্বারা লাভ করা যায় না, (গ্রন্থার্থধারণশক্তিরূপ মেধা দ্বারা ও নহে, উপনিষদ্বিচারব্যতিরিক্ত) অনেক শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও নহে।]

স্থানান্তরেও কথিত হইয়াছে :—

"বহুশাস্ত্রকথাকন্থা রোমন্থেন বৃথৈব কিম্।
অন্বেষ্টব্যং প্রযত্নেন তত্ত্বজ্ঞৈর্জ্যোতিরান্তরম্॥ ইতি

(মুক্তিকোপনিষৎ ২।৬৩)

[গোছাগাদি যেরূপ কন্থা ভোজন করিয়া, তাহা রোমন্থন করে, সেইরূপ বহুশাস্ত্র বচন সংগ্রহ করিয়া বৃথা আবৃত্ত করিলে কি হইবে? (গুরু শাস্ত্রোপদেশ হইতে) তত্ত্ব অবগত হইয়া প্রযত্ন সহকারে সেই হৃদয়স্থ আত্মজ্যোতির অন্বেষণ করাই কর্ত্তব্য।]

অধীত্য চতুরো বেদান্ ধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি দর্বী পাকরসং যথা। ইতি চ॥

মুক্তিকোপনিষৎ ২।৬৫।

[যে ব্যক্তি চারিবেদ এবং প্রচুর পরিমাণে ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করিয়াও ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে না পারে, তাহাকে দর্ব্বীর (বা হাতানামক পাকযন্ত্রের) মত দুর্ভাগা মনে করিতে হইবে কেননা দর্ব্বী পায়সাদি বহন করিলেও তাহা আস্বাদন করিতে জানে না।]

ছান্দগ্যোপনিষদে আছে—(সপ্তম অধ্যায়ে) নারদ চৌষট্টি বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া অনুতপ্ত হইয়া সনৎকুমারের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

অনুষ্ঠানবাসনা বিষ্ণুপুরাণে নিদাঘের চরিত্রে (বিষ্ণুপুরাণ দ্বিতীয়াংশ, ১৫শ ও ১৬ অধ্যায়) এবং বাসিষ্ঠ রামায়ণে দাশূর চরিত্রে (স্থিতি প্রকরণ ৪৮ হইতে—৫১ অধ্যায়ে) দেখিতে পাওয়া যায়। ঋভু নিদাঘকে পুনঃ পুনঃ বুঝাইলেও, নিদাঘ কর্ম্মবিষয়ে শ্রদ্ধাজড়তা দীর্ঘকাল পরিত্যাগ করেন নাই। দাশূরও অত্যন্ত শ্রদ্ধাজড়তাবশতঃ সমগ্র পৃথিবীতে কোথাও অনুষ্ঠানের উপযুক্ত শুদ্ধস্থান খুঁজিয়া পাইলেন না। এই কর্ম্মবাসনা পুনর্জন্মের কারণ বলিয়া, ইহা মলিন। অথর্ব্ববেদীগণ এই মন্ত্রে পাঠ করিয়া থাকেন।—(মুণ্ডক ১।২।৭—১।২।১০)

"প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
"অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম,
"এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া,
"জরামৃত্যুং তে পুনরেবাভিপযন্তি।

[এই মন্ত্রে উপাসনাবর্জ্জিত কেবল কর্ম্মের ফলের ও কর্ম্মকর্ত্তৃগণের নিন্দা করা হইতেছে :—

এই (অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ) যজ্ঞকর্ত্তৃগণ হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, উদ্গাতা, প্রতিপ্রস্থাতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, প্রস্তোতা, মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক্, নেষ্টা, আগ্নীধ্র, প্রতিহর্ত্তা, গ্রাবস্তুৎ, নেতা, পোতা, ও সুব্রহ্মণ্য এই ষোল জন এবং যজমান্ যজমানপত্নী, যাঁহাদের দ্বারা যজ্ঞ নিরূপিত হয় এবং যাঁহারা উপাসনাবর্জ্জিত কেবল কর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন, তাঁহারা ভেলার ন্যায় ক্ষুদ্র নদী উত্তীর্ণ হইবার সাধন হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা ভবাব্ধিপারে লইয়া যাইতে সমর্থ নহেন, কেননা তাঁহারা অদৃঢ় অর্থাৎ স্বল্পমাত্র বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত হইলে স্বর্গপর্য্যন্তও পাওয়াইতে পারেন না। যে অজ্ঞব্যক্তিগণ এই উপাসনা-রহিত কেবল কর্ম্মকে মোক্ষসাধন

মনে করিয়া হর্ষপ্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা (কিছুকাল স্বর্গে অবস্থান করিয়া) পুনর্ব্বার জরাসহিত মরণ প্রাপ্ত হয়েন।]

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ।
"স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ॥
"জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া।
"অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত কেবল কর্ম্মিদিগের নিন্দা করিতেছেন—সেই কেবল-কর্ম্মিগণ মূঢ় অর্থাৎ বিবেকশূন্য এবং অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত কর্ম্মাভিমানী, তাহারা আপনাদিগকে প্রজ্ঞাবান ও বিদিততত্ত্ব মনে করিয়া নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পরিক্লিষ্ট হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় অর্থাৎ জরামরণরূপ অনর্থ প্রাপ্ত হয়। যেমন কয়েকটী অন্ধ অপর এক অন্ধকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কূপথগামী হয় এবং তাহার ফলে গর্ত্তপতনাদি জন্য নানাবিধ ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অন্ধ গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া কর্ম্মিগণ জরামরণাদি দুঃখ প্রাপ্ত হয়।]

"অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানাঃ।
"বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ॥
"যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ।
"তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥

সেই আত্মজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিগণ অবিদ্যাকার্য্যবিষয়ক বিবিধপ্রকারের অভিমানদ্বারা আক্রান্ত হইয়া আমরা কৃতকৃত্য হইয়াছি এইরূপ অভিমান করে। যেহেতু কর্ম্মিগণ কর্ম্মফলেচ্ছা বশতঃ আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে না সেই হেতু, অর্থাৎ আত্মবিষয়ক অজ্ঞানহেতু দুঃখ প্রাপ্ত ও বিনষ্ট-কর্ম্মফল হইয়া তাহারা স্বর্গলোক হইতে অধঃপতিত হয়।]

"ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং।
"নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ॥
"নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেনানুভূত্বা।
"ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥

[পুত্রাদিতে প্রসক্তিবশতঃ জ্ঞানহীন সেই কেবল-কর্ম্মিগণ, যাগাদি-

বৈদিককর্ম এবং বাপীকূপতড়াগাদি স্মার্ত্তকর্ম্ম শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া মনে করে এবং অপরটিকে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানকে শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া বুঝে না। তাহারা স্বর্গের উচ্চস্থানে পুণ্যকর্ম্মফল অনুভব করিয়া এই মনুষ্যলোক কিম্বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট তির্য্যঙ্‌নরকাদিতে প্রবেশ করে।]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও (ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪২-৪৬ শ্লোকে) বলিয়াছেন :—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

হে পার্থ, স্বল্পবুদ্ধি (অবিবেকী) লোকে (বহু অর্থবাদবিশিষ্ট এবং বহুফল ও বহু সাধনের প্রকাশক) বেদবাক্য সমূহে আসক্ত হইয়া পুষ্পিত বৃক্ষের ন্যায় শোভমান্ অর্থাৎ শ্রবণরমণীয় যে সকল বাক্য বলিয়া থাকে, (সেই সকল বাক্যের মর্ম্ম এই যে) স্বর্গপশ্বাদি-ফলসাধন কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। ঐ সকল লোক কামস্বভাব, এবং স্বর্গপ্রাপ্তিই তাহাদের পরমপুরুষার্থ; তাহাদের ঐ সকল বাক্য, ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিবিষয়ে বিশেষ বিশেষ অনেক ক্রিয়াই প্রতিপাদন করিয়া থাকে (সুতরাং) জন্মরূপ কর্ম্মফল প্রদান করাই ঐসকল বাক্যের একমাত্র ফল। যাহারা ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যের প্রতি আসক্ত, তাহাদের চিত্ত পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াতে তাহাদের সাংখ্যযোগে বা কর্ম্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অন্তঃকরণে গঠিত হইতেই পারে না।

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥"

বেদ সমূহ (অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড), ত্রিগুণময় সংসারেরই প্রতিপাদক; হে অর্জ্জুন, তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য অর্থাৎ নিষ্কাম হও, এবং (নিষ্কাম হইবার নিমিত্ত, অগ্রে) শীতোষ্ণাদি, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু এবং অর্জ্জনরক্ষণ বিরত হইয়া

সর্ব্বদা সত্ত্বগুণাবলম্বী ও সাবধান হইয়া থাক, (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দিগকে প্রশ্রয় দিওনা)।

"যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥"

কূপতড়াগাদি পরিচ্ছিন্ন জলাশয়ে স্নানপানাদিতে যে সকল প্রয়োজন সংসাধিত হইয়া থাকে, সমুদ্রের ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন এক জলাশয়ে, যাহাতে চতুর্দ্দিক হইতে জল আসিয়া পড়ে তাহাতেও, সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র জলাশয় নিষ্পাদ্য প্রয়োজন সংসাধিত হইয়া থাকে, কেননা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়গুলি বৃহতের অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। সেইরূপ বেদোক্ত ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের দ্বারা যে যে প্রয়োজন সংসাধিত হয় তৎসমস্তই পরমার্থতত্ত্বদর্শী, (একমাত্র) বিজ্ঞানের ফলরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ বেদোক্ত ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের ফলসমস্তই একমাত্র পরমার্থতত্ত্ববিজ্ঞান-ফলের অন্তর্ভূত।

সমালোচনা

"বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য"

কার্ত্তিকের নারায়ণে অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার "বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য" নাম দিয়া একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ লখিয়াছেন। আমরা উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমাদের নিজের প্রাণের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ নাই। তাই ঠিক সুরটী ধ্বনিত হইতেছে না। কি একটা বেসুরো অবাস্তবতায় আমাদের সাহিত্য মূক হইয়া রহিয়াছে। কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম বাংলার মুদির দোকান হইতে প্রাসাদ পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। মুসলমানও রামায়ণের রচনায় নিজকে কত আগ্রহ দেখাইয়াছিল। * * * বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী, রামপ্রসাদের গান আজও বাংলার খোলা

মাঠ প্লাবিয়া রাখালের গলায় ধ্বনিত হয়। আবার কর্ম্মরত গৃহস্থের ব্যস্ত-জীবনের মাঝে বৈরাগীর খোল করতাল, বাউল ফকীরের একতারার সঙ্গে আসিয়া খানিক ক্ষণের জন্য জীবনের দূর লক্ষ্যের আবছায়া চিত্রটা মনের মধ্যে জাগাইয়া দিয়া যায়। কিন্তু আজ লোকের মধ্যে আমাদের সে সাহিত্য কই ?”

ইহার উত্তর একমাত্র—জীবন সংগ্রাম। ভীষণ দারিদ্র্যের তাড়নায় অন্নচিন্তায় বাঙ্গালী ‘বুদ্ধিহারা’ হইয়াছে। শান্তিময় জীবনের চিত্র বাঙ্গালীর কাছে অতীত সুখ স্মৃতি মাত্র! জনসাধারণের সাহিত্য বাংলা দেশ হইতে বর্ত্তমান কালে অন্তর্দ্ধান হইয়াছে—এখন সাহিত্য বলিলে যা বুঝায় তাহা শিক্ষিত লোকদিগের জন্য মাত্র! পেটে অন্ন না থাকিলে, প্রাণে আনন্দ থাকে না। নিরানন্দময় জীবনে “সাহিত্য মূক” হইয়া থাকিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। স্থানান্তরে হেমন্তবাবু লিখিয়াছেন :—

“নাটকের চরিত্রগুলি যেমন অস্বাভাবিক অভিনয়ও তদ্রূপ। যে নায়কের চরিত্র ভাল সে একেবারে সুশীল ও সুবোধ বালকের মত—ভাজা মাছখানি পর্য্যন্ত উল্টাইয়া খাইতে জানে না—আবার যাহার চরিত্র খারাপ সে একেবারে সয়তানের প্রতিমূর্ত্তি। যেন স্মৃতি শাস্ত্র মাফিক স্বর্গ নরকের উপযুক্ত করিয়া ইহাঁদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। বৃষভের মত সুর হইলেই বীররস হইল, আর নাকি সুরে প্যাঁ প্যাঁ করিতে পারিলেই করুণ রস—আর কাতুকুতু দিয়া কোন গতিকে হাস্যরস জাগাইতে পারিলেই শ্রেষ্ঠ নাটককার।”

লেখকের সঙ্গে এই বিষয়ে আমাদের মতভেদ আছে। নাটক আর উপন্যাস এক নয়। উপন্যাসের চরিত্র আর নাটকের চরিত্র এক ধরণের হইতে পারে না। নাটকের চরিত্রে বিশেষতঃ পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক নাটকে “স্বাভাবিকতা” পুরো মাত্রায় বজায় রাখা চলে না। গিরীশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র লাল, ক্ষীরোদ প্রসাদ প্রণীত নাটক সমূহের চরিত্রগুলি একেবারে অস্বাভাবিক একথা স্বীকার করিতে পারি না। গিরীশচন্দ্রের প্রফুল্লের কিম্বা রমেশের চরিত্রে কি অস্বাভাবিকতা আছে ? সামান্য যদি কিছু বা থাকিয়াই থাকে তাহা শিল্পীর দোষে নয়—নাটক বলিয়া। তারপর

একেবারে নিখুঁত স্বাভাবিক চরিত্র অঙ্কন করিতে গেলে নাটক লেখা চলে না, উপন্যাস লিখতে হয়।

জাতীয় জীবনে লোকশিক্ষার জন্য নাটকের আবশ্যকতা খুব। দীনবন্ধু, গিরীশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বাঙ্গালাসাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন এবং বাংলার জাতীয় জীবন গঠনে খুবই সহায়তা করিয়াছেন। বিশ্বের সাহিত্যদরবারে তাঁহারা কখনও স্থান লাভ করিতে পারেন নাই ইহা ক্ষোভের বিষয়—সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহারা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ করিবে কে?

বর্ত্তমান বাংলা উপন্যাসের কথায় হেমন্তবাবু লিখিয়াছে:—"পাশ্চাত্য সমাজে যে সকল সমস্যা জীবন্ত হইয়া সমাজে দেখা দিয়াছে—বার্ণার্ড'স বা হাইপটমান্ প্রভৃতির সাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই সকল সমস্যার কথাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের সামাজিক জীবনে কোর্টসিপ নাই elopment নাই, পরের স্ত্রী লইয়া বলনাচ নাই, বিধবা বিবাহ নাই, সধবা বিবাহও নাই, divorce নাই; যুদ্ধ নাই, রাজ্য নাই, সমাজ বিপ্লব নাই—কি লইয়া নভেল লিখিব? এক বালবিধবার সহিত প্রেম সে আর কত রকমে লেখা যাইবে? তাই পরের সমাজ হইতে ধারকরা 'আইডিয়া লইতে হয়—কিন্তু বাংলার মাটিতে সেগুলি নিতান্ত আগাছার মতই রহিয়া যাইতেছে।"

আমাদের দেশে যাহারা সাহিত্য চর্চ্চা করেন তাঁহাদের অনেকেই পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত তাঁহাদের সামাজিক এবং ব্যবহারিক জীবনেও পাশ্চাত্য অনুকরণ কম দেখা যায় না। ইহারা সহুরে মানুষ রাজধানীর সভ্যতার সঙ্গে জড়িত পল্লীগ্রামের নিভৃত কুটীরের খবর ইহাদের কর্ণকুহরে পৌছায় না। 'পরের সমাজের ধার করা আইডিয়া' গুলিকে ইহারা নিজস্ব করিয়া লইতেছেন, কাজেই উপন্যাস রচনাও তদ্রূপ হইবে—ইহা বিচিত্র কি? অবশ্য সাহিত্যিক মাত্রেই যে এই শ্রেণীর তাহা নহে। যাঁহারা পল্লীগ্রামের জলহাওয়ায় মানুষ অথচ প্রতিভাবান তাঁহাদের রচনায় বাঙ্গালীর প্রাণের বাঙ্গালীর জীবনের নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়। যেমন কবি গোবিন্দ দাসের কবিতা। আমরা হেমন্ত বাবুর কথায় বলি—

"সাহিত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা চাই।" আরও বলি বাঙ্গালীকে অনেক বিষয়ে—শুধু সাহিত্যের নয়—পাশ্চাত্য অনুকরণ ছাড়িতে হইবে। তবেই জাতীয় জীবনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে সাহিত্যেও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে।

উদ্বোধন—ইহা একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক। চন্দননগর প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস হইতে শ্রীরামেশ্বর দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। বাঁধান অতি সুন্দর। মূল্য ৸০ পাঁচ সিকা।

নাটক খানি স্ত্রী-চরিত্রবিহীন ও উচ্চ আদর্শপূর্ণ। ভাষা ও ছন্দ হিসাবে স্থানে স্থানে এক-আধটুকু কটমট হইলেও মোটের উপর পুস্তক খানি অতি সুন্দর, সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। একটী চরিত্রে সম্প্রদায় বিশেষের উপর একটু কটাক্ষ হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু গ্রন্থকার স্বয়ংই গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন যে, "* * * উহা সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া নহে, ব্যক্তিগত চরিত্র চিত্রণের জন্যই উহা প্রদর্শিত হইয়াছে। * * *" এতদ্ব্যতীত অপর কয়েকটী চরিত্রে ত্যাগ, সরলতা ও উদারতার যে উচ্চ আদর্শ চিত্রিত হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান সময়ে যে সকলেরই সর্ব্বথা অনুকরণীয় তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। নাটক খানি বর্ত্তমান যুগের কয়েকটী বাস্তব চরিত্রের আদর্শে রচিত।

নাটক খানি স্ত্রীচরিত্রবিহীন হওয়ায় স্কুলকলেজের ছাত্রগণের দ্বারা অভিনীত হইবার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে, সন্দেহ নাই। উহা তাহা-দিগকে একাধারে শিক্ষা ও আনন্দদানে সহায়তা করিবে।

প্রার্থনা

(শ্রীমতী প্রভাবতী স্বরস্বতী)

আঁধার জীবনে, প্রেমের আলোটী
উজল করিও প্রিয়।
করুণা, জ্ঞান, প্রেম মাখা তব
হাতের পরশ দিয়ো॥
যদিবা কখন যাই আমি টলে,
ভ্রান্তির পথে যাই যদি ভুলে,
হাতটী বাড়ায়ে তখনি আমায়
তোমার নিকটে নিয়ো॥
যদি সখা কভু 'আমার' বলিয়া
বৃথা অভিমানে ভ'রে যায় হিয়া
আঘাতি আমারে জানাইয়ো তুমি
কোনটি শ্রেয় বা প্রেয়॥
জানাইয়ো হেথা কাজের লাগিয়া
আসিয়াছি আমি একা
করিব সাধনা লভিব করুণা
অতুলন তব সখা
নিরাশ হইয়া নাহি থাকি যেন
কেহ পারে—আমি পারিবনা কেন—
চেতনা আনিতে করিতে হৃদয়
নিরমল রমণীয়।
যদি কেহ পারে উর্দ্ধে উঠিতে
আমিই কেনবা নিম্নে মাটিতে
থাকিব নিজের ভাবিয়া দীনতা
সংসারের মাঝে হেয়॥

সংবাদ।

আমেরিকার বোষ্টন সহরের বেদান্ত কেন্দ্র হইতে স্বামী পরমানন্দ গত জুন মাসে সিনসিনেটিতে কয়েক দিনের জন্য গমন করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে Spiritual Consecration, Life after Death ও Unity and Universality প্রভৃতি কতিপয় বক্তৃতা করেন। সকলেই আগ্রহের সহিত তাঁহার বক্তৃতাগুলি শ্রবণ করিয়া ছিলেন। বেদান্ত গ্রন্থাদি পাঠের জন্য অনেকে আগ্রহান্বিত হওয়ায় একটী সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সেবাধর্ম্মের প্রচার যত হয় ততই ভাল। যাঁহারা কথায় প্রচার করেন তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা নিজ নিজ জীবনের দ্বারা উহার প্রচারে সহায়তা করেন তাঁহাদের উপর সকলেরই সহানুভূতি হয়। পূর্ব্ববঙ্গে বরিশাল জেলায় ভারুকাটী গ্রামে কয়কটী ভদ্রসন্তান রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম নামে একটী সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। গত ১১ বৎসর ধরিয়া ইঁহারা একান্ত মনে কার্য্য করিতেছেন। দুর্ভিক্ষ, বা সংক্রামক পীড়াদির সময়ে নানারূপে জনসাধারণের সেবা করিয়া থাকেন। গত বৎসর ৬৫ জন রোগীকে ঔষধ দান করেন এবং অনেকগুলি রোগীকে সেবা শুশ্রূষা করেন। ১৪টী দরিদ্র গৃহস্থ পরিবারকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। ২টী মুসলমান পিতৃমাতৃহীন বালক, ১টী হিন্দু বালক এবং ১৩৮ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে ইঁহারা সাহায্য করিয়াছেন। এতন্মধ্যে ১১টী ছাত্রের পড়াশুনার ভারও গ্রহণ করিয়া ছিলেন। প্রায় ৪ বৎসর হইল ইঁহারা একটী অবৈতনিক মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। সকল জাতের ছেলেরাই এখানে পড়িতে পারে। বর্ত্তমান ছাত্রের সংখ্যা ৮২। পূর্ব্ববঙ্গে গত ভীষণ ঝটিকা কার্য্যে ইঁহারা খুব উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়া ছিলেন। এবং এই বস্ত্রাভাবের দুর্দ্দিনে ২৬৯ খানি কাপড় বিতরণ করিয়াছিলেন। গ্রামে গ্রামে এইরূপ সদনুষ্ঠান প্রার্থনীয়।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত কলমা গ্রামে রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি নানারূপ জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। ছোট ছোট ছেলেদের ও

মেয়েদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। স্থানীয় শ্রমজীবীরা যাহাতে স্বাবলম্বন শিক্ষা করে ও গৃহ শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার সুবিধা পায় সেজন্য একটী বিবেকানন্দ টেক্‌নিকাল ইনষ্টিটিউট্ স্থাপন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অন্নকষ্টের বা দুর্ভিক্ষের সময় বস্ত্র, চাউল ও অর্থ বিতরণ করিয়া থাকেন। এই সকল অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ অর্থ প্রয়োজন তাহা না পাওয়ায় ইঁহারা অনেক অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। সহৃদয় জনসাধারণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থ সাহায্য করিলে সমিতি বিশেষ অনুগৃহীত হইবেন। শ্রীযুক্ত বিনোদেশ্বর দাসগুপ্ত, সেক্রেটারী রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি কলমা, ঢাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বন্যা ও দুর্ভিক্ষনিবারণ কার্য্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বন্যা ও দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। ক্রমেই শীত পড়িতেছে। বস্ত্রাভাবে লোকের কষ্ট বর্ণনাতীত। শীত-কালে বস্ত্র ও গরম কাপড়ের অভাবে জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি অবশ্যম্ভাবী। সহৃদয় জনসাধারণের নিকট অর্থ ও বস্ত্রাদি সাহায্য প্রার্থনীয়। কার্ত্তিক মাসের শেষে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত স্থান সকলে চাউলের দরের হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। আশা করা যায় এই সময় লোকের অন্নাভাব অনেকটা কমিবে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে		চাউল	কাপড়
ভুবনেশ্বর	৪০ গ্রাম	১৮৫৮৪	১৮০
কানাস	৪৩ গ্রাম	১৬৯।০॥৫	১০২
গারিসাগোদা	৩০ গ্রাম	১৩১।২॥৫	১০০
গত অক্টোবর মাসে			
ভুবনেশ্বর		১৫৬/	৮৮
কানাস	৪৪	১৬৫/	৩১৬
গারিসাগোদা	৩০	১৪৯/॥৩	৩১৭
জেনাপুর	৪৯	১২০।৪	২০০

নিবেদিতা বিদ্যালয় বিবেকানন্দ পুরস্ত্রী শিক্ষা ও সারদা মন্দিরের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী ও আবেদন।

বর্ত্তমানযুগে ভারতের নারীচরিত্র কি ভাবে গঠিত হওয়া উচিত পাশ্চাত্য রমণী জীবনের কতটুকু ভারতের কন্যাগণের জীবনে গ্রহণীয় ও প্রযুজ্য হইতে পারে—কি ভাবে শিক্ষিতা হইলে তাঁহারা জাতীয় রমণী-জীবনাদর্শ সর্ব্বথা অবিকৃত রাখিয়া নারী-জীবন নিয়মিত করিবার বর্ত্তমান যুগোপযোগী নিয়মাবলী নিরূপণ পূর্ব্বক সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারেন—ইত্যাদি সমস্যা সকলের মীমাংসা স্থলে পূজ্যপাদাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন মৌলিক গবেষণাপূর্ণ অপূর্ব্ব-বাণী সকলের সুগভীর সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদীয় নির্দ্দেশ মুখ্যভাবে অবলম্বন পূর্ব্বক বেলুড় মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ কলিকাতা বাগবাজার পল্লীস্থ বসুপাড়া লেনে, ১৭নং ভাড়াটিয়া বাটীতে বালিকা ও অন্তঃপুরচারিকাগণের সেবাকল্পে একটি শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠা করতঃ গত বিংশ বৎসর কাল উহার কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। নানা অভাব ও অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যদিয়া এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে উক্ত যুগোপযোগী মহদনুষ্ঠান কতদূর প্রসার ও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং দেশের জনসাধারণ উহার উপযোগীতা কতদূর হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন তাহা বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে। বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এমন কি স্থানাভাবে ও অন্যান্য অসুবিধা হেতু কিছুকাল যাবৎ প্রাতে ও বৈকালে দুই বেলা বিদ্যালয় বসাইতে হইতেছে। "সারদা মন্দির" নামধেয় ঐ কার্য্যের এক নূতন বিভাগ ও (ছাত্রীনিবাস) ছয় বৎসর হইল প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। "সারদা মন্দির" নিবাসীনিগণের সংখ্যা গত পাঁচ বৎসরে ১১ হইতে ৪০ পর্য্যায়ে উঠিয়াছে। অর্থ ও স্থানাভাবে ছাত্রীগণের বিদ্যালয় ও "সারদা মন্দিরে" অন্তর্ভুক্ত হইবার ভূরি ভূরি আবেদন কর্ত্তৃপক্ষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সর্ব্বদা প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। এই অভাব দূরীকরণার্থে বেলুড়

মঠের ট্রষ্টীগণ বহুকালের চেষ্টায় বাগবাজারস্থ নিবেদিতা লেনে আন্দাজ ১৬ কাঠা পরিমিত একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন; কিন্তু অর্থাভাবে এ যাবং উক্ত ভূমিতে একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। উক্ত বাটী নির্ম্মাণের জন্য প্রায় লক্ষ মুদ্রার প্রয়োজন। এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে এইরূপ একটি বাটী নির্ম্মাণ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার সন্দেহ নাই; কিন্তু যে কার্য্যে আমাদের প্রকৃত অভাব বোধ হইয়াছে—যাহা আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক তাহা শত বাধা সঙ্কুল হইলেও তৎকরনার্থে যত্নবান হইতে হইবে। এক জীবনের দ্বারা দুঃসাধ্য দশজনের সমবেত চেষ্টায় তাহা সহজ হইতে পারে। সমগ্র বাঙলা দেশে কি এমন কুড়ি হাজার লোক নাই যাহারা প্রত্যেকে পাঁচ টাকা করিয়া এই সদনুষ্ঠানের সাহায্যকল্পে দান করিতে পারেন? এ অবস্থায় আমাদের সানুনয় নিবেদন দেশের শিক্ষিত জন সাধারণ এই হিতকর শিক্ষানুষ্ঠানের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া উহার যাবতীয় অভাব দূরীকরণে সাধ্যানুযায়ী স্ব স্ব শক্তি নিয়োগ করতঃ উহার উন্নতি ও প্রসার বিধানে সচেষ্ট হইবেন। এই কার্য্যে যিনি যাহা দিতে ইচ্ছুক নিম্ন ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাগ্রহে গৃহীত হইবে।

ঠিকানা—সেক্রেটারী—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন,
১নং মখার্জ্জি লেন. বাগবাজার।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

(বিদ্যার্থী মনোরঞ্জন)

"You must not imagine, that there was ever a religion in India called Buddhism, with temples and priests of its own order! Nothing of the sort, the idea was always within Hinduism only the influence of Buddha was paramount at one time and made the Nation monastic."

Swami Vivekananda.

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক শত বৎসর ব্যাপিয়া ভারতের জাতীয় জীবন বিপুল সংঘর্ষ ও বিপ্লবে মথিত হইয়া আসিতেছিল। নানা জাতির সংমিশ্রণজনিত বিপ্লবের তাড়নায় ভারতবর্ষ তখন কোন সমন্বয়ের ধারা অনুসন্ধানে বিফল মনোরথ হইয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির অভাব ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ঈর্ষাকলুষিত অসংখ্য রাজ্য ও অল্পকয়েকটি সাধারণ-তন্ত্রের সংগ্রামে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় একত্বের ভাব সুদূরপরাহত হইয়া উঠিয়াছিল। পৌরহিত্য শক্তির অবাধ প্রাধান্য ও শাসনের বিরুদ্ধবাদী ক্রমজাগ্রত ক্ষত্রিয়শক্তির উৎকট উচ্ছ্বাসের প্রদীপ্ত হুতাশনে ভারতভূমিকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সনাতন ধর্ম্মের মহান্ উদারতার পরিবর্ত্তে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রাবল্য ও ক্রিয়াবহুল কিন্তু প্রাণহীন নীরস যজ্ঞ ও পশুহত্যার অবাধ প্রচলনে ভারতবর্ষে এক বিরাট সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছিল।

ভারত-ইতিহাসের বিশিষ্টতার প্রতি সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিলে ইহা

স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, যখনই সনাতন ধর্ম্মভাবকে নত ও পর্য্যুদস্ত ক'রয়া কালস্রোতের পরিবর্ত্তনের সহিত নানা প্রকার আবেষ্টনী প্রসূত সমস্যা জাতিকে পথহারা করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তখনই ভারতবর্ষের যুগ-যুগান্তরব্যাপী শিক্ষা ও সাধনা মূর্ত্তিমান্ হইয়া এক উদার সমন্বয় বার্ত্তার আহ্বানে দেশব্যাপী যাবতীয় বিষবায়ু দূরীভূত করিয়া এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের পুঞ্জীভূত বিপ্লব ও সংঘর্ষভাবের চরম নিষ্পত্তি করিয়া এক অভিনব যুগের পত্তন করিতে দুইটি সমন্বয়ের বাণী এক সঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছিল। একটি শ্রীমহাবীর প্রবর্ত্তিত জৈনধর্ম্ম ও অপরটি শ্রীবুদ্ধদেব প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধ-ধর্ম্ম। জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম এই দুইটি ঐতিহাসিক ধর্ম্মই বর্ত্তমান বিহার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ড হইতে উত্থিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিকগণের মতে জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং প্রথমতঃ জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ভূমিকা প্রদর্শন পুরঃসর বৌদ্ধধর্ম্ম ও জৈনধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত তুলনা-মূলক আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পার্শ্বনাথ নামক কোনও মহাপুরুষ জৈনধর্ম্মের পত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই উত্তরকালে শ্রীমহাবীর কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই যুগে ধর্ম্মের সনাতন তত্ত্বগুলি সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত ছিল না। উপনিষদের সারসত্য—যাহা হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ—মাত্র জনকয়েক মহাপুরুষের সহিত গভীর অরণ্যে ও পর্ব্বত গহ্বরে লুক্কায়িত ছিল। সে কালের ধর্ম্মাচার্য্য ঋষিগণ বাস্তব জগতে দেশ ও সমাজের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিলুপ্ত করিয়া দিয়া প্রকৃতির লীলা নিকেতন কোন নির্জ্জন প্রদেশে অল্প কয়েকজন মাত্র শিষ্যসমভি-ব্যাহারে কালযাপন করিতেন। ধর্ম্মের গুপ্ততত্ত্ব যে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টা ও সাধনপ্রসূত অনুভূতি লভ্য তাহা অতীব সত্য; কিন্তু সেই অনুভূতিসমূহ যে উদারভাবে সামাজিক জীবনে সর্ব্বসাধারণে বিতরিত করা যাইতে পারে এবং উহাদিগকে ভিত্তিরূপে গ্রহণপূর্ব্বক যে এক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের গঠন সম্ভবপর তাহা সর্ব্বপ্রথম জৈনধর্ম্মই আমাদিগকে প্রদর্শন করাইয়া দেয়। জৈনধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় ধর্ম্মরাজ্যে সম্প্রদায় সৃষ্টি

করিয়াছিল। বৈদিক যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্যতার প্রকোপে ও বৈপ্লবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নিরীহ প্রাণী কীট পতঙ্গ প্রভৃতিতে করুণা প্রকাশ করিয়া জৈনধর্ম্ম ভারতবর্ষের সমাজশক্তিকে নিজ সম্প্রদায় রক্ষণ ও পুষ্ট করিতে নিয়োজিত করিয়াছিল। সিষ্টার নিবেদিতা বলিয়াছেন—

"In repudiating the authority of the Vedas, Jainism proves itself the oldest form of non-conformity in India."

ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু শুদ্ধোধন-পুত্র শ্রীগৌতম সগৃহ পরিবার পরিহার পূর্ব্বক জৈনাচার্য্যগণের নিকট কতিপয় কঠোর ও তীব্র সাধনা করিয়াছিলেন এবং নিরীহ প্রাণীর প্রতি তাঁহাদের অপার করুণার ভাব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। জৈনধর্ম্ম পরে বৈদিক ভাবে কিয়ৎ পরিমাণে অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সহায়ে জৈনধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম জৈনধর্ম্মের প্রভাবকে অত্যধিক পরিপক্ক করিয়া তুলিয়া ভাবে ও প্রাণে আরও অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিল। জৈনধর্ম্মে যে করুণা ও সহানুভূতি নানা প্রাণী ও কীট পতঙ্গ সমূহে পর্য্যবসিত ছিল, বৌদ্ধধর্ম্মে তাহা সমগ্র প্রাণী জাতিকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল। জন্মমৃত্যু জরাব্যাধিক্লিষ্ট ত্রিতাপ-তাপিত পথহারা মানবজাতিকে নির্ব্বানের আশাপ্রদ বাণী শুনাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম মানবপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। অন্যপক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণবার্ত্তা উপনিষদের সত্য হইতে ভিন্ন নহে—বুদ্ধদেবের ব্যক্তিগত সাধনালব্ধ জ্ঞান বেদান্ত বা আরণ্যক কথিত জ্ঞানের সহিত সর্ব্বাংশে একত্বজ্ঞাপক। যাহা এতকাল বিচ্ছিন্ন ও অপরিস্ফুত ভাবে জনসাধারণের জ্ঞাত ছিল বুদ্ধদেব তাহাই সংবদ্ধ ও জনসাধারণের নিকট নির্ভীক ভাবে ব্যক্ত করিলেন। সিষ্টার নিবেদিতা বলিয়াছেন—

"This great Sannyasin, calling all men to enter on the highest path, forms the bridge between the religion of the Aryans tracing itself back to the Vedas and the religion of the Jainas, holding itself to be defiant of the Vedas."

বর্ত্তমান কালে বৌদ্ধধর্ম্ম বলিতে আমরা বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী

এমন একটি ধর্ম্মসম্প্রদায় বুঝিয়া থাকি—যাহা মুসলমান ধর্ম্ম বা খৃষ্ট ধর্ম্মের মত বৈদিক ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ পথাবলম্বী। বস্তুতঃ অধুনাতন চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া যাহা প্রবর্ত্তিত, তাহা দেশ, কাল ও পাত্রভেদে নানা প্রকার আবেষ্টনীর প্রভাবে ও আচার ব্যবহার রীতিনীতির বিভিন্নতায় মূল বৌদ্ধধর্ম্ম (যাহা ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত হইয়া এক শান্তির বিমল ধ্বজা উড্ডীয়মান করিয়াছিল) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। বৌদ্ধযুগের জীবন মধ্যাহ্নে তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা, অজন্তা প্রভৃতি বিহারগুলি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল; দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানভিক্ষু, বুদ্ধভদ্র প্রভৃতি সম্যক্ সম্বোধিপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণের অলৌকিক জীবনাদর্শ ও নির্ব্বাণ বার্ত্তা প্রচার কার্য্যে বৌদ্ধধর্ম্মের বিমলচ্ছটা দিগ্‌দিগন্ত উচ্ছ্বসিত করিয়াছিল এবং চীন জাপান প্রভৃতি স্থানে প্রচারিত ধর্ম্মকে সঞ্জীবিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত প্রচারকগণের অভাবে বিদেশ-প্রচারিত ধর্ম্ম কিম্ভূতকিমাকার ধারণ করিল ও অপরদিকে বৌদ্ধধর্ম্ম নানা অনার্য্য আচার ব্যবহারে অভিভূত হইয়া বিভৎস তান্ত্রিক বামাচার প্রভৃতির তাড়নায় দেশকে অস্থির ও নীতিভ্রষ্ট করিল এবং শান্তিস্বরূপ স্বীয় জন্মভূমি হইতে চিরনির্ব্বাসিত হইল। কিন্তু যে বৌদ্ধধর্ম্ম বহুশত বৎসর ধরিয়া শান্তি ও আশীর্ব্বচনের শুভবার্ত্তায় ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি, বাণিজ্য, শিল্প, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি জাতীয় জীবনের প্রতি বিভাগ অভিনব ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল—তাহা বৈদিক ধর্ম্মেরই নূতন সংস্করণ। বৌদ্ধযুগের ইতিহাস লেখক প্রসিদ্ধ Rhys Davids বলিয়াছেন—

"Buddhism was the child—the product of Hinduism. Gautama's whole training was Brahmanism."

আমরা যদি বৈদিক ও ত্রিপিটকীয় মূলতত্ত্বগুলি লইয়া আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে ত্রিপিটকই বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই বেদে নিহিত ছিল এবং সেই বেদনিহিত সত্যকেই ভগবান্ বুদ্ধদেব কালোপযোগী করিয়া সাধারণে বিতরণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যে

বেদ অস্বীকার করিয়াছিলেন—তাহা তাঁহার মহাপুরুষোচিত নির্ভীকতার পরিচায়ক। তাঁহার এই মত ছিল যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত বেদ নিজ অনুভূতির সঙ্গে মিলিবে ততক্ষণ উহা সত্য—তদ্ব্যতিরিক্ত নহে। আত্মা, পরমাত্মা, কর্ম্ম, জন্মান্তরবাদ, পরলোক ও নির্ব্বাণ সম্বন্ধে যে মতবাদ বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা সর্ব্বাংশে বেদের অনুকূল। কঠোপনিষদে আত্মার যে সংজ্ঞা আছে—'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ'—ঠিক তাহারই প্রতিধ্বনি প্রাপ্ত হই বৌদ্ধগ্রন্থে—"তত্থ নত্থি হন্তা বা ঘাতেতা বা সোত্তা বা সাবেতা বা বিঞ্ঞাতা বা বিঞ্ঞাপেতা বা।" কর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলিতেছেন—"হে শিষ্যবর্গ! এমনও হইতে পারে, কোন ভিক্ষু বিশ্বাস বলে বলীয়ান, সত্যপর, ধার্ম্মিক, ত্যাগী ও জ্ঞানী, কিন্তু তিনি মনে মনে কামনা করিতেছেন—'আমি যেন মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্মে বলৈশ্বর্য্যসম্পন্ন রাজসংসারে জন্মগ্রহণ করি।' যাঁহার এই জ্ঞান, এই ধ্যান, এই চিন্তা তাঁহার সংস্কার, বিহার, প্রভৃতি মনোগতি, তাঁহাকে পুনর্জ্জন্মের সেই পথেই লইয়া যাইবে।" বুদ্ধদেব পরলোক মানিতেন—পরলোক প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন—"বিভিন্ন পরলোকস্স নত্থি পাপং অকারিয়ং"—অর্থাৎ যাহারা পরলোক মানে না তাহাদের অকার্য্য পাপ কিছুই নাই। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ যাহাকে মুক্তি বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, বুদ্ধদেব তাহাকেই নির্ব্বাণ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীবুদ্ধ নির্ব্বাণ অবস্থায় বাসনা বিমুক্তির কথা বলিতেছেন —"সব্বাভিভূ সব্ববিদূহমস্মি সব্বেসু ধম্মেসু অনুপলিত্তো, সব্বং জহো তন্‌হক্‌খয়ে বিমুত্তো সয়ং অভিঞ্ঞায় কং উদ্দিসেয্যন্তি।" অর্থাৎ আমি সর্ব্বপাপজয়ী সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিষয়ে আসক্তিরহিত, সর্ব্বত্যাগী, তৃষ্ণাক্ষয়হেতু বিমুক্ত, সকল জ্ঞানে আমি জ্ঞানী সুতরাং আমার আর কে উপদেষ্টা আছে?" নির্ব্বাণ প্রসঙ্গে রিজ্ ডেভিডস্ বলেন—

"It is the extinction of that sinful grasping condition of mind and heart which would otherwise, according to the great mystery of Karma, be the cause of renewed individual existence".

বৌদ্ধধর্ম্ম নূতন সামাজিক রীতিনীতি-আচার ব্যবহার সম্বলিত কোন সম্প্রদায়রূপে কখনই ভারতবর্ষে বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। জগতের মহত্তম ধর্ম্মাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বসাধারণের সাহায্য-নিরপেক্ষভাবে এক বিরাট ও অত্যুদার ধর্ম্মসঙ্ঘরূপে উহা ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। সেই বিরাট সন্ন্যাসিসঙ্ঘ এমন এক মহান্ আচার্য্যের পূজায় আপনার মনঃপ্রাণ নিয়োজিত করিয়াছিল, যাঁহার জীবন সর্ব্ব প্রকারে সঙ্কীর্ণতাগন্ধলেশমাত্রহীন এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় যিনি "The one absolutely sane man", "Buddha was not a man but a realisation." মহান্ করুণা ও প্রেমের প্রেরণায় বৌদ্ধসঙ্ঘ, উপনিষদের যে মহান্ সত্য এতকাল লোক-লোচন অন্তরালে পর্ব্বতগহ্বরে লুক্কায়িত ছিল কেবল তাহাই সর্ব্বসাধারণে বিলাইয়া দিবার জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম কখনই ভারতের সামাজিক জীবনে কিছুমাত্র আঘাত করে নাই, তৎপরিবর্ত্তে মহান্ উদারতার অমৃত-বন্যায় সমাজের প্রতি অঙ্গকেই প্লাবিত করিয়াছে। ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ্ শ্রীমহাবীর ও শ্রীবুদ্ধদেব প্রসঙ্গে বলেন—

"Neither prophet endeavoured directly to overthrow the caste frame-work of Hindu Society so far as it had been established in their time."

প্রিয়দর্শী অশোক রাজসিংহাসনারূঢ় থাকিয়াও আপনাকে সন্ন্যাসী বলিয়াই জ্ঞান করিতেন এবং বিরাট ধর্ম্মসঙ্ঘের গৃহস্থ শিষ্য বলিয়াই আপনাকে বিজ্ঞাপিত করিতেন। নানাপ্রকার সামাজিক রীতিনীতি পূজাপদ্ধতির জন্য সকলকেই ব্রাহ্মণদিগের নিকট যাইতে হইত—বাস্তব জগতের অন্তরালে স্থিত বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণের শান্তিবার্ত্তাই দেশকে আহ্বান করিয়াছিল এবং সমাজনীতিতে আপনার শক্তির অযথা অপব্যয় করা হীন বলিয়াই মনে করিত। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ভারতের সামাজিক ও ধর্ম্মজীবনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচ্ছন্নভাবে যে প্রকার প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে তাহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, যদিই বা বৌদ্ধধর্ম্ম কোনও বিশেষ সম্প্রদায়রূপে প্রবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে আজ পর্য্যন্ত উহা বৈদিক ধর্ম্মের

প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে টিকিয়া থাকিতে পারিত। রাজর্ষি ধর্ম্মাশোকের অনুশাসনগুলি পাঠ করিলে বৌদ্ধধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সম্প্রদায় বলিতে আমরা এই বুঝি যাহা অল্পসংখ্যককে লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে ; পরন্তু অশোক অনুশাসন পাঠে দেখিতে পাই ধর্ম্মাশোক সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতার ভাব পরিহার পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মের সুনীতি সমূহ সর্ব্বসাধারণে প্রচার করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার দ্বাদশ গির্ণার অনুশাসনের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ;—"দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা সকল সম্প্রদায়ের কি সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ সকলকেই দান ও বিবিধ সম্মানসহকারে সম্বৰ্দ্ধনা করিয়া থাকেন। * * * সকলে পরস্পরের ধর্ম্ম শ্রবণ করুক এবং উত্তরোত্তর শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করুক। দেবপ্রিয় এইরূপ ইচ্ছা করেন— কিরূপ ? সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীরাই বহু অধ্যয়নসম্পন্ন এবং কল্যাণকর নীতিযুক্ত হউক।"

আর্য্যধর্ম্মের সহিত গণতান্ত্রিক ভাব সম্মিলিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম উত্থিত হইয়াছিল। আর্য্যধর্ম্মের সারসত্য তখন পর্ব্বত গহ্বরে লুক্কায়িত ছিল। জাতীয় জীবনে হিন্দুধর্ম্ম নামে যাহা প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল—তাহা কর্ম্মকাণ্ডবিবৃত যাগযজ্ঞ প্রভৃতি উপাসনা। জৈনধর্ম্ম এই বৈদিক কর্ম্ম-কাণ্ডের বিরুদ্ধে এক সম্প্রদায়রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। জনসাধারণ কিন্তু অসংবদ্ধ নানাপ্রকার বিশ্বাসাবলী মানিয়া চলিত। বৈদিক কর্ম্ম-কাণ্ডের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ অতি অল্পই ছিল এবং জৈনধর্ম্ম তখন পর্য্যন্ত সমাজের সর্ব্বস্তরে সাধারণের গোচরীভূত হইতে পারে নাই। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ধর্ম্মরাজ্যে তখন একটা সমন্বয়ের ভাব বর্ত্তমান ছিল না—জনসাধারণ আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি ও দার্শনিক চিন্তা প্রণালীর সহিত আপনাদের বিভিন্ন প্রকার বিশ্বাসসমূহ মিশাইয়া দিয়া হিন্দুধর্ম্মরূপ বিরাট সৌধে তখনও স্থান পায় নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম গণতান্ত্রিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আর্য্যধর্ম্মের সনাতন সত্যসমূহ সর্ব্বসাধারণে প্রকাশিত করিয়া দিয়া বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ড, মতবাদ ও বিশ্বাসাবলীকে এক সাধারণ ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়া এক মনোহর সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করিল। সিষ্টার নিবেদিতা তাঁহার "বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধ"

নামক প্রস্তাবে লিখিয়াছেন—"Historically it brought about the birth of Hinduism." এই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবেই প্রাচীন মগধের নিম্নস্তরের অনার্য্যভাবাপন্ন জাতি হিন্দুধর্ম্মের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছিল।

আমরা এখন জাতীয়তার দিক্ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা করিব। "Buddha was the first of faith-organisers and the first in India of nation-builders." এই সূত্রে উত্তরাধিকারিরূপে আমরা যাহা পাইয়াছি তাহা আজ পর্য্যন্ত আমাদের নিকট বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে সকল শক্তিসমূহ বহুশতাব্দী যাবং নানা ভাবে ভারতীয় জাতীয় জীবন গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের—সত্যলাভে সকলেরই তুল্য অধিকার, সত্যের পথে সামাজিক কোন স্তরবিভাগ নাই, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই—এইরূপ বাণী একটি প্রধান শক্তি। বুদ্ধদেবই সর্ব্বপ্রথম স্ত্রীলোককে সন্ন্যাসের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, যাহার ফলস্বরূপ আমরা সঙ্ঘমিত্রার ন্যায় আদর্শ নারীরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বৌদ্ধযুগে ভারতে আমরা যে বিরাট সাম্রাজ্য দেখিতে পাই, তাহা ভারতে জাতীয়তা গঠন করিতে অসমর্থ হইত যদি তাহার পশ্চাতে বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যুদার বাণী না থাকিত—যাহা সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি বহির্ভূত থাকিয়াও ভারতের রাজনৈতিক জীবন পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত স্বীয় অমানুষিক শক্তি ও উপযুক্ত মন্ত্রী চানক্যের বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষের ছিন্নবিচ্ছিন্ন রাজশক্তি সমূহকে রাজনৈতিক একসূত্রে কেন্দ্রীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তা যে আনুসঙ্গিক হইয়া চলিবেই তাহা নহে—এবং চন্দ্রগুপ্ত নিজেও বুঝিতে পারেন নাই সেই গুপ্তসূত্র কোথায় যাহা ভারতে জাতীয়তা গঠনের উপাদান। সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি একই সাম্রাজ্যের সুশীতল ছায়াতলে আগমন করিয়া জাতীয়তা গঠনের উপায় সুগম করিয়া তুলিল এবং বৌদ্ধধর্ম্ম উপনিষদের সত্যগুলি জাতীয় জীবনের প্রতিস্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া ভারতের জাতীয়তার সৃষ্টি করিয়া দিল—ও জাতীয় জীবনের প্রতি বিভাগে শিল্প, ভাস্কর্য্য, শিক্ষা ও সাধনার

অভিনবভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া এবং নূতন স্পন্দনের সাড়া তুলিয়া দিয়া এক সুবর্ণযুগের প্রবর্ত্তন করিল।

কোন জাতির শিল্প-স্থাপত্য সেই জাতির বিশেষ ভাবেরই অভিব্যক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের মহান্ ভাব সমূহ অভিব্যক্ত করিতে সুদূর অতীতে ভারতবর্ষে যে এক সুমনোহর শিল্প-স্থাপত্য বিকাশ লাভ করিয়াছিল তৎপ্রসঙ্গে আলোচনা অতীব প্রয়োজন। প্রত্নতত্ত্বের প্রসারের সঙ্গে আমাদের মন স্বভাবতঃই বিভিন্ন গুহা, প্রস্তরমূর্ত্তি ও নানা প্রকার কারুকার্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া শিল্প-স্থাপত্যের নানা প্রকার প্রথা নির্দ্ধারণ ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হইতেছে। অজন্ত গুহার সুঠাম কারুকার্য্য, সাঁচির স্তূপ, সারনাথের বুদ্ধমূর্ত্তি প্রভৃতি ভারতের এক স্বপ্নময় যুগের বার্ত্তা আমাদের নিকট বহন করিয়া আনিতেছে। এখন সমস্যা এই—ভারতীয় শিল্প স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে বিকশিত, না কোন বৈদেশিক ভাবের আধিপত্যে অনুপ্রাণিত। গ্রুভেল, ফারগুসন, ভিনসেণ্ট্ স্মিথ্ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বৌদ্ধ স্থাপত্যে গ্রীসীয় প্রভাব (Hellenistic influence) সম্বন্ধে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়াছেন। বুদ্ধমূর্ত্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের মত এই যে কুষণ যুগের পূর্ব্বে বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয় নাই এবং গ্রীস ও পারস্যের শিল্পাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই বৌদ্ধমূর্ত্তি সকল প্রথম নির্ম্মিত হইয়াছিল। 'কুষণযুগের বুদ্ধমূর্ত্তি শিল্প'—এই প্রসঙ্গে ভিনসেণ্ট্ স্মিথ্ তাঁহার Oxford History of Indiaতে বলেন—

"His image in endless forms and replicas became the principal elements in Buddhist Sculpture. The change obviously was the result of foreign influence, chiefly Greek (or more accurately, Hellenistic) and Persian or Iranian".

বৌদ্ধধৰ্ম্ম মগধ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ড হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক যে একই কেন্দ্র হইতে ধর্ম্মভাব ও তৎভাবপ্রকাশক মূর্ত্তি বা প্রতীকের উৎপত্তি এবং ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত ভাব স্ফূরিত হইয়া থাকিবে। এই মগধই বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া সমগ্র বৌদ্ধজগতের

ধর্ম্ম, শিক্ষা, সাধনা ও শিল্পাদর্শ প্রভৃতির কেন্দ্ররূপে বর্ত্তমান ছিল। গান্ধারে শিল্প ও স্থাপত্যের জন্মের বহুপূর্ব্বে মগধ সিংহল, তিব্বত, চীন জাপান প্রভৃতি দেশে ধর্ম্ম ও শিল্পাদর্শ প্রচার করিয়াছিল। বৌদ্ধযুগের জীবন সন্ধ্যা যখন সমাগত, যখন মগধের বৌদ্ধস্থাপত্যে তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে—তখন গান্ধার-স্থাপত্য শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিল এবং হুন আক্রমণ-প্রযুক্ত বিশৃঙ্খল ও বিপ্লবে কথঞ্চিৎ পরিমাণে পলায়মান বৌদ্ধগণের দ্বারা ভারতের কয়েকটি স্থানে প্রসার লাভ করিয়াছিল। কলিকাতা মিউজিয়মে যাঁহারা গান্ধারের বুদ্ধ-মূর্ত্তিগুলির সহিত পূর্ব্বপ্রদেশীয় মথুরা অথবা সারনাথের বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি তুলনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহাদের নিকট ইহা সুন্দররূপে প্রতীয়মান হইবে যে সারনাথ ও মথুরার মূর্ত্তিগুলিতে কেমন এক অমানব শান্ত ভাব রহিয়াছে, যাহা উত্তরপশ্চিমদিকে প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্মশ্রু ও নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া এক অশান্ত ও অনার্য্য ভাবের ছায়াপাত করিয়া রহিয়াছে। সিষ্টার নিবেদিতা তাঁহার "The theory of Greek Influence on Indian art'এ লিখিয়াছেন—

"Unless than there should be unimpugnable evidence to the contrary, the rule being that ideals create Symbolism as their vehicle, and the source of Buddhist thought having always been Magadha, we should expect that that country would also be the creative centre in matters of Buddhist art and that it would be responsible amongst other things for the devising and fixing of the image of Buddha."

মগধে যে শিল্পাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা গান্ধার প্রদেশে গমন করিয়া অনেকাংশে বিকৃত ও ভ্রষ্ট হইলেও কয়েকটি বিষয়ে সুন্দর ও সুঠাম হইয়া উঠিয়াছিল। কুষণ যুগে বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান নামক যে এক নূতন সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল—সেই মহাযানের বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ সমগ্র এশিয়া খণ্ডকে শান্তির বিমল আহ্বানে একই

সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শিল্পাদর্শ গান্ধার হইতে সমগ্র এশিয়াময় ছড়াইয়া পড়িয়া অবশেষে ইউরোপে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। গান্ধার শিল্প কিয়ৎ পরিমাণে ইউরোপীয় ভাবাবলী প্রদর্শন করাইলেও ইহা সর্ব্বাংশেই এশিয়া দেশীয়। ভারতীয় শিল্পস্থাপত্যের ইতিহাসে যিনি নূতন চিন্তার ধারা আনিয়া দিয়াছেন—সেই "Indian Sculpture and Painting"এর লেখক শ্রীযুক্ত হেভেল সাহেব লিখিয়াছেন,—

"Indian idealism during the greater part of this time was the dominating note in the art of Asia, which was thus brought into Europe, and when we find a perfectly oriental atmosphere and strange echoes of Eastern Symbolism in the Mediaeval cathedrals of Europe."

বৌদ্ধধর্ম্মের উপর দিয়া পরিবর্ত্তনের প্রবল প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের পর রাজগৃহের সপ্তপর্ণী নামক গুহাভ্যন্তরে মহাকাশ্যপের অধিনায়কত্বে প্রথম বৌদ্ধসঙ্ঘ আহুত হইয়াছিল। বৌদ্ধসঙ্ঘের নানাপ্রকার নিয়মাবলী নির্দ্ধারণে প্রায় পাঁচশত বৌদ্ধ ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিলেন। এই প্রথম বৌদ্ধ সম্মিলনীতে 'বিনয়' ও 'সূত্ত' সঙ্কলিত হইয়াছিল। প্রায় একশত বৎসর পরে বৈশালী নগরে ভিক্ষু যশের সভাপতিত্বে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসভা আহুত হইয়াছিল। এই মহাসভায় প্রায় সাতশত ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন এবং ধর্ম্ম সঙ্ঘের নিয়মাবলী অধিকতর দৃঢ়ীকৃত করিয়া দ্বিতীয় সম্মিলনী 'বিনয়ে'র পুনঃ সঙ্কলন ও 'অত্থকথা' নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ বৌদ্ধ ভিক্ষু এই মহাসভার সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া কঠোর বিধানগুলি অনেক পরিমাণে শ্লথ করিয়া নূতন ভাবে নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রতিক্রিয়াশীল এই বৌদ্ধ সম্মিলনী "মহাসঙ্গীতি" নামে পরিচিত ছিল। বৌদ্ধগণ যে উত্তর দেশীয় ও দক্ষিণ দেশীয় এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—তাহার মূল এই বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি। 'দ্বীপবংশে' এই মহাসঙ্গীতির কথা এইরূপ উল্লিখিত আছে—"মহাসঙ্গীতির ভিক্ষুগণ প্রাচীন

ধর্ম্মমত একেবারে উল্টাইয়া দেন।.........তাঁহারা সুত্তপিটকের ও বিনয়-পিটকের অন্তর্গত গভীরভাব মূলক অংশসমূহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন সুত্ত, নূতন বিনয়, নূতন ভাষা, নূতন পরিভাষা, নূতন নিদেশ ও নূতন জাতকাংশ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।”

অশোকের রাজত্বকালে পাটলীপুত্র নগরে আর এক বৌদ্ধ মহা-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই মহাসভায় ধম্মমত পুনরায় সংস্কৃত পুনরাবৃত্ত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এবং ফলস্বরূপ অশোক প্রেরিত প্রচারকগণ সিংহল প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন। মহারাজ কনিষ্কের রাজত্ব কালে কাশ্মীরে বসুমিত্র, অশ্বঘোষ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের তত্ত্বাবধানে চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসভা আহুত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে কনিষ্কের মহাসভা একটি অতি স্মরণীয় ঘটনা। কারণ এই সময় হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের ‘মহাযান’ ও ‘হীনযান’ নামক দুইটী শাখা উদ্ভূত হয়। মহাযানীয় বৌদ্ধগণ প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মকে সংস্কৃত করিয়া গ্রহণ করেন এবং তাহাদের দ্বারা বোধিসত্ত্বগণের পূজা আরম্ভ হয়। অন্য পক্ষে হীনযানীয় বৌদ্ধগণ প্রাচীন মতাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁহারা বোধিসত্ত্বের পূজা মানিতেন না। দক্ষিণ দেশীয় বৌদ্ধগণ হীনযানের অন্তর্ভুক্ত হন এবং প্রকৃত বৌদ্ধ বলিতে তাঁহারা সংসারত্যাগী বিহারবাসী ভিক্ষুগণকেই বুঝিতেন। মহাযানের ভাব ও চিন্তাপ্রণালী অধিকতর উদার ও বিস্তৃত ছিল—তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহিলেন না। পরন্তু প্রচার করিতে লাগিলেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি; সকল জাতিই (নানা প্রকার ধর্ম্মমত ও আচার ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও) উহার সত্য গ্রহণে ও নির্ব্বাণ লাভে অধিকারী। এই মহাযানীয় বৌদ্ধগণই পারস্য, তাতার, তিব্বৎ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন আচারবিশিষ্ট রণদুর্ম্মদ জাতি সকলকে বৌদ্ধধর্ম্মের মহান্ সত্যগুলি দান করিয়া সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডকে এক সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন। সিষ্টার নিবেদিতা তাঁহার Foot falls of Indian History”-তে বলেন—

“India in fact, as soon as the Mahayana was formulated,

entered on a position of undisputed pre-eminence as the leader and head of the intellectual life of Asia."

অতীতের গভীর অন্ধকার হইতে ইতিহাসের আলোকরশ্মি যতই প্রকাশিত হইতেছে ততই আমরা বৌদ্ধযুগের জ্ঞানগৌরব ও বিদ্যাবিভবে সম্মোহিত হইতেছি। ইউরোপের মধ্যযুগে যেমন রোমান্ক্যাথলিক্ সন্ন্যাসিগণের মঠগুলি শিক্ষা ও সাধনার কেন্দ্ররূপে বর্ত্তমান ছিল, তেমন ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের প্রত্যেকটি বৌদ্ধবিহারই শিক্ষা ও সাধনার এক একটি কেন্দ্র ছিল। তদ্ভিন্ন সম্রাট অশোকের অনুশাসনগুলি ভারতবর্ষের অনেকস্থানে সংস্থাপিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সত্য ও নীতি সমূহকে সাধারণের গোচরীভূত করিয়াছিল। "অশোক অনুশাসন ও বৌদ্ধ বিহার" প্রসঙ্গে ভিনসেণ্ট স্মিথ্ বলেন—

"The heavy cost of publication in such an enduring form would have been wasted if people could not read the edicts. Probably the numerous Buddhist monasteries served the purpose of schools, as they do now in Burma, and so produced a higher general percentage of literacy among the population than that existing at present."

সেই যুগের ভারতবর্ষের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল এবং চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েনসাং নালন্দার প্রধান অধ্যাপক শীলভদ্রের প্রতিভায় বিমোহিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুয়েনসাং কতিপয় বৎসর নালন্দায় অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার লিখিত ভারত বিবরণীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কথাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতবর্ষের আর আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তক্ষশীলাও অতি প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত। এক সময় উহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাব বিনিময়ের কেন্দ্র ছিল।

"Here between 600 B c. to 500. A. D. met Babilonean, Syrian, Egyptian, Arab, Phoenician, Ephesian, Chinese and Indian. The knowledge that was to go out of India, must first be carried to Taxila, thence to radiate in all directions."

অবশেষে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের যুগে যখন 'তারা' প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, তখন বিক্রমশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ই বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। অতঃপর বক্তিয়ার খিলিজ যখন বিহার ধ্বংস করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন, তখন বিক্রমশীলার বিশ্ববিদ্যালয় অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত হয়।

এইবার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার কাহিনী ও বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের প্রায় ৩০০ শত বৎসর পরে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের বাহিরে দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সিংহলে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তিনি আপন পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে পাঠাইয়াছিলেন। এশিয়া, আফ্রিকা এমন কি ইউরোপের অনেক স্থানেও অশোকের প্রেরিত প্রচারকগণ গমন করিয়াছিলেন। ভিন্‌সেণ্ট্‌ স্মিথ্‌ বলেন—

"The surprising intimation that Buddhist missions were despatched in the middle of the 3rd cen. B. C. to distant Hellenistic kingdoms in Asia and Africa and perhaps in Europe, opens up a wide field for reflection and speculation."

ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে বৌদ্ধধর্ম্মই দেশকালপাত্রভেদে পরিবর্ত্তিত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়া কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা—এই লইয়া অধুনা খুব বাগ্‌বিতণ্ডা চলিয়াছে। নিউটেষ্টামেণ্টের চারখানি পুস্তকই অগ্রাহ্য হইয়াছে। সেণ্ট্‌ জনের লিখিত সুসমাচার ত একেবারে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। এবং বাঁকি তিন খানিও নাকি কোন প্রাচীন পুঁথির নকল। নিউটেষ্টামেণ্টে যে ধর্ম্মের কথা আছে তাহা খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই য়াহুদিদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং বুদ্ধ হিলেন প্রভৃতি উপদেশকগণ উহা প্রচার করিতেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আলেকজেন্দ্রিয়ার Therapeuts (থেরাপুত্ত বা স্থবির পুত্র)-দিগের কথা আলোচনা করা দরকার। উহাদের এক শাখা পেলেষ্টাইনে আসিয়া বসতি করেন এবং তদ্দেশীয়

ভাষায় Essene বলিয়া পরিচিত হন। প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা বাধ্য হইয়া অনুমান করিতে হয় যে Therapeuts এবং Essene-রা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন, কারণ য়িহুদি দেশে কোথাও ঐরূপ আচার পদ্ধতি বর্ত্তমান ছিল না; বরং ভারতীয় আচার পদ্ধতি ও বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তাহাদের সম্পূর্ণ মিল দেখিতে পাওয়া যায়। যীশুখ্রীষ্টের অস্তিত্ব অপ্রতিপাদন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে—ভারতীয় আচার পদ্ধতি ও ধর্ম্মমতের সহিত তদ্দেশীয় মতামত সংযুক্ত হইয়াই যে খ্রীষ্টধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে উহা প্রতিপাদনই আমাদের উদ্দেশ্য। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ীর পৃথিবীর ইতিহাসের ৪র্থ খণ্ড 'প্রাচীন বঙ্গের বিভব' নামক অধ্যায়ে আছে "প্যালেষ্টাইনের এসিনগণ (Essene) যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের ন্যায় জীবন যাপন করিতেন, আর তাঁহাদের সদ্ভাবপরম্পরা ঐ প্রদেশে বিকাশ প্রাপ্ত হওয়ায়, সমসময়েই যে যীশুখ্রীষ্ট আবির্ভূত হন ও তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত মধ্যে এসিনগণের (সুতরাং বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের) ধর্ম্মমতের ছায়াপাত হয়, তাহা অনেকেই এখন স্বীকার করিতেছেন। ভিন্ ম্যান্সেল ও ভিন্ মিল্ম্যান্ প্রমুখ দার্শনিকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে ভারত হইতে প্রেরিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মযাজকগণের শিক্ষার ফলেই থেরাপিউট্‌গণের ও এসিন্‌গণের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল।

যবদ্বীপের 'বরোবদরের' শিল্প-স্থাপত্য হইতেও বৌদ্ধধর্ম্মের কথা ব্যক্ত হইয়া পড়ে। গুজরাট প্রদেশ হইতে ভারতবাসিগণ যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং ফলস্বরূপ যবদ্বীপে ভারতীয় ধর্ম্ম, আচার-পদ্ধতি ও শিল্পাদর্শ প্রভৃতি বিকাশ লাভ করিয়াছিল।*

প্রাচীন চীন সাহিত্যে ফুসং নামক একদেশের উল্লেখ আছে। সেই দেশের এক প্রকার বৃক্ষ হইতে দেশের নামকরণ হইয়াছিল। এবং মেক্সিকো দেশের আগুয়ে বা গুয়ে বৃক্ষের সহিত ফুসং বৃক্ষের যথেষ্ট সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। চীন সাহিত্যে কাবুলবাসী হুইসেন ভ্রমণ

---

* কলিকাতা মিউসিয়ামে যবদ্বীপ হইতে আনীত কতকগুলি হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত আছে।

বৃত্তান্ত নামক এক অধ্যায় আছে। তাহা হইতে জানা যায় "পূর্ব্বে ফুসংবাসীরা বৌদ্ধ ধর্ম্মের কিছুই জানিত না। ৪৫৮ খৃঃ সুংবংশীয় তামিং সম্রাটের রাজত্বকালে কাবুল হইতে ৫ জন বৌদ্ধভিক্ষু ফুসং গমন করতঃ সেস্থানে ধর্ম্মপ্রচার করেন। সেখানকার অনেকে বৌদ্ধভিক্ষুরূপে দীক্ষিত হয় ও তখন হইতে লোকদের রীতিনীতি সংশোধন আরম্ভ হয়।" মেক্সিকোবাসীদের মধ্যে এইরূপ একটি কিম্বদন্তী আছে যে, কোন বিদেশাগত আলখাল্লাধারী পুরুষ তাহাদিগকে বিবিধ নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভাষাগত প্রমাণ হইতেও জানিতে পারা যায় যে, Mexico প্রদেশের অনেক নামই 'গৌতম ও শাক্য' এই দুইটী নাম ও তাহাদের অপভ্রংশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। "আমেরিকায় এমন কতকগুলি জিনিষ পাওয়া গিয়াছে যাহা সে দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের মূর্ত্তিমান প্রমাণ স্বরূপ। ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি, সন্ন্যাসী বেশধারী বৌদ্ধ ভিক্ষু মূর্ত্তি, হস্তীর প্রতিমূর্ত্তি (আমেরিকায় হস্তীর ন্যায় কোনও জন্তু ছিল না), চীন প্যাগোডাকৃতি, প্রাচীরের গায়ে চিত্র, খোদিত শিলা, স্তূপ, বিহার, অলঙ্কার, এই সকল জিনিষে বৌদ্ধধর্ম্মের ছাপ বিলক্ষণ পড়িয়াছে।" (The Buddhist discovery in America—Harper's Magazine)—বৌদ্ধধর্ম্ম—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কথা প্রসঙ্গে।

হৃদয় ধর্ম্মের মাপ কাটি। হৃদয়ের সঙ্কোচ বা বিকাশের সহিত ধর্ম্মের উন্নতি বা অবনতি বুঝিতে পারা যায়। দেখিতে পাওয়া যায় অতি উচ্চ একাকার অদ্বৈত-বেদান্তের চুল-চেরা বিচার করিয়াও বহু বিজ্ঞ প্রেম-হীন সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু যাঁহার হৃদয় আছে তিনি আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত অমূর্ত্তের মূর্ত্ত প্রকাশকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিয়াছেন, কারণ তিনি মূকাস্বাদনবৎ প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন সেই অখণ্ড প্রেমাস্পদ আত্মাকে;—মাত্র যুক্তিপূর্ণ ভাষায় বুঝাইতে পারেন না বলিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহাকে মূর্খ বলে। কিন্তু মানুষ গ্রহণ করে হৃদয়বানেরই কথা—প্রমাণ শঙ্করের চুলচেরা বিচার গ্রহণ করিল বিদ্বৎ-সমাজ, আর বুদ্ধের হৃদয় অধিকার করিল বিশ্বকে।

* * *

সহানুভূতি নারকীকে স্বর্গীয় করে, আর তাহার অভাব স্বর্গীয়কেও নারকী করিয়া ফেলে। সহানুভূতির অভাবেই তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে ত্রিশ কোটি ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি মানব ভারতের অজ্ঞাত অরণ্যে পশুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে। আর সহানুভূতির জোরে আয়ার্ল্যাণ্ডের অধোবদন Pat, Pall, আমেরিকায় গিয়া উচ্চশির প্রতিভাবান মানব বলিয়া নিজেকে পরিচিত করে।

* * *

অনন্ত প্রেম মাবন হৃদয়ে বর্ত্তমান—তাই মানব চায় 'আমি ভালবাসি এবং আমাকে ভালবাসে'। এই বৃত্তির পরিধি যার যত বড় তিনি তত মহৎ। দেখা যায় বহুতে প্রেম সম্পন্ন ব্যক্তি যখন ক্ষুদ্র কোন একটিতে তাঁহার প্রেমবৃত্তি আবদ্ধ করেন তখনই তাঁহার ত্যাগ ও মানবত্বের হানি হয়। আবার যখন মানবের প্রেমবৃত্তির পরিধি বহু হইতে বহুতরে বিস্তৃতি লাভ করে তখন সে দেবত্বকেও অতিক্রম করে এবং ধীরে ধীরে সে মহাপ্রাণসাগরে নিমজ্জমান হইয়া আমিত্বকে হারাইয়া ফেলে কিম্বা

সম্ভোগেচ্ছু হইলে, শ্রীভগবানের আদি-অন্ত-হীন অরূপ-সাগরোত্থিত চিন্ময়-লীলার পার্ষদত্ব গ্রহণ করে।

* * *

প্রেমই বিকাশ এবং সঙ্কোচের নিয়ামক। মানবাত্মা প্রেমস্বরূপ, উহা সাধ্য নহে, স্বতঃসিদ্ধ। সেই আত্মা বা প্রেমের বিকাশে মানব দেবত্ব লাভ করে—আর তাহার সঙ্কোচে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। জলাশয় হইতে বাঁধ কাটিয়া ক্ষেত্রীরা যেমন জল আনয়ন করে, সেইরূপ অন্তর্নিহিত অনন্ত প্রেমের চতুঃপার্শ্বে প্রতীয়মান যে তমের বাঁধ রহিয়াছে তাহাকে সৎকর্ম্মেদ্বারা অপসারণ করিলেই আপনিই অনন্ত প্রেমের ধারা বহিতে থাকে। অসৎ কর্ম্ম সেই তমের বাঁধ আরও জমাট বাঁধায়—ইহাই সদসৎ কর্ম্মের লক্ষণ।

* * *

প্রেমের রাজ্যে ছোট বড় নাই, কারণ প্রেমের বৃত্তি একত্ব বিধায়ক। দ্বৈত ভয় এবং বিরহের জনয়িতা, সেইহেতু একত্ব বিধায়ক প্রেমে মানব অভয় এবং আনন্দকে লাভ করে। প্রেমের ব্যভিচার সামান্য স্বার্থান্ধ ভালবাসা অথবা স্নেহ মানুষকে কিরূপ নির্ভীক করে, অতি কুৎসিৎকে কিরূপ সুন্দর প্রতিপন্ন করে, অতি হীনকে কিরূপ তাহার সমান আসনে বসায়, দৈহিক এবং মানসিক বহু যন্ত্রণাকে কিরূপ উপেক্ষার চক্ষে দেখায়, মিলন বা একত্বের প্রবৃত্তি কিরূপ পরস্পরের হৃদয়ে দারুণ রূপে প্রকটিত করে, তাহা দ্রষ্টব্য। সেই হেতু ঈশা-চৈতন্য প্রমুখ ঈশ্বরপ্রেমিকদের হৃদয়ে নির্ভীকতা কিরূপ অটল, সে দেবচক্ষে কি করুণা, দৈহিক বা মানসিক তপস্যা তাঁহাদের কি কঠোর, সাম্যের পরিধি কি বিরাট, প্রেমাস্পদের নিমিত্ত বৈরাগ্য কি জ্বালাময়, তাহা ভাবিবার বিষয়!

* * *

হৃদয়বানেরা মহা শ্রদ্ধাসম্পন্ন—যে শ্রদ্ধার বলে নচিকেতা মৃত্যুকে বরণ করিয়া সত্য আনয়ন করিয়াছিলেন। এই সত্যকে লাভ করিয়া বর্ত্তমান ধর্ম্মরাজের হৃদয়বান নিঃস্বার্থ প্রেমিক-সেনাপতি মোক্ষকে তুচ্ছ করিয়া মৃত্যুময় সংসার সহস্রবার আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছেন। "অসংখ্য

বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ" একথা হৃদয়বান সত্য-জ্ঞানীরই সাজে, অপরের ধৃষ্টতা মাত্র। "ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলা বালি, কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে"—কেবল আউড়েই যেন আমাদের কর্ত্তব্যের শেষ না হয়—যেন আত্মাকে বিভু জ্ঞানে ছিন্ন বস্ত্র, ধূলাবালিতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারি।

*　　　*　　　*

প্রেমের কর্ম্মগতি অপ্রতিহত। সলিলের ন্যায় ইহারও ধারা line of least resistance কে অবলম্বন করিয়া চলে এবং উদ্দেশ্য-বিষয়ে কখনও দিশেহারা হয় না। কিন্তু বাধা যখন পর্ব্বত প্রমাণ হইয়া তাহার গতি অবরোধ করিয়া দাঁড়ায় সে ধীরে, গোপনে অন্য রাস্তা খুঁজে—পরে যখন তাহার সকল অন্বেষণ ব্যর্থ হয়, তখন তাহার সমুদ্রের বিরহও অতি তীব্র হইয়া উঠে এবং যে সলিলের কোমল স্পর্শে নিজেকে সবুজ করিবার জন্য পর্ব্বত তাহার বিরাট বাহু বিস্তার করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চায়—সেই ক্ষুদ্র ধারার কারামুক্তির সংঘর্ষে অদ্রিরাজের কঠিন চূড়া খসিয়া পড়ে।

*　　　*　　　*

পণ্ডিত বলেন, উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া, বিচার পূর্ব্বক উপযুক্ত হইলে তাহার সমাজ বাঁধন খুলিয়া দাও, তাহাকে স্বাধীনতা দাও, তাহাকে জ্ঞানদান কর। প্রেমিক বলেন, সবাই আমার মত—প্রেমাস্পদ যে সকলের হৃদয়ে বর্ত্তমান। প্রেমের ধর্ম্ম 'দেওয়া', 'নেওয়া' নয়। তুমি তোমার ভাবের পেটিকা শূন্য করিয়া 'পর'কে সর্ব্বস্ব দান কর তার পর "করুণা তাঁহার কোন খান দিয়ে কোথা লয়ে যায় কাহারে"—সে তিনিই বুঝিবেন। জ্ঞানের আলোক আনিলে আরও অন্ধকার সৃষ্টি হইবে, এ কথা প্রলাপ মাত্র। যে কারাকূপে বহুকাল বাস করিয়াছে হঠাৎ তাহাকে সূর্য্যালোকে আনিলে তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া যাইবে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে কি পুনরায় কূপেই নিক্ষেপ করিতে হইবে—না ধীরে ধীরে যাহাতে তাহার চক্ষু আলোক সহ্য করিতে পারে তাহাই করিতে হইবে? 'তুই জন্মেছিস্ গোলাম, থাকবি

গোলাম’ এই নিষ্ঠুর নীতি, নীতিকারের ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশের মূল বলিয়াই বোধ হয়।

(২)

ব্রহ্মে জগতের সত্ত্বা উপলব্ধি হয় না—সেখানে কর্ত্তা কর্ম্ম কিছুই নাই। আর জগতে ব্রহ্মের সত্ত্বা উপলব্ধি হয় না—সেখানে নামরূপের ছাপ ছাড়া কিছুই নাই। শুদ্ধাদ্বৈত, নির্ব্বিকার ব্রহ্মে এই নামরূপাত্মক জগৎ ফুটিয়া উঠে কি করিয়া? এই প্রশ্ন নিরর্থক ও অসঙ্গত। ফুটিয়া উঠে ইহা সত্য—এই যে অদ্ভুত আত্মবিরোধী (Self Contradictory) ঘটনা ইহার নামই দেওয়া হইয়াছে মায়া। মায়া এই রহস্যের কারণ নহে—এই রহস্যের আখ্যা।

যিনি কখনও দেখেন ব্রহ্মাণ্ড মহাব্যোমে ‘ছায়াসম’ ‘ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর আবার কখনও ‘সে ধারাও বন্ধ হ’ল শূন্যে শূন্য মিলাইল অবাঙ্‌মনসোগচরম্ বোঝে প্রাণ বোঝে যার’ তিনিই জ্ঞানী। তিনিই ‘একের’ উপলব্ধি করিয়াছেন—তাঁহার ভেদবুদ্ধি নাই—তাই তাঁহার স্বার্থ পরার্থ নাই। এই জ্ঞানী সংসারের কর্ম্মে ব্যাপৃতই থাকুন আর পর্ব্বত গহ্বরে সমাধিমগ্নই থাকুন তাহাতে কোনই প্রভেদ নাই। বায়ুকে যেমন লাল কালো প্রভৃতি রঙে বিভক্ত করা যায় না সেইরূপ জ্ঞানীকে স্বার্থপর ও পরার্থপরে বিভক্ত করা যায় না। তিনি যে উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছিলেন তাহা তিনি লাভ করিয়াছেন—তাঁহার জীবরূপে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ধারণারূপ মহাভ্রম দূর হইয়াছে, তাঁহার আবার কর্ম্ম, অকর্ম্ম কি? তবে কেহ কেহ এই অবস্থায় কর্ম্ম করেন লোক সংগ্রহার্থ—তাঁহারা আচার্য্য। তাঁহারা ‘এক’ ও ‘বহুর’ মাঝখানে দাঁড়াইয়া বহুকে একের উপলব্ধি করিতে নিয়োজিত করেন। কিন্তু আচার্য্য হওয়া সকলের সাধ্য নহে—ভগবৎ-শক্তি কোনও কোনও জ্ঞানীর শরীর মনের মধ্য দিয়া আচার্য্যের অভিনয় করেন।

“It is easier to become a Jibanmukta than to be an Acharyya. For the former knows the world as a dream and has no concern with it; but an Acharyya knows it as a dream

and yet has to remain in t and work. He is an Acharyya through whom divine power acts. It is not possible for everyone to be Acharyya." প্রত্যেক জ্ঞানীকেই আচার্য্য হইতে হইবে—এইরূপ দাবী করিতে পারি না।

কিন্তু ভেদবুদ্ধি বশতঃ অজ্ঞানান্ধ মানুষ এইরূপ দাবী না করিয়া থাকিতে পারে না। আমরা যে দেখিতেছি সমাজ, দেশ, জগৎ এবং ইহাদের মধ্যে দুঃখকষ্ট; যাঁহারা এই দুঃখকষ্ট অপনোদন করিতে আসেন তাঁহাদিগকে মহান্ বলিয়া বরণ না করিয়া থাকিতে পারি না; এবং যাঁহারা এই দুঃখ দূর করিতে আসিলেন না, তাঁহাদিগকে ভীরু, কাপুরুষ স্বার্থপর বলা আমাদের পক্ষে, স্বাভাবিক। চার্ব্বাকপন্থীও দেখিতেছে তাহার শরীর এবং ঐ শরীরে দুঃখকষ্ট—যিনি এই শরীরটীর দুঃখকষ্ট দূর করিয়া দিতে 'ঘৃত'দান করিবেন তিনিই তাহার কাছে মহান্— এবং যিনি তাহার শরীর পুষ্টির জন্য ঘৃত যোগাইবেন না তাহাকে ভীরু, কাপুরুষ, স্বার্থপর বলা তাহার স্বভাবসিদ্ধ। চার্ব্বাকপন্থী যেমন নিজের শরীরের স্বার্থবোধ করিতেছে, আমরা দেশ, সমাজ ও জগতে স্বার্থবোধ করিতেছি—তাই আমাদের কাছে 'স্বার্থপরতা' ও 'পরার্থপরতা' রূপ ভেদবুদ্ধি রহিয়াছে। তবে চার্ব্বাকপন্থীর অপেক্ষা আমাদের স্বার্থ একটু ভূমার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানীর স্বার্থ যে ভূমায় ডুবিয়া গিয়াছে! তাঁহাকে আমাদের দলে টানিয়া আনিয়া আমাদের মাপকাঠিতে মাপিলে চলিবে কেন? তিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম, অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখিতেছেন— তাঁহার বহুত্ববোধ নাই—সুখ-দুঃখ, সুন্দর-কুৎসিৎ, শীত-উষ্ণ, সমুদয় দ্বৈতভাব একসত্ত্বায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাঁহার শরীরমন দ্বারা কাজ হওয়া না হওয়া দুইই তাঁহার কাছে অপরা প্রকৃতির কার্য্য—কাজেই দুইয়েরই এক অর্থ। এক কথায় 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'—তাই তাঁহার কার্য্যের সমালোচনা করা আর ভগবানের কার্য্যের সমালোচনা করা

আমাদের ধাঁধা—এইরূপ জ্ঞানলাভ করিতে যদি এক এক জন পর্ব্বতগুহায় আবদ্ধ হইয়া যান তাহা হইলে দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি

জগতের উন্নতি ও হইবে না। কি ভ্রম? গাড়ীকে ঘোড়া টানিবে না ঘোড়াকে গাড়ী টানিবে? দেশ, সমাজ ও জগতের উন্নতি সাধন ত সত্যলাভের উপায় মাত্র। ছোট আমিটীকে ভূমার দিকে লইয়া যায় বলিয়াই আমাদের যাবতীয় কর্ত্তব্যের স্বার্থকতা। এই সত্যলাভের পিপাসা অনেকের মধ্যে জাগিয়া উঠিলে তাঁহারা শাস্ত্রসঙ্গত উপায়ে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, যতি প্রভৃতি নানা আশ্রমের মধ্যদিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলে তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহ সমাজ, দেশ ও জগতের উন্নতি আনয়ন করিবে। যত অধিকসংখ্যক মানব সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অসৎকে নিরাশ করিয়া পরিশেষে সৎ-অসতের পারে চলিয়া যাইবেন—ততই সত্যলাভের আদর্শ সমাজে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া সকলকে সত্যলাভের প্রেরণা দিবে। এবং এই সত্যলাভের প্রেরণা জগতের যত অধিক সংখ্যক লোক অনুভব করিবে ততই জগতের কল্যাণ।

প্রকৃতির নৃত্য ত চলিতেছে—'তুমি' 'আমি' অলীক কর্ত্তৃত্ববোধে শুধু আস্ফালন করিতেছি। মনে করিতেছি 'আমি জগতের এই কল্যাণ আনয়ন করিব'। এই সমুদয় ভ্রম—ইহা নাস্তিকতার পরিচায়ক। অহঙ্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত এক মিথ্যা ব্যক্তির উপরে, প্রকৃতির একটী ক্ষুদ্র কণিকার উপরে প্রকৃতির কর্ম্ম নির্ভর করে না। এই সত্য মানিয়া লইলে আমাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম স্বার্থলেশশূন্য হইয়া যায়—এবং এই কর্ম্ম যেমন একদিকে আমাদিগকে সত্যলাভের দিকে লইয়া যায় অপরদিকে এই কর্ম্ম জগতেরও বেশী কল্যাণকর হয়। অন্যথা 'আমি' জগতের উপকার করিব বলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলে জগতেরও বিশেষ কিছু করিতে পারিব না এবং নিজেও অজ্ঞানেই থাকিব।

"It is only a blessed privilege to you and to me that we are allowed in the way of helping others, to educate ourselves." "It is sheer nonsense on the part of any man to think that he is born to help the world ; it is simple pride, it is selfishness insinuating itself in the form of virtue."

(৩)

স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে দু-একটি কথা।

"এই নব্য শিক্ষার যুগে পুরুষ যখন নূতনের মধ্যে মগ্ন হইতেছে, তখন তাহার অর্দ্ধ-নারী সমাজেও যে এই নব্য-তন্ত্রতার স্রোত প্রবলভাবে আঘাত করিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে; এবং ভাল হউক, মন্দ হউক,—ইহাকে সম্পূর্ণরূপে বাধা দিয়া ঠেকাইয়া রাখাও সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই যে নূতন স্রোত দেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এ স্রোত দেশের নদীর নিজের বক্ষ হইতে ক্রমশঃ উদ্ভূত হয় নাই। ইহা বৈদেশিক বন্যার অতর্কিত প্লাবন। এই নূতন স্রোতের বেগবতী ধারা আমাদের দ্বার-ঘর ভাসাইয়া না দেয়, সেই দিকে আমাদের একটুখানি দৃষ্টি রাখাও অত্যাবশ্যক বলিয়া আমার মনে হয়। যেহেতু, নর এবং নারীর পরস্পর সম্মিলনে গঠিত হইলেও, প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃ, জীব-জগতের জননীগণের স্থান ঘরের ভিতর অংশে এবং পুরুষের বাহিরে। গলা ফাটাইয়া ইহার প্রতিবাদ চেষ্টা করিলেও, এই প্রকৃতিদত্ত অধিকারের পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। কাজেই, প্লাবন যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, তখনই স্বতঃই একটুখানি ব্যস্ত হইতে হয়।"　　(ভারতবর্ষ—অগ্রহায়ণ, ১৩২৭।)—শ্রীঅনুরূপা দেবী।

আমরা আশা করি মাতৃসমাজ উদ্ধৃত কথাগুলি বেশ করিয়া তলাইয়া বুঝিবেন।

বৈদেশিক ভাষা।

"বিদেশী ভাষা (ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ বা জার্ম্মাণ) আমেরিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে মাত্র আরম্ভ হয়। কিন্তু ইংরাজী বিদেশী ভাষা হইলেও, উহা রাজভাষা বলিয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এত প্রয়োজনীয় যে ইংরাজিশিক্ষা আমাদের উচ্চ বিদ্যালয়ের সর্ব্ব নিম্নশ্রেণী হইতেই আরম্ভ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু যে মাতৃভাষা পৃথিবীর সমস্ত সুসভ্য দেশে এত আদৃত হইতেছে সেই মাতৃভাষাকে অবহেলা করা আমাদের পক্ষে কোন ক্রমেই সমীচীন নয়। ইংরাজী ভাষার প্রতি অতিরিক্ত সময় ও মনোযোগ দিতে গিয়া আমরা আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষার প্রতি শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছি। বাঙ্গলাভাষা শিক্ষাদানেরও যে বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী আছে তাহা যেন আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, ইংরাজের বা আমেরিকানের পক্ষে ইংরাজি ভাষার উৎকর্ষসাধন করা যেরূপ গৌরবজনক কার্য্য বাঙ্গলাভাষার উন্নতি বিধান করাও তদ্রূপ বাঙ্গলী মাত্রের পক্ষে শ্লাঘনীয় ও সম্মানকর কার্য্য। তাই আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ইংরাজী শিক্ষাদানের জন্য যে বিজ্ঞানসম্মত মনোহর প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে আমাদের দেশে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষাদানের জন্য তদ্রূপ প্রণালী অবলম্বন করা উচিত।" (বিবিধপ্রসঙ্গ—ভারতবর্ষ—অগ্রহায়ণ ১৩২৭)

ত্যাগ-ভোগের সমন্বয়।

"ত্যাগের আলোকরশ্মিতে আবার জগৎ বিশেষতঃ ভারত সমুদ্ভাসিত হইতে চলিয়াছে দেখিয়াও একদল লোক ত্যাগভোগের সমন্বয়ের জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। তাহাদের ছুটাছুটি দেখিলে ও হা হতোস্মি লক্ষ্য করিলে মনে হয় যেন সন্ন্যাসীর দল ভগবানের রাজ্যে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। সব পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতেছে। ইহারা "ফায়ার বিগ্রেড্" নিয়া আগুন না নিবাইলে সুন্দর সৃষ্টিটা যেন ভস্মীভূত হইবে। কিন্তু হায় মানুষ! ভিজা কাঠ, তোমার ভিতরে কি ত্যাগের আগুন প্রবেশ করিতে পারে? ভোগবারি সম্পাতে তুমি যে কতটা খেতাইয়া গিয়াছ সে খবর রাখ কি? এই যে যুগ যুগ তোমার গায় ত্যাগের অগ্নিসেক চলিয়াছে তবুও ত তোমার গায়ের জল শুকাইল না? অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইবে কি—ধূম্রনির্গমন চিহ্নও ত সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছে না। সাধু-সন্ন্যাসী দূরের কথা স্বয়ং ভগবানও ত বার বার আসিয়াও আমাদের মত ভিজা কাঠে আগুন ধরাইতে পারিতেছেন না!" একি তুমি দেখ না? তবুও তোমার চিন্তা?"

(নবযুগ—কার্ত্তিক ১৩২৭) —শ্রীলাবণ্যকুমার চক্রবর্ত্তী।

দেশের কথা

(ব্রহ্মচারী অনন্ত চৈতন্য)

হে শিক্ষিত সম্প্রদায়. দুর্ভিক্ষ ম্যালেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রপীড়িত বিদ্যা ও অন্নবস্ত্রহীন মুমূর্ষু কোটি কোটি নরনারী পরিপূর্ণ ভারতভূমির বিরাট শ্মশান চিত্র যদি দেখিতে ইচ্ছা হয়, নিভৃতে চিত্তপটে তাহার অনুসন্ধান করিও। দেখিবে, কি বিভৎস ছবি, কি ভীষণ বিপদ্ চারিদিকে ঘণীভূত, তথাপি আমরা ভ্রান্ত, নিশ্চেষ্ট, বিস্মৃত!

ভারতের অভিজাত সম্প্রদায় স্বীয় ভোগ বিলাসে গা' ভাসান দিয়াছেন, দেশের রক্ত শোষণ করিয়া নিজ কলেবর পুষ্ট করিতেছেন। শোভা সুখসম্পদে দিবারজনী মগ্ন রহিয়াছেন, এদিকে যাহারা দেশের প্রাণ, যাহাদের লইয়া দেশ, দেশের জীবনী শক্তি যাহাদের মধ্যে

নিহিত, মৃত্যুর অগ্রদূতগণ অধুনা মৃতবৎ সেই জনসাধারণকে (Mass) পরপারে পার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।—(১) প্লেগ, বসন্ত, কলেরা, ইনফ্লুয়েন্‌জা, ম্যালেরিয়া, প্রভৃতি রোগনিচয়, (২) খাদ্য-দ্রব্যের ভীষণ দুর্ম্মূল্যতা ও দুর্ভিক্ষ, (৩) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের অভাব, (৪) মাতৃজাতির অবনতি ও (৫) পাশ্চাত্যের অন্ধানুকরণলিপ্সা প্রভৃতি শত্রুগণ কর্ত্তৃক আজ ভারতভূমি ভীষণ ভাবে আক্রান্ত।

ইহা ছাড়া অপর তিনটী মহাবিপদও আমাদের গৃহদ্বারে দণ্ডায়-মান, যথা—(১) ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে আর সমস্ত বর্ণ একত্রিত হইয়া পুরাকালে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষের ন্যায় এক নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করিবে, (২) বাহ্য দেশীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, অথবা (৩) সমস্ত ধর্ম্ম-ভাব ভারতবর্ষ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইবে। প্লেগ, বসন্ত, কলেরা, প্রতিবৎসর শত শত ভারতবাসীকে গ্রাস করিতেছে। তাহারা সমস্ত দিন প্রাণ-পাত পরিশ্রম করিয়াও অধিকাংশদিনই উদরপুরিয়া আহার করিতে পায় না, এবং সহরের ও পল্লীর নিকৃষ্টতম ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বহু কষ্টে একখানা কুটীর বাঁধিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া কোনরূপে মাথা গুঁজিয়া থাকে, তথা শরীর পালনের সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ নীতিগুলির বিষয়েও সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ; সুতরাং সমস্ত সংক্রামকব্যাধি তাহাদের মধ্যেই প্রথম প্রকাশ পায় এবং প্রতি বৎসর ঐ দরিদ্র সমাজেরই শত সহস্র ব্যক্তি উহাদের কবলিত হয়। ধনী ভদ্রলোকদিগের ইহারা বিশেষ কিছু করিতে পারে না। পল্লিগ্রাম সমূহে যখন ইহাদের প্রাদুর্ভাব হয় তখন কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপও দেখা গিয়াছে যে কয়েক দিবসের মধ্যেই হয়ত অর্দ্ধেক পল্লীবাসী উহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। তাহাদের অর্থ নাই সুতরাং সুচিকিৎসক আনিবার সামর্থ্য নাই—তাহাদের চিকিৎসক ভূতুড়ে ওঝা এবং ঔষধ শ্রীশ্রীরক্ষাকালীর স্নান-জল। বিবিধ দেবতার পূজা ও নগর সংকীর্ত্তন, ইহাই হইল পল্লীগ্রাম হইতে উহাদিগকে বিতাড়িত করিবার একমাত্র উপায়। দরিদ্র সমাজ হইতে কতশত ব্যক্তি যে প্রতি বৎসর এইরূপে প্রাণবিসর্জ্জন করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইনফ্লুয়েঞ্জাও বিগত

চারি বৎসর হইতে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই তিন চারি বৎসরের মধ্যে সে একা যে ক্ষতি করিয়াছে ম্যালেরিয়া বা দুর্ভিক্ষকৃত ক্ষতির পরিমাণ তাহার তুলনায় অধিক নহে। বিগত কয়েক বৎসর ব্যাপী ভীষণ ইউরোপীয় মহাসমরে জার্ম্মাণীর যে লোকক্ষয় হইয়াছে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এক ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভারতে ততোধিক লোক প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে।

গ্রীষ্মকালে অনলবর্ষী সূর্য্যের উত্তাপে পল্লীগ্রামের অধিকাংশ জলাশয়ই শুষ্ক হইয়া যায়, জল কর্দ্দমাক্ত ও বিষাক্ত হইয়া উঠে, ঐ বিষাক্ত জল পান করিয়া পল্লীবাসিগণ ওলাউঠা প্রভৃতি ভীষণ রোগনিচয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, ক্রমে তাহারা দাবানলের মত এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এইরূপে প্রতি বৎসর আমাদের দরিদ্রশ্রমজীবিকুল ধ্বংস হইতেছে। তাহার উপর আছে ম্যালেরিয়া, উহা ত বাংলা দেশকে উজাড় করিয়া ক্রমে ক্রমে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের উপর—ছড়াইয়া পড়িতেছে। পশ্চিম বাঙ্গালায়—হাবড়া, হুগলি, চব্বিশপরগণা, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার পল্লীসমূহ উহার প্রবল আক্রমণে জনশূন্য শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইতেছে। এই জ্বরাসুরের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার কি আমাদের কোন উপায় নাই? ভারত কি এইরূপেই অবাধ গতিতে কালগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে? ভারতের দরিদ্র সমাজ কি এইরূপেই অনন্ত শয্যায় শয়ন করিবে? ইটালিতে এক সময় ভয়ানক ম্যালেরিয়া ছিল, কিন্তু ইটালিবাসীর প্রাণপণ চেষ্টায় অবশেষে উহা ঐ দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। আমেরিকার পানামা (Panama) প্রদেশে সেদিন পর্য্যন্ত ও ম্যালেরিয়ার কি ভীষণ প্রকোপ বিদ্যমান ছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাহার তুলনায় বঙ্গদেশে উহার প্রকোপ ত কিছুই নহে। সেরূপ অস্বাস্থ্যকর স্থানকেও কয়েক বৎসরের মধ্যে যদি মহা স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করা যাইতে পারে তবে ভারতের এই শমনসদনবৎ পল্লিগ্রাম সমূহের উন্নতি বিধান করিয়া প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ নরনারীকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করা কি শুধু ভারতের পক্ষেই অসম্ভব?

রোগজ্বালার কথা পরিত্যাগ করিলে আর একটী গুরুতর বিষয়ে আমাদের মন সহজেই আকৃষ্ট হয়, উহা আমাদের জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহের বর্ত্তমান ভীষণ দুর্ম্মূল্যতা। দুর্ম্মূল্যতা যথায় গমন করে দুর্ভিক্ষও তাহার অনুবর্ত্তন করে, কারণ দুর্ম্মূল্যতা ও দুর্ভিক্ষ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। সুতরাং এই ভারতব্যাপী দুর্ম্মূল্যতা যে ভারত-ব্যাপী এক ভীষণ দুর্ভিক্ষের সূচনা করিতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেশজ খাদ্য দ্রব্যের মূল্যের সহিত বর্ত্তমানের ঐ সমস্ত দ্রব্যের মূল্যের তুলনা করিলে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ি। এইরূপে যদি উহা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হয় তবে আর কিছুদিনের মধ্যে ভারতের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রসমাজের দুরবস্থা কোথায় গিয়া উপনীত হইবে তাহা কল্পনা করিতেও আমাদের হৃদয় শিহরিয়া উঠে। ষাট্ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ আজও সাক্ষ্য দেন যে বাল্যকালে তাঁহারা এক পয়সায় /১ সের চাউল ক্রয় করিয়াছেন, কিঞ্চিদধিক ষাট্ বৎসর পূর্ব্বে এক টাকায় ৪/০ মণ দুগ্ধ পাওয়া যাইত, এক পয়সার মুড়ি সচরাচর কেহ খাইতে সমর্থ হইত না —এক্ষণে উহা গল্প বলিয়া মনে হয়! কিন্তু জিজ্ঞাস্য—এই কয়েক বৎসরের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের এইরূপ ভীষণ দুর্ম্মূল্যতার কারণ কি? উহার সর্ব্ব-প্রধান কারণ আমাদের নিজেদের অজ্ঞতা ও দৃষ্টিহীনতা। মেশোপোটেমিয়া হইতে যে সুমিষ্ট খর্জ্জুর প্রতি বৎসর বাক্সবন্দি হইয়া ভারতের বাজারে প্রেরিত হয় উহা মেশোপোটেমিয়াবাসিগণ এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বাক্সবন্দি করিয়া রাখে; উৎপন্ন ফসল সেই বৎসরই বিদেশে রপ্তানি করে না, নূতন উৎপন্ন ফসল যদি তাহাদের বাৎসরিক আহারের জন্য প্রচুর হয় তবে তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত খর্জ্জুর বিদেশে প্রেরিত হয়—নচেৎ স্বদেশে মজুত রাখিয়া দেয়। সেই অতি নিরক্ষর মেশোপোটেমিয়া-বাসীদেরও এই সামান্য বুদ্ধিটুকুর অভাব নাই, আর আমরা তথাকথিত সভ্যতালোকে আলোকিত ভারতবাসী, পেটের ভাত না রাখিয়া কাঞ্চনের লোভে আমাদের মুখের গ্রাস অপরের মুখে তুলিয়া দি! আমরা তাহাদিগকে আমাদের জীবনী শক্তিটুকু দিয়া থাকি আর তাহার বিনিময়ে তাহারা আমাদিগকে দেয়—ছেলে ভুলানো খেলনা, রঙ্গিন কাপড়, পাউডার, এসেন্স

ও অপরাপর নানাবিধ বিলাস দ্রব্য যাহাদ্বারা আমাদের সমাধি মন্দির আমরা সুসজ্জিত করিতেছি। আমাদের দেশে প্রতি বৎসরই দুর্ম্মূল্যতা ও দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে, তথাপি আমাদের দেশ হইতে গত ফেব্রুয়ারী মাসে ৫০ হাজার টন্ চাউল ইউনাইটেড কিংডমে এবং তৎপরে প্রায় ৩০ হাজার টন্ চাউল ইউরোপে রপ্তানি হইয়াছে।

যদিও দুর্ভিক্ষ নিবারণী সম্প্রদায় সমূহ ইহার করালগ্রাস হইতে নরনারিগণকে কতক পরিমাণে রক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ ফল হইতেছে না। তাহার কারণ রোগের মূল উৎপাটিত না হইলে রোগ উপশমিত হয় না। দুর্ভিক্ষের মূল অনুসন্ধান করিতে হইবে।

আপাততঃ আমরা দেখিতে পাই তিনটী প্রধান কারণে খাদ্যদ্রব্য মহার্ঘ হইয়া উঠে। প্রধানতঃ অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি বশতঃ বা অন্য কোন নৈসর্গিক কারণে যদি শস্য প্রচুর পরিমাণে বা আবশ্যকমত উৎপন্ন না হয়; দ্বিতীয়তঃ প্রচুর পরিমাণে বা আবশ্যকমত উৎপন্ন হইলেও যদি উহা অধিকাংশ পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইয়া যায়; তৃতীয়তঃ যদি দেশে মুদ্রার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমাদের চির শস্যশ্যামল ভারতবর্ষ, যাহার অতুল ঐশ্বর্য্য ও উর্ব্বর ক্ষেত্র সমস্ত পৃথিবীবাসীকে প্রলুব্ধ করিতেছে, যে দেশ হইতে প্রতি বৎসর কত কোটিকোটি মন চাউল সমস্ত পৃথিবীতে রপ্তানি হইয়া জগদ্বাসীকে পোষণ করিতেছে ও অন্যান্য দ্রব্যে তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছে, যে দেশের একটীমাত্র ক্ষুদ্র জেলার উৎপন্ন ধান্য সমস্ত প্রদেশকে অনায়াসে আহার্য্য যোগাইতে সমর্থ, সেই দেশে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এরূপ কোনও বহুজেলাব্যাপী অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হয় নাই, যাহার জন্য আজ সমস্ত ভারতবর্ষ অন্নবিনা হাহাকার করিবে, কিম্বা কয়েক বৎসরের মধ্যে সমগ্র দেশের শস্য উৎপাদনী-শক্তি এরূপ হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই, যাহাতে টাকায় ১৷৵ মন চাউলের স্থানে ৵৪ সের চাউল বাজারে বিক্রীত হইবে। বস্তুতঃ পক্ষে প্রতি বৎসর চাউল গম প্রভৃতি উৎপন্ন খাদ্য দ্রব্য ভারত হইতে যে পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইয়া যাইতেছে তাহার তালিকা দৃষ্টে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যদি উহা বিদেশে রপ্তানি না হইয়া স্বদেশেই আবদ্ধ থাকিত

তাহা হইলে ভারতমাতা কখনই দুর্ভিক্ষের বিপুল ভারে এরূপ নিপীড়িতা হইতেন না। অন্যরূপ বিপদ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু এই সোনার দেশে যে অন্নাভাব কখনও উপস্থিত হইবে ইহা প্রাচীনভারত বোধ হয় কখনও কল্পনা করে নাই। বর্ত্তমান ভারতও কখন স্বপ্নেও ভাবে না যে অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি জনিত অজন্মায় তাহার এরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। সে ইহা আজ বেশ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছে যে রপ্তানিই তাহার অনশনের একমাত্র কারণ। এই পাপ সে ধরিতে পারিয়াছে সত্য, কিন্তু এ পাপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা তাহার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ নিম্নে যথাসম্ভব পরিষ্কার রূপে নিবদ্ধ হইল।

আমাদের দেশে দরিদ্র কৃষকগণ ধনী মহাজনের নিকট হইতে প্রতি বৎসর উচ্চহারে অগ্রিম 'দাদন' গ্রহণ করে বা দরিদ্রতা প্রযুক্ত উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। পূর্ব্বে এই কৃষককুলের অবস্থা বেশ স্বচ্ছলই ছিল। তৈল, লবণ বা পরিধেয় বস্ত্রের চিন্তায় তাহাদিগকে কখনও আকুল হইতে হয় নাই। তাহারা ক্ষেত্রের ধান্যে গোলা বাঁধিয়া সম্বৎসর তাহারই কিয়দংশ আহার করিত এবং তৈল, লবণ, বস্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয়িত হইত। উদ্বৃত্তাংশ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত থাকিত। তাহারা তখন অভাব কাহাকে বলে জানিত না। পল্লীগ্রামের নিরাবিল আনন্দের মধ্যে তাহাদের শান্তিপূর্ণ জীবনটুকু স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পাশ্চাত্যের অর্থলিপ্সা সাধারণতঃ মহাজন প্রভৃতির মধ্যে অত্যুৎকট হওয়ায় তাহারা প্রচুর পরিমাণে ধান্য গোলা বাঁধিয়া না রাখিয়া প্রচুর পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করায় স্বদেশের যাহা কিছু উৎপন্নদ্রব্য সমস্তই বিদেশে রপ্তানি করিতে আরম্ভ করিল, এবং বিদেশের যাহা কিছু লইয়া নিজেদের কুটীর পূর্ণ করিতে লাগিল।

এদিকে অপরিমিত রপ্তানি বশতঃ দেশে ক্রমে খাদ্যাভাব উপস্থিত। চাষের পূর্ব্বে কৃষকগণ দাদন গ্রহণ করে, পরে বৎসরের

শেষে মহাজনগণকে ধান্য বিক্রয় করিয়া ঐ ঋণশোধ করিয়া দেয়। কিন্তু এই 'দাদন' গ্রহণের ফলে তাহাদের অবস্থা বর্ত্তমানে এরূপ নিঃসহায় হইয়া পড়িয়াছে যে, চাষের পূর্ব্বে অর্থাভাব বশতঃ তাহাদিগকে মহাজনগণের নিকট হইতে 'উচ্চ হারে' দাদন গ্রহণ করিতেই হয় নতুবা তাহারা চাষের ব্যয় ভারই বহন করিতে সমর্থ হয় না। পরে ঐ ঋণশোধ করিবার নিমিত্ত তাহারা উৎপন্নধান্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়—কারণ দুই এক বৎসর ঐ ঋণ শোধ না করিলে ঋণের দায়ে তাহাদের সর্ব্বস্ব বিক্রীত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং ভারতভূমিকে দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে হইলে দরিদ্র কৃষককুলকে 'দাদন' গ্রহণের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে হইবে। মহাজনগণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলে কৃষককুল পুনরায় স্বাধীন ভাবে উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা না করা, বা স্বেচ্ছামত রপ্তানি করা সমস্তই নিজ করায়ত্ত করিয়া লইতে পারিবে। এক্ষণে কৃষকগণ এই দাদন গ্রহণরূপ বন্ধন হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবে তাহাই চিন্তনীয় বিষয়। আমাদের মনে হয় বাংলার এবং বাংলার বহিঃস্থিত সমস্ত ভারতের প্রতি পল্লীগ্রামে পল্লীবাসিগণ কর্তৃকই Co-operative credit system এর প্রচলন করিয়া co-operative Society হইতে স্বল্প 'হারে' কৃষকগণকে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিলে তাহারা বর্ত্তমান দাদনগ্রহণরূপ ঘোর বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৃষকগণ মহাজনগণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে রপ্তানি করা পুনরায় তাহাদিগের করায়ত্ত হইবে। তখন তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে 'তোমরা আহারের জন্য অন্ততঃ তিন বৎসরের ধান্য গোলা বাঁধিয়া রাখ—লবণ, তৈল, বসন প্রভৃতি সংসারের অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য উহা ব্যতীত আরও কিছু পরিমাণ ধান্য সঞ্চিত কর—তৎপরে অবশিষ্টাংশ তোমরা ইচ্ছামত বিদেশে রপ্তানি করিতে পার'। আর একটী বিষয় কৃষকগণের মধ্যে প্রবর্ত্তন করার জন্য আমাদিগকে যত্নবান হইতে হইবে—তাহারা যেন টাকার সংশ্রব যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করে। পাশ্চাত্য সভ্যতালোক এখনও যথায়

সম্যক্ প্রবিষ্ট হয় নাই বাংলার এরূপ দুই একটী গণ্ড গ্রামে এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে তথাকার অধিবাসিগণ পরস্পরের মধ্যে তাহাদের ক্ষেত্রজ দ্রব্যের 'লেন্‌দেন্' দ্বারাই ব্যবসায় চালাইতে থাকে এবং সংসার নির্ব্বাহ করে। তাহারা টাকার কোন মূল্যই জানে না এবং তাহার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে না। কৃষক ধান্যের বিনিময়ে তন্তুবায়ের নিকট বস্ত্র ক্রয় করে, তন্তুবায়ও বস্ত্রের বিনিময়ে ধান্যের দ্বারা সংসারের খাদ্য সমস্যা পূর্ণ করে। এইরূপ পরস্পরের সাহায্যে ও বিনিময়ে পল্লীবাসিগণকে আবশ্যকীয় কোন দ্রব্যের জন্য কখনও অভাবগ্রস্থ হইতে হয় না। আমাদের এই চির পুরাতন প্রথাটী শ্রমজীবিকুলের মধ্যে প্রচলন করিতে পারিলে বর্ত্তমান অন্নসমস্যা হইতে তাহারাও রক্ষা পাইবে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশবাসীই এই ভীষণ অনশন যন্ত্রণা হইতে নিস্কৃতি লাভ করিবে। দাদন গ্রহণরূপ ভীষণ বিপদ হইতে কৃষক-কুলকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত co-operative credit system এর প্রবর্ত্তন, আহার্য্য ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ৩।৪ বৎসরের ধান্য গৃহে সঞ্চিত রাখিয়া অবশিষ্টাংশ বিদেশে রপ্তানি করা এবং সমস্ত 'লেন্‌দেন্' ব্যাপার টাকায় না করিয়া যতদূর সম্ভব দ্রব্য বিনিময়ে করিবার জন্য প্রভূত পরিমাণে যত্নবান হওয়া প্রভৃতি বর্ত্তমান অন্নসমস্যা সমাধানের জন্য যেরূপ অত্যাবশ্যকীয়, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর ও দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনাপূর্ব্বক অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সাধন করা তদপেক্ষা কিছু অল্প আবশ্যকীয় বিষয় নহে।

বর্ত্তমান শিক্ষা আমাদিগকে কোন্ কোন্ বিষয়ে সাহায্য করে তাহার সম্যক আলোচনা করিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী সৃজন করিতেছে অসংখ্য নিরন্ন উকিল, বুভুক্ষু কেরাণী ও সংসারক্ষেত্রে পথহারা নিরুপায় যুবক। কৃষক, কর্ম্মকার, সূত্রধর, তন্তুবায়, ক্ষৌরকার, রজক, ভুনিওয়ালা এবং পানওয়ালা প্রভৃতি শ্রমজীবিকুল পুত্রকে ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্য স্কুলে প্রেরণ করে। পুত্র রাজভাষা শিক্ষা করিতেছে, সুতরাং জমীজমা বন্ধক রাখিয়া তাহার শিক্ষার ব্যয় বহন করিতে হয়; পুত্র কষ্টে

সৃষ্টে হয়ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল বটে কিন্তু বাল্যকাল হইতে বাপ্‌দাদার ব্যবসায় কিছুমাত্র শিক্ষা লাভ করে নাই বলিয়া সে এক্ষণে করিবে কি? সংসার ক্ষেত্রে এই অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিটীর স্থান কোথায়? এইরূপে প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি সৃষ্টি হইতেছে। এই অসম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রণালীর দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক সংস্কার সাধন যে একান্ত প্রয়োজন ইহা আজ একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। সুখের বিষয় এই সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অধুনা অল্পবিস্তর আন্দোলন দেখা দিয়াছে এবং আরও আনন্দের বিষয় যে স্বদেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হৃদয়বান্ কোন কোন ব্যক্তি ইহার জন্য ইতিমধ্যেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই সংস্কৃত শিক্ষা প্রণালী যেন স্ত্রী ও পুরুষ উভকেই সমভাবে নিজ নিজ জীবন ও উদ্দেশ্য সফল করিবার সমান সুযোগ প্রদান করে। যাহার আদর্শ যত উচ্চ তাহার জীবনও তত সফলকাম। সুতরাং বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীকে উজ্জ্বল ও অধিকতর কার্য্যকরী এক উচ্চতম আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। উহার সংস্কার ও গঠন প্রণালী এরূপ হইবে যে উহা যেন ইহজীবনকে শক্তি সম্পন্ন ও পরজীবনকে ধন্য করিতে পারে। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের "Education is the manifestation of the perfection already in man" এই প্রকৃত শিক্ষা নির্দ্দেশক সূত্রটীই আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর একমাত্র আদর্শ স্বরূপ হইবে। এই শিক্ষা বিস্তারের কেন্দ্র নগর-নগরী না হইয়া হইবে শ্মশান সদৃশ ও পরিত্যক্ত পল্লীগ্রাম সমূহ। এই বাণী-মন্দিরে মায়ের অর্চ্চনাকারিগণ আসিবে—কৃষকের কুটীর হইতে, বেনের দোকান হইতে, ভুনিওয়ালার উনানের পার্শ্ব হইতে, তাঁতী, তেলী, দুলে, মালীর নরক সদৃশ ভূমিশয্যা হইতে। মাতৃচরণে সর্ব্বস্ব উৎসর্গীকৃত পূজক নবীন পূজার্থিগণকে অতি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া এক অভিনব প্রণালীতে তাহাদিগকে মাতৃপূজায় ব্রতী করিবেন। "প্রাচ্যের শিক্ষা—ত্যাগ, প্রতীচ্যের শিক্ষা ভোগ; সুতরাং ছাত্রগণ যাহাতে প্রতীচ্যের চাকচিক্যে বিহ্বল না হইয়া দৃঢ়ভাবে প্রাচ্য আদর্শেরই অনুসরণ করে

তদ্বিষয়ে তিনি প্রভূত পরিমানে সচেষ্ট হইবেন, শিক্ষাদান কালে শিক্ষার্থীর উপর তাঁহাকে অসীম শ্রদ্ধাবিশ্বাস রাখিতে হইবে এবং মনে করিতে হইবে প্রত্যেক বালক অনন্ত শক্তির আধার, আর সেই নিদ্রিত শক্তিকে, সেই নিদ্রিত ব্রহ্মকে জাগরিত করাই শিক্ষকদের কর্ত্তব্য।" বিভিন্নবর্ণের বালকগণকে সমভাবে অল্প-স্বল্প সাধারণ বিদ্যা (অর্থাৎ ভাষা শিক্ষা, এবং কিছু পরিমানে ইতিহাস, গণিত, ভূগোল, বিজ্ঞান স্বাস্থ্যরক্ষানীতি ইত্যাদি) শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ বর্ণোপযোগী কার্য্যকরী (Technical training) বিদ্যা শিক্ষাদান করিতে হইবে। যথা— কৃষকপুত্র কিছু কিছু নূতন প্রণালীতে কৃষিবিদ্যায়, তন্তুবায় পুত্র ঐ ভাবে বস্ত্রবয়ণ শিল্পে, সূত্রধার পুত্র দারু-কার্য্যে—এইরূপে প্রতিবর্ণের বালককেই নিজ নিজ অর্থকরী বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিতে হইবে। শক্তিমান মহাপুরুষগণের জীবনাদর্শে নিজ জীবন গঠন পূর্ব্বক উহা সর্ব্বসমক্ষে উজ্জ্বল রাখিয়া তাহাদের নৈতিক ও ধর্ম্মজীবন গঠনে সহায়তা করিবেন। এইরূপ প্রণালীতে ভারতের প্রতি পল্লীগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে। যাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছুক তাহারা College অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা বিস্তার কেন্দ্রে গমন করিবে। সেখানেও ঐ সমুস্ত Technical department থাকিবে। কিন্তু উহার জন্য এক্ষণেই মাথা ব্যথার প্রয়োজন নাই—ভবিষ্যতের চিন্তা ভবিষ্যতেই হইবে। এখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া এস, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করি। তীরে সন্তরণ বিদ্যায় পটু হইয়া নদী উত্তীর্ণ হওয়া যায় না—জলে নামিয়াই আমাদিগকে সন্তরণ শিক্ষা করিতে হইবে। প্রথম কত ডুবিতে হইবে উঠিতে হইবে, কত বিপত্তি ও নিষ্ফলতার সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু এইরূপ হাবুডুবু খাইতে খাইতেই আমাদের হস্ত ও পদ শক্তি সম্পন্ন, ক্ষিপ্র ও দক্ষ এবং চিত্ত সতেজ ও নির্ভীক হইয়া উঠিবে। এই গ্রাম্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন স্বামীবিবেকানন্দের কর্ম্ম-জীবনের অন্যতম চরমলক্ষ্য ছিল। তিনি স্থির জানিতেন এই পশুবৎ অজ্ঞ ও উপেক্ষিত নীচ জাতির মধ্যেই ভারতের নব জাগরণ শক্তি সুপ্ত রহিয়াছে। তাহারা উন্নত হইলেই ভারত আবার উন্নতির শীর্ষস্থানে উপনীত হইবে। তাঁহার যোগলব্ধ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি শক্তি

উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাইয়াছিল—ভবিষ্যত ভারতের জাতীয় জীবন কোথা হইতে আসিবে। তাই তিনি একস্থানে উহার ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন—"* * * নূতন ভারত বেরুক্। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনিওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত থেকে।" স্বার্থ-সর্ব্বস্ব দীন দরিদ্রের অস্থি মাংস ও মেদচর্ব্বনকারী আভিজাত্যবর্গের দ্বারা যে কোনই মঙ্গলাশা নাই, তাহারা যে বহুশত বর্ষব্যাপী স্বীয় দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়মে আজ বিনাশের পথে অগ্রসর এবং ঐ সমস্ত পদদলিত নীচ অস্পৃশ্য জাতিই যে অচিরে তাহাদের পরিত্যক্ত তক্ত অধিকার করিয়া বসিবে সে কথাও তিনি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"অতীতের কঙ্কালচয়! ঐ সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত, ঐ তোমার রত্ন পেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো, তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুন্‌বে কোটী জিমূতস্যন্দী, ত্রৈলোক্য কম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধনধ্বনি ওয়াহ গুরুজিকী ফতে।"

নিজ পায়ের উপর দাঁড়াইবার শক্তি যতদিন না হয়, নিজ অভাব বোধ ও আকাঙ্ক্ষা যতদিন না অন্তরে জাগিয়া উঠে, স্বার্থসুখের অন্ধকারময় গহ্বর হইতে যে জাতির আত্মা যতদিন না মুক্ত হয়, ততদিন সে জাতি উঠিতে পারে না, উঠিলে দাঁড়াইতে অক্ষম। অন্যের উপর নির্ভর করিলে আর চলিবে না, এখন হইতে আমাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। বহুদিন ত আমরা করঙ্গ হস্তে পরের দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়াছি, বহুদিন ত আমাদিগকে একটু তুলিয়া ধরিবার জন্য বলবানের চরণে হৃদয়ের কত কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছি, কত দিন ধরিয়া কত ভাব ভাষা ছন্দে হৃদয়ের অসহ্য বেদনা বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছি কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার ফল কিছু কি হইয়াছে? তাহার প্রত্যুত্তর কিছু কি আসিয়াছে? গলাধাক্কা দিয়া আমাদিগকে বিশ্ব-সীমান্তরালে মৃত্যুর যবনিকাপারে নিক্ষেপ করিতে

সচেষ্ট হওয়া ব্যতীত আর কোন সাহায্য আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে কি পাইয়াছি? ভাই, ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করা যায় না। অভাবের নিদারুণ কষাঘাতে দিবা রাত্র জর্জ্জরিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুও শতগুণে শ্রেয়ঃ। ভারত-লক্ষ্মীর সন্তান হইয়া ভিক্ষুকের বেশে ধনীর দ্বারে "দেহি দেহি" রব করা অপেক্ষা হীনতার কার্য্য আর কি আছে? এস, এ ভিক্ষুকের বেশ ছিঁড়িয়া ফেলি, ভিক্ষাপাত্র ভূমি তলে নিক্ষেপ করিয়া আত্মশক্তিতে জাগরিত হই, এস, নব-যুগের এই নবীন উষার নূতনত্বকে আলিঙ্গন করি। যখন যে জাতি বিনষ্ট হয় তখন তাহাদের নূতনত্ব বোধ নষ্ট হইয়া যায়, এই নূতনত্ব বোধ নষ্ট হওয়াই জাতির বিনাশের প্রধানতম কারণ। আমরা বহুদিন হইল এই নূতনত্বকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়াছি। "যেনাস্য পিতরো যাতাঃ", বাপপিতামহ যাহা করিয়াছেন আমাদিগকে ঠিক তাহাই করিতে হইবে। তাহার একটু এদিক ওদিক হইলেই সর্ব্বনাশ, উকিলের পুত্রকে বংশানুক্রমে উকিলই হইতে হইবে, ডেপুটির পুত্র পৌত্রকে ডেপুটিই হইতে হইবে—যখন যে দেশের জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ ভাবের উদয় হয় তখন সেই জাতির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ভ্রাতৃগণ! প্রতিবৎসর শতসহস্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া স্বদেশে পরস্পর গুঁতাগুতি করিতেছ কেন? স্বদেশের কর্ম্মক্ষেত্র ত সীমাবদ্ধ নহে। এখানে পরস্পর গুতাগুতি না করিয়া যাওনা জাপান ইউরোপ আমেরিকায় শতসহস্র। সেখান হইতে অর্থাগমের নব নব উপায় শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন কর না কেন? কৃষি-বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন প্রণালী শিক্ষা করিয়া স্বদেশীয় সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে নূতন ধরনে কৃষিকার্য্য দ্বারা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান হওনা কেন? প্রথমে দেশবাসীর ক্ষুধাতুর উদরে দুটি দুটি অন্ন দিবার ব্যবস্থা কর, বুভুক্ষু জীবের সম্মুখে ঐতিহাসিক তথ্য বা দার্শনিক আলোচনা বন্যার স্রোতের মত কোথায় ভাসিয়া যাইবে। প্রথমে তাহাদের উদরে কিছু পুষ্টিকর খাদ্য দাও, তাহাদের মস্তিষ্ককে সবল করিয়া তোল, পরে তাহাদিগের সম্মুখে যাহা কিছু ধরিবে, মস্তিষ্কে যাহা কিছু প্রদান করিবে, তাহা স্বল্পকালের মধ্যে ফলফুলে পরিণত হইবে।

বদরীপথে শঙ্কর।

(শ্রীমতী—)

কাশী হইতে বদরিকাশ্রম যাইতে হইলে হরিদ্বার পর্য্যন্ত অনেকগুলি পথ আছে। শঙ্কর কাশীবাসিগণের নিকট ইহা শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে কোন্ পথে হরিদ্বার পর্য্যন্ত যাইবেন, সে বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং শিষ্যগণের অভিমত জানিতে চাহিলেন। সনন্দন প্রভৃতি কতিপয় দক্ষিণ ভারতবাসী শিষ্য কহিলেন "মহাত্মন্! আমাদের মনে হয়, গঙ্গাতীর ধরিয়া যাইলেই ভাল হয়। আবার কেহ বলিলেন "অযোধ্যার ভিতর দিয়া চলুন।" অপর কেহ বলিলেন "কুরুক্ষেত্র দিয়া গমন করা যাউক।" কিন্তু পরিশেষে গঙ্গাতীরের পথে যাওয়াই স্থির হইল।

একদিন প্রাতঃকালে এই ক্ষুদ্র সন্ন্যাসীর দল প্রাতঃকৃত্যসমাপন করিয়া 'জয় বিশ্বনাথ কি জয়' বলিয়া গঙ্গাতীরের পথে হরিদ্বার যাত্রা করিলেন। দূরদেশ যাত্রিপথিকগণ প্রায় রিক্তহস্তে কেহই গৃহত্যাগ করেন না, সামর্থ্যানুযায়ী দ্রব্য সম্ভার সকলেই সঙ্গে লইয়া থাকেন। কিন্তু এই সন্ন্যাসীদিগের কোন দ্রব্যই সঙ্গে নাই বলিলেই হয়। সকলেই দণ্ড কমণ্ডলু হস্তে এবং মৃগচর্ম্মাবৃত কুশাসন ও পুঁথিপত্রাদি মাত্র লইয়া চলিয়াছেন। সন্ন্যাসীদিগের মুণ্ডিত মস্তক, আজানুলম্বিত গৈরিক বহির্ব্বাস। একখানি গৈরিক বসন সন্ন্যাসীদিগের সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া বক্ষঃস্থলে গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কেবল হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডল অনাবৃত হইয়া আছে। ললাটে ভস্মের ত্রিপুণ্ড্র, গলদেশ, বাহুমূল এবং মণিবন্ধ রুদ্রাক্ষ মালো সুশোভিত। নগ্নপদ এবং অনাবৃত মস্তক। সন্ন্যাসিগণের বদনকমল প্রসন্ন ও দৃঢ়তাময়। ব্রহ্মচর্য্য জনিত ব্রহ্মতেজ যেন নয়ন পথে বিকীর্ণ হইতেছে। অগ্রে যুবক শঙ্কর, পশ্চাতে যুবক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ শিষ্যগণ ধীরপাদবিক্ষেপে কোন দিকে না চাহিয়া এক মনে দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছেন।

ক্রমে তাঁহারা কাশীর সীমা অতিক্রম করিলেন। পূর্ব্বদিকের

বালার্কারুণ ছটা খরতর রৌদ্রে পরিণত হইল। পবনদেব যেন গঙ্গা-স্নানান্তে শীতলমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সন্ন্যাসিগণের ঘর্ম্ম নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পবিত্রীদেবী সন্তানের মধ্যাহ্ন মার্ত্তাণ্ডের উত্তাপ জনিত ক্লেশ নিবারণ মানসে, স্বয়ং উত্তপ্ত হইয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটী গ্রামের এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিলেন। এই স্থান হইতে বিন্ধ্যাচলের অপূর্ব্ব শোভা সন্ন্যাসীদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সন্ন্যাসিদল ক্ষণকাল বিশ্রামপূর্ব্বক মধ্যাহ্নস্নান সমাপন করিয়া ইষ্টপূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্কর বৃক্ষমূলে অবস্থান পূর্ব্বক বিশ্রাম সুখভোগ করিতে করিতে যেন একটা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। এদিকে শিষ্যগণ শঙ্করের ভিক্ষার ব্যবস্থার জন্য চঞ্চল হইলেন। সকলেই শঙ্করের আদেশ অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব। কিন্তু বিধাতা যে ইতিমধ্যে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা ক্ষণপরেই বুঝিতে পারিলেন। গ্রামবাসিগণ গঙ্গাস্নানে আসিয়া এই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীর দল দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছিল এবং অনেকেই তাঁহাদের ভাবভঙ্গী দর্শনে তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েকজন ব্যক্তি এই সন্ন্যাসীদিগকে যথাসাধ্য ভিক্ষাদানের জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু সহসা কেহ কিছু বলিতে পারিতেছিল না। তাহাহের মধ্যে কয়েকজন সন্ন্যাসীদিগের নিকটে কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু একটী ব্রাহ্মণ একটী বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে প্রণিপাত পূর্ব্বক করজোড়ে কহিলেন "মহাত্মন্। মধ্যাহ্ন-কাল উপস্থিত, যদি আদেশ হয় তাহা হইলে আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া আজ আমায় কৃতার্থ করুন।" উত্তরে সন্ন্যাসী, শঙ্করকে দেখাইয়া বলিলেন "মহাশয় আমরা এই মহাত্মার শিষ্য। উঁহার যেরূপ আদেশ হইবে, আমরা তাহাই করিব।" ব্রাহ্মণ তাহা শুনিয়া শঙ্কর সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্ব্বক করজোড়ে তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। ব্রাহ্মণের অতিথিসৎকাররূপ প্রবল ইচ্ছা শক্তি বুঝি সমাধিস্থ শঙ্করেরও মনকে বিচলিত করিল। শঙ্কর সহসা নয়ন উন্মীলন করিলেন এবং ব্রাহ্মণকে তদবস্থ দেখিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক তাঁহার কি প্রার্থনা জানিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণ বিনীত ভাবে নিজ প্রার্থনা শঙ্কর চরণে

নিবেদন করিলেন। শঙ্কর সনন্দনকে লক্ষ্যকরিয়া বলিলেন "বৎস! এই ব্রাহ্মণের পরিচয় গ্রহণ কর, যদি ইনি সদাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হয়েন তবে ইঁহার ভিক্ষাগ্রহণ করিতে পার।"

শঙ্করের সেবা করিবার ভাগ্য যাঁহার হইবে তিনি কি কদাচারী হইতে পারেন! সনন্দন ব্রাহ্মণের পরিচয়ে পরিতুষ্ট হইলেন এবং তদনুসারে সকলে ব্রাহ্মণের সহিত গ্রামে যাইয়া ভিক্ষাগ্রহণ করিলেন।

এই ভাবে ভিক্ষা করিতে করিতে সন্ন্যাসীর দল ক্রমে বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্ত্তী হইলেন। দেখিলেন বিন্ধ্যাচল যেন জাহ্নবীদেবীর দক্ষিণাভিমুখী গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান। আর জাহ্নবীদেবী যেন কুপিত হইয়া পিত্রালয়ে যাইবার জন্য উত্তরাভিমুখী হইয়াছেন। পরপারে পর্ব্বতোপরি একটী নগর। লোকপরম্পরায় শুনিলেন সেখানে রামলীলা-সহায় গুহকচণ্ডালের বাস ছিল। বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরি যে গুহামধ্যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহাও তথায় বিদ্যমান। (এই স্থানটী বর্ত্তমান চুণার)।

এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে শঙ্কর বিন্ধ্যবাসিনী তীর্থের পরপারে আসিলেন। গঙ্গাতীরে শৈলোপরি একটী ক্ষুদ্র নগর। তন্মধ্যে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছে। লোকমুখে শুনিলেন ইনি অষ্টভুজা ও সতীর বায়ান্ন পীঠের একটী পীঠস্থান। এখানে সতীর বামপদ পতিত হইয়াছিল। অদূরে যোগমায়াদেবীর মন্দির। ইনি যশোদার কন্যারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং কংসরাজ ইহাকে শিলোপরি নিক্ষেপপূর্ব্বক নিহত করিবার চেষ্টা করিলে ইনি কংশের হস্ত হইতে স্খলিত হন এবং শূন্যমার্গে উত্থিত হইয়া বলিয়া যান "তোমাকে মারিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।" বিন্ধ্যবাসিনীদেবীর অর্দ্ধক্রোশ দূরে উচ্চতর পর্ব্বতশৃঙ্গে মহাকালীর মন্দির। ভগবতী এই মহাকালীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শুম্ভাসুরকে নিহত করেন। তদবধি এই স্থানে ভগবতীর এই মূর্ত্তির পূজা হইয়া আসিতেছে।

শিষ্যগণ লোক মুখে এই সব মাহাত্ম্য কথা শুনিয়া দেবতা দর্শনে উৎসুক হইলেন। শঙ্কর শিষ্যগণের আগ্রহ দর্শনে নৌকাযোগে সশিষ্য

পরপারে যাইয়া যথাবিধি দেবদর্শন কার্য্য সমাধা করিলেন এবং পরপারে আসিয়া প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী হইতে প্রয়াগের পথে গঙ্গাদেবীর শোভা অতুলনীয়া। কোথাও সরল, কোথাও বক্র, কোথাও কুটিল নানাভাবে নানাভঙ্গীতে গঙ্গাদেবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিতা। দক্ষিণে গগনস্পর্শী বৃক্ষলতাদি পরিশোভিত বিপুলকায় বিন্ধ্যাচল; উত্তরে বিশাল সমতল ক্ষেত্র—শস্যশ্যামলরূপ ধারণ করিয়া বিরাজিত। দক্ষিণ দিকে কঠিন দুর্ভেদ্য প্রস্তরের দৃশ্য, উত্তর দিকে কোমল কমনীয় বালুকা বহুল মৃণ্ময় ভূমি।

এইরূপে প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্য দেখিতে, দেখিতে সন্ন্যাসীর দল ক্রমে প্রয়াগের পরপারে সেই পুরাণ প্রসিদ্ধ কেশী বা প্রতিষ্ঠানপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শঙ্কর শুনিলেন এইস্থানে চন্দ্রবংশীয় পুরুরাজার রাজধানী ছিল। স্থানটী অতি মনোরম। ক্রমে ইহাঁরা নানাস্থান দেখিলেন। গুপ্ত বংশীয় রাজগণের কীর্ত্তি ধ্বংসোন্মুখ এবং গঙ্গাতীরে অনতি উচ্চ পর্ব্বতোপরি বহু দেবদেবীর মন্দির, সাধুগণের সাধন স্থানরূপে বহু দুর্গম গুহা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ বিদ্যমান রহিয়াছে। শঙ্কর সশিষ্যে ক্রমে ক্রমে এই স্থানটী পরিদর্শন করিলেন। সনন্দন গুরুবাক্য স্মরণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের প্রাচীন ভাষ্যাদির অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু প্রার্থিত বস্তু কি সর্ব্বদা সুলভ হয়? (এই স্থানটী বর্ত্তমান ঝুসি) এই স্থান হইতে শঙ্কর নৌকা সাহায্যে প্রয়াগে আসিলেন। পরপার হইতে প্রয়াগের শোভা পথিকগণের চিত্ত হরণ করিয়াছিল। বামদিকে সুদূর পশ্চিম হইতে যমুনাদেবী কাক চক্ষুর ন্যায় নির্ম্মল কাল জল আনিয়া ঢালিয়া দিতেছেন এবং উত্তরদিক হইতে গৈরিক বর্ণ জল গঙ্গাদেবী ঢালিয়া দিতেছেন। মস্তকোপরি অতি মহান্ আকাশ। যেন প্রকৃতিদেবী আকাশ সদৃশ বিপুল বপু ধারণ করিয়া গঙ্গা ও যমুনারূপে জ্ঞান ও ভক্তি স্বরূপ দুইটী বাহু প্রসারিত করিয়া সন্তানগণকে কোলে টানিয়া লইতেছেন। গঙ্গাবক্ষ হইতে প্রয়াগের এই অপরূপ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আচার্য্য সশিষ্য প্রয়াগক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন।

এ সময় প্রয়াগে বৈদিক ধর্ম্মের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেও বৌদ্ধগণও যথেষ্ট প্রবল। প্রয়াগবাসিগণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মলিন পীত বর্ণের কষায় বস্ত্র দেখিতে অভ্যস্ত ছিল। এক্ষণে উজ্জ্বলবর্ণ গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসীর দল দেখিয়া সকলে বিস্ময়ান্বিত হইল। তাহারা সন্ন্যাসীদিগের পরিচয় লাভের জন্য কৌতূহলী হইয়া নিকটে আসিল। কিন্তু যুবক সন্ন্যাসীর ধীর প্রসন্ন গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই চপলতা ত্যাগ করিল। কেহই আর সাহস করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। শঙ্কর বৌদ্ধ ও বৈদিক ধর্ম্মের কীর্ত্তি পাশাপাশি দেখিতে দেখিতে সঙ্গম স্থলে আসিলেন।

পথ শ্রান্তি দূর হইলে স্নান করিবেন ভাবিয়া শঙ্কর এক বৃক্ষমূলাভি-মুখে অগ্রসর হইলেন। সনন্দন ইহা দেখিয়া ত্বরিত গতিতে উপযুক্ত স্থানে গুরুদেবের জন্য একটী আসন বিস্তৃত করিয়া দিলেন এবং আচার্য্য উপবিষ্ট হইলে সকলে তাঁহার পশ্চাতে উপবেশন করিলেন।

এই অবকাশে একটী শিষ্য শঙ্করের সম্মুখে আসিয়া করজোড়ে বলিলেন "ভগবন্ আমরা কাশী থাকিতে আপনার রচিত গঙ্গাস্তবটী পাঠ করিতে করিতে স্নান করিতাম, আজ সঙ্গম স্থলে স্নান কালে গঙ্গা স্তবের পর একটী যমুনার স্তব পাঠ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আপনার দয়া হইলে তাহা আমাদের পক্ষে দুর্লভ হইবে না।"

শঙ্কর শিষ্যের এই পবিত্র ইচ্ছা অবগত হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা বৎস! তাহাই হইবে। কিছুক্ষণ পরে শঙ্কর মনে মনে একটী স্তব রচনা করিয়া শিষ্যটীকে বলিলেন "বৎস! কণ্ঠস্থ করিয়া লও। শঙ্করের সঙ্গে পাঠ করিতে করিতে শিষ্যটী যমুনাস্তবটী কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেন। অতঃপর সঙ্গম স্থানে স্নানকালে কয়েকটী গুরু ভ্রাতার সঙ্গে মিলিয়া গঙ্গা ও যমুনাস্তব পাঠ করিলেন।

(যমুনাষ্টকম্)

মুরারি কায়কালিমা ললাম বারিধারিণী
তৃণীকৃত ত্রিবিষ্টপা ত্রিলোক শোকহারিণী।

মনোঽনুকূল কূলকুঞ্জ পুঞ্জধূত দুর্মদা

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ নন্দিনী সদা ॥১

মলাপহারি বারি পূরিভূরি মণ্ডিতামৃতা

ভৃশং প্রপাতকপ্রপঞ্চ নাতিপণ্ডিতানিশা।

সুনন্দনন্দিনাঙ্গসঙ্গ রাগরঞ্জিতাহিতা

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥২

লসত্তরঙ্গসঙ্গধূতভূতজাত পাতকা

নবীন মাধুরীধুরীণ ভক্তিজাত চাতকা।

তটান্তবাসদাস হংসসংসৃতাহ্নিকামদা

ধুনোতুমে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥৩

বিহাররাস খেদভেদধীর তীরমারুতা

গতা গিরামগোচরে যদীয়নীর চারুতা।

প্রবাহ সাহচর্যপূত মেদিনীনদীনদা

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥৪

তরঙ্গসঙ্গ সৈকতান্তরান্বিতা সদাসিতা

শরন্নিশাকরাংশুমঞ্জুমঞ্জরী সভাজিতা।

ভবার্চনা প্রচারুণাম্বুনাধুনা বিশারদা

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥৫

জলান্তকেলি কারিচারু রাধিকাঙ্গরাগিণী

স্বভর্ত্তুরন্যদুর্লভাঙ্গতাঙ্গতাংশভাগিনী

স্বদত্তসুপ্তসপ্তসিন্ধু ভেদিনাতিকোবিদা

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥৬

জলচ্যুতাচ্যুতাঙ্গরাগলম্পটালিশালিনী

বিলোলরাধিকাকচান্তচম্পকালিমালিনী।

সদাবগাহনাবতীর্ণভর্ত্তৃভৃত্য নারদা

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥৭

সদৈব নন্দিনন্দকেলিশালি কুঞ্জমঞ্জুলা

তটোত্থফুল্লমল্লিকাকদম্বরেণুসূজ্জ্বলা।

জলাবগাহিনাং নৃণাং ভবাব্ধি সিন্ধুপারদা

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥৮

স্নানান্তে দেবদর্শন প্রশস্ত। সুতরাং এইবার সন্ন্যাসীর দল দেবদর্শনে যাইবেন। কিন্তু কোথায় কি দর্শনীয় আছে কে বলিয়া দিবে? তাঁহারা এইরূপ ভাবিতেছিলেন এমন সময় দর্শকগণের মধ্যে যাঁহারা পাণ্ডা ছিলেন তাঁহারা তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাদিগকে দেবদর্শনে আমন্ত্রণ করিলেন।

তীর্থগুরু পাণ্ডাগণের সাহায্যে সন্ন্যাসীর দল একে একে প্রয়াগের প্রসিদ্ধ প্রায় সকল দেবদেবীর মূর্তিদর্শন করিলেন। এই স্থানে সতীর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী পতিত হয় তদুপলক্ষে এখানে ললিতাদেবী এবং শিব ভব-নামক ভৈরবরূপে বিরাজমান। এই স্থানেই ভরদ্বাজ মুনি দুশ্চর তপস্যা করিয়াছেন। অদূরে তাঁহার সেই আশ্রমও দেখিলেন। এই স্থান হইতে কিছু দূরে বাসুকীঘাট শ্রীরামচন্দ্র বনবাস গমনকালে এই স্থানে গঙ্গাপার হন। এখানে বাসুকীদেবীর মন্দির বিরাজমান। শ্রীরামচন্দ্র এই স্থানে যে শিবেরপূজা করিয়াছিলেন তিনি আজ শিবকোটী নামক এক মন্দিরে বিরাজমান। এই শিবের পূজা করিলে কোটি শিবপূজার ফল হয়। সঙ্গম স্থলের নিকটে পাতালপুরী। এখানে অক্ষয়বট ও এক শিবমূর্ত্তি আছেন। এই অক্ষয়বটে আরোহণ করিয়া সঙ্গমস্থলে আত্ম বিসর্জ্জন করিলে স্বর্গ হয় এই বিশ্বাসে তখনও বহুলোক প্রাণ দিত। অদূরেবেণীমাধবের মন্দির। সন্ন্যাসীরা একে একে সবই দেখিলেন। বৌদ্ধ-প্রভাব অল্প হইলেও যথেষ্ট। অশোকের বহুকীর্ত্তি তখনও বিদ্যমান। যে বৌদ্ধভিক্ষুগণ এক সময়ে বহু বৈদিক পণ্ডিতগণকে এস্থলে পরাজিত করিয়াছিলেন এখন কুমারিল্লের অভ্যুদয়ে বৈদিকগণের নিকট ক্রমে তাঁহারা মস্তক অবনত করিতেছেন। সন্ন্যাসীর দল ক্রমে এই সকল স্থানই দেখিলেন।

তখনও প্রয়াগবাসিগণ কাণ্যকুব্জরাজ বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী হর্ষবর্দ্ধন ও রাজ্য-বর্দ্ধনের অদ্ভুত দানের কথা কীর্ত্তন করিত। হর্ষবর্দ্ধন যে পাঁচ বৎসর অন্তর দান করিয়া রাজকোষশূন্য করিতেন, প্রয়াগ তাঁহার সে দান ভূমি ছিল।

এই রূপে যে কয়দিন শঙ্কর প্রয়াগে অবস্থিতি করিলেন সেই কয়দিন তিনি অতীতের কথা শুনিতে লাগিলেন। সনন্দন প্রভৃতি শিষ্যগণ প্রাচীন গ্রন্থের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কতকটা কৃতকার্য্যও হইলেন। একদিন ললিতাদেবীর এক ভক্ত শঙ্করের নিকট আগমন করিয়া ললিতাদেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে দেবীর উপর কিরূপে তাঁহার ভক্তিদৃঢ় হয়, আচার্য্যকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। শঙ্কর তাঁহার ভক্তি দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া একটী স্তবরচনা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন ব্রাহ্মণ! আপনি ইহা নিত্য পাঠ করিবেন, ইহাতে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে আশাকরি। সেই স্তবটী এই যথা—

(ললিতা পঞ্চরত্ন)

প্রাতঃ স্মরামি ললিতাবদনারবিন্দং
　　বিম্বাধরং পৃথুলমৌক্তিকশোভিনাসম্।
আকর্ণ দীর্ঘনয়নং মণিকুণ্ডলাঢ্যং,
　　মন্দস্মিতং মৃগমদোজ্জ্বলফালদেশম্॥ ১

প্রাতর্ভজামি ললিতাভুজকল্পবল্লীং,
　　রক্তাঙ্গুলীয়লসদঙ্গুলি পল্লবাঢ্যাম্।
মাণিক্যহেমবলয়াঙ্গদশোভমানাং
　　পুণ্ড্রেক্ষুচাপ কুসুমেষুসৃণীর্দধানাম্॥ ২

প্রাতর্নমামি ললিতাচরণারবিন্দং
　　ভক্তেষ্টদাননিরতং ভবসিন্ধুপোতম্।
পদ্মাসনাদিসুরনায়ক পূজনীয়ং
　　পদ্মাঙ্কুশধ্বজসুদর্শন লাঞ্ছনাঢ্যম্॥ ৩

প্রাতঃস্তবে পরশিবাং ললিতাং ভবানীং
　　ত্রয্যন্তবেদ্যবিভবাং করুণানবদ্যাম্।
বিশ্বস্য সৃষ্টিবিলয়স্থিতিহেতু ভূতাং
　　বিদ্যেশ্বরীং নিগম বাঙ্মনসাতিদূরাম্॥ ৪

প্রাতর্বদামি ললিতে তব পুণ্যনাম,
　　কামেশ্বরীতি কমলেতি মহেশ্বরীতি।

শ্রীশাম্ভবীতি জগতাং জননী পরেতি
বাগ্‌দেবতেতি বচসা ত্রিপুরেশ্বরীতি ॥ ৫
যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং ললিতাম্বিকায়াঃ,
সৌভাগ্যদং সুললিতং পঠতি প্রভাতে।
তস্মৈ দদাতি ললিতা ঝটিতি প্রসন্না
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিমলসৌখ্যমনন্ত কীর্ত্তিম্ ॥ ৬

অতঃপর শঙ্কর উত্তর পশ্চিমাভিমুখে গঙ্গাতীর ধরিয়া ক্রমে তমসানদী ও গঙ্গাসঙ্গমে বাল্মীকীর তপোবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এস্থানে সীতাদেবীর বনবাস হয়। এই স্থানেই গঙ্গাতীরের অদূরে ব্রহ্মা সুরনুষ্ঠেয় মহাযজ্ঞ করিয়াছিলেন। মহর্ষি কপিলও পূর্ব্বকালে এই স্থান তপস্যা করিয়া ছিলেন। আচার্য্য সেই বাল্মীকীর প্রতিষ্ঠিত শিব এবং কপিল প্রতিষ্ঠিত শিব, একে একে দর্শন করিলেন। সেই সীতাদেবীর অবস্থিতি স্থান, সেই কমনীয়দর্শন। তপোবনের শোভা সম্বর্দ্ধক দুর্ল্লভ পাদপ শ্রেণী দর্শন করিলেন। মহর্ষির সময় হইতে এপর্য্যন্ত কত রাজকীয় উপদ্রব হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে স্থানের পবিত্রতা, সে স্থানের প্রাণারাম দৃশ্য যেন মলিন হয় নাই, আচার্য্য তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। শিষ্যগণ এই স্থানে আসিয়া জগৎ যেন ভুলিয়া গেলেন। সেই চির বাঞ্ছিত সমাধি-মন্দির, যেন আপনাআপনি উন্মুক্ত দ্বার হইয়া গেল। (এ স্থানটী এখন ব্রহ্মবর্ত্ত বা বিঠুর নামে প্রসিদ্ধ। ইহা কাণপুর হইতে ১০।১২ মাইল হইবে।)

বাল্মীকী আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া কিছুদূর আসিয়া শঙ্কর ইক্ষুমতী ও বর্ত্তমান কালিনদীও গঙ্গাসঙ্গম স্থিত পরিখা পরিবেষ্টিত কাণ্যকুব্জ নগরে উপস্থিত হইলেন। প্রবেশ করিয়া শঙ্কর দেখিলেন সুন্দর কান্তি দৃঢ়কায় প্রশস্তবক্ষ দীর্ঘাকৃতি উষ্ণীষধারী ক্ষত্রিয় বীরপুরুষগণ সশস্ত্র হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। কোথায় বা তাহারা ব্যায়াম করিয়া মৃন্মণ্ডিত দেহে স্ফীতবক্ষে দলবদ্ধ হইয়া চলিতেছে। ব্রাহ্মণগণ পূজোপকরণ হস্তে মন্দিরাভি-মুখে যাইতেছে। বৌদ্ধভিক্ষুগণ সংযত ভাবে ধীরে ধীরে পথ চলিতেছে। রমণীগণ বহুমূল্য বস্ত্র অলঙ্কারে ও পুষ্পাদিতে সজ্জিত হইয়া নির্ভীকচিত্তে

স্থানান্তরে গমন করিতেছে। বিদ্যার্থিগণ পুস্তক কক্ষে দ্রুতবেগে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে যাইতেছে। হস্তী, অশ্বযান, গোযান শশব্যস্তে চলিয়াছে। পথিপার্শ্বে বিপণিশ্রেণী জনতায় পরিপূর্ণ। মন্দিরদ্বার ও গৃহদ্বারগুলি প্রায় পুষ্পমাল্যে মণ্ডিত। যেন সত্ত্ব ও রজগুণ মূর্ত্তিমান হইয়া নগরে বিরাজমান। বিলাস, বীরত্ব, পাণ্ডিত্য, ধর্ম্মপরায়ণতা ও ঐশ্বর্য্য যেন সমভাবে বিদ্যমান। গঙ্গাতীরে অগণ্য অভ্রভেদী বৌদ্ধস্তূপের দৃশ্য, শঙ্করের হৃদয় বৈদিক-ধর্ম্মের দুরবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিল। তাঁহারা অন্বেষণ করিয়া একটী শিব মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হর্ষবর্দ্ধন পরলোক গমন করিলেও এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব এতই ছিল যে নগরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এখানে ব্রাহ্মণগণ আছেন কিনা এবিষয়ে সনন্দনের সন্দেহ জন্মিল। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার এসংশয় দূর হইল। নগরে প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতেই তাঁহারা দেখিলেন বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহ, বহু দেবদেবীর মন্দির বিরাজিত রহিয়াছে। কিন্তু এইবার সন্ন্যাসীর দল রাজৈশ্বর্য্যের মোহন শক্তি কিরূপ তাহা অনুভব করিলেন। নগরের সর্ব্বত্র নয়নাভিরাম পুষ্পোদ্যান, ফলভারাবনত বৃক্ষরাজি, সুদৃশ্য বাসভবন, নির্ম্মল সলিল পূর্ণ সুদৃশ্য সরোবর, সরল সুপরিষ্কৃত রাজপথ, বিবিধ বিলাস ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিপণি শ্রেণী। অলঙ্কার এবং উজ্জ্বলবর্ণ বস্ত্রাদি পরিহিত প্রসন্নবদন নগরবাসিগণ স্ব স্ব কার্য্যে নিরত। ধর্ম্মাচরণ ও বিদ্যানুরাগ সম্পন্ন ব্রহ্মণ পণ্ডিত ও বৌদ্ধভিক্ষুগণ সন্ন্যাসিদলের চিত্ত আকর্ষণ করিল। নগরবাসীরাও এই সন্ন্যাসীর দল দেখিয়া চমৎকৃত হইল, কারণ এরূপ বেশধারী সন্ন্যাসী তখন দেখা যাইত না। কিন্তু বৌদ্ধগণ ইঁহাদিগকে বৈদিক মতাবলম্বী বুঝিয়া অবিলম্বে ইঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিলেন। কেবল ব্রাহ্মণগণ অতিথি সৎকারের জন্য ব্যস্ত হইলেন। যে শঙ্কর যে সনন্দন চারি বৎসর পরে বিচার যুদ্ধে ভারতের সমুদায় বিচার মল্লকে উদ্বাস্ত ও লণ্ডভণ্ড করিবেন আজ তাঁহারা নিরীহভাবে অবস্থান করিতেছেন। জিজ্ঞাসুকে জিজ্ঞাস্য বিষয় বুঝাইয়া দিতেছেন, শ্রেয়ঃকামীকে শ্রেয়োমার্গ উপদেশ দিতেছেন মাত্র। (ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি ও গীতি।

(স্বামী বাসুদেবানন্দ)

শিশু-ভারত আকাশ রঙ্গমঞ্চে চন্দ্র-সূর্য্য ও অসংখ্য তারাগুচ্ছের নাগরদোলার অবিরাম ক্রীড়াচক্রের গতি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হয়—কাননের সুন্দর পুষ্পে কর্ণ ভূষিত করিয়া নির্জ্জনে নিজের ভাবে নিজেই বিভোর হয়—ঝরনার ঝর ঝর শব্দে, পক্ষীর কলতানে নিজের সুর মিলাইয়া, তাহার নর্ত্তনে অঙ্গভঙ্গী করিয়া কতই না আনন্দ অনুভব করে। সমুদ্রের গভীর কল্লোল, উচ্চশৃঙ্গের অনাদি তুষার, শান্ত স্বচ্ছ নীলাকাশ, নদ নদীর বিশ্রাম হীন প্রবাহ, নিবিড় কাননের শীতল ছায়া যখন সেই শিশু হৃদয়ে প্রতিভাত হয় তখন কোন্ অজানা শক্তি তাহার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য উৎস খুলিয়া দেয় তা কে জানে? চুপে চুপে লতা কেমন করিয়া তরুর বক্ষ জড়াইয়া ধরে, বায়ুর সহিত পত্রবল্লরী কিরূপে দোলে, কখন কি সুরে পাখীর গীতি নীরব প্রান্তরে খেলিয়া বেড়ায়, কেমন করিয়া মেঘমন্দ্রে ময়ূর নৃত্য করে, চপলা তাহার সহিত কিরূপ লুকাচুরী খেলে, কেমন করিয়া মিহিকা গাছের পাতায় দুল ঝুলাইয়া দেয়, শ্যামল দুর্ব্বাদল মুক্তাখচিত করে, তাহা সে লক্ষ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তুলনার আকাঙ্ক্ষাও তাহার মনে দেখা দেয়। কেবল প্রাকৃত জড়ের সৌন্দর্য্যে সে মুগ্ধ হয় এমন নয়, পারিপার্শ্বিক সকল মানবেতর জীবের অঙ্গভঙ্গীও তাহার মন আকৃষ্ট করে—বৃষভের গম্ভীর গমন, সিংহের গর্ব্বিত গ্রীবা, হরিণীর চকিত নয়ন, দলিতা-ফণিনীর ভীষণতা দেখিয়া কল্পনা চক্ষে সে সেগুলি নিজ ও আত্মীয়ের অঙ্গভঙ্গীতে লক্ষ করে। সে তখন তুলনা করে নিজ এবং সহচর-সহচরীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের, নিজ কণ্ঠ-স্বরের সহিত প্রাকৃত শব্দের, নিজ বাসস্থানের সহিত প্রাকৃত কুঞ্জের। —এই তুলনার শুভদিনে ভারতীয় কলাবিদ্যার অভ্যুত্থান।

এই তুলনার প্রবৃত্তি ভারত ভারতীর হৃদয়ে যত প্রবল এত আর অপর দেশে দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন গ্রীক্ রোমে এবং ইউরোপীয় মধ্যযুগে,

মনবৃত্তি (emotion) এবং নরশরীর বিজ্ঞানের (Anatomy) জ্ঞান চূড়ান্ত ভাবে কলাবিদ্যায় পরিস্ফুট হইয়াছে সত্য এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুশীলনের ফলে পোষাক-পরিচ্ছদে তথা ভাস্কর্য্যাদি নানা কারুকার্য্যে স্বভাব সৌন্দর্য্যের কথঞ্চিৎ অনুকরণ দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু ভারতীয় কলাবিদেরা মনুষ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অঙ্কনে বাহ্য স্বভাব সৌন্দর্য্য যেরূপ কাব্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে, নৃত্যে তথা ভাস্কর্য্যে তুলিত করিয়াছেন এরূপ আর কোনও জাতিতে লক্ষ্য হয় না। মানবের যাহা অতিপ্রিয় সে তাহার বিরহ সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়—সেই হেতু তাহার অতিপ্রিয়কে নিরবচ্ছিন্নভাবে উপভোগের নিমিত্ত তাহার হৃদয়ে অঙ্কন প্রবৃত্তি স্বতঃই জাগিয়া উঠে এবং সেই প্রিয়বস্তুর প্রতিকৃতিকে নয়নতৃপ্তিকর স্বভাবসৌন্দর্য্যের দ্বারা ভূষিত করিতে চায়। মানুষ যদি পারিত তাহা হইলে তাহার প্রিয় নিজস্বঃকে সে নক্ষত্রের মালা, চন্দ্র সূর্য্যকান্তি, অম্লান কুসুম দ্বারা সজ্জিত করিত (এবং যথাসম্ভব সে প্রকৃতিক সৌন্দর্য্যের আধার মণি-কাঞ্চন, কুসুম সংগ্রহও করে) কিন্তু যাহা দুষ্প্রাপ্য সে তাহা লাভ করিবার জন্য কলাদেবীর উপাসনা করে। এবং যাহাকে সে হেয় মনে করে তাহাকে সে বাহ্য যত প্রকার বীভৎস ও হাস্যোদ্দীপক বস্তুর দ্বারা চিত্রিত করে। এই তুলনা বৃত্তির প্রকাশ আমরা বৈদিক 'কপ্যাসং' হইতে আরম্ভ করিয়া ইদানীং এর 'পটল চেরা চোখে'ও দেখিতে পাই ; এবং এই অনুকরণ বৃত্তির প্রভাবে অশ্ব, গর্দ্দভ ময়ূর কোকিলাদির কণ্ঠস্বর হইতে ষড়জাদি সপ্ত স্বরের সৃষ্টি এবং অদ্ভুত ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যার প্রকাশ ঘটিয়াছে।*

---

* হিন্দুশাস্ত্র মতে বিশেষ বিশেষ জন্তু হইতে সংগীতের বিশেষ বিশেষ স্বরের সৃষ্টি হইয়াছে,—

ষড়জং রৌতি ময়ুরোহি গাবো নর্দ্দন্তি ঋর্ষভম্।
অজা বিরৌতি গান্ধারং ক্রৌঞ্চো নদতি মধ্যমম্॥
পুষ্পসাধারণে কালে কোকিলো রৌতি পঞ্চমম্।
অশ্বশ্চ ধৈবতং রৌতি নিষাদং রৌতি কুঞ্জরঃ॥

ময়ুর ষড়জে (ষ), গাভি ঋষভে (ঋ), মেষ গান্ধারে (গা), হংস মধ্যমে (ম), কোকিল পঞ্চমে (প), অশ্ব ধৈবতে (ধৈ) এবং হস্তী নিষাদে (নি) শব্দ করে। আবার

কিন্তু ক্রমে যখন অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্ম-বিজ্ঞানে গুরুপূজা হইতে অবতার তত্ত্বের প্রকাশ ঘটিল, সেই দিন হইতে ভারত-ভারতীর চক্ষের একটি পরদা যেন খুলিয়া গেল,—সে দেখিল সাধারণ রক্তমাংসের শরীরে দেবচরিত্র এবং দেবসৌন্দর্য্য আবির্ভূত হইয়াছে এবং ঐ দেব চরিত্র ও সৌন্দর্য্য সে তাহার অনুকরণ প্রাণ কলাবিদ্যায় ফুটাইয়া তুলিয়া ভারতীয় ধর্ম্মবিজ্ঞানের ভক্তি কাণ্ডের অঙ্গীভূত করিয়া দিল। ভারতীয় ব্রাহ্মণসন্ন্যাসীরা কেবল ধর্ম্মের পৌরোহিত্য করেন নাই, যজ্ঞীয় কর্ম্ম এবং ভক্তির অনুশীলনের সহিত কলাবিদ্যাকে অনুকরণ ও পার্থিব কারা হইতে মুক্ত করিয়া মনের পরপার হইতে অরূপ-সাগরোত্থিত ঈশ্বরীয়রূপের রঙে তুলিত করিয়া এক অপূর্ব্ব আদর্শ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

গ্রীকো-রোমান্ কলাবিদেরা নরশরীর-বিজ্ঞান নিজ বিষয়ে যতই ফুটাইয়া তুলুন না কেন কিন্তু একখানি চিত্রে বা প্রতিকৃতিতে একটী রাজ্য বা ইতিহাস বা একটী সমগ্র দৃশ্য বা ঘটনা তাঁহারা কখনও অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। কলাবিদ্যার বর্ত্তমান যুগপ্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'আরতি' নামক চিত্র দেখিয়া চিত্রকরকে বলিয়াছিলেন "ওহে, তোমার এ ছবিতে ধূপধুনোর গন্ধ পাওয়া যাচ্চে বটে, কিন্তু আরতির বাজনা তো শোনা যাচ্চে না"! ইহাই ভারতীয় কলাবিদ্যার যথার্থ লক্ষণ। কেবল বাদ্যযন্ত্র আঁকিলে চলিবে না বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিও যেন দর্শকের কর্ণে আঘাত করে।*

পাশ্চাত্য সকল প্রেমচিত্রেই কি যেন একটী লালসা ও আকাঙ্ক্ষার ভাব থাকিয়া যায় কিন্তু প্রাচ্যশিল্পী সংসার অনিত্য এবং চরিত্র ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে দেবত্ব জ্ঞান থাকায় আকাঙ্ক্ষা এবং লালসাকে ত্যাগ করিয়া যথার্থ প্রেম দৈহিক ভাববিকারে

মতান্তরে আছে ময়ূর ষড়জে, ভেক ঋষভে শব্দ করে। আবার কোনও কোনও প্রাচীন গন্ধর্ব্ব শাস্ত্রবিদেরা বলিয়া থাকেন যে সমুদ্র গর্জ্জন, বজ্রের কড় কড়, সমুদ্রের কল্লোল, বায়ুর সন্ সন্, নদীর কুল কুল, ঝরনার ঝর ঝর প্রভৃতি প্রকৃতিক শব্দের একত্র বা পৃথক সমাবেশে ষড়জাদি স্বরের সৃষ্টি হইয়াছে।

* নিখিল প্রবাহ—শ্রীনরেন্দ্র দেব, ১। চিত্রে সঙ্গীত।—ভারতবর্ষ—অগ্রহাণ—১৩২৭

প্রকটিত করেন। সংসার যে অনিত্য, ইদানীংকার কতকগুলি প্রাচীন শাস্ত্র এবং মহাপুরুষে অবিশ্বাসী ভোগবাদী ছাড়া সকলেই তাহা মানিত এবং মানে; তাই এই ত্যাগ-বৈরাগ্যের দেশের ললিত-কলাবিদের আদর্শ দেবদেবী। কিন্তু যাহারা মৃত্যুভয়ে ভীত, পরপার সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন তাহারাই এই জগৎটাকে সাজায় নিজের ভোগের জন্য এবং সুকুমারকলার পুষ্টিসাধন করে—মানবান্তর্গত পশুবৃত্তি এবং দৈহিক ভাব সকলকে পরিস্ফুট করিয়া। এমনকি যখনই ভারতবর্ষে ঐ ত্যাগাদর্শের হানি ঘটিয়াছে, তখনই তাহার দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পে জঘন্য চিন্তা এবং ভাব প্রকটিত হইয়াছে। অতীতেন্দ্রিয় জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন না বলিয়াই গ্রীক্ ও রোমান্‌দের সকল দেবতার প্রতিমূর্ত্তি সাধারণ নরযোদ্ধা-রূপে প্রকটিত হইয়াছে। এবং ইউরোপীয় মধ্যযুগে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে তপস্যার ভাব যথেষ্ট বর্ত্তমান ছিল বলিয়া বহু পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি তাঁহাদের চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের ইউরোপীয় কলাবিদ্যায় রুচিবিরুদ্ধ ব্যভিচারের সৃষ্টি হইয়াছে, আর যাহা রুচিকর চিত্র বা প্রতিমূর্ত্তি সৃষ্টি হইতেছে তাহাও পার্থিব। বর্ত্তমান ইউরোপীয় এবং ভারতীয় ললিত-কলার পার্থক্য এই যে ইউরোপীয় চারু-কলাবিদেরা শিল্পের পক্ষচ্ছেদন করায় সে আর মাটির জিনিষ ছাড়া অপর পদার্থ দেখিতে পায় না, পক্ষান্তরে ভারতীয় ললিত-কলা অতি ঊর্দ্ধে উড্ডীয়মান্ হয় এবং মনের পরপার হইতে এক অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্য অনুভব পূর্ব্বক তাহা মর্ত্যজগতে আনয়ন করিয়া ব্যক্তি ও জাতির চরিত্রে ও সৌন্দর্য্যে দেবত্ব ঢালিয়া দেয় এবং এমন এক নব ভাষার সৃজন করে যাহা সার্ব্বজনীন, যাহার অক্ষর পরিচয় পাঠককে করিতে হয় না; এবং বাক্ যাহা প্রকাশ করিতে পারে না সে তাহাই মানব চিত্তে ফুটাইয়া তুলে। গ্রন্থের উপাসনা করিয়া অসারও পণ্ডিত বলিয়া পূজ্য হয়, কিন্তু এই কলাবিদ্যার ভাষা অসার হৃদয়-হীনের বুঝিবার উপায় নাই।

পুনরায় চিত্র ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে যাহা সত্য, সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাহাই। অস্মদ্দেশীয় সংগীত-বিদ্যা সর্ব্ব প্রথমে অনুকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া,

অনুশীলনের দ্বারা স্বরদেবতা সকলের প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।* যেমন প্রতি শব্দের রূপ আছে, সেইরূপ প্রতি রাগরাগিণীর আলাপনে নানা রসের মূর্ত্ত প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। সুরকে ভাষা হইতে পৃথক্ করিয়া যদি শুদ্ধভাবে আলাপ করা যায় তাহা হইলে তত্তৎ সুর শব্দের দ্বারাই শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শান্ত, এই নব রসের হিল্লোল চিত্ত সরোবরে উদ্ভূত করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সুর সম্বন্ধেও সেই একই পার্থক্য--কেবল একটি পার্থিব, অপরটী পার্থিব হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গীয় জ্যোতির রাজ্যে শ্রোতাকে লইয়া যায়। ভারতীয় চিত্রের আলোক এবং গীতির কম্পনের ধারা যে ভারতেতর দেশ হইতে পৃথক্, তাহার কারণ ভারত-ভারতী মনে করে বিদ্যা নিজ ভোগের জন্য নহে, শ্রীভগবানকে লাভ করিবার জন্য—এই মর্ত্ত্য জগতে বাস করিয়াও শ্রীভগবানের লীলা সম্ভোগের নিমিত্ত।

---

* হিন্দু শাস্ত্র মতে শুদ্ধ রাগ-রাগিণী তাল-মান-লয়ে আলাপ করিলে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর মূর্ত্ত প্রকাশ ঘটিয়া থাকে।

শ্রীরাগোঽথ বসন্তশ্চ ভৈরবঃ পঞ্চমস্তথা।
মেঘরাগো বৃহন্নটঃ ষড়েতে পুরুষাহ্বয়াঃ॥ ইতি সংগীত-দর্পণম্॥
আদৌ মালবরাগেন্দ্র স্ততো মল্লার সংজ্ঞিতঃ।
শ্রীরাগশ্চ ততঃ পশ্চাদ্বসন্ত স্তুদনন্তরম্।
হিন্দোলশ্চাথ কর্ণাট এতে রাগাঃ ষড়েবতু॥

শ্রীরাগ, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ, নট, এই ছয় পুং-রাগ।

জীবন্মুক্তি-বিবেক।

বাসনাক্ষয় প্রকরণ।

অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শাস্ত্রবাসনা দর্প উৎপাদন করে বলিয়া তাহা মলিন। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে (১) পাঠ করা যায় যে শ্বেতকেতু স্বল্পকাল মধ্যেই সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া দর্পবশতঃ পিতার সমক্ষেই অবিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আর কৌষীতকী (২) ও বাজসনেয়ী (বৃহদারণ্যক) (৩) উপনিষদে পড়া যায় যে বালাকি কয়েকটী উপাসনাতত্ত্ব অবগত হইয়া (এত) গর্ব্বিত হইয়াছিলেন যে উশীনর প্রভৃতি বহুদেশে দিগ্বিজয় করিয়া অনেক ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিয়া (শেষে) এতদূর ধৃষ্ট হইয়াছিলেন যে কাশীতে আসিয়া ব্রহ্মবিদ্‌দিগের শিরোমণি অজাতশত্রুকে(ও) উপদেশ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

দেহ বাসনাও তিন প্রকার; যথা—আত্মত্ব-ভ্রম, অর্থাৎ দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করা; গুণাধান-ভ্রম, অর্থাৎ যে সকল গুণ জনসমাজে সমাদৃত হইয়া থাকে সেই সকল গুণ অর্জ্জন করিবার প্রয়াস; এবং দোষাপনয়ন-ভ্রম, অর্থাৎ দেহের রোগ অশুচিত্ব প্রভৃতি অপনয়ন করিবার প্রয়াস। তন্মধ্যে দেহে আত্মবুদ্ধি ভগবান্ ভাষ্যকার কর্ত্তৃক (শারীরক ভাষ্যে— ১।১।১) (৪) বিবৃত হইয়াছে—

---

(১) ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ড হইতে আরম্ভ।

(২) কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায় হইতে আরম্ভ।

(৩) বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ।

(৪) "প্রাকৃতাজনাঃ" এইরূপ পাঠও আছে (কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত বেদান্তদর্শন ৫৯ পৃঃ)। বেদান্তবাগীশ কৃত টীকা—চার্ব্বাকের মতে দেহাতিরিক্ত পৃথক্ চৈতন্য নাই সুতরাং জীবদ্দেহই আত্মা বা অহমাস্পদ। দেহে যে চৈতন্য দৃষ্ট হয় তাহা ইহার উপাদানীভূত ভূতনিবহের গুণ বা ধর্ম্ম।

"দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমাত্মেতি প্রাকৃতা
লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ" ইতি

চৈতন্যবিশিষ্ট দেহমাত্রই আত্মা সাধারণ (জ্ঞানচর্চ্চাবিহীন অজ্ঞ) লোকে এবং চার্ব্বাকমতাবলম্বিগণ এইরূপ বুঝিয়াছেন। সাধারণ অজ্ঞ লোকের উক্ত ধারণাটী তৈত্তিরীয় উপনিষদে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে; যথা—ব্রহ্মবল্লী (২।১।১)

"স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" হইতে আরম্ভ করিয়া "তস্মাদন্নং তদুচ্যতে" (এই গ্রন্থাংশে)।

"অন্ন হইতে জাত সেই সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষ শিরঃপাণ্যাদিমান্ স্থূলদেহ অন্নরসের বিকার।'..............সেই হেতু অর্থাৎ ভক্ষ্য ও ভোক্তা বলিয়া তাহাকে অর্থাৎ সেই ভক্ষ্য এবং ভোক্তৃকর্ত্তৃক ধৃত দেহকে মনীষিগণ অন্ন বলিয়া থাকেন"। আর ছান্দোগ্য-উপনিষদের অষ্টমাধ্যায়ে (১) পাঠ করা যায় যে বিরোচন (স্বয়ং) প্রজাপতিকর্ত্তৃক (ব্রহ্মবিদ্যায়) উপদিষ্ট হইয়াও স্বকীয় চিত্তদোষবশতঃ দেহাত্মবুদ্ধিকে দৃঢ় করিয়া অসুরদিগকে (তদ্রূপ) উপদেশ করিয়াছিলেন।

গুণাধান দুই প্রকারের, যথা—লৌকিক ও শাস্ত্রীয়। উত্তম (কণ্ঠ বা বাদ্যাদি) শব্দ সম্পাদন শিক্ষা লৌকিক গুণাধানের দৃষ্টান্ত। অনেকে কোমলস্বরে গান করিতে বা পাঠ করিতে পারিবে বলিয়া তৈলপান, মরিচ ভক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে যত্ন করিয়া থাকে; শরীর কোমলস্পর্শ হইবে বলিয়া অনেকে পুষ্টিকর ঔষধ ও আহার গ্রহণ করিয়া থাকে; লাবণ্যের জন্য লোকে তৈলাদি, সুগন্ধি চূর্ণদ্রব্য, সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকে এবং দেহকে সুগন্ধ করিবার নিমিত্ত পুষ্পমাল্য ও আলেপন ধারণ করে।

শাস্ত্রীয় গুণাধানের নিমিত্ত লোকে গঙ্গাস্নান, শালিগ্রাম পূজা ও তীর্থদর্শন করিয়া থাকে।

দোষাপনয়ন দুই প্রকার—লৌকিক ও বৈদিক। চিকিৎসকোক্ত ঔষধ প্রভৃতির দ্বারা মুখাদি প্রক্ষালন দ্বারা লৌকিক; এবং শৌচ,

(১) অষ্টমাধ্যায়ের সপ্তম খণ্ড হইতে আরম্ভ।

আচমন প্রভৃতি দ্বারা বৈদিক দোষাপনয়ন সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই দেহবাসনার মলিনতা (পরে) বর্ণিত হইবে। দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করা—অপ্রামাণিক এবং অশেষ দুঃখের কারণ বলিয়া দেহাত্মবুদ্ধি—মলিনবাসনা। পূর্ব্বাচার্য্যগণ সকলেই এ বিষয়ে (এই বাসনার মলিনত্ব বুঝাইতে) সবিশেষ বলপ্রয়োগ করিয়াছেন (অর্থাৎ বহুলপরিমাণে বলবদ্যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন)। গুণাধান সম্পাদিত হওয়া প্রায়ই আমরা দেখিতে পাই না। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অনেক গায়ক ও পাঠক প্রকৃষ্ট যত্ন করিয়াও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর লাভ করিতে পারে না। শরীরের কোমলস্পর্শতা ও পুষ্টিসম্পাদন অব্যভিচারিভাবে ঘটিতে দেখা যায় না (অর্থাৎ কখনও ঘটে কখনও ঘটে না)। লাবণ্য এবং সৌগন্ধও বস্ত্রমাল্যাদিতে থাকে, তাহাদিগকে দেহে থাকিতে দেখা যায় না। এই হেতু বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে :—

"মাংসাসৃক্‌পূযবিণ্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ
দেহে চেৎপ্রীতিমান্মূঢ়ো ভবিতা নরকেঽপি সঃ।"

(বিষ্ণুপুরাণ ১।১৭।৬৩) (১)

কোনও অবিবেকী ব্যক্তি যদি মাংস রক্ত পূয বিষ্ঠা মূত্র স্নায়ু মজ্জা এবং অস্থির সংঘাতরূপ দেহে প্রীতিযুক্ত হয়েন, তবে তিনি নরকেও সেইরূপ (প্রীতিযুক্ত) হইবেন।

"স্বদেহাশুচিগন্ধেন ন বিরজ্যেত যঃ পুমান্
বিরাগকারণং তস্য কিমন্যদুপদিশ্যতে॥" (মুক্তিকোপনিষৎ ২।৬৬)

যে পুরুষ স্বদেহের অশুচিগন্ধের দ্বারা (ই) দেহের প্রতি বৈরাগ্য যুক্ত না হয়েন, তাঁহাকে বৈরাগ্যের জন্য আর কি উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে ?

আর শাস্ত্রে যে গুণাধানের বিধান আছে তাহা তদপেক্ষা প্রবলতর অন্য শাস্ত্রবিধান দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়াতে তাহাকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। যেমন এক শাস্ত্রে আছে—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি", কোন জীবের হিংসা বা বধ করিতে নাই; আবার অন্য শাস্ত্রে আছে—

(১) নারদ পরিব্রাজকোপনিষদেও ইহা ৪৮ সংখ্যক শ্লোক বা মন্ত্র।

"অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" "যজ্ঞায় পশু বধ করিবে"। শেষোক্ত শাস্ত্রদ্বারা যেরূপ পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রের অপবাদ বা নিষেধ হইল, (১) সেইরূপ এই অন্য প্রবল শাস্ত্র আছে ;—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

যিনি বায়ু পিত্ত কফ এই ত্রিধাতুনির্ম্মিত—শরীরকে আত্মা বলিয়া মনে করেন, পত্নী প্রভৃতিকে আপনার বলিয়া মনে করেন—অর্থাৎ তাহাতে মমতা বুদ্ধি করেন, মৃৎপ্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তিকেই পূজার্হ বলিয়া মনে করেন এবং সলিলকেই তীর্থ বলিয়া মনে করেন, (কিন্তু) তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে তীর্থ বলিয়া মনে করেন না, তিনি গবাদির (খাদ্য বহন যোগ্য) গর্দ্দভ এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

"অত্যন্তমলিনো দেহো দেহী চাত্যন্তনির্ম্মলঃ।
উভয়োরন্তরং জ্ঞাত্বা কস্য শৌচং বিধীয়তে॥"

দেহ অত্যন্ত মলিন, দেহী (আত্মা) অত্যন্ত নির্ম্মল—এতদুভয়ের এইরূপ প্রভেদ বুঝিলে কাহার শৌচের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে? অর্থাৎ—দেহের শৌচ হইতেই পারে না এবং দেহীর শৌচের প্রয়োজন নাই। যদ্যপি এই শাস্ত্রবাক্য দ্বারা শরীরের দোষাপনয়নেরই নিষেধ করা হইতেছে, গুণাধানের নহে ; তথাপি প্রবলদোষের প্রতিকূলতা থাকিলে, গুণাধান করা সম্ভবপর হয় না বলিয়া, তাৎপর্য্যদ্বারা গুণাধানেরই নিষেধ করা হইয়াছে (বুঝিতে হইবে)। (বেদের মৈত্রায়ণী শাখায় এই শরীরের অত্যন্ত মলিনতা সম্বন্ধে এই শ্রুতি আছে :—

"ভগবন্নস্থিচর্ম্মস্নায়ুমজ্জামাংসশুক্রশোণিতশ্লেষ্মাশ্রুদূষিকাদুষিতে বিণ্মূত্রবাতপিত্তসংঘাতে দুর্গন্ধে নিঃসারেঽস্মিন্‌শরীরে কিং কামোপভোগৈঃ" ইতি। (মৈত্রায়ুণ্যপনিষৎ। ১ম প্রপাঠক। ২ কণ্ডিকা।)

(১) সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদিতে, দ্বিতীয় কারিকার ব্যাখ্যানে বাচস্পতি মিশ্রের উক্তি দ্রষ্টব্য।

হে ভগবন্! এই শরীর চর্ম্ম, স্নায়ু, মজ্জা, মাংস, শুক্র, শোণিত, শ্লেষ্মা, অশ্রু ও পিঁচুটী (চক্ষুক্লেদ) দ্বারা দূষিত, ইহা বিষ্ঠা-মূত্র-বায়ু-পিত্তাদির সংঘাত মাত্র দুর্গন্ধ ও নিঃসার। এইরূপ দেহে আবার কাম্যবস্তুপভোগের প্রয়োজন কি?"

"শরীরমিদং মৈথুনাদেবোদ্ভূতং, সম্বিদপেতং নিরয় এব মূত্রদ্বারেণ নিষ্ক্রান্তমস্থিভিশ্চিতং মাংসেনানুলিপ্তং চর্ম্মণাববদ্ধং বিণ্মূত্রকফপিত্তমজ্জামেদোবসাভিরন্যৈশ্চাময়ৈর্বহুভিঃ পরিপূর্ণং কোশ ইব বস্থুনেতি" (মৈত্রায়ুণ্যপনিষৎ ৩।৪)। এই শরীর স্ত্রী-পুং-সংসর্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; ইহা সম্বিৎশূন্য, অর্থাৎ অচেতন। ইহা (সাক্ষাৎ) নরকস্বরূপ, ইহা মূত্রদ্বার দিয়া নির্গত হইয়াছে। ইহা অস্থিরাশি দ্বারা ব্যাপ্ত (গঠিত), মাংসের দ্বারা অনুলিপ্ত, চর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ এবং ধনাগার যেরূপ ধনদ্বারা পূর্ণ থাকে, সেইরূপ বিষ্ঠা মূত্র কফ পিত্ত মজ্জা মেদ বসা প্রভৃতি (ধন) দ্বারা এবং বহুপ্রকার রোগ দ্বারা (এই অন্নময় কোশ) পরিপূর্ণ।

আর চিকিৎসা দ্বারা যে রোগশান্তি হইবেই তাহারও নিশ্চয়তা নাই। আবার নিবৃত্ত হইলেও রোগ কথন কথন দেখা দেয়। যথন নবদ্বার দিয়া নিরন্তর মল নিঃসৃত হইতেছে এবং অসংখ্য রোমকূপ দিয়া প্রস্বেদ নির্গত হইয়া শরীরকে আর্দ্র করিতেছে তখন কোন্ ব্যক্তি এই দেহকে প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে?* পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন:—

"নবচ্ছিদ্রযুতা দেহা স্রবন্তি ঘটিকা ইব।
বাহ্যশৌচৈর্ন শুধ্যন্তি নান্তঃশৌচং তু বিদ্যতে॥"

ছিদ্রযুক্ত ঘট হইতে (যাহার ভিতর হাত প্রবেশ করে না) জলের ন্যায় নবচ্ছিদ্রযুক্ত দেহসমূহ হইতে (সর্ব্বদাই) (মল) পরিস্রুত হইতেছে। বাহ্যশৌচের দ্বারা তাহাদের শুদ্ধি হয় না এবং আভ্যন্তর শৌচের কোন উপায়ই নাই।

এই হেতু দেহবাসনা একটী মলিন বাসনা। (দেহবাসনার) এই মলিনতাকে লক্ষ্য করিয়াই বসিষ্ঠ বলিতেছেন:—

* টীকা—এস্থলে "কো নাম (স্বেদেন) প্রক্ষালয়িতুং শক্নুয়াৎ" এইরূপ পাঠ সন্দিগ্ধ। (খেদেন) পাঠ করিলে, 'পরিশ্রম করিয়া প্রক্ষালন করিতে পারে' এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়।

আপাদমস্তকমহং মাতাপিতৃ বিনির্ম্মিতঃ

ইত্যেকো নিশ্চয়ো রাম বন্ধায়াসদ্বিলোকনাৎ ॥

"চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত আমি পিতামাতা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হইয়াছি" এইরূপ মুখ্য ধারণা, হে রাম! বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে; কেননা ইহা অসম্যগ্ দর্শন বা বিচারবিহীন জ্ঞান (অজ্ঞান) হেতুই হইয়া থাকে।

সা কালসূত্র পদবী সা মহাবীচিবাগুরা

সাঽসিপত্রবনশ্রেণী যা দেহোঽহমিতি স্থিতিঃ ॥*

(বাসিষ্ঠ রামায়ণ, স্থিতিপ্রকরণ—৫৬।৪৫-৪৬)

"দেহই আমি" এইরূপ নিশ্চয়, কালসূত্র নামক নরকে পৌঁছিবার পথ; এই নিশ্চয়রূপ ফাঁদে ধৃত হইলেই মহাবীচি নামক নরকে নীত হইতে হয়, এবং ইহাই অসিপত্রবন নামক নরকে নামিবার নিঃশ্রেণী বা সোপান স্বরূপ।

"সা ত্যাজ্যা সর্ব্বযত্নেন সর্ব্বনাশেঽপ্যুপস্থিতে।

স্প্রষ্টব্যা সা ন ভব্যেন সশ্বমাংসেব পুল্কসী ॥ †

(বাঃ স্থিতি প্রকরণ রাঃ,—৫৬।৪৬)

সেই ধারণাকে, সর্ব্বনাশ ঘটিলেও সর্ব্ব প্রযত্নে পরিত্যাগ করিতে হইবে। নিষাদের ঔরসে শূদ্রকন্যার গর্ভজাতা নারী যদি কুকুরের মাংস বহন করিয়া লইয়া যায় সে যেরূপ অস্পৃশ্য, "আমি দেহ" এইরূপ ধারণাও সেইরূপ সাধুগণের অস্পৃশ্য।

---

* টীকা—মনুসংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ে ৮৮-৯০ শ্লোকে যে উত্তরোত্তর উগ্রতাধিক্যানুক্রমে ২১টী নরকের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে কালসূত্র নরক ৫ম, মহাবীচি ৮ম ও অসিপত্রবন ২০শ। শ্রেণী শব্দের অর্থ রাজি বা সমূহ হইলেও, নিঃশ্রেণী গ্রহণ করিলেই শ্লোকের সুসঙ্গত অর্থ পাওয়া যায়। রাজি অর্থ গ্রহণ করিলে, অর্থাৎ উক্ত নিশ্চয়কে অনেকগুলি অসিপত্রবন নরক বলিলে, রামায়ণ টীকাকার প্রদর্শিত উপায়ে অর্থ বাহির করিতে হয়—অর্থাৎ আয়ুকে ঘৃত বলিলে যেমন অভেদারোপ হেতু সামানাধিকরণ্য ঘটাইতে হয়, এখানেও সেইরূপ করিতে হয়।

† মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায়ের ১৮শ শ্লোকে পুক্কসীর লক্ষণ দ্রষ্টব্য। দেহে অহং বুদ্ধিও কুকুর মাংসের ন্যায় অশুচি কামাদি উৎপাদন করিয়া থাকে।

ব্রতধারিণীর মহাসমাধি।

(স্বামী সারদানন্দ)

দিব্যশতদল রবিকর-সম্পাতে পূর্ণপ্রবুদ্ধ ও শোভা-সৌরভে দেবতার লোভনীয় হইয়া রহিয়াছে, সহসা দুরন্ত পবন আসিয়া তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট ও বৃন্তচ্যুত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল—সংসারে এ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়!

সরলতা ও নির্ভরের পুণ্যপ্রতিমা দিব্যশিশু জননীর পার্শ্বে ক্রীড়ারত থাকিয়া আনন্দের তুফান উঠাইয়াছে, সহসা করাল ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া কয়েকদণ্ডে মানবদৃষ্টির অন্তরালে লইয়া যাইল—এ দৃশ্যও বিরল নহে !!

অশেষ সাধনার পরিণতিস্বরূপ নির্দ্বন্দ্ব, নিরহঙ্কার, সর্ব্বভূতে করুণাশীল সাধুহৃদয়, দুঃখদারিদ্র্য ও ত্রিতাপে দগ্ধ জীবকুলের পরম আশা-ভরসা ও আশ্রয়স্থল হইয়া রহিয়াছে, সহসা বিকট কাল উপস্থিত হইয়া তাহাকে সবলে সংহারপূর্ব্বক তাহাদিগের সকল আশা নির্ব্বাপিত করিল—এ দৃশ্যও "দৃষ্টি-পোড়া সৃষ্টিতে" নিত্য দেখা যায় !!!

কেন এরূপ হয়? উহা কি নির্ম্মম কঠোর প্রেতের পরিহাস তাণ্ডব? —অথবা শিবময় বিধাতার, মানবদৃষ্টি ও বুদ্ধির অগম্য, অজ্ঞাত মঙ্গলময় ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়?—কে বলিবে?—ভগবদ্ভক্ত বলিয়া থাকেন "তোমরা ঐরূপ ঘটনাবলীর যে ভাবেই ব্যাখ্যা কর না কেন, আমি কিন্তু বলিব ঐ সকলও আমার পরমারাধ্য হৃদয় দেবতার মঙ্গলময় ইচ্ছাতে সংঘটিত হইয়া মঙ্গলই আনয়ন করে—উহা আমি বুঝিতে পারি বা নাই পারি!"

হে পাঠক, ঐরূপ একটি ঘটনাই আমরা সন্তপ্তচিত্তে আজি তোমাদের গোচরে আনয়নে অগ্রসর। শ্রীগুরুর করুণাকর-সম্পাতে যে সহস্রদল-কমল সপ্তদশবর্ষে পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা ও সাধনাপ্রভাবে যে হৃদয় বঙ্গের ব্যথিত, ক্লিষ্ট নারীকুলের শান্তিময় আশ্রয়-

স্থল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ইহসংসার হইতে সহসা সবলে অপহৃত হইয়াছে!—'নিবেদিতা বিদ্যালয়ের' সুবিখ্যাতা পরিচালিকা এবং শ্রীশ্রীসারদামন্দির-ছাত্রীনিবাসের প্রতিষ্ঠাত্রী ও প্রাণস্বরূপা শ্রীমতী সুধীরা বিগত ৮ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার অপরাহ্ণে কাশীধামে শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে মহাসমাধিযোগে লীনা হইয়াছেন!

'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' আজীবন ব্রতধারিণী তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রয়স্ত্রিংশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল—কিন্তু অদ্ভুত কর্ম্মকুশলতা ও অচল অটল ধৈর্য্যসম্পদে অধিকারিণী হইয়া তিনি ঐ স্বল্পকালে যে কার্য্য সকল করিয়া গিয়াছেন তাহা অশীতিপর বৃদ্ধের দীর্ঘজীবনেও সম্ভবপর নহে। নিঃস্বার্থ-প্রেম ও মাধুর্য্য তাঁহার হৃদয়ে এতই পরিণতি লাভ করিয়াছিল যে, একবার মাত্র পরিচয়েই তিনি সকলকে চিরকালের মত আপনার করিয়া লইতেন!

পূজাবকাশে হৃষীকেশ, হরিদ্বারাদি তীর্থসমূহে পরিভ্রমণপূর্ব্বক তিনি ৬ই অগ্রহায়ণ উত্থান-একাদশীর পূর্ব্বদিনে প্রয়াগধামে উপস্থিত হন এবং শ্রীরামকৃষ্ণমিশন প্রতিষ্ঠিত কাশী-সেবাশ্রমের স্ত্রী-বিভাগের কতকগুলি কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য পরদিন অপরাহ্ণে বি, এন্, ডবলিউ, রেলপথে কাশীযাত্রা করেন। কাশীর কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনে পৌঁছিবার ৮।১০ মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত ষ্টেশনবিশেষে ট্রেন্ প্রবেশ করিবার কালে তিনি গাড়ী হইতে সহসা ভূতলে পড়িয়া অচেতন হইয়া যান। কিন্তু গুরুতর আঘাতপ্রাপ্তির কোনরূপ বাহ্য চিহ্ন শরীরে না থাকায় তাঁহার শীঘ্র প্রকৃতিস্থ হওয়ার বিষয়ে সকলে নিঃসন্দিহান হয়। অনন্তর উক্ত গাড়ীতেই উঠাইয়া রাত্রি ১১টা আন্দাজ সময়ে তাঁহাকে কাশীতে মিশনের সেবাশ্রমে লইয়া আসা হইল এবং তৎক্ষণাৎ সুবিজ্ঞ চিকিৎসক-গণকে আনাইয়া চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইল। দুঃখের রজনী অতি বিলম্বে পোহাইল—কিন্তু শ্রীমতী সুধীরার জ্ঞানোন্মেষ হইল না। প্রভাতের সূর্য্য ধীরপদে মধ্যাকাশে উপস্থিত হইল—কিন্তু সুধীরার অবস্থার উন্নতি না হইয়া ক্রমশঃ অবনতিই হইতে লাগিল। অবশেষে চিকিৎসকগণ নিরাশ হইয়া তাঁহাকে ভবরোগবৈদ্য ৺শ্রীবিশ্বনাথের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

অপরাহ্ণের বেলা ঢলিয়া ক্রমে ৩াটা বাজিল— ব্রহ্মচারিণী সুধীরার মুখমণ্ডল এইক্ষণে অপূর্ব্ব শ্রী ও জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া সকলের নয়নাকর্ষণ করিল!—সকলেই বুঝিল শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহার অশেষ গুণশালিনী প্রিয় তনয়াকে নিজাঙ্কে লইয়া তাহার জীবনব্যাপী ব্রতের উদ্‌যাপন ও সকল যন্ত্রণার অবসানপূর্ব্বক তাহাকে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীতে পরিণত করিতেছেন!

হে ব্রতধারিণী! অদ্য তোমার ব্রত সম্পূর্ণ—'শীল' সম্পূর্ণ—ত্যাগ সম্পূর্ণ হইয়াছে! কর্ম্মপরিণতিই তোমাকে 'অকর্ম্মের' পথে প্রেরণ করিয়া "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং বিন্দতে নরঃ" রূপ ভগবদ্‌বাক্যের সাফল্য প্রমাণিত করিয়াছে; এবং দৈব তোমার কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভের কাল আগতপ্রায় অবলোকনে সুপ্রসন্ন হইয়া পতনরূপ ঘটনা অবলম্বনে মুহূর্ত্তমাত্রে সকল প্রকার পার্থিব কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া তোমাকে উল্লাভে সহায়তা করিয়াছে! যে যে-ভাবেই ঐ ঘটনা দেখুক না কেন, আমাদের ধারণা—আমাদিগের পরম করুণাময়ী জননী, তুমি ভূতলে পতিত হইবার পূর্ব্বেই তোমাকে নিজ স্নেহ-কোমল অঙ্কে ধারণ করিয়া পরম শান্তির রাজ্যে অন্তর্হিত করিয়াছেন! তবে যাও গুরুগতজীবিতে! জীবৎকালে শ্রীপ্রভু তোমাকে কৃপা করিয়া দিব্যচক্ষু প্রদানপূর্ব্বক যে দিব্যধাম হইতে তোমারি আগমন দেখাইয়াছিলেন, তথায় নিজ অধিকার-গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিতা হইয়া নিত্যানন্দে চিরবিহার করিতে থাক এবং তোমার পিতা মাতা ভগ্নী ভ্রাতা সুহৃৎ ও শিষ্যস্থানীয় যাহারা তোমার অদর্শনে শোকে মুহ্যমান ও মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছে—অমরধামের দিব্যশক্তি প্রভাবে তাহাদিগের প্রাণ স্পর্শ করিয়া তাহাদিগকে নিঃসংশয়ে বুঝাইয়া দাও—"ভাগবৎ ভক্ত ভগবান, তিনে এক, একে তিন"—শ্রীভগবানের সহিত ভক্ত চিরকাল বর্ত্তমান রহিয়াছে ও থাকিবে!!

কার্ত্তিক-শুক্লাত্রয়োদশীর কৌমুদিশুভ্রা রজনী স্বর্ণময়ী কাশীর অঙ্গে রজতাবরণ ঢালিয়া আনন্দকাননে হরগৌরীর মিলন উপস্থিত করিয়াছে! ৺বিশ্বনাথের আরাত্রিকের গুরুগম্ভীর ধ্বনি "জয় শিব ওঁকার, ভজ শিব ওঁকার, ব্রহ্মাবিষ্ণু সদাশিব, হর হর হর মহাদেব" শিব-মহিমায় দশদিক্ পূর্ণিত ও প্রতিধ্বনিত করিতেছে! উত্তরবাহিনী

ভাগীরথীর পুণ্য-মণিকর্ণিকাবক্ষে ঐ সময়ে চিতার জলন্ত শিখারাজি যেন ঐ আবাবে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নাচিয়া নাচিয়া পার্শ্বস্থ দ্বিতল গৃহসমূহকেও ছাড়াইয়া উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল এবং বিভূতিমণ্ডিত শ্মশানবাসী জনৈক সাধু তথায় সহসা আগমন করিয়া ঐ চিতার চতুর্দ্দিকে আনন্দে পরিক্রমণ ও নৃত্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"এতদিন এখানে আছি, কিন্তু এমনটি কখন দেখি নাই !!"

সমালোচনা।

বাঙ্গালীর প্রাণ। শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। (প্রবাসী—অগ্রহায়ণ ১৩২৭)—"বাঙ্গালী হইতেছে প্রকৃতির সাধক। বাঙ্গালীর ধর্ম্মে, সাহিত্যে দেখি জন্মিয়াছে এই প্রকৃতিপূজার উৎসব। বাঙ্গালীর ইষ্ট পুরুষ নহে। নিরালম্ব, সমাধিগত, আত্মরত স্থৈর্য্যকেই সে একান্ত করিয়া লইতে পারে নাই। বাঙ্গালী চাহিয়াছে প্রকাশ, লীলা।" বাঙ্গালা তাই মায়ের —শক্তির পীঠ। বাঙ্গলা আনন্দের ক্ষেত্র—অক্ষরব্রহ্ম বাঙ্গলার লক্ষ্য নয় —বাঙ্গালীর প্রাণে অধিষ্ঠিত হ্লাদিনী শক্তি। আধুনিক বাঙ্গলার গোড়ায় দেখি শক্তিসাধক রামমোহন। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ছিলেন শক্তিসাধক। বেদান্ত তাঁহাদের উপর যতই প্রভাব ছড়াইয়া থাকুক না কেন, শক্তির সাধনা ছিল তাঁহাদের মর্ম্মের বস্তু। আর অন্য ক্ষেত্রে আজকাল জগদীশচন্দ্র প্রকৃতি সাধনার যে একটা নূতন দিক দেখাইতে-ছেন, তাহার মধ্যে বাঙ্গলার প্রতিভারই ছায়া কি যে দেখিতেছি না ?"

লেখকের লেখা দেখিয়া বোধ হয় যে—তাঁহার ইচ্ছা বাঙ্গালীর চিন্তোদ্ভূত ধর্ম্মকে একটী জাতীয় গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়া দেওয়া। কিন্তু বাঙ্গালী, চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি হইতে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সকল

সিদ্ধ পুরুষের ভাবে ভাষায় ও সাধনায় অনন্ত ভাবময় পরমেশ্বরের বৈচিত্র্যই প্রদর্শন করিয়াছে। বাঙ্গালীর ইষ্ট কেবল স্ত্রী নহে,—বাঙ্গালী বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, বাঙ্গালী ব্রাহ্ম সগুণনিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন এবং রামপ্রসাদ কমলাকান্তে আদ্যাশক্তির আরাধনার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তথা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর এবং মাতৃভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখা যায়। লেখক বেদান্ত-কেও একদেশী গণ্ডীর মধ্যে নিক্ষেপ করিতে চাহিয়াছেন! বেদান্ত মানে কেবল শ্রীগৌড়পাদের অজাতবাদ নহে, যাহাতে এই জগতকে নিঃশেষে অস্বীকার করা হইয়াছে—কিম্বা শ্রীশঙ্করের মায়াভাষ্যান্তর্গত 'পারমার্থিক' এবং 'ব্যবহারিকে'র, কেবল 'পারমার্থিক' নহে। শ্রীশঙ্কর দার্শনিক ভাষায় যে 'ব্যবহারিক' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাই পুরাণের ভাষায় 'লীলা'। তা'ছাড়া এই বেদান্তকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীরামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, নিম্বার্ক, বলদেব প্রভৃতি অষ্টাদশ আচার্য্যগণ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং বেদব্যাসের পূর্ব্বেও আশ্মরথ্যঃ, কাশকৃৎস্ন, ওডুলোমি প্রভৃতি আচার্য্যগণের বেদান্ত ব্যাখ্যা তৎপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রে দৃষ্ট হয়, তথা শ্রীশঙ্করাদির ভাষ্যে বৃত্তিকার বৌধায়ন, ভর্তৃ এবং উপবর্ষ প্রভৃতি বেদব্যাখ্যাকারগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।—অতএব আমরা বলিতে পারি না বাঙ্গালী সাধক কেবল লীলাকে চান নিত্যকে নহে, স্ত্রীদেবতার সৌন্দর্য্য দেখেন পুংদেবতার নহে, কিম্বা বেদান্ত মানে 'জগৎ তিনোকালমে নেহি হ্যায়।'

"বাঙ্গালী জীবন চাহিতে পারে তাই বলিয়া অধ্যাত্মকে ভুলিতে চাহে না।" একথা খুব ঠিক্। কিন্তু তাই বলিয়া—"বৈরাগ্য হইতে সে দূরে থাকিতে চাহিয়াছে কিন্তু মুক্তিকে দূর করিয়া দেয় নাই"—একথায় আমরা সায় দিতে পারি না; কারণ বাঙ্গালী চৈতন্যের সন্ন্যাস, বাঙ্গালী রামকৃষ্ণের কামকাঞ্চন ত্যাগ এবং বাঙ্গালী সাধক কবিগণের গান ঐ কথার প্রতিবাদ করে। যথা,—

"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুতমিত রমণী সমাজে"

—বিদ্যাপতি।

"এখন যৌবন পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীতরে।
"কমল দল জল জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নিত রে॥"
—গোবিন্দ দাস।

"প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি"
—রাম প্রসাদ।

"আর কিছু নাই সংসারের মাঝে কেবল শ্যামা সার রে"
—কমলাকান্ত।

"মন চল নিজ নিকেতন" —রামমোহন।

"নেতি নেতি বিরাম যথায়" —বিবেকানন্দ।

আমরা তাই বলি "বাঙ্গালা সাদা অধ্যাত্মকে ধরিতে জানে না, তাই বাঙ্গালী মায়াবাদের অর্থ বুঝিতে সাধু সন্ন্যাসী হইতে চাহে না"—একথা ঠিক নয়। সাদা অধ্যাত্ম-নিত্যের কাপড়ও যেমন বাঙ্গালী পছন্দ করে, তেমনি বিচিত্র অধ্যাত্ম-লীলার রঙিন কাপড়ও পছন্দ করে। বাঙ্গালীর প্রাণ কেবল নিত্যে নয়, কেবল লীলায় নয়—নিত্য ও লীলার সমন্বয়ে।

চিন্তা প্রবাহ—৺শশীমোহন বসাক্, এম-এ প্রণীত। গ্রন্থকার সাহিত্যজগতে সমধিক সুপরিচিত না হইলেও একেবারে অপরিচিত নহেন। এই পুস্তকে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য দার্শনিক ও সামাজিক গবেষণা এবং ভারতীয় পৌরাণিক মহান্ চরিত্র সকলের সমালোচনা পরিপূর্ণ পঞ্চদশটি প্রবন্ধ আছে। "ব্যাকরণ মানিয়া চলা একটা দুর্ব্বলতা বা সঙ্কীর্ণতা" এই আধুনিক মত গ্রন্থকার ত্যাগ করিয়া সরল শুদ্ধ ভাষায় বিষয়গুলির আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে ইংরাজী অনভিজ্ঞ বহুব্যক্তি ইউরোপীয় স্পিনোজা, হিগেল প্রভৃতি প্রথিতনামা দার্শনিক সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন। তাহা ছাড়া লক্ষণ, অর্জ্জুন, কর্ণ প্রভৃতি পৌরাণিক মহান্ চরিত্র সকলের মাধুর্য্য কোথায় তাহা খুঁজিয়া পাইবেন। মূল্য ৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—উদ্বোধন কার্য্যালয়।

সংবাদ ও মন্তব্য।

নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয়ে বয়নশিল্প শিক্ষার জন্য একটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। জনৈক শিক্ষয়িত্রী কয়েকটী বালিকা ও কৌনও কোনও শিক্ষয়িত্রীকে তাঁতে কাপড় ও গামছা বুনা শিক্ষা দিতেছেন। বিদ্যালয়ের কয়েকজন এই শিল্প শিক্ষায় পারদর্শীনী হইলে অনেকগুলি শিক্ষার্থিনীকে এই বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইবে। অর্থ সমস্যার দিনে স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই শিল্প শিক্ষার বিস্তার প্রার্থনীয়। দেশের এই দারুণ বস্ত্র-সঙ্কটের সময় গৃহলক্ষ্মীরা এই বিষয়ে সুশিক্ষিতা হইলে অল্প মূলধনে অবসরসময়ে কাপড় গামছা ইত্যাদি বুনিয়া স্বল্প খরচে নিজ নিজ পরিবারের বস্ত্রাভাব মোচনে সমর্থা হইবেন এবং প্রয়োজন হইলে বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবেন নিঃসন্দেহ।

রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড়ে একটী বয়ন বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। জনৈক ব্রহ্মচারী কোয়ালপাড়া রামকৃষ্ণ বয়ন বিদ্যালয় হইতে শিক্ষালাভ করিয়া এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতেছেন। আপাততঃ ছয় জন ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতেছে। দুইটী তাঁত বসান হইয়াছে এবং কাপড় ও গামছা বুনা হইতেছে। রামকৃষ্ণ আশ্রম, কলমা (ঢাকা), একটী বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন করিবার মানসে এই বিদ্যালয়ে একটী ছাত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

শিলচর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অধীনে একটী নৈশ বিদ্যালয়, সাধারণ পাঠাগার এবং ছাত্রাবাসের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে। ইঁহারা 'নবযুগ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিতেছেন। কাগজখানির সম্পাদন কার্য্য ভবিষ্যতের অতি আশাপ্রদ।

গত বুধবার ১৭ই নভেম্বর কলিকাতা ভবানীপুর ৮৬।এ হরিশ চাটার্জ্জীর ষ্ট্রীটে বেলুড় মঠের শাখা স্বরূপ 'রামকৃষ্ণ মঠ' স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় প্রায় ১৫০ শত ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। ভজন, কীর্ত্তন, পূজা-পাঠ, হোম এবং প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি কার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। কলিকাতার দক্ষিণাংশে যাঁহাদের বাস দূরত্ব হেতু তাঁহাদের অনেকের বেলুড় মঠে বা বাগবাজার মঠে আসিয়া

ধর্ম্মালোচনাদি করিবার যে অসুবিধা ছিল তাহা এত দিনে দূর হইল।

মান্দ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের স্বামী গোকুলানন্দজি শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ৺কাশীধামে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করেন। তথায় কিছু কাল অবস্থানের পর বিগত আশ্বিনের মাঝামাঝি জ্বররোগে আক্রান্ত হ'ন এবং তাহার ফলে শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সজ্ঞানে শ্রীশ্রীঠাকুর এবং মাতাঠাকুরাণীর চিত্র সমক্ষে জপ করিতে করিতে ৩৪ বৎসর বয়সে তাঁহাদেরই শ্রীচরণপ্রান্তে প্রয়াণ করিয়াছেন।

আগামী ১৬ই পৌষ, ইং ৩১ ডিসেম্বর, শুক্রবার, চান্দ্র অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের পুণ্য সপ্তমী তিথি। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের পরমারাধ্যা জননী সপ্তষষ্ঠী বৎসর পূর্ব্বে ঐ তিথিতে আমাদিগের প্রতি অনন্ত করুণায় ইহধামে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। ঐ ঘটনার স্মরণার্থ ঐ দিবসে বেলুড় মঠে এবং কলিকাতায় বাগবাজার-পল্লীস্থ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বাটীতে (১নং মুখার্জ্জি লেনে) বিশেষ পূজানুষ্ঠান হইবে। পুরুষ ভক্তগণের জন্য বেলুড় মঠে এবং স্ত্রী ভক্তদের জন্য বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বাটীতে ঐ দিবস মধ্যাহ্নে পূজা দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বন্যা ও দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য্য।

পুরী জেলায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য্য বন্ধ করা হইয়াছে। এসময় একটী ধান কাটা হয়; অনেকে কাজ পাইবে। চাউলের দরেরও হ্রাস হইয়াছে। এজন্য ভুবনেশ্বরেও গত অক্টোবর মাসে কার্য্য বন্ধ করা হইয়াছে। গত ২৬শে নভেম্বর হইতে কানাস ও গারিসাগোদার কার্য্যও বন্ধ করা হইয়াছে। কটক জেলার জেনাপুরে কার্য্য এখনও চলিতেছে। মনে হয় তথায় ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্য চলিবে।

নভেম্বর মাস		চাউল	কাপড়
কানাস	৪৩ গ্রাম	৭৪॥৬	৭
গারিসাগোদা	৩০ „	১৫০৸৭	১৫
জেনাপুর	৪৯ „	১৫০/৬	^